মুখবন্ধ

'নিম্নবর্গ ও নারী'- এইরূপ একটি বিষয় নিয়ে আমার উচ্চতর পর্যায়ে গবেষণার অভিপ্রায় এম.এ শ্রেণির শিক্ষার্থী থাকাকালীন। নিম্নবর্গ তাত্ত্বিক ঘরানার সঙ্গে পরিচয়ের পর্যায় থেকে সাহিত্যের বিভিন্ন মাধ্যমে এর যে বিস্তৃত দিকসমূহ ছড়িয়ে আছে তাকে গভীরভাবে খতিয়ে দেখার আগ্রহ জন্মে। পরবর্তী সময়ে, কর্মজীবনে প্রবেশের পর সেই আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণরূপ দেয়ার সুযোগ এলো। শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ স্যারের নিকট প্রত্যাশা ব্যক্ত করলে, তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ এই গবেষণাকর্মকে যথানিয়মে বাস্তবায়ন করার পথ দেখিয়েছে।

আমার পিএইচ.ডি. গবেষণা অভিসন্দর্ভের শিরোনাম 'বাংলাদেশের উপন্যাসে নিম্নবর্গের নারী (১৯৮৭-২০০০)'। পিএইচ.ডি. গবেষণাকর্মের নিমিত্তে ২০১৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক অধ্যাপক ড. হোসনে আরার তত্ত্বাবধানে যোগদান করি। ম্যাডামের প্রত্যক্ষ ও আন্তরিক সহযোগিতা, প্রাজ্ঞতা, সহনশীলতায় এই অভিসন্দর্ভ রচনায় উৎসাহ পেয়েছি। শত ব্যস্ততার মধ্যে তিনি আমাকে সময়, সাহস ও সাহচর্য দিয়ে অনুপ্রাণিত করেছেন। এ-প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, এই গবেষণা পরিমণ্ডলের শুরু থেকে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাঁর অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ অভিমত, সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা দিয়ে এই অভিসন্দর্ভ রচনায় সহায়ক ভূমিকা রেখেছেন। তাঁর নিকট আমার ঋণ অপরিসীম; পরবর্তীতে তিনি অবসরে যাওয়ার পর যুগ্ম-তত্ত্বাবধানে থাকতে অপারগতা প্রকাশ করেন। অসীম কৃতজ্ঞতায় স্যারের এই অবদান আজীবন স্মরণে রাখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করি।

এই গবেষণাকর্ম চলাকালীন করোনার ভয়াবহ থাবায় হুমকির সম্মুখে ফেলেছিল সমগ্র সভ্যতাকে। এই দুঃসময়ে আমরা হারিয়েছি অনেক কাছের মানুষকে। এর মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. মোহা.সাইদুর রহমানের আকস্মিক চলে যাওয়া। তাঁর এই চলে যাওয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। গবেষণা চলাকালীন স্যারের পরামর্শ, দিকনির্দেশনা আমাকে আজীবন ঋণী করে রাখবে। গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক মোঃ ইয়াসিন আলী স্যারকে। গবেষণার বিষয়ে তাঁর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা, পরামর্শ নিরন্তর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। এই অভিসন্দর্ভ রচনাকালে যারা আমাকে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করেছেন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. মোঃ সরওয়ার মুর্শেদ, অধ্যাপক ড. মোঃ হাবিবুর রহমান(রহমান হাবিব), অধ্যাপক ড. গৌতম কুমার দাস, অধ্যাপক গাজী মোঃ মাহবুব

মুর্শিদ স্যার। তাদের আন্তরিক পরামর্শ, নির্দেশনা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। বিভিন্ন সময় ফোনে পরামর্শ দিয়ে, খোঁজ নিয়ে সাহস দিয়েছেন আমার শিক্ষক অধ্যাপক ড. মোঃ রবিউল হোসেন, অধ্যাপক ড. মোঃ মনজুর রহমান, অধ্যাপক ড. মোঃ রশিদুজ্জামান, সহযোগী অধ্যাপক ড. সাইফুজ জামান। আমার সতীর্থ ও সহকর্মী, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. ইয়াসমীন আরা সাথীর পরামর্শ ও সাহচর্য শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। ড. রোজি আহমেদ ও জনাব ফৌজিয়া খাতুনের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। জনাব তিয়াশা চাকমার প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই, কারণ জাপান প্রবাসী হয়েও বিভিন্নভাবে খোঁজ-খবর নিয়ে সাহস জুগিয়েছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বাইরে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক মুঈদ রহমান স্যারের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা অসীম; বিশেষ করে করোনাকালীন বৈরী পরিবেশে তিনি আমাকে বিভিন্নভাবে সাহস ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন গবেষণাকর্ম যথাসময়ে সম্পন্ন করতে। পিএইচ.ডি. গবেষণাকর্মের মতো একটি শ্রমশীল জ্ঞানচর্চায় নিজেকে নিয়োগ ও সম্পন্ন করার জন্য আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাবেক সভাপতি ও অধ্যাপক ড. শেখ মোঃ রজিকুল ইসলাম স্যারের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। কর্মজীবনের সর্ব অবস্থায় স্যারের পরামর্শ, দিকনির্দেশনা আমার সারা জীবনের পাথেয়। গবেষণা চলাকালীন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব সুপ্রিয়া রাণী দাসের বন্ধুত্বসুলভ সহযোগিতা কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছে।

গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করার কাজে আমি ব্যক্তিগত সংগ্রহের পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। পাশাপাশি অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের জন্য বাংলা একাডেমির গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এ কাজে গ্রন্থাগার-সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর আন্তরিক সহযোগিতা অনস্বীকার্য। এপ্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে বাংলা একাডেমির কর্মকর্তা জনাব মোঃ কামাল উদ্দীন আহমদ ভাইয়ের নিকট আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ; তাঁর আন্তরিক সহযোগিতা বাংলা একাডেমির দুষ্প্রাপ্য বই, পত্রিকা সংগ্রহ করতে সাহায্য করেছে। আমি স্মরণ করি আমার বাবা-মা, দুই ভাই ও পিতৃব্য অধ্যাপক নূরউদ্দীন আহ্মেদকে যারা সব সময় আন্তরিকতার সঙ্গে গবেষণাকর্মের খোঁজখবর রেখেছেন। তাঁদের দোয়া ও আন্তরিক সহযোগিতা আমার জীবনের পাথেয়। এই দীর্ঘ গবেষণাযাত্রায় সবচেয়ে ত্যাগ স্বীকার করেছে আমার একমাত্র পুত্র আহনাফ তাহমিদ সৌম্য। ওকে প্রাপ্য সময় থেকে বঞ্চিত করে আমাকে এই কাজ সম্পন্ন করতে হয়েছে। আমার সহযাত্রী আব্দুস সবুর, তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঋণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকারের উর্ধ্বে। তার আন্তরিক সহযোগিতা সবসময় আমার পথচলায় অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। পরিশেষে আমি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে, এই গবেষণাকর্মের জন্য তারা পিএইচ.ডি. ফেলোশিপের মনোনয়ন

দেওয়ায় আরো কর্মনিষ্ঠ ও দায়িত্ববোধের সঙ্গে কাজটি সম্পন্ন করতে উৎসাহিত হয়েছি। বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের নারী–বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই কাজের মধ্য দিয়ে সাহিত্যে নিম্নবর্গের নারীর বহুমাত্রিক রূপের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, যার সবটুকু এখানে তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। আগামীতে সুযোগ এলে এই বিষয়ে আমি আরো শ্রমসার্থক গবেষণা করতে আগ্রহী।

মোছাঃ রওশন আরা
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া
ও পিএইচ.ডি. গবেষক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সূচিপত্র

ভূমিকা **৫-১১**

প্রথম অধ্যায়
নিম্নবর্গ ও নারী: তাত্ত্বিক পটভূমি **১২-৬২**

দ্বিতীয় অধ্যায়
বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের নারী **৬৩-১১৭**

তৃতীয় অধ্যায়
বাংলাদেশের উপন্যাসে নিম্নবর্গের নারী **১১৮-৩৯৩**

প্রথম পরিচ্ছেদ
নিম্নবর্গের নারীর সামাজিক অবস্থান **১১৮-৩৩৩**

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
নিম্নবর্গের নারীর অর্থনৈতিক অবস্থান **৩৩৪--৩৬৮**

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
নিম্নবর্গের নারীর রাজনৈতিক অবস্থান **৩৬৯-৩৯২**

চতুর্থ অধ্যায়
নিম্নবর্গের নারীর ভাষিক-বৈশিষ্ট্য **৩৯৩-৪৩২**

উপসংহার **৪৩৩-৪৩৭**

গ্রন্থপঞ্জি **৪৩৮-৪৪৯**

অবতরণিকা

মানব সভ্যতার ইতিহাসে মানুষের অবস্থানকে বারংবার মূল্যায়ন করার মধ্যে দিয়ে মানুষ তার নিজেকে চিনতে শিখেছে। হাজার বছর ধরে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মানুষ যে সভ্যতা নির্মাণ করেছে, সেখানে মানুষের মূল্য কোথায় এই প্রশ্ন থেকেই যায়। এই প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজতে সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসকে আরো একবার পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন পড়ে। মানুষে মানুষে বিভাজন বা বিভেদের পশ্চাতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে অর্থনীতি। অর্থনৈতিক বৈষম্য নির্মাণ করে মানুষের বহুমাত্রিক শ্রেণিবিভেদ। এই অদৃশ্য বিভাজন রেখা কখনো চলেছে ধর্মের নামে, কখনো রাজনীতির নামে, যেখানে সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে সুবিধাভোগী উচ্চবর্গ শ্রেণি। কৃষক, শ্রমিক, ক্ষুদ্র কারিগর প্রভৃতি মানুষ হয়েছে অবহেলিত, বঞ্চিত, নিম্নবর্গ শ্রেণির নাগরিক। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বাতাবরণে এভাবেই পটভূমি রচিত হয়েছে মানুষে মানুষে বিভেদের। শাসনে ও শোষণে মানুষ পরিণত হয়েছে তুচ্ছ থেকে তুচ্ছতর প্রাণীতে। উৎপাদন-কৌশলের বির্বতনে সংগঠিত হয়েছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সীমারেখা। সভ্যতার এই সুদীর্ঘ ইতিহাসে নারীর অবস্থান হয়েছে পশ্চাৎপদ। পুরুষতান্ত্রিকতার সুনিয়ন্ত্রিত কৌশলে নারী হয়ে পড়েছে বঞ্চিত, নিপীড়িত জনগোষ্ঠী। সাহিত্যে সবসময় সময়ের প্রতিচ্ছবিকে ধারণ করা হয়। এই পরিক্রমায় প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত নিম্নবর্গের নারীর একটি আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক সমীক্ষণ এই গবেষণায় তুলে ধরার প্রচেষ্টা বহমান।

১.

উপন্যাস আধুনিককালের সাহিত্য-আঙ্গিক। উপন্যাস হলো মানুষের জীবনের গদ্যরূপ, যেখানে মানুষের জীবনকে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করার ও প্রকাশ করার নান্দনিক প্রচেষ্টা রয়েছে। প্রত্যেকটি উপন্যাস একেকটি স্বতন্ত্র জীবনকে, জীবনের রহস্যকে জীবন্ত করে তোলে। অন্য যেকোনো শিল্প মাধ্যমের থেকে উপন্যাস ঠিক এখানেই অনেক বেশি জীবন-সংলগ্নতা নিয়ে পথচলা শুরু করেছে। উপন্যাস শিল্পমাধ্যম হিসেবে চরিত্রবিন্যাসের বৈচিত্র্যে অনেক বেশি সামাজিক। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, 'উপন্যাস হলো অস্তিত্ব ও ঘটনার পারস্পরিক সম্বন্ধের বিপুল বিস্তার ও সানুপুঙ্খ গ্রন্থনার কথকতা। তাই এখানে একটিমাত্র তাৎপর্য থাকে না, থাকে একাধিক মাত্রান্তরের সংকেত। (তপোধীর, ২০২০ : ৭০) সে-কারণেই উপন্যাসের ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতিতে সমাজস্থিত মানুষ অধিক মাত্রায় জীবন্ত হয়ে

উঠেছে। জন্মলগ্ন থেকেই বাংলা উপন্যাস সমাজনিষ্ঠ ও সমাজ-বাস্তবতানুসারী। সেখানে প্যারীচাঁদ মিত্র থেকে শুরু করে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে সমাজের বহুতর অপ্রকাশিত দিকসমূহ প্রকাশিত হয়েছে।

১.২

আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের জটিল এবং দ্বন্দ্বময় বৈশিষ্ট্যসমূহকে ধারণ করে বাংলাদেশের উপন্যাস তাৎপর্যমণ্ডিত ও স্বতন্ত্র পরিমণ্ডল নির্মাণ করে চলেছে। বাংলাদেশের উপন্যাসের সূচনালগ্ন থেকে পূর্ব বাংলার পিছিয়ে পড়া মানুষের জীবনের বহুমাত্রিক চালচিত্রকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে উপস্থাপন করেছে। সেখানে দীর্ঘ সামন্ত শোষণের মধ্যে অশিক্ষা আর অজ্ঞতায় সাধারণ মানুষের জীবন যুগের যুগের পর যুগ ধরে সর্বস্বান্ত হয়ে আসছে। এই সমস্ত মানুষের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ হলো কৃষক এ ছাড়াও রয়েছে বৃত্তিনির্ভর বিভিন্ন নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠী। নির্দিষ্ট পেশার বাইরে আছে আরো একটি বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যারা, একই সঙ্গে ভূমিহীন ও দিনমজুর শ্রেণি। (মহীবুল, ২০০৮ : ৩৭)। সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া এই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে নিম্নবর্গ বলে চিহ্নিত করা হয়। গুণানুসারে বর্ণ বিভাজনের ধারণাটি ব্যাপ্ত হলেও বৈশিষ্ট্য অনুসারে তারা যুগের পর যুগ ধরে ক্ষমতাহীন ও আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের শিকার।

১.৩

নিম্নবর্গ শব্দটি বাংলা ভাষায় এসেছে ইংরেজি সাবলর্টান শব্দ থেকে। শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন ইতালীয় দার্শনিক আন্তেনিয় গ্রামসি তাঁর *কারাগারের নোটবই* গ্রন্থে। শব্দটি উৎপত্তি সূত্রেই একটি ক্ষমতা-সম্পর্কজাত শব্দ। ১৯৮০ দশকে ঐতিহাসিক রণজিৎ গুহর নেতৃত্বে ভারতীয় উপমহাদেশে ‘সাবলর্টান গোষ্ঠী’ নামে চর্চার সূত্রপাত ঘটে। সেই সঙ্গে সঙ্গে সাবলর্টানের বাংলা পরিভাষা হিসেবে নিম্নবর্গ শব্দটির বিস্তার ঘটে। শব্দটি সমার্থক শব্দের ভাণ্ডার বেশ সমৃদ্ধ। এখানে অন্ত্যজ, অচ্ছুৎ, অস্পৃশ্য, অপর, অপাংক্তেয়, ব্রাত্য, দলিত, প্রান্তিক প্রভৃতি শব্দের প্রায়োগিক উপস্থিতি লক্ষণীয়। শব্দগুলো সংখ্যায় অধিক হলেও অর্থগত সাদৃশ্য অনুসারে নেতিবাচকতা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যতাপূর্ণ। এর বিপরীতে আছে আধিপত্য, কর্তৃত্ব, প্রভুত্বের মতো ক্ষমতা ও ক্ষমতাকেন্দ্রিক শব্দের রূপরেখা। অধ্যাপক রণজিৎ গুহর মতে সব ধরনের অধস্তন শ্রেণিই নিম্নবর্গ। অধস্তন বলতে তিনি সেই সব শ্রেণিকে বুঝিয়েছেন, যারা ক্ষমতার বিন্যাসে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে যুক্ত নন।

যারা রাজনৈতিক প্রভুত্ব, অর্থনৈতিক স্বার্থ, মতাদর্শগত প্রভাবের মধ্যে প্রবলরূপে অন্তর্হিত (রণজিৎ, ২০১৫ : ৩৯)। তাদের পক্ষে সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক শ্রেণিগত অধস্তনতাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। যদিও তারা নিজস্ব শ্রেণিচেতনায় সচেতন। আরো স্পষ্ট করে বললে বলা যায়, নিম্নবর্গ হল সমস্ত জনগণের মধ্যে তারা, যারা, শ্রেণি, জাতি, বর্ণ-বয়স-লিঙ্গ-পেশা এবং অন্য যেকোনো বিচারে অধস্তন। সর্বোপরি শিক্ষায় অর্থনৈতিক অবস্থান থেকে অনুন্নত অনগ্রসর জনগোষ্ঠী- যারা পেশাগতভাবে সরাসরি শারীরিক শ্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাদের নিম্নবর্গ বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। পাশাপাশি ক্ষমতায়নের দিক থেকে প্রান্তিক বা প্রাকৃতজন, শোষিত জনগোষ্ঠী, আর লৈঙ্গিক বৈষম্যের দিক থেকে নারীও নিম্নবর্গের অধিভুক্ত জনগোষ্ঠী। ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসকে পুনর্বিবেচনার মধ্য দিয়ে ইতিহাস-সমাজ-রাষ্ট্রনীতি-শিল্প-সাহিত্যে নিম্নবর্গের অবস্থানকে স্পষ্ট করে তোলে।

১.৪

নিম্নবর্গের শ্রেণিগত অবয়বের মধ্যে নারী একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী। সমাজের অর্ধেক জনগোষ্ঠী হওয়া সত্ত্বেও নারী বিভিন্নভাবে অবদমিত ও অবহেলিত হয়ে থাকে। নিম্নবর্গীয় সমাজের অংশ হিসেবে নারীর অবস্থান আরো দুর্বল। সভ্যতার প্রথম শোষক পুরুষ আর প্রথম শোষিত শ্রেণি নারী। শোষণের বহুমাত্রিকতায় নারীর রয়েছে বিভিন্নরূপ, যেখানে নারী কন্যা, মাতা, স্ত্রীর ভূমিকার দক্ষ অভিনেতা। নারীর কোনো শ্রেণিগত পরিচয় হয় না; নারীর সবচেয়ে বড় পরিচয় সে নারী। আধিপত্য ও অধীনতার স্থবিরতায় নির্মিত মানুষের যাত্রা যেখানে অপ্রতিরোধ্য; সেখানে নারী ও নিম্নবর্গ শব্দ দুটির দাসত্বের পরিণাম ও পরিধি একই সুতোয় বাঁধা। শ্রেণিভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় নারী-পুরুষের সম্পর্ক আধিপত্য ও অধীনতার। নারীর প্রতি সমাজের বৈষম্য দুই প্রকার, প্রথমত নারী বলে সে লৈঙ্গিক বৈষম্যের শিকার; দ্বিতীয়ত অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে সে দুর্বল বলে। এই দ্বৈত দুর্বলতা বা শোষণের মধ্য দিয়ে নারী পড়ে থাকে সার্বিক শোষণের জাঁতাকলে। বিংশ শতাব্দীর পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের উপন্যাসে উঠে এসেছে নতুন নতুন সমাজ-ভাবনার বিভিন্ন দিক। যেখানে নারীর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের ভিন্ন ভিন্ন দিক আলোকিত হয়েছে।

১.৫

চর্যাপদ থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য অতিক্রম করেছে এক দীর্ঘ যাত্রাপথ। ইতিহাসের এই বিস্তৃত পথে নারীর বহুরূপ বহুভাবে নির্মিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে নারীর নানাবিধ রূপায়ণ বিভিন্ন গবেষণায় বিভিন্ন রূপে উদ্ভাসিত। সাহিত্য সমাজকে প্রভাবিত করে, সমাজ থেকে সাহিত্য রসদও নেয়; পারস্পরিক এই লেনদেন প্রশ্নাতীতভাবে মেনে নেয়া হয়েছে। সমাজ ও সাহিত্য কে কার আয়না- সেই বিতর্ক জরুরি নয়। (শাহীন, ২০০৯ : ২৭) স্বাভাবিক নিয়মেই সাহিত্য সমাজ ও সভ্যতার ধারাকে অনুসরণ করে চর্চিত হয়ে থাকে। বহুবিভাজিত সমাজে বর্ণ-বর্গ-লিঙ্গগত পার্থক্য নারীর অবস্থানকে করেছে প্রান্তিকায়িত। সমাজের চোখে নারীসত্তা যুক্তিবুদ্ধিহীন আবেগের বশীভূত এক অচেতন সত্তা। নারীকে শুধু নারী হওয়ার কারণে সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য লড়াই করতে হয়েছে। তার জৈবিক অস্তিত্ব আর শারীরিক-সংস্থান তাকে খাঁচায় বন্দি করেছে। বাংলা সাহিত্যের সূচনাকাল থেকেই তার প্রতিরূপ আভাসিত। চর্যাপদের সন্ধ্যাভাষার আড়ালে এই বিড়ম্বনার সোচ্চার অভিব্যক্তি যেমন ফুটে উঠেছিল : 'আপনা মাংসে হরিণা বৈরী'- এই দার্শনিক উচ্চারণের মধ্যে। সহস্র বছরের পুরোনো এই সাহিত্যিক- ভাবনা আজও সমভাবে সত্য। নারীমাংসলোলুপ পুরুষ আজও ব্যাধের ভূমিকায় অবতীর্ণ তবে, নারী আর ভীতু হরিণী নয়; বরং আজকের নারী প্রতিবাদী, অধিকার বুঝে নেওয়া সাহসী এক সত্তা। তারপরও নারীর জৈবিক অস্তিত্বের কারণে সমাজ তাকে খাঁচায় বন্দি করে; শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত এক খাঁচা থেকে অন্য খাঁচায় তাকে স্থানান্তরিত করে চলে সমাজ। (তপোধীর, ২০২০ : ৫৮) নিম্নবর্গের নারীকে এই পরিপ্রেক্ষিতে শোষিত হতে হয়। নিম্নবর্গের বিবেচনায় শ্রেণিগতভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষ অপেক্ষা অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সামন্তবাদী ও পাতি-বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে নাজুক এই জনগোষ্ঠী নিরন্তর বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে আত্ম-উন্নতির পথে। উচ্চবর্গের শোষণের বহুমাত্রিক পথ কার্যকর থাকে নিম্নবর্গের নারীর প্রতি, কখনো আসে ধর্মের নামে, কখনো সমাজের নামে। সর্বোপরি নারীকে দুবাহু বিস্তার করে পিষ্ট করে রেখেছে লৈঙ্গিক রাজনীতির পথপরিক্রমা। নিম্নবর্গের নারীর সংকটাপন্ন অবস্থার বিভিন্ন দিক বাংলাদেশের উপন্যাসের পরতে পরতে ছড়িয়ে রয়েছে। যে বিষয়গুলো পুরুষের অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে না ; একই সঙ্গে যা মুদ্রার অপর পিঠের মতো অন্ধকার হয়ে থাকে।

১.৬

বাংলাদেশের উপন্যাসের স্পষ্ট-অস্পষ্ট নানান বাঁকে রয়েছে নিম্নবর্গের নারীর বিয়ে-দাম্পত্য-গার্হস্থ্যের আপাত ছোট ছোট চিত্র। এর মধ্যে রয়েছে নারীর প্রবল বিদ্রোহ আর প্রতিরোধের উপলব্ধি, যাকে আশ্রয় করে নারীর বাঁচতে শেখার নিজস্ব কণ্ঠস্বর উচ্চকিত হয়েছে। মানবসমাজের ভেতরে নারীর জন্য বরাদ্দকৃত জায়গার পরিমাণ খুব কম। ফলে তারা একই সঙ্গে বঞ্চিত ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সোচ্চার। এই অবস্থানকে শুধু অধস্তনতার প্রতিরূপ বলে চিহ্নিত করা যায় না, বরং প্রতিটি বঞ্চনাপূর্ণ অবস্থানের মধ্যে লুকিয়ে থাকে একেকটি বিপ্লবী সম্ভাবনার দ্বার। নারীর ভেতরের ধারণ করা এসব সম্ভাবনাময় কাহিনি ঔপন্যাসিকদের নিকট নিরেট গল্পের আকর্ষণীয় বিষয়। পুরুষ আধিপত্যের সযত্নে নির্মিত সভ্যতায় নারী এক অপার সম্ভাবনার আধার। (শাহীন, ২০০৯ : ১৭) নারী পারিবারিক জীবনে তিনরূপে বিকশিত হয়–এর মধ্যে বিদ্যমান থাকে নারীর একটি সামাজিক সত্তা ও লিঙ্গগত স্বাতন্ত্র্যের পরিসর। যেখানে পুরুষ একজন নারীকে গ্রহণ করে একান্ত ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রয়োজনে। সামাজিকভাবে সমাজ একজন সকর্ম স্ত্রীকে চায়, যার কোনো অভিযোগ বা উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদ থাকবে না। প্রকৃতপক্ষে পুরুষতন্ত্র তার সামাজিক ও ব্যক্তিগত চাহিদা অনুযায়ী নারীকে গড়ে তোলে। এই পরিপ্রেক্ষিতের সর্ব অবস্থায় পুরুষতন্ত্র নারীর নিকট অধীনতা ও অনুগামিতা নিশ্চিত করতে চায় (সিরাজ, ২০২০: ৩৫৫)। আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় নিম্নবর্গের নারীর শ্রম শোষণ ও তার সঠিক পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত করা তাকে অবদমিত রাখার একটি কৌশল। নিম্নবর্গের সমাজে পুরুষের পাশাপাশি নারী ব্যাপকভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত থাকে। শ্রমসাধ্য যেকোনো কাজেই তাদের অংশগ্রহণ পুরুষের মতোই গুরুত্ববহ। জীবিকার সংস্থানে বিপর্যস্ত, ক্ষুধায় কাতর, নিম্নবর্গের এই সব নারীর সংগ্রামী জীবনের নির্মলরূপ বাংলাদেশী ঔপন্যাসিকদের উপলব্ধির অসামান্যতায় শিল্পমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি সমাজের অন্তেবাসী এই সব নারীর চেতনালোকে বহমান বিরল মানবিক গুণাবলি উন্মোচনের আন্তরিক অভিপ্রায় উপন্যাসগুলোতে বিরাজমান।

১.৭

'বাংলাদেশের উপন্যাসে নিম্নবর্গের নারী (১৯৪৭-২০০০)' শিরনামে রচিত অভিসন্দর্ভটি মোট চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এই অভিসন্দর্ভ রচনায় বিশ্লেষণাত্মক রীতিপদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে নিম্নবর্গ ও নারীর তাত্ত্বিক পরিসর আলোচনা করা হয়েছে। যার মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গ ও নারীর

একটি আত্মিক যোগসূত্রের সন্ধান করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে সমগ্র বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের নারীর যে জয়যাত্রা তার একটি সমীক্ষণ তুলে প্রচেষ্টা। গবেষণার মূল আলোচনার ব্যাপ্তি ঘটেছে তৃতীয় অধ্যায়ে। এই অধ্যায়ে রয়েছে মোট তিনটি পরিচ্ছেদ, যার মধ্যে আছে বাংলাদেশের উপন্যাসে নিম্নবর্গের নারীর সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অবস্থার সবিস্তার আলোচনা। যেখানে বিস্তার লাভ করেছে নিম্নবর্গের নারী জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতার বহুমাত্রিক রূপায়ণ। নিম্নবর্গের নারী জীবনের আর্থ-সামাজিক মানদণ্ড ও অধিকারহীন জীবনবৃত্তের অভিন্ন সব পরিসর। চতুর্থ অধ্যায়ে গুরুত্ব লাভ করেছে নিম্নবর্গের নারীর ভাষিক-বৈশিষ্ট্য। সাহিত্যের আলোচনার যা গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

১.৮

উনিশ শতক থেকে বিশ শতক পর্যন্ত বাঙালি নারীর জীবনযাপনে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সাহিত্যের মাধ্যমেই বাঙালি নারীর এই বিবর্তনের রেখাচিত্র পাওয়া যায়। উপন্যাস সাহিত্যের শুরুর দিকে নারীর বন্দিত্বপূর্ণ অবস্থান ছিল দুই ধরনের-একদিকে অন্তঃপুর বন্দিত্ব, অন্যদিকে সমাজ-নির্দিষ্ট বিভিন্ন ভূমিকাতেও তারা ছিল শৃঙ্খলিত। অন্তঃপুরের বন্দিত্ব আলগা হলেও সমাজের তৈরি করা বন্দিত্বের শৃঙ্খল আলগা হয়নি আজও (সুতপা, ২০২১ : ৩৩)। নারীর লিঙ্গপরিচয়ের সর্বগ্রাসী সত্তা সমাজের অন্য সমস্ত উপাদান ও অস্তিত্বকে অপ্রাসঙ্গিক ও অর্থহীন করে তুলেছে। লৈঙ্গিক বর্গীকরণের এই নিরুদ্ধ, নিষ্প্রাণ স্থবিরতায় নিম্নবর্গের নারী এক সপ্রতিভ আন্দোলন। উচ্চবর্গের নারী বিভিন্ন কারণেই পিতৃতান্ত্রিক প্রতাপের কাঠামোয় অবরুদ্ধ। এ প্রসঙ্গে বাখতিন বলেছেন, জীবন হলো বহুধরনের দ্বিবাচনিকতার সমষ্টি। তাঁর প্রবাদপ্রতিম ভাষ্য অনুযায়ী, 'The contexts of dialogues are without limit. They extendhy into the deepest past and the most distant future'(Bakhtin, 1981: 28) পুরুষতন্ত্রের আধিপত্যপ্রবণ প্রবণতাসমূহ সমাজের কণ্ঠস্বর বর্ণ-বর্গ-লিঙ্গগত বিভাজনকে প্রকটিত করেছে। যেখানে নারীর অপর সামাজিক উচ্চারণ দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়ায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জীবনের অনেকান্তিকে অস্বীকার করে নারী দেখাতে চায় পিতৃতন্ত্র আর অস্বীকৃতির অন্তরালবর্তী রাজনীতিকে। তার অর্থ এই নয় যে নারীকে পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে; সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদের বহুবিচিত্র কাঠামোকে প্রতিরোধ করতে হবে। অস্তিত্বের সত্য ও সত্তার প্রকৃত পরিচয় আবিষ্কারের পথে পুরুষতান্ত্রিক প্রতাপের কৃৎকৌশল কত রকমভাবে বাঁধা তৈরি করে, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাও নারীচেতনার অভিপ্রায় (তপধীর, ২০২০ : ৫৯) বাখতিনের এই নারীচেতনার মধ্যে সাহিত্যে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি,

নারীর ক্রমাগত লড়াই চালিয়ে যাওয়ার যে পটভূমিসমূহ রয়েছে তার একটি ভাবাদর্শের প্রতিচ্ছায়া পাওয়া যায়। এই চেতনা একই সঙ্গে জীবন ও জগতে নারীর জায়মান অবস্থাকে সর্বব্যাপ্ত পরিসরে উজ্জীবিত করে তোলে। বস্তুত, বাংলাদেশের উপন্যাসের এই দীর্ঘ যাত্রাপথে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সুবিধাবাদী মূল্যবোধের পথঘাট পেরিয়ে নিম্নবর্গের নারী তার চিন্তাচেতনা স্বাধীনতায় ব্যক্তিত্বময় নারীতে রূপান্তরিত হয়েছে। সেই নারী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে কখনো সে সামাজিক সংস্কারকে অতিক্রম করেছে, কখনো স্বতন্ত্র সাহসিকতায়, কখনো একক প্রচেষ্টায় আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। আলোচিত প্রতিটি উপন্যাসে রয়েছে নারী ব্যক্তিত্বের সেই স্বাতন্ত্র্যে প্রতিফলিত আলো।

তথ্যসূত্রঃ

১. গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পা. (২০১৫)। *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, আনন্দ, কলকাতা

২. ছন্দশ্রী পাল (২০০৯)। *বাংলাদেশের উপন্যাস পরিবার ও সমাজ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৩. তপোধীর ভট্টাচার্য(২০২০)। *বাখতিন তত্ত্ব ও প্রয়োগ*,বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

৪. মহীবুল আজিজ (২০০২)। *বাংলাদেশের উপন্যাসে গ্রামীণ নিম্নবর্গ*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা

৫. মিল্টন বিশ্বাস (২০০৯)। *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ছোটগল্পে নিম্নবর্গের মানুষ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৬. শাহীন আখতার (সম্পা.)(২০০৯)। *সতী ও স্বতন্তরা বাংলা সাহিত্যে নারী প্রথম খণ্ড*, সাহিত্যপ্রকাশ, ঢাকা

৭. সিরাজ সালেকীন (২০২০)। *ভারতীয় শাস্ত্রে নারীকথা*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা

৮. সুতপা ভট্টাচার্য (২০২১)। *প্রবন্ধ সংগ্রহ*,এবং মুশায়েরা, কলকাতা

৯. Bakhtin (1981) *The Dialogic Imagination: Four Essay*(trans.C.Emerson and M. Holquist ed. M. Holquist) Austin Tex: University of Texas Press.

প্রথম অধ্যায়

নিম্নবর্গ ও নারী : তাত্ত্বিক পটভূমি

সভ্যতার ইতিহাসে মানুষের অবস্থানকে বারবার মূল্যায়ন করার মধ্য দিয়ে মানুষ চিনতে শিখেছে তার নিজেকে। মানুষের তৈরি, মানুষের জন্য নির্মিত সমাজে, মানুষের মূল্য কোথায়? এই প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজতে সমাজবিবর্তনের ইতিহাসকে আরো একবার উল্টেপাল্টে দেখার প্রয়োজন পড়ে। আদিমতার দুর্গম পথ অতিক্রম করে জীবনের প্রাচুর্যের যে আলোকশিখা, তাও মানুষের সৃষ্টিশীলতার অপরিমেয়তায় পূর্ণ। তবু কেনো মানুষে মানুষে এত বিভেদ; মানুষের সমাজে মানুষকে শোষণের এত অভিসন্ধি। ইতিহাসের ব্যাখ্যায় মানুষে মানুষে ব্যবধানের প্রথম অধ্যায় রচিত হয়েছিল উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশে। ফসলের অসম বণ্টন সৃষ্টি করেছিল মানুষে মানুষে সামাজিক অসমতা। উদ্বৃত্তের বণ্টনের অসমতা ত্বরান্বিত করেছিল শ্রেণির গঠনকে। অনুকূল সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিসরে শাসকশ্রেণি তাদের কর্তৃত্বের রূপরেখার প্রতিফলন ঘটায়। ইতিহাসের এই পরিক্রমণে ঢাকা পড়ে যায় শোষিত শ্রেণির ধ্যানধারণা ও শ্রমের মূল্য। সমাজবিকাশের এই পর্বকে বলা চলে প্রাক্-রাষ্ট্রগঠন পর্ব। রাষ্ট্রের আবির্ভাব তাকে আরো চূড়ান্ত রূপে প্রতিষ্ঠিত করে তুলেছিল। এ বিষয়ে গবেষকের মন্তব্য নিম্নরূপ:

> রাজ্যজয় ব্যাপারটাই মুখ্যত কতকগুলি আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াশক্তির ফল, যেমন শাসক শ্রেণির তরফ থেকে শ্রমশক্তি যোগাড় করা এবং উপনিবেশ গঠনের জন্য জমি সংগ্রহকরা জরুরী প্রয়োজন। সমাজের প্রাক-পুঁজিবাদী পর্যায়ে এমন ধরনের শক্তির প্রয়োগকে অর্থনীতিক-ব্যতিরিক্ত পদ্ধতি বলে বিবেচনা করা যেতে পারে, যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হত শ্রেণী-ভিত্তিক অথবা দাস-ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা এবং রক্ষা করার প্রয়োজনে, যেমন ঘটেছিল গ্রীস এবং রোমে এবং কখনো কখনো ভারতবর্ষে। মূলত ক্ষমতাশালী অর্থাৎ উদ্বৃত্তভোগী শ্রেণীর উদ্বৃত্ত আহরণের প্রক্রিয়া অক্ষুণ্ণ রাখা এবং প্রসারিত করার ব্যবস্থা হিসেবেই রাষ্ট্রের জন্ম। (পার্থ, ২০১৭ : ৭০)

উৎপাদনব্যবস্থার অগ্রগতি ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল শ্রেণিভেদরেখাকে। এই স্তরবিন্যাসের মধ্যেই ছিল মানুষে মানুষে ক্ষমতার সম্পর্ক, প্রভুত্ব ও অধীনতার সম্পর্ক। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মর্মমূলে সামাজিক এই চরিত্র পরবর্তীতে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। রাষ্ট্রব্যবস্থা হয়ে ওঠে সামাজিক ক্ষমতার প্রথাগত প্রয়োগের মাধ্যম। প্রভুত্বশালী শ্রেণির আধিপত্য বজায় রাখার সম্মিলিত প্রয়াস ও রাষ্ট্রীয় ঐক্যের মধ্যে নিহিত থাকে। সমাজের সব মানুষকে এক আইন বা নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ রাখার

মধ্যে রাষ্ট্রের সার্থকতা বহাল থাকে। রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, পাইক, বরকন্দাজ-সবই সেই প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির বিহ্বলতার ঐক্যতান। শুধু উৎপাদনমুখী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তে নানামুখী শিল্পের বিকাশ ও বাণিজ্যের বিস্তার রাষ্ট্রকে করে তুলেছিল আরো বেশি আধিপত্যবিস্তারী। বহুমুখী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নানা পেশাজীবী মানুষ বিভাজিত হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে রাজা ও পুরোহিতগণ ছিলেন সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী এবং সবচেয়ে সুবিধাভোগী শ্রেণি। কৃষক, শ্রমিক, ক্ষুদ্র কারিগর প্রভৃতি ছিল তৃতীয় শ্রেণির নাগরিক। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বাতাবরণে এভাবেই মানুষে মানুষে বিভেদের তটভূমি রচিত হয়েছে; শাসনে শোষণে মানুষ হয়েছে তুচ্ছ থেকে তুচ্ছতর প্রাণী।

১.

মানুষের বিকাশের ইতিহাসকে যদি একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে বিবেচনা করা যায়; তবে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি ইতিহাসের অন্যতম সমৃদ্ধ একটি ধারা হিসাবেই পরিগণিত হবে। ভারতীয় সভ্যতাকে পৃথিবীখ্যাত অন্যতম সমৃদ্ধ সৃষ্টির প্রবাহ বলার কারণ সুদূর অতীত থেকে ভারতে বিভিন্ন বহির্জাতির আগমন ঘটেছে এবং ভারতীয় সমাজ-জীবনে তাদের বিলীন হয়ে যাবার দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। এই দীর্ঘ পরিক্রমায় ভারতীয় সভ্যতা অনেক কিছু অর্জন করলেও, অনেক সনাতনী ধ্যানধারণা বহন করে চলেছে শতাব্দী পর শতাব্দী ধরে। তার মধ্যে জাতিবিভেদ ভারতীয় সমাজব্যবস্থার প্রাচীনতম সংস্কার। বৈদিক যুগে এই প্রথার ক্রমবিকাশ ঘটলে বৈদিক ঋষিরা তার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন অন্যভাবে। কালক্রমে বহির্জাতির সাথে তাদের মিলন ঘটলেও বিরাটসংখ্যক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষুদ্র একটি অংশ ছিল যোদ্ধা ও পুরোহিত। যারা সাধারণ মানুষের সাথে উৎপাদনমূলক কাজে অংশ নিতে পারতো না। এখান থেকে শুরু হয়েছিল সমাজে শ্রেণি-বিভাজন প্রক্রিয়ার প্রাথমিক পর্ব। বৈদিক যুগের শেষ পর্যায়ে উৎপাদনকারী শ্রেণিকে চিহ্নিত করা হয় সেবকশ্রেণি হিসেবে। সেবকশ্রেণিকে শূদ্ররূপে উপস্থাপনের প্রমাণও পাওয়া যায় ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে। এ বিষয়ে বিস্তৃত উল্লেখ না থাকলেও ধারণা করা যায় শূদ্ররাই ছিলেন শ্রমজীবী শ্রেণি। শূদ্ররা ছিল কঠিন শ্রমের প্রতিভূ বিভিন্ন শ্রমিক ও হস্তশিল্পী। এ প্রসঙ্গে ইতিহাসের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ :

> বৈদিক যুগের শেষ পর্বে কৃষিকার্যের সম্প্রসারণ এবং তারপর বাজার অর্থনীতির বিস্তার সমাজে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের প্রবল প্রাধান্য, সেই সাথে অপরপক্ষে শ্রমজীবী শূদ্রের হীন সামাজিক অবস্থান প্রখরতর হয়ে ওঠে। সমাজের প্রধান উৎপাদক শ্রেণি ছিল বৈশ্য ও শূদ্র। দাসদের এই শূদ্রদের মধ্যেই ধরা যেতে পারে উৎপাদনের এই প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে। বৈশ্যরা কৃষিজীবী ও শূদ্রদের ভূমিকায় ছিল, কৃষিমজুর ও অন্যান্য কায়িক শ্রম সমাজের দৃষ্টিতে হীনতর হিসেবেই পরিগণিত হতো। শ্রেণি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে জাতিবিভেদ তৎকালীন সমাজের শ্রেণিদ্বন্দ্বেরই আরেকটি অভিব্যক্তি। বস্তুত শ্রেণি-বিভাজন ও জাতিভেদের মধ্যে কোনো

> পার্থক্যই খুঁজে পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা ছিল শাসকশ্রেণি আর বৈশ্য ও শূদ্ররা ছিল উৎপাদক শ্রেণি। এর মধ্যে শূদ্রদের অবস্থান ছিল নিম্নতম কারণ শ্রমবিভাজন অনুযায়ী সর্বাপেক্ষা শ্রমসাধ্য ও কঠোরতম কাজগুলো এদেরকেই সম্পন্ন করতে হয়। মনু প্রমুখ তৎকালীন শাস্ত্রকাররা ছিলেন শাসকশ্রেণির আদর্শগত প্রতিভূ। শাসকশ্রেণি কর্তৃক উৎপাদক শ্রেণি বিশেষ করে শূদ্রদের উপর শাসন-শোষণ নির্যাতনের আদর্শগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই শাস্ত্রকারেরা। মনু ও অন্যান্যদের সমস্ত বিধান ছিল নিম্নতর শ্রমজীবী শ্রেণিকে দমিত ও অধপতিত করে রাখার জন্য। অন্যদিকে শাসকশ্রেণি অর্থাৎ ব্রাহ্মাণ-ক্ষত্রিয়দের নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্ব ও আধিপত্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে রচিত। মনু, বশিষ্ঠ প্রমুখদের বিধান ছিল শাসকশ্রেণির স্বার্থ ও ভাবাদর্শকে অক্ষুণ্ন রাখার নিমিত্তে। গ্রীক সভ্যতায় প্লেটো, অ্যারিস্টটল যেমন তৎকালীন গ্রীক দাস ব্যবস্থার অনুকূলে ও সমর্থনে লিখেছেন। বৈদিক ও বৈদিকোত্তর যুগের ঋষি ও শাস্ত্রকারেরা তৎকালীন সমাজের স্বার্থরক্ষকারীর ভূমিকায় পালন করেছেন বিশ্বস্তভাবে। (সুকোমল, ২০১৩ : ১০৫)

ভারতীয় সমাজবিকাশের ক্ষেত্রে শুধু জাতিভেদেরই বিকাশ ঘটেনি, শ্রেণিভেদের বিকাশও ছিল একটি অনিবার্য ঘটনা। শ্রেণির বিকাশের কার্যকারণ বিশ্লেষণের অনুসন্ধানে পাওয়া যায় ভারতের বহুধাবিভক্ত সমাজ একটি গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো। সমাজবির্বতনের বিভিন্ন পর্যায়ের অর্থনৈতিক অবস্থা অনুযায়ী ভারতীয় সমাজ বিভক্ত ছিল পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন শ্রেণিতে। ভারতীয় সমাজবিধিতে এই বিভক্তির নানামাত্রিক প্রভাব ধারণ করেছিল জটিলতর আকার। শ্রেণিবিভাজন শুধু শ্রমবিভাজনকে উচ্চকিত করেনি, শ্রেণি শোষণকেও করেছিল প্রকটিত। পরবর্তী কালে ইউরোপীয় রেনেসাঁসজাত সভ্যতা সংস্কৃতি এই বদ্ধদ্বারে আঘাত করেছিল; তবে ঔপনিবেশিকতাজাত মূল্যবোধ তার নতুন বিন্যাস তৈরি করতে পারেনি। এই সমস্ত বিষয় অর্বাচীন সমাজের ভিত্তিটাকে কিছুটা নাড়া দিয়েছিল।

১.১

ইংরেজরা চলে যাবার পর ভারতবর্ষে তথা ভারতীয় উপমহাদেশের দেশগুলোতে শ্রেণিশাসনেরই প্রতিষ্ঠা ঘটে। এই দেশগুলোতে এখনও উচ্চবর্ণের মানুষদের আধিপত্যকে বজায় রাখার ঘোরতর ষড়যন্ত্র চলেছে। স্বার্থপর শাসকগোষ্ঠী তাদের নিত্যনৈমিত্তিক রূপ দেখাচ্ছে। সমাজের নিচুমহলের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করার যথার্থ ইচ্ছা বা পরিবেশ পরিস্থিতির যে যথেষ্ট অভাব, তাও এখন দৃষ্টিগ্রাহ্য। এইরূপ সময়ে ইউরোপীয় মার্কসবাদী চিন্তকের চিন্তায় খেলে যায় মানবতার নতুন প্রত্যয় সাবলটার্ন বা নিম্নবর্গীয় চর্চার প্রণালি। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে গ্রামসির চিন্তা ও ভাবনার পরম্পরা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে ও চর্চিত হতে থাকে। একজন প্রকৃত ঐতিহাসিকের মতো তিনি সমাজস্থিত শোষিত শ্রেণির প্রত্যেকটি স্বাধীন প্রচেষ্টার তথ্য ও বিবরণ সংগ্রহ করতে সচেষ্ট ছিলেন। ক্ষমতা অর্থনীতি ও রাজনীতির কল্পিত কেন্দ্র থেকে যারা বিচ্ছিন্ন ও দূরে অবস্থিত; যারা

চেতনার প্রান্তবাসী নিম্নবর্গের কর্তৃত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যকে ইতিহাসের পাতা থেকে একেবারেই মুছে ফেলার চেষ্টা করেছিল। যাদের কথা সার্বিক অর্থে কেউ ভাবেনি, বা বলার তাগিদ অনুভব করেনি; তাদের ইতিহাসের কঙ্কালের উপর আলোকপাত করে, তাদেরকে উজ্জীবিত করেছেন গ্রামসি। নিম্নবর্গের ধারণা সীমাবদ্ধ থাকেনি বিশেষ কোনো তত্ত্বের বা স্থান-কাল বা জাতির ইতিহাস বা ঐতিহ্যে। এই তত্ত্ব প্রযুক্ত হতে পারে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, ভাষাতাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে। গ্রামসি নিজেই নিম্নবর্গের ধারণায় এমন এক ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন, যেখানে কৃষক, শ্রমিক, নারী ও সর্বহারা সবাই অবস্থান করতে পারে। গ্রামসি সম্পর্কে আরো বলা যায়:

> আন্তেনিও গ্রামশি এমনই এক ব্যক্তিত্ব যাঁর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে চিন্তালব্ধ জ্ঞান সাংস্কৃতিক ও উত্তর ঔপনিবেশক বিদ্যাচর্চার উর্বর ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে, বিশেষত: সেই সব দেশে যেখানে সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশবাদ এবং উত্তর উপনিবেশবাদের ইতিহাস একসূত্রে আবদ্ধ-যেমন ইংল্যান্ড, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, লাতিন আমেরিকা ও ভারতবর্ষ। (জয়শ্রী, ২০১৬ : ২৫)

সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ, উত্তর উপনিবেশবাদ সর্বত্র নিম্নবর্গ আলোচিত ও সংযোজিত। নিম্নবর্গের আলোচনা ভারতের ঔপনিবেশিক কালের ইতিহাসের ধারাকে সম্প্রসারিত করে নতুন গবেষণার ক্ষেত্রকে করেছে সম্প্রসারিত। ভারতীয় ইতিহাসে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন সময়ের কৃষক সংগ্রামকে বিশেষভাবে অধ্যয়নের সুযোগ করে দিয়েছে। নিম্নবর্গের প্রসঙ্গ শ্রমিকের শ্রেণি-সংগ্রাম থেকে ঔপনিবেশিক জনগণের সামন্তবিরোধী আন্দোলনে কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠেছে; যার ফলে ভারতের ক্ষেত্রে নিম্নবর্গের অধীনতা হয় দ্বিগুণাত্মক: প্রথমত ; ঔপনিবেশিক প্রভুর অধীনতা; দ্বিতীয়ত প্রথাগত দেশীয় অভিজাত শ্রেণির অধীনতা। নিম্নবর্গ চর্চায় ভারতীয় পুরোধা ব্যক্তি রণজিৎ গুহ হলেও, তাঁর পাশাপাশি অবদান রেখেছেন গায়ত্রী চক্রবর্তী (স্পিভাক), পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও দীপেশ চক্রবর্তী প্রমুখ তাত্ত্বিকগণ। গ্রামসি তাঁর গবেষণাকে কৃষকদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে কৃষকদের সাংস্কৃতিক, নৃতাত্ত্বিক অধ্যয়নের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন, যা বর্ধিত করবে আলোচনার গতিবেগকে।

১.২

ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নবর্গের ইতিহাস বৈচিত্র্যে ভরা। স্বাভাবিক কারণেই এই বিষয়ে বিতর্কের সীমা নেই। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বৈষম্যপীড়িত সমাজে সাধারণের সংগ্রামী চেতনা জাতীয় আন্দোলনে কতখানি ভূমিকা রেখেছিল, সেই প্রশ্নও থেকেই যায়। তবে কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে নিম্নবর্গের শ্রেণিসংগ্রাম, জাতীয় আন্দোলনকে করেছিল আরো বেশি বেগবান।

ইতিহাসের পরিসরকে সমৃদ্ধ করতে রাজরাজড়ার কাহিনি নয়, শোষিত মানুষের প্রভুত্ববিরোধী চেতনার ইতিহাসের অনুসন্ধান, ইতিহাসচর্চার পরিসরকে করবে বিসারিত। নিম্নবর্গের চেতনার অনুকল্পে তৈরি হলো প্রতিস্পর্শী বিকল্প ইতিহাস ও মতাদর্শ। এক্ষেত্রে গ্রামসির আধিপত্যবাদের চিন্তাসূত্র প্রাণিত করেছিল তাদেরকে। নিম্নবর্গ চেতনার প্রাথমিক সূত্রায়ণে অন্ত্যজ বা আদিবাসীদের প্রতিরোধ বা সংগ্রামী চেতনা আলোচিত হলেও পরবর্তীতে তার বিকাশকাল বর্তমান পর্যন্ত বর্ধমান।

শ্রেণিবিভক্ত সমাজব্যবস্থায় রাজনেতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শাসকবর্গের দ্বারা যে কর্তৃত্বের করায়ত্ত থাকে–সেই শাসকশ্রেণির চাপিয়ে দেয়া মতাদর্শে একসময় ঢাকা পড়ে যায় নিম্নবর্গের নিজস্ব দেশ, ভাষা আর ঘ্রাণশক্তি। একটা স্বদেশ, স্বভাষায় কাঙ্ক্ষিত নিরাপদ ছায়ায় বসে নিজেদের কথা বলার দেশজ পটভূমি তারা খুঁজে পায় না। আক্ষেপের কথা হলো তথাকথিত ইতিহাসের ভূমিতলে ইতিহাসের যে ছায়া কঙ্কাল পাওয়া যায়, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্যের নির্মিত ইতিহাস। এই কারণেই গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক তত্ত্বকথার অরূপ জগতের সামনে দাঁড় করালেন এক বিরূপ প্রশ্ন, 'can the subaltern speak?' নিম্নবর্গের ঐতিহাসিক যোগসূত্র অনুসন্ধানে যা এক মাইলফলকের কাজ করেছে। যেখানে তিনি চেয়েছেন নিম্নবর্গের এমন এক ঐতিহাসিক আবির্ভাব, যিনি সামাজিক অস্বীকৃতি ও সামাজিক পদ্ধতিগুলোর ভেতর থেকে নিম্নবর্গকে আবিষ্কার করে আনবেন। (মিল্টন, ২০০৯: ৩০) তবু এ কথা সত্য যে হাজার বছরের বৌদ্ধভূমির তলদেশ থেকে এই কণ্ঠস্বরের আওয়াজকে বেগবান করা দুরূহ কর্ম। দীর্ঘ ঔপনিবেশিকতার রোষানলে যে জাতির ইতিহাস গড়া, সেখান থেকে সদা অবহেলিত এই শ্রেণির ইতিহাসকে আলোর মুখ দেখানো বা আলোকিত করার চেষ্টা খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার মতো। উচ্চবর্গের হাতে রচিত ইতিহাসে নিম্নবর্গের জয়যাত্রাকে সাধুবাদ জানানোর প্রচেষ্টাও তাই অনেকাংশেই গৌণ বলে ধারণা করা যায় :

> ঔপনিবেশিক ইতিহাসবিদ্যায় বা ঔপনিবেশিক ইতিহাসের দলিলে সবক্ষেত্রেই উচ্চবর্গের স্বার্থ ও সুবিধাকেই বারবার বড়ো করে দেখানো হয়েছে এবং এমন বড়ো করে দেখানো হয়েছে যে, নিম্নবর্গের ভূমিকা ও অবস্থান সেখানে একেবারেই গৌণ। ঔপনিবেশিক বা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীর এই নির্লজ্জ একরৈখিক পক্ষপাতিত্ব মূলত রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিক প্রভুত্ব স্থাপনেরই বহিঃপ্রকাশ। (জহর, ২০১৭ : ৩৪)

ইতিহাসের এই পক্ষপাতিত্বসুলভ দৃষ্টিভঙ্গিতে নিম্নবর্গের প্রকৃত অবস্থানকে আরো সংকীর্ণ করে তোলে, সেই সঙ্গে সভ্যতার পরতে পরতে নিম্নবর্গের স্বতন্ত্র সত্তাকে অস্বীকার করার অপপ্রয়াসও কার্যকর হয়ে ওঠে। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের এই স্থূল অনুবৃত্তি মূলত রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসমূহে কর্তৃত্ব স্থাপনের বহিঃপ্রকাশ। ঔপনিবেশিক ইতিহাসের অবিনির্মাণকৃত এই বিকৃতির

স্বেচ্ছাচারিতা অবলোকনে ভারত উপমহাদেশের নিম্নবর্গীয় তাত্ত্বিক রণজিৎ গুহ তাঁর ‘নিম্নবর্গের ইতিহাস’ প্রবন্ধে পক্ষপাতিত্বের কারণগুলো বিশ্লেষণ করে শনাক্ত করে দেখিয়েছেন; পাশাপাশি ইতিহাসের বিভ্রম ও ব্যর্থতাকে সুস্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেছেন যা ইতিহাসের পরিসরে নিম্নবর্গের অবস্থানকে আরো দৃঢ়তা দিয়েছে :

> যে ইতিহাস উচ্চবর্গীয় দৃষ্টির বাহন, যে ইতিহাস প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার ধারক, যে ইতিহাস শ্রেণীচেতনার সংকীর্ণ মাহাত্ম্যে বশীভূত–রণজিৎ গুহ সেই খণ্ডিত এবং প্রভুশক্তির স্তাবক ইতিহাসকে ‘ইতিহাস’ বলে মানতে পারেননি। এক্ষেত্রে তাঁর মত ও মতামতে রয়েছে সংকীর্ণতার উর্ধ্বে এক খোলা দিগন্ত– যে খোলা দিগন্তের মধ্যে শোনা যায় স্বাধীন পদচারণার ছন্দ, যে খোলা দিগন্তের মধ্যে পাওয়া যায় সর্বব্যাপী ভাষা, যে খোলা দিগন্তের মধ্যে দেখা যায় মাটি ও তার যূথবদ্ধ সন্তানদের জোর ও ঘনত্ব। (জহর, ২০১৭ : ৩৪)

কালের বিবর্তন সত্ত্বেও স্পিভাক অভীপ্সিত সেই দিকনির্ণয়ী পরিবর্তন যেমন আজও পাওয়া যায়নি, তেমনি প্রতিষ্ঠিত হয়নি রণজিৎ গুহর বর্ণিত মুক্তস্বাধীন ইতিহাসচর্চার পদ্ধতি। সেই কারণেই সমাজ, প্রতিষ্ঠান, ভাবাদর্শ ও মানবিক সম্পর্কের বন্ধনে নিম্নবর্গ এখনও অনগ্রসর, অস্পৃশ্য। তবে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক এবং রণজিৎ গুহর মতামতকে সম্মান জানিয়ে এ কথা বলা যায় যে ইতিহাস যিনি রচনা করেন, তিনিও একজন ব্যক্তি; তাঁরও থাকে নিজস্ব কিছু দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি যখন ইতিহাস রচনা করেন, তখন তাঁর অতি সন্তর্পিত মতাদর্শের একটি প্রভাস সেখানে থেকে যায়। তা হতে পারে ব্যক্তির ইচ্ছা বা অনিচ্ছার, হতে পারে পছন্দ বা অপছন্দের। অনেক ক্ষেত্রেই তিনি নিজস্ব রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে না আসতেও পারেন। সেখানেই ঐতিহাসিক গবেষণা হয়ে পড়ে ব্যক্তির গবেষণা। এক্ষেত্রে বিকল্প পদ্ধতির দ্বারস্থ হওয়া যেতে পারে, সেটা ইতিহাসবিদ্যার পরিবর্তে সাহিত্য হতে পারে। ইতিহাসের সাথে সাহিত্যের বড় ব্যবধানের জায়গা হলো, ইতিহাসে ব্যক্তি জাগ্রত সত্তা বলে বিবেচনাধীন থাকে, সাহিত্য ব্যক্তির কর্তৃত্বের পথে চলে না। বরং সাহিত্যিক অনেকাংশে অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে যায়। (রাজকুমার, ২০১৯ : ১৫-১৭) দৃষ্টিভঙ্গিগত এই পার্থক্যের কারণেই ঐতিহাসিকের রচিত নিম্নবর্গ অপেক্ষা সাহিত্যিকের হাতে নির্মিত নিম্নবর্গ অনেক বেশি নিরপেক্ষ ও জীবন্ত। সংমিশ্রিত শ্রেণিচেতনার বাতাবরণে নির্মিত ক্ষমতাতন্ত্রের ভেতর নিম্নবর্গকে কীভাবে প্রতিরোধী আকৃতি দেয়া যায় সেই বিষয়ে একজন ঐতিহাসিক অপেক্ষা একজন প্রকৃত সাহিত্যস্রষ্টা অনেক বেশি দক্ষ। প্রশ্ন হলো, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক এবং রণজিৎ গুহর মতো তাত্ত্বিকেরা ইতিহাসবিদ্যা বা ঐতিহাসিকের কাছ থেকে যুক্তিযুক্ত বাস্তব প্রত্যাশা পূর্ণ করতে চেয়েছেন। তারপরও কথা থেকে যায়, সেই বাস্তব প্রত্যাশাটা কিন্তু সাহিত্য এবং সাহিত্যস্রষ্টার কাছে করাটা অনেক বেশি জরুরি ও তাৎপর্যপূর্ণও ছিল। নিম্নবর্গের নিজস্ব কণ্ঠস্বর শোনার জন্য কিংবা নিম্নবর্গের সঠিক সামাজিক অবস্থানজাত ইতিহাস জানার

জন্য বিশেষ ব্যক্তিসংগঠিত ইতিহাসবিদ্যা নয়, নির্বিশেষ সাহিত্যই ভীষণভাবে ভরসার স্থান হয়ে উঠতে পারে। (জহর, ২০১৭ : ৩৪) এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, সাহিত্যস্রষ্টাও ব্যক্তি, ঐতিহাসিকও একজন ব্যক্তি, তাহলে আমরা কেনো সাহিত্যস্রষ্টার কাছে নির্বিরোধী নিরপেক্ষতা আশা করছি; ঐতিহাসিকের কাছে কেনো নয়? কারণ ঐতিহাসিক অনেকক্ষেত্রেই ক্ষমতাশীল উচ্চবর্গের দ্বারা চালিত ও পরিপোষিত হন, সে কারণেই আপোসের সীমারেখায় আটকে যেতে পারেন। অন্যদিকে সাহিত্যিক অনেকাংশেই স্বাধীন; তাই স্বার্থলেশহীন দায়বদ্ধতা একজন সাহিত্যস্রষ্টার কাছেই আশা করা যেতে পারে। তবুও সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের বিশ্বস্ত দলিল বলে ইতিহাসবিদ্যার দ্বারস্থ হতেই আত্মাধীন। কারণ হেরোইনের জন্য আফিম যেমন, তেমনি রাজনৈতিক ভাবাদর্শসমূহ ইতিহাস নির্মাণের কাঁচামাল বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। ইতিহাসের বিকৃতি-অবিকৃতি মেনে নিলেও, ঐতিহাসিকের তথ্যের সীমাবদ্ধতাকেও স্মরণে রাখতে হবে।

১.৩

গ্রামসির সৃজনশীলতার আনুকূল্যে জ্ঞানচর্চার এক নতুন ঘরানার সৃষ্টি হয়, যা সাবলটার্ন নামে অধিক পরিচিতি। মার্কসীয় পরিভাষার এক প্রভাববিস্তারী তাত্ত্বিক পরিসর সাবলটার্ন স্টাডিজ। ১৯৮০ দশকে ঐতিহাসিক রণজিৎ গুহর নেতৃত্বে ভারতীয় উপমহাদেশে 'সাবলটার্ন গোষ্ঠী' নামে চর্চার সূত্রপাত ঘটে। সাবলটার্নের বাংলা পরিভাষা 'নিম্নবর্গ' নামে পরিচিতি ও প্রসার থাকে। ঔপনিবেশিক দর্শনের প্রভাবে ইতিহাসে আধিপত্য বিস্তার করেছে উচ্চবর্গের মাহাত্ম্য ও আদর্শনিষ্ঠার বিবরণ। সেই ইতিহাসে সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার থাকলেও অবস্থান তৈরির সুযোগ বা সামর্থ্য কোনোটাই ছিল না। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলোতে সাধারণ মানুষের অবস্থান নিছক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে পরিণত হয়। সাধারণ মানুষের, বিশেষত নিম্নবর্গের মানুষের রাজনৈতিক অবস্থান পর্যবেক্ষণ করার দৃষ্টিভঙ্গিই গড়ে ওঠেনি উচ্চবর্গের। সাবলটার্ন চর্চাকারীরা নিম্নবর্গকে অর্থাৎ কৃষক/ শ্রমিককে তার ইতিহাসের স্রষ্টা রূপে দেখাতে চান। সাধারণ ইতিহাসের ব্যাখ্যায় কৃষককে সব সময় অন্যের অধীন চিন্তার ধারা চালিত করে বলে প্রতিষ্ঠিত করার প্রক্রিয়া চলমান। মধ্যবিত্তের নেতৃত্বদান বা রাজনীতি সচেতন করার দ্বারা এই শ্রেণি তাদের অন্ধকার অজ্ঞতার অধ্যায়কে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয় বলে তারা দাবি করে থাকেন।(মিল্টন, ২০০৯: ৪২)সুবিধাবাদী এই শ্রেণি ইতিহাসে নিজেদের মহৎ প্রমাণ করতে সুবিধাবঞ্চিত এই শ্রেণিকে সামনে আনে। এই যুক্তির যথার্থতা নিরূপণে মার্কসীয় ঐতিহাসিক এরিক হবসমের মতামতকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। যেখানে তিনি বলেছেন শ্রেণি হিসেবে কৃষকরা কম সচেতন ; কৃষকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস থাকে, কিন্তু রাজনৈতিক ইতিহাস

বিরল। যদিও হবসমের এই বিশ্বাস ইউরোপীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে উঠেছিল। যা ভারতীয় প্রেক্ষিতের জন্য সাযুজ্যপূর্ণ নয়। সে-কারণেই মার্কসীয় ঘরানার এই যুক্তিকে অগ্রাহ্য করে ভারতীয় সাবলটার্ন গবেষক রণজিৎ গুহ অভিমত দিয়েছেন যে ঔপনিবেশিক শাসনের অন্তর্গত জমিদার-মহাজন এবং সরকারি পদস্থ ব্যক্তিদের শাসনাধীনেই বসবাস করে কৃষক। এই অধীনতার চরিত্র প্রাথমিকভাবে রাজনৈতিক। তারপরও তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক শোষণের সম্পর্কটি প্রকট। সহজভাবে বললে প্রতিটি ক্ষমতার বিপরীতে থাকে আর একটি ক্ষমতা; যেমনভাবে আলোর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে অন্ধকারের অস্তিত্ব। কৃষকরা প্রভুত্ব ও শোষণের সম্পর্কের অন্বয়ের মধ্যে দিনযাপন করে। এককথায় ক্ষমতা সম্পর্কের একদিকে থাকে প্রভুত্বকারী শ্রেণি, অন্যদিকে থাকে প্রতিরোধকারী শ্রেণি। আর নিম্নবর্গ যখন ঐ প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তখনই তাদের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটে। রণজিৎ গুহের মতে, কৃষকের ঐ রাজনৈতিক চেতনা কখনোই অসচেতন বা অসম্পূর্ণ কোনো রাজনৈতিক চেতনা নয়।

১.৪

জাতীয়তাবাদী উচ্চবর্গ শ্রেণির অভিমত, রাজনীতি সচেতন আন্দোলনে তারাই দীক্ষা দিয়েছিল কৃষক শ্রেণিকে। এই অভিমতকে অযৌক্তিক ও ভ্রান্ত বলে অভিহিত করেছেন সাবলটার্ন সমাজবিজ্ঞানীরা। তাদের মতে, কৃষকের ও নিম্নবর্গের সংগ্রামের একটা দীর্ঘ ঐতিহ্য আছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে গান্ধীর আবির্ভাব, নেহরুর ভারত আবিষ্কারের বহু আগে থেকে এই জনপদের কৃষক ও নিম্নবর্গের জনগণ রাজনৈতিকভাবে সচেতন; তার প্রমাণস্বরূপ যেকোনো শোষণের বিরুদ্ধে তারা প্রতিরোধ বা আন্দোলন করে এসেছে। উচ্চবর্গীয় জনমানস সেই আন্দোলনের উত্তাপকে অনুধাবন করতে পারেনি। আবার উচ্চবর্গ এই আন্দোলনকে রাজনৈতিক প্রবণতার বিশেষ প্রকাশ বলে মানতেও পারেনি। তাই কখনো কখনো একে ধর্মীয় উন্মাদনার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখেছে। উচ্চবর্গীয় রাজনৈতিক অভীপ্সা অনুযায়ী কোনো আন্দোলনকে সক্রিয় ও সংগঠিত হতে হলে তার মধ্যে কয়েকটি উপাদান থাকা জরুরি। যেমন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য কিছু গঠনমূলক কার্যক্রম। উচ্চবর্গের মতানুসারে নিম্নবর্গের রাজনৈতিক কার্যাবলির মধ্যে যথেষ্টই অপরিপক্বতা ছিল।(ফকরুল, ২০১৪: ৩৫) রণজিৎ গুহর মতে, এটা তো ঠিক যে প্রভুত্বকারী উচ্চবর্গের কর্তৃত্ব ধ্বংস করার লক্ষ্যেই তারা পরিকল্পনা করেছিল অভ্যুত্থানগুলোর। হয়তো এ ব্যাপারে তাদের বিস্তর জানাশোনা বা অভিজ্ঞতার অভাব আন্দোলনের কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ ও সুদূরপ্রসারী করতে পারেনি। তার অর্থ এটা দাঁড়ায় না যে, এই সমস্ত কার্যক্রম রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বাইরের ব্যাপার। এই আপাত নেতিবাচক ও বিপরীত

প্রক্রিয়ার মধ্যে তারা প্রতিষ্ঠিত করেছে তাদের নিজেদের রাজনৈতিক চরিত্রকে। আবার এর মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গ নিজেকে ক্ষমতাবান ভাবার আকাঙ্ক্ষার জন্ম হয়েছে ; এই পরিক্রমার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে নিম্নবর্গের নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের প্রাথমিক কর্মসূচি। গ্রামসির আলোচনা অনুসারে নিম্নবর্গস্থ মানুষের রয়েছে দুটি পরস্পরবিরোধী চেতনা। প্রথমটি তার ব্যবহারিক জগৎ, যেখানে সে কথাবার্তায়, চলাফেরায় নষ্ট ও বিকৃত; এখানে সে তার প্রভুত্বকারীশ্রেণির প্রভাবপুষ্ট চরিত্র। আরেকটি বা দ্বিতীয় অংশে সে ব্যবহারিক জীবনের বাইরে থেকে যায়; যেখানে অস্তিত্বমান থাকে তার স্বাধীন ও স্বশাসিত চিন্তা, এটাই তার প্রকৃত সত্তা। সাবলটার্ন সমাজবিজ্ঞানীরা বলেছেন বিদ্রোহের মধ্যে নিম্নবর্গের প্রকৃত চেতনা অস্তিত্বমান থাকে। সেই সঙ্গে এ কথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে নিম্নবর্গ মানে শুধু প্রতিবাদ প্রতিরোধ নয়। আনুগত্য বা অধীনতার মধ্যেও প্রতিরোধের একটি প্রবাহ সদা বয়ে চলে, বিদ্রোহের সময় সেটাই উঠে আসে প্রধান সারিতে। এই আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে অনুমিত হওয়া যায় যে নিম্নবর্গের রাজনীতি উচ্চবর্গের প্রতি আনুগত্য ও বিরোধিতার সমন্বয়; বিরোধিতা যখন আনুগত্যকে অতিক্রম করে যায়, তখনই নিম্নবর্গের রাজনীতির মৌলিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রেক্ষিতে অমর্ত্য সেনের একটি মতামত অনুধাবনযোগ্য :

> বস্তুত উপনিবেশ অধীনস্থ মন ঔপনিবেশিক ক্ষমতার সঙ্গে বহিরঙ্গের সম্পর্ককে পরজীবীর মতো আঁকড়ে থাকে। এরকম আচ্ছন্নতার প্রভাব যদিও নানা রূপ নিতে পারে, অভ্যস্ত এই নির্ভরতার আত্ম-উপলব্ধির সুষ্ঠু ভিত্তি হতে পারে না। (উদ্ধৃত, ফকরুল, ২০১৪ : ২১)

নিম্নবর্গের রাজনৈতিক প্রচেষ্টা তাদের নির্ধারিত বিজয়কে চূড়ান্ত করতে না পারলেও প্রভুত্বকারী শ্রেণিকে আপোস করতে বাধ্য করেছে। আবার এভাবেও ভাবা যায় শোষিত শ্রেণিকে যেভাবে দুর্বল বা হীনবল ও অসংগঠিত শক্তি বলে ধারণা করে এসেছে সেই, ধারণাগত পরিসরের পরিবর্তন ঘটেছে। তাদের চিন্তা-চরিত্রে প্রতিরোধ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

১.৫

মানবসমাজ বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধর্মের উদ্ভব ঘটেছিল। তাই নিম্নবর্গের চেতনায় ধর্মের প্রভাব একটি অতীব আলোচিত প্রসঙ্গ। এ সম্পর্কে সাবলটার্ন সমাজবিজ্ঞানীদের সুনির্দিষ্ট মতামত রয়েছে। এনলাইটমেন্ট তত্ত্ব ধর্মকে কুসংস্কার হিসেবে দেখে। বিজ্ঞান ও যুক্তি যাকে বিপরীত ঘরানার অনুষঙ্গ বলে মনে করে। সাবলটার্ন গবেষকরা ধর্মের সার্বিক এবং একরূপী চরিত্রকে বিশ্বাস করে না। ধর্মচেতনার সবটাই নেতিবাচক নয়, এর ইতিবাচক দিকেরও তাৎপর্য রয়েছে। শোষকশ্রেণির কাছে ধর্ম শোষণের বাহন; শোষিতের কাছে সান্ত্বনার প্রলেপ বা হৃদয়হীন জগতের হৃদয়। নিম্নবর্গের ধর্মীয়

চেতনা এভাবেই তার যাপিত জীবনের ইতিহাসে আত্মিক মর্যাদার বোধকে জাগ্রত করে চলেছিল। ঐতিহাসিক পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতে, কৃষক-চেতনার চরিত্রের আবশ্যিক অংশ ধর্ম। ধর্ম এইরকম সম্প্রদায়কে দান করে একদিকে তত্ত্ব; অন্যদিকে নৈতিক জীবনযাত্রার বাস্তব ছক। সেই নৈতিকতার মধ্যে রাজনৈতিক ধারণাও অন্তর্ভুক্ত। যখন এই সম্প্রদায় রাজনৈতিক কাজে লিপ্ত হয়, তখন প্রত্যেকটি কাজের তাৎপর্য ধর্মীয় প্রতিরূপের মধ্যে থেকে লাভ করা যায়। সুতরাং নিম্নবর্গের ধর্মীয় সত্তা শুধু ধর্মের অলৌকিকতায় সীমাবদ্ধ নয়, যাপিত জীবনের অবরুদ্ধতার পথে কিছু আলোকচ্ছটার সমাহার। প্রতিটি নিশার প্রাতে আরো একটি নতুন প্রভাতের আয়োজন। গৌতম ভদ্র বলেন, 'নিম্নবর্গের নিম্নতম আন্দোলনের যে আদর্শ থাকে, তা-ও দীন অথবা আদাব দ্বারা পরিষিক্ত, তা শুধু সংহতি বা জমায়েতের সূত্র নয়। আদর্শ ছাড়া রাজনীতি ছাড়া নিম্নবর্গের আন্দোলন হয় না এবং সেই রাজনীতির মূলে থাকে কোন না কোন ইমান বা বিশ্বাস।' (গৌতম, ২০১৮ : ১৭) প্রতিটি দর্শনের থাকে সাধারণ কিছু বোধিভূমি, যা মানুষকে আন্দোলিত করে, অভিষিক্ত করে। সাধারণ বোধ অপরিবর্তনীয় কোনো কিছু নয়, বরং প্রতিনিয়তই বৈজ্ঞানিক পরিসরে নিজেকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধিত করেছে। যে চিন্তাধারা প্রভাবশালী হয়ে উঠছে, তা আবার প্রভুত্বকারী এবং অধস্তন গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে জোরদার সংগ্রামের মুহূর্তে স্বশাসিত উপাদানটি স্ফুরিত হয়ে উঠে। আবার কখনো সামাজিক চিন্তাধারায় উদ্ভাসিত এই আদর্শ সমগ্র সমাজের আদর্শগত ঐক্য পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন মেটায়। নিম্নবর্গীয় মানুষের সাধারণবোধের মধ্যে এই ধর্ম এমন এক উপাদান হয়ে উঠে, যা তাদের শক্তিশালী সাংস্কৃতিক জগতের প্রবেশের পথ দেখায়। ধর্মের উপাদানগুলো তাদের সাধারণ বোধের অন্যান্য আদি উপাদানগুলোর সাথে বিরোধহীনভাবে মিলেমিশে অবস্থান করে। চেতনাকে বুঝতে গেলে ধর্মকে বিশ্লেষণ করতে হয়, তার মধ্যে দৃশ্যমান হয় ধর্মের যে ভিন্ন ভিন্ন রূপাদর্শ রয়েছে। সাধারণ বোধ নামক যে চেতনা প্রত্যক্ষ ও প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশ পায় ঐতিহাসিক কোনো উদ্যোগের মুহূর্তে :

> নিম্নবর্গের চেতনার মূল্যায়নে গ্রামসি আমাদের জন্য এখানে একটি রাজনৈতিক মান নির্ধারণ করেন দিচ্ছেন। এই মান নিম্নবর্গীয় মানুষদের 'নিয়তিবাদী' বলে নিন্দাকরা নয়– যাকে নিম্নবর্গীয় চেতনার একটি ধ্রুবচরিত্র জ্ঞান করে একশ্রেণী, নিম্নবর্গ যে কখনও নিয়ন্ত্রক ও দায়িত্বশীল হবে তার আশাও করেন না। বরং একে দেখানো হয়েছে নিম্নবর্গীয় চেতনার স্ববিরোধী অস্তিত্বের একটি দিক হিসেবে: (পার্থ, ১৯৯৮ : ৬৭)

ঐশ্বরিকতার আতিশয্যেই কর্তা কখনও কখনও নিজের সৃষ্টিকেই সঠিকভাবে চিনতে পারে না। যা তার নিজের প্রতিভাজাত তাকে সে অন্যের কৃতিত্ব বলে বর্ণনা করে। একে বলা যায় মঙ্গলকাব্যের অতি বিনয়ী কবির বলা কথাকাব্য, নিজ কবিত্ব শক্তিকে আরাধ্য দেবীর অলৌকিক কোনো কর্ম বলে প্রচার করার ঔদার্যতা। নিম্নবর্গের ধর্মীয় চেতনাকে আরো একটু স্পষ্ট করা করলে এই দাঁড়ায় যে,

প্রতিরোধই নিম্নবর্গের একমাত্র উপাদান নয়; ধর্মীয় চৈতন্য তাঁর সত্তার আর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। এই চেতনার জগতে তার রয়েছে কিছু অলৌকিক বিশ্বাসের বসবাস। অর্থাৎ বিদ্রোহের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে সে তার চেতনা জগৎ আবিষ্কার করতে অক্ষম হয়ে তাকে দৈব বা ধর্মের অংশ বলে দাবী করে থাকে। এই ধরনের ধর্ম বিশ্বাসকে গবেষকগণ নিম্নবর্গের রাজনীতির একটি প্রধান উপাদান বলেছেন।(ফকরুল, ২০১৪: ৫২) নিম্নবর্গের ধর্মের প্রশ্নে নির্মোহভাবে কতগুলো বিষয় বিশ্লেষণ করতে হবে যে জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে ওঠার আগে ও পরে বহুদিন সাধারণ মানুষের চোখে রাষ্ট্রব্যবস্থার সামগ্রিক চেহারাটা স্পষ্ট ছিল না। তারা রাষ্ট্রকে দেখেছে তাদের স্থানীয় প্রতিনিধিদের চোখ দিয়ে। স্থানীয় প্রতিনিধিদের ক্ষমতার গোষ্পদে রাষ্ট্রের সামগ্রিক ও স্থানীয় রূপের মধ্যে যে ফাঁকা জায়গাটি তৈরি হয়েছিল, তা পূর্ণ করেছিল ধর্মের অলৌকিকতা। ক্ষমতা প্রকৃতির পিরামিডের নিচে যারা থাকে, তাদের কাছে চূড়ায় অবস্থান করা রাজশক্তিকে দৈবশক্তি বলেই বোধ হয়। তাই শাসক বাহিনীর সশস্ত্র শক্তির দ্বারা নিষ্পেষিত হয়েও শীর্ষে থাকা সেই রাজশক্তি বা দৈবশক্তির কাছেই ন্যায়বিচার প্রর্থনা করে। কারণ তারা যে রাষ্ট্রকে চেনে তার দুইটি দিকে রয়েছে। একটি নিপীড়ক বাহিনীর প্রতিভূ আর একটি আরও শক্তিধর ক্ষমতার প্রতিভূ, যাকে তারা দৈবশক্তির নিয়ামক বলে জানে। বলা চলে সেই রাষ্ট্র একটি অলীক রাষ্ট্র। এই অলীক রাষ্ট্রচিন্তা নিম্নবর্গের ধর্মাশ্রয়ী রাজনৈতিক চেতনাকে প্রভাবিত করে চলে। এই রাষ্ট্রচিন্তার প্রতিচ্ছবি মার্কসের বিশ্লেষণে আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে :

> যে প্রকার চিন্তা সেই সব শ্রেণীরই চৈতন্যের বৈশিষ্ট্য যারা উঠতির মুখে, যাদের মধ্যে ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবিক করার জন্য আবশ্যক উপাদান ও অবস্থা সমাজে তখনও তৈরি হয়নি। সেই বাস্তব ভিত্তির অভাবেই ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা রাষ্ট্রশক্তির সম্পর্কে যুক্তিসিদ্ধ ও সুসংগত কোনও ধারণাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠতে পারে না, আর সেজন্যই তা মগ্ন হয়ে থাকে অলীক রাষ্ট্রবাদের দিবাস্বপ্নে। (রণজিৎ, ২০১৫ : ৪৫)

মার্কসের এই মতের প্রতি পূর্ণ সহমত প্রদর্শন করে রণজিৎ গুহ বলেছেন, ঔপনিবেশিক ভারতের ইতিহাসের নানা শ্রেণির মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্র সম্পর্কিত এই অপরিণত ও অলীক রাষ্ট্রচিন্তার নিদর্শন। অলীক রাষ্ট্রবাদের ধারণাগত অভিপ্রায় তাদের রাজনীতির বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকতাকে উৎসাহিত করেছে, সেই সাথে সংস্কারহীনতার পথে তাকে বাধ্য করেছে দৈব ও পারলৌকিকতার আশ্রয় গ্রহণ করতে। নিম্নবর্গের চেতনাকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে তাদের সত্তার ধর্মাশ্রয়ী দিককেও সচেতনভাবেই গবেষণার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

১.৬

সভ্যতার বিকাশে মানবসমাজে শ্রেণিবিভাজন একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। দাস-শ্রম, ভূমিদাস-ব্যবস্থা, ধনতান্ত্রিক সমাজে মজুরি-শ্রমের ব্যবস্থা, এভাবেই বিভিন্ন প্রকৌশলের দ্বারা সমগ্র সমাজেই মালিকশ্রেণি উৎপাদনকারীশ্রেণি থেকে শোষণ ও লুণ্ঠন করেছে। পরস্পরবিরোধী দুটি শ্রেণির সংঘাত ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে সাধিত হয়েছে মানবসমাজের এই অগ্রগতি। এখানে সব সময়ই লাভবান হয়েছে সুবিধাভোগী শ্রেণি; আর শোষণের চতুর্দোলায় বাঁধা পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নিপীড়িত ও শোষিতশ্রেণি। প্রচলিত সেই ইতিহাসকে নতুনরূপের দেখার তাৎপর্যের আলোকিত অধ্যায় নিম্নবর্গ। একবিংশ শতাব্দীর পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞানতত্ত্বের বিভিন্ন শাখাকে নতুনভাবে মূল্যায়নের সময় এসেছে। অর্থনির্ভর সমাজভাবনায় মানুষকে নতুন সমীকরণে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। (তাশরিক, ২০১৮: ২০-২২) সাহিত্য সমাজভাবনার সেই পরিবর্তনসমূহকে শিল্পমণ্ডিতরূপে প্রকাশ করেছে। অভিজ্ঞতার বিস্তৃত পরিক্রমায় Subaltern Studies বা নিম্নবর্গ অধ্যয়ন সময়ের একটি বহুল আলোচিত তাত্ত্বিক পরিসর, যা বলার অপেক্ষা রাখে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম জ্ঞানতাত্ত্বিক কার্ল মার্কসের অবলোকনে শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাসে সমাজবিবর্তনের পাঁচটি পর্ব পাওয়া যায়। আদিম সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা ছাড়া বাকি প্রতিটি পর্বে রয়েছে একেকটি অধীনতার অবকাঠামো। একটি শ্রেণি সব সময় ক্ষমতার প্রয়োগ করে চলেছে, আর একটি শ্রেণি নিষ্পেষিত হয়ে চলেছে সেই প্রয়োগকৃত শোষণের বাঁধাজালে। এই বৈষম্যের পশ্চাতে যত কারণ ক্রিয়াশীল ছিল, তার মধ্যে অর্থনৈতিক কারণ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামসির ব্যবহৃত সাবলটার্ন শব্দটিকে পরিপ্রেক্ষিত ও অনুষঙ্গ নিরূপণে নিম্নবর্গ শব্দটি প্রয়োগ করেন ভারতীয় তাত্ত্বিক রণজিৎ গুহ। সাম্প্রতিক সময়ের ইতিহাসের সবচেয়ে বিবর্তকারী দৃষ্টিভঙ্গির প্রত্যয় হিসেবে নিম্নবর্গ শব্দটির প্রায়োগিক প্রখরতা অতুলনীয়। এর রয়েছে সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অনুষঙ্গের বিস্তৃত ইতিহাস।

> The term `subaltern' is used to denote the entire people that is subordinate in terms of class, caste, age, gender, and office, or in any other way. The historical processes of colonial Indian were marked by an admixture of pre-capitalist and capitalist relations. The nature of power, exploitation and popular resistance in such a society was not therefore, amenable to adequate understanding in trems of distinct class categories that can be clearly

> enunciated. Fore the dominating elites this lack of clarity was expressed in their inability to unite the people around themselves. For the subalterns on the other hand this very lack of clarity makes it important for us to realize the significance of every trace of their independent initiative, even though it remained fragmented in scale and distant from the core of articulate political society. Gramsci's reflections on the subaltern classes are indeed appropriate in this regard, for they are marked by a clear recohnition of incalculable value of such peripheral initiative for `the integral historian'. (Asok, 1994:203-204)

সাবলটার্ন শব্দটি সামরিক বাহিনীর, সামরিক সংগঠনের শৃঙ্খলার্থে প্রয়োগকৃত শব্দ। শব্দটি জন্মসূত্রে একটি ক্ষমতা-সম্পর্কজাত শব্দ। সামরিক বাহিনীর সাধারণ ক্যাপ্টেনের অধস্তন অফিসারদেরকেই সাবলটার্ন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। যার আভিধানিক অর্থ অনেকটা এই রকম দাঁড়ায়–Under the control or influence of some one or something that is more powerful. এ ছাড়াও দার্শনিক অ্যারিস্টটলের ন্যায়শাস্ত্রে সাবলটার্ন হচ্ছে এমন বচন যা, সব সময় অন্য বচনের অধীন; যা স্বাধীন বা সার্বিক নয়। এভাবে নিম্নবর্গ বা সাবলটার্নের সাথে অধীনতা জড়িয়ে রয়েছে। অর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমবিকাশের মধ্যে এক শ্রেণি উঁচুতে উঠে যায় আর এক শ্রেণিকে টেনে নিচে নামিয়ে দেয়। আর এই নিচে থাকা মানুষগুলোর পরিপ্রেক্ষিতের পরিক্রমায় নিম্নবর্গ হয়ে ওঠে। সামাজিক অবরোহে উপরওয়ালার অবস্থান অনাবৃত হলে, অবলুপ্ত হয়ে রয়েছে অধীনস্থ পিলসুজ-শ্রেণির সকরুণ জীবনচর্যা। নিম্নবর্গ একটি স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের তাত্ত্বিক পটভূমির ইস্তেহার। যারা একটি রাষ্ট্রব্যবস্থার উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে সরাসরি জড়িত শ্রমিক, কৃষক বা বৃত্তিনির্ভর বিভিন্ন গোষ্ঠীকে মৌলিক অধিকারসমূহ থেকে বঞ্চিত করে জনরোষের জন্ম দেয়। এই বঞ্চিত ও প্রতিহত শ্রেণিটি নিম্নবর্গ। যাদের নিজস্ব কোনো ইতিহাস নেই, যাদের কথা অতীতের কোনো দলিল দস্তাবেজে উল্লেখ করা হয়নি। তবু তারা আছে, তা সে ভ্রূণ আকারেই হোক, যা তাদের কাজের চেতনার মধ্য দিয়ে সতত বহমান। নিম্নবর্গ এমনই একটি সামাজিক গোষ্ঠী, যারা বিশ্বচেতনায় সদা বিকাশমান তার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের জয়গাথা নিয়ে। যা ক্রমায়াত উত্তর-ঔপনিবেশিক সাহিত্যের বহুল পঠিত, চর্চিত ও বৌদ্ধিক তত্ত্বের জগতের পথিকৃৎ। (তাশরিক, ২০১৮ : ২৫-২৭) ঔপনিবেশিকতার ঋণাত্মক মনোভাব ভারতবর্ষে অবস্থানরত শাসক-শোষিতের সম্পর্ককে পারস্পারিক সাংঘর্ষিক ও বিপ্রতীপ অবস্থানে উন্নীত করেছিল। এর সঙ্গে এই অঞ্চলের সুদূর অতীত থেকে চলে আসা বর্ণপ্রথার অভিঘাত জনজীবনে সৃষ্টি করেছিল প্রবল জটিলতার অন্তর্জাল। যার একদিকে রয়েছে ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসনের কঠোর শৃঙ্খল, অন্যদিকে ঔপনিবেশিক নাগরিক হিসেবে বহিরাগত

শাসকশক্তির আনুগত্য স্বীকারের প্রচণ্ড বাধ্যবাধকতা। এসবের পরিণতিতে বরাবরই বিঘ্নিত হয়েছে এদেশের সাধারণ মানুষের সহজাত ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণপ্রবাহ। এর সার্বিক স্বরূপ সুস্পষ্ট হয় রণজিৎ গুহের প্রাসঙ্গিক বিবৃতিতে :

> ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও সমাজে এমন কোনও অভিব্যক্তি নেই যা এই দ্ব্যণুক সম্বন্ধ দিয়ে বোঝা বা বোঝানো যায় না। জাত, শ্রেণী, সম্প্রদায় ও অন্যান্য সমূহের নানা অংশের মধ্যে, স্ত্রীপুরুষ জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠ প্রভৃতির মধ্যে, অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের সর্বত্র ক্ষমতাবৈষম্য সেই বৈপরীত্যের বিশেষ বিশেষ প্রকাশ। এবং তা যেমন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রকট, আঞ্চলিক ক্ষেত্রেও তেমনি। এক কথায়, যুক্তিসিদ্ধ এবং প্রয়োগ নমনীয় বলেই, অভিজ্ঞতার বৈশিষ্ট্যে ও সামান্যতা উভয়কেই বোধগম্য করতে পারে বলেই এই ধারণাটি এত শক্তিশালী। (রণজিৎ, ২০১৫ : ৩৪)

নিম্নবর্গ সমস্ত জনগণের মধ্যে অবস্থান করেও, তাদের শ্রেণি, পেশা, বর্ণ বা লিঙ্গের বিচারে তারা অন্য কারো অধীনস্থ। অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রতিটি পর্বে তাদের স্বকীয় উদ্যোগ, তাদের স্বতন্ত্র প্রচেষ্টার বিচারে নিজস্ব অস্তিত্বের পরিচয় বহন করে। তবে নিম্নবর্গকে সংজ্ঞায়নের সুবিধাজনক ক্ষেত্র হলো ক্ষমতার মাপকাঠিতে সম্পর্কের মৌলিকতার গুরুত্ব অনুধাবন করা। শ্রেণি বিশ্লেষণের ধারণা অপেক্ষা আধিপত্য ও অধীনতার দ্বারা নিম্নবর্গকে অধিক অবলোকন করা হয়। যার মধ্য দিয়ে গ্রামসি ও নিম্নবর্গীয় প্রসঙ্গের ভারতীয় তথা বাংলা ভাষার পাঠ ও প্রয়োগের মধ্য দিয়ে আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের নতুন একটি ধারা গড়ে উঠেছে।

১.৭

নিম্নবর্গ শব্দটি এসেছে ইংরেজি সাবলটার্ন শব্দ থেকে। নিম্নবর্গ শব্দটির সমার্থক শব্দের ভাণ্ডার বেশ সমৃদ্ধ। অন্ত্যজ, অচ্ছুত, অস্পৃশ্য, অপর, অপাংক্তেয়, ব্রাত্য, দলিত, প্রান্তিক, প্রান্তজন, নিম্নবর্গ প্রভৃতি শব্দের প্রায়োগিক উপস্থিতি লক্ষণীয়। শব্দগুলো সংখ্যায় অধিক হলেও অর্থগত দিক থেকে নেতিবাচকতা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যতায় পূর্ণ। এর বিপরীতে আছে আধিপত্য, কর্তৃত্ব, প্রভুত্বের মতো ক্ষমতা বা ক্ষমতাকেন্দ্রিক শব্দের রূপরেখা। সমাজব্যবস্থার অনাদিকাল থেকে যে শ্রেণিবিভেদ প্রথা শিলীভূত হয়ে রয়েছে; এর মধ্যে প্রতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে ক্ষমতার বিন্যাস, প্রতিষ্ঠা, প্রভুত্ব এবং পুনরাবর্তনের প্রক্রিয়া। উৎপাদন প্রক্রিয়ার সক্রিয় কারিগর কৃষক ও শ্রমিক, সমাজের প্রয়োজনে যে শ্রমকে সে দিনের পর দিন ব্যবহার হতে দিয়েছে, শোষণের হাঁড়িকাঠে বারবার রক্তাক্ত হয়েছে সেই শ্রেণি। সমাজের প্রান্তে থেকে যারা সমাজকে সমানের পথে এগিয়ে দিয়েছে, সেই অপহৃত শ্রমের মালিক এই নিম্নবর্গ। নিম্নবর্গের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য মানুষ যেমন রয়েছে কৃষক -তেমনি শ্রমিক এমন

কি জীবিকাবিহীন একশ্রেণির দরিদ্র মধ্যবিত্ত, যারা অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার মধ্য দিয়ে ক্রমশ নিম্নবিত্ত হয়ে চলেছে। আসলে দলিত, অবহেলিত, অপমানিত এবং অপাঙক্তেয় নিম্নবর্গ সামগ্রিক অর্থেই একটা বৃহৎ পরিবার। এই বৃহৎ পরিবারকে ফাঁদে ফেলে শোষণ করা হয়, পরিশীলিত হতে গিয়ে ছিটকে পড়ে স্বধর্মের স্বাভাবিক জীবনচর্যা থেকে। শ্রেণিবিভক্ত সমাজের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়নে ঢাকা পড়ে যায় নিম্নবর্গের প্রকৃত দেশ ও সংস্কৃতি। মার্কসীয় চেতনা থেকে মার্কসবাদ-উত্তর বিশ্বে কোথাও তৈরি হয়নি তাদের নিরাপদ আবাসভূমি। বরং পণ্যায়নমুখী চতুর হস্তক্ষেপে তারা অসহায়, অনিরাপদ। তাদের ইতিহাস বয়ে চলেছে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের বাচন ও পরম্পরায়। দৈব ও ধর্ম-নির্ভর লোকায়ত সংস্কারের বহুবিধ মিথের মধ্যে ছড়িয়ে আছে শক্তি ও সামর্থ্যের সম্ভাবনাময় দিকসমূহ। ব্রাত্য করে রাখার সামাজিক ষড়যন্ত্র যুগ যুগ ধরে বিবর্তিত হতে হতে যখন রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে রূপ নিয়েছে, তখনই সমাজের মূল ধারার বাইরে থেকে গিয়েছে নিম্নবর্গ।

> শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ক্ষমতাস্থাপনের বিভিন্ন প্রকরণ ও প্রতিবেদন থাকে, বিভিন্ন আইন ও রেজিমেন্ট থাকে, বিভিন্ন ছদ্ম জাদুকাঠি ও যান্ত্রিক জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠান থাকে। সেই Hierarchy বা ক্রমোচ্চ বিন্যাসে নিম্নবর্গেরা কোথাও নেই– অথচ তারাই কিন্তু তাদের পিঠের ওপর হিন্দু পুরাণ কল্পনা অনুসারী কূর্ম অবতারদের মতো পৃথিবীকে ধরে আছে। মূলত নিম্নবর্গের প্রশ্নহীন আনুগত্য ছিল বলেই সভ্যতার ইমারত দেখে বোঝা যায়নি সাময়িক ইতিহাসের চক্রান্তের। (জহর, ২০১৭ : ৩৪)

শ্রেণিস্বার্থের সংকীর্ণ গণ্ডি পেরিয়ে নিম্নবর্গের জীবনচর্যার অফুরন্ত আধারকে সমাজবীক্ষণের সুগভীর দৃষ্টিতে আলোকিত করতে হবে। নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকবৃন্দ সেই নির্জলা ইতিহাসকে প্রাণ দেয়ার প্রচেষ্টায় অনুসন্ধানরত। প্রতিবেদনের প্রবেশাধিকারে যখন সামাজিক ইতিহাসের মর্মমূলে আলো ফেলবে, তখন ক্ষমতাহীন ও ক্ষমতাশালী শ্রেণিচৈতন্যের অসম্পূর্ণতাকেও তুলে ধরবে। আধুনিকতা ও পশ্চাৎপদতার দ্বন্দ্বের মধ্যেও রয়েছে শ্রেণিসংগ্রামের দ্বন্দ্ব। নিম্নবর্গের পশ্চাৎপদতার মধ্যে রয়েছে অবদমনের ইতিহাস; সেই ইতিহাস উন্মোচনের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হবে সত্যের ইতিহাস, শোষণের ইতিহাস। রাষ্ট্রক্ষমতা সব সময় আধুনিকতার প্রতি অগ্রগামী, আর ক্ষমতাতন্ত্র সম্পর্কিত থাকে মতাদর্শের সঙ্গে। সুতরাং ক্ষমতাতন্ত্রের তলদেশের বিনির্মাণ অবশ্যম্ভাবী। এই সংক্রমণজাত প্রভাবের বৃত্তে নিম্নবর্গের ছিল না কোনো তথাকথিত নবজাগরণ বা ঔপনিবেশিকতাজাত জাতীয়তাবাদের কৃত্রিম স্ফুরণ। ফলে তার নিজস্ব সমাজবিধির মূলধারা ক্রমাগত চাপা পড়ে চলেছে প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসূচির মৌলবাদের অন্তরালে।

রণজিৎ গুহের ব্যাখ্যা থেকে অনুসারে অধস্তন শ্রেণিকে নিম্নবর্গ বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। অধস্তন শ্রেণি বলতে সেই সব শ্রেণিকে চিহ্নিত করা হয়, যারা ক্ষমতার বিন্যাসে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক

মতাদর্শগত দিকের সঙ্গে যুক্ত নন। তাদের পক্ষে সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক শ্রেণিগত অধস্তনতাকে প্রবলরূপে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। যদিও তারা তাদের নিজস্ব শ্রেণি চেতনায় সচেতন। তবুও যতক্ষণ পর্যন্ত শ্রেণি স্বার্থে তারা সংগঠিত হতে পারছে না, ততক্ষণ পর্যন্ত অধস্তন শ্রেণির শোষণের বিপরীতে দাঁড়াতে পারছে না। নিম্নবর্গের পরিধির বিস্তৃতি রয়েছে ঔপনিবেশিক শাসন আমলের দীর্ঘ পরিসরে। আর অসংগঠিত শ্রেণি হিসেবে যে নিম্নবর্গকে আমরা শনাক্ত করি, তা ধর্মীয় বর্ণের ভিত্তিতে দেখলে হরিজন বা নমশূদ্রের মধ্যেও সীমাবদ্ধ নয়। লিঙ্গের আলোকে দেখলে, পুরুষশাসিত সমাজে নারীও সর্বার্থেই নিম্নবর্গ :

> Taken as a whole and in the abstract this… Category… was heterogeneous in its composition and thanks to the uneven character of regional economic and social developments, different from area to area. The same class or element which was dominant in one area…could be among the dominated in another. This could and and did create many ambiguities and contradictions in attitudes and alliances, especially among the lowest strata of the rural gentry, impoverished landlords, rich peasants and upper middle class peasants all of whom belonged, ideally speaking to the category of people or subaltern classes.(Guha 1982:8)

গ্রামসি তাঁর *কারাগারের নোটবই* গ্রন্থে ফ্যাসিস্ট শক্তির রোষদৃষ্টি এড়াবার কল্পিত প্রচেষ্টায় রূপক ভাষার সাহায্যে মার্কসবাদের বিভিন্ন তত্ত্ব সম্পর্কে নিজস্ব পর্যালোচনা লিপিবদ্ধ করেছিলো। রূপক ভাষায় মার্কসবাদকে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি প্রচলিত মার্কসীয় পরিভাষাকে পরিহার করে উপযুক্ত বাকপ্রতিমা নির্মাণ করে নিলেন। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রচলিত মার্কসীয় তত্ত্বের বিশ্লেষণকে গ্রামসির নিজস্ব অভিমত, তাৎপর্য ও ব্যাখ্যার স্বতন্ত্র একটি দৃষ্টিভঙ্গির ও উদ্ভাস ঘটিয়েছেন। মার্কসীয় আলোচনায় প্রাথমিক দুটি পারিভাষিক শব্দ পুঁজিপতি বা বুর্জোয়া এবং শ্রমিক শ্রেণি বা 'প্রলেতারিয়েত'। গ্রামসির ভাষায় এই দুটি শব্দের প্রতিশব্দ যথাক্রমে 'হেজেমনিক' আর 'সাবলটার্ন'। গ্রামসিয় দর্শনের পরিবর্তে তিনি ব্যবহার করেছিলেন 'প্রোক্সিসের দর্শন'। ইতালীয় 'সুবলতের্নো' শব্দটিকেই গ্রামসি প্রলেতারিয়েত শব্দের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করেন। মূলত সুবলতের্নো বলতে তিনি শ্রমিকশ্রেণিকে বুঝিয়েছেন। অর্থনীতিনির্ভর পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় মালিকশ্রেণিই সমস্ত ক্ষমতার সর্বময় কর্তা, আর শ্রমিকশ্রেণি সেখানে সাবলটার্ন। তবে গ্রামসির সমকালীন প্রেক্ষিতে ইতালির পুঁজিবাদের বিকাশপর্বে প্রভুত্বের অধিকারী সামন্তশ্রেণি এবং প্রভুত্বের অধীনস্থ কৃষকশ্রেণি গ্রামসিকে অধিকতর প্রভাবিত করেছে :

> ইউরোপীয় মার্কসবাদের আদিপর্বে কৃষকের সংস্কৃতি, ধ্যানধারণা, আচার-আচরণ ও রাজনৈতিক সম্ভাবন ধ্যানধারণার, আচার-আচরণ ও রাজনৈতিক সম্ভাবনা সম্পর্কে যে তাচ্ছিল্য আর অবজ্ঞার ভাব ছিল, তার বিরুদ্ধে গ্রামসি বলে গেছেন 'সাবলটার্ন' কৃষকদের প্রাত্যহিক জীবনযাপন, ধর্মবিশ্বাস, রাজনৈতিক ধ্যানধারণার বিশিষ্ট লক্ষণগুলির কথা এবং বিপ্লবী নেতৃত্ব তথা বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে এই লক্ষণগুলিকে গভীরভাবে অনুসন্ধান করা ও বোঝার প্রয়োজনের কথা। অথচ একই সঙ্গে তিনি ক্রমাগত জোর দিয়েছেন কৃষকশ্রেণীর চেতনার সীমাবদ্ধতার উপর। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে প্রভুত্বের অধিকারী যে শ্রেণী, তার চেতনার সমগ্রতা, মৌলিকতা, সক্রিয় ইতিহাসবোধের তুলনায় কৃষকচেতনা একান্তভাবেই খণ্ডিত, নির্জীব, পরাধীন। ... গ্রামসি কৃষকচেতনার সীমাবদ্ধতা এবং পরনির্ভরতার কথা বলেছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু একই সঙ্গে এ-কথাও বলেছেন যে-কোনও শ্রেণী বিভক্ত সমাজে প্রভুত্ব/ অধীনতা সম্পর্কটা হল বিরোধিতার সম্পর্ক। (পার্থ, ২০১৫ : ৪)

গ্রামসি দেখিয়েছেন প্রভুত্ব আর অধীনতার সম্পর্ক, শাসক-শোষক আর শাসিত ও শোষিতের সম্পর্ক চিরকালই বিরোধে পূর্ণ একটি প্রত্যয়। আর এই সম্পর্ক শুধু জমিদার ও কৃষক বা ধনী কৃষক ও দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকের মধ্যেই আবদ্ধ নয়। এটি একটি অবিরাম প্রক্রিয়ার প্রত্যয়। যেকোনো আধিপত্য ও অধীনতার মধ্যে এর মূল প্রক্রিয়া লুক্কায়িত রয়েছে। যার কর্তৃত্বের মধ্যে রয়েছে শোষিত ও শাসিত হওয়ার সামগ্রিকতা। শাসক-যন্ত্র কেবল কর্তৃত্ব বা প্রভুত্ব স্থাপনের মাঝেই তার অধীনতার সীমানা আবদ্ধ রাখে না, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেও তার কর্তৃত্বের পরিসীমা বজায় রাখে। গ্রামসির বিশ্লেষণে এই বিষয়টি স্পষ্ট যে পরাধীনতা সত্ত্বেও শোষণের চূড়ান্ত সীমায় নিম্নবর্গ প্রতিবাদে প্রতিরোধে উচ্চকিত হয়ে উঠে। যা তার স্বজাত্যবোধ আর স্বাধীন প্রত্যয়েরই চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ। গ্রামসি কৃষকের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা ও ভাবাদর্শের জগৎকে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করেছেন। অধীনতার জটিল শাখা-প্রশাখাকে সূক্ষ্মভাবে বিচার -বিশ্লেষণ করার মধ্য দিয়ে জীবনের সমগ্রতার চেতনাগত দিক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেখানে স্থান পেয়েছে নিম্নবর্গের ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, আদর্শ ও বিশ্বাসের পরিচয়। তবে এখানে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে সামাজিক অধীনতা; অধীনতার সাথে আধিপত্যের সম্পর্ক নিবিড়। আধিপত্য এমন একটি ধারণা, যা কীভাবে প্রভুত্ব ও অধীনতার সম্পর্কের দ্বারা একটি শ্রেণি তৈরি হয়, তা বুঝতে সাহায্য করে। আধিপত্য কীভাবে শ্রেণিসম্পর্কে প্রভাবিত করে তা বোধগম্য করার কারণেই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় বুর্জোয়ারা প্রভুত্বের আর সর্বহারারা অধীনতার অবস্থানে থাকে। এই সব অনুষঙ্গের বিবেচনায় রণজিৎ গুহ নিম্নবর্গ শব্দটিকে বাংলা ভাষার অধিভুক্ত করেছিলেন।(মিল্টন, ২০০৯ : ৪৫) নিম্নবর্গ শব্দটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে শ্রেণি, জাতি, বর্ণ, পদমর্যাদা, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব এবং আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থানের দিক থেকে শ্রেণির ইতিহাস। সর্বোপরি শিক্ষায় ও অর্থনৈতিক অবস্থান থেকে অনুন্নত অনগ্রসর জনগোষ্ঠী যারা পেশাগতভাবে সরাসরি

শারীরিক শ্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাদেরকেই নিম্নবর্গ বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। ক্ষমতায়নের দিক থেকে এই শ্রেণি কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রান্তিক বা প্রাকৃতজন, আবার কখনো কখনো সাধারণ লোক, অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, চাষি, ক্ষেতমজুর, আদিবাসী ও শোষিত জনগোষ্ঠী; তার সঙ্গে রয়েছে লৈঙ্গিক বৈষম্যের শিকার নারী। জীবনযাপনের অবস্থানগত লক্ষণের মধ্যেও নিম্নবর্গের অভিব্যক্তি প্রকাশিত :

> নিম্নবর্গের অন্তর্ভুক্ত সকল শ্রেণী গোষ্ঠী ব্যক্তি ও সমূহকে ঐতিহাসিক গবেষণা ও বক্তব্যেও বিষয় বলে স্বীকার করতে হবে সচেতনভাবে। এদের মধ্যে কৃষক, শ্রমিক, নিম্নমধ্যবিত্ত, গ্রাম ও শহরের গরিব জনতা ইত্যাদি গণ্য তো বটেই। কিন্তু ঔপনিবেশিক সমাজে প্রভু ও অধীনের সম্পর্কটা যাদের জীবনে খুবই প্রকট অথচ যারা আমাদের ইতিহাসচিন্তায় এখনও প্রায় অনুপস্থিত সেই আদিবাসী, নিম্নবর্ণ ও নারীদের ভূমিকা নিয়ে বিশেষ করে ভাবতে ও লিখতে হবে। (রণজিৎ, ২০১৫ : ৩৯)

সাবলটার্ন আলোচনার ক্ষেত্রে নতুন গতিপ্রবাহের সৃষ্টি হয় রণজিৎ গুহের নেতৃত্বে একদল ঐতিহাসিকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। ভারতবর্ষ তথা সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার সমাজ-ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে। ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসকে পুনর্বিবেচনার মধ্য দিয়ে ইতিহাস-সমাজ-রাষ্ট্রনীতি-শিল্পসাহিত্যে নিম্নবর্গের অবস্থানকে স্পষ্ট করে তোলে। Subaltern studies-এর প্রথম খণ্ডের preface রণজিৎ গুহ জানিয়েছেন, এই প্রকল্পে তিনি দক্ষিণ এশিয়ার নিম্নবর্গ বিষয়ে একটি সুশৃঙ্খল ও তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনার প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন। গ্রামসির প্রতিষ্ঠিত তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিতকে দক্ষিণ এশিয়ার আর্থ-সামাজিক পরিবেশের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ করে প্রতিষ্ঠা করার বৌদ্ধিক অবদান রণজিৎ গুহর। তাঁর সম্পাদিত ছয় খণ্ডের Subaltern Studies (১৯৮২-১৯৮৯) জ্ঞানতত্ত্বের জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে; উপমহাদেশের চিন্তাজগতের সমৃদ্ধি আনয়ন করে তিনি প্রাগ্রসর প্রাজ্ঞতা প্রদান করেছেন। তিনি নিম্নবর্গ শব্দটির পারিভাষিক রূপ দিয়ে একটি সুশৃঙ্খল জ্ঞানভাণ্ডারের উদ্যোক্তা হিসেবেও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। নিম্নবর্গের ধারণাগত অবয়বকে আরো সুস্পষ্ট ও তাৎপর্য বহুল করতে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন Concise Oxford Dictionary :

> The word `Subaltern' in the title stands for the meaning as given in the Concise Oxford Dictionary that is, `of inferior rank'. It will be used in these pages as a name for the general attribute of subordination in South Asian Society whether this is expressed in terms of class, caste, age, gender and office or in any other way.(Ranajit, 1982: preface)

আন্তেনিও গ্রামসি তাঁর *প্রিজন নোটবুকসে* নিম্নবর্গের জীবনযাত্রা, আচার-আচরণ নিয়ে মোট ছয়টি দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। রণজিৎ গুহ এ বিষয়ে গ্রামসির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন। তিনি

ভারতীয় ঔপনিবেশিক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতাবান-ক্ষমতাহীনের মানদণ্ড নির্মাণ করেছেন। 'On Some Aspects of the Historiography of Colonial India'(Subaltern Studies:1, 1982: 8 প্রবন্ধের note) পরবর্তীতে ভারতীয় তাত্ত্বিক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক এই যুগ্ম-বৈপরীত্যের অনুষঙ্গে উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গের পারস্পরিক সম্পর্কের মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন :

1. Dominant foreign group's elite}

2. Dominant indigenous groups on the all-India level,} elite

3. Dominant indigenous groups at the regional and local levels.

4. The terms 'people' and 'Subaltern classes' (are) having been used as synonymous throughout (Guha's definition). The social groups and elements included in this category represent the demographic difference between the total Indian population and all those whom we have described as the`elite'. (Gayatri, 19982:40)

স্পিভাক নিম্নবর্গের সংজ্ঞা বলতে বর্ণিত সংজ্ঞাগুলোর মধ্যে তৃতীয় ধারাটিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। যারা সাধারণ জনতা ও প্রভুত্বকারী শ্রেণির মধ্যবর্তী জনগোষ্ঠী। রণজিৎ গুহ উচ্চবর্গ হিসেবে বিদেশি ও দেশীয় প্রভুত্বকারী শ্রেণিকে নির্দেশ করেছেন। এ ছাড়া স্থানীয় প্রভুত্বকারী শ্রেণি নিজ অঞ্চলে প্রভাবশালী হলেও অন্যত্র তারা অন্য কোনো প্রভুর অধীন; তারপরও তারা উচ্চবর্গের অন্তর্গত; কারণ এই তিন শ্রেণির বাইরে আছে যারা, রণজিৎ গুহের মতে তারা সবাই নিম্নবর্গ। গরিব শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুর, নিম্নমধ্যবিত্ত, গ্রাম ও শহরের গরিব জনতা আদিবাসী সর্বোপরি নারীও এর অন্তর্গত। এদের জীবনযাত্রা ও জীবনবোধের মৌলিক কিছু পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য অবলোকন করা যায় :

ক. নিয়ন্ত্রণহীন, স্বাধীন

খ. রাজনীতি সচেতনতায় অবিবেচিত, স্বতঃস্ফূর্ত, উদ্দাম

গ. সক্রিয়তায় সশস্ত্র, নিয়মবিরোধী

ঘ. আত্মীয় ও জাতিগোষ্ঠীর প্রতি সহমর্মী অনুপ্রেরণায় উদ্দীপিত

ঙ. উচ্চবর্গ কর্তৃক বঞ্চনা ও নির্যাতনের অভিজ্ঞতা থেকে প্রতিরোধ স্পৃহা

চ. প্রতিরোধ, প্রতিবাদ, বিদ্রোহ সুপরিকল্পিত ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যমুখী নয়। (জয়শ্রী, ২০১৬: ৪৫)

দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসের অবয়বকে ভিন্নদৃষ্টিতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মধ্যে বঞ্চিত মানুষের কণ্ঠস্বরকে সামনে আনার প্রচেষ্টা বরাবরই তাদের মাঝে লক্ষণীয় ।এই বিশ্লেষণে কৃষকদের রাজনৈতিক চেতনা সম্পর্কে প্রচলিত অভিমতকে অগ্রাহ্য করে তাদের শ্রেণিগত অবস্থানকে তুলে ধরার যৌক্তিক প্রয়াস স্পষ্টভাবে প্রকাশিত। উত্তর-ঔপনিবেশিক চিন্তনে এই দৃষ্টিভঙ্গি আরো অধিক পূর্ণতা পেয়েছে :

> পুঁজিবাদপূর্ব সমাজ ক্ষমতাকে অবিশ্বাস করত, তাই অভক্তিও ছিল। কারণ ক্ষমতা ছিল নিপীড়নের একটি উপায়। তাই ওই সমাজে অত্যাচারী কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে কৃষকবিদ্রোহ ছিল। মন্দ শাসকের উচ্ছেদ করে ভালো শাসকের পক্ষে তারা হাতিয়ার ধরত। এখানে কোনো অমূল্যবাদী বিবেচনা ছিল না। মূলত প্রায়শ পুরনো প্রতিষ্ঠান কাঠামোর সংশোধন কিংবা শুদ্ধিতাই ছিল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তারা বিপ্লবী নয়, বিদ্রোহী ছিল। এই সমাজগুলোর মূল বৈসাদৃশ্য যা ছিল তা হচ্ছে, একটা শক্ত ভৌত-অবকাঠামোর ওপরে এক নড়বড়ে উপর-কাঠামো। একটার পর একটা বিদ্রোহ ঘটছে, রাজবংশকে উল্টে দেয়া হয়েছে, কিন্তু যেসব মূল প্রতিষ্ঠানসমূহ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে চালিত করত তা রয়েই গেছে এবং প্রায়ই অশান্তির কালটা পার হয়ে যাওয়ার পর আরোও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। তবু, শোষণের অধীনে থেকে কৃষকসমাজ যে ন্যায় ও ন্যায্যতার কোনো একটি আদর্শ জগতের স্বপ্ন দেখত বৈকি। এখান থেকেও উপ্ত হতো সোনালি ভবিষ্যৎ রচনায় আন্দোলনের তাড়না। তখন কৃষকসমাজ শক্তভাবেই নিজেদের অবস্থান জানান দিত। যদিও কোনো সুসঙ্গত ও সুগঠিত কার্যক্রমের বদলে এগুলো ছিল যৌথ স্বপ্নের এক উন্মুক্ত প্রকাশ। (ফকরুল, ২০১৪ : ১০৯)

এভাবে নিম্নবর্গ একটি সামগ্রিক চেতনার বোধকে সমন্বিত ও সার্বজনীন ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করার মাধ্যমকে প্রসারিত করে চলেছে। নিম্নবর্গের চেতনা বিশ্লেষণ করলে এর সম্ভাব্যতার সূত্র মূল্যায়নের পরিসীমা পাওয়া যায়। একদা কৃষিসমাজের বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিল্পসমাজের উদ্ভাস ঘটেছিল। আবার সেই রকম বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া শিল্পসমাজকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে শিল্পোত্তর সমাজে। সমাজের এই পরিবর্তনকে বরাবরই বেগবান করে চলেছে নিম্নবর্গ। তবু সেই সমাজে নিম্নবর্গের নেই কোনো সম্মানজনক আবাসভূমি। নিম্নবর্গের এই নিরলস শ্রমের নেই কোনো স্বীকৃতি। তাই নিম্নবর্গের ইতিহাস তাত্ত্বিকেরা ঔপনিবেশিক ভারতের কৃষক বিদ্রোহকে তলদেশ থেকে দেখেছেন এবং ভেতর থেকে অনুসন্ধান করেছেন এই আন্দোলনের যথার্থ পরিমণ্ডলকে।

১.৮

প্রাচীন ভারতীয় সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী কায়িক শ্রমের অধীনস্থ ছিল। তারা সকলেই ছিল সমাজের একান্ত প্রয়োজনীয় সেবক। অথচ সমাজে তাদের স্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছিল সামাজিক ক্রমবিন্যাসের নিম্নতম স্তরে। সপ্তম-অষ্টম শতক থেকে বাঙালি সমাজ প্রধানত কৃষি ও গৃহশিল্প নির্ভর

ছিল। আর অর্থোৎপাদক এই শ্রমিকশ্রেণি সামাজিক মর্যাদায় নিম্ন থেকে নিম্নতম স্তরে অবস্থান করে আসছিল। সমাজের অর্থোৎপাদক ও শ্রমিকশ্রেণি সম্বন্ধে একটি অবজ্ঞাসূচক ধারণা খ্রিস্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতকে গড়ে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে বর্ণের সঙ্গে শ্রেণির পারস্পরিক সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে; যা পাল আমলের শেষের দিকে এসে তীব্ররূপ ধারণ করে। 'পঞ্চম শতকের পর হইতে এই ভেদ-বিন্যাস ক্রমশ বিস্তৃত হইতে আরম্ভ করে এবং সেন-বর্মণ পর্বে তাহা দৃঢ় ও অনমনীয় হইয়া সমাজকে স্তরে-উপস্তরে বিভক্ত করিয়া সমগ্র সমাজ-বিন্যাস গড়িয়া তোলে।' (নীহাররঞ্জন, ১৪০৭ : ২৫৯-২৬০) প্রাচীন বাংলার সমাজ যেমন বিভিন্ন বর্ণে বিভাজিত, তেমনি আবার বিভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণিতেও বিভাজিত ছিল। সামাজিক সম্পদের উৎপাদন ও বণ্টন অনুযায়ী সমাজে অর্থনৈতিক উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটতে থাকে। উৎপাদিত সম্পদ কারা বেশি ভোগ করবে, এবং কারা কম ভোগ করবে তাও নির্ভর করত বণ্টনব্যবস্থার উপর। বাংলায় ধনোৎপাদনের মাধ্যম ছিল তিনটি কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য। এই তিন উপায় অবলম্বন করে গড়ে উঠত তিনটি শ্রেণি। কিন্তু সবচেয়ে বৈষম্যের জায়গা ছিল কৃষি -ক্ষেত্রে। কৃষিকাজের ক্ষেত্রে উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে সরাসরি কৃষক সম্পৃক্ত থাকত, কিন্তু বণ্টনব্যবস্থা ছিল রাষ্ট্রের হাতে। ঐ সমাজব্যবস্থায় যেখানে বৃত্তি বা জীবিকা অনুযায়ী বর্ণ ও শ্রেণি একে অপরের সাথে পারস্পরিক সম্পর্কে নির্ভরশীল ছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অষ্টম শতক হতে যতগুলো শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে, তার প্রতিটিতেই ক্ষেত্রকর বা কৃষকদের উল্লেখ আছে। পাল ও সেন আমলের শিলালিপি থেকে জানা যায়, ভূমির অধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন শ্রেণি স্তর সমাজে বিদ্যমান ছিল। যেখানে উপর মহলের অধিকার অনেক বেশি স্বীকৃত ছিল। বিভাজনে কৃষক বা ক্ষেত্রকর ছিল চতুর্থ শ্রেণিতে; যারা স্বল্প ভূমির অধিকারী অথবা ভাগচাষি ও ভূমিহীন চাষি। আর পঞ্চম স্তরে রয়েছে সমাজের শ্রমিক-সেবক, যারা অধিকাংশই ভূমিবঞ্চিত, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অধিকারবঞ্চিত। অনুৎপাদক শ্রেণি তাদের নিজেদের শক্তি ও অবস্থানকে চিরস্থায়ী করার জন্য শ্রমিক কৃষকশ্রেণিকে অবদমন করা শাসন কার্যের অন্যতম নীতিমালা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেন। এই ধরনের বণ্টনব্যবস্থায় সমাজের উচ্চবর্গ ক্রমেই ধনী আর নিম্নবর্গ ক্রমেই দরিদ্র হয়ে চলেছিল। এইভাবে এই পথে শ্রেণি ও উৎপাদন প্রণালির শোষণ প্রক্রিয়ার দ্বারা বিকশিত হয়েছিল ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা।

এই গবেষণার পটভূমি বাংলাদেশ, যা পূর্বতন পূর্ববঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তান। তিনটি ঔপনিবেশিক পর্ব পার করে আজকের বাংলাদেশের অভ্যুদয়। তবে ইতিহাসের দীর্ঘ-পরিসীমায় পার করেছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমল। এই তিনটি শাসনকালকেই ঔপনিবেশিক শাসন-পর্ব বলে চিহ্নিত করা যায়। ঔপনিবেশিক সবগুলো পর্বেই নিম্নবর্গ উচ্চকিত ছিল তার চেতনার বহ্নিশিখায়; প্রতিরোধ করেছে স্থানীয় শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে। প্রতিরোধ শুধু স্থানীয় শাসন-শোষণে সীমাবদ্ধ

ছিল না; ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধাচরণেও সদা প্রজ্জ্বলিত ছিল তারা। এই প্রতিরোধের চেতনা শুধু নিম্নবর্গজাত নয়, যা বাঙালির ঐতিহ্যেরও অন্যতম অনুষঙ্গ। ঔপনিবেশিক শাসকবর্গ যাকে সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আর দেশীয় জাতীয়তাবাদীরা শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলে বিবেচনা করেছেন। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি এই প্রতিরোধকে বিদ্রোহ বলেই বিচার করেছে। একে শুধু বিদ্রোহ বলে অনুকীর্তিত করা যায় না, বরং নিম্নবর্গের আত্মগত চেতনার স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ বলে উৎকীর্তন করা যায়। এই সব বিদ্রোহের অভিঘাত শুধু বাংলাদেশ নয়, উপমহাদেশের বিভিন্ন আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব সঞ্চার করেছিল। বিশ শতকের ঔপনিবেশিক পর্বে সংগঠিত কৃষক আন্দোলনগুলো প্রচলিত অর্থে নিম্নবর্গ বলে না মানলেও, অর্থের ব্যাপকতায় নিম্নবর্গ প্রত্যয়টি ব্যবহার করলে দেখব, এদের সঙ্গে শক্তির ও সম্পদের কোনো পার্থক্য ছিল না। ঔপনিবেশিক শক্তিকে তারা হটাতে চেয়েছিলেন এবং ঔপনিবেশিক শক্তির সঙ্গে যারা সম্পর্কযুক্ত তাদের সঙ্গে ঐ শ্রেণির কোনো সম্পর্ক ছিল না বলে তারা ক্ষমতাবলয়ের বাইরে ছিল। (মুনতাসীর, ২০১৬ : ৪১) এই আন্দোলনের শ্রেণিগত তাৎপর্যে নিম্নবর্গের রাজনৈতিক চেতনার প্রতিনিধিত্বমূলক প্রকাশ বলে বিবেচনা করব। এই ইতিহাস ও ঐতিহ্য বাংলাদেশের সব ধরনের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আগ্রাসন ভূমিতে পরিণত হয়েছে।

১.৯

গ্রামসির হাত দিয়ে নিম্নবর্গের যাত্রা শুরু হলেও তার উৎসভূমিকে সমৃদ্ধ করেছেন বিভিন্ন তাত্ত্বিক ব্যক্তির পর্যালোচনা। মার্কসবাদ থেকে ফুকোর আলোচনা, গ্রামসি থেকে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক। উত্তর-ঔপনিবেশিক পরিসরের দেশগুলোর আবেগ ও আবহকে তাত্ত্বিকতার প্রবাহে ধারণ করার মধ্যেও বৈশ্বিক বাস্তবতার অনুভূমিক অবস্থান তৈরি করেছে। উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় উন্নয়নের প্রয়োগকৌশল বদলিয়েছে কিন্তু উদ্দেশ্য বদলায়নি। স্বাধীন এই দেশগুলোতে ক্রমবিকাশমান অগ্রসরতার নামে একটি গোষ্ঠী পশ্চিমা আগ্রাসন ও জীবনাচারকে বৈধতা দেয়ার প্রকল্পে নিয়োজিত। মুষ্টিমেয় সুবিধাবাদী শ্রেণির জীবনাচারকে বিলাসিতায় ভরিয়ে দেয়ার নামে যে উন্নয়ন, তাতে করে বৃহত্তর একটি জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যের নিগড়ে বাঁধা পড়ে থাকে। ঔপনিবেশিক বন্ধনের মুক্তি ঘটলেও, বেঁধে ফেলা হয় তার তাৎপর্যগত মুক্তির পথকে। অস্বীকার করা হয় ঐসব দেশের বাণিজ্যিক স্বাধীনতাকে, বাধা দেয়া হয় তাদের প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারে, বাজার ও শিল্পায়নকে, স্বাধীন অর্থনৈতিক বিকাশের পথকে। সাবেকী উপনিবেশিত দেশগুলোকে আন্তর্জাতিক সংস্থা ও লগ্নি প্রতিষ্ঠানগুলো ‘অনন্নুত’ দেশ হিসেবে হিসেবে অভিহিত করেছে। এর আরেক অর্থ দাঁড়ায়–এই

দেশগুলো পশ্চাৎপদ ও বিকলাঙ্গ। অর্থাৎ একটি নেতিবাচক চিত্র ফুটে ওঠে। জাতিসংঘসহ বিভিন্ন বিশ্বসংস্থা অনুন্নত দেশগুলোকে 'উন্নয়নশীল' দেশ করছে। অর্থাৎ দেশগুলো উন্নয়নের দিকে ধাবিত হচ্ছে। বিষয়টি বিভ্রান্তিকর। এর মানে এই দেশগুলো ঐতিহাসিকভাবেই দরিদ্র ছিল, এখানে সাম্রাজ্যবাদের কোনো দায় নেই। বরং সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী এই সব পশ্চাৎপদ খারাপ অর্থনীতির দেশগুলোর উদ্ধারে মহতী দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে। (ফকরুল, ২০১৪ : ১০৯-১৩৯) এভাবে বড় পরিসরের উচ্চবর্গ নিম্নবর্গকে অবদমন করে আসছে। সাবলটার্ন স্টাডিজের লেখকেরা তাই ইতিহাসকে নিচের দিক থেকে দেখার পক্ষপাতী। রণজিৎ গুহর মতে, ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে উচ্চবর্গীয় দেশীয় প্রভুগোষ্ঠীর স্থানীয় বা আঞ্চলিক প্রতিনিধিদের শ্রেণিচরিত্র সম্পর্কে কিছু কথা স্পষ্ট। যেখানে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে প্রতিফলিত হয়েছে অসমতার দ্বিবিধ কারণ। এক–সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের আঞ্চলিক বৈষম্য আর দুই–এই অংশটির সামাজিক গড়নের সংশ্লেষণ, অর্থাৎ তার অন্তর্ভুক্ত উপাদানগুলোর মধ্যে গুণগত পার্থক্য। এই অসমতার ফলে যে শ্রেণি এক অঞ্চলে প্রভুস্থানীয় বলে সমাদৃত, সেই অন্যত্র আবার এক প্রভু গোষ্ঠীর অধীনস্থ। সে-কারণেই ঔপনিবেশিক উচ্চবর্গের চরিত্রের মধ্যে প্রায়শ স্ববিরোধিতায় পূর্ণ জটিলতায় অস্পষ্ট।

> ঔপনিবেশিক যুগে ভূস্বামীদের মধ্যে যারা নিঃস্ব হয়ে পড়ে, গ্রামভদ্রের মধ্যে যারা আর্থিক বা সামাজিক ক্ষমতায় একটু খাটো, মাঝারি কৃষকদের মধ্যে যারা আর্থিক বা সামাজিক ক্ষমতায় একটু খাটো, মাঝারি কৃষকদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত ওপরের দিকে এবং ধনী কৃষকশ্রেণী–এরা সকলেই আমরা সংজ্ঞার শুদ্ধ অর্থে নিম্নবর্গের অন্তর্গত হলেও বহুক্ষেত্রেই অবস্থার চাপে ও চৈতন্যের অন্তর্দ্বন্দ্বে উচ্চবর্গের সপক্ষে কাজ করে। আদর্শের বিশুদ্ধ থেকে বাস্তবের এই বিচ্যুতি ও তারই পরিণামে যে ঐতিহাসিক জটিলতার সৃষ্টি হয় তার সন্ধান, বিশ্লেষণ ও বর্ণনাই গবেষণার দায়িত্ব। (রণজিৎ, ২০১৫ : ৩৩)

এই উপলব্ধিজাত অভিজ্ঞতার পথে নিঃস্ব ভূস্বামী, অর্থনৈতিক বা সামাজিক ক্ষমতায়নে নিম্নশ্রেণির জনগোষ্ঠী, মাঝারি গোছের কৃষকশ্রেণি ও এই সংজ্ঞায়নের পরিধিকে প্রসারিত করেছে। শ্রেণিগত অবস্থানে নিম্নবর্গ হওয়া সত্ত্বেও উচ্চবর্গের স্বপক্ষে কাজ করার অভিপ্রায়কে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক বলেছেন, 'আঞ্চলিক অভিজাত সাব-অলটার্নের আদর্শচ্যুত্য ভাসমান বাফার জোন বলেছেন।' (গায়ত্রী, ২০১৫ : ৪৫) যা আসলে ঔপনিবেশিক মানসিকতার ফসল। ঔপনিবেশিক ও উত্তর-ঔপনিবেশ পর্বের ভারত উপমহাদেশিয় শ্রেণিবিন্যাসে আধিপত্য–অধীনতার সূত্র বিবেচনা করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ক্ষমতা সম্পর্কের মানদণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটলেও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের অবসান ঘটেনি। আধিপত্যশীল এই গোষ্ঠীর বাইরে ছিল অধীনতার জাঁতাকলে পিষ্ট এক বিশাল জনতা। পুঁজিবাদ পূর্ব সমাজব্যবস্থায় আধিপত্য ও অধীনতার

সম্পর্কের সূত্রায়ণ হয়েছিল সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে। পুঁজিবাদের আধিপত্যের মধ্যেও এর একটি ক্ষয়িষ্ণু অবকাঠামো বিদ্যমান রয়েছে। যাকে আমরা আধা-সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক বলেও অভিহিত করতে পারি। এ বিষয়ে রণজিৎ গুহের মত :

> In other words, it was a relationship of dominance and subordination- a political relationship of feudal type, or as it has been appropriately described, a semi feudal relationship which derived its material sustenance from pre-capitalist conditions of production and its legitimacy from a traditional culture still paramount in the superstructure. (Ranajit, 1982: 30)

কৃষিনির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কায়িক শ্রমের সাথে নিযুক্ত মানুষসমূহের সামাজিক পদমর্যাদা নিচের দিকে নামতে থাকে। আর ওপরের দিকে আসতে শুরু করে বিভিন্ন পেশাজীবী সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠী। যেমন পুরোহিত, করণিক অথবা চিকিৎসক সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠী। ঔপনিবেশিক যুগে বাংলার সমাজ ও অর্থনীতিতে বেশ কিছু পরিবর্তন আসে। বৃত্তিনির্ভর জনগোষ্ঠীর ওপর যার প্রভাব ছিল অপরিসীম। ভূমিব্যবস্থা ও বাণিজ্যনীতির ফলে কৃষক ও কারিগরদের ওপর চাপ তৈরি করেছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার বুদ্ধিজীবী বৃত্তি ও চাকুরির প্রসার গড়েছিল। ঔপনিবেশিক সরকার দ্বারা সৃষ্ট সুযোগ-সুবিধা নব্য সৃষ্ট সুবিধাবাদী শ্রেণিসমূহ ভোগ করতে থাকে। এর ফলে তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতিগুলোর মধ্যে জাগ্রত হলো এক নতুন ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক চেতনার। অর্থনৈতিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে এই শ্রেণিগুলোর মধ্যে একধরনের সামাজিক বিভাজন তৈরি হতে থাকে। নিম্নবর্গ তার মধ্যে আত্মভূত প্রতিবাদী সত্তাকে আরো একটু ছড়িয়ে দেয়ার প্রশস্ততা পেল :

> এটি গঠিত এবং পরিবর্তিত হয় এক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে, যা প্রভাবশালী ও অধস্তন শ্রেণীগুলিকে এক পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে নিয়ে আসে। সাধারণ বোধ তাই দুই প্রতিপক্ষ উপাদানের মধ্যে এক বিরোধময় ঐক্য: এর একটি হল স্বশাসিত উপাদান, যা নিম্নবর্গীয় কোনো গোষ্ঠীর মানুষদের সাধারণ বোধকে ব্যক্ত করে, যে গোষ্ঠী তাদের ব্যবহারিক কর্মে নিয়োজিত রয়েছে এবং তাদের শ্রমের শক্তিতে পৃথিবীকে রূপান্তরিত করছে, যদিও তা প্রায়শই সাধিত হয় শাসকগোষ্ঠীর নির্দেশে এবং নিশ্চিত কর্তৃত্বাধীনে। আর অন্য উপাদানটি হল প্রভুত্বকারী শ্রেণীগুলির কাছ থেকে ধার করা এবং যা সূচিত করে নিম্নবর্গীয় গোষ্ঠির আদর্শগত আত্মসমর্পণ। (পার্থ, ১৯৯৮ : ৬৪)

ঔপনিবেশবাদের সবচেয়ে বড় অভিঘাত হলো প্রাচ্যের ওপর পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক উপনিবেশায়ন। সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির ঐতিহ্য উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলোতে প্রভাববিস্তার করে তাদের সুসভ্য

প্রগতিশীল করার শিক্ষা প্রচার করে চলেছে। যা একই সঙ্গে আধিপত্যবাদী সংস্কৃতির রূপকল্প এবং বিদেশি সংস্কৃতি ও প্রভাবশালী আচরণের দ্যোতক। উপনিবেশবাসীর মনোজগৎকে শৃঙ্খলিত করার অভিপ্রায়ে ঔপনিবেশিক সাহিত্য-সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে শাসকগোষ্ঠী। প্রাচ্যতত্ত্বের বিশেষ ছাঁচে গঠিত সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আবহকে নিষ্ক্রিয় অসাড় করে অন্তর্লোককে আয়ত্ত করেছে। ঔপনিবেশিক জনমনের চেতনালোককে শূন্য করে তাদের ইতিহাস, প্রভৃতি সম্পর্কে যেন হীনম্মন্যতা জাগ্রত করতে পারে, সে-বিষয়ে ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর সতত সতর্ক দৃষ্টি ছিল। সামগ্রিকভাবে ঔপনিবেশিক শাসন প্রক্রিয়ার সংশ্লেষকে কেন্দ্র আর প্রান্তের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের যে রূপকল্প তৈরি করে, তাতেই অন্তর্নিহিত রয়েছে নিম্নবর্গের সংজ্ঞা ও পরিধি।

১.১০

ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের পাদটীকায় চেতনা একটি সূক্ষ্ম অনুভূতির রসে সঞ্চারিত বোধের নাম। যার সাথে উঠে আসে একটি শ্রেণির অস্তিত্বসমূলক বিষয়সমূহ। তার মধ্যে মিশে থাকে ঐ জাতির সমাজ-সংস্কৃতি-অর্থনীতি-রাজনীতি প্রভৃতি সঞ্চরণশীল বিষয়সমূহ। একটি রাষ্ট্রের অস্তিত্ববান অংশের ধারা হিসেবে প্রবাহমান রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র ও স্বকীয়তার ধারা নিম্নবর্গের শ্রেণিচেতনায় জাগ্রত থাকে। নিম্নবর্গের তাত্ত্বিকগণ মূলত আলোকপাত করে থাকেন প্রাক-ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পর্যায়কে যেখানে আধিপত্যশীল রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে গড়ে ওঠে আধিপত্য ও অধীনতার সম্পর্ক। এর বাইরে নিম্নবর্গের চেতনা নামে দৃশ্যমান কোনো পর্যায়, পরিসর বা সংগঠিত অবয়ব দেখা যায় না। কারণ সাধারণ পরিসংখ্যানে নিম্নবর্গকে দেখা হয়ে থাকে নিষ্ক্রিয়, ভীরু ও একান্ত অনুগত শ্রেণি হিসেবে। যাদের নিজেদের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে ভাবনাগত কোনো স্বভূমি নেই। অন্যের দ্বারা চালিত এই শ্রেণি সময় বিশেষে নিজেদের স্বার্থকেন্দ্রিক ভাবনায় কোনো কোনো সুপ্ত সত্তাকে জাগ্রত করে।

> একমাত্র প্রকাশ্য রাজনৈতিক বিরোধ বিশেষ করে বিদ্রোহের সময়ই শাসকগোষ্ঠী তাকে সক্রিয় প্রতিপক্ষ হিসেবে গ্রাহ্য করে। এই ধরনের ঐতিহাসিক বিবরণগুলোর মধ্যে নিম্নবর্গের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য, অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্য/পরাধীনতার দ্বৈত চরিত্রটি উদঘাটন করাটা নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনার একটা বিশেষ দিক হিসেবে গৃহীত হয়েছে। (পার্থ, ২০১৫ : ৮)

এই বিদ্রোহগুলোকে শুধু অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধাচরণ হিসেবে ভেবে নেয়াটা যথেষ্ট নয়। তার বাইরে থেকে যায় নানাবিধ সামাজিক উৎপীড়ন। আর প্রতিরোধের এই বহ্নিশিখা কৃষকশ্রেণির মধ্যে আকস্মিকভাবে জ্বলে ওঠে না। তার পিছনে থাকে প্রস্তুতি, সংগঠন, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের নির্দিষ্ট

ছক। এই ছক নিহিত রয়েছে কৃষকচেতনায়। বিদ্রোহের উদ্দেশ্য, তার অলীক চরিত্র এবং রাজনৈতিক পরিণতি হিসেবে তার অনিবার্য ব্যর্থতা, এসবেরই যুক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে কৃষকচেতনার আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে, অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্য/ বৈপরীত্যের দ্বান্দ্বিক রূপটিতে। (পার্থ, ২০১৫ : ৮)

নিম্নবর্গ একটি শ্রেণি, একটি চেতনা। যে চেতনাকে ক্ষমতাকেন্দ্রিক বলয়ের বাইরের বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই চেতনার সঙ্গে রয়েছে ক্ষমতাসীনদের বৈপরীত্য ও তীব্র আপসহীনতার সংস্কৃতি। রণজিৎ গুহের আলোচনায় নিম্নবর্গের চেতনা উচ্চবর্গের উন্নাসিকতার বিপরীতে। তাঁর মতে উচ্চবর্গের রাজনীতি ও ইতিহাসে সাধারণ কখনও স্থান পায়নি। অথচ ঔপনিবেশিক সময়ে উচ্চবর্গের পাশাপাশি নিম্নবর্গের রাজনৈতিক চেতনা অবস্থান করেছে ; যেখানে উচ্চবর্গ ছিল দেশীয় সমাজের আধিপত্যকারী শ্রেণি। শ্রমিক, জনতা, সাধারণ মুটে, মজুর শ্রেণি ছিল, নিম্নবর্গের আমজনতা। নিম্নবর্গের চেতনার উদ্ভাস হয়েছে তাদের স্বশাসিত সজাগ অনুভূতি থেকে; উচ্চবর্গের রাজনীতি বা অনুগ্রহের পরিসীমা থেকে নয়। (মিল্টন, ২০০৯: ৪৯) উচ্চবর্গের রাজনৈতিক তৎপরতার সঙ্গে নিম্নবর্গের রাজনৈতিক চেতনার পার্থক্য বা স্বাতন্ত্র্যের রূপরেখাটি তৈরি হয়েছে এখান থেকে। পরাধীনতার দ্বৈত পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠছে নিম্নবর্গের রাজনৈতিক চেতনায়; উৎপত্তি, উৎকর্ষতা, চরিত্র ও মতাদর্শ প্রভৃতি বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা প্রয়োজন।

প্রাক্-ঔপনিবেশিক পর্বে উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের রাজনৈতিক চেতনার সূচনা ঘটলেও তার বিস্তৃতি ঘটেছিল ঔপনিবেশিক পরিসরে। ব্রিটিশ শাসন আমলে উচ্চবর্গের রাজনীতির পূর্বতন বৈশিষ্ট্য মলিন হলেও সমৃদ্ধ হয়েছিল নিম্নবর্গের চেতনাজগৎ। এই পরিস্থিতির সঙ্গে সংগতি রেখে নিম্নবর্গের রাজনৈতিক বোধের পরিক্রমা বিকশিত হয়েছিল; যা স্বাতন্ত্র্য ও নিজস্বতায় উচ্চবর্গের তুলনায় অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল। সমাবেশ কৌশল ও প্রকৃতিগত পার্থক্য থেকে উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ রাজনীতির স্বাতন্ত্র্য নির্ণয় করা যায়। ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতায় তা নিম্নবর্গের কার্যক্রমের ব্যাপ্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। নিম্নবর্গ ছিল শোষিত মানুষের আত্মিক উন্মাদনায় সামাজিক কুটুম্বিতা ও আঞ্চলিকতার বিধিব্যবস্থায় গড়ে ওঠা শ্রেণিসংস্থা। নিম্নবর্গের সাংগঠনিক প্রক্রিয়া ন্যায়সংগত পরিক্রমার মধ্যে গড়ে উঠলেও তারা নিজেকে সংযত করতে ব্যর্থ হয়েছে দ্রোহের পরিস্থিতিতে। যার ফলে, একটি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের সফলতার সন্ধিপথে এই হোঁচট খাওয়া সমস্ত তৎপরতাকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেছে। নিম্নবর্গের আন্দোলনের এইরূপ পরিণতি ভারতবর্ষের কৃষক বিদ্রোহগুলোতে বরাবরই লক্ষণীয়। নিম্নবর্গের তাৎপর্যপূর্ণ ও শক্তিশালী আন্দোলনগুলোতে প্রতিবাদের চূড়ান্ত রূপরেখা নির্মিত হয়েছিল। এর সর্বাঙ্গীণ ও সার্বত্রিক রূপ দৃষ্টিগোচর হয় ভারতবর্ষের কৃষক

বিদ্রোহগুলোতে। (মিল্টন, ২০০৯ : ৫০-৪৮) এই কৃষক বিদ্রোহগুলোকে শুধু উদ্দেশ্যনির্ভর আন্দোলন হিসেবে না দেখে একে স্বীকার করতে হবে এর নিজস্বতায় বা স্বমহিমায়। এর মধ্যে নিম্নবর্গের চৈতন্যের লক্ষণসমূহ দেখতে হবে, যার মধ্যে এর ঐতিহাসিক সত্যতার স্বীকৃতি পাওয়া যাবে। গবেষক রণজিৎ গুহের মতে, নিম্নবর্গের চৈতন্যে অসমতা, স্তরভেদ, উপাদানও অবস্থাভেদে তার বিভিন্ন ধরনের প্রকাশ রয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীর জার্মান কৃষক বিদ্রোহে, ফরাসি বিপ্লবের সমকালীন মহাত্রাসের (লা গ্রাঁদ প্যর) মধ্যে, জার্মান ও ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে পূর্ব আফ্রিকার মাচি-মাজি অভ্যুত্থানে, এই পরিবর্তনকে ইংরেজিতে 'সেকেন্ড ওয়েভ' বলে বর্ণনা করেছেন গবেষকগণ। কারণ এই দ্বিতীয় পর্যায়ের সমাবেশে আপোসের চেয়ে আঘাতের প্রবণতা হঠাৎ তীব্র হয়ে ওঠে, তিক্ততা ও হিংস্রতা ভীষণ বেড়ে যায় ; শ্রেণিসংগ্রামে দীর্ণ হয়ে সমাজ গৃহযুদ্ধের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। (রণজিৎ, ২০১৫: ৪১) নিম্নবর্গ তার রাজনীতির সুলুক সন্ধানে এমন একটি ক্ষেত্র তৈরি করেছেন, যেখানে নিম্নবর্গ নিজেই নায়ক। নিম্নবর্গের চৈতন্যই সেই রাজনীতির চালিকাশক্তি। নিম্নবর্গের রাজনীতি হলো উচ্চবর্গের প্রতি আনুগত্য ও বিরোধিতার সমন্বয়। বিরোধিতা যেখানে আনুগত্যকে ছাড়িয়ে গিয়েছে, সেখানেই নিম্নবর্গের রাজনীতির মৌলিকতার সূচনা হয়েছে। উচ্চবর্গের প্রতি আনুগত্য ও বিরোধিতার মধ্যে আছে নিম্নবর্গের রাজনীতির মৌল-আদর্শ। উভয়ের রাজনৈতিক লক্ষ্য, অভিজ্ঞতা ও চৈতন্যের আঁধার এক নয়। তবে অবস্থা ও অবস্থানভেদে পরিবর্তন ঘটেছে নিম্নবর্গের রাজনৈতিক চৈতন্যের। পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তন ঘটেছে তার আকার ও চেহারার। ঔপনিবেশিক ভারতের কৃষক বিদ্রোহ নিয়ে সাবলটার্ন স্টাডিজ গবেষক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের আলোচনায় দুটি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে :

> প্রথম অর্থে ঔপনিবেশিক শাসনযন্ত্রের যা পরিধি তাতে করে নিম্নবর্গের রাজনীতি তার বাইরেও বটে, আবার ভেতরেও বটে। যে অর্থে তা বাইরে, সেই একই অর্থে আবার ভেতরেও বটে। যে অর্থে তা বাইরে, সেই অর্থে নিম্নবর্গের রাজনীতি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থা অথবা ভাবাদর্শের তুলনায় স্বতন্ত্র। কিন্তু তা আবার ভেতরেও বটে, কারণ বহু ক্ষেত্রেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে, তাকে সুবিধামতো ব্যবহার করছে, হয়তো বা একরকম আত্মস্থ করছে। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে, একদিকে নিম্নবর্গীয় সত্তা বা চৈতন্যের একটা বিশুদ্ধ আকৃতির ধারণা, অন্যদিকে ঐতিহাসিক মালমশলায় বারেবারে এটা আবিষ্কার করা যে নিম্নবর্গের উপস্থিতি ঘটেছে বিভিন্ন আকারে, বিভিন্ন চেহারায়। এমনকি নিজের ভেতরেই বিভাজিত অবস্থায় (গায়ত্রী, ২০১৫ : ১৬)

উচ্চবর্গের সঙ্গে নিম্নবর্গের চেতনাগত পার্থক্য এখানেই। প্রগতিশীল ইতিহাসচর্চার প্রথম অধ্যায় হলো মানবচেতনার বিকাশ। চেতনার বিকাশ বলতে অনুন্নত বা আদিম অবস্থা থেকে ক্রমান্বয়ে উন্নত বা আধুনিক চেতনার দিকে অগ্রসর হওয়াকে বোঝানো হয়। প্রগতির এই তাত্ত্বিকতা যেমন গোটা সমাজ

বা সভ্যতার জন্য প্রযুক্ত হয়, সমভাবে প্রযোজ্য তেমনি সমাজের অভ্যন্তরীণ বিভাজনের ক্ষেত্রে। এভাবেই সমাজ বিবর্তনের বাঁকে বাঁকে নিম্নবর্গ তার নিজস্ব প্রত্যয় নিয়ে উচ্চকিত হয়েছে। উচ্চবর্গের আলোকিত পথের প্রবলতায়, নিম্নবর্গের আঁধারের যাত্রা আলোর মুখ দেখেনি। সময়ের অগ্রযাত্রায় সেই আঁধার মোচনের দিন এসেছে। অন্ধকারের সোপান থেকে ক্ষীণ আলোর আলোকশিখাকে প্রজ্জ্বলিত করা এই গবেষণার অভিপ্রায়।

২.

সমাজ বিবর্তনের ধাপে ধাপে বাঁকবদলের পরিক্রমার নিদর্শন কিছু ইতিহাসের পাতায় মুদ্রিত থাকে; কিছুটা থাকে মানুষের অভিজ্ঞতায়। সভ্যতার যাত্রা শুরু হয়েছিল মানুষকে নিয়ে, মানুষের হাত দিয়ে। যাত্রাপথের সূচনাংশে মোড় নিল ও দুটি শ্রেণির অভ্যুদয় হলো, আর উদ্ভাস ঘটলো একটি পুরুষ আর একটি নারীর। যাত্রা পথে মানুষের অর্জন অনেক, প্রাপ্তিও অশেষ; কিন্তু নারী শুধু মানুষ থেকে নারী হয়ে উঠল। আর পুরুষ হয়ে উঠল সমাজের অধিপতি। নারীর নির্মাতা ও নিয়তির নির্ধারক। নারী হয়ে কেউ জন্মায় না, সমাজ তার প্রয়োজনে মানুষকে নারী করে তোলে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায় তাকে নারী হতে শেখায়। 'কেউ নারী হয়ে জন্ম নেয় না, ক্রমশ নারী হয়ে উঠে।' সিমোন দ্য বোভোয়ারের উক্তির গূঢ়ার্থ থেকে এটাই প্রতিভাসিত হয় যে নারীর জৈবিক সত্তায় পুরুষের বা পুরুষতান্ত্রিকতার দৃষ্টিভঙ্গি মানুষ থেকে নারীর জন্ম দেয়। সে-কারণেই মহৎ কবির ভাষ্যে ধরা পড়ে 'শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি!/ পুরুষ গড়েছে তোমারে সৌন্দর্য সঞ্চারী।' পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতা যতটা না নারীকে সৃষ্টি করেছে; তার চেয়ে বেশি সৃষ্টি করেছে পুরুষ। নানা শব্দে নারীকে শনাক্ত করেছে, নানা সংজ্ঞায় নারীকে সংজ্ঞায়িত করেছে (হুমায়ুন,২০১৪ : ৫-৭)। পিতৃতান্ত্রিক সভ্যতার প্রথম শাসকশ্রেণি পুরুষ, প্রথম শোষিত শ্রেণি নারী। পৃথিবীতে শুধু নারীই শোষিত শ্রেণি নয়; পুরুষও শোষিত। তবে নারী আর পুরুষের শোষণের মধ্যেই রয়েছে বিস্তর ব্যবধান। সব শ্রেণির পুরুষ শোষিত নয়, তবে সব শ্রেণির নারীই শোষিত। নারীর শোষণের ক্ষেত্রে বুর্জোয়া আর সর্বহারায় কোনো পার্থক্য থাকে না। পুরুষের বেলায় সর্বহারা পুরুষ শোষিত হলেও সর্বহারা নারীকে শোষণে তার কোনো দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় না। স্মর্তব্য সভ্যতার উষালগ্নের প্রেক্ষিতটা ছিল অন্যরকম।

২.১

শোষণের বহুমাত্রিকতায় নারীর রয়েছে কতকগুলো রূপ; যেখানে নারী কন্যা, মাতা ও স্ত্রীর ভূমিকার সুদক্ষ অভিনেতা। পুরুষতন্ত্র বা পুরুষ নারীকে এই সব পদে দেখতে চায়; তাকে হতে হবে সুকন্যা,

সুমাতা ও সুগৃহিণী। সমাজ তাকে শিখিয়েছে দেবী, শাশ্বতী, কল্যাণী ও গৃহলক্ষ্মী হতে। সতীত্বের ধোয়া তুলে গৃহেবন্দি করেছে নারীকে, সতীত্বের গৌরবকে জীবনের মুকুট করে তুলেছে। সতীত্বের সুবর্ণরেখায় জীবনের সুন্দরের অনুভবকে সংকীর্ণ করে, মাংসল পুতুল রূপে নারী পুরুষের জীবনকে করেছে নির্ভাবনাময়; নিজেকে করেছে 'চিরন্তনী দাসী'। নারীর কোনো শ্রেণিগত পরিচয় হয় না; নারীর সবচেয়ে বড় পরিচয় সে নারী। সে বিশেষ কতকগুলো দৈহিক বৈশিষ্ট্য বহন করে, যা তাকে পুরুষ নামক আদিম শ্রেষ্ঠ প্রাণী থেকে আলাদা করে তুলেছে। নারীরশোষণে বুর্জোয়া ও সর্বহারার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই; বুর্জোয়া পুরুষ শুধু সর্বহারা শ্রেণিটিকেই শোষণ করে না, শোষণ করে তার নিজের শ্রেণির নারীকেও। আবার সর্বহারা পুরুষ নিজে শোষিত হয়েও অন্যকে শোষণ করতে দ্বিধা করে না, সে শোষণ করে নিজের শ্রেণির নারীকে। বিত্তবান শ্রেণির নারীর অবস্থান পরগাছারও পরগাছা আর বিত্তহীন শ্রেণির নারী দাসেরও দাসী। নারীমাত্রই দ্বিগুণভাবে শোষিত নির্যাতিত। নির্দিষ্ট কোনো শ্রেণি নারীর শোষক নয় বলে, বিশেষ কোনো সামাজিক বিপ্লবে নারীর মুক্তি ঘটে না বা ঘটেনি। ফরাসি বিপ্লব ভুলে যায় মানুষ রূপে নারীর মুক্তি দিতে, তাই সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার মর্মবাণী শুধু প্রযোজ্য হয়ে ওঠে পুরুষের জন্য। রুশ বিপ্লবও কিছুদিনের ব্যবধানে পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভুলে নারীকে জড়ালো পুরুষতন্ত্রের শেকলে। সভ্যতার ইতিহাসে এখন পর্যন্ত নারীই বিশুদ্ধ শোষিত ও সর্বহারা (হুমায়ুন, ২০১৪ : ১৪)। তবে নারীও একদিন এই মানবজাতিকে নেতৃত্ব দিয়েছে। সভ্যতার চূড়ায় দাঁড়িয়ে যে পুরুষ বা পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা নারীকে অন্ধকারে আবদ্ধ রাখার ষড়যন্ত্র করে চলেছে; সেই সভ্যতার আলোকবর্তিকা প্রজ্বলিত হয়েছিল নারীর হাত দিয়ে। যেখানে নারী ছিল সমাজে ও পরিবারের নেতা, নারীর পরিচয়ে সন্তান পরিচিত হতো, নারীর নেতৃত্বে শিকারে যেত পুরুষ।

> মাতৃকেন্দ্রিক সমাজে সকলে মিলিয়া উৎপাদন করিত। পুরুষেরা একত্রে মাছ ধরায় যাইত। মেয়েরা সকলের সমবেত শ্রম দ্বারা চাষ করিত, জমি তৈয়ার করিত, বীজ বুনিত এবং ফসল কাটিত। যে খাদ্য তৈয়ার হইত তাহা সকলে মিলিয়া খাইত। (রেবতী, ২০১৭ : ১৬)

সমাজব্যবস্থার শুরুতে সৃষ্টিশীলতা ছিল শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড। যেখানে নারীই ছিল এগিয়ে কারণ নারী উৎপাদন করে বিনাশশীল মানুষকে। নারী মনুষ্য জাতিকে পুনরুৎপাদন করে সভ্যতার চাকাকে বেগবান করেছিল; তাই নারীর কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব দুই-ই বিরাজমান ছিল। সেই সঙ্গে পরিবারগুলো পরিচিত হতো মায়ের নাম অনুসারে। মায়ের নেতৃত্বে শিকার ও অন্যান্য কার্যাবলি পরিচালিত হতো। কৃষিকাজেও নারীই ছিল অগ্রগামী ভূমিকার পথচারী। উদ্বৃত্ত সম্পদ সমাজে অসমতার সৃষ্টি করেছিল। পরিবারগুলোর মধ্যে উদ্বৃত্ত সম্পদ সঞ্চয়ের প্রলোভন দেখা দিল, কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রবণতা লক্ষণীয় আকারে বাড়তে থাকে। তার সঙ্গে বাড়তে থাকে অসমতা ও শোষণ, আদিম সমাজের সাম্যবাদের

ভিত ধসে পড়ে, গড়ে ওঠে শ্রেণিবিভাজনের নতুন সমাজ। আর বাড়তে থাকে নারীর অধীনতার ষড়যন্ত্র।

২.২

আধিপত্য ও অধীনতার স্থবিরতায় নির্মিত মানুষের যাত্রা অপ্রতিরোধ্য। নারী ও নিম্নবর্গ দুটির দাসত্বের পরিণাম ও পরিধি একই সুতায় বাঁধা। শ্রেণিভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় নারী সব সময় অবদমনের শিকার। সামগ্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী-পুরুষের সম্পর্ক আধিপত্য ও অধীনতার। নিম্নবর্গের আর্থ-সামাজিক শোষণের পথ ধরে নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। নারীর প্রতি সমাজের বৈষম্য দুই প্রকার- প্রথমত, নারী যেখানে সে লৈঙ্গিক বৈষম্যের শিকার ; দ্বিতীয়ত সে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে সে দুর্বল, কারণ এ ক্ষেত্রে সে পুরুষের উপর নির্ভরশীল। দ্বৈত দুর্বলতা বা শোষণের মধ্য দিয়ে নারী পড়ে থাকে সার্বিক শোষণের জাঁতাকলে। গবেষক গায়ত্রী চক্রবর্তীর মতানুসারে :

> পুরুষ শাসিত সমাজে সব নারীই এক অর্থে নিম্নবর্গ। তাই বলে নারীর কোনও শ্রেণীগত, জাতিগত ও সম্প্রদায়গত পরিচয় নেই, এও সত্য নয়। সুতরাং নিম্নবর্গের নির্মাণ দেখতে হলে পুরুষশাসিত সমাজে নারীর অধীনতাও যেমন বিশ্লেষণের বিষয়, তেমনি অন্যান্য ক্ষমতার সম্পর্ক, যেমন শ্রেণী, জাতি, সম্প্রদায়, ইত্যাদি কীভাবে সেই নিম্নবর্গীয় নারীর নির্মাণটিকে আরও জটিল করে তোলে, তাও বিশেষ গবেষণার বিষয়। (গায়ত্রী, ২০১৫ : ২০)

ঔপনিবেশিক শাসনের সঙ্গে জাতিগত বৈষম্য যেমনভাবে জড়িত, তেমনিভাবে শ্রেণিগত ও লিঙ্গগত বৈষম্য জড়িত। সবগুলো বৈষম্যের সঙ্গে নারীর প্রতি যোগ হওয়া লিঙ্গগত বৈষম্য আর একটি বড় শোষণ। নিম্নবর্গের তাত্ত্বিকদের মধ্যে অন্যতম গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের অন্যতম তত্ত্ব 'can the subaltern speak?'। তাঁর আলোচনার অন্যতম আলোচিত ধারণা 'অপর' ধারণা। এই প্রবন্ধে স্পিভাক নারীবাদী বক্তব্যকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন, তিনি তৃতীয় বিশ্বের নারীর সংগ্রাম ও নিপীড়নের ওপর আলোকপাত করেছিলেন। তত্ত্ব হিসেবে নারীবাদকে বিশ্বব্যাপী সকল নারীর মতামত ও আশার আলোক বিবেচনা করতে পারেন না। কারণ সর্বত্র আঞ্চলিক গঠনগত ও ইতিহাসের গঠনগত একটি ভূমিকা রয়েছে, যা আরো বিশদভাবে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। নারীবাদের ওপর স্পিভাকের লেখাটি সাধারণভাবে নারীবাদের মৌলিক ধারণার কিছুটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে একটি আইকনক্লাস্টিক প্রভাব ছিল। সব নারীই এক নয়, শ্রেণি ও ধর্মের মধ্যেও বিদ্যমান রয়েছে বহুবৈচিত্র্য ইউরোপীয় নারীদের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষাগুলো এশিয়ার নারীদের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ ইউরোপীয় নারীরা তাদের পিতৃপুরুষের কর্তৃত্ব থেকে অনেকাংশে স্বাধীন বা মুক্ত। যেখানে এশিয়া নারী বা তৃতীয়

বিশ্বের দেশগুলোর নারী ইউরোপীয় নারীদের সমমর্যাদা লাভের জন্য সংগ্রাম করছে। সার্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য নারীর লৈঙ্গিক সমতা প্রতিষ্ঠিত করা কঠিন। স্পিভাক নারীবাদের বিরুদ্ধে নয়, তবে তার অস্ত্রোপচার ছিল সামন্তবাদের বিরুদ্ধে। তিনি এই বিষয়টি পুনর্ব্যক্ত করেন যে নারীর মধ্যে জাতি, শ্রেণি, ধর্ম, নাগরিকত্ব এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। (Gayatri, ১৯৯৯ : ২৪০-২৪২)। নারীবাদের দৃষ্টিতে নারী হলো সেই উপনিবেশ, যেখানে আধিপত্য বিস্তার করে পুরুষ। সেখানে নারী শুধু যৌন অনুষঙ্গ আর সন্তান উৎপাদনের আদি-অকৃত্রিম স্থান-কাল-পাত্র। ঔপনিবেশিক শোষণের প্রক্রিয়াজাত সংস্কৃতি নারীকে আরো অধিক মাত্রায় ভোগ্য পণ্য করে তোলে। বিশ্বায়নের প্রসার বহুজাতিক পণ্যের সম্ভার নারীকে পণ্য করেছে। বিশ্বের সব ঔপনিবেশিক জাতির একটি নিম্নবর্গীয় পরিচয় রয়েছে। বিশ্বায়নের নামে ঔপনিবেশিকের সংস্কৃতির অধীনে নারী যৌনতার মন্দীভূত রূপে বন্দি। কারণ যৌনতার বোধ কখনও শরীরকে বাদ দিয়ে হতে পারে না; শরীরের উপস্থাপনা সর্বদাই সেই সব সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করে, যা পুরুষপ্রধান সমাজ তৈরি করে। ঔপনিবেশিকতা জাতিগত, অর্থনীতিগত যে বৈষম্য সৃষ্টি করে, তা-ই লৈঙ্গিক বৈষম্যকে প্রকটিত করে তোলে।

গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের ‘can the subaltern speak?’ প্রবন্ধে উত্তর-ঔপনিবেশিক জ্ঞানচর্চার দ্বারা প্রভাবিত অপরতাবোধের আলোকে ভারতীয় উপমহাদেশের নিম্নবর্গের নারীর অন্তর্জালকে উদ্ভাসনের চেষ্টা করেছেন। নারীবাদী দৃষ্টিকোণের বহুমাত্রিক তাৎপর্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করার মাধ্যমে নিজের স্পষ্ট অভিব্যক্তি উত্থাপন করেছেন। যখন নিম্নবর্গের মানুষ তার নিজস্ব অস্তিত্বের সম্পূর্ণ জাগরণের প্রমাণ দিতে অক্ষম, তখন নারী বা নিম্নবর্গের নারীর অবচেতনা বা অসমর্থতা নিম্নরূপ :

> The question is not of female participation in insurgency, or the ground rules of the sexual division of labour, for both of which there is `evidence'. It is, rather, that, both as object of colonialist historigraphy and as subject of insurgency, the ideological construction of gender keeps the male dominant. If, in the context of colonial production, the subaltern has no history and cannot speak, the subaltern as female is even more deeply in shadow... (Gayatri,1999:210)

সামগ্রিক অর্থে নারীর অধীনতা আরও বিশেষ অর্থে নিম্নবর্গীয় নারীর অধীনতার পরস্পর সম্পর্কিত হলেও যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তাহলো পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজন। এর মধ্য দিয়ে নারী-পুরুষের অসম বণ্টনব্যবস্থার প্রথা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। নারীর শ্রমকে নিয়ন্ত্রণ করার মধ্য দিয়ে নারীকে অবদমনের সামাজিক প্রক্রিয়াকে সচল করে রাখার সিদ্ধান্ত। কারণ

যেকোনো পরিবারে ক্ষমতাকাঠামোর শীর্ষে অবস্থান করে পুরুষ। একজন পুরুষ তার আধিপত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে নারীর শ্রমকে অবমূল্যায়ন করতে শুরু করেন। যাকে সমাজ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে পুরুষের আধিপত্যবাদী মানসিকতাকেও প্রতিষ্ঠিত করে চলেছে। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারব্যবস্থায় নারী পুরুষের অধীনতা মেনে নেয় দুটি কারণে। প্রথমত, যুগ যুগ ধরে চলে আসা এই ভাবধারা সমাজ ও পরিবারে নারীদের উপরের শোষণকে কায়েম করে চলেছে, সেই ধারাবাহিকতায় যেকোনো মূল্যে তাকে প্রতিষ্ঠিত করা ও সচল রাখার প্রয়াস চালিয়ে এসেছে। দ্বিতীয়ত, পিতৃতন্ত্রের সঙ্গে দীর্ঘদিনের বসবাস সেটাকে নিয়ম বলে মেনে নিয়েছে এবং সেই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটলে সমাজ তাকে কঠোর শাস্তির ভয় দেখিয়ে রাখে। এভাবেই পিতৃতন্ত্রের মধ্য দিয়ে সমাজে পুরুষতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পেয়ে চলেছে। তাই পিতৃতন্ত্রকে পুরুষতন্ত্রের নামান্তরও বলা চলে। পিতৃতন্ত্রের উদ্দেশ্য হলো শ্রমবিভাজনের বৈষম্যকে অস্তিত্বমান রেখে নারীর শ্রমকে নিয়ন্ত্রণাধীন রাখা। লিঙ্গভিত্তিক শ্রমব্যবস্থায় পুরুষের নিজের কাজ সম্পর্কে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা থাকলেও, নারীর জন্য তা একান্তই অনুপযোগী। নিম্নবর্গের নারীর অবস্থা ও শ্রমমর্যাদা নিয়ে আলোচনার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। তারা গৃহশ্রমের বাইরেও পারিবারিক প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের অর্থনির্ভর শ্রমসাধ্য কাজেও জড়িত থাকেন। কৃষিসংশ্লিষ্ট কাজ ছাড়াও পারিবারিক আর্থিক সংকট মোচনের জন্য ঘরে বসে নানা ধরনের অসংগঠিত শিল্পের কাজ করে থাকেন। এই সমস্ত কাজে নিম্নবর্গের নারীর নিজস্ব আর্থিক সংকটের সিদ্ধি হয় না, তারপরও সে সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থনীতিতে একটি স্থায়ী অবদান রেখে চলে। নারীর উপার্জিত অর্থে নারীর নিজের কোনো অধিকার থাকে না।

উচ্চবর্গের তুলনায় নিম্নবর্গের নারীর অধীনস্থতার রূপটি প্রকট হয়ে দেখা দেয়। তাদের ওপর স্বামীর কর্তৃত্ব ও খবরদারিত্ব বেশি থাকে। অথচ তারা গৃহকর্ম ছাড়াও আর্থিক দায়িত্বে পুরুষের সাথে সমভাবে বা প্রয়োজনে অনেক বেশি দায়িত্ব বহন করে থাকে। পরিবারে তাদের দুটি ভূমিকা পালন করতে হয়। মা হয়ে সন্তানের জন্মদান থেকে লালন-পালনের সমস্ত দায়িত্ব; আর স্ত্রী রূপে গৃহশ্রম -সম্পর্কিত সমস্ত কাজ সম্পাদন পাশাপাশি স্বামীর কাজে সহযোগিতা। আবার কখনও নিম্নবিত্তের স্বামীটি সম্পূর্ণ বেকার হয়ে পড়লে একমাত্র স্ত্রীর আয়ে সংসার চলে। তা সত্ত্বেও কোনো ক্ষেত্রে অন্যথা ঘটলে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, এমনকি প্রহারও চলে। আবার কোনো ক্ষেত্রে পুত্র সন্তান না হওয়ার কারণেও নারীকে স্বামী কর্তৃক নিয়মিত প্রহৃত হতে হয়। সময়ের পরিবর্তনে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিসরের বিস্তর পরিবর্তন ঘটলে নিম্নবর্গের নারীর জীবনে তার ছোঁয়া কমই পড়েছে। পুরোনো ধাঁচের পুরুষতান্ত্রিক ভাবাদর্শের পরিবার প্রথায় বিশেষ পরিবর্তন আসেনি। আজও নিম্নবর্গের পরিবারগুলোতে খাদ্য, পুষ্টি ও চিকিৎসার ক্ষেত্রেও রয়েছে বৈষম্যের প্রসার :

> পরিবারের পুরুষেরা মেয়েদের কাছ থেকে সর্বদাই অসম শ্রম আদায় আদায় করে নেন। অথচ; পরিবারে খাদ্য, পুষ্টি ও চিকিৎসার সব সুযোগ নেন তারাই বেশি করে। এইভাবে পরিবারে তৈরি হয়েছে মহিলাদের জন্য ভীষণ অসম অবস্থান। সাবেকি পরিবারগুলো একদিকে নিবিড় মমতা, অন্যদিকে শোষণের এক বিরাট মিশ্রণ। এই বৈষম্য শিশুকাল থেকে শুরু হয় এবং এই কারণেই শিশুদের মধ্যে কন্যাশিশুর মৃত্যুহারও বেশি থাকে। নিম্নবর্গের পরিবারে প্রতিদিন খাদ্যের অভাবের কারণে মেয়েরাই খাদ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ায় অপুষ্টিতে ভোগে। (অমল, ২০১৩ : ৩৩)

ঔপনিবেশিক শাসনের হাত ধরে ধনতান্ত্রিক যে অর্থনীতির বিকাশ ঘটেছিল, সেখানে অবসান ঘটেছিল গ্রামীণ-সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার। অবশিল্পায়নের ধাক্কায় গ্রামের কৃষি অর্থনীতির উপর একটা প্রচণ্ড চাপ এসে পড়েছিল। যার ফলে কৃষি অর্থনীতি বা কৃষিশ্রমের সাথে নিম্নবর্গের নারীর সরাসরি যোগাযোগ ঘটে। তারা কৃষিকাজসহ অন্যান্য কাজের মধ্য দিয়ে পরিবারের আর্থিক দায়িত্ব অর্ধেক বহন করতে শুরু করেন। তবে সব শ্রেণির নারীর শ্রমের সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র গৃহশ্রম। জাতীয় অর্থনীতিতে নারীদের গৃহশ্রম একটি উপেক্ষিত বিষয়, কারণ এই শ্রম বেতন বা মজুরিভিত্তিক নয়। আর এই কারণেই তা অনুৎপাদিত শ্রম। এই শ্রমের কোনো পেশাদারিত্বের স্বীকৃতি নেই, নেই কোনো সময়সীমার বাধ্যবাধকতা। নারীর গৃহশ্রম নিয়ে গত শতকের মাঝামাঝি সময় নয়া-ধ্রুপদী অর্থনীতির প্রভাবে উদার অর্থনীতিবিদ গ্যারি বেকার 'নয়া গৃহস্থালি অর্থনীতির' ধারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে, পরিবারে হচ্ছে একটি সৌহার্দ্যমূলক দরদি প্রতিষ্ঠান, যা পরিবারের সদস্যদের ভালোবাসার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। প্রতিটি পরিবারের লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজন পুরুষ - নারীর স্ব স্ব ক্ষেত্রে দক্ষতার ভিত্তিতে নির্মিত হয় (অমল, ২০১৩ :৩০-৩৪)। বেকারের এ প্রসঙ্গে আরো বলেছেন, শ্রমবাজারে পুরুষ স্বাধীনভাবে পেশা বেছে নেন, অর্থ উপার্জনের আশায় তারা বাইরের কাজে শ্রম ও সময় দেয়। অন্যদিকে নারী প্রতিযোগিতাপূর্ণ শ্রমবাজারে কাজ করার পরিবর্তে গৃহশ্রম ও সন্তান লালন -পালনের দায়িত্বকে গ্রহণ করে।

২.৩

ধ্রুপদী মার্কসবাদ নারীমুক্তি নিয়ে উচ্চকিত হলেও পরিবারের মধ্যে নারী-পুরুষের সম্পর্কের অসমতা এবং নারীকে অবদমনের বিষয় নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কোনো রূপরেখা দেখা দেয়নি। সমাজে নারীর অবস্থা ও লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের মধ্যে নারীকে অবদমনের পরিসরে নারীর কাঙ্ক্ষিত মুক্তির পথ কোথায়? আসলে মার্কসের সামগ্রিক তাত্ত্বিক পরিকাঠামোর মধ্যে নারীর সমস্যার কথা আসলেও, লিঙ্গভিত্তিক বিশ্লেষণ কখনই মার্কসের অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে ওঠেনি। ধ্রুপদী মার্কসবাদ অর্থনীতিকে ভিত্তি করে সমাজ রাজনীতি প্রভৃতিকে উপরিকাঠামো হিসেবে ধরা হয়। ফলে শ্রেণির অর্থনৈতিক মুক্তি ঘটলে

অন্যসব শোষণের অবসান ঘটবে বলে ধারণা করা হয়েছিল। তাই আলাদাভাবে পিতৃতন্ত্র বা পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা আসেনি। পুঁজিবাদী শোষণের অবসান ঘটলে, উৎপাদনব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটলে নারীর মুক্তি ঘটবে বলে ধরেই নেয়া হয়েছিল। মার্কসিস্টদের মধ্যে এঙ্গেলসই প্রথম উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্ককে মিলিয়ে দেখেছিলেন। পরবর্তী সময়ে আগস্ট বেবেল তাঁর Woman in socialism -এ পিতৃতন্ত্রের অস্তিত্বকে স্বীকার করে বলেছেন শ্রমিক নারী স্বাধীন নয়। কিন্তু তিনিও ধ্রুপদী মার্কসবাদ অনুসরণ করে বলেছিলেন, শ্রেণির মুক্তি ঘটলে নারীর মুক্তি ঘটবে।

সমাজতন্ত্রী নারীবাদীগণ পরিবার ও গৃহশ্রমের তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। তাঁরা এর সমাধান হিসেবে দ্বৈতব্যবস্থার কথা বলেছেন, যার মধ্যে নারীর গৃহশ্রমকে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব। যদিও ধ্রুপদী মার্কসবাদে নারীর গৃহশ্রমের কোনো মূল্য নেই। কারণ তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বস্তুবাদ, শ্রেণিদ্বন্দ্ব, শোষণের বিষয়গুলো শুধু গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়েছে। সেখানে নারীর গৃহশ্রমের কোনো অর্থনৈতিক উপযোগিতা ব্যাখ্যা করা হয়নি। নারীর গৃহশ্রমকে অনুৎপাদনমূলক কাজ বিবেচনা করে তাকে অকর্মের পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। একটি পরিবারে নারীর ভূমিকা দ্বিবিধ, একদিকে উৎপাদকের, অন্যদিকে সেবামূলক। উৎপাদকের ভূমিকা যুক্তিগ্রাহ্য হলেও সেবামূলক ভূমিকাটি সাংঘাতিকভাবে অবমূল্যায়ন করা হয়। এর পক্ষে যুক্তি দেখানো হয় যে সেবামূলক কর্মপ্রক্রিয়াকে অর্থনীতির পরিভাষায় যথার্থরূপে মূল্যায়ন করা দুরূহ। এর উপর অর্থনৈতিক মূল্য আরোপ করাও কঠিন। তারপরও নারীর গৃহশ্রমকে অকর্মের পর্যায়ভুক্ত করাও যথোচিত নয়।

> পেশাজীবী নারীরা আসলে নিযুক্ত থাকে দুটি পেশায়;– তাদের ঘরসংসার দেখতে ও সন্তান পালন করতে হয়, আর পালন করতে হয় পেশার দায়িত্ব। পেশাকে তারা পুরোপুরি পেশা হিশেবে নিতে পারে না, পরিবারই হয়ে থাকে তাদের মূলপেশা। (হুমায়ুন, ২০১৩ : ৩৫)

যেসব অর্থনীতিবিদ লৈঙ্গিক বৈষম্য নিয়ে কাজ করেন, তারা নারীর গৃহশ্রমের আরোপিত মূল্য নির্ধারণ করতে পারেন। পেশাদার গৃহপরিচারকের পারিশ্রমিক নিরূপণ করলে একজন নারী চব্বিশ ঘণ্টায় কী ধরনের সেবামূলক শ্রম দিয়ে থাকেন তার আর্থিক মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব হবে। নারীর আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির সবচেয়ে গঠনমূলক ইতিহাস হলো আদমশুমারি। এই প্রতিবেদনে প্রকাশিত তথ্যে নারীর সমাজ, অর্থনীতি এবং রাজনীতিতে ভূমিকার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়। মোট জনসংখ্যার কত ভাগ নারী, কত ভাগ নারী কর্মরত, কত ভাগ গৃহিণী; নারীর শিক্ষার হার, রাজনীতিতে অংশগ্রহণের হার, ভোটাধিকার ও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে

যাবতীয় তথ্যাদি রাষ্ট্রীয়ভাবে নারীর অবস্থা ও অবস্থানকে নির্দেশ করে। সবচেয়ে বড় কথা, আদমশুমারির তথ্যে নারীর শ্রমের একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিচ্ছবি থাকে না। কারণ নারীর গৃহশ্রমকে অর্থনীতি বা পরিসংখ্যান জরিপে কোনো মূল্য ধারণ করা হয় না। তবে নারীর ইতিহাসের ধারার একটি বড় সূত্র সাহিত্য। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর অবস্থান যে একেবারে প্রান্তে, সেই সম্পর্কে কোনো সন্দিহান নেই। বিভিন্ন যুগের সাহিত্যে রয়েছে নারীর অবস্থা ও অবদমনের জীবন্ত প্রতিবেদন। প্রত্যেকটি জীবই পরিপূর্ণভাবে জীবনকে ভোগ করতে চায়; জীবনের বিচিত্র আস্বাদনের মধ্য দিয়ে জীবনকে জয় করে চলার ক্রমাগ্রসর পরিণতি পূর্ণতা পায়। জীবনাকাঙ্ক্ষায় নারীও এক পূর্ণ সত্তা নিয়ে সভ্যতার ইতিহাসে যাত্রা শুরু করেছিল। শিকারি যুগের যৌথ সমাজভাবনায় নারী-পুরুষ একে অপরের সহচর হিসেবে খাদ্য সংগ্রহ করেছে, জীবন ধারণ করেছে, সংকট মোকাবেলা করেছে। সহযোদ্ধা সহযাত্রী নারীকে পুরুষ তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিতে সব ধরনের অবদমনে বাধ্য করেছে।

> পুরুষ অধিপতি, নারী তাই নির্যাতিত। যখন আদর পায় তখন অধীনেই থাকে, এবং অর্জনের মাপকাঠিটা পুরুষ ঠিক করে দেয়। নারীর বিশ্ব-ঐতিহাসিক পরাজয়ের পর তার পক্ষে সামনে এগিয়ে যাওয়া কঠিন হয়েছে; সভ্যতার অগ্রসর হয়েছে কিন্তু নারী-পুরুষের বৈষম্য ঘোচেনি, অনেক সমাজে বরঞ্চ বৃদ্ধি পেয়েছে। (সিরাজুল, ২০০৮ : ৩৩)

ভারতীয় প্রেক্ষিতের বৈদিক যুগের সূচনাকালে নারীর স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা ছিল। আর্যদের আগমন প্রাগার্যদের সভ্যতায় অনেকগুলো পরিবর্তন এনেছিল, তার মধ্যে নারীর অধিকার বিলুপ্তি অন্যতম। যাযাবর মানুষ যখন কৃষিসভ্যতার বিস্তার ঘটাল, তখন পেশিশক্তির বিস্তার ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা প্রতিষ্ঠা হলো। সভ্যতার এতসব অর্জনের মধ্যে নারী তার পরিবারে ও সমাজে নিজের অধিকার ও স্বাতন্ত্র্য হারাল। নারীর অবরুদ্ধতায় ধর্মের একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। এ কথা প্রমাণিত ইতিহাসের মতো সত্য যে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্ম ও শাস্ত্রীয় অনুশাসনের আধিপত্য প্রবল।

২.৪

কৌম সমাজ ভেঙে কৃষিভিত্তিক সমাজ গড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে ক্রমে সমাজে নারীর স্থান অবনমন হতে থাকে। ‘উৎপাদনব্যবস্থায় নারীর অংশ ক্রমেই কমে যাচ্ছিল, যদিও গৃহকর্মে তার পরিশ্রম ও দায়িত্ব যথেষ্টই ছিল, তবু তাকে ‘ভার্যা’ অর্থাৎ অন্যের দ্বারা ভরণীয়া, স্বামীর অন্নে প্রতিপালিত এই সংজ্ঞা দেওয়া হল।’ (সুকুমারী, ১৪২৪ : ২৮) বৈদিক যুগের শেষের দিকে বৈদেশিক আক্রমণের শঙ্কা বাড়তে থাকলে নারীর অপহরণ ও বর্ণসংকরের শঙ্কাও বাড়তে থাকে, স্বজাতিত্বের পরিশুদ্ধতা রক্ষায় নারীকে আরো বেশি গৃহকোণে ঠেলে পাঠানো হলো। এভাবে সমাজ পরিবর্তনের ক্রমস্তরে নারীর

অবরুদ্ধতার দেয়াল বাড়তে থাকে। ঘরে বাইরে যখন যেখানে সংকট দেখা দিয়েছে, সেখানেই মূল্য দিতে হয়েছে নারীকে; যেমনটা দিতে হয়েছিল শূদ্র বা প্রান্তিককে। শ্রেণিগত অবদমনের প্রসারে নারীর অবস্থান পৌঁছেছে নিম্নবর্গ বা প্রান্তিকের কাতারে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বলে শিক্ষায় নারীর অধিকার শাস্ত্র স্বীকার করেনি; যার ফলে ধীরে ধীরে নারী প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অধিকার হারালো। গৃহকর্মই নারীর একান্ত করণীয় হয়ে উঠল; সংকুচিত হয়ে এলো বাইরের জগতের সঙ্গে নারীর যোগাযোগ। নারীর কর্তব্য স্থির করা হলো পুরুষের অনুবর্তিনী হয়ে ওঠা। মনুসংহিতায় এক জায়গায় বলা হয়েছে নারীর পক্ষে বিবাহই হলো উপনয়ন, পতিসেবা বেদাধ্যয়ন এবং পতিগৃহে বাসই গুরুগৃহে বাস। এ কথা থেকে প্রমাণিত হয় যে বিবাহ, স্বামী-সন্তান ও শ্বশুরালয়ে সকলের পরিচর্যায় নারীর বিদ্যাশিক্ষার বিকল্প কার্য। শিক্ষার কোনো অধিকার না থাকায় স্বাধীন কোনো বৃত্তির অধিকারও তার ছিল না, যার ফলে কোনো না কোনো পুরুষের উপরে একান্ত নির্ভরশীল থাকতে বাধ্য হতো তারা। তাই বৈদিক ধর্মসূত্র থেকে শুরু করে মহাভারত পর্যন্ত সর্বত্র একটি শ্লোক বারবার শোনা যায়; কৌমার্যে পিতা, যৌবনে স্বামী ও বার্ধক্যে পুত্ররা তাকে রক্ষা করবে। অর্থাৎ নারী স্বাধীনতার যোগ্য নয়। অতএব সে 'ভার্যা' অর্থাৎ ভরণীয়া, স্বামী ভর্তা অর্থাৎ ভরণকারী। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে ভূ-ধাতু থেকে ঐ অর্থেই নিষ্পন্ন হয়েছে ভৃত্য শব্দটি। (সুকুমারী, ১৪২৪ : ৪) পাশ্চাত্যও প্রভুত্বের ধারণায় পিছিয়ে নয়, ষোড়শ-সপ্তদশ শতক পর্যন্ত স্ত্রী স্বামীকে লর্ড বলে সম্বোধন করে এসেছে। আবার ভৃত্যও তার প্রভুকে লর্ড বলে সম্বোধন করত, লর্ড শব্দের ব্যুৎপত্তি হলো রুটির জন্য সে কারো অধীনস্থ। নারীর ইতিহাসে শোষণের রোষানলের পার্থক্য প্রাচ্য-পাশ্চাত্যে বড় কোনো ব্যবধান দৃষ্টিগোচর হয় না। বেদ থেকে মহাকাব্যের যুগ পর্যন্ত নারীকে শুধু বধূ আর জননী রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। বিবাহিত নারী ছাড়া নারীর অন্য কোনো অস্তিত্বকে সামাজিকভাবে স্বীকার করা হয়নি। নারী যেন অজন্মা সন্তানের উৎপাদন ও উৎকর্ষে নিয়োজিত এক প্রাণী; এর বাইরে অস্তিত্বশূন্য এক মানবসত্তা। শুধু পুরুষের সংস্পর্শই নারীকে পূর্ণ মানবরূপে দেখতে সমাজকে অভ্যস্ত করে তোলে। কারণ নারীর সভায় যাবার অধিকার নেই, নেই কোনো শিক্ষা পাবার ও অর্থ অর্জন করার, এমনকি নিজের দেহটিকেও অবাঞ্ছিত সম্ভোগ থেকে রক্ষা করার অধিকারও নেই। তবে একমাত্র গণিকার অধিকার ছিল শিক্ষা গ্রহণের; এবং সেই ছিল প্রাচীন ভারতের স্বাধীন নারী। কুলবধূকে শিক্ষা থেকে সর্বতোভাবে বঞ্চিত করে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে গণিকাকে সর্ববিদ্যায় পারদর্শী করে তোলা হতো। কারণ দেশের সব পুরুষের শিক্ষিতা নারীর সান্নিধ্য পাবার অধিকার ছিল; আর রাষ্ট্রীয় অর্থে তার ব্যবস্থা করা হতো। এভাবে ঐ সমাজ কুলনারীর প্রতি চূড়ান্ত অপমানের ব্যবস্থা করেছিল। (সুকুমারী, ১৪২৪ : ৩৬-৩৭) এরূপে প্রাচীন ভারতীয় সমাজবিধি নারীকে মানুষ থেকে ভোগ্যবস্তুতে পরিণত করেছে; আর শাস্ত্র এই

বিধানকে মেনে বৈধতা দিয়েছে। সমাজে নারীর শোষণ ঘটে থাকে বহুমাত্রিক উপায়ে; পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক রাষ্ট্রিক-নানা স্তরে অবদমনের নানা চিহ্ন বিরাজমান। সভ্য পুরুষরূপী মানুষ নারীকে বন্দি করতে, পিছিয়ে রাখতে শোষণের যত অন্তর্জাল তৈরি করেছে। বন্ধুবিহীন এই পথে নারীও অনেক সময় নারীর বন্ধু হয়ে উঠতে পারেনি। কারণ শিক্ষাবিহীন অন্ধ দৃষ্টি নারীর দৃষ্টিকে প্রসারিত হতে দেয়নি।

> বাঙালির আদি ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গিয়ে নীহাররঞ্জন রায় লক্ষ্য করেছেন পাল ও সেন আমলের লিপিগুলো এই ধারণা দেয় যে 'লক্ষ্মীর মতো কল্যাণী, বসুধার মতো সর্বংসহা, স্বামী ব্রতনিয়তা নারীই ছিল নারীর চিত্তাদর্শ।' অনুমান করা যায় স্বামীর ইচ্ছার এই যে চাপ তা স্বামীর একার নয়, তা ছিল গোটা ব্যবস্থার। (সিরাজুল, ২০০৮ : ৩৫)

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে একটি কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর নানা সামাজিক-রাষ্ট্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাকে ভবিষ্যৎ দিনের নারীরূপে গড়ে তোলা হয়। এই পদ্ধতির মধ্যে নিহিত থাকে সামাজিক বঞ্চনা ও বৈষম্যের সচিত্র বিন্যাস।

২.৫

শ্রেণিবিভক্ত সমাজে বর্ণশ্রমভিত্তিক নিম্নবর্গের মানুষ আর নারী একই দলভুক্ত মানুষ। সেই বিবেচনায় অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে মূল্যায়িত নিম্নবর্গের নারীর অবস্থান সর্বাপেক্ষা নাজুক। একদিক থেকে যে নারী, অন্য দৃষ্টিতে সে নিম্নবর্গ; অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক বৈষম্যে সে সর্বাপেক্ষা নিপীড়িত ও নির্যাতিত। নিম্নবর্গের নারীর ক্ষেত্রে তথাকথিত উচ্চবর্গের পদপিষ্ট সুলভ আচরণ সর্বক্ষেত্রে; সামাজিক অনুশাসনের পাশাপাশি ধর্মীয় অনুষঙ্গসমূহ সুবিধাবাদী উচ্চবর্গ তাদের নিজেদের অভীপ্সানুযায়ী প্রয়োগ করে থাকে। আসলে, শ্রেণিগত শোষণের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে অর্থনৈতিক পরাভাব; বিশেষ করে ভূমিহীনতা ও দারিদ্র্য। তাই অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা আনয়ন সম্ভব না হলে এই শ্রেণির সামগ্রিক অবস্থার উন্নয়ন কিছুতেই সম্ভব নয়। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব না হলে, আইন প্রণয়ন করেও প্রয়োগ ঘটানো সম্ভব নয়। বিশেষ করে নারীর ক্ষেত্রে এ কথা সবিশেষ প্রযোজ্য। নিম্নবর্গের অনেক ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক বা সামাজিক ন্যায়বিচারের দাবি করাতে চরমভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে থাকে। উচ্চবর্গের নারীর অবস্থা যে খুব সম্মানজনক তেমনটি নয়, তবে উচ্চবর্গের নারীর অর্থনৈতিক অবস্থানের কারণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা থাকে। নিম্নবর্গের নারীর সবচেয়ে বড় সংগ্রাম অর্থনৈতিক অধীনতা, অর্থনৈতিকভাবে নাজুক হওয়ায় সামাজিক ও ধর্মীয় শোষণের প্রকোপ বেড়ে যায়। পাশাপাশি স্বাস্থ্যঝুঁকি ও অপুষ্টির প্রকোপ অনেক বেশি থাকে। ১৯০১

থেকে ১৯৮১-ও মধ্যে ভারতবর্ষে নারী এবং পুরুষের অনুপাত ৯৭.২ শতাংশ থেকে নেমে এসেছে ৯৩.৫ শতাংশে। মেয়েদের এই অধিক মৃত্যুর প্রবণতাটি ভয়ংকর এবং আশ্চর্যজনক। কারণ আধুনিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুহার নারীদের মধ্যেই বেশি হ্রাস পাওয়া স্বাভাবিক ছিল। আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতি এবং জনস্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ যত বেড়েছে, তার বেশির ভাগ সুযোগ নিয়েছে এ দেশের পুরুষ সমাজ। নারী-পুরুষের অবস্থায় চিরাচরিত ফারাক বেড়েছে আরও। স্বাস্থ্যে, জীবনের স্থায়িত্বে, সার্বিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই নারী সমাজের আপেক্ষিক অবস্থার অবনতি হয়েছে। অভিজাত সমাজে অবশ্য এমনটা বেশি ঘটেনি। কিন্তু নিচুতলার মানুষের মধ্যে পুরুষ ও নারীর মৃত্যুহারের এই বিচিত্র অসাম্য উঁচুতলার ঘুম কাড়েনি। (অমর্ত্য, ১৪২২ : ১৫০-১৫২) এর মধ্যে দিয়ে নিম্নবর্গের নারীর অর্থনৈতিক অসাম্যতার চিত্র সুস্পষ্ট। রাজনৈতিক স্বাধীনতা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক বৈষম্যের একটা মারাত্মক ফাঁক থেকে যায়। মাতৃ-মৃত্যুহার বর্তমান সমাজেও অপেক্ষাকৃত বেশি, সামাজিক গবেষণায় এই সব সত্য প্রমাণিত হলেও রাষ্ট্রীয়ভাবে তাকে অস্বীকারের প্রবণতা প্রমাণিত। সমাজব্যবস্থা অপুষ্টি ও অনাহারকে মেনে নেয়, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই অনাহারে মানুষের মৃত্যু না ঘটে এবং যত দিন পর্যন্ত সেই অনাহার নীরব থাকে। সমাজের উঁচুতলার মানুষ বিস্তৃত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ নিচুতলার মানুষের জন্য অসম সমাজ প্রস্তুত। নিচুতলার মানুষেরা দারিদ্র্য ও সামাজিক অসমতার যে বোঝা বয়ে চলেছে, তা ভবিষ্যতেও চলবে। দারিদ্র্য ও অসমতা যখন নাটকীয় আকারে বাড়ে, তখন তার বিরুদ্ধে প্রবলভাবে কাজ করে সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ। তারপরও কত যে অসমতা-নিপীড়ন নীরবে চলে, তার প্রতিকার-প্রতিরোধ ঘটে কমই।

২.৬

নিম্নবর্গ ও নারী একই সুতায় বাঁধা। দাসের কোনো সংস্কৃতি হয় না। তাই বরাবরের মতো নারী ইতিহাসে উপেক্ষিত; তাদের কোনো নিজস্ব ইতিহাস তৈরি হয়নি। সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে নানা যন্ত্রণার ও বৈষম্যের মধ্যে দিয়ে তাদের পাড়ি দিতে হয় জীবনের দীর্ঘ পথ। বৈষম্যের প্রাচীর তুলে বঞ্চিত মানুষগুলোকে ক্রীতদাসে পরিণত করার দীর্ঘ ষড়যন্ত্র পাড়ি দিতে হয়েছে। এই অন্যায্যতা এই অসমতা সভ্যতার অগ্রযাত্রার বোধিমূলে নিহিত রয়েছে। এই ষড়যন্ত্রের বাহক পুরুষ, পুরুষতন্ত্র, পেশিশক্তি, শাস্ত্র ও শাস্ত্রাচার। এই ষড়যন্ত্রে প্রথম শোষিত নারী তারপর অন্যান্য দুর্বল শ্রেণি ও গোষ্ঠীসমূহ। মাতৃত্বের সৌরভ যখন নারীকে উৎপাদনব্যবস্থা থেকে ক্রমশ দূরবর্তী করে তুলল, তখন পুরুষ আর পুরুষতন্ত্র তার সুযোগ নেয়। এর সাথে যুক্ত হলো উৎপাদনব্যবস্থার নতুন আবিষ্কার (লাঙল ও বলদের ব্যবহার)। বর্ধিত সম্পদের মালিকানা নির্ধারণ,

ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিকাশ, উত্তরাধিকার নির্ণয়ের সুবিধার্থে একক বিবাহ প্রথা চালু। সেই একক বিবাহ শুধু নারীর জন্য, পুরুষের জন্য বহুগামিতার পথ উন্মুক্ত হলো। এভাবে ক্রমপ্রসারিত ষড়যন্ত্রের জটিল জালে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়েছে নারী। সংসার নামের আবর্তনের গোলকধাঁধায় নারী শুধু নিয়ত ডানা ঝাপটেছে, শিকলভাঙার গান গেয়ে চলেছে, শিকলভাঙার শক্তি অর্জন করতে পারেনি। মহান দার্শনিক মার্কস বলেছেন :

> যে দিন থেকে নারীরা উৎপাদনব্যবস্থা থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছে, এবং ফসলের উৎপাদন এবং তার মালিকানার প্রশ্নে সমাজ নারীরদের এক বিবাহ প্রথা চালু হয়েছে, সেইদিন থেকে নারীরা তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য হারিয়ে পুরুষের দাসীতে পরিণত হয়েছে। তাই নারীদের এই দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে হলে সর্বাগ্রে তাদের সামাজিক উৎপাদনে আংশগ্রহণ করতে হবে। (গৌরী, ২০১৬ : ৪৫২)

সামাজিক সংঘের মধ্য দিয়ে নারীর এই দাসত্বের শৃঙ্খল বরণ করতে হয়েছে। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক আইন ও ধর্মীয় অনুশাসন প্রণয়ন করে শ্রেণিশোষণের সার্বিক প্রকৌশলের প্রতিলিপি প্রতিষ্ঠা করেছে।

২.৭

ব্যক্তির আর্থিক সংস্থানের বড় যোগান তার উপার্জনের মাধ্যম, যাকে কর্মসংস্থান বলে নির্ধারণ করা হয়। সাধারণত উপার্জন বেশি হলে তাকে ধনী এবং কম হলে দরিদ্র বলে অবহিত করা হয়। পরিবারের একজন সদস্যের অবস্থান নির্ধারিত হয় তার আয়ের পরিমাণ দ্বারা। কিন্তু আয় বলতে কী বুঝায়, তা নির্ভর করে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। সমাজ বিশেষ কারো কারো কাজকে আয়সংক্রান্ত কাজ বলে সংজ্ঞায়িত করে থাকে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে কেউ আয় করে কেউ করে না। এই বিবেচনায় বাংলাদেশের সমাজ সমীক্ষায় নারীর কাজ যেহেতু উৎপাদনমূলক নয়, তার ওপর ভিত্তি করে পারিবারিক-সামাজিক জীবনে তাদের অবস্থান নির্ধারিত হতো। পুরুষ প্রত্যক্ষভাবে অর্থ উপার্জন করে আর নারী সংসারের সমস্ত দায়িত্ব বহন করেও নগদ কোনো অর্থের মালিক হতে পারে না। তবে গ্রামীণ নিম্নবর্গের নারীর কাজ শুধু গৃহ অভ্যন্তরে সীমাবদ্ধ থাকে না, পুরুষের একনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে তাকে সর্বদায় অংশগ্রহণ করতে হয় কৃষিকেন্দ্রিক কাজের বৃহৎ কর্মশালায়। তারপরও নারীর কাজ পুনরুৎপাদনমূলক কাজ বলে বিবেচিত হয়। যদিও এই সমস্ত কাজে পুরুষের চেয়ে নারীকে বেশি শ্রম ও সময় দিতে হয়। এক সমীক্ষায় দেখা যায়, গ্রামের নারী গড়ে দৈনিক ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা সময় ব্যয় করে, যেখানে একজন পুরুষ ১০ থেকে ১১ ঘণ্টা কাজ করে থাকে। তারপরও নারীর এই শ্রম বা কাজকে অর্থনৈতিক কাজ বলে গণ্য করা হয় না। কারণ যেহেতু ঐ কাজ থেকে নগদ কোনো অর্থ আসে না। রাষ্ট্রীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যাখ্যায় যেহেতু নারীর কাজ দ্বারা নগদ কোনো অর্থের

আগমন ঘটে না, তাই অর্থনৈতিক বিবেচনায় নারীর কাজগুলো অর্থনৈতিক ও উৎপাদনমূলক কাজের পর্যায়ভুক্ত হতে পারে না। 'কাজেই নারীকে মনে করা হয় অ-অর্থনৈতিক, অনুৎপাদক, পরজীবী মানুষ। মনে করা হয়, পরিবারের পুরুষ সদস্যের উপার্জনে তাকে জীবন নির্বাহ করতে হয়। নারীর অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে এমন ধারণা দ্বারাই পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে তার অবস্থান নির্ধারিত হয়। আর স্পষ্টতই সে অবস্থান অধস্তনতা ও নির্ভরতার অবস্থান।' (আবদুল, ২০১১ : ৪৯) পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বহুমুখী প্রসার এভাবে নারীকে একটি অকার্যকর পরাশ্রয়ী প্রাণীতে পরিণত করেছে। সব ধরনের সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, এমনকি সব ধরনের শ্রমের মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করা সত্ত্বেও তার কাজের কোনো আর্থিক মূল্য নেই। নারীর প্রতি সভ্যতার এর চেয়ে বেশি নেতিবাচক মূল্যায়ন হতে পারে না। সামাজিকভাবে একজন মানুষের প্রতি চরমতম শোষণ বললেও অত্যুক্তি হবে না। এর পাশাপাশি এ কথাও সত্য যে, নারীর এই অবদমন নারী নিজেও স্বীকার করে না; কারণ সমাজ তাকে এই শিক্ষা দিতে সম্পূর্ণ সফল যে নারীর কাজ কোনো কাজই নয়। পুরুষের কাজই প্রকৃত কাজ, কারণ সেখান থেকে অর্থের আগমন ঘটে। অন্যদিক থেকে এ কথাও সত্য যে, যে শ্রমের আর্থিক মূল্য সমাজ বা অর্থবিদ্যা স্বীকার করে না, তা সত্যিকার অর্থে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কাজ হয়ে উঠতে পারে না। সমাজের এই বিরূপ মনোভাবে নারী তার শ্রমের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে; যার ফলে নিজের শ্রমের প্রকৃত মূল্য দাবি করার বোধকে অবদমন করে চলেছে। নারীর এই মানসিক ভারসাম্যহীনতা অনিবার্যভাবে তাদের অধিকারহীনতার জন্য দায়ী।

২.৮

পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও প্রযুক্তির সমাহার নারীর সনাতনী কর্মব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন এনেছে। যার ফলে অনেক কাজে সে আবার পুরুষের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। যেমন ঢেঁকিতে ধান ভানার পরিবর্তে মেশিনে ধান ছাঁটাই করে চাল উৎপাদন, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বীজ সংরক্ষণ, সার ও কীটনাশক সংরক্ষণ, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের জ্বালানি ব্যবহার প্রভৃতি মাধ্যমে প্রযুক্তি প্রয়োগ। প্রযুক্তির প্রভাব জীবনে কায়িক শ্রমের শ্রমলব্ধতা কমিয়ে আনলেও নারী তার ব্যবহারের স্বাধীনতা ও সহজলভ্যতা অর্জন করতে পারেনি। প্রযুক্তির উদ্ভাবন নারীকে সনাতনী কর্ম থেকে অবসর দিলেও তার জন্য নতুন মাত্রার কর্মপরিবেশ তৈরি করেনি। প্রযুক্তির প্রসারতা উচ্চবর্গ, মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত নারীর কর্মের ব্যাপ্তি কমিয়ে আনলেও নিম্নবর্গের নারীর জীবনে তার প্রভাব কম। নিম্নবর্গের নারীর শ্রম পূর্বের তুলনায় দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ কম থাকা সত্ত্বেও দারিদ্র্যের কারণে অধিকসংখ্যক নারী ঘরের বাইরে শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে আর্থিক প্রয়োজন থাকার

খাতিরেই কম মজুরি সত্ত্বেও নারীকে ঘরের বাইরে শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য করা হচ্ছে। নিম্ন মজুরির অনেকগুলো কারণ প্রদর্শন করা হলেও বাস্তবে নারীর শ্রম শোষণের লক্ষ্যই হলো নারী পুরুষের বৈষম্য তৈরি করা। অথচ মজুরি যদি উৎপাদনের ভিত্তি হয়, তাহলে উৎপাদনের অবদানের মানদণ্ডে নারীকেই বেশি মজুরি দেয়া উচিত। কারণ কাজের মাঝে ক্লান্তিজনিত বিশ্রাম ছাড়া নারী পুরুষের মতো পান-বিড়ি-সিগারেট, গল্পগুজব করে সময় পার করে না। তারপরও নারী শ্রমিকের ক্ষেত্রে শ্রমবৈষম্য, নারীকে বঞ্চিত করার সমস্ত কৃৎকৌশল সমাজের অতলে অবগুণ্ঠিত। গবেষণায় দেখা যায়, ৭৯% শ্রমিক তাদের শ্রমের যথার্থ মূল্য পায়, নারীর মধ্যে এই হার মাত্র ৩৬%। ৬৪% নারী শ্রমিক তার কর্মদাতার শর্তসমূহ মেনে নিয়ে কাজ করতে বাধ্য হয়েছে।(আবদুল, ২০১১: ৪৭) তবু দেখা যায়, কর্মদাতা নারী শ্রমিকের প্রতি যেন নানা রকম অসম অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি করে। এই সব ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় ঐ নারী শ্রমিকের পরিবারের কোনো পুরুষ সদস্য কর্মদাতা পুরুষের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক তৈরি করে এবং ঐ নারীকে সব শর্তাবলি মেনে নিয়ে কাজ করতে বাধ্য করে। এসব সত্ত্বেও নারীর সামাজিক মর্যাদা, সমর্থন রীতিনীতি–সবকিছুই ঐ কর্মদাতার মতামতের ওপর নির্ভর করছে। ফলে অবমূল্যায়িত শ্রমের মালিক একজন নারী পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র কোথাও কোনো মর্যাদা পায় না :

> নারীর উপার্জিত অর্থ পুরুষতন্ত্রের নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কারণ নারীর সবকিছুই পুরুষের অধীন। পুরুষ তার মালিক। এজন্যই নারীর উপার্জিত অর্থ নারীর নিয়ন্ত্রণে থাকে না এবং তা ব্যয় হয় স্বামী, শ্বশুর বা পুরুষতন্ত্রের মনোনীত কোনো ব্যক্তির ইচ্ছামাফিক। কাজেই নারী কেন অ-অর্থনৈতিক, অনুৎপাদক তা পুরুষতন্ত্রের সামগ্রিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচ্য ও বোধগম্য। (আবদুল, ২০১১ : ৫১)

পারিবারিক ও সামাজিক অর্থনৈতিক প্রতিকূলতার মধ্যে ব্যক্তি নারীর কতকগুলো মৌলিক চাহিদা রয়েছে, যা শুধু আয় বা আয়ের পরিমাণের উপর বিবেচ্য নয়। সামাজিক-রাষ্ট্রীয়-অর্থনীতির সঙ্গে ব্যক্তি নারীর মৌলিক চাহিদা গভীরভাবে জড়িয়ে রয়েছে। নারীর প্রতি বণ্টনকৃত এই নিয়ম পুরুষের দ্বারা আবর্তিত, পুরুষকেন্দ্রিক বিধান অনুসারে, তাই একে পুরুষতন্ত্রেরই নিয়ামক বলা যায়। যখন অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল পরিবারে একজন নারী অসমবণ্টনের শিকার হয়, তখন নিম্নবর্গের বা নিম্নবিত্তের একটি পরিবারে অপূর্ণতার বা দারিদ্র্যের বঞ্চনা-স্বরূপ তীরগুলো নারীকেই বরাবর আহত করে থাকে। যে তীরের শরগুলো হয়ে থাকে খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসার মতো মৌলিক চাহিদার প্রতিরূপক। জীবনের অস্তিত্বের প্রয়োজনে, মানুষের কর্মক্ষমতার তাগিদে, খাদ্য গ্রহণ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক চাহিদা। খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ ও গুণাগুণের সঙ্গে দারিদ্র্যের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। প্রয়োজনের তুলনায় কম খাদ্য গ্রহণ, কম ক্যালরি ও প্রোটিনযুক্ত খাদ্য গ্রহণ-সবই

দারিদ্র্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। গ্রামীণ পরিসরে খাদ্যবণ্টনের অসমতা দীর্ঘদিনের নিয়মে পরিণত হয়েছে। কারণ নারীর দীর্ঘদিনের লালিত সংস্কারে পুরুষ অর্থ উপার্জন করে,তাই আহার্য উপাদানে পুরুষের অগ্রাধিকার অধিকমাত্রায়।

২.৯

সমাজ বিনির্মাণে নারী বরাবরই পুরুষের সমপরিমাণ অবদান রেখে চলেছে। যদিও সমাজের ইতিহাসে নারী তার কর্মের স্বীকৃতি বা মূল্যায়ন কোনোটাই পায়নি; তবুও তার কর্মযজ্ঞ কখনো থেমে থাকেনি। সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতি বহু পথ অতিক্রম করলেও নারীর সামাজিক অবস্থান আজও সুস্পষ্ট ও সম্মানজনক হয়নি। পুরুষতান্ত্রিক ভারতীয় সমাজে নারী বহুদিন ধরেই নিম্নবর্গস্থ। তার কারণ নারীর নিজস্ব চিন্তা, ইচ্ছা, মেধা ও সৃজনশীলতার চর্চা বরাবর ব্যাহত হয়ে এসেছে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব যেহেতু পুরুষের হাতে; সেহেতু সেখানে নারীর একমাত্র অবস্থান পুরুষের আজ্ঞা পালনকারী হিসেবে। সামাজিক সংস্কার ও ধর্মীয় বিধানে নারী বহুকাল পূর্বেই হারিয়েছে তার স্বাধীন ও নিজস্ব মনোভঙ্গিকে বাস্তবায়নের সুযোগ। শিক্ষা ও সামাজিক কর্ম-উদ্যোগ থেকে নারীকে অনধিকারী বিবেচনা করে, সমাজ তার জন্য নির্দিষ্ট করল সংকীর্ণ গৃহপরিসরের বেষ্টনী; যা নারীকে শুধু বহির্জগৎ থেকে দূরবর্তীই করেনি, পাশাপাশি তার মনোলোকেও আরোপ করেছে পরাধীনতা ও দাসত্বের শৃঙ্খল। স্বামী ও সংসারের প্রতি বিনা প্রতিবাদে একনিষ্ঠ আনুগত্য পোষণে নারীর সামাজিক জীবনের অনেকাংশ বন্দি হয়ে আছে। কিছুদিন পূর্বেও এই সমাজ, মানুষ হিসেবে নারীর অনেক মৌলিক অধিকার অবদমিত করে রেখেছিল। সমস্ত সংকীর্ণতার মধ্যে শিক্ষা গ্রহণের অধিকারহীনতা, নারীর অন্য সব প্রতিকূলতাকে আরো বেশি প্রকটিত করে তুলেছিল। এই উপমহাদেশীয় জীবনব্যবস্থায় নারীর যে জীবনভাষ্য নির্মিত হয়, সেখানে নারীর ব্যক্তিগত কোনো পরিচিতি তৈরি হয় না; নারী কারো কন্যা, স্ত্রী, মা- এই জীবনাভিজ্ঞতার প্রতিবেশের মধ্য দিয়ে তার জীবনকে পাড়ি দিতে হয় :

> এসব কৌশলের অন্যতম কৌশল নারীর দৈহিক ও সামাজিক গতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ করা। নারীকে বাড়ির আঙিনা, পাড়া বা গ্রামের বাইরে যেতে হয়, তাহলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পর্দানশিন হয়ে যেতে হয়। নারীর দৈহিক ও সামাজিক গতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ নারীর অধিকার ভোগে ও ক্ষমতায়নের ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং নারীকে বসতবাড়ির আঙিনায় বন্দি করে। এর ফলে নারী বা নারীসমাজ লোকালয়ে কাজ করার সুযোগ পায় না; যার ফলে সমাজ স্বীকৃত আয় বলতে যা বোঝায় তা তারা অর্জন করতে পারে না। যার ফলে নারীকে অনুপার্জনকারী জনগোষ্ঠী হিসেবে গণ্য করে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। সামাজিক গতিশীলতা নিয়ন্ত্রণের ফলে তারা প্রয়োজনীয় তথ্য থেকে বঞ্চিত হয়, যা তাদের

> সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা বিনির্মাণ করতে পারে না। ফলে তারা সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে প্রত্যাশিত ভূমিকা রাখতে পারে না। (আবদুল, ২০১১ : ৭৩)

নারীর ইতিহাস আলোকিত কোনো ইতিহাস নয়, শোষণ, বঞ্চনা আর লাঞ্ছনা ভরা জীবনের স্বরলিপি রচনা করতে গেলে সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিস্তীর্ণ পরিসরের পরিসীমায় তাকে খুঁজে বের করতে হয়। সমাজ বিবর্তনের পথে নারীর ভূমিকা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির অভাবই নারীর সামাজিক ইতিহাস নির্ণয়ের একটি বড় অসঙ্গতির দিক। 'আমাদের সমাজে নারী যে পুরুষের সমকক্ষ নয়, এ কথাটা রামমোহনের সময় থেকেই উঠেছিল এবং নারীর যে সমকক্ষ হওয়া উচিত, এ কথা ইয়ং বেঙ্গলরা বলেছিলেন।' (আনিসুজ্জামান, ২০০৮ : ২৪) যে চেতনা বাঙালির প্রায় দুই শতাধিক বছর পূর্বে জাগ্রত হয়েছিল, তাকে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে এতটা সময় ব্যয় হলো, তবুও তার নির্ভার ফল বাঙালি নারী আজও অর্জন করতে পারেনি; কারণ সেদিনের মতো আজও অনেক বাঙালি পুরুষ ভাবতে পারে না, বিবাহ ও সন্তান পালনের বাইরে নারীর কোনো কর্মদক্ষতা থাকতে পারে।

২.১০

নারীর সামাজিক জীবনকে বৈষম্যপীড়িত করার মূলে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কারণ নারীর শিক্ষার অধিকার বিলোপ করা। ভারতীয় সমাজের নারীদের বৈদিক যুগ থেকে শুরু ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অধিকার হরণ করা হয়েছিল। শিক্ষা মানুষের জীবন বোধের যে বিকাশ ঘটাতে সক্ষম তা অন্য কোনো মাধ্যমে সম্ভব নয়। এই গূঢ় সত্যের মর্মার্থ জানার কারণেই বোধ হয় পিতৃতান্ত্রিক সমাজ মূলধারার নারীকে শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়াদি থেকে দূরে রাখার সব ধরনের প্রচেষ্টায় সক্রিয় ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ড দ্বারা বাঙালি যেসব উপযুক্ততা অর্জন করেছিল নারী শিক্ষা তার মধ্যে অন্যতম অনুষঙ্গ। নারী শিক্ষার বড় অন্তরায় ছিল বাল্যবিবাহ। বাঙালি নারীদের শিক্ষা গ্রহণের পথ প্রলম্বিত করতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখেন মিশনারিগণ ও ব্রাহ্মসমাজ। তারা নারীদের ঘরের বাইরে এনে মৌলিক শিক্ষা দিতে ১৮১৮-১৮২৮ সালের মধ্যে কলকাতা শহরে ও তার আশপাশে অনেকগুলো স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। সবচেয়ে বেশি অবদান যে প্রতিষ্ঠানের, তা হলো বেথুন কলেজ। এই প্রতিষ্ঠান বাংলার নারীদের জন্য উচ্চশিক্ষার দ্বার খুলে দিয়েছিল।(পূরবী,২০১৭; ২৫০) নারী শিক্ষা বাঙালি নারীর জীবনে আলোকবর্তিকা; তবে বাঙালি মুসলিম সমাজে সার্বিক সংস্কার মুক্তির পথ দেখান রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন(১৮৮০-১৯৩২)। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে 'স্ত্রী জাতির অবনতি' প্রকাশের মাধ্যমে বাংলায় তাঁর মতো এক অসাধারণ নারীবাদী লেখকের উত্থান ঘটেছিল। সমাজবিজ্ঞানীরা বাংলার নারীবাদী আন্দোলনে রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন ও সরলা দেবীর

(১৮৭২-১৯৪৫) ভূমিকাকে প্রশংসা করে তাদের বাংলার নারী আন্দোলনের জননী বলে অভিহিত করেছেন। রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন নারী শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ করে বাঙালি মুসলিম নারীর জন্য স্কুল স্থাপন করার মধ্যে দিয়ে, তাঁর জাগ্রত প্রচেষ্টাকে প্রাণ দিয়ে প্রতিস্থাপন করেছেন। এ ছাড়াও নারী সম্পাদিত প্রগতিশীল বিভিন্ন সাময়িকপত্র ও নারী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে ভূমিকা রেখেছেন তিনি। তারপরও সমাজপতিদের প্রথাগত চিন্তার অন্দরমহলে চলেছিল সংস্কারের বেড়াজাল :

> স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে যতই বিরুদ্ধাচরণ করেন না কেন পুরুষেরা, ধীরে ধীরে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারকে মেনে নিতে তাঁরা বাধ্য হন। কিন্তু নারীদের বাইরে কর্মক্ষেত্রে যোগ দেওয়া মেনে নিতে আরো বহুদিন সময় লাগে। মেয়েদের লেখাপড়ার উপযোগিতা ছিল কেবল শিক্ষিত স্বামীদের পাশে দাঁড়াবার যোগ্যতা অর্জন। স্ত্রী শিক্ষিত হলে সে স্বামীর কাছে উন্নত মনের সঙ্গী হতে পারে, দিতে পারে স্বামীকে তাঁর কাজে এবং ব্যক্তিগত জীবনে যথেষ্ট উদ্দীপনা। নিজের বুদ্ধি ও চর্চিত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়ে, সুন্দর বাচনভঙ্গি রপ্ত করে স্বামীর জীবনকে করে তুলতে পারে যথেষ্ট আনন্দকর ও উপভোগ্য। আর এ সবই ছিল নারীশিক্ষা সমর্থনের পেছনের যথেষ্ট কারণ। সন্তানের লেখাপড়াটাও সহজে নিশ্চিত করা যাবে ঘরে শিক্ষিত স্ত্রী থাকলে--একথাটাও মনে ধরেছিল কারো কারো। কিন্তু পড়াশোনা করার মাধ্যমে নারী যে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে, তাদের আত্মপ্রত্যয় বাড়তে পারে, পেশাজীবী হিসেবে নিজেদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে– এসব কথা কারোর মনে আসেনি। (পূরবী, ২০১৭ : ২৩৬)

সামাজিক জীবন কখনও নারীর জন্য আনুকূল্যের ছিল না, বরং বরাবরই তাকে প্রতিকূলতা উত্তরণের আপ্রাণ ব্রত নিয়ে চলতে হয়েছে। লেখাপড়া জানা শিক্ষিত নারীর উপার্জনের অধিকার অর্জনের সামাজিক ছাড়পত্র পেতে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়েছে; সামাজিক প্রাণী হিসেবে একজন নারীর স্বাধীন স্বনির্ভর হতে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভীষণই প্রয়োজন। যা ছাড়া স্বাধীন মানুষ যথার্থভাবে স্বাধীন জীবনবোধের চর্চা করতে পারে না।

২.১১

বলা হয়ে থাকে যে মানুষ মাত্রই রাজনৈতিক প্রাণী। কথাটা সব মানুষের জন্য সমভাবে প্রযুক্ত নয়; তবে রাষ্ট্র ধারণার শুরু থেকে সমাজে দুইটি শ্রেণির উদ্ভব ঘটেছে। একটি শ্রেণি শাসন করে, আর একটি শ্রেণি শোষিত হয়। নারী বরাবরই দ্বিতীয় শ্রেণির অংশীদার হিসেবে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে পরিগণিত হয়ে এসেছে। রাজনৈতিক বোধ বা রাজনৈতিক অধিকার নামক এই সংস্কৃতি থেকে নারীকে সবসময় দূরে রাখা হয়েছে; সেখানে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নানাবিধ যুক্তি থাকলেও নারীকে যেকোনোভাবেই ক্ষমতায়িত হতে দেয়া যাবে না; এটা তারই একটা দীর্ঘমেয়াদি ষড়যন্ত্রের অংশ-বিশেষ। তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোতে রাজনীতির প্রকৃতিই এমন যে সেখানে নারীর

রাজনীতিতে অগ্রহী হয়ে ওঠার ও অংশগ্রহণমূলক পরিবেশের সুযোগ তৈরি হয় না। এইরূপ রাষ্ট্রের রাজনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, দলাদলি, সশস্ত্র, সন্ত্রাসপূর্ণ, ভীতিকর, চাটুকারিতা, ঠকবাজি, স্বার্থপরতা প্রভৃতি অনৈতিক ও নেতিবাচক কর্মতৎপরতা। এ ছাড়া রাষ্ট্রকেন্দ্রিক যে রাজনীতি চর্চা তাও অনেক বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। আবার পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতি নারীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাবিমুখ করে নতজানু হতে শেখায়। সেখানেও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির কথা ভেবে নিজেকে নিরাপদ বলয়ে রাখতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য করে; তা ছাড়াও প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য প্রয়োজন যে সম্পদের, সেই সম্পদ পুরুষ তার নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখে। সব মিলিয়ে নারী অনেকাংশেই রাজনীতিবিমুখ হয়ে পড়ে। সংবিধানের বিভিন্ন ধারায়-উপধারায় নারীর নানাবিধ অধিকারের কথা বলা হলেও সাধারণ নারীর জন্য তা অনেকক্ষেত্রে অকার্যকরই থেকে যায়। সেখানে নারীর আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার হাতছানি থাকে অনেক বেশি, এই বাস্তবতা নারীর নিকট ভীতিকর ও দুর্বোধ্য। তবে কোনো নারীই যে রাজনীতিসচেতন নয় ; তেমনও নয়। তবে তার অংশগ্রহণমাত্রা সীমিত। ইতিহাসের বিভিন্ন সংকটময় সময়ে নারী তার দায়িত্ব এড়িয়ে যায়নি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিব্যাপ্তিতে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সমস্ত আন্দোলনে নারী ভূমিকা রেখেছে। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের সব শ্রেণির নারীর বৈচিত্র্যপূর্ণ অংশগ্রহণ ও অবদান ইতিহাসে তাদের প্রশংসনীয় অবস্থান তৈরি করেছে। (আবদুল, ২০১১ : ৯৬-৯৭) আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রত্যেকটি মানুষের রয়েছে রাজনৈতিক অধিকার, রাজনৈতিক মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নাগরিকের অন্যতম অর্জন। সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে নারী যে শোষণের ও ষড়যন্ত্রের শিকার, সেখানে নারীর মানুষরূপে মানবিক অধিকারের রাজনৈতিক ভাষ্য রচিত হওয়া নিকট অতীতের ঘটনা।

> ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বন্দ্ব বিংশ শতাব্দীতেও যেমন সমাধান হয়নি, তেমনি ভারতীয় নারীত্বের গতিপ্রকৃতি, নতুন শক্তি ও প্রতিক্রিয়ার প্রবেশের দ্বারা নির্দিষ্ট এক আকার লাভ করে। প্রতীচ্য নারীমুক্তিবাদী অ্যানি বেসান্ত ও মার্গারেট কাজিন্স ভারতীয় রমনীদের পশ্চিমী নারীমুক্তিবাদী ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত করে তোলেন এবং নারী শিক্ষার প্রসার নতুন নতুন চিন্তাধারা ব্যাপ্তি ঘটান। (ভারতী, ২০০৭ : ৪১-৪২)

মানুষের রাজনৈতিক অধিকার মানুষের মানবিক অধিকারের বহির্ভূত কোনো বিষয় নয়। মানুষ হিসেবে নারীর জীবনের অন্যান্য সব অধিকার যখন ভূলুণ্ঠিত হয়েছে, তখন রাজনৈতিক অধিকারের অনুশীলন দীর্ঘদিন অচর্চিত থেকেছে। নারীর রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার যাত্রা শুরু হয়েছিল ইউরোপ থেকে, পরবর্তী সময়ে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রসমূহে তার প্রতিষ্ঠা ঘটে। মানব ইতিহাসের সাড়া জাগানো বিপ্লব ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯), যেখানে সব মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল। তখন এই একটা প্রত্যাশা খুব জোরালো ছিল যে এই বিপ্লব বদলে দেবে নারীর ভাগ্য।

বিপ্লব-উত্তর পটভূমি নারী-পুরুষের সাম্যের প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অধিকার দেয় না। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ভারতবর্ষে নারীর রাজনৈতিক আবির্ভাব পুরুষের হাত ধরে; ঔপনিবেশিক শাসন, শোষণ ও বৈষম্যের অবসান ঘটাতে সুসংগঠিত রাজনৈতিক আন্দোলনে নারীর সমর্থন ও সহযোগিতার প্রয়োজন পড়েছিল। এ প্রসঙ্গে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের রেখে যাওয়া চিঠিতে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তিনি লিখেছিলেন, 'মেয়েদের ভারতীয় সমাজে জোর করে নিচে ঠেলে রাখা হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক জগতে আত্মদান করে মেয়েরা এখন প্রমাণ করেছেন যে কোনো অংশেই তারা পুরুষের চেয়ে কম নন।' (ভারতী, ২০০৭ : ৫৪) প্রীতিলতার এই চিঠি এ কথাই প্রমাণ করে নারীর উৎপীড়নমূলক সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সে-ও সচেতন ছিল। সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সিঁড়ি হিসেবে রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের পথে পা বাড়িয়েছিল নারী। সামাজিক অনাচারকে ভাঙার লক্ষ্য নিয়ে তারা রাজনীতির ময়দানে আত্মত্যাগ করেছিল, যা তাদের সামাজিক-সংস্কৃতিক মুক্তির পথকে প্রশস্ত করেছিল। গৃহকর্মের বাইরেও যে নারীদের কিছু করার আছে; এ কথা সেদিনের রাজনৈতিক কর্মীদের বক্তৃতাবলিতেও উঠে এসেছিল। নারী যে পুরুষের চেয়ে নিকৃষ্ট, এই ধারণাও দূর হতে শুরু করেছিল। কারণ নারী যে কাপুরুষ নয়; তারাও পুরুষেরই সমান কঠিন লড়াই চালাতে পারে, সে কথাও প্রমাণিত হয়েছিল। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে নারীর ভূমিকার কোনো দলিল বা সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাব নেই, যার মাপকাঠিতে তাদের রাজনৈতিক চেতনার প্রমাণ দেয়া যায়। তবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ তাদের সামাজিক চেতনাকেও বিকশিত করেছিল, তার প্রমাণ যথেষ্টই রয়েছে।

২.১২

এটাও অনুধাবন করতে হবে যে বাঙালির রাজনৈতিক বোধের জাগরণের প্রাক্‌কালীন সময়ে বাঙালি নারীর চেতনাজগতে বিপুল বিবর্তন ঘটেছিল। সেই সঙ্গে এ কথা কোনো মূল্যেই অস্বীকার করা যায় না যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার গুরুত্ব সর্বাগ্রে, রাজনৈতিক বোধের বিকাশ নারীর সামাজিক চেতনাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। নিরাপদ গৃহকোণ ছেড়ে রাজনীতির সংক্ষুব্ধ মাঠে হেঁটেছিল নারী, যা এর পূর্বে সম্পূর্ণই ছিল পুরুষের নিজস্ব পরিমণ্ডলে। তবে পুরুষপ্রধান সমাজে পুরুষকে উপেক্ষা করে নারী রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করেনি। বরং এ কাজে পুরুষই তাকে প্রেরণা দিয়েছে। বহু বাধার নিগড়ে আবদ্ধ নারীর সামগ্রিক চেতনা ও শৃঙ্খল মোচনের প্রচেষ্টার সবটাই রাজনীতির বাতাবরণে ঘটেনি। সমসাময়িক দেশজ সাহিত্য সংস্কৃতিও এ ব্যাপারে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে :

> উনবিংশ শতাব্দী থেকে ভারতে জাতীয়তাবাদ একটা সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিগত চেহারা নিয়ে দেখা দিয়েছিল। একটা জাতির অন্যতম প্রধান পরিচয় তার ভাষা ও সাহিত্য–– একথা স্বীকৃত হয়েছিল। ফলে মাতৃভাষার ও মাতৃভাষায় সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে যথেষ্ট উৎসাহ দেখা দিয়েছিল। অন্যান্য রাজ্যের মত, বাংলাদেশের মেয়েদের উপর এই সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিগত আন্দোলনের যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল। শুধু তাই নয়, ১৯১১-৩০ পর্বে গড়ে উঠল, মেয়েদের নানা রাজনৈতিক সংগঠন। এর ফলেও রাজনৈতিক আন্দোলনে মেয়েদের অংশগ্রহণ সহজ নয়। (ভারতী, ২০০৭ : ৫৫)

নারীদের ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকার অল্প দিনের ঘটনা। ১৯০৮ সালের ৮ মার্চ নিউইয়র্ক শহরে দরজি মেয়েরা ভোটাধিকারের দাবিতে প্রথম আন্দোলন করে। ১৯০৯ সালেও এই দাবিতে নিউইয়র্কের অন্য নারীরাও আন্দোলন করেন। তারপর ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনের ডাক দেয়া হয় এবং নারী ভোটাধিকার দিবস পালন করা হয়। এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ৮ মার্চকে 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' পালন করা হয়। এই আন্দোলনের পূর্বে বিশ্বের মাত্র দুই-তিনটি দেশে নারী ভোটাধিকারের অধিকার পেয়েছিল। সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নারী ভোটাধিকার পায়। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের নারী বিভিন্ন কারণে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী। সেখানে নারীর রাজনৈতিক অধিকার অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়। আনন্দের বিষয় হলো নারীরা ভোটাধিকার পাওয়ার পূর্বেই রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে উঠেছে ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে পুরুষের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছে। ততোদিনে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক দল হিসেবে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। সেখানে শুরু থেকেই নারীদের নেতৃত্বে নিয়ে আসা হয়; তবে উল্লেখ্য যে এই সব ক্ষেত্রে সব সময় উচ্চবর্গের নারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

> তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মাদাম কামা, অ্যানি বেসান্ত, মার্গারেট কাজিন, সরোজিনী নাইডু প্রমুখ নারীগণ। এদের নেতৃত্বে ভারতের নারীরা ভোটাধিকারের দাবী করেন। ব্রিটিশ রাজশক্তি বিষয়টি প্রাদেশিক শাসকবর্গের ওপর ছেড়ে দেন। ১৯১৯ সাল থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে সব প্রদেশেই নারীরা পুরুষের সমান ভোটাধিকার পায়। (গৌরী, ২০১৬ : ৪৫৯)

নারীর রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার সাথে নারী ক্ষমতায়ন বা নারীর স্বাধীন জীবনাচারের স্তরগুলো অনেকাংশে নির্ভর করে। বৈশ্বিক পরিসরে নারীর ক্ষমতায়নে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণের বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতের পরিসরে বাংলাদেশের নারীর প্রাতিষ্ঠানিক রাজনৈতিক অংশগ্রহণের অবস্থা ও আগ্রহের মাত্রা আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ক্ষমতার শীর্ষ পদে নারী অবস্থান করলেও তা নারীর অর্জন করে নেয়া

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বলেই অধিক বিবেচিত হতে পারে। যা শুধু বাংলাদেশের ক্ষেত্রেই নয়, এশিয়ার অন্যান্য নারীনেত্রীর ক্ষেত্রেও সমভাবেই প্রযুক্ত। তবে তাঁরা উত্তরাধিকার সূত্রে রাজনীতিতে প্রবেশ করলেও জাতীয় সংকট ও রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। একজন নারী নেতৃত্বের রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতায়িত হওয়া ও সফলভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করার মধ্যেও দায়িত্ব শেষ হয় না। রাষ্ট্রীয়ভাবে লিঙ্গবৈষম্য বিলোপ বা লিঙ্গ সংবেদনশীল রাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগ করে সমস্ত ক্ষেত্রে নারীর উঠে আসার পথ প্রশস্ত করতে হবে। এই সমস্ত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোর রাষ্ট্রনীতিতে নারীবান্ধব নীতির যৌক্তিক পরিপ্রেক্ষিত গড়ে উঠতে পারে।

টীকা:

১. মানব-সমাজ বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধর্মের উদ্ভব ঘটেছিল। প্রাথমিক স্তরে সেই ধর্মমতগুলোর অন্যতম প্রধান ভূমিকা লক্ষ করা গিয়েছিল সমাজের দরিদ্র ও নিপীড়িত মানুষের পক্ষে। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সমাজ বিকাশের অগ্রগতি, শ্রেণিবিভাজনের তীব্রতায়, সেই ধর্মমতগুলো সমাজের সুবিধাভোগী ও শাসক সম্প্রদায়গুলোর দ্বারা আপন স্বার্থ রক্ষার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সমাজের নিচেরতলার নিষ্পেষিত মানুষকে ধর্মভাবনায় আচ্ছন্ন করে রেখে উপরতলার সুবিধাভোগীরা, অর্থাৎ উচ্চবর্গ শ্রেণি ধর্মকে অত্যন্ত স্থূলভাবে শোষণ ও বঞ্চনার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে। যার ফলে ধর্মভাবনা অধঃপতিত হয়েছে ধর্মান্ধতায়। তাই নিম্নবর্গের চেতনায় ধর্মের প্রভাব একটি অতীবও আলোচিত প্রসঙ্গ। শোষক শ্রেণির কাছে ধর্ম শোষণের বাহন; শোষিতের কাছে সান্ত্বনার প্রলেপ বা হৃদয়হীন জগতের হৃদয়। পরাজয়ের অপরিমেয় অভিজ্ঞতাকে অনিবার্যতার বাতাবরণে গ্রহণ করতে একটি আশ্রয়স্থলের প্রয়োজন পড়েছিল; ধর্ম তাদের কল্পনার জগতে সেই মমতাময় কল্পনার আশ্রয়ের আধার। প্রতিরোধ প্রতিকারের প্রেরণা সঞ্চয়ের মার্গ। প্রতিদিনের দমন-পীড়নের-বঞ্চনার অনলে বারিধারার পরশ দিয়েছে ধর্মবিশ্বাস। নিম্নবর্গ তার চৈতন্যের গভীরে লুপ্ত হয়ে থাকা পরাজয়ের গ্লানিকে বিজয়ের সৌরভে পুলকিত করে থাকে। নিম্নবর্গের ধর্মীয় চেতনা এভাবেই তার যাপিত জীবনের ইতিহাসে আত্মিক মর্যাদার বোধকে জাগ্রত করে চলেছিল। (গৌতম, ২০১৮ :১৭-২০)

২. ঔপনিবেশিকতা বা উপনিবেশ হলো একটি প্রশাসনিক প্রক্রিয়া, যা স্থানিক বা আঞ্চলিক রাজনীতি-অর্থনীতিকে অপর একটি কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার আওতাধীনে নিয়ে আসে। একই সঙ্গে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যবলী নিয়ন্ত্রণ করা এবং প্রশাসনিক শাসনাধিকার কায়েম করা। ‘কলোনি’ বা উপনিবেশ শব্দের গূঢ়ার্থে সমীর রায়চৌধুরী ‘জবরদখলের’ ঐতিহাসিক ধারণার উপস্থিতি লক্ষ করেছেন। কলন শব্দের সাধারণ অর্থ গ্রাস। নতুন দেশ বা ভূখণ্ডকে সামগ্রিক রূপে আয়ত্তীকরণ করা বা দখলদারিত্বের মাধ্যমে শাসন প্রক্রিয়া সুসম্পন্ন করা বোঝা হয়ে থাকে। ইউরোপীয় পূর্বপুরুষেরা বিভিন্ন দেশে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করেছিল আর তা সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। এই সমস্তই ছিল ঔপনিবেশিকতার প্রথম পর্যায়। পরবর্তীতে ঐ সমস্ত রাষ্ট্রের ওপর নিজেদের অধিকার

প্রতিষ্ঠিত করে ঔপনিবেশিকতার পরিকল্পনা স্বার্থক করে কৌশলগতভাবে। এতে করে সাদা ঔপনিবেশিক এবং স্থানীয়দের মধ্যে তৈরি হয় জাতিগত বৈষম্য। বিশ্বের সব ঔপনিবেশিক জাতিরই একটি নিম্নবর্গীয় পরিচয় রয়েছে। এইসব বাচন আধিপত্যকারী শ্রেণিকে শাসন ও শোষণের অপকৌশলগুলো আয়ত্ত করতে চেতনা দিয়েছিল। (ফকরুল, ২০১৪:৪০)

৩. উৎপাদন ব্যবস্থায় নারীর অংশ ক্রমেই কমে যাচ্ছিল, যদিও গৃহকর্মে তার পরিশ্রম ও দায়িত্ব যথেষ্টই ছিল তবু তাকে 'ভার্যা' অর্থাৎ অন্যের দ্বারা ভরণীয়া, স্বামীর অন্নে প্রতিপালিত এই সংজ্ঞা দেওয়া হল। বৈদিক যুগের শেষের দিকে বৈদেশিক আক্রমণের শঙ্কা বাড়তে থাকলে নারীর অপহরণ ও বর্ণসংকরের শঙ্কাও বাড়তে থাকে, স্বজাতিত্বের পরিশুদ্ধতা রক্ষায় নারীকে আরো বেশি গৃহকোণে ঠেলে পাঠানো হলো। এভাবে সমাজ পরিবর্তনের ক্রমস্তরে নারীর অবরুদ্ধতার দেয়াল বাড়তে থাকে। শ্রেণিগত অবদমনের প্রসারে নারীর অবস্থান পৌঁছেছে নিম্নবর্গ বা প্রান্তিকের কাতারে। নারীর কর্তব্য স্থির করা হলো পুরুষের অনুবর্তিনী হয়ে উঠা। অতএব সে 'ভার্যা' অর্থাৎ ভরণীয়া, স্বামী ভর্তা অর্থাৎ ভরণকারী। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে ভূ-ধাতু থেকে ঐ অর্থেই নিষ্পন্ন হয়েছে ভৃত্য শব্দটি। পাশ্চাত্যও প্রভুত্বের ধারণায় পিছিয়ে নয়, ষোড়শ-সপ্তদশ শতক পর্যন্ত স্ত্রী স্বামীকে লর্ড বলে সম্বোধন করে এসেছে। আবার ভৃত্যও তার প্রভুকে লর্ড বলে সম্বোধন করতো, লর্ড শব্দের বুৎপত্তি হল রুটির জন্য সে কারো অধীনস্থ। নারীর ইতিহাসে শোষণের রোষানলের পার্থক্য প্রাচ্য-পাশ্চাত্যে বড় কোনো ব্যবধান দৃষ্টিগোচর হয় না। বেদ থেকে মহাকাব্যের যুগ পর্যন্ত নারীকে শুধু বধু আর জননী রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। বিবাহিত নারী ছাড়া নারীর অন্য কোনো অস্তিত্বকে সামাজিকভাবে স্বীকার করা হয়নি। নারী যেন অজস্র সন্তানের উৎপাদন ও উৎকর্ষতায় নিয়োজিত এক প্রাণী ; এর বাইরে অস্তিত্ব শূন্য এক মানবসত্তা। (সুকুমারী,১৪২৪ব.: ৮)

সহায়ক গ্রন্থ :

১. অমর্ত্য সেন (১৪২২)। *জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি*, আনন্দ, কলকাতা

২. অমল দাস (২০১৩)। *ভারত ইতিহাসে নিম্নবর্গের নারী শ্রমিক এদের সংকট ও সংগ্রাম উনিশ থেকে বিশ শতক*, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা

৩. গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পা. (২০১৫)। *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, আনন্দ, কলকাতা

৪. গৌতম ভদ্র (২০১৮)। *ইমান ও নিশান*, সুবর্ণরেখা, কলকাতা

৫. জহর সেনমজুমদার (২০১৭)। *নিম্নবর্গের বিশ্বায়ন*, পুস্তক বিপনি, কলকাতা

৬. জয়শ্রী চৌধুরী ও ইন্দ্রাণী দাশ সম্পা.(২০১৬)। *আন্তোনিও গ্রামশি ইতিহাসের প্রান্তসীমায় দানিয়েলাকাপ্পেল্লো*, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

৭. চিত্ত মণ্ডল ও ড. প্রথমা রায়মণ্ডল সম্পা. (২০১৬)। *বাংলার দলিত আন্দোলনের ইতিবৃত্ত*, একুশ শতক, কলকাতা

৮. তাশরিক-ই-হাবিব(২০১৮)। *বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে প্রান্তজনের জীবনচিত্র*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

৯. নীহাররঞ্জন রায় (১৪০৭)। *বাঙ্গালীর ইতিহাসঃ আদি পর্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

১০. পার্থ চট্টোপাধ্যায় (২০১৭)। *ইতিহাসের উত্তরাধিকার*, আনন্দ, কলকাতা

১১. পূরবী বসু (২০১৭)। *আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বাংলার নারী*, বেঙ্গল পাবলিকেশনস লিমিটেড, ঢাকা

১২. ফকরুল চৌধুরী (২০১৪)। *প্রাচ্যতত্ত্ব ও উত্তর-ঔপনিবেশিক সমাজ*, কথা প্রকাশ, ঢাকা

১৩. মিল্টন বিশ্বাস (২০০৯)। *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে নিম্নবর্গের মানুষ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

১৪. মুনতাসীর মামুন সম্পা. (২০১৬)। *বাংলাদেশ নিম্নবর্গ, দ্রোহ ও সশস্ত্র প্রতিরোধ (১৭৬৩-১৯৫০)*, কথা প্রকাশ, ঢাকা

১৫. মোঃ আব্দুল মান্নান (২০১১)। *গ্রামীণ নারী*, অবসর, ঢাকা

১৬. রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় ও গৌতম নিয়োগী সম্পা.(২০০৭)। *ভারত ইতিহাসে নারী*, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা

১৭. রাজকুমার চক্রবর্তী (২০১৯)। *নির্মাণ অবিনির্মাণ বিকৃতি*, এবং মুশায়েরা, কলকাতা

১৮. রেবতী বর্মণ (২০১৭)। *সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ*, বিভাস, ঢাকা

১৯. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিজিৎ দাশগুপ্ত সম্পা.(১৯৯৮)। ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, দিল্লি, পার্থশঙ্কর বসু কতৃক নয়া উদ্যোগে কলকাতা থেকে প্রকাশিত

২০. সুকুমারী ভট্টাচার্য (১৪২৪ব.)। *প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য*, আনন্দ, কলকাতা

২১. সুকোমল সেন (২০১৩)। *ভারতের সভ্যতা ও সমাজ বিকাশে ধর্ম শ্রেণী ও জাতিভেদ*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

২২. সেলিনা হোসেন, বিশ্বজিৎ ঘোষ ও মাসুদুজ্জামান সম্পা.(২০০৩)। *নারীর ক্ষমতায়নঃ রাজনীতি ও আন্দোলন*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

২৩. সেলিনা হোসেন ও বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পা.(২০০৮)। *জেন্ডার আলোকে সংস্কৃতি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

২৪. হুমায়ুন আজাদ অনু. (২০১৫)। *নারী*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

২৫. Gayatri Chakravorty Spivak (1999) *A Critique of Postcolonial Reason*, Harvat University Press, Massachustts, London , England.

২৬. Ranajit Guha [Edi.](1982), `*On some Aspects of the Historiography of Colonial India,* Subaltern Studies No.1, Oxford University Press, Delhi

সহায়ক প্রবন্ধঃ

১. আনিসুজ্জামান, ‘পুরোনো বাংলা সাহিত্যে নারী সম্পর্কিত ধারণা, সেলিনা হোসেন, বিশ্বজিৎ ঘোষ ও মাসুদুজ্জামান সম্পা.(২০০৩)। *নারীর ক্ষমতায়নঃ রাজনীতি ও আন্দোলন*, মাওলা ব্রার্দাস,ঢাকা

২. গৌরী হালদার, নারীমুক্তি আন্দোলন ও দলিত নারী সমাজ, চিত্ত মণ্ডল ও ড. প্রথমা রায়মণ্ডল সম্পা. (২০১৬)। *বাংলার দলিত আন্দোলনের ইতিবৃত্ত*, একুশ শতক, কলকাতা

৩. প্রথমা রায়মণ্ডল, বাংলার দলিত আন্দোলনের ইতিবৃত্ত, চিত্ত মণ্ডল ও ড. প্রথমা রায়মণ্ডল সম্পা. (২০১৬)। *বাংলার দলিত আন্দোলনের ইতিবৃত্ত*, একুশ শতক, কলকাতা

৪. ভারতী রায়, স্বাধীনতা আন্দোলন এবং বাংলাদেশের নারী জাগরণ (১৯১১-২৯) রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় ও গৌতম নিয়োগী সম্পা.(২০০৭)। *ভারত ইতিহাসে নারী*, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের নারী

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের ধর্মীয় আবরণের অন্তরালে খণ্ডিত যে বাস্তব রসধারা সঞ্চারিত হয়েছিল, তা একেবারেই মূল্যহীন নয়। বাংলা সাহিত্যের শূন্যপ্রায় মানচিত্রে তা ইতিহাস সংগঠনের কাজ করেছিল। এই পটভূমির মূল সংযোগ-সেতু নির্মাণ করেছিল মুকুন্দরাম চক্রবর্তী আর ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের মাধ্যমে বাস্তবজীবনের আলো-হাওয়ায় প্রতিভাসিত হয়েছিল দেব-দেবীর বন্দনা। ধর্মীয় বন্দনার ফাঁকে ফাঁকে যে বাস্তবের রসধারা সঞ্চারিত হয়েছিল, সেখানেই অবগুণ্ঠিত ছিল নতুন সাহিত্যেধারার বিকাশ-উন্মুখ অস্তিত্ব। (শ্রী শ্রীকুমার, ১৯৬৫ঃ ৩) এভাবেই মধ্যযুগের সামাজিক শৃঙ্খল হতে মুক্ত মানুষের মধ্যে জাগ্রত হয়েছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উদ্বুদ্ধচেতনা; যার অনিবার্য পরিণতি প্রশস্ত করেছিল উপন্যাসের আগমনকে। সংলাপ আর ঘটনা বর্ণনার অভূতপূর্বে সমাবেশে সাহিত্যের যে শিল্পরূপটি মৌলিক অবয়ব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে; সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকের ইউরোপে তা সমাদৃত হয়েছিল উপন্যাস নামে। যে গদ্য ভাষায় মানুষ তার নিজের মনের কথা ব্যক্ত করে, ঘটনার বর্ণনা করে, সেই গদ্যের সঙ্গতেই ব্যাপক জীবনকে বাঙময় করে তুলেছিল এই সাহিত্য মাধ্যমে। এই কারণেই ইংরেজ ঔপন্যাসিক ফিল্ডিং তাঁর উপন্যাস টম জোনাস এর নাম দিয়েছিলেন গদ্য-মহাকাব্য। তবু উপন্যাস শিল্পরূপের মূল উপাদান যেহেতু বাস্তব পরিবেশ, মাতৃভাষা ও সজীব মানব-মানবী, সে জন্য বাংলা উপন্যাস প্রথম থেকেই দেশজ উপাদান নিয়ে গড়ে উঠেছিল। (রণেশ, ২০১২ :২১)

১.

উপন্যাস একটি আধুনিকতম ও সমগ্রতাস্পর্শী শিল্পমাধ্যম। বাস্তবের সন্ধানী হয়েও উপন্যাস অনাবৃত বাস্তবের সমাহার। বুর্জোয়া সমাজের শক্তি আর স্বাতন্ত্র্যকে আত্মস্থ করে; মধ্যযুগীয় জীর্ণ সামন্ত সমাজকাঠামোকে ভেঙে দেওয়ার অভীপ্সা নিয়ে যাত্রা করেছিল বাংলা উপন্যাস। সেই বাস্তবকে তথ্যগত বাস্তব অপেক্ষা তত্ত্বগত বাস্তব হতে হবে অধিক। কারণ উপন্যাসের অপরিহার্য শর্ত হলো, জীবনের মর্মগত সত্যতাকে নিরূপণ করা। যেখানে শিল্পিত স্বরে উদ্ভাসিত হয় লেখকের জীবনার্থ, তাঁর স্বদেশ-সমাজ-সমকাল। এ প্রসঙ্গে Ralph Fox এর সেই বিখ্যাত উক্তি স্মরণযোগ্য :

> The Novle is the epic –from of our modern, bourgeois socity... It did not exist, except in very rudimentary from before that modern civilisation which began with the renasissance and like every new art- from it has served its purpose extending and deepening human consciousness. (Ralph, 1937: 27)

রালফ ফক্সের এই মৌলিক সংজ্ঞায়নের মধ্যে উপন্যাসশিল্পের আগামী দিনের সম্ভাবনার ইঙ্গিত সম্মোহিত হয়ে ছিল। অষ্টাদশ শতকের ইংরেজি শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশ বাঙালির মনে ধীরে ধীরে পাশ্চাত্যের প্রভাবকে শাখা-প্রশাখায় বিস্তার করতে থাকলে; পাশ্চাত্য শিক্ষার স্ফুরণ যখন বাঙালির বুদ্ধি আর মননশক্তিকে দখল করে নিল, তখন বাংলার সাহিত্য আর সংস্কৃতিতে দিকবদলের হওয়া নতুন খাতে প্রবাহিত হয়েছিল। উপন্যাসের পূর্বলক্ষণাক্রান্ত বাংলা সাহিত্য ইংরেজি উপন্যাসের প্রত্যক্ষ প্রভাবে আলোড়িত হলো। গল্পবলার আর গল্পশোনার যে প্রবৃত্তি প্রাচীন ও মধ্যযুগ থেকে বাঙালি অন্তঃশীলায় বহমান ছিল, তাকে আপ্ত করে বাংলা উপন্যাসের মৌলিক ভিত্তির নির্মাণ ঘটল। এ প্রসঙ্গে মিলান কুন্দের একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য : Every novel says to the reader : ‘Things are not as simple as you think’ (উদ্ধৃত, রণেশ, ২০১২ : ২০) জন্মলগ্ন থেকেই উপন্যাস কল্পিত আখ্যান-আশ্রয়ী জীবনভাষ্য। আবার কোনো উপন্যাসই, উপন্যাস হয়ে উঠতে পারে না ; যদি না সেখানে জীবনবোধের পূর্ণবৃত্তায়ন না থাকে। উপন্যাসের কাছে মানবজীবন অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই নয়। জীবনকে সামগ্রিকভাবে অঙ্গীভূত করার অভিপ্রায়ে মহাকাব্যরূপী এই শিল্প-প্রয়াসের সৃষ্টি।

১.১

ঔপনিবেশিকতা বাহিত আধুনিকতার স্বাক্ষর বাংলা সাহিত্যের সব শাখাতেই প্রতিভাসিত। বাংলা উপন্যাসশৈলীর বিকাশের ক্ষেত্রে সেই সে লক্ষণরেখা নিকট অতীতের ইতিহাস। যদিও তার প্রারম্ভরেখা আরো কিছু পূর্বের পর্বের ঘটনা; যেখানে প্যারীচাঁদ মিত্রের (১৮১৪-১৮৮৩) *আলালের ঘরের দুলাল* (১৮৫৮) ও কালী প্রসন্নসিংহের (১৮৪০-১৮৭০) *হুতোম প্যাঁচার নকশা* (১৮৬১-৬২) গদ্য বিবরণধর্মী আখ্যানের দেখা পেলেও ঔপনিবেশিকতাজাত আধুনিকতার অসঙ্গতি থেকেই যায়। সে কারণেই বাংলা সার্থক উপন্যাসের ধারায় তাদের অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। তবে কোনো সৃষ্টিই একদিনে প্রতিষ্ঠিত হয় না, তার জন্য প্রয়োজন হয় দীর্ঘ শ্রম আর সাধনার। প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহ দুজনই বাংলা উপন্যাস সৃষ্টির ধারার প্রথম বংশীবাদক। পূর্ববর্তী বিচ্যুতির বিন্যাস করে, তাতে যথার্থ সুর সংযোজন করলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৮)। বাংলা উপন্যাসের সমৃদ্ধ স্রোতোধারায় সুধা জুগিয়েছেন অনেকেই, তবে মূল সংগঠকের ও সঞ্চালনের ভূমিকা

পালন করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এ প্রসঙ্গে গবেষকের মত, 'প্যারীচাঁদ বা হুতোম যাকে গদ্যবিবরণ ভাবতেন বঙ্কিমচন্দ্র তাকে বড় জোর একটা ভঙ্গিমাত্র ভেবেছিলেন আর বঙ্কিম যাকে উপন্যাস ভাবতেন প্যারীচাঁদ বা হুতোমের পক্ষে তা কল্পনা করাও অসাধ্য ছিল।' (দেবেশ, ২০১৬ : ১৪) সমবেত এই প্রচেষ্টায় বাংলা উপন্যাস সাহিত্য আজ একটি সর্বাত্মক সমৃদ্ধ সাহিত্যধারায় প্রবাহিত পরিমণ্ডল। বিভিন্ন ধ্যানধারণার, সামাজিক-সাংস্কৃতিক, আনুপূর্বিক পটভূমিকায় উপন্যাসের বিকাশ সাধিত হয়েছে।

২.

সাহিত্য শূন্যসম্ভূত নিরবয়ব কোনো ধারণা নয়। সাহিত্য সমাজের বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন। মানুষ আর তার বাস্তব জীবনকে নিয়েই সাহিত্যের কারবার। 'সাহিত্যের প্রাণ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সাহিত্যের জগৎ মানেই হচ্ছে মানুষের জীবনের সঙ্গে মিশ্রিত জগৎ'। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪২৫ব.: ৬০) সেই মানুষে মানুষে বিভেদ অপরিসীম, তা সমাজের ধাপে ধাপে যেমন দৃশ্যমান, তেমনি সাহিত্যেও রয়েছে তার বাস্তবোচিত প্রতিচ্ছায়া। সপ্তম শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে যে বিশাল ধারা প্রবাহিত, সেখানে আছে নিম্নবর্গের জীবন আচ্ছাদিত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও শোষণ-শাসনের ইতিকথার সারমর্ম। নিম্নবর্গের সেই মানুষের মধ্যে আরো এক নিম্নবর্গ, আরো এক শোষিত শ্রেণি, নারী। নিম্নবর্গের খেটে খাওয়া সেই সব মানুষের সমাজে নারীকে অপমানিত হতে হয়, হতে হয়েছে। চর্যাপদ মূলত বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ের অধ্যাত্ম সংগীত, যা একই সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শনও বটে। অধ্যাত্ম সংগীত হলেও তার অধিকাংশ পদই জীবনরসসম্পৃক্ত। পদকর্তারা তাদের গূঢ় সাধনার তত্ত্বকে আড়াল করার জন্য রূপকের আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই সব রূপকের মধ্য দিয়েই চর্যায় আভাসিত হয়েছে নিম্নবর্গীয় জীবনের চালচিত্র। চর্যার যুগেও সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল; সমাজ ছিল বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত। অস্পৃশ্য, অবহেলিত ডোম, শবরদের বাস 'নগর বাহিরি' 'টালত' উঁচা উঁচা পাবতে'। পেশানির্ভর মানুষদের অতিসাধারণ জীবন ও অনগ্রসরতার দিকটিও চর্যাগুলোতে স্পষ্ট ও প্রকটিত হয়ে উঠেছে। চর্যাকারগণ সমকালীন সমাজস্থ মানুষের জীবনের প্রতিমূর্তি অঙ্কন করতে গিয়ে দরিদ্র অপাঙক্তেয় অসহায় নারীর জীবনকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। চর্যাকালে অন্ত্যজ শ্রেণির, নিরক্ষর নিম্নবর্গের নারীরা তাদের জীবনসংগ্রামে; উদারান্ন সংগ্রহে পরিশ্রম করত অহোরাত্র। আবার এরই মধ্যে তারা তাদের জীবনের আনন্দকে খুঁজে নিত। সভ্যতার এই সূচনালগ্নের সমাজে উচ্চবর্গের দ্বারা নিম্নবর্গ শুধু বর্ণগতভাবে শোষিত হতো না; পাশাপাশি লিঙ্গবৈষম্যেরও শিকার হতো নারীরা। দিনের আলোয় যারা ছিল অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ, রাতের অন্ধকারে তারাই হয়ে উঠত ভোগ্য

উপকরণ। ব্রাহ্মণসহ উচ্চবর্গের লোকেরা এদের সঙ্গে গোপনে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করত। এটা সমাজের চোখে ব্যভিচার হলেও অপরাধ নয়; কারণ উচ্চবর্ণের প্রতি সমাজ ছিল অন্ধ। উচ্চবর্ণের লোকদের শাস্তিদানের কোনো ব্যবস্থাও ছিল না। এই সম্পর্কিত পদ তারই দৃষ্টান্ত বহন করে :

নগর বাহিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ

ছোই ছোই জাইমো ব্রাহ্ম নাড়িয়া।। (কাহ্নুপাদ, ১৪৩ : ২০১৪)

সব সময় সব সমাজে নারী বৈষম্যের শিকার হয়েছে, শোষণের শিকার হয়েছে। ব্রাহ্মণ পুরুষেরা এই সমস্ত ডোম নারীদের ভোগ করত কিন্তু বিয়ে করত না। আবার তাদের সন্তানেরাও সমাজে কোনো সম্মান পেত না। ডোম সম্প্রদায়ের নারীরা বেত ও বাঁশের চাঙারি, চুপড়ি, ধামা ও কুলা ইত্যাদি তৈরি করে জীবন চালাত। দারিদ্র্যময় এই জীবনে অর্থনৈতিক বৈষম্যে জীবন যখন জরাজীর্ণ তখন, লৈঙ্গিক এই নির্যাতন অন্ত্যজ এই নারীদের জীবনকে বিষময় করে তুলত :

টালত মোর ঘরে নাহি পড়বেষী।

হাঁড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী।।(টেন্টণ,২০০ :২০১৪)

অন্নাভাবে দুঃখ, দুদর্শায় ক্লান্ত মানুষগুলোর যে জীবনচিত্র, সেখানে হাঁড়িতে ভাত না থাকলেও ঐ উটকো অতিথির আগমনের অভাব ছিল না। দারিদ্র্যপীড়িত নারীর মানসিক নির্যাতনের চিত্রকে পরিস্ফুট করেছেন পদকর্তাগণ। তখনও সমাজে প্রচলিত ছিল প্রতিলোম ব্যবস্থা। ডোমনী-শবরীদের তথা নিম্নবিত্তের মানুষের মধ্যে মধ্যবিত্ত নারীসুলভ পুরুষার্জিত অন্নজীবন ছিল না, তারা বাইরে গিয়ে সহকর্মিণী হয়েছিল স্বামী সন্তানের। তবে পুরুষ প্রাধান্যের কারণে স্বামীর শাসন তাদের মেনে চলতে হতো। (আহমদ, ২০০5 : ১৭৫) ৮ নং চর্যায় ডোম্বীর নৌকা বাওয়ার কথার উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া তাঁত তৈরি, চাঙারি বোনা প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে সংসারে অর্থের জোগান দিত। এ ছাড়া নৃত্যগীতকে জীবিকা হিসেবে নেওয়ার প্রচলন ছিল। এই সমস্ত কিছুর মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হয়েছিল নারীকে ও নারীর শরীরকে ভোগ্যপণ্য করার বিষয়টি। এভাবে প্রাচীন ভারতীয় সমাজে নিম্নবর্গের নারীর দুঃখ-দুদর্শাপূর্ণ জীবনের সচিত্র প্রতিবেদনে ভাস্বর চর্যাপদ।

২.১

চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এর আগে বাংলা ভাষায় রচিত তেমন কোনো সাহিত্যকৃত সন্ধান পাওয়া যায় না। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যক্ষেত্রে একালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক নিদর্শন *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*। শ্রীকৃষ্ণ, রাধা ও বড়াই–এই কাব্যের তিনটি চরিত্র মুখ্য। এর মধ্যে বড়াইয়ের কথাবার্তায়, আচার-

আচরণে গোপপল্লীর অমার্জিত, অসংস্কৃত মূল গ্রাম্যতা কাব্যদেহের প্রায় সর্বত্র বর্তমান। এই শিথিলতা, নৈতিকতা, ক্ষয়িষ্ণু সমাজে বিশেষত অনভিজাত লোকজীবনেই স্বাভাবিক ছিল। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ছিল ধর্মাশ্রয়ী। ধর্মাশ্রয়ী সাহিত্যশাখার সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং বৃহত্তম শাখা হলো মঙ্গলকাব্য। কাব্যগুলোতে সেই হিসেবে দেবতাদেরই প্রলম্বিত ছায়াপাত ঘটেছে। কিন্তু জীবনকে অস্বীকার করে কোনো মঙ্গলকাব্যই রচিত হতে পারেনি। দেবতার পূজা প্রচারের কথা থাকলেও মানবজীবনের কাহিনিই হয়ে উঠেছে মুখ্য। মঙ্গল কাব্যের মধ্যে *মনসামঙ্গলই* সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মঙ্গলকাব্য। এখানে দেবী মনসাও স্বর্গবাসী দেবতাগণের মধ্যে বর্ণবৈষম্যের শিকার। মনসা দেবী হলেও সে মূলত অন্ত্যজ মানুষের দেবী। কবি কেতকাদাস তাঁর *মনসামঙ্গল* কাব্য রচনার ইতিহাস বর্ণনাকালে এ কথা উল্লেখ করেন। উচ্চকোটির মানুষের পূজা পাওয়ার জন্য তার সংগ্রাম। চরিত্রসমূহের মধ্যে স্বর্গের ধোপানী নেতাই এখানে গুরুত্বপূর্ণ নিম্নবর্গীয় নারী। যার সাহায্য নিয়ে বেহুলা স্বর্গলোকে পৌঁছায় এবং স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনে। নেতাইয়ের জন্ম শিবের চোখের জল দিয়ে আর কাহিনিতে সে মনসার প্রধান পরামর্শদাত্রী। (সুশোভন, ১৪১৩ব.: ১৬০) চৈতন্যোত্তর যুগের মঙ্গলকাব্যগুলোর মধ্যে *চণ্ডীমঙ্গল* প্রকৃত অর্থে নিম্নবর্গের মানুষের আয়োজন। এখানে আছে দুটি কাহিনি –একটি কালকেতু ব্যাধের কাহিনি, অন্যটি ধনপতি সদাগরের কাহিনি। প্রথম কাহিনিটি ব্যাধ সমাজের; এই ব্যাধ অন্ত্যজবর্ণের মানুষ। দেবী চণ্ডী কোনো অপদেবতা নন, তিনি অনার্য অন্ত্যজজনের দেবী। তিনি অভয়দাত্রী বিপদগ্রস্ত পশুকুলকে ব্যাধের আক্রমণ থেকে রক্ষাকারী। এখানে নিম্নবর্গের নারী রূপে পাওয়া যায় সঞ্জয়ের কন্যা এবং কালকেতুর স্ত্রী ফুল্লরাকে। এই ব্যাধ নারী স্বামীর শিকারলব্ধ মাংস বিক্রি করে এবং সেই টাকায় সংসার চালায়। সে বুদ্ধিমতী এবং প্রথাগতভাবেই স্বামী অন্তঃপ্রাণ। ফুল্লরা চরিত্রের মধ্য দিয়ে ব্যাধ জীবনের নিবিড় অভিজ্ঞতা যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি কবি মুকুন্দরামের সামাজিক অভিজ্ঞতা ও আন্তরিকতার পরিচয় রূপদক্ষ শিল্পীর ন্যায় প্রকটিত হয়েছে। (মনজুর, ১৫৫ :২০১৬) এ ছাড়া আছে ফুল্লরার মা হীরাবতী আর শাশুড়ি নিদয়া। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নিয়ম অনুসারে এই সমস্ত অন্ত্যজ নিম্নবর্গের নারীর বিনির্মাণ ঘটেছে। *ধর্মমঙ্গল* কাব্যে অন্ত্যজ নারীর দেখা পাওয়া যায় লখিয়াকে, যে কালু ডোমের পত্নী। লখিয়া চরিত্র ছাড়াও নয়নী, ভাজনবুড়ি, সুরক্ষী, সনকা, গুরক্ষীর মতো অন্ত্যজ নারীর দেখা মেলে।

২.২

মঙ্গলকাব্যে'র শেষ পর্যায় *অন্নদামঙ্গল কাব্য*। এই কাব্যটি তিনটি খণ্ডে রচিত তিনটি স্বতন্ত্র কাব্য। প্রথম ভাগ শিবায়ন ও দেবীমঙ্গল, দ্বিতীয় কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান এবং তৃতীয় ভাগ

মানসিংহ প্রতাপাদিত্য ভবানন্দ উপাখ্যান। *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে খুব সামান্য সন্নিপাত রচিত নিম্নবর্গের নারী চরিত্র ঈশ্বরী পাটুনী। তার সামান্যে অসামান্যের ধৃষ্টতা পাঠককে মুগ্ধ করে রেখেছে। (রুমা, ২০০২ : ১৩৪) 'অন্নদার ভবানন্দ ভবনে যাত্রা' অংশে 'গাঙ্গিনীর তীরে' অবতীর্ণ অন্নদা পাটুনীকে পার করতে বলে। দেবী উপস্থিতি অনুভব করে কৌতূহলবশত এই অন্ত্যজ নারী তাকে অনুসরণ করলে, তখন দেবী তাকে বর দিতে চাইলে, সে কৃতজ্ঞচিত্তে বলে–

প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে যোড় হাতে।

আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।। (ভরতচন্দ্র, ২০০১ : ১৭১)

দেবীর কাছে বর চাওয়ার মধ্যে ঈশ্বরী পাটুনী যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে তা অবিস্মরণীয়। নিজের সুখের পরিবর্তে, সে চেয়েছে তার পরবর্তী প্রজন্মের স্বাচ্ছন্দ্যে বাঁচার রসদটুকু। নিজের পূর্বে সন্তানের সুখ মাতৃত্বের সবচেয়ে বড় চাওয়া। ঈশ্বরী পাটুনী নামক এই অন্ত্যজ নারী তার সন্তানের দুধে-ভাতে থাকার বর দেবীর কাছে চেয়ে নিয়েছে। সন্তানবৎসল নারীর শুধু সন্তানের জন্য প্রার্থনা। বাংলার দরিদ্র অন্ত্যজ এই নারীর, এই কামনা চরিত্রটিকে মুহূর্তের মধ্যে করে তুলেছে জীবন্ত। (সুশোভন, ১৪১৩ব : ১৬০)

২.৩

মধ্যযুগের অনুবাদ কাব্যের আলোচনায় মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতে অন্ত্যজ-জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। কৃত্তিবাসী রামায়ণে মন্থরার দেখা পাওয়া যায়। রাজা দশরথের দ্বিতীয় স্ত্রী ভরতজননী কৈকেয়ীর পিতৃগৃহ থেকে আগত কুব্জা দাসী মন্থরা। মন্থরা ঈর্ষাপরায়ণ, কূটবুদ্ধিসম্পন্না। কৈকেয়ী চরিত্রকে সফল করতে মন্থরা অধিকতর সার্থক ও সমন্বয়ীর ভূমিকা রেখেছে। নিম্নবর্গের নারী চরিত্র নির্মাণে কৃত্তিবাসের যে নৈপুণ্য, তার দৃষ্টান্ত মন্থরা। রামায়ণের পাশাপাশি মহাভারতে আমরা অন্ত্যজ নারী রূপে পাই মৎস্যাগন্ধাকে। মৎস্যাগন্ধা ধীবর পিতাকে নদী পারাপারে সাহায্য করতেন। পরাশর ঋষির কামার্ত বাসনাকে পূর্ণ করার ফলে তার গন্ধ দূর হয়ে সে সুগন্ধী নারীতে রূপান্তরিত হয়েছিল। তাই পরবর্তীতে তার নামকরণ হয়েছিল গন্ধবতী। রাজা শান্তনুর সঙ্গে বিয়ের পর তার নামকরণ হয়েছে সত্যবতী। অন্ত্যজ এই নারী মহাভারতের আদিপর্বের কাহিনিকে সমৃদ্ধ ও নিয়ন্ত্রণ করেছে।

৩.

বাংলা উপন্যাস দেখতে দেখতে সার্ধশত বছর পার করে চলেছে। পাশ্চাত্য 'নভেল'-এর প্রভাবে এর যাত্রা শুরু হলেও বাংলা উপন্যাস আত্মশক্তিতে ভরপুর সাবালক একটি ধারা। জীবনকে দেখা ও

দেখানোর প্রতিশ্রুতি নিয়ে উপন্যাসের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল। ভারতীয় সংস্কৃতির ওপর ইংরেজ সংস্কৃতির সেই আরোপিত আধুনিকতায় বেড়ে ওঠে বাংলা উপন্যাসের শারীরিক সৌন্দর্য। অন্তঃশিলায় ক্রিয়াশীল ছিল এদেশীয় সমাজ-সংস্কৃতির সমকালীনতার পরিপুষ্টি। সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রত্যেকটি উপন্যাস এক একটি স্বতন্ত্র মানবসংসার, স্বতন্ত্র জীবনখণ্ড। প্রতিটি উপন্যাস এক একটি নিজস্ব প্রতিনিধিস্থানীয় জীবননাট্যকে আমাদের অন্তর্দৃষ্টিতে জীবন্ত করে তোলে। প্রতিটি উপন্যাসের মধ্যে আমরা নতুন মানুষের, নতুন সব জীবনকে আবিষ্কার করি। যা আধুনিক মানুষের চরিত্রের একটি অধিগত বিষয় বলেও প্রখর হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের কাছে পাঠকের সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষার বিষয় হলো চরিত্রের আদ্যোপান্ত রহস্যের আবিষ্কার। সময় ও সভ্যতার বিবর্তন মানবচরিত্রের বিভিন্ন দিককে নানাভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। ঔপন্যাসিকের বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গিতে সমকালীন পরিপ্রেক্ষিতে চরিত্রের অনুলিপি রচিত হয়েছে। সেই কারণেই মানুষের ব্যক্তিত্বের রহস্যের অনুসন্ধান অনেকাংশে একালীন প্রয়াস। তাই ঘোষিতভাবে হোক আর অঘোষিতভাবেই হোক, উপন্যাসের মৌল প্রেরণা হলো ব্যক্তিত্বের রহস্যমোচন, ব্যক্তিত্বের অন্তর্গত ভাবনার প্রকাশ ও পরিচয়। সাহিত্য শেষ পর্যন্ত ব্যক্তির প্রকাশ, ব্যক্তিরই সৃষ্টি। ব্যক্তি প্রতিভায় সেখানে অপূর্ব বস্তু নির্মাণক্ষম প্রজ্ঞা হয়ে দেখা দেয়, অসম্ভবকে সম্ভব করে। সেখানে বারবার প্রমাণিত হয়েছে মানুষের সৃষ্টি ক্ষমতার অসীমতা।

৩.১

বাংলা উপন্যাস উপক্রমলগ্নে বহুবিজ্ঞজনের হাতে প্রলম্বিত ও প্রতিবিম্বিত হলেও সেখানে সর্বার্থেই আধুনিক বাংলা উপন্যাসের জনকরূপে স্মরণীয় হয়ে আছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বাংলা উপন্যাসের স্রষ্টারূপে নয়, শিল্পরূপের স্রষ্টা হিসেবে তিনি আদি কলাকার। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলায় গল্পের রসপ্রবাহ প্রবাহিত করলেন, বাঙালির সাহিত্য সুরপ্রবাহে নবতরঙ্গের উন্মাদনা আনয়ন করলেন। এ প্রসঙ্গে সুকুমার সেনের মতামত:

> তিনি বাঙ্গালীর সংসারের ছবি আঁকিতে বসেন নাই। তিনি এমন কোন ঘটনার অবতারণা করেন নাই যাহা বাঙ্গালীর অভিজ্ঞতায় সচরাচর ঘটিয়া থাকে। বঙ্কিম চাহিয়াছিলেন গল্প জমাইতে, সাহিত্যপাঠে নূতন আগ্রহ জাগাইতে। তাই তিনি রোমান্সের ফ্রেমটিই বাছিয়া লইয়াছিলেন, এবং সেই ফ্রেমের মধ্যে তাঁহার শিল্প-আদর্শকে রূপ দিতে পারিয়াছিলেন। সাহিত্য সৃষ্টির এই নূতন ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ফসল ফলাইবার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব বঙ্কিমচন্দ্রের। (সুকুমার, ১৩৮৬ ব, ২য় খণ্ড : ৩৩০)

বঙ্কিমচন্দ্রের *দুর্গেশনন্দিনী* বাঙালি পাঠকের হাতে আসার পূর্বেই ইংরেজি উপন্যাসের কুশলীকথার সঙ্গে বাঙালি পাঠক পরিচিত ছিলেন। বাঙালি পাঠকের অপেক্ষা ছিল শুধু এমন একটি উপন্যাসের

জন্য, যা পড়লে ইংরেজি উপন্যাস পাঠের অনুভূতির সঞ্চার হবে; তবে তা হতে হবে বাংলা ভাষায় রচিত। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্রের সবচেয়ে বড় অবদান, বাঙালি পাঠককে বাংলা ভাষায় উপন্যাসের রস আস্বাদনের সুযোগ তৈরি করে দিয়েছিলেন তিনি। *দুর্গেশনন্দিনী* (১৮৬৫) তাঁর সফল পদক্ষেপ, পাশাপাশি নতুন, নতুন গল্পের প্রেক্ষাপটে পাঠককে উৎসারিত আগ্রহে নিমজ্জিত করে রাখেন। বাংলা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র যে আধুনিকতাকে প্রামাণিক করে তুললেন, তার ফলে উপন্যাস পড়তে পড়তেই পাঠকের কাছে উপন্যাসের সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়ে উঠল। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের বা কাহিনিগদ্যের যে ধরন, যে ফর্ম প্রতিষ্ঠিত করলেন তার ভেতর কোনো অনিশ্চয়তা ছিল না, কোনো দ্বিধা বা সংকোচ ছিল না। কারণ তাঁর ইউরোপীয় মডেলই ছিল একমাত্র সার্থক ও সফল মডেল। সেরকম ভাবে উপন্যাস লিখলেই বাংলায় উপন্যাস হবে, নইলে হবে না, বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের ফর্ম সম্পর্কে ছিল এমনই স্থিরজ্ঞান ও স্থিতসিদ্ধান্ত। তাই তাঁর প্রথম উপন্যাসই পুরো উপন্যাস। (দেবেশ, ২০১৬ : ২২) এই পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসের জনক ও সফল ঔপন্যাসিক রূপে সর্বজনবিদিত আসন অর্জন করে নিলেন।

৩.২

উপন্যাসের আধুনিকতার যে প্রত্যয় বাঙালি ঔপনিবেশিক শিক্ষা থেকে পেয়েছিল, তার ওপর আলো নিক্ষেপ করলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উপন্যাসের বাস্তবতা, চরিত্রগঠন, কাহিনিনির্মাণ সমগ্রতার মধ্যেই ঔপনিবেশিক আধুনিকতার শিক্ষাকে সঞ্চারিত হতে দেখা যায়। বাংলা উপন্যাসে নারীচরিত্রের প্রতিষ্ঠা পরিব্যাপ্তিও বঙ্কিমচন্দ্র দ্বারা হয়েছিল। বঙ্কিমের প্রথম সার্থক উপন্যাস *দুর্গেশনন্দিনী* (১৮৬৫) তে যে সব নারী চরিত্রসমূহ দেখতে পাওয়া যায়, তা ইতোপূর্বে রচিত বাংলা সাহিত্যের নারীর অবস্থান থেকে অনেকখানি অগ্রসর এবং আধুনিক। পাশ্চাত্য ভাবধারার উদার মানবিকজ্ঞান চর্চা বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রভাবিত করেছিল। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল চিরাচরিত ভারতীয় দর্শন, যা দীর্ঘদিনের ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতি দ্বারা পুষ্টি লাভ করেছে। বঙ্কিম-মানসে পাশ্চাত্য ভাবধারার উদারপন্থী নীতি, অন্যদিকে ভারতবর্ষের সনাতন রীতিনীতি দিয়ে গড়ে উঠা সংস্কার বিশ্বাস-এই দু'য়ের টানাপোড়েন সুস্পষ্ট। বঙ্কিম-মানসে এই দ্বৈতের দ্বন্দ্ব তাঁর নারীচরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কার্যকর ভূমিকা নিয়েছে। (নাহিদ, ২০১১ : ১৭-১৮) বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে বাঙালির পারিবারিক জীবনের মানবিক উপকরণসমূহকে ভারতীয় ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উপস্থাপন করেছেন। সমাজের ও ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ের নরনারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা কীরূপ ছিল, তাও যথার্থরূপে দেখানোর চেষ্টা

করেছিলেন তিনি। এই ধারণা থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের কথাসাহিত্যে নারীচরিত্রের স্বরূপ সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা পাওয়া যায়।

৩.৩

সাহিত্য ব্যক্তিমনীষার প্রত্যক্ষ সৃষ্টি, কিন্তু ব্যক্তির পেছন থেকে সমাজই যে অভিব্যক্ত করছে নিজেকে এবং অপরদিকে সমাজ নিজেও যে আবার প্রভাবিত হচ্ছে ওই সৃষ্টি দিয়ে–এই ঐতিহাসিক বস্তুবাদী জ্ঞান আজ যেমন সহজলভ্য, বঙ্কিমের সময়ে তেমনটা ছিল না। তাই বঙ্কিমের উপন্যাসে আমরা শুধু বঙ্কিমের সত্তার পরিচয়ই পাই না; তাঁর সময় ও শ্রেণির পরিছাপও পাই। (সিরাজুল, ২০১৮ : ১৫৪) মহৎ প্রতিভার ধর্ম হলো মাধুকরী হওয়া। প্রকৃতি, ব্যক্তিমানসের ও সমাজজীবনের সহজাত রূপকার হওয়া শিল্পীর সহজাত প্রবণতা। রূপকার হিসেবে শিল্পী সমৃদ্ধ হয় মাধুকরীর হয়ে উপাদান সংগ্রহ করার মধ্য দিয়ে। এই পথে ধরে একজন লেখকের দ্বারা আর একজন লেখকের স্বাতন্ত্র্যের মাপকাঠি তৈরি হয়; যা তাঁর নিজস্ব মৌলতার মাপকাঠিকে নিরূপণ করে। ‘বঙ্কিমচন্দ্র দেশ-কাল-সমাজসচেতন, মানুষের বৃত্তি-প্রবৃত্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ একজন জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনাসম্পন্ন মনীষী-মনস্বী ব্যক্তি ছিলেন।’ (আহমদ, ২০০৩ : ১১) তাঁর সূক্ষ্ম ও সতর্ক দৃষ্টির পরিচয় আলাদা করে অন্য কোথাও নয়, তাঁর সৃষ্ট বিভিন্ন চরিত্রের সমাবেশের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়েছে। তিনি কেবল উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী আচরণ কেবল নিয়ন্ত্রণ করেননি, অনুসরণও করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের বিস্তৃত্ব পটভূমিতে এমন অসংখ্য নিম্নবর্গের নারীর সন্ধান পাওয়া যায়, যারা সবাই সবার থেকে আলাদা। তাদের স্বাতন্ত্র্যের সারবত্তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তৈরি করে দিয়েছে নির্দিষ্ট ও নিজস্ব অবস্থান।

৩.৪

উনিশ শতকের ভারতীয় জীবনের পরতে পরতে রয়েছে নারীর বৈষম্যপূর্ণ জীবনের প্রতিচ্ছবি। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে বা তারও পূর্বে থেকে গৃহশ্রমের ক্ষেত্রে দুই ধরনের নারীর ভূমিকার কথা আমরা জানি। এদের একজন পরিবারের জননী বা বধূ আর একজন পরিচারিকা। মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত পরিবারে সাধারণত পরিবারের নারী সদস্যরা গৃহকর্ম সম্পন্ন করে থাকে। উচ্চবিত্ত পরিবারসমূহে গৃহকর্মের প্রয়োজনে এক বা একাধিক পরিচারিকা থাকে। অনেক সময়, অনেকে বংশানুক্রমিকভাবে এই পেশার সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং তা এক দিন দুই দিনের জন্য নয়। আমৃত্যু তারাও ঐ পরিবারের সেবায় নিয়োজিত থাকে। ‘পরিচারিকার’ প্রচলন ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকেই দেখা গিয়েছিল। ঋগ্বৈদিক সাহিত্যে ‘দাসদাসী’ শব্দটির বহুল প্রচলন রয়েছে। স্মৃতিশাস্ত্র ও মহাকাব্যগুলোতেও নারীর

দাসত্বের কথা রয়েছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যগুলোতে যথা চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এ রাধা-কৃষ্ণের সেবার কাজের সঙ্গে যুক্ত গৃহভৃত্য/ গৃহদাসীদের সম্পর্কে নানান কথা জানা যায়। মোগলযুগের রাজপরিবার, নবাবি পরিবার, অভিজাত ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোতেও প্রচুর দাস-দাসীর প্রচলন ছিল। (অমল, ২০১৩ : ১৭০) তারই পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চবর্গের জীবননির্ভর যে সমস্ত সাহিত্য রচিত হয়েছে, সেখানে নিম্নবর্গের নারীর পরিচারিকা রূপের আবশ্যিক অবস্থান লক্ষণীয়। বঙ্কিমচন্দ্রে উপন্যাসের বৃহৎ পরিসরে এই নারীর সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল নয়। উচ্চবর্গের পরিবৃত্তে অবস্থানরত সেই সব নিম্নবর্গের নারীর সম্যক জীবনব্যবস্থা আমরা এই গবেষণায় তুলে ধরতে প্রয়সী হব।

৩.৫

আর্থিক মূল্যের বিনিময়ে কোনো নারী যখন অন্য একটি পরিবারে শ্রমদান করে, নিম্নবিত্তের সেই নারীকে তখন পরিচারিকা বলে গণ্য করা হয়। 'পরিচারিকা' শব্দটির মধ্যে একটি বিশেষ জীবিকাধারী নারীকে চিহ্নিত করা হয়। তারা শুধু কায়িক শ্রমই দান করে না, পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সেবার দ্বারা মনিবশ্রেণির প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা অর্জন করে। সাহিত্য যেহেতু সমাজের প্রতিরূপক, সুতরাং যেখানে সমাজজীবনের প্রতিবিম্ব প্রত্যক্ষ হবে সেটাই স্বাভাবিক :

> সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবশ্য বয়ন-নির্বিশেষে, সমাজ-সংসারের এই বিশেষ ভূমিকায় নারীদেরকে সাহিত্যকর্তাগণ তাঁদের সৃষ্টিক্ষেত্রে স্থান দিয়েছেন। বহুস্থলে আবার তারা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রও হ'য়ে উঠেছে। সাহিত্যে পরিচারিকার বিশেষ ভূমিকা প্রাচীনযুগ থেকেই লক্ষ্য করা যায়। 'রামায়ণ'-এ মন্থরার কুমন্ত্রণায় কাহিনীর সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। (দেবযানী, ২০১৪ : ১৫৭)

প্রাচীনকাল থেকেই সাহিত্যে নারীর পরিচারিকারূপী অবস্থান অঙ্কিত হয়ে এসেছে। কখনো মূল নারী চরিত্রের সহযোগী রূপে সীমাবদ্ধ থেকেছে; কখনো নিজস্ব চেতনারূপে স্ব-অবস্থানে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। রামায়ণের মন্থরা সেখানে উল্লেখযোগ্য; আবার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়াইও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এভাবেই পৃথিবীর সকল সমাজে নারীর অবদান আবশ্যক হয়ে ওঠে; তারপরও নারীই যত অবহেলা আর লাঞ্ছনার শিকার হয়ে থাকে।

৩.৬

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাতে বাংলা উপন্যাসের মুক্তি ঘটলেও, সাধারণ বা সর্বস্তরের মানুষের জীবন উপাখ্যান সেখানে স্থান পায়নি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধ-নিবন্ধে বাংলার কৃষক, শ্রমিক প্রভৃতি নিম্নবর্গের

মানুষের সঙ্গে জমিদার ও তথাকথিত মহাজন শ্রেণির সম্পর্কের নীতিগত বিভিন্ন দিক আলোচনা করলেও তাঁর উপন্যাসে এসব প্রসঙ্গ অনালোকিত থেকেছে। বঙ্কিম-কথাসাহিত্যে গণচেতনার বিষয়সমূহ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থেকেছে। রোমান্স-প্রবণতাই তাঁর উপন্যাসে একান্ত সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তিনি গ্রামীণ অভিজাত ও ভূম্যধিকারী সম্প্রদায় থেকে তাঁর প্রধান চরিত্রগুলো আহরণ করেছেন। (দেবসেন, ২০১২ : ৪৫) ঔপনিবেশিক কালপর্বে, বাংলা উপন্যাসের সূচনাপর্বের সময়ের সাধারণ মানুষের কথা বড় মাত্রায় স্থান পায়নি। কারণ এই শ্রেণির নিম্নবিত্তের বা নিম্নবর্গের পরিচয় ঘটেছে পরিচারিকা চরিত্রগুলোর মধ্যে। 'সাহিত্যের ক্ষেত্রে বয়স-নির্বিশেষে, সমাজ-সংসারের এই বিশেষ ভূমিকায় নারীদেরকে সাহিত্যকর্তাগণ তাদের সৃষ্টিক্ষেত্রে স্থান দিয়েছেন। বহুস্থলে তারা গুরুত্বপূর্ণ সব চরিত্রও হয়ে উঠেছে।' (দেবযানী, ২০১৪ : ১৫৭) সাহিত্যে পরিচারিকা প্রাচীনকাল থেকেই অঙ্কিত হয়ে এসেছে। অভিজাত শ্রেণির জীবনাচারে পরিচারিকার একটি ভূমিকা থাকে, তা সে সেবাদাত্রী হিসেবে বা সঙ্গদানকারী হিসেবে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের শুরু থেকেই এই সেবাদাত্রী নামক নিম্নবর্গের নারী উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

৪.

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস *দুর্গেশনন্দিনী* (১৮৬৫) তে সেবাদাত্রী ও প্রণয়দূতী রূপে বিমলাকে পাওয়া যায়। উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদ থেকেই সে সক্রিয়। উপন্যাসে তাকে সর্বদা প্রধান পরিচারিকা রূপে পরিচিত করা হলেও তিনি মূলত তিলোত্তমার পিতা বীরেন্দ্র সিংহের উপপত্নী। বিমলা চরিত্রের বাৎসল্য ও সহৃদয়তা তিলোত্তমাকে মাতৃত্বের স্নেহে বড় করেছে, বন্ধুত্বের অন্তরঙ্গতায় আপন করেছে। বিমলার জন্মগত গ্লানি তার সম্মানজনক জীবনের পথে বাধা হয়েছে। যদি অবৈধ জন্মকে 'পাপ' বলা হয়, তাহলে সে বড় হয়েছে তার মায়ের একনিষ্ঠ প্রেমের দুঃখকে সঙ্গে করে। সে ছিল কাশীর শূদ্রাণী কুমারীর গর্ভজাত কন্যা। যৌবনে বিমলার প্রতি বীরেন্দ্রসিংহের প্রণয় মুগ্ধতার সৃষ্টি হলেও, কুলবধূর মর্যাদা দিতে অস্বীকৃতি জানান। জন্মপরিচয়ের পঙ্কিলতা বীরন্দ্রে সিংহের মনে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়তে বাধা সৃষ্টি করলেও, তাকে উপপত্নী বা রক্ষিতারূপে ব্যবহার করতে দ্বিধান্বিত করেনি। জগৎসিংহের সঙ্গে পরিচয়কালে তার পরিচারিকার পরিচয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলে বলেছে : 'আমি পরিচারিকা নহি। অদৃষ্টক্রমে পরিচারিকার ন্যায় আছি, অদৃষ্টকেই বা কেন দোষী? আমার অদৃষ্ট মন্দ নহে!' (বঙ্কিমচন্দ্র, ২০০৬ : ৮৮) এই ভাবনার মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গজাত এই নারী নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছে, মেনে নিয়েছে জীবনের বাস্তবতাকে। বিমলার স্রষ্টা তাকে সামাজিক মর্যাদায় পশ্চাৎপদ

করলেও মানুষ হিসেবে সে ছিল উচ্চগুণসম্পন্ন নারী। শৈলেশ্বরের মন্দিরে জগৎসিংহ বিমলার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তার উত্তর প্রদানের মধ্যে তার ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে :

> স্ত্রীলোকের পরিচয়ই বা কি, যাহারা কুলোপাধি ধারণ করতে পারে না, তাহারা কি বলিয়া পরিচয় দিবে? গোপনে বাস করা যাহাদিগের ধর্ম, তাহারা কি বলিয়া আত্মপ্রকাশ করিবে? যেদিন বিধাতা স্ত্রীলোককে স্বামীর নাম মুখে আনিতে নিষেধ করিয়াছেন, সেইদিন আত্মপরিচয়ের পথও বন্ধ করিয়াছেন। (বঙ্কিমচন্দ্র, ২০০৬ : ২৭)

বিমলার এই আত্মজিজ্ঞাসায় উনিশ শতকের নবজাগ্রত নারীচৈতন্যের আভাসের সুর ধ্বনিত হয়েছে। তিলোত্তমার অনুরাগ-আসক্ত জগৎসিংহের হাতে তাকে তুলে দেয়ার মাধ্যমে সে মাতৃত্বের দায়িত্বকে পূর্ণতা দিয়েছে। 'এভাবে স্নেহ-প্রেম-দ্রোহে বিমলা চরিত্রটি উপন্যাসে তাৎপর্যময় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।' (ফেরদৌসী, ২০১১ : ১৫৮) *দুর্গেশনন্দিনী* উপন্যাসে প্রচলিত অর্থে আরো একজন পরিচারিকা পাওয়া যায়, তার নাম আশ্‌মানি। এই চরিত্রটি লেখক শুধু হাস্যরস সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই নির্মাণ করেছে, এর চেয়ে বেশি তাৎপর্য তার মধ্যে পাওয়া যায় না।

৪.১

দুর্গেশনন্দিনীর পর *কপালকুণ্ডলা* (১৮৬৬) উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মতিবিবি ওরফে পদ্মাবতীর পরিচারিকা হিসেবে পাওয়া যায় পেষমনকে। চরিত্র হিসেবে উপন্যাসে তার প্রাসঙ্গিক গুরুত্ব কম, তবু ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র পেষমনকে সৃষ্টিতে অবহেলা বা অতিরঞ্জনের প্রবলতা দেখাননি। উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক পরিবৃতি একজন নিম্নবর্গের নারীকে যে মাপকাঠিতে বিচার করে, ঔপন্যাসিক সেই সংশ্লেষে পেষমনকে তুলে ধরেছেন। অলংকার ও মূল্যবান পোশাকের প্রতি সাধারণ নারীসুলভ আকর্ষণ তার চরিত্রকে আরো অধিক জীবন্ত করে তুলেছে। মতিবিবির বিশ্বস্ত অনুচর হিসেবে ভবিষ্যতে এগুলো তারই প্রাপ্য ছিল। তবে আগ্রার বিলাস-ব্যসনের জীবন পরিত্যাগ করে সপ্তগ্রামের পথে যাত্রায় তার আগ্রহ ছিল না। এ ছাড়া পরশ্রীকাতর মতিবিবির মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যার প্রয়োজনে কাহিনিতে পেষমনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। কারণ মতিবিবি তার মানসিক অবস্থার অনেকাংশই বর্ণনা করেছেন পেষমনের কাছে। বাংলা উপন্যাসের সূচনালগ্নে সাধারণ মানুষ অবস্থান স্পষ্ট না হলেও, কাহিনির প্রয়োজনের কেন্দ্রীয় চরিত্রের পরিপূর্ণতায় তাদের প্রয়োজন হয়েছে। 'পেষমন স্বল্পপ্রাণ নারী। তার লোভ আছে, সহজ ভোগবৃত্তি পর্যন্ত তার বাসনা। সে বড় লোভ চিত্তের অহঙ্কার প্রাপ্তিকে ছাপিয়ে অপ্রাপ্তি পর্যন্ত প্রসারিত তার তাৎপর্য বোঝার ক্ষমতা পেষমনের নেই।' (ফেরদৌসী, ২০১১ : ৭২) এই ক্ষুদ্র স্বার্থের বাইরে আছে তার নিবেদিত নিঃস্বার্থ প্রাণের পরিচয়; জীবনবোধের স্বতঃস্ফূর্ত ছোঁয়ায়

নিম্নবর্গের এই নারী পরিপূর্ণ এক মানুষ। পেষমনের কিছু কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দাসীর চেয়ে বিশেষ উন্নত নয়, তবু মানবিক গুণাগুণে সে একজন পরিপূর্ণ মানুষ।

৪.২

মৃণালিনী (১৮৬৯) উপন্যাসের গিরিজায়ার মধ্যে ছিল পরোপকারী মনোবৃত্তির এক মানবিক ঐশ্বর্য। সে খুব সাধারণ একজন নারী, যার পেশা ছিল ভিক্ষাবৃত্তি। পেশাগত জীবনে ভিক্ষাজীবী হয়েও মানসিক ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ এক স্বনিযুক্ত সেবাদাত্রী। অর্থের বিনিময়ে নিযুক্ত সে কোনো পরিচারিকা নয়। এখানেই সে অন্য যেকোনো নিম্নবর্গের নারী থেকে আলাদা। মৃণালিনীর দুঃখের দিনে তার যথার্থ সহচারী হিসেবে পাশে থেকে যথার্থ সুহৃদতার পরিচয় দিয়েছে। এমন নিঃস্বার্থ ত্যাগের উদাহরণ খুব কমই দৃষ্টিগোচর হয়। ‘আবহমান কাল ধরে ভারতে শ্রেণিবিভক্ত সমাজের নিম্নস্তরে তথাকথিত ব্রাত্য-সমাজের অস্তিত্ব বিদ্যমান। খাদ্য-বস্ত্র ও বাসস্থানের সমস্যা বহু যুগ ধরে ভারতের সাধারণ মানুষের কঠিন ও চিরন্তন সমস্যা।’ (সুবোধ, ২০১২ : ৫৭) জীবনধারণের মৌলিক সামগ্রীর সমস্যা সাধারণ মানুষকে সদা ভাবিত করেছে। যার ফলে যুগ যুগ ধরে উচ্চবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারে দাস-দাসীর সমাগম প্রচলিত হয়ে আসছে।

৪.৩

বঙ্কিম উপন্যাস পরিমণ্ডলের বৈচিত্র্যময় সম্ভারে *বিষবৃক্ষ* (১৮৭৩) অন্যতম সার্থক কৃতাঞ্জলি। সমাজের উচ্চাসনের অভিজাত মানুষের জীবনাখ্যানের কূটকৌশলে হীরা নামক এই কায়স্থকন্যা উপস্থাপিত হয়েছে দাসী হিসেবে। বাল্যবিধবা হীরা একই সঙ্গে বুদ্ধিমতী ও সুন্দরী। হীরা বিধবা হলেও জীবনের সুন্দর সবদিকের প্রতি তার রয়েছে অনাবিল আকাঙ্ক্ষা: ‘হীরার বাড়ী প্রাচীর আঁটা। দুইটি ঝরঝরে মেটে ঘর। তাহাতে আলপনা –পদ্মআঁকা–পাখী আঁকা–ঠাকুর আঁকা। উঠান নিকান– এক পাশে রাঙ্গা শাক, তার কাছে দোপাটি, মল্লিকা, গোলাপ ফুল।’ (বঙ্কিমচন্দ্র, ২০০৬ : ৩২৬) যথেষ্ট রূপ ও গুণ থাকা সত্ত্বেও তাকে জীবন কাটাতে হয়েছে দাসীবৃত্তি করে। জমিদার নগেন্দ্রনাথের স্ত্রী সূর্যমুখীর অন্দরমহলের প্রধান পরিচারিকা হওয়ায় চোখের সামনে সূর্যমুখী-নগেন্দ্রের সুখী দাম্পত্যপ্রেম গড়ে উঠতে দেখেছে; প্রস্ফুটিত দাম্পত্যকে দেখেছে শুকিয়ে ঝরে পড়তেও। নিজের জীবনের সুখ-শূন্যতা তাকে স্পর্ধিত করেছে অন্যদের জীবনের শান্তিকে অশান্তিময় করে তুলতে। অন্যের দয়া, অনুগ্রহে তাকে বাঁচতে হয়েছে, চলতে হয়েছে; সামাজিক এই অসমীকরণের অন্তর্দাহ তাকে নিয়োজিত করেছে হীন চক্রান্তে। আত্মসুখ নিরাপদ ভবিষ্যৎ ও সামাজিক সম্মানের আশাবোধ তাকে অনুগামী করে

তুলেছিল দেবেন্দ্রের প্রতি। ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিভেদের নীতি সেদিনের সেই সমাজের অসংখ্য নারীকে অতৃপ্ত জীবনাকাঙ্ক্ষায় বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। তার জন্য ব্যক্তি হীরা যত না দায়ী, তার অপেক্ষা অনেক বেশি দায়ী সেদিনের সমাজ, সামাজিক অনুশীলন। *বিষবৃক্ষ* উপন্যাসে হীরা কপট লোভী ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হলেও সে অনেক বেশি জীবন্ত চরিত্র উচ্চবর্গের পরিশীলিত নারী চরিত্রের তুলনায়। শুধু বঙ্কিম উপন্যাসেই নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যে পার্শ্বচরিত্র হিসেবে তার মতো প্রাণ প্রাণপ্রাচুর্য পূর্ণ নারী চরিত্র কমই আছে। বাংলা উপন্যাসের আদি অধ্যায়ে তার মতো অধিকার ও আত্মমর্যদাবোধপূর্ণ নিম্নবর্গের নারী অপ্রতুল।

৪.৫

বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে যে আধুনিকতাকে প্রামাণিক করে তুললেন, তার ফলে বাংলা উপন্যাসের শাখাটিকে ক্রমশ সমৃদ্ধতার পথে ধাবিত করল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস চর্চার ধরনের মধ্য দিয়ে বাংলা উপন্যাস প্রায় সার্ধশত বছরে চলে এসেছে; এর মধ্যে কিছু ব্যতিক্রমী ফসল ফলেছে। তবে, বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের প্রধান সঞ্চয় তাঁর হাতেই নির্মিত। তাঁর উপন্যাস প্রকরণে ঐতিহাসিক উপন্যাস একটি বৃহত্তম ধারা বলে জ্ঞাত করা আচারবিরুদ্ধ নয়। সেখানে *রাজসিংহ* (১৮৮২) একটি মহাকাব্যিক আখ্যানরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। উপন্যাসের নায়িকা চঞ্চলকুমারীর সখী নির্মলকুমারী। চঞ্চলকুমারীর সখি পরিচয়ের মধ্যে এই চরিত্রটি কর্মপ্রয়াস আবদ্ধ থাকেনি; পরবর্তীকালে বাদশা আলমগীরের অন্তঃপুরচারিণীর ভূমিকায় অঘটন ঘটনপটিয়সীরূপে উপন্যাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হয়ে উঠেছে। তার চাতুর্য, সাহস, উপস্থিত বুদ্ধি, সূর্যচন্দ্র-নিষিদ্ধ মুঘল অবরোধের কামনা-বাসনাময় চক্রান্তের রুদ্ধতার মাঝেও সে নিজের জন্য তৈরি করে নিয়েছিল মসৃণ গতিপথ। এমনকি বিশ্বত্রাস অপনিন্দেয় বাদশা আলমগীর পর্যন্ত তার বুদ্ধিদীপ্ততায় অভিভূত হয়েছিল। একজন রাজকুমারীর সখিত্বের এমন নিদর্শন বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। নির্মলকুমারীর ব্যক্তিগত কোনো অভিলাষ না থাকা সত্ত্বেও নিজেকে অধিষ্ঠিত করেছে এই রাজনৈতিক সংক্ষোভের কেন্দ্রস্থলে। সে বলেছে, 'আমি ঔরঙ্গজেবকে ভজিয়াছি, যেমন বিড়াল ইঁদুর ভজে। আমি যদি ঔরঙ্গজেবকে না পাই তা হলে আমার বিড়াল- খেলাটা এ জন্মের মতো রহিয়া গেল।' (বঙ্কিমচন্দ্র, ২০০৬ : ৭৫০) এই সব সাহসী উক্তি শুধু বলার জন্য নয়, এতে তার চরিত্রের বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে তার বলা সব কথার উত্তর লুকিয়ে রয়েছে। নির্মলকুমারীর চরিত্রটি অন্তর্গত বিষয়াদি বিশ্লেষণে এই ধারণা পোষণ করা চলে যে নিম্নবর্গের নারী আত্মগত সিদ্ধান্তে সব সময়ই স্বাধীন ও অবিচল। যেখানে উচ্চবিত্তের নারী চঞ্চলকুমারী বা যোধপুরী অনেক বেশি আপোসকামী ও পরাধীন।

রাজসিংহ উপন্যাসের আর একজন সাধারণ নারীর অসামান্য ট্র্যাজেডি রচিত হয়েছে, দরিয়া বিবি নামক এই নারীর অন্তর্গত অবকাঠামোর মধ্য দিয়ে। দরিয়া বিবির পেশাগত পরিচয় সে একজন আতরওয়ালী। নির্মলকুমারীর মতো দরিয়া বিবিও কল্পিত চরিত্র। ইতিহাসের সত্যকে অক্ষুণ্ন রেখে বঙ্কিমচন্দ্র উনিশ শতকের নবজাগ্রত নারী ব্যক্তিত্বকে কাহিনিতে পুনর্বিন্যাস করেছেন। দরিয়াবিবি স্বামী পরিত্যক্তা; তার স্বামী মবারক শাহজাদী জেবউন্নিসার প্রতি অনুরক্ত। বাস্তবজীবনে স্বামী যত অনাচারই করুক না কেন, তবু স্বামীকেই নারী তার জীবনের একান্ত নিজস্ব সম্পদ বলে বিবেচনা করে। দরিয়া বিবি সেই সংস্কারে গড়া এক নারী। ধর্মীয় ও সামাজিক বিধান যখন নারীকে অবদমনের সমস্ত পথ খোলা রেখেছে, তখন তাকে অস্বীকার করে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি প্রকৃতই সাহস ও স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ। ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক চালানো, স্বামীর অর্থে অনাগ্রহ প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে সে তার ব্যক্তিত্বের ছাপ রেখেছে। সাধারণ একজন নারী হয়েও তার মধ্যে উচ্চস্তরের চিন্তার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। সব চেষ্টা ব্যর্থ করে স্বামী যখন নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থেকেছে, তখন নিজের হাতে তার প্রাণ নিয়ে আপন-সম্মান প্রতিষ্ঠা করেছে। মুঘল শাসনের তমসাচ্ছন্ন যুগে এটি অকল্পনীয় ঘটনা। তাই দরিয়া বিবি নবজাগ্রত নারী ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। স্বামীকে সে যেমন ভালোবাসে, তেমনি তার অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারে। দরিয়া বিবির উক্তি: 'কি করিয়াছ? তুমি আমার কি না করিয়াছ। তুমি যাহা করিয়াছ তার অপেক্ষা স্ত্রী লোকের অনিষ্ট কি আছে?' (বঙ্কিমচন্দ্র, ২০০৬ : ৭৫৯) এটি ঊনবিংশ শতাব্দীর নারীর কাছে অকল্পনীয়। সেই অকল্পনীয় অগ্রসরতা বঙ্কিম সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এখানেই বঙ্কিম সাহিত্যের সার্থকতা ও শ্রেষ্ঠত্ব।

৪.৬

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে নিম্নবর্গের নারীর উচ্চজীবনবোধের পরিচয় যেমন পাওয়া যায়, তেমনি গ্রামীণ স্থূল রুচির কিছু নারীরও সন্ধান পাওয়া যায়। *কৃষ্ণকান্তের উইল* উপন্যাসের অপ্রধান চরিত্র হলেও পরিপ্রেক্ষিতের পরিক্রমায় তারা কাহিনির আবশ্যক উপাদান হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের কালো ভ্রমরের সুখি দাম্পত্যে যাদের গাত্রদাহের কারণ হয়ে উঠেছিল। সরল ভ্রমরের অন্তঃকরণে বপন করে দিয়েছিল সন্দেহের বীজ। প্রতিবেশী এই সমস্ত নারী চরিত্রের মানবিক বোধের দীনতা ও হিংস্রতা ভ্রমরের মনে উৎপাদন করেছিল অশান্তির কাঁটা। এই পথের আরো একজন সহচর কৃষ্ণকান্ত বাড়ির পাচিকা হরিমণি। তার সঙ্গে ছিল রায় বাড়ির আরো একজন গৃহপরিচারিকা ক্ষীরি। গোবিন্দলালের বিরুদ্ধে অপ্রিয় সব কথা বলে ভ্রমরের ক্ষতকে আরো বেশি রক্তাক্ত করেছিল ক্ষীরি। এর কারণেই ভ্রমর ক্ষীরিকে প্রহার করেছিল।

> তা ঠাকুরণ, আমাদের মারিলে ধরিলে কি হইবে–তোমারি জন্য আমরা বলি। তোমাদের কথা লইয়া লোকে একটা হৈ হৈ করে, আমরা তা সইতে পারি না। তা আমার কথা বিশ্বাস না হয়, তুমি পাঁচীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর। (বঙ্কিমচন্দ্র, ২০০৬ : ৬৯২)

এই উপন্যাসে নিম্নবর্গের নারীর নেতিবাচক দিকগুলো উঠে এসেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্স, ইতিহাস, গার্হস্থ্যজীবন সব পরিবেশে নিম্নবর্গের নারীর আবির্ভাব ও উন্মেষ ঘটেছিল; বাংলা উপন্যাসের দীর্ঘ পরিক্রমায় যার সার্বিক ও সবিস্তার পরিসর লক্ষ করা যায়।

৫.

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯০৮) একজন সমাজসচেতন শিল্পী। দেশ-কাল-সমাজ অথবা জনজীবনের বিশ্বস্ত রূপকার হয়েও স্ব-প্রতিভায় তিনি আপন দেশ-কালের গণ্ডি অতিক্রম করেছেন। শরৎ-সাহিত্য ব্রাত্যজীবনের চিত্রে পরিপূর্ণ। (দেবসেন, ২০১২ : ১১৯) বাংলা উপন্যাসে না খেতে পাওয়া অবহেলিত প্রান্তজনের কথা প্রথম নিয়ে এলেন শরৎচন্দ্র। শরৎ-সাহিত্যের আরো বড় দিক নারীকেন্দ্রিক কাহিনিতে নারীর প্রতি সমাজের শোষণের দিকসমূহ তুলে ধরা এবং পাঠকের মনে প্রশ্নের জন্ম দেওয়া। সে কারণেই বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় লেখক হিসেবে তিনি সমাদৃত ছিলেন। নিম্নবর্গের সারাৎসার বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাওয়া যায় সমাজ ও সভ্যতার বিকাশ কীভাবে নারীকে নিম্নবর্গ বা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। নারীমাত্রই প্রান্তিক। পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় সব নারীই প্রান্তিক, তা সে উচ্চবর্গ, মধ্যবিত্ত বা নিম্নবর্গ যে বর্গভুক্তই হোক না কেনো। সমাজে যেমন ব্রাহ্মণ বর্ণ-শ্রেষ্ঠ গুরু, সংসারে তেমনি পুরুষ সর্বগুণে গুণান্বিত। নিজেরা শক্তিশালী তাই নিজেরাই সমাজগঠনের দায়িত্ব নিয়ে নারীর চির-অবরোধের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। নারী পর-পুরুষের দিকে চোখ তুলে চাইলে তার পদস্খলন হয়েছে, পুরুষ সারা রাত পতিতালয়ে যাপন করে এলেও স্ত্রীর পতি-পরম-গুরু। দুর্বলের প্রতি সবলের এই অত্যাচার বোধ হয় শরৎচন্দ্রকে নারীর প্রতি সংবেদনশীল করেছিল। তাই ধর্মাচার আর সমাজাচারের বিরুদ্ধে নারীকে অন্তরের সমস্ত দরদ আর শ্রদ্ধা দিয়ে বিনির্মাণ করেছিলেন লেখক। (নীলিমা, ২০০১ : ১৯) নারীর প্রতি সহমর্মিতার প্রতিবিম্বতায় শরৎ সাহিত্য যতটা উচ্চকিত নিম্নবর্গের প্রতিভাস নির্মাণে ততটা প্রদীপ্ত নন। রবীন্দ্র-সাহিত্যের মতো শরৎ-সাহিত্যে উপন্যাস অপেক্ষা ছোটগল্পে নিম্নবর্গের সামাজিক সমস্যার প্রতিলিপি লক্ষণীয়।

৫.১

ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় নারীর জীবন যে পঙ্কিলতার পাঁকে ঘুরপাক খেয়ে নিষ্পেষিত হয়ে চলেছিল তার বহুবিধ কারণ ছিল। কুলিন প্রথার কুফল, বাল্যবিবাহ, সতীদাহ প্রথা প্রভৃতি সমস্যার সঙ্গে

জড়িয়ে ছিল অশিক্ষার বেড়াজাল। ধর্মাচার, সামাজিক বিধিবিধানের কাছে নারী ছিল কাঠের পুতুল সদৃশ্য আজ্ঞা পালনকারী এক বোধহীন সত্তা। সেখানে নারীর নিজস্বতা বলে কিছুই ছিল না। সাহিত্যের নারী সেই সামাজিক পরিমণ্ডলে ফিরে ফিরে এসেছে বারবার। সেখানে নারীর মাতা-কন্যা-ভগিনী চরিত্রায়ন অপেক্ষা প্রেমিকা প্রণয়িনী বা স্ত্রী চরিত্রটিকে বেশি তুলে ধরা হয়। নারীর প্রণয়িনী রূপটি যেহেতু পিতৃতান্ত্রিক সম্পর্কের সঙ্গে সর্বাত্মকভাবে জড়িত তাই, উপন্যাসে তাকে দেখানো হয়েছে ব্যক্তি নারী বা মানুষ নারী হিসেবে নয়; তাকে দেখানো হয়েছে পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কে সম্পর্কিত একটি শ্রেণি হিসেবে। সাহিত্যের স্রষ্টা পুরুষগণ নারীর প্রণয়িনী চরিত্র সৃজনে অধিক আগ্রহ পেয়ে থাকে। প্রণয়িনী চরিত্রের মধ্যে দিয়ে নারী চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও টানাপোড়ন যথার্থরূপে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। শরৎসাহিত্যে নিম্নবর্গের নারী চরিত্রের অনুসন্ধানে *চরিত্রহীন* (১৯১৭) উপন্যাসের সাবিত্রীকে পাওয়া যায়। সাবিত্রী বাল্যবিধবা, যৌবনে আত্মসংযমে ব্যর্থ হয়ে এক ভগ্নিপতির সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। তারপর তার অচরিতার্থ মোহের অবসান ঘটে। ততদিনে সূর্যের বহু পরিক্রমা ঘটে যায়, সমাজের চোখে কুলটারূপে জাতকুল হারিয়ে পথে বসেছে। জীবনধারণের প্রয়োজনে তাকে করতে হয়েছে মেসের ঝিয়ের কাজ। ‘হায় রে! কর্মদোষে আজ সাবিত্রী বাসার দাসী।’ (শরৎচন্দ্র, ২০২০ : ১০৩) সাবিত্রীই উপন্যাসের মূল নারী চরিত্র। তার চরিত্রটি উপন্যাসে তিনটি স্তরে ক্রমবিকাশ ঘটেছে। প্রথম স্তরে রয়েছে অভিলাষ বিস্তারের ছবি, দ্বিতীয় স্তরে আছে আত্মসংযমের সাধনা ও আত্মগোপনের পালা এবং শেষ স্তরে আছে প্রণয়ের চুক্তিবদ্ধ ফয়সালার রূপ। এই তিনরূপের মিলিত স্রোতোধারায় সাবিত্রী চরিত্রের সামষ্টিক প্রতিমূর্তি গড়ে উঠেছে। নারী হওয়ার কারণেই তাকে কষ্টসহিষ্ণু ও আত্মদমনের আদলে গড়ে তোলা হয়েছে। যেন ‘শরৎচন্দ্র আদর্শায়িত প্রেমের উচ্চ মার্গে উত্তীর্ণ করিয়ে দিয়েছেন এই চরিত্রটিকে। এ জন্যে শিল্পীর সতর্কতার অন্ত নেই।’ (জয়ন্ত ১৪০৬ ব. : ১৯৬) সমাজ নারীকে জন্ম হতে এই শিক্ষা দিয়ে চলেছে, তাকে কষ্টসহিষ্ণু ও সংযমের সাধনা করতে হবে। নারীকে মানুষ হয়ে মানুষের সম্মান অধিকারের সমরেখায় বাঁচার প্রচেষ্টায় অনুপ্রাণিত করে না। বরং তাকে আত্মপীড়ন ও আত্মত্যাগের মহিমায় অনুপ্রণিত করেছে।

শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ত্যাগি সাবিত্রী। কারণ তার জীবনের শেষ সম্বল, তার প্রেমের সাধনালব্ধ ধনকে লেখক কেড়ে নিয়েছেন। যদিও শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসের কাহিনির সমাপন ঘটেছে ত্যাগের মহিমাকে মহিমান্বিত করার মাধ্যমে। সমাজ নারীকে জন্ম থেকেই ত্যাগের শিক্ষা দিয়ে থাকে, এত সহিষ্ণুতার মধ্যে দিয়ে নারী কি পেল সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। লেখক শরৎচন্দ্র ত্যাগের মধ্যে নারীর যে যন্ত্রণাকে যেমন দেখাতে চেয়েছেন, পাশাপাশি নারী চরিত্রের ঔদার্য ও মহত্ত্বকেও স্বীকার করেছেন। বর্ণশ্রেষ্ঠ ও নিম্নবর্ণের সামাজিক ভেদরেখা শোষণের ক্রিয়ার এক অদ্ভুত

নিয়ামক। এই সব অব্যবস্থার প্রতিনিধি স্বরূপ বাংলা উপন্যাসে সাবিত্রীর মতো চরিত্রের উপস্থিতি চোখে পড়ে।

৫.২

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলো নারীমুখ্য হলেও সামাজিকভাবে নিম্নবর্গের নারীর দেখা খুব বেশি পাওয়া যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী পুরুষের অধিগত হলেও, জ্ঞানে-অজ্ঞানে শরৎচন্দ্রের নারীরা পুরুষের নৈতিক অভিভাকত্বের দায় বহন করেছে। তাই তাঁর উপন্যাসের কাহিনির প্রবাহে নারী চরিত্রের পরীক্ষা- নিরীক্ষা প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। *শ্রীকান্ত* (১৯১৭) শরৎচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অবয়বে কাহিনি নিরীক্ষণ উপন্যাস। *শ্রীকান্ত* উপন্যাসের মূল প্রবাহ রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্তের প্রণয় কাহিনি হলেও এখানে মোট চারটি ধারাবাহিক পর্ব রয়েছে। সেখানে রাজলক্ষ্মী ছাড়াও আরো নারীর চরিত্রের সমাবেশ লক্ষ করা যায়। প্রত্যেকটি নারী চরিত্র একে অপরের থেকে আলাদা এবং স্ব স্ব মহিমায় দীপ্তি ছড়িয়েছে। অন্নদা দিদি শরৎসাহিত্যের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী নারী চরিত্র। *শ্রীকান্ত* উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা প্রতিবাদী আর সহনশীল নারী অন্নদা দিদি জন্মেছিল হিন্দু ধর্মের উচ্চকুলে; পরবর্তী কালে স্বামীর সাথে ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হয়ে, হয় সাপুড়ের ঘরনি। তবে আসল সাপুড়ে সে নয়, খুনের দায় এড়ানোর জন্য পুলিশের চোখে ধুলো দিতে এই ছদ্মবেশের আয়োজন। লাঞ্ছিতা ও নিপীড়িত এই নারী পারেনি স্বামীকে ত্যাগ করতে। অন্নদা দিদিকে প্রথম দেখেই ঔপন্যাসিকের মনে হয়েছিল :

> যেন ভাস্মাচ্ছাদিত ....অন্নদা দিদির এই মূর্তি শ্রীকান্তের মনে চিরকালীন নারীর তপস্যাক্লিষ্ট শাশ্বত সতীর আবির্ভাব ঘটেছিল। যে কারণেই শ্রীকান্ত চিরকালের জন্য নারীকে মহিমাময়ী রূপে দেখেছেন। তাই নারীর পিশাচী রূপকে তাঁর সাহিত্যে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। (শরৎচন্দ্র, ২০০৭ : ১০৯)

অন্নদা দিদি চরিত্রের যে মাহাত্ম্য শ্রীকান্তকে মুগ্ধ করেছিল, তা হলো ঐ চরিত্রের suffering। যে নারী তার সতী ধর্ম রক্ষার জন্য জীবন-যৌবন, সুখ-শান্তি, ভোগ-ঐশ্বর্য কলঙ্কের কালিমায় মসীলিপ্ত করতে ইতস্তত করেনি। যে নারী তার চারিত্রিক সততার জন্য জাগতিক সমস্ত ঐশ্বর্যকে আহুতি দিয়েছে, তাকে শরৎচন্দ্র দেবীরূপে সম্মান দিয়েছেন। *শ্রীকান্ত* উপন্যাসে এমনই আরো একজন নারীর সন্ধান পাওয়া যায়, যার মধ্যেও ত্যাগের প্রাচুর্য লক্ষণীয়। যিনি রাজলক্ষ্মী -এই উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্র। সে জীবিকাগতভাবে পতিতা হিসেবে উপন্যাসে পরিচিত। শ্রীকান্তের বাল্য প্রণয়িনী সে, বহুদিন পরে জমিদারের রঙ্গশালায় তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় শ্রীকান্তের সঙ্গে। নারীর উন্নত জীবনাকাঙ্ক্ষা, মানুষের মর্যাদায় দাঁড়ানোর প্রচেষ্টা তাকে তাড়িত করলেও দ্বিধাদ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি লেখক। এ সম্পর্কে গবেষকের মতামত নিম্নরূপ:

> অন্নদাদিদির কৃচ্ছ্রতাসাধন, আর রাজলক্ষ্মীর দীক্ষা গ্রহণ করে পতিতা জন্মের সমস্ত কলঙ্ক কালিমা ধুয়ে-মুছে ফেলবার প্রচেষ্টা যেন শ্রীকান্তের মনে অহর্নিশি এক অব্যক্ত যন্ত্রণার কারণ হয়ে উঠেছিল।....অথচ হিন্দুর ঘরে জন্মে ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের ভেতর মানুষ হয়ে একে অশ্রদ্ধা করার মতো মানসিক বলও তো তার ছিল না। তাই সমস্ত যুক্তিতর্কেও অতীতে থেকে অন্নদাদিদি চিরকালের জন্যেই দেবীর আসনে বসে আছেন। (নীলিমা, ২০০১ : ১৭)

এভাবে নারীচরিত্র চিত্রণে শরৎচন্দ্র তাঁর অন্তরের সমস্ত নিষ্ঠা, নৈমিত্তিকতাকে নিবেদন করেছিলেন। যার মধ্য দিয়ে *শ্রীকান্ত* উপন্যাসে অন্নদাদিদি, রাজলক্ষ্মী ছাড়াও আরো একজন নিম্নবর্গের নারীর সন্ধান পাওয়া যায়, যেমন কমললতা।

৫.৩

শরৎচন্দ্রের সর্বাধিক জনপ্রিয় উপন্যাস *দেবদাস*, চন্দ্রমুখী তার গুরুত্বপূর্ণ নারী চরিত্র। চন্দ্রমুখী পতিতা হলেও চরিত্রের বহুমুখী ক্রিয়াশীলতা তার বিশ্লেষণধর্মিতাকে বাড়িয়ে তুলেছে। চন্দ্রমুখী দেহ ব্যবসায়ী চপল, চটুল, বুদ্ধিমতী। শরৎচন্দ্র তাঁর এক পত্রে বলেছেন যে এক সময় তিনি ছয় শত পতিতা নারীর ইতিহাস সংগ্রহ করেছিলেন। এই সংগ্রহ থেকে তিনি এই সূত্র উপলব্ধি করেছেন যে নারী স্বভাবের তাড়নায় কুল ত্যাগ করে না, নারী অধিকাংশ ক্ষেত্রে কুল ত্যাগ করে যন্ত্রণার দায়কে এড়াতে। তাই পতিতা হলেই সে অবহেলা বা ঘৃণার পাত্রী নয়। অনেক পতিতার মধ্যেও অনেকে সতী হয়ে বেঁচে থাকে। এই আত্মপ্রকাশের মধ্যে কোনো অসততা নেই, নেই কোনো কপটতা। তাই দেবদাস চন্দ্রমুখীকে ধীরে ধীরে ভালোবেসেছে। 'একেবারে চিনতে পারিনি কিন্তু যত্নটি চিনেছিলাম। অনেকবার মনে হয়েছিল, আমার চন্দ্রমুখী ছাড়া এতযত্ন কার?' (শরৎচন্দ্র, ২০১২ : ৯২) শরৎচন্দ্র মানুষকে বিচার করেছেন হৃদয়ের মাপকাঠিতে। সেখানে ধর্ম, বর্ণ, অপেক্ষা মানবপ্রেমকে মুখ্য করে দেখেছেন। হতে পারে একজন বঞ্চিত পতিতার কাছে অনাস্বাদিতপূর্ব প্রেমের মূল্য সামাজিক নারীর তুলনায় বেশি। তাই মরণাপন্ন দেবদাসকে অকৃত্রিম সেবায় বাঁচিয়ে তুলেছিল চন্দ্রমুখী। ব্যক্তি চন্দ্রমুখীকে ভালোবাসা যায়, কিন্তু বারবণিতা চন্দ্রমুখীকে সামাজিকভাবে গ্রহণ করা যায় না। আর সেজন্যই তাদেরকে স্বেচ্ছাগত কৃচ্ছ্রতাসাধনে নামতে হয়েছে তাকে: 'তাই চন্দ্রমুখীর মতো নারীরা নিজের সীমারেখায় দাঁড়িয়েই অপাত্র বা দুরধিগম্যকে ভালোবাসা দিয়ে নিজেরা কৃতার্থ হতে চায়। চন্দ্রমুখীতে এই আকণ্ঠ তৃষ্ণার সজীব ধারাটিকে আমরা ধরতে পারি।' (জয়ন্ত, ১৪০৬ ব.: ৯৪) শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যে যেসব নারী চরিত্র উজ্জ্বল আলোকরশ্মিতে বিদ্যমান, তার মধ্যে সামাজিকভাবে বঞ্চিত এই নারীরা প্রস্ফুটিত। চন্দ্রমুখী ছাড়া *শুভদা* উপন্যাসের কাত্যায়নী সরাসরি একজন দেহজীবিনী নারী। চরিত্র হিসেবে যা তাকে চন্দ্রমুখীর সমগোত্রীয় রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নিম্নবর্গীয় জীবনের তাত্ত্বিক পরিসর

সেই সব মানুষের কথা বলে, যারা প্রতিদিনের জীবন অভিজ্ঞতায় পায়ের তলায় পিষ্ট হয়। শোষণের ইতিহাস সব সময় এক হয় না; সেখানে শ্রেণি, বর্ণ ও লিঙ্গ অনুসারে ভিন্নতা তৈরি হয়েছে। সমাজের তৈরি করা নিয়মে কারো জন্য রয়েছে সর্বপ্রকার বৈধতা আর কারো জন্য রয়েছে পদে পদে বাধার প্রাচীর।

৬.

বিশ শতকের প্রথম ভাগে, ভারতীয় উপমহাদেশ নানা প্রসঙ্গে প্রকম্পিত হয়েছে। এর অভিঘাত রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক ও সংস্কৃতিক প্রাঙ্গণে প্রবলভাবে পড়েছিল। বৈশ্বিক আবহের যত সব পরিবর্তন ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের অপ্রতিরোধ্য নিয়তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভাঙা-গড়ার এই খেলায় পুঁজিবাদের ক্রমশ বিস্তারের প্রতিক্রিয়ায় বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি ও অবক্ষয়ী জীবনভাবনা সমকালে চরম আধিপত্য বিস্তার করে। সামাজিকভাবে নেতি আর নাস্তির, চরম অনিশ্চয়তার পাশাপাশি বিচ্ছিন্নবাদের প্রসার এই সমস্ত অন্তঃসারশূন্যতার অন্তরালে ক্রিয়াশীল ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে পৃথিবীব্যাপ্ত সামাজিক অবক্ষয়, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, মূল্যবোধ বিচ্যুতি, মানবিক সম্ভাবনাময় অবিশ্বাস প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে ফাঁপা মানুষের বিপন্ন অস্তিত্বের প্রতিবেশে বাংলা সাহিত্যে সামূহিক পরিবর্তনের আর্বতন ঘটেছে। এই প্রচণ্ড ভাঙা-গড়ার আবহ অর্থনীতি-সমাজনীতি-রাষ্ট্রনীতি সর্বত্র বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রভাবে মানুষের জীবনদর্শন ও মূল্যবোধে সম্পর্কে পূর্বতন ধারণা ও প্রত্যয়ের চেতনাসমূহের পরিবর্তন লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। এই পরিবর্তিত কালপ্রবাহে মানুষের নিকট মূল্যহীন হয়ে ওঠে সনাতন মূল্যবোধ ও প্রবহমান জীবনপ্রত্যয়। সেখানে স্থান করে নেয় জেমস ফ্রেজারের (১৮৫৪-১৯৪১) নৃতত্ত্ব, চার্লস ডারউইনের (১৮০৯-১৮৮২) বিবর্তনবাদ, কার্ল মার্কসের (১৮১৮-১৮৮৩) শ্রেণিসংগ্রাম তত্ত্ব, সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের (১৮৫৬-১৯৩৯) মনোবিকলন তত্ত্ব প্রভৃতি আবিষ্কারের সামগ্রিক প্রতিক্রিয়ায় মানুষের দীর্ঘদিনের বিশ্বাসের ভিত্তিমূল দোদুল্যমান হয়ে ওঠে (বিশ্বজিৎ, ২০০২ : ১০০)। বিশ্বরাজনীতি আর জ্ঞানমার্গের জগতে ঘটে যাওয়া এতসব পরিবর্তনে ইউরোপের শিল্প-সাহিত্যের জগৎও আক্রান্ত হয়েছিল। পুঁজিবাদের চরম আগ্রাসনে হতাশা আর বিচ্ছিন্নতার ক্ষয়রোগে আক্রান্ত অসহায় ক্রমশ আশ্রয় নেয় আপন অস্তিত্বের গভীরে। ব্যক্তির এই বিপন্নতা, অসহয়তার প্রভাব পড়েছিল সমগ্র পৃথিবীজুড়ে। বাংলাদেশ ও বাংলা সাহিত্য তার বাইরের কোনো সত্তা নয়। সমকালীন বৈশ্বিক পরিস্থিতির সঙ্গে সমন্বয় সাধনে বাংলা সাহিত্যে জন্ম নেয় একটি নবতর যুগচেতনা। এই জটিল অবস্থায় সংকটময় অবস্থা বাংলা সাহিত্যের নবচেতনালব্ধ সাহিত্যিকেরা আবির্ভূত হন কল্লোল (১৩৩৪) কালিকলম (১৩৩৩) প্রগতি (১৩৩৪) পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। জগদীশ গুপ্ত, শৈলজানন্দ, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রভৃতি লেখকদের আত্মপ্রকাশের

প্রধান মুখোপাত্র হয়ে কল্লোল পত্রিকা। এঁদের মধ্যে কল্লোল বাংলা সাহিত্যে এনেছিল কালান্তরের বার্তাবহ। মানবতাবাদ ও গণতান্ত্রিক বোধের সূত্র ধরে সাহিত্য চলে এসেছিল সেই সব নিচুতলার মানুষের এলাকায়, সাহিত্যের বিষয় এবং প্রকরণে যারা দিয়েছিল নতুন পথ। সেই নতুন পথের প্রধান বার্তাবাহক হয়েছিল *কল্লোল* নামের একটি সাহিত্য পত্রিকা। কল্লোল চেতনার মৌলচারিত্র্য বুদ্ধদেব বসুর ব্যাখ্যায় ধরা পড়েছে এভাবে--

> অতি-আধুনিক সাহিত্যকে post-war সাহিত্য বললে ভুল হয় না। আধুনিক লেখকেরা post-war সামাজিকও অর্থনৈতিক অবস্থার ভিতর দিয়ে বড় হয়ে উঠেছেন। লড়াইয়ের ফলে ইউরোপের যে-দুরবস্থা হয়েছে ও মানুষের চিন্তার-জগতে যতটা পরিবর্তন এসেছে, আমাদের দেশে তার চেয়ে অনেক কম হলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর তুলনায় আমাদের দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যের পরিমাণ ও মনের ভাব-ধারার গতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। আধুনিক লেখকেরা শিশুকাল থেকে যে-অর্থনৈতিক সংঙ্কটের সহিত চাক্ষুস পরিচয় লাভ করেছেন, বঙ্কিমবাবুর সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা দেশমাতা বা রবীন্দ্রনাথের সোনার বাঙলায় তার চিহ্নমাত্র ছিল না। (বিশ্বজিৎ, ২০০২ : ১০২)

কল্লোলের উপলব্ধিজাত এই চেতনা তাদের সাহিত্য চেতনারও মূলমন্ত্র। যুগসংকটের বিপুল প্রবাহে ধরা দিল সেই সব মানুষের কথা; যাদের কথা আগে কেউ ভাবেনি বা বলেনি। তাদের সাহিত্যের মূল আলো নিক্ষেপণ হলো অবহেলিত-অবজ্ঞাত-নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন। বিশ্বযুদ্ধজাত রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সংকটে নিম্নবিত্ত ও নিম্নবর্গের জীবনপ্রত্যয় কীভাবে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। সময়ের পরিবৃত্তে নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনের ব্যর্থতা, দারিদ্র্যের চাপে অন্তর্হিত নৈতিক আদর্শবোধ ও মূল্যবোধের বিনাশ প্রভৃতি বিষয় এই সময়ের সাহিত্যে রূপলাভ করেছিল।

৭.

কল্লোলের কালে যে সব ব্যক্তিবর্গ নবীন যাত্রাপথকে আলোকিত করেছিল, সেই সময়ের অনির্বাণ শিখায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯) দেখালেন এক নবীন জীবনদৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য। যখন মানুষ নাকি ক্রমশ সরে আসছে পূর্বতন নীতিবোধের কপাট খুলে, সমস্ত কিছুকেই নতুন মানে যাচাই করে ঘরে তুলতে চাইছেন; তখন বিভূতিভূষণ শোনালেন এক শান্ত নির্জন নির্লিপ্ত জীবনের বাণী। দেশ-কালের-বিস্তৃত আত্মবিহ্বলতায় উদাসীন পথিকের আত্মমুগ্ধতার স্বপ্ননীল জগৎ তৈরি করলেন। বাংলা সাহিত্যের পাঠকের নিকট যা চিরচেনা কিন্তু বাস্তবতার খোদাই পাথরে প্রতিষ্ঠিত রূঢ় কোনো অন্তর্লোকের প্রতিমূর্তি নয়। ক্ষুধা-কান্নায় জর্জরিত জীবনের আবেগমোথিত রূপ। এভাবেই বিশ

শতকের বিভ্রান্ত-বিক্ষুব্ধ, প্রাণ-কল্লোলের খণ্ডবিশ্বাস আর ক্ষুব্ধ হতাশ্বাস ও চেতনার পটভূমিতে নিজেকে দাঁড় করালেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় :

> বাইরের পৃথিবীতে যেখানে অসংখ্য দ্বন্দ্ব-সমস্যা, জীবনের মূল্য-পরিবর্তন নিয়ে মানুষের মন সংশয়ে জিজ্ঞাসায় উদভ্রান্ত, সাম্যবাদ ও যৌনসমস্যা যখন বাংলার মনন ও শিল্পপ্রেরণাকে আচ্ছন্ন করেছে– সেই সময় এক বিচিত্র মানুষটি দেশ-কাল-বিস্তৃত আত্মবিহ্বল উদাসীন পথিক-শিল্পীর মতো রূপকথার এক স্বপ্নমুগ্ধ 'অলৌকিক' জগৎ রচনা করলেন। বাংলাদেশের পাঠক ও লেখকসমাজ যুগপৎ বিস্ময়ে হতবাক হল। বিভূতিভূষণ বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হলেন। একটি মাত্র উপন্যাস রচনা করেই এতখানি প্রতিষ্ঠা লাভ– সাহিত্যের ইতিহাসে খুব বেশি চোখে পড়ে না। (গোপিকানাথ, ২০১৬ : ১১)

বিভূতিভূষণের আবির্ভাব কল্লোল যুগে হলেও, তিনি ছিলেন এক ভিন্ন জগতের আত্মমগ্ন শিল্পী। তাঁর প্রীতিপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে প্রকৃতিরহস্যে সমাজের অন্ত্যজশ্রেণির হৃদয় এবং ব্রাত্যজীবনের প্রবাহ। সমাজের অর্থনৈতিক শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে সচেতন হওয়ায়, অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ মানুষের প্রতি তাঁর মর্মোৎসারিত অন্তর্বেদনা আজীবন প্রবাহিত হয়েছে; সৃষ্টির স্বভূমিতেও সেই ধারা অব্যাহত ছিল। জীবনে যে পেয়েছে অনেক, তার তুলনায় না পাওয়া মানুষের শূন্যতা, রিক্ততা আর সর্বহারা মানুষের প্রতি তাঁর প্রাণের টান আর আকর্ষণ ছিল দুর্নিবার। অন্তর্গত আকর্ষণের অনিবার্যতা থেকে বিভূতিভূষণের উপন্যাসে স্থান পেয়েছে মাঝি-মাল্লা, মুচি, হাড়ি, বাগদি, কৃষাণ, জেলে, কুমোর, ডাইনি ও ঠ্যাঙাড়ে, ফাঁসুড়ে ডাকাত, সাঁওতাল, কোল, ভীল, মুণ্ডা প্রভৃতি অন্ত্যজশ্রেণির নিম্নবর্গের জীবনের কথা। তবে এ কথাও অনিবার্য সত্য যে এই সমস্ত অধিকারহীন মানুষের, অধিকারবোধ বা শ্রেণিচেতনা বিষয়ে বিভূতিভূষণের সুচিন্তিত মতামত অপ্রকাশিত থেকেছে সর্বদা।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধিকাংশ উপন্যাসের স্থানিক পরিসর গ্রামীণ প্রেক্ষাপটকেন্দ্রিক হওয়ায়; সেখানে বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের দিনযাপনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিচ্ছবি বিন্যস্ত হয়ে রয়েছে। তাদের পটভূমি, জীবনের প্রাতিস্বিকতা, বিভূতিভূষণের লেখাকে প্রকৃতির বন্দনা সীমার ঘেরাটোপ থেকে মুক্ত করে, সাধারণ মানুষের জীবনানুষঙ্গের কাছাকাছি এনেছে। জীবনের খণ্ড খণ্ড বিশেষকে ঘিরে জীবনভর তাঁর যে অভিজ্ঞতা, যে মুগ্ধতা, যে যন্ত্রণা, যে জিজ্ঞাসা, তাকে শিল্পীর স্বতঃস্ফূর্ততা অবারিত করে তাঁর সাহিত্যিক উৎকর্ষের সীমাকে স্পর্শ করতে পেরেছেন। (রুশতী, ২০১৩ : ১৫) সেখানে নিম্নবর্গকে আলাদাভাবে ভিন্ন কণ্ঠস্বরে আবিষ্কার করা অনভিপ্রেত। কারণ সমগ্র বিভূতিসাহিত্যে জীবনের মর্মস্পর্শী মায়ার আবরণের অন্তরালে অন্তর্লীন হয়ে আছে জীবনের হাহাকার; দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর নিরবায়ব রূপ। তবে অবিভক্ত বাংলা সাহিত্যে দারিদ্র্যের বিভিন্নরূপ থাকলেও শ্রেণি বিবেচনায় বর্ণপ্রথার বিভীষিকার প্রাদুর্ভাব অকল্পনীয়। অর্থনৈতিক সংকট জীবনের একমাত্র সমস্যা নয়;

পাশাপাশি সামাজিক সংস্কারের বিভিন্ন অনুঘটক সমাজস্থিত মানুষের জীবনকে আরো বেশি দ্বন্দ্বদীর্ণ করে তুলেছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, বিভূতিসাহিত্যে দারিদ্র্যের পরিসীমাকে দুভাবে দেখতে হবে। এক. বর্ণের উচ্চতায় যারা সমাজের উৎকৃষ্ট অর্থাৎ ব্রাহ্মণের দারিদ্র্যপীড়িত অবস্থাকে আলোচনা অন্য প্রাসঙ্গিকতা। দুই. সামাজিকভাবে যারা সমাজের নিচে বা প্রান্তে অবস্থান করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিচার-বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গ।

৭.১

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস *পথের পাঁচালী* (১৯২৯); লেখক হিসেবে যা তাকে সফলতা ও সার্থকতা দুই-ই দিয়েছিল। সাহিত্যিক জীবনের সূচনা পর্বের এই রাজকীয় অভিষেক খুব কম লেখকের জীবনে ঘটে থাকে। *পথের পাঁচালী* উপন্যাসের পরিসর গড়ে উঠেছে গ্রামীণ জীবন ও জনপদকে কেন্দ্র করে। উপন্যাসের কেন্দ্রে আছে দুটি বালক-বালিকা। নিশ্চিন্দিপুরের দরিদ্র ব্রাহ্মণ হরিহর রায়ের পরিবারের যাপিত জীবনের পাশাপাশি; এই জনপদের সমাজ ও সামাজিক জীবনের এক বিস্তৃত সময়ের ছবি তুলে ধরেছেন। জীবন মানেই শুধু দুঃখ-দারিদ্র্য, বিক্ষোভ-যন্ত্রণা নয়, প্রকৃতির কোলে যে জীবনানন্দের দৃষ্টিপ্রদীপ জ্বলে সে কথাও অনস্বীকার্য। সেই আলোর উদ্ভাসনে তিনি দেখেছেন অন্ত্যজ মানুষের জীবন আর প্রকৃতির সরল মুগ্ধতা, তা সত্ত্বেও তিনি দারিদ্র্যের নির্মমতাকে অস্বীকার করতে পারেননি; অবলোকন করে হয়ে উঠলেন ব্রাত্যজীবনের রূপকার।

বিভূতিভূষণ তাঁর মৌলিক শান্ত দৃষ্টিতে নারীকে অনন্যসাধারণ করে নির্মাণ করেছেন। সেখানে ব্যক্তি নারীর অপেক্ষা, তাঁর উপর আরোপিত বিভিন্ন গুণাবলির উৎকীর্তন দেখানো হয়েছে। সেখানে নারী মঙ্গলময়ী, স্নেহময়ী রূপের আঁধার; তবে তার রিরংসার দিকও আছে, যেমন দেখি সর্বজয়ার ইন্দির ঠাকুরণের দ্বন্দ্ব-বিবাদ। যা দিনযাপনের প্রতিদিনের অভাব-অনটনের আঘাতের রূঢ় বাস্তবতা। সূচনাপর্বের এই পথসারিতে যাদের আর্বিভাব ঘটে, তাদের অস্বীকার করে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। *পথের পাঁচালীতে* নিম্নবর্গের নারী বললে মনে আসে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত ‘আতুরী ডাইনী বুড়ি’র প্রসঙ্গ। গ্রামের শেষ মাথায় সেখানে জনমানবশূন্য এক প্রান্তে সে বসবাস করে। স্বামী-সন্তান, আত্মীয়-পরিজনহীন এক জীবন তার। নিঃস্ব এই জীবনে সামাজিক কুসংস্কার তাকে চাপিয়ে দেয় অপবাদ, তাকে সামাজিক সুস্থ জীবন থেকে বিতাড়িত করে অন্ধকারের রুদ্ধদ্বারের পৌঁছে দিয়েছে। সেখানে সে মানুষ থেকে ডাইনি হয়ে উঠেছে। অথচ তার মধ্যেও রয়েছে মানবতার স্বাভাবিক প্রবাহ। মানবসন্তানের স্বাভাবিক প্রবাহ আন্দোলিত করে। বলে, ‘ভয় কি ও মোর বাবারা? মুই কিছু বলবো না, ভয় কি মোরে?’ (বিভূতিভূষণ, ২০০০ : ৫৩) সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে অপু ও নীলু ভয়ে নীলবর্ণ

হয়ে উঠেছিল সেই সামাজিক অপাঙক্তেয় বুড়িকে দেখে। বুড়ির চোখের চাহনি তাদের পুরানো ভয়ের সংস্কারকে জাগ্রত করেছিল। তাই বুড়ির স্নেহার্দ্র চাহনিকেও রূঢ়তার ভয়াল দৃষ্টি বলে মনে হয়েছিল। আর এই অবুঝ বালকদের ভয়ের কারণ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ জানা না থাকায় বুড়ি ভাবিল, 'মুই মাত্তিও যাই নি, ধত্তিও যাই নি–কাঁচা ছেলে, কি জানি মোরে দেখে কেন ভয় পালে সন্দেবেলা?' (বিভূতিভূষণ, ২০০০ : ৫৪) এই অশীতিপর বৃদ্ধা নিজেও সন্দিহান তার সম্পর্কে মানুষের এই ধারণা নিয়ে। গ্রামীণ এই কুসংস্করাচ্ছন্ন দিকসমূহ এই জীবনের একটি অন্ধকার দিক। ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদে আবার এই নারীর জীবনাবসানের মধ্য দিয়ে তার সম্পর্কে লেখকের পূর্ণাঙ্গ ধারণা পরিণতি পায় :

> চড়কের দিন গ্রামের আতুরী বুড়ি মারা গেল। নতুন যে মাঠটাতে আজকাল চড়কের মেলা বসে, তাহারই কাছে আতুরী বুড়ির সেই দোচালা ঘরখানা।...আতুরী বুড়ি ডাইনী নয়, কিছু নয়। গ্রামের একধারে লোকালয়ের বাহিরে একা থাকিত–গরীব, অসহায়, ছেলে ছিল না, মেয়ে ছিল না, কেহ দেখিবার ছিল না, থাকিলে কি আজ সারাদিন ঘরের মধ্যে মরিয়া পড়িয়া থাকিত? সৎকারের লোক হয় না?' (বিভূতিভূষণ, ২০০০ : ১২৫)

শুধু কিছু সংস্কারের কাছে নিঃসহায় মানুষ এভাবে দিনপাত করে। আতুরী বুড়ি ছাড়াও স্বর্ণ গোয়ালিনীকে দেখি যার ছোঁয়ায় সবকিছু অশুচি হয়ে যায়। শূদ্র ঘরের মেয়ে হওয়ার কারণে তাকে নিয়ে এই আচার-আচরণের এতো ব্যবধান। ছোঁয়াছুঁয়ির এই সংস্কার ঠিকমতো অনুসরণ করতে না পারায় চপলা গৃহবধূ গোকুলের বউকে তার সখী ঠাকরুনের কাছে অনেক কথা শুনতে হয়: 'এইখান থেকে সন্ন ঘটি তুলে নিয়ে গিয়েচে, তারপর সেই শুদ্দুরের ছোঁয়া এঁটো বাসন আবার হেঁসেল নিয়ে সাত-রাজ্যি জড়ানো হয়েচে! হাঃ জাতজন্মো একেবারে গেল!' (বিভূতিভূষণ, ২০০০ : ৭৩) বর্ণপ্রথার অন্ধ অনুসরণ মানুষকে, মানুষের ছোঁয়াকে দূরে অন্ধকারে ছুড়ে দিয়েছে। এ ছাড়া দেখা যায়, চড়ুইভাতির অনুষ্ঠানে অপু আর দুর্গার খেলার সাথি বিনির সাথে আছে ছোঁয়াছুঁয়ির সেই আদিম অন্ধকার সংস্কার। বিনির বাবা কালীনাথ চক্কত্তি যুগির বামন হওয়ায় সামাজিক ব্যাপারে তাকে দূরে রাখা হয়। সেই একই দোষে বিনিও দুষ্ট :

> যুগীর বামন বলিয়া পাড়ায় জল খাইতে চাহিলে লোকে ঘটিতে করিয়াজল খাইতে দেয় ; তাহাও আবার মাজিয়া দিতে হয় । বিনি দু-একবার ইতস্তত করিয়া অপুর গ্লাসটা দেখাইয়া বলির–আমার গালে একটু জল ঢেলে দেও তো অপু? জল তেষ্টা পেয়েছে! অপু বলিল –নাও না বিনিদি, তুমি নিয়ে চুমুক দিয়ে খাও না! তবু যেন বিনির সাহস হয় না। দুর্গা বলিল-নে না বিনি, গেলাসটা নিয়ে খা না! (বিভূতিভূষণ, ২০০০ : ৮৯)

বর্ণপ্রথার বিরূপ প্রভাবে অনেক সময় অন্য ধর্মের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থান ও তাকে নিম্নবর্গের সারিতে নামিয়ে দেয়। সপ্তদশ পরিচ্ছেদে একটি কৃষক-বধূকে পাওয়া যায়; যার স্বামীর মৃত্যু তাকে

এক ভঙ্গুর পরিস্থিতিতে নিমজ্জিত করেছে। অল্প বয়সি কৃষক-বধূ তমরেজের বৌ; চার দিন হলো তার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। অন্নদা রায় মহাশয়ের কাছে তার স্বামীর সুদে আসলে চল্লিশ টাকা বাকি ছিল। তাই তমরেজের মৃত্যুর দিনই তার গোলায় চাবি দিয়ে রেখেছে। গোলা খোলার তদবির করতে রায় মহাশয়ের কাছে এসেছেন। শেষ সম্বল ছেলের গয়না নিমফল বিক্রি করে পাঁচ টাকা এনেছেন যাতে গোলা খুলে দেন এবং সন্তানদের খাবারের ব্যবস্থা করতে পারেন। এ সম্পর্কে রায় মশায়ের মন্তব্য: '–ওঃ ভারি যে দেখচি মাগীর আব্দার, চল্লিশ টাকার কাছাকাছি সুদে আসলে বাকি–পাঁচ টাকা এনিচি, নিয়ে গোলা খুলিয়ে দ্যান্, ছোট লোকের কাণ্ডই আলাদা।' (বিভূতিভূষণ, ২০০০ : ৭১) এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গের একজন নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির একটি বস্তুনিষ্ঠ প্রতিরূপ উঠে এসেছে।

৭.২

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চতুর্থ উপন্যাস *আরণ্যক* (১৯৩৯)। *আরণ্যক* বাংলা উপন্যাসের এক নবনির্মিতি। এখানে সমান্তরালভাবে দুটি বিষয় বহমান, একটি হলো আদিম জনজাতির মানুষ আর একটি হলো প্রকৃতি। সেখানে যারা পাত্রপাত্রী তারা এই প্রচলিত সভ্যতার বাইরে, তারা সম্পূর্ণ নতুন দিগন্তের নতুন মানুষ। সত্যচরণের অন্তর্দৃষ্টিতে লেখক দেখেছেন প্রকৃতির কোলে লালিত অসংস্কৃত, অখ্যাত, সহজ-সরল আদিম অন্ত্যজশ্রেণির জীবনপ্রবাহ। জীবনের সেই প্রবাহে রয়েছে কত নারী, কত পুরুষ আর প্রাণীর অস্তিত্বের দলিল। এদের প্রত্যেকের সহচর্যে লেখকের রয়েছে সহমর্মিতা আর ভালবাসার অপরিমেয়তা। *আরণ্যক* উপন্যাসে শুধু যে নিম্নবর্গের মানুষেরই পরিচয় পাওয়া যায় এমন নয়, পাশাপাশি নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার উপরও আলোকপাত করা হয়েছে :

> মানুষের সত্যিকারের ইতিহাস কোথায় আছে? জগতের বড় বড় ঐতিহাসিক যুদ্ধ বিগ্রহের বঞ্চনায় সম্রাট সম্রাজ্ঞী সেনাপতি মন্ত্রীদের সোনালী পোশাকের জাঁকজমকের দরিদ্র গৃহস্থের কথা ভুলে গিয়েছেন। ....আজকের তুচ্ছতা হাজার বছর পরের মহাসম্পদ। মানুষ মানুষের বুকের কথা শুনতে চায়। কোটি কোটি মানুষ প্রলয়স্রোতে ভাসছে, ভবিষ্যতের সত্যিকার ইতিহাস হবে এই কাহিনী মানুষের মনের ইতিহাস, তার প্রাণের ইতিহাস। (বিভূতিভূষণ, ১৪০৮ ব. : ৯১)

আরণ্যক উপন্যাসে একদিকে ফুটে উঠেছে প্রকৃতি-প্রেমিক বিভূতিভূষণের গভীর সৌন্দর্যবোধ, অন্যদিকে রয়েছে নিম্নবর্গের নিঃস্ব পতিত জীবনের অন্তর্বেদনা। এখানে যাযাবর শ্রেণির মানুষ, অনার্য রাজবংশ, কথক, কাঠুরে, রাখাল, ভিখারী, সৎ মহাজন ও সহজ-সরল প্রকৃতিমুগ্ধ শোষিত প্রভৃতি মানুষের সান্নিধ্য লেখককে আরণ্যক উপন্যাসের পটভূমি রচনায় প্রেরণা জুগিয়েছে।

> সম্পূর্ণ বন্ধনমুক্ত, ব্রাত্য ইহাদের জীবন– সমাজ নাই, সংসার নাই, ভিটার মায়া নাই। নীল আকাশের নীচে সংসার রচনা করিয়া, বনে শৈলশ্রেণীর মধ্যস্থ উপত্যকায়, বড় নদীর নির্জ্জন চলে ইহাদের বাস। আজ এখানে কাল সেখানে। (বিভূতিভূষণ, ১৪০৮ব.: ৫৫)

আরণ্যক-এর এই জীবনব্যবস্থার মধ্যে অর্থনৈতিক শ্রেণিবৈষম্যের পাশাপাশি বর্ণবৈষম্য বা জাতিভেদজনিত সংস্কারের চিত্রও দৃশ্যমান। তার পাশাপাশি জমিদার মহাজনদের বিভিন্ন উপায়ে অর্থ আদায়ের কথা উল্লেখ রয়েছে। 'সেলামীর টাকা, খাজনার টাকা, আদায় ইরশাল, হস্তবুদ' (বিভূতিভূষণ, ১৪০৮ব. : ৫৩) প্রভৃতি উপায়ে টাকা প্রাপ্তির মধ্যে নিম্নবর্গের নিপীড়ন শোষণের চরম সত্য উঠে এসেছে। এদের মধ্যে নারী পুরুষ উভয়ই আছে। কুন্তার মতো দুঃখদীর্ণ জীবন ইতিহাসের নারীর দেখা যেমন পাওয়া যায়, তেমনি আছে নকছেদী, মঞ্চীর মতো শ্রমজীবী নারী। অরণ্যের প্রকৃতি ও মানুষ যে একটি উপন্যাসের পটভূমি হতে পারে বাংলা সাহিত্যে তাঁর পূর্বে কেউ সেই প্রাতিস্বিকতা দেখাননি :

> আরণ্যক উপন্যাসে অজস্র মানুষ। এরা প্রায় সবাই দরিদ্র সরল অতিসাধারণ। কঠোর পরিশ্রম করে এদের অন্ন সংস্থান করতে হয়। এই অমানুষিক দারিদ্র্য কিন্তু এদের জীবনকে অসন্তোষের আগুনে নিরন্তর দগ্ধ করে না। এক গভীর আত্মতৃপ্তির মনোভাব এদের চরিত্রকে এক অনাড়ম্বর মহত্ত্ব দান করেছে। অভাব ও কঠিন জীবন সংগ্রামের সঙ্গে এরা একটি বস্তুকে অত্যন্ত সহজে গ্রহণ করেছে। সেটি অন্ধকুসংস্কার। (গোপিকানাথ, ২০১৬ : ৪৮)

অরণ্যের রহস্যময় পরিসীমায় এই অন্ত্যজ, অনাদৃত মানুষগুলো কোনো অসাধারণত্ব নিয়ে উপস্থাপিত হয়নি। এরা সাধারণ, এদের মাঝে কোনো দ্বন্দ্ব নেই, সংকীর্ণ বা বিশালতাও নেই। জীবনের প্রয়োজনে এরা সদা ব্যস্ত। বেঁচে থাকার লড়ায়ের বাইরে আর কোনো ভাবনা এদেরকে বিচলিত করতে পারে না। বিভূতিভূষণের অন্য উপন্যাসের মতো এখানে নারী চরিত্রের মাতৃত্ব ও মঙ্গলময়ী রূপটি নিপুণতার সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে। সামাজিকভাবে নারীর দুর্বল অবস্থা চিত্রিত হলেও মাতৃরূপে নারী কখনও দুর্বল নয়। যেখানে লেখক বলেছেন :

> কুন্তা... মুসাম্মত কুন্তার কথা মনে হয়। এখনো যেন সুংঠিয়া বইহারের বিস্তীর্ণ বন্যকুলের জঙ্গলে সে দরিদ্র মেয়েটি তার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে লইয়া বন্যকুল সংগ্রহ করিয়া তাহার দৈনন্দিন সংসারযাত্রার ব্যবস্থায় ব্যস্ত। নয়তো জ্যোৎস্নাভরা গভীর শীতের রাত্রে সে আমার পাতের ভাত লইবার আশায় আজমাবাদ কাছারির প্রাঙ্গণের এক কোণে, ইঁদারাটার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। (বিভূতিভূষণ, ১৪০৮ব. : ৫)

কুন্তা একজন নারী, একজন মা। বিভূতিভূষণের শান্ত উদার দৃষ্টি নারীর মধ্যে সব সময় এক মঙ্গলময়ী প্রকৃতির সন্ধান করে চলেছে; কুন্তা সেই দৃষ্টির অনুকূল এক নারী। বাইজির মেয়েকে বিয়ে করায় দেবী

সিংয়ের জাতভাই ও রাজপুতেরা তার সাথে আত্মীয়তা বন্ধ করে তাকে একঘরে করে দেয়। তারপর বাবুগিরি আর অযথা ব্যয়ে দেবী সিং সর্বস্বান্ত হয়ে মৃত্যুও হয়। যে কুন্তা এক সময়ে ঝালর দেয়া পালকিতে স্নান করতে যেত আজ তার এই দুর্দিন। জন্মগতভাবে বাইজির মেয়ে হওয়ায় স্বামীর মৃত্যুর পর তার আর কিছু নেই। বাইজির মেয়ে কুন্তার কোনো জাত নেই। তাই দুঃখ-ধান্দা করে কোনো রকমে ছেলেপুলেকে খাওয়াচ্ছে। তবে সে কারো কাছে হাত পাতে না। এই অরণ্যের দারিদ্র্যভরা জীবনে তারা ভাতের পরিবর্তে চীনাঘাসের দানা, মকাই খেড়ীরদানা, বথুয়া শাক সিদ্ধ, কলাইয়ের ছাতু, প্রভৃতি খেয়ে জীবন ধারণ করে। ভাত খেতে পাওয়া যেখানে ভোগের মতো, সেখানে মানুষের জীবন দারিদ্র্যের কোন সীমায় অবস্থান করে তা চিন্তারও অতীত :

> আপনার আসবার কথা শুনে আমায় কাল বলেছিল– ম্যানেজারবাবু আসবেন, তাঁর পাতের ভাত আমি গিয়ে নিয়ে আসবো। আমার ছেলেপুলের বড় কষ্ট' দিনের বেলায় কুন্তা খুব একটা বের হয় না। ...'কুন্তা! তাহাকে তো চিনি নাই? তাহার কারণ দিনের আলোতে কুন্তাকে তো দেখি নাই, যাহা দেখিয়াছি রাত্রে। ইজারাদারের লোকজনকে তৎক্ষণাৎ শাসাইয়া কুন্তাকে মুক্ত করিলাম। সে লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়া ছেলেপুলেদের লইয়া বাড়ি চলিয়া গেল। যাইবার সময় কুলের ধামাটি ও আঁকশিগাছটা সেখানে ফেলিয়া গেল। বোধ হয় ভয়ে ও সংকোচে। (বিভূতিভূষণ, ১৪০৮ ব. : ৩০)

এই ত্যাগ-তিতিক্ষা মা হিসেবে একজন নারীকে করতে হয়; কারণ যেকোনো দীর্ণতার বিনিময়ে নারী তার এই আত্মার বাঁধনকে ছিন্ন করতে পারে না। লেখক নারীর এই সত্তাটি বরাবর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেছেন। অরণ্য জীবনের বহু-জীবিকার বহু-বিচিত্র মানুষের সমাহার লেখকের অভিজ্ঞতায় উঠে এসেছে। সেই অভিজ্ঞতার অভিঘাতে আর একটি নতুন অধ্যায় নকছেদী মঞ্চী দম্পতি ও তাদের জীবনাভিঘাত। ফসল কাটুনী মজুর নকছেদী, তার দুই স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে প্রতিবছর ফসল কাটতে আসে। কৌতূহলবশত তাদের জীবনের খবর নিতে গিয়ে তাদের অজ্ঞাত-অচেনা জগৎ লেখকের সামনে আসে। নিদারুণ শীতে তাদের কোনো গরম কাপড় নেই, খুপরির কোণে জমা করা কলায়ের ভুসি তাদের একমাত্র ভরসা :

> কলায়ের ভুসির মধ্যে ঢুকে ছেলেপিলেরা শুয়ে থাকে আমরাও কলায়ের ভুসি গায়ে চাপা দিয়ে শুই। দেখছেন না, অন্তত পাঁচমন ভুসি মজুদ রয়েছে। ভারি ওম কলায়ের ভুসিতে। দুখানা কম্বল গায়ে দিলেও অমন ওম হয় না। আর আমরা পাবই বা কোথায় কম্বল বলুন না। (বিভূতিভূষণ, ১৪০৮ব. :৭৭)

নারীর চরিত্র চিত্রণে বিভূতিভূষণ বরাবরই প্রথাগত পথে হেঁটেছেন। বৈদ্যুতী প্রেমের তীব্রতা ভরা প্রিয়া কি প্রেয়সীর চরিত্র তাঁর সাহিত্যে মেলে না। প্রেয়সীর 'ছদ্মবেশে' তাঁর সব নারী চরিত্রই হয় স্নেহময়ী জননী, নয়তো কল্যাণময়ী ভগিনী। (গোপিকানাথ, ২০১৬ : ৫৩) এই উপন্যাসে মঞ্চী

তেমনি এক নারী। তাকে পাওয়া যায় কাটুনী মজুর নক্‌ছেদীর দ্বিতীয় স্ত্রীরূপে। মঞ্চীকে প্রথমে লেখক প্রথমে নক্‌ছেদীর কন্যা হিসেবে ধারণা করেন। নক্‌ছেদী মঞ্চীর বয়সের ব্যবধান সে কথায় স্মরণ করায়। 'মেয়েটির বয়স চব্বিশ-পঁচিশ, খুব স্বাস্থ্যবতী, বার্নিশ করা কালো রং, নিটোল গড়ন। কথাবার্তা বেশ বলিতে পারে, গলার সুরটা দক্ষিণ-বিহারের দেহাতী হিন্দিতে বড় চমৎকার শোনায়।' (বিভূতিভূষণ, ১৪০৮ব. :৭৮) কাটুনী মজুরের যাযাবর জীবনে আজ এখানে তো কাল সেখানে। প্রান্তিক এই নারী তার জীবনকে বোঝার পূর্বেই পিতার বয়সী এক বিগত যৌবন পুরুষের স্ত্রী হয়ে সন্তানের মা হয়ে উঠেছে। বৃদ্ধের জীবনে মঞ্চী শুধু তরুণী স্ত্রী রূপেই তাকে সুখী করেনি, শ্রমে ও সহযোগিতায় এই পরিবারের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছিল সে। একমাত্র সন্তানকে বসন্তের করাল আঘাতে হারিয়ে জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে অজানার পথে পাড়ি দিয়েছে। এ ছাড়া অন্য নারীরা আছেন, যেমন ভানুমতী, সাঁওতাল রাজকন্যা। তাকে ঠিক নিম্নবর্গ বলে সম্বোধন করা যায় না। কারণ তিনি আদিবাসী নারী হিসেবে সমাজের মূলস্রোতের বাইরের মানুষ হলেও তার সমাজের সে উচ্চবর্গাধীন একজন নারী। এ ছাড়া তুলসী, ধ্রুবার কথাও লেখকের মর্মকে স্পর্শ করেছে। তাদের জীবন যন্ত্রণা সম্পর্কে লেখক অবগত ছিলেন। তবে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে তারা ঔপন্যাসিকের মানসিক নৈকট্যকে আকৃষ্ট করতে পারেননি।

৭.৩

ইছামতী (১৯৫০) বিভূতিভূষণের গ্রামীণ জীবনচেতনার আর এক দিগন্তবিস্তারী রূপ। এই উপন্যাস গ্রামীণ নারী ও ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে কৌলীন্য প্রথার অনলে নারীর বেদনাদগ্ধ জীবনকাহিনি। উপন্যাসের শুরুতেই লেখক বলেছেন মূক জনগণের কথা বলবেন, সেই মূক জনগণ হলো নারী। বিশেষত গ্রামীণ নারী বা নিম্নবর্গের নারী। সামাজিক শোষণের বহ্নিজালে সব সময় নারীকেই পুড়তে হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই সমাজ পরিসরে তিনটি ভিন্ন গোত্রের নারীকে প্রত্যক্ষ করা যায়, যারা মেয়েদের চিরাচরিত ছাঁদকে অস্বীকার করেছে গৃহবধূ নিস্তারিণী, সন্ন্যাসিনী ক্ষেপী, আর সাহেবের পরিচারিকা গয়ামেম। (সুতপা, ২০০৮ : ২২০) ইছামতী নদীর মতোই এই নারীদের জীবন ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভাঙা ভাঙা নিরলস ভঙ্গিতে চলতে থাকা। লেখক সুকৌশলে ঢেউয়ের উত্তলতা পরিহার করে, চরিত্রগুলোকে প্রশমিত করেছেন। ঔপনিবেশিক শোষণ শুধু অর্থনৈতিক দাসত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেনি। পাশাপাশি শাসকশ্রেণির নিয়োগকৃত প্রতিনিধিদের আরাম-আয়েশ ও মনোরঞ্জনের জন্য এদেশীয় নারীর সম্ভ্রমহানি ঘটানো তার একটি অংশ। ইতিহাসে তা অনুল্লিখিত থাকলেও সময়ের অভিঘাতকে অস্বীকার করা যায় না। উপন্যাসের ইতিহাস সংযোগের একটি অধ্যায় গয়ামেম নামক বাগদী এই

নারী। সমাজের মূল স্রোতে যারা অপাঙক্তেয়, দারিদ্র্যপীড়িত, সেই মেয়েটিকে ক্ষুধার যন্ত্রণায় তার মা তাকে তুলে দিয়েছিল নীলকর শিপটন সাহেবের হাতে। সেই থেকে সবাই জানে সে বড় সাহেবের রক্ষিতা; আর বাগদী নারী গয়ার নামের সাথে মেম শব্দটি জুড়ে গিয়েছিল। নিম্নবর্গের নারী গয়া বগিদী সত্যিই সাহেবকে ভালোবেসে ছিল। সাহেবের মৃত্যুর বহু বছর পর গয়া যখন বৃদ্ধা, অভাবগ্রস্ত,তখনও গয়া এসেছে গভীর জঙ্গলে সাহেবের কবরে ফুল দিতে। 'আজ মরবার তারিখ সাহেবের, মনে আছে না? কত নুন খেয়েছেন এক সময়! দুটো উলুখড়ের ফুল দ্যান ছড়িয়ে।'(বিভূতিভূষণ, ২০১২ : ১৯৪) অসুস্থ শিপটন সাহেবের নিঃসঙ্গ জীবনের সহায় ছিল গয়া। সাহেবের মৃত্যুর পরও সমাজে তার ঠাঁই হয়নি। সমাজের ঘৃণায় সে একঘরে হয়ে নিঃসঙ্গ হয়ে জীবনযাপন করেছে। সমাজের এই বৈরী আচরণকে উদ্দেশ্য করে গয়ার আক্ষেপ :

> খেতি পেতাম না যদি যদি সাহেব সেই জমির বিলি না করে দিত... যদ্দিন সময় ভাল ছেল, আমারে দিয়ে কাজ আদায় করে নেবে বুঝতো, তদ্দিন লোকে মানতো, আদর করতো। এখন আমারে পুঁছবে কেন? উল্টে আরো হেনস্ত করে, এক-ঘরে করে রেখেছে পাড়ায়– আমার জাত গিয়েছে যে। একঘটি জল কেউ দেয় না, অসুখে পড়ে থাকলি কেউ উঁকি মেরে দেখে না।... সে দিন কি আমার আছে। (বিভূতিভূষণ, ২০১২ : ১৯৪)

গয়া চরিত্রেরের আর একটি দিক নীল-কুঠিরের আমিন প্রসন্ন আমিনের প্রণয় প্রাসঙ্গিক রসিকতা। প্রসন্ন আমিন বিভিন্নভাবে বিভিন্ন প্রসঙ্গে গয়ার প্রতি তার ভলোবাসা জানিয়েছে। সব বুঝেও অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তার প্রণয় প্রাসঙ্গিক রসিকতা এড়িয়ে সহজ স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে সে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মতে, 'চিরকালীন নারীর মমতাতেই সে প্রসন্ন আমীনের মতো প্রৌঢ় নারীদেহ লোলুপকে একেবারেই ত্যাগ করতে পারেনি, তিরস্কার করেছে, ধিক্কার দিয়েছে, খেলিয়েছে ও কিছু-সেই সঙ্গে তার যথার্থ কল্যাণচিন্তাও করেছে। সস্নেহ প্রশ্রয়- শেষ পর্যন্ত আশ্রয় দিয়েছে।' (গোপিকানাথ, ২০১২ : ১৯৬) সবকিছুর মধ্য দিয়ে তার অনন্যসাধারণ মানবিক গুণেরই প্রকাশ ঘটেছে। এই একঘরে করার মধ্য দিয়ে তাকে ঠেলে ফেলা হয় মূল স্রোত থেকে অনেক দূরে। এভাবে সমাজে একজন নারী হয়ে ওঠে 'অপর'। সামাজিক বিভিন্ন কারণ বা আর্থিক-অনটনে যখন একজন নারী হয়ে ওঠে পতিতা, তখন তার জন্য সামাজিক বিধানের থাকে অনেক কূপমণ্ডূকতা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নিম্নবর্গের নারীর প্রতি এই বিধান স্বাভাবিক, অথচ পুরুষের বহুগামিতাকে প্রতিষ্ঠা দিতে কার্পণ্য করেনি সমাজ।

সমাজের অন্তেবাসী সেই নারীর চেতনালোকের সহজ-নির্মল রূপ অন্বেষণ ও বিরল মানবীয় গুণাবলি উন্মোচনের আন্তরিকতায় বিভূতিভূষণের এই সব চরিত্ররাজি বিশিষ্ট মাত্রায় উত্তীর্ণ। (তাশরিক, ২০১৮

: ৩৬৬) আবার নিজের দুঃখ-দুর্দশার দিনে, প্রত্যাখ্যাত মানুষটার কথা মনে হয়েছে। সংকীর্ণ গ্রামীণ পরিবেশে প্রচণ্ড জাত্যভিমানের বেড়ে ওঠা এই গয়ামেমের চিন্তার স্বাতন্ত্র্য, মানবিকতার সাহস তার উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের বিজয়গাথা। শুধু বরো বাগদীর মেয়ে গয়া নয়, শাম বাগদীর মেয়ে কুসুমকেও পাওয়া যায় একই পরিস্থিতির মধ্যে। ক্ষুধার জ্বালা আর সৎমায়ের অত্যাচার এই দুইয়ের হাত থেকে মুক্তি পেতে সে ভগ্নিপতির সাথে চলে যেতে চায়। সেখান থেকে রাজারাম তাকে ফিরিয়ে আনার পর কুসুম বলেছে, 'মোরে পেট ভরে খেতি দেয় না সৎমা। মোরে বকে, মারে। মোর ভগ্নিপতি বলেল-মোরে বাড়ি কিনে দেবে, ভালোমন্দ খেতি দেবে।'(বিভূতিভূষণ, ২০১২ : ৮৮) পেটের দায়ের কাছে নিরুপায় এই নারীর কাছে অন্যসব ভাবনা মূল্যহীন। এক মেয়ের শান্তি নিবারণের জন্য আর এক অশান্তির পথ শাম বাগদী তৈরি করতে পারেনি। তাই হতদরিদ্র এই পিতা সব বুঝেও কন্যা কসুমকে নীলকুঠির সাহেবের কাছে দিতে চেয়েছিল। এত দারিদ্র্য, এত শোষণ, এত চরিত্রহীনতা, দুস্থিতির মধ্যেও মানুষ কীভাবে বাঁচে, কীভাবে সে পুনঃসৃষ্টির মধ্য দিয়ে ইতিহাসের প্রবাহকে স্রোতময়-গতিময় রাখে, তার হদিস ইতিহাসের এই নন্দন জিজ্ঞাসায় বিভূতিভূষণ দিয়ে গিয়েছেন। (পার্থপ্রতিম, ১৯৯২ : ১০০)

৭.৪

আদর্শ হিন্দু-হোটেল (১৯২৮) বিভূতিভূষণের অন্যতম সার্থক উপন্যাস। প্রধান চরিত্র হাজারি ঠাকুর হোটেলের প্রধান রাঁধুনী। হাজারি ঠাকুরকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের কাহিনি রচিত হয়েছে। এই উপন্যাসে মুখ্যত দুটি নারী চরিত্রের পূর্ণাঙ্গরূপ পাওয়া যায় পদ্ম ঝি ও কুসুমের মধ্যে। পদ্মঝি বেচু চক্কতির হোটেলের ঝি, হোটেলের ঝি হলেও সে সবার ওপর আধিপত্য বিস্তার করে ও নিয়ন্ত্রণ করে। নিম্নবর্গের নারীর সাধারণ মানসিকতাবশত সংকীর্ণতা থেকেই সে অন্যের ভালোতে ঈর্ষান্বিত হয়। আর একটি ক্ষেত্রে পদ্ম খুব বেশিই বিরক্ত থাকে সে হাজারি ঠাকুরের প্রতি। হাজারি ঠাকুরের সব কাজেই সে ত্রুটি খোঁজে, তার চলাফেরা সবকিছুতেই তার সমস্যা মনে হয়। পদ্ম চরিত্রের এই সংকীর্ণতা, এই নেতিবাচকতা তার জীবনপরিধি, তার সংস্কৃতি থেকে জাত। অকারণেই সে সবার সাথে খারাপ আচরণ করত, সন্দেহ করত, কর্মচারীদের সব সময় তটস্থ রাখত। এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলা জরুরি, লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু মানবচরিত্রের মানবিক, ইতিবাচকতাকে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেননি, মানবচরিত্রের সংকীর্ণতা ও নেতিবাচকতাও তাঁর উপলব্ধির সীমায় আবদ্ধ। আসলেও কোনো মানুষই পুরোটা খারাপ যেমন হয় না, তেমনিই সামগ্রিক ভালোও হয় না; ইতি আর নেতির মিলনেই মানুষ, পদ্মঝি তেমনি একজন নারী। পদ্মঝির বাইরে আছে আরো একজন নিম্নবর্গের

নারী; যে হাজারি ঠাকুরের গ্রামের মেয়ে ঘোষজায়া কুসুম। কুসুম গ্রামের মেয়ে, রানাঘাটের নগরজীবন তার মনের গ্রামীণ সহজাত উদারতাকে গ্রাস করতে পারেনি। অভাবের সংসারে নিত্যদিন দারিদ্র্যের সঙ্গে সহবাস করলেও গাঁয়ের মানুষকে পেয়ে তার প্রতি সহমর্মিতার নাড়ির টান অনুভব করে। পিতৃসুলভ মমত্বে সুখ-দুঃখের কথা বলে প্রশান্তির ছায়া পায়। কন্যার সেই আন্তরিকতা থেকে, দাবিবশত একখানি কাঁথা দেয়; যা খবু সাধারণ কিন্তু আন্তরিকতার অপরিমেয়তায় অসাধারণ–

> একখানা কাঁথা বাহির করিয়া হাজারির সামনে মেলিয়া ধরিয়া বলিল– কেমন হয়েছে কাঁথাখানা?...আপনি এখানা রাত্রে পেতে শোবেন। আপনি শুধু মাদুরের উপর শুয়ে থাকেন হোটেলে–আমার অনেক দিনের ইচ্ছা একখানা কাঁথা আপনাকে সেলাই করে দেব।(বিভূতিভূষণ, ১৪২৪ব. :৮৭)

কুসুমের এই কন্যাসুলভ মমত্বের কোনো মূল্য হয় না। এই সম্পর্কের সূত্রে হাজারি তার স্বপ্নের কথা প্রথম ব্যক্ত করে কুসুমের কাছে। কুসুম শুধু নীরব শ্রোতা হয়ে প্রেরণা জোগায়নি; তার কৃচ্ছ্রাদিত জীবনের তিল তিল করে জমানো মূলধন দিয়েও সহযোগিতা করেছে হাজারি ঠাকুরকে। নিম্নবর্গের খেটে খাওয়া এই নারীর স্নেহ, মমতা, বিশ্বাসের যথার্থতায় মর্যাদা দিয়ে হাজারি নিজে যেমনভাবে সম্মানিত হয়েছে, তেমনি কুসুমকেও সম্মানিত করেছে।

৭.৫

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বশেষ ও অসম্পূর্ণ উপন্যাস *অশনি সংকেত* (১৯৫৯)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে, গ্রামজীবন-নির্ভর এই উপন্যসে যুগচেতনাকেই ধারণ করা হয়েছে। উপন্যাসের প্রধান পাত্র-পাত্রী গঙ্গাচরণ চক্রবর্তী ও তার স্ত্রী অনঙ্গ। *অশনি সংকেত*-এ পাঠক অন্য এক বিভূতিভূষণকে আবিষ্কার করেছেন। যে বিভূতিভূষণকে তারা জেনে এসেছে প্রকৃতি প্রেমিক ও জীবনবিমুখী হিসেবে লেখক হিসেবে। সেই মানস-চেতনার মাঝেই তাঁর মধ্যে দৃপ্তমান হয়ে ওঠে যুগচেতনার দৃশ্যমান আলো। এই বিষয়ে সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতামত ব্যক্ত করেছেন-

> যে বিভূতিভূষণ ১৯৩০ সনের দেশব্যাপী লবণ আন্দোলনের সময় গোপাল হালদারকে বলেছিলেন ‘ও সব আমাদের কিছু নয়, আমরা সাহিত্যিক, আমরা জীবনের অনেক গভীরতর দেশকে দেখি’, সেই বিভূতিভূষণ তেরশ পঞ্চাশের মন্বন্তরে বাংলাদেশকে দেখে বিচলিত না হয়ে পারেননি। বিভূতিভূষণের সাহিত্যে যাঁরা সমসাময়িক তথা আধুনিকতার অভাব দেখেন, তারা ‘অশনি সংকেত’-এ নিশ্চয় আধুনিকতা খুঁজে পাবেন। তেরশ পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের গ্রাম বাংলার তথ্যচিত্র ‘অশনি সংকেত’। (সুনীল, ২০০৬ : ২৪৬)

দেশজ, সামাজিক, রাজনৈতিক আবহ ও সমস্যাকে উপেক্ষা করে রচিত শিল্পকর্মে সৃষ্টির গুণগত প্রবাহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, লেখক বিভূতিভূষণ তা বুঝতেন। যার ফলে সম্ভব হয়েছে কালগত-দেশগত

সীমাবদ্ধতাকে ছাপিয়ে এক ব্যাপ্ত কালসময়ের কণ্ঠস্বরকে আত্মপ্রকাশ করার; তাঁর সর্বশেষ এই উপন্যাসের আঁধারে তিনি নিজেকে পুনঃর্নির্মাণ করেছেন। ক্ষুধার জ্বালার কাছে বৈধ-অবৈধ, নীতি-নৈতিকতা সব ভেসে গিয়েছে। গ্রামসমাজের প্রচলিত সব সংস্কার, পাপপুণ্য, শুভ চেতনাবোধকে গ্রাস করে নিয়েছে মন্বন্তরের কালো ছায়া। ক্ষুধার পীড়নে নারীত্বের আদর্শলোকে অনুচিতের আগমন ঘটেছে। অনাহারের তাড়নাতেই কাপালীবৌয়ের সতীত্বের বিসর্জন ঘটে। কাপালীবৌ ইটখোলার যদুপোড়ার কাছে যায় চালের লোভে। কাপালীবৌ বলে, ' না খেয়েই যদি মলাম, তবে কিসের কি ? আমি কোনো কথা শুনবো না–চলি বামুনদি পাপ হয়ে নরকে পচে মরবো সেও ভালো–'(বিভূতিভূষণ, ২০১৪ : ৭৪) আঁচলে চাল নিয়ে ইটখোলা থেকে সে যখন বের হয়, তখন সে সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ। এভাবে ক্ষুধা আর অনাহারের কাছে সবকিছু ভেঙ্গে পড়ে; ইতিহাসের মূল সীমার বাইরে আরও একটি ইতিহাস ভেঙে পড়ে গ্রামীণ সমাজ আর পরম্পরা। কারণ সমাজ নারীর জন্য সবসময় নৈতিকতার কষ্টিপাথরে নির্মিত খাঁচা সেখান থেকে বের হওয়ার পথ সহজ হলেও ঢোকার পথ নির্মম দুর্জ্ঞেয়তায় ঘেরা। সে কথা জেনেও কাপালীবৌ চিরদিনের জন্য নিজেকে বিসর্জনের পথে পা বাড়িয়ে। যেখানে খাদ্যাভাবে জীবন এক চরম অনিশ্চয়তার ফাঁদে বন্দি, সেখানে সমাজ, ধর্ম সমস্তই কুহকজাল বলে মনে হয়েছিল তার কাছে। তাই আর্তনাদ করে বলেছিল, ' নরকে গিয়েও যাতে দুটো খেতে পাই।'(বিভূতিভূষণ, ২০১৪ : ৭৪) এই স্বরের মধ্যে ধ্বনিত হয় আর এক সত্য ; যেখানে স্পষ্ট হয় যে আপৎকালীন সংকট নারীর জীবনের গভীরতর ক্ষতের সৃষ্টি করে। এ চিহ্ন বয়ে চলে আজীবন। বিভূতিভূষণ বাস্তববাদিতা চান কিন্তু রূঢ় বাস্তবকে চান না, বাস্তবতার কাঠিন্যকে পরিহার করে তার মধ্যে সুধাময়তার পরশ খুঁজে চলেন। বলা যায়, দার্শনিকতা তাঁর নির্মিত চরিত্রের মধ্যে আরো বেশি মাত্রায় বিরাজমান।

৮.

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়কালের বিভ্রান্তিকর সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমি যখন মানুষের জীবন সম্পর্কে স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে; প্রচলিত মূল্যবোধ সম্পর্কে মানুষের সন্দেহাতীত সংশয় প্রকাশ পায়; এমন এক পরিবর্তশীল সময়ের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে পুরোনো জীবনকে নতুন আলোয় নতুন করে মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে আবির্ভূত হন ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৮-১৯৭১)। সমাজের বাস্তবতাকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে তিনি শ্রেণিগত ঐতিহ্য, সহানুভূতি ও রাজনৈতিক মতাদর্শকে কাহিনির বিন্যাসে বাস্তবতার সমন্বয়ে বিকাশ ঘটান। জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেও সামন্তবাদী সত্তার উদারনৈতিক আত্মগত চেতনাকে ধারণ, লালন ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি

তাঁর সাহিত্যিক সত্তায়। কল্লোল সমসাময়িক কালের হয়েও তাঁর লেখা কখনোই কল্লোলের বৈদগ্ধতার সীমায় আবিষ্ট হয়ে থাকেনি। দীর্ঘ সাহিত্যজীবনে তিনি জীবন সম্বন্ধে নানা ধরনের তাৎপর্যমুখী কৌতূহলের প্রশ্নোত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন। 'তারাশঙ্করের রচনায় আত্মপ্রকাশ করেছে ময়ূরাক্ষী, লাল-রুক্ষ-কর্কশ মাটির রাঢ় অঞ্চল, ক্ষয়িষ্ণু গ্রামীণ জমিদার, জোতদার, আধিয়ার আর আউরি, বাউরি, সাঁওতাল শ্রমজীবী শ্রেণী। যে বিশ্বস্ত অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতি ঔপন্যাসিকের সম্পদ তারাশঙ্কর তার অধিকারী।' (দেবেশ, ২০১৬ : ১৮১) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ একজন মানুষ। একজন সমাজসচেতন শিল্পী হিসেবে দেশ-কাল-সময়ের সাথে তাঁর অন্তর্যোগাযোগ অপরিমেয়। দেশ বলতে তিনি দেশের মাটি আর মানুষকে এক করে বুঝতেন। তিনি মানুষের সমত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, তাই তাঁর সমস্ত রচনায় শ্রেণিবৈষম্যের প্রতিরোধী চেতনার পরিচয়ে পরিব্যাপ্ত। নতুন আর পুরাতনের দ্বন্দ্ব তাঁর লেখনীর উল্লেখযোগ্য বিষয়। এই নতুন-পুরাতনের দ্বন্দ্বদীর্ণতার মাঝে বাংলা সাহিত্যে প্রথম নিম্নবর্গকে সর্বত্মাকভাবে জায়গা করে দিলেন তিনি। গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় এই মানুষগুলোর অতীত বর্তমান যেমন রূপায়িত হয়েছে, তেমনি তিনি ভবিষ্যতেরও ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। যাকে সহজভাবে বলা যায় সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে পুঁজিবাদের দ্বন্দ্ব। তাঁর প্রতিটি সাহিত্যকর্ম তার প্রামাণিকতা বহন করে। এই ধারাবাহিকতায় তাঁর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হলো *চৈতালী ঘূর্ণী*, *ধাত্রীদেবতা*, *কালিন্দী*, *কবি*, *গণদেবতা*, *পঞ্চগ্রাম*, *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*, *নাগিনী কন্যা* প্রভৃতি।

৮.১

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস নিম্নবর্গ প্রধান না হলেও নিম্নবর্গ সম্পর্কিত। অর্থাৎ কোনো না কোনোভাবে কাহিনিতে আগমন ঘটেছে নিম্নবর্গের। তাঁর সাহিত্যিক সম্পৃক্ততার বৃহৎ আলোচিত প্রসঙ্গ রাঢ় অঞ্চলের বেদে সম্প্রদায়ের ব্যক্তিজীবন ও গোষ্ঠীজীবনের সংগ্রাম-সংক্ষুব্ধতার কাহিনি, যা অদ্ভুত রহস্যপূর্ণ দিকও বটে। মায়াবী আস্তরণে তিনি রূপায়িত করেন আঞ্চলিক প্রতিবেশ, সেখানে অবশ্য কল্পলোকই প্রাধান্য বিস্তার করে। একটা ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত পৌরাণিক যুগ থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সম্প্রদায় যেনো লৌকিক কুসংস্কার ও সংস্কৃতিতে নিজের আনন্দ-বেদনা, আশা-আকুলতাকে সীমাবদ্ধ রেখে একটা আদিম অন্ধকারাচ্ছন্নতায় যুগে যুগে কাটিয়ে দিয়েছে। এই সমস্ত উপন্যাসে লৌকিক সংস্কারের দিকটিই কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে উঠেছে। তাঁর ঔপন্যাসিক সত্তাটাই এমন পরিবেশ ও প্রেক্ষিত নির্ভর যে গ্রামসমাজ ও নিম্নবর্গীয় জীবনের ক্যানভাসটি সেখানে বিস্তৃতি পায়। (মানবেন্দ্র, ২০০৯ : ১৪০) গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে নিবিড় সংযোগই নানা শ্রেণির অন্ত্যজ ও অবহেলিত

মানুষকে তাঁর উপন্যাসে স্থান করে দিয়েছে। তাঁর উপন্যাসে শুধু বর্ণগত, শ্রেণিগত বৈষম্যই স্পষ্ট হয়নি; অর্থনৈতিক পটভূমিতে সমাজের নিচের তলার দরিদ্র ও অবহেলিত মানুষের নগ্ন চিত্রও উঠে এসেছে।

৮.২

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *কবি* (১৯৪৪) পুরোপুরি একটি ব্রাত্যজীবনের ছবি। কবি যতটা না নিম্নবর্গের সমাজজীবন বা বহির্বাস্তবতার কথা, তার চেয়ে অনেক বেশি অন্তর্জীবনের প্রতিচ্ছবি। উপন্যাসের নায়ক বা প্রধান চরিত্র যথার্থই নিম্নবর্গাধীন মানুষ। উপন্যাসের প্রধান উদ্দিষ্ট নিতাই হওয়ায়, নিতাইয়ের বংশ ইতিহাস তুলে ধরেছেন লেখক। উপন্যাসের নায়ক নিতাইচরণ ডোম বংশের সন্তান হলেও সে নিজের মধ্যে কবিত্বশক্তির স্ফুরণ অনুভব করেছিল। নিতাই ডোমশ্রেণিভুক্ত হলেও আপন জাত সম্পর্কে এতটুকু দ্বিধাগ্রস্ত নয়। '... ডোমেই বা লজ্জা কি? ডোমই বা ছোট কিসে? ডোমও মানুষ বামুনও মানুষ'(তারাশঙ্কর, ২০১৮ : ১০)। দ্বিধাহীন নিতাই বংশগত ব্যবসা ছেড়ে উদাসী মন নিয়ে গোষ্ঠী জীবনের বাইরে এসে জীবনযাপন করত। এই জীবনে নিতাইয়ের সংসর্গ হয়েছিল দুজন নারীর সঙ্গে। প্রথমজন ঠাকুরঝি, দ্বিতীয়জন বসন্ত। দুই জনের বসবাস নিতাইয়ের মনে। তাদেরকে কেন্দ্র করে নিতাইয়ের জীবন ও কবিসত্তার আবির্ভাব ও আবর্তন দুইই ঘটেছিল। নিতাইয়ের কবিত্বশক্তির প্রথম মানবীয় অনুপ্রেরণা ঠাকুরঝি। ঠাকুরঝির সামাজিক পরিচয় হলো, সে একজন নিম্নবর্গীয় নারী। রেলওয়ে পয়েন্টসম্যান রাজালাল বায়েনের শ্যালিকা। সে একজন গোপবধূ, পাশের গ্রামে তার শ্বশুরালয়। তার চরিত্রের আর একটি বিশেষ দিক হলো, বিবাহিত হলেও সে গৃহবন্দি নারী নয়। কর্মের প্রয়োজনে প্রতিদিন তাকে ঘরের বাইরে আসতে হয়। সে কারণেই বাইরের জীবন ও পরিবেশ তাকে টেনেছিল। স্টেশনের ভাঙা ঘরে নিতাইয়ের যে বাসবাস, সেখানে ঠাকুরঝির কাছে নিতাই এক পোয়া করে দুধ রাখে। আর এভাবে তাদের বাহ্যিক যোগাযোগ; কিন্তু অন্তরগত যোগাযোগ ঘটে কবিপ্রতিভার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশে। নিতাইয়ের চোখে ব্রাত্য কালো এই মেয়েটির গায়ে সাদা ধপধপে মোটা কাপড় পরা আর মাথায় ঝকঝকে সোনা রঙের পিতলের ঘটি, যা দূর থেকে সৌন্দর্যপিয়াসু মনের নজর কাড়ে। ঠাকুরঝির এই বর্ণনা নিতাইয়ের চোখে দেখা। নিতাইয়ের কাছে ষোল-সতের বছর বয়সের এই মেয়েটি যেন তার দৃষ্টিতে 'মূর্তিমতী শ্রদ্ধা'। তার কালো রঙের কলঙ্ক নিতাইয়ের চোখে কবিত্বের আধারে ধরা দিয়েছে। 'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেন?' (তারাশঙ্কর, ২০১৮ : ৩২) আবার ঐ কালো রঙের মেয়েটি যখন খোঁপায় কৃষ্ণচূড়া দিয়ে নিজের সৌন্দর্যের বহর বাড়ায়; তখন কবিয়ালের মনে হয়-'কালো কেশে রাঙা কুসুম হেরেছ কি নয়নে?'

(তারাশঙ্কর, ২০১৮ : ৩৫) এভাবে ঠাকুরঝি আর কবিয়াল একে অপরের সুখ-দুঃখের সঞ্চারী হয়ে উঠেছে। একের জীবনে অন্যের আবির্ভাব, আকর্ষণের আপ্যায়ন ঘটেছে। আত্মার-আত্মীয় হয়ে উঠেছে এক অপরের; কিন্তু সমাজ? সে তো মানবে না এই সম্পর্ক। এরই মধ্যে এই অবুঝ নারী তার সর্বস্ব দিয়ে অন্তরের অন্তঃস্তলের আধিপত্য সমর্পণ করে কবিয়ালকে। ঠাকুরঝির মতো অসহায় নারীর মানসিক শক্তির দৃঢ়তা এত বেশি ছিল না যে প্রথম প্রেমের দুকূল প্লাবিত ঢেউে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করবে। এরই মধ্যে আগমন ঘটে ঝুমুর গানের শিল্পী বসন্তর। তার প্রেমের ঠাকুর নিতাইয়ের জীবনে অন্য কোনো নারীর আবির্ভাবের আকস্মিকতা তাকে যন্ত্রণার পরাকাষ্ঠে দগ্ধ করে। যেখান থেকে নিরাগমনের পথ তার জানা ছিল না, এই অসহায়তার অন্ধকার তার মানসিক স্থিতিশীলতা কেড়ে নেয়। নিম্নবর্গের পোড়খাওয়া এক তরুণীর অব্যক্ত বাসনার জলে একটি আঘাতকে জলোচ্ছ্বাসে রূপ নিয়েছিল। ঠাকুরঝির এই অবর্ণনীয় অন্তর্দাহ পাঠককের মনে দীর্ঘস্থায়ী ছায়াপাত করেছে।

বসন্তকে বলা যায় নিম্নবর্গের মধ্যেও নিম্নবর্গ, ব্রাত্যর মধ্যেও ব্রাত্য। সমাজের নিম্নস্তরের দেহব্যবসায়িনী বসন্ত। সমাজবহির্ভূত স্বৈরিণী এই নারীর জীবন শুধুই শূন্যতায় ভরা। কোনো মানবসন্তান যেমন নারী হয়ে জন্মায় না, সমাজ তার প্রয়োজনে তাকে নারী করে তোলে। তেমনিভাবে কোনো কন্যাসন্তানই বারাঙ্গনা হয়েও জন্মায় না; সমাজ ও সমাজে বিরাজমান পরিবেশ তাকে বারাঙ্গনা করে তোলে। বসন্তের মতো পতিতা নারী সমাজের চোখে সর্ব-অপরাধে অপরাধী। যে পরিবেশ পরিস্থিতি নারীর স্বাভাবিক জীবনের সমস্ত অধিকার হরণ করে, সেখানে প্রবেশ করা যায় ; কিন্তু বের হওয়ার পথ চিরদিনের জন্য অবরুদ্ধ থাকে। তারাশঙ্করের সৃষ্টিশীল মন বরাবরই অন্তেবাসী এই মানুষের জীবন ও জীবনবোধ সম্পর্কে সহানুভূতিপ্রবণ। তাঁর বর্ণনায় তারই প্রতিভাস মেলে :

> সমাজের নিম্নস্তরের নারী বসন্ত লেখাপড়া কিছুই জানো না। কিন্তু সঙ্গতি হিসাবে একটা অদ্ভুত সংস্কৃতি এরা রক্ষা করে চলে। পালাগানের মধ্যে দিয়ে পুরাণ জ্ঞান কিছু এদের হয়–এদের ঠাট্টা– পরিহাসে পুরাণের অনেক প্রসঙ্গ থাকে– এরা পুরাণকথা কিছু কিচু বুঝতেও পারে। প্রশংসা নিন্দা সহজেই উপলব্ধি করতে পারে। এই জাতেরই মেয়ে বসন্ত। (তারাশঙ্কর, ২০১৮ : ৫৭)

এই যাত্রাদলে বসন্তের আপন কেউ ছিল না, ছিল না কোনো আত্মার আত্মীয়। নিজেকে সময়ের হাতে সম্পূর্ণরূপে সঁপে দেয়া এক নারী সে। তার কোনো অতীত নেই, বর্তমান নেই, ভবিষ্যতও নেই। তবে তার গুণ আছে অপার, রূপে-গুণে সে ঝুমুর দলের মক্ষীরাণী। ঝুমুর দলের খেমটি নাচওয়ালী এই স্বৈরিণীর মধ্যে ছিল অসাধারণ নারীর সত্তা; যাকে সবাই দেখতে পায় না। তার সন্ধান পেয়েছিল নিতাই আর নিতাইয়ের কবিয়াল মন।

একটি দীর্ঘ কৃশতনু গৌরাঙ্গী মেয়ে অদ্ভূত দুইটি চোখ। বড় বড় চোখ দুইটার সাদা ক্ষেতে যেন ছুরির ধার,–সেই শাণিত দীপ্তির মধ্যে কালো তারা দুইটা কৌতুকে অহরহ চঞ্চল। বৈশাখের মধ্যাহ্ন রৌদ্রের মধ্যে যেন নাচিয়া ফিরিতেছে মধুপ্রমত্ত দুইটা কালো পতঙ্গ–মরণজয়ী দুইটা কালো ভ্রমর। (তারাশঙ্কর, ২০১৮ : ৫৫)

স্বভাবগত দিক থেকে সে বড় একগুঁয়ে ধরনের মেয়ে। তার বন্ধুত্ব সব মানুষের সাথে হয় না। ঝুমুর দলের মেয়েদের সবারই প্রেমিক আছে, ব্যতিক্রম শুধু বসন্ত। তার সৌন্দের্যের আলোকচ্ছটায় সবাই বশীভূত হতো, 'মেয়েটা শুধু মুখ ভরিয়া হাসে না, সর্বাঙ্গ ভরিয়া হাসে। আর সে হাসির কি ধার। মানুষের মনের মনকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ধুলায় ছুড়িয়া ছিটাইয়া ফেলিয়া দেয়।' (তারাশঙ্কর, ২০১৮ : ৫৫) তার পেশাগত জীবন হয়তো তাকে এভাবে তৈরি করেছে। এই সৌন্দর্য, এই অঙ্গভঙ্গি হয়তো তাকে নায়িকার স্থান তৈরি করে দিয়েছে। ঝুমুর দলের লাস্যময়ী নায়িকা বসন্তকে এমনরূপে দেখতে চায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। পণ্যস্বরূপ এক নারীর ভোগ্যময়ী সৌন্দর্যের অন্তঃসারকে তোষণ করে তাকে খোসারূপে বাঁচিয়ে রেখেছে। নিতাইয়ের নিবিড় সান্নিধ্যে এই দেহব্যবসায়িনীরও সুপ্ত ক্ষুধিত চিত্ত হাহাকার করে ওঠে; বসন্তের মধ্যেও প্রকৃত প্রেম জাগরণ ঘটে। এত দিনে সে ভালবাসার স্বাদ পেয়েছে। এই ভালোবাসায় তার নবজন্ম ঘটেছে, আজন্ম ভালোবাসা বঞ্চিত বসন্তর নতুন করে বাঁচার আকুতি জন্ম নিয়েছে :

নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে নিজের প্রতি তার যত্নের কোনো শেষ নেই। যদিও সন্ধ্যার পর তাকে ব্যবসার জন্য উগ্র হয়ে উঠতে হয়। নিতাই তখন বেহালাবাদকের সঙ্গে একই মনোবেদনা নিয়ে বসে থাকে। বসন্তর ক্লান্ত হলে চলে না। তাদের মদ খেতে খদ্দেরদের মন যোগাতে হবে। না হলে দলে আর রাখবে না মাসী। তারই মধ্যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও 'রূপোপজীবিনী'র অভ্যাসের নেশা জেগে ওঠে। (তারাশঙ্কর, ২০১৮ : ১১০)

এভাবেই বসন্তের জীবনের দেনাপাওনার হিসাব শেষ হয়ে আসে। নারী জন্মের স্বাদ আস্বাদ করার পূর্বেই তাকে বিদায় নিতে হয় জীবন থেকে। নিতাইয়ের রিক্ত জীবন আবার রিক্ততায় মণ্ডিত হয়। মাঝে শুধু আসা যাওয়ার পথে স্মৃতির ভাড়ারকে শূন্যতায় ভরিয়ে তোলা। তাই নিতাইয়ে খেদ-

'এই খেদ আমার মনে মনে।

ভালবেসে মিটল না আশ– কুলাল না এ জীবনে।

হায়, জীবন এত ছোট কেনে?

এ ভুবনে?' (তারাশঙ্কর, ২০১৮ : ১১৯)

জন্মগতভাবে যে নারী নিম্নবর্গের, তার জীবনের পরিণতি সমাজ, রাষ্ট্র, কেউই এর-চেয়ে বেশি ভাবে না। তাই তাদের জীবনের অব্যক্ত আস্বাদন নিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়। অন্ত্যজ এই নারী, এই সমাজের এক উজ্জ্বল উদাহরণ। পৃথিবীর প্রায় সব দেশের মতো ভারতীয় প্রান্তিক নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবন ছিন্নমূল বৃক্ষের মতো। তৃতীয় বিশ্বের দুনিয়ায় প্রান্তিক নারীর জীবন গৃহপালিত প্রাণীর চেয়ে বেশি অবমূল্যায়িত হয়, তার চেয়ে বেশি দগ্ধ হয় জীবনযাপনে। নিম্নবর্গের নারীর বা প্রান্তিক নারীর কোনো ইতিহাস থাকে না; গণমাধ্যম বা মিডিয়ার কল্যাণে যা নির্মিত হয় তা অন্যের নির্মাণ। সে নানা ধরনের সামাজিক উৎপীড়নের মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে। সামাজিক নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা তাদের জন্য তৈরি হয় না। গোষ্ঠী ও সমাজের প্রথা অনুযায়ী তাদের বিয়ে দেয়া হয়। যা প্রান্তিক নারীকে নিরাপদ জীবন দেয়ার পরিবর্তে যৌনদাসে পরিণত করে। (বিপ্লব, ২০১৭ : ৭৭)

৮.৩

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাধিক উপন্যাসে যুগ পরিবর্তনের ইতিহাস লক্ষ করা যায়। সামন্ততন্ত্র শেষ হয়ে ধনতন্ত্রের আবির্ভাব তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন গভীরভাবে। এই পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ ছাপ তিনি রেখে গিয়েছেন তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে। যুগ পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে *কালিন্দী* রচিত হলেও মানবপ্রেম ও মৃত্তিকা-সংলগ্নতা এই উপন্যাসে আলাদা ব্যঞ্জনা দিয়েছে। বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গের অন্ত্যজশ্রেণির সাঁওতালদের নিয়ে যে সকল উপন্যাস রচিত হয়েছে তার মধ্যে *কালিন্দী* অন্যতম। শ্রেণিবদ্ধ এই গোষ্ঠীর জনজীবন কালিন্দীর কোলে লালিত, কালিন্দীর চরের সংস্কৃতিতে পুষ্ট আর কালিন্দীর মৃত্তিকা তাদের পেটের অন্ন জুগিয়েছে। সাঁওতাল গোষ্ঠীর সামগ্রিক জীবনকে লেখক দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখেননি; দেখেছেন তাদের একজন হয়ে। পুঁজিবাদের আগ্রাসনকে এই মানুষগুলোই বা কীভাবে গ্রহণ করেছে; তাদের জীবনে এর প্রভাব কিরূপ ছিল। উপন্যাসে এমনই বহু প্রশ্নের উত্তর মেলে কালিন্দী নদীতে বহুদিন পর জেগে ওঠা চরের মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব। তার সুযোগে বেনিয়ার আগমন ঘটে; নব জাগ্রত অনাবাদী জমিকে যে অন্ত্যজ মানুষগুলো অক্লান্ত শ্রমে উর্বর কৃষিভূমিতে পরিণত করলে, শেষ পর্যন্ত তাদেরকেই ভোগাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হলো। পুঁজিপতির আছে টাকার জোর আর নিম্নবর্গের পেটে আছে ক্ষুধা। এই ক্ষুধাকে পুঁজি করে পুঁজিপতি তাদেরকে যন্ত্রের মতো পেষণ করছে। ওদের 'পেটের জ্বালাই' এদের 'কলের স্টীম উৎপন্ন করে' তখন সেই জ্বালাতেই অন্ত্যজ এই মানুষগুলোকে বশীভূত করে রেখেছে। সেই সত্যই এখানে প্রমাণিত, যে সত্য চিরকালীন। ক্ষুধার জ্বালা দিয়ে শোষকশ্রেণি ওদের যন্ত্রের মতো পেষণ করেছে, মনুষ্যত্বের সবটুকু

'গুড়া' করে এদের 'মজুর' সত্তাটিকে জাগিয়ে রাখে। সেই সাথে সব শোষণের পথে নারীর ওপর প্রভাব আসে অন্য পথে। *কালিন্দী* উপকূলীয় সাঁওতাল-কন্যা সারী তার জীবনের ঐশ্বর্য হারিয়েছে :

> বিমলবাবু ডাকিলেন, সারী! সারী আসিয়া নীরবে চকিত দৃষ্টি তুলিয়া দাঁড়াইল। পরিপূর্ণ আলোকে দেখা যায়, সারীর নিটোল স্বাস্থ্যভরা দীর্ঘ দেহখানি আর সে তৈলাক্ত অতি মসৃণতায় প্রসাধিত নয়, রুক্ষ প্রসাধনের একটি ধূসর দীপ্তি সর্বাঙ্গে সুপরিস্ফুট। পরনে তাহার সাঁওতালী মোটা শাড়ি নাই। একখানা ফুলপাড় মিলের শাড়ি সে পরিয়া আছে। বর্বর আদিম জাতির দেহে অপরিচ্ছন্নতার একটা আরণ্য কুট গন্ধ থাকে, কিন্তু সারী আসিয়া নিকটে দাঁড়াইলেও সে গন্ধ আর পাওয়া গেল না। (তারাশঙ্কর, ১৪২৩ব. : ১৫৬)

কমল মাঝির নাতনি সারী সাহসী মেয়ে। সে জমিদার আর কারখানার মালিক কাউকেই ভয় পায় না। জমিদার আর কলের মালিক মিলে যখন ষড়যন্ত্রে কালিন্দীর যখন চর দখল করে সাঁওতালদের উচ্ছেদ করে, তখন সারীর স্থান হলো বড় বাবুর বাড়িতে :

> সাঁওতাল-- পাড়ার সর্দার এখন চূড়া মাঝি, সেই কাছের পুতুলের ওস্তাদ। সর্দার মাঝির জমি শ্রীবাস পাল দখল করিয়া লইল, তাহার নাকি বন্ধকী দলিল আছে। সারী এখন বিমলবাবুর বাংলোয় কাজ করে, বাংলোর সীমানার মধ্যেই আউট-হাউসে থাকে। তাহার বেশভূষার প্রাচুর্য দেখিয়া সারীর সখীরা বিস্মিত হইয়া যায়। (তারাশঙ্কর, ১৪২৩ব.: ১৫৭)

কারণ সারী শুধু অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের অসহায় মানুষ নয়; সে একজন নারীও বটে। এক্ষেত্রে তার শ্রমকে শোষণ করেই তার মুক্তি ঘটবে না; লৈঙ্গিক পরিচয়ে তার নারীত্ব, তার দৈহিক অবয়বও শোষণের বস্তু। পুঁজিবাদের প্রকট গ্রাস কেড়ে নিয়েছে তার গোষ্ঠী জীবনের স্নিগ্ধ সারল্যের সজীবতা। অভাবের তাড়না তাকে নিয়ে গিয়েছিল বাবুর বাড়ির দাসত্বের কাছে। কিন্তু নারী জানে ঐ দাসত্ব শুধু তার শ্রমকে চুরি করে না; লুণ্ঠন করে তার সম্ভ্রম আর সামাজিক সম্মানকে। যে জীবনে না খেতে পাবার যন্ত্রণা ছিল; সমস্ত বিবর্ণতার শেষে যেখানে মনকে রাঙানোর আলো ছিল। নির্ভার সেই জীবনের নিশ্চিন্ত আনন্দে আর ফেরা যায় না। সমাজের বিবর্তনের পথে নারীকে বরাবরই এভাবে মূল্য দিতে হয়েছে। রাষ্ট্রের বাঁক পরিবর্তনের পথেও নারীকেই পথ হারাতে হয়েছে। মানুষরূপে নারীকে পণ্যের ন্যায় বিক্রি করার ইতিহাস নিকট অতীতের। ঔপনিবেশিক ভারত বা আধুনিকতার যাত্রাপথের ভারতবর্ষে এদেশীয় নারীকে মুক্তি দেয়নি। সে কথার ঐতিহাসিক সত্যতার আভাস মেলে বেনিয়া জাতির অভিজ্ঞতার স্মৃতি বর্ণনায় :

> বাংলায় যখন পর্তুগীজ ও ডাচ বণিকেরা ছিলো, তারা বলতো যে বাংলায় ঢুকবার পথ রয়েছে একশটা, কিন্তু বেরুবার পথ নেই একটিও কারণ হলো এর প্রকৃতিতে রয়েছে প্রাচুর্য আর মেয়েদের সৌন্দর্য ও উদারতা।

এদেশের মেয়েরা নিশ্চয় ইচ্ছা করে উদার হয়নি, তাদেরকে উদার হতে বাধ্য করা হয়েছে। (সেলিনা, ২০০৮ : ৩৫)

পুঁজিবাদের আগ্রাসী শিখায় একদল কৃষিজীবী পরিশ্রমী মানুষ কারখানার অদক্ষ শ্রমিকে পরিণত হলো। নারীদের পরিণতি ঘটলে পেশাজীবী বারাঙ্গনায়। আদিবাসী মায়েদের চোখের জল ও বেঁচে থাকার হা-হা-কার ধ্বনির মধ্য দিয়ে সমাজের বাস্তব ভাবাবেগের প্রকাশ ঘটেছে। এভাবেই উচ্চবর্গের প্রতিহিংসা নিম্নবর্গের সমস্ত অধিকার হরণ করেছে, সর্বস্বান্ত করেছে :

> বিমলবাবু এখানে আসার কিছুদিনের মধ্যেই সারী অনুভব করিল, অজগরের সম্মুখস্থ শিকারের সর্বাঙ্গ যেমন অবশ হইয়া যায়, সেও যেন তেমনি অবশ হইয়া পড়িতেছে.....আরও একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটিয়া গেল, সাঁওতাল -পল্লীর সকলেই এক দিক হইয়া সর্দার কমল মাঝিও সারীর স্বামীকে একঘরে করিল; অথচ তাহারাই রহিল বিমলবাবুর একান্ত অনুগত। কিছুদিনের মধ্যে সারীই নিজে পঞ্চজনের কাছে 'সমচারী'র অর্থাৎ বিবাহবিচ্ছেদের প্রার্থনা করিল। সামাজিক আইনমত তাহারাই জরিমানা দিবার নিয়ম; চাহিবার পূর্বেই সে একশত টাকা 'পঞ্চে'র সম্মুখে নামাইয়া দিল। (তারাশঙ্কর, ১৪০৮ব. : ১৫৭)

সারীকে সামাজিক ও মানসিকভাবে শোষণের মধ্য দিয়েই বণিক বিমলবাবুর তৃপ্তি ঘটেনি। তাকে পাকাপোক্ত গৃহহীন, আশ্রয়হীন করার জন্য যত আয়োজন সবই করেছে। তারপর ছেঁড়া কাগজের মতো পথের ধারে ফেলে দিয়ে নতুন আর এক সারীর সর্বনাশের খেলায় মেতে উঠবে। এভাবে সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ নারীকে মানুষ থেকে পণ্যের আধারে নির্মাণ করেছে।

৮.৪

গণদেবতা ও *পঞ্চগ্রাম* একই পটভূমিতে লেখা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুবৃহৎ উপন্যাস। অনেক আলোচিত, নানা দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা -বিশ্লেষণের এক সুবিশাল পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে বাংলা সাহিত্যে জায়গা করে আছে। গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবনকে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা যেভাবে আবদ্ধ করেছে, সেই প্রাচীরের অন্ধকার তালাবদ্ধ জীবনকে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, গভীর অনুভূতির সম্মিলিত সমবায়ে গ্রামীণ জীবনের এক মহাকাব্যিক পরিসরে এই উপন্যাসের প্লট গড়ে উঠেছে।

গ্রামীণ সমাজজীবনের এই দীর্ঘ বর্ণনার মধ্যে লেখক কৃষিনির্ভর গ্রামীণ জীবনের বিশদ বিবরণ তুলে ধরেছেন। এর পাশাপাশি রয়েছে শ্রমিক-চাষি হিসেবে রয়েছে হরিজন সম্প্রদায়ের কথা। জমিদার মহাজনদের চেয়ে ব্রাত্য মানুষের ব্যক্তিজীবনের কথায় বিশেষ গুরুত্বের সাথেই তুলে ধরেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। এদের মধ্যে আছে মুচি, বাউরি, ডোম উল্লেখযোগ্য। এই উপন্যাসের

অন্যতম নিম্নবর্গের নারী দুর্গা, জাতিতে সে মুচি। পাতুবায়েনের বোন দুর্গা দেহোপজীবী। এর জন্য দুর্গাকে কারো কাছে যেতে হয় না; বরং শ্রীহরির মতো টাকাওয়ালা মনিবেরাই তাকে খুঁজে নেয়। এ বিষয়ে লেখক যথার্থই একটি মন্তব্য করেছেন। 'ভদ্রলোকের পাপ ধরতে চিরকালই আছে নিম্নবর্গের দরিদ্র রমণী।'(তারাশঙ্কর, ১৪০৮ব. : ২০) দুর্গারা স্বেচ্ছায় স্বৈরিণী হয় না; পরিবেশে প্রতিবেশ তাদেরকে স্বৈরিণী বানিয়ে তোলে। অনেকে আবার দুর্গার বৃত্তিচারিতার জন্য তার মাকে দায়ী করে থাকে। তারপরও শ্রীহরিদের প্রবৃত্তিকে কখনই দায়ী করা হয় না। কারণ তারা থাকে ধরা ছোঁয়ার ঊর্ধ্বে। দুর্গা সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে-

> তাহার বিবাহ হয়েছিল কঙ্কনায়। দুর্গার শাশুড়ীর কঙ্কনার এক বাবুর বাড়িতে ঝাড়ুদারনীর কাজ করিত। একদিন শাশুড়ীর অসুখ করিয়াছিল-দুর্গা গিয়াছিল শাশুড়ীর কাজে। বাবুর বাড়ির চাকরটা সকল কাজের শেষে তাহাকে ধমক দিয়া বাবুর বাগানবাড়ী ঝাঁট দিবার জন্য একটা নির্জন ঘরে ঢুকাইয়া দিয়াছিল। ঘরটা কিন্তু নির্জন ছিল না...... কারণ সে বাবুর কাছে শুনিয়াছিল এই যোগসাজশটি তাহার শাশুড়ীর। সব শুনিয়া মায়ের চোখেই বিচিত্র দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিয়াছিল; একটা উজ্জ্বল আলোকিত পথ সহসা যেন তাহার চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া ফুটিয়া উঠিল- সেই পথই সে কন্যাকে দেখাইয়া দিয়া বলিল, যাক আর শ্বশুড়বাড়ী যেতে হবে না। তাহার পর হইতে দুর্গা সেই পথ ধরিয়া চলিয়াছে। (তারাশঙ্কর, ১৪০৮ব. : ১৬৩)

এই ছিল দুর্গার স্খলনের প্রথম পদচিহ্ন। তার সাথে এ কথাও স্বীকৃত যে নিম্নবর্গের এই নারীদের দেহারতি উচ্চবর্গের পুরুষদের দ্বারাই হয়ে থাকে। কোনো নারীই স্বৈরিণী হয় না স্বভাবগত প্রবৃত্তি দ্বারা, তার সঙ্গে থাকে পেটের ক্ষুধার ক্ষুরধার জ্বালা। যে জ্বালার আঁচ উচ্চবিত্ত কোনোদিন স্পর্শই করেনি। সে কারণেই বোধ হয় উচ্চবিত্তের চিত্ত দ্বিধাহীনভাবে বলতে পারে; নিম্নবর্গের নারীর স্বৈরিণী প্রবৃত্তি স্বভাবগত। এর পাশাপাশি উচ্চবিত্তের মানসগঠনটাই এমনতর হয়ে থাকে যে নিম্নবর্গের মানুষ অর্থাৎ একজন শ্রমিকের শ্রমশোষণ যেমনভাবে তার অধিকারে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ঠিক তেমনিভাবেই নিম্নবর্গের নারীর শরীরকে ভোগ করার অধিকার প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে শ্রমশোষণ দৃশ্যমান সত্য আর নারীর শরীরকে ভোগ করা অদৃশ্যমান সত্য। দুর্গার স্বাতন্ত্র্য হলো, সে স্বৈরিণী হলেও কপট নয়; ভীরু নয়। তার বোধগম্যতার শক্তি অনেক বেশি ; তাকে ঠকানো সহজ নয়। পাশাপাশি তার রয়েছে প্রবল স্বাজাত্যপ্রীতি। মোটকথায়, মানুষ হিসেবে তার রয়েছে প্রবল মানসিক শক্তি। কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা, সেই পার্থক্যটা সে বোঝে; তার বোধগম্যতা অনুযায়ী সমাজে সে অবস্থান করে। একদিন শ্রীহরির দেহরক্ষী হয়েছে বলে আজীবন তার ক্রীতদাস হয়ে থাকবে এমনটিও নয়। শ্রীহরি ও শ্রীহরির শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সে ভয় পাই না। আক্রান্তর পাশে দাঁড়িয়ে সাধ্য অনুযায়ী তাকেও সাহায্য করতে ভয় পাই না। একজন নিম্নবর্গের স্বৈরিণী নারীর এই

ব্যক্তিত্ব, এই স্বকীয়তা তাকে উজ্জ্বল নারী চরিত্রের প্রাতিস্বিকতা দিয়েছে; যা তারাশঙ্করের নিম্নবর্গের নারী চরিত্র সৃষ্টির উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য বলেও স্বীকৃত। *গণদেবতা* থেকে *পঞ্চগ্রাম* পর্যন্ত দুর্গার বিচরণ তাকে এই মহাকাব্যিক উপন্যাসের মহানায়িকা করে তুলেছে। কঙ্কনার জমিদার থেকে শুরু করে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, দারোগা, হাকিম কেউই তার সহবত থেকে বাদ যায় না। দুর্গা বলে,

> আমি মুচির মেয়ে; আমাদের জাতকে পা ছুঁয়ে পেন্নাম করতে দেয় না, ঘরে ঢুকতে দেয় না;–আর আমারই পায়ে গড়াগড়ি সব। পাশে বসিয়ে আদর করে– যেন স্বগ্গে তুলে দেয় বলব কি ভাই।– সে আর বলব কি ভাই।– সে আর বলতে পারে না; হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে।(তারাশঙ্কর, ১৪২৩ব.: ১৩৬)

এই দুর্গা অন্য দুর্গা। এই দুর্গা দুরন্ত আর স্বেচ্ছাচারিণী। তার বিচরণের ক্ষেত্র ঊর্ধ্বলোক থেকে অধঃলোক; যে কোনো সীমাকেই অতিক্রম করতে সে দ্বিধাহীন। ভদ্রলোকের পাপ ধরার জন্য যে দুর্গাদের সৃষ্টি হয়, তার জন্য তার লজ্জা নেই, সংকোচ নেই। 'দুর্গা তার এই জীবনের নিয়ে মনে যথেষ্ট অহংকার পোষণ করে। সে নিজের কলঙ্ক কখনও গোপন করে না; বরং স্বজাতির মধ্যে সে তার শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করে।' (রুমা, ২০১৪ : ২৫৪)। সে স্বৈরিণী হলেও তার স্বজাতির প্রতি সমাজের কটাক্ষ শোষণ সে বোঝে। সে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে জানে, তার মধ্যে আগুন ও জল দুইই আছে। কখনো সে সমাজের নিয়মকে তোয়াক্কা না করে, সমাজের চোখে নিজেকে কলঙ্কিনী করেছে। আবার কখনো অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে পরম মমতায় তাদের আগলে রেখে ।

> দুর্গার এই জীবনযাপনের জন্য তার জগৎ অনেকটা বড়। বহু মানুষের সঙ্গে তার পরিচয়। সে অনেক খবর রাখে। মানুষের উপকার করার একটা বড় মন তার আছে। তার এই মনের প্রসারতার জন্য সমাজে কেউ তাকে উপেক্ষা করতে পারে না। সময়ে-অসময়ে সে মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায়, যতটুকু তার সাধ্য, উপকার করার চেষ্টা করে। প্রয়োজনে তার পরিচিত জগতের মানুষেরগুলোকে কাজে লাগায়। খবর সংগ্রহ করে পৌঁছে দেয় সৎ কাজে। সে বিপথে গেলেও বিপথে থেকেই সে সৎকর্ম করে থাকে। এই সব কারণে তাকে ঘাঁটাতে কেউ সাহস করে না। সেও কারোর পরোয়া করে না। (রুমা, ২০১৪ : ২৫৪)।

দেবু ঘোষের নিত্য সহচর হয়ে, তার বিলু দিদির অবর্তমানে জমাই পণ্ডিতের সব সংকটে প্রকৃত বন্ধুর মতো পাশে পাশে থেকেছে। সেই সত্যের পথে সমাজ, ধর্ম, সংস্কার কেউই পথকে আড়াল করতে পারেনি। একজন নিম্নবর্গের নারীর এই নির্মোহ জীবনবৃত্তান্ত দেবু ঘোষের মতোই একজন সম্পূর্ণ মানুষের মর্যাদায় মহীয়ান করেছে। পদে পদে সে শ্রীহরি মতো শয়তানকে লেহন করেছে, '– ঘোষ মশায় –ছিরে পাল গো, যে এককালে মুচির মেয়ের এঁটো মদ খেয়েছে, মুচির মেয়ের ঘরে রাত কাটিয়েছে, মুচির মেয়ের পায়ে ধরেছে।' (তারাশঙ্কর, ১৪২৩ব.: ৮৭) সে করবে দেবু ঘোষের বিচার; সে করবে করবে দেবু ঘোষকে পতিত।

-- আমি!–দুর্গা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।– আমি!–দুর্গার সে হাসি আর থামে না দুই দিকের পাড় ভাঙিয়া বর্ষার নদী খল-খল করিয়া অবিরাম যে হাসি হাসে – সেই হাসির উচ্ছ্বাস। তাহার মধ্যে যত তাচ্ছিল্য তত কৌতুক ফেনাইয়া উঠিতেছে। খানিকক্ষণ হাসিয়া সে বলিল– আমি সেদিন সভার মাঝ একখানা ঢাক কাঁধে নিয়ে বাজাব আর লাচব; আমার যত নষ্ট কীর্তি সব বলব। সতীশ দাদাকে দিয়ে গান বাঁধিয়ে লোব। বামুন, কায়েত, জমিদার, মহাজন– সবার নাম ধরে বলব। ছিরু পালের গুণের কথা হবে আমার গানের ধুয়ো। (তারাশঙ্কর, ১৪২৩ব.: ৮৬)

দুর্গার স্বৈরিণীবৃত্তি তাকে কলঙ্কিত করেনি বরং করেছে সাহসী। কারণ সে জানে এই সমাজপতিদের প্রকৃত চেহারা কী। দিনের আলোয় যারা সমাজ আর ধর্মের বড়াই করে; রাতের অন্ধকারে তারাই ভিক্ষা মাগে দুর্গার দ্বারে। সভ্য সমাজ যাদের যতো বেশি পশ্চাৎপদ বলে মনে করে, তাদের জীবনযাপন ততো বেশি সত্য ও সরলতায় ভরা। জীবন ও জীবিকার প্রশ্নে তাদের কোনো রাখঢাক নেই। দুর্গার পতিতাবৃত্তিতে তার কোনো মিথ্যাচার নেই; নেই কোনো সতীত্বের ধুয়া তোলার অভ্যাস। সে যা তাই নিয়েই সে সমাজে চলে। তার সাথে এ কথাও গুরুত্বপূর্ণ যে স্বামীর সংসার করেও যদি তাকে জমিদার, মহাজনদের অঙ্কশায়িনী হতে হয়, তবে সেই স্বামী-সংসারের প্রয়োজন নেই। যে কথা লেখক সেই সময়ে দাঁড়িয়ে বলেননি, সে কথা আজ দ্বিধাহীনভাবেই বলা যায়। প্রথম দিনের স্বৈরিণীর অভিজ্ঞতা তাকে এই সাহস দিয়েছিল; তাই স্বামীর বাড়ি ফিরে না গিয়ে মায়ের কাছে এসে নিজের স্বাধীন পেশাকে গ্রহণ করেছিল। দুর্গা তার সময়ের যথার্থই নারীবাদী চরিত্র রূপে অবতীর্ণ হয়েছে। দুর্গা এক ব্যক্তিত্বময়ী নারী, সে স্বাধীনচেতা, বীরাঙ্গনা, দায়িত্ব ও কর্তব্যপরায়ণ, সমাজসেবী ও সমাজের চালিকাশক্তি।

৮.৫

দুর্গা ছাড়াও এই উপন্যাসের আরো একজন নিম্নবর্গের নারী আছে, যার সামাজিক পরিচয় কামারবৌ। অনিরুদ্ধ কামারের স্ত্রী সে, তার নিজের নাম পদ্ম। পদ্ম নিজেও একজন ব্যক্তিত্বময়ী নারী। চরিত্রটি *গণদেবতা* থেকে *পঞ্চগ্রাম* পর্যন্ত বিস্তৃত। নিঃসন্তান এই নারী উপন্যাসের শুরু থেকে সংগ্রাম করে চলেছে; *পঞ্চগ্রামের* শেষে এসে আমরা তার বিক্ষুব্ধতার শেষে শান্তির পরশের প্রতিচ্ছবি পাই। তৃতীয় বিশ্বের সমাজে নারী সব সময় অবহেলিত প্রাণী; সমাজে বা রাষ্ট্রে নারীর যেটুকু প্রয়োজন তা তার সন্তান উৎপাদন করার সক্ষমতার জন্য। তারপরও মানুষ বোধ হয় সেটা ভুলে যায় যে সন্তান উৎপাদনে পুরুষের একটা ভূমিকা থাকে। কিন্তু সেই পুরুষের যেকোনো অক্ষমতা থাকতে পারে, সে কথা সমাজ মানতে পারে না। কারণ যে পুরুষ সমাজের অধিপতি, তার তো কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকতে পারে না। সে কথা ভিন্ন প্রসঙ্গ। পদ্ম আর অনিরুদ্ধ দাম্পত্য জীবনে সেই অনুষঙ্গটাই বড় হয়ে

উঠেছে। সন্তানবিহীন দাম্পত্য জীবনে পদ্ম 'তাহার ভালবাসায় যত্নের আধিক্য, মমতার অতিশয্য অনিরুদ্ধকে পীড়া দিয়েছে।'(তারাশঙ্কর, ১৪২৪ব.: ১৪) আর এই কারণেই অনিরুদ্ধ আর পদ্মর দাম্পত্য জীবনের ভিতটাই কখনোই তৈরি হয়ে উঠেনি। সেখানে পরিপার্শ্বের ঝড় যখন এসেছে, তখনই ভেঙে পড়েছে তাদের সংসার। পদ্ম বুক পিঠ দিয়ে সংসারকে বেঁধে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছিল।

> নিঃসন্তান পদ্ম গলায় মাদুলির বোঝা নিয়ে এই ডেকোহেঁকো স্বামীর সংসারে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। অনিরুদ্ধর উদাসীনতা, দুর্গার সঙ্গে গোপন সম্পর্ক-এসব ব্যাপারেও সে আপোস করে নিয়েছে। তার জীবনে না-পাওয়ার ব্যথা হয়তো ভিতরে ভিতরে তাকে মানসিক ভাবে অসুস্থ করে তুলেছিল, মাঝে মাঝে বিকারগ্রস্ত হয়ে জ্ঞান হারাত। (রুমা, ২০১৪ : ২৫৪)

এই অবস্থার মধ্য দিয়ে পদ্ম তার সংসারকে বয়ে নিয়ে চলেছিলেন। *পঞ্চগ্রাম* -র শুরু থেকে দেখা যায় অনিরুদ্ধ নিরুদ্দেশ। পদ্মর জীবনের এই সময় তাকে মানসিকভাবে সঙ্গ দিয়ে সহযোগিতা করেছিলেন দুর্গা আর রাঙাদিদি। আর দেবু ঘোষ তার মিতেনীর আর্থিক দায়িত্ব নিয়ে তাকে সংসারেও থিতু করেছিল। তারপরও তার অপ্রাপ্য বাসনা মানুষকে তাড়িত করে সব সময়।

> মানুষ যাহা চায়, নারী যাহা চায়, যে পাওনার তাগিদে নারীর প্রতি দেহকোষে প্রতি লোমকূপে-- চেতনার প্রতি স্তরে স্পন্দিত হয়, সেই দাবি তাহার। দেহের তৃপ্তি-উদরের তৃপ্তি; স্বামী-সন্তান-অন্ন-বস্ত্র-সম্পদ, ঘর-সংসারের দাবি। একাধিপত্যের প্রতিষ্ঠার মধ্যে শুধু তাহার নিজস্ব করিয়া এইগুলো সে পাইতে চায়। ওই কামনাগুলোকে কৃচ্ছ্রসাধনের নিগ্রহে নিগৃহীত সে অনেক করিয়াছে। বারব্রত করিয়াছে; কিন্তু তাহার প্রাণশক্তির প্রবল উচ্ছ্বাস কিছুতেই দমিত হয় নাই। (তারাশঙ্কর, ১৪২৪ব.: ১৪৩)

এই সব চাহিদার অনন্ত তাগিদ তাকে তাড়িত করে শূন্য জীবনের হতাশার বহ্নিশিখায় পিপীলিকার মতো পদলেহন করে। শূন্য জীবন শূন্য সংসার তাকে স্থিত হতে দেয় না। মানুষ সবসময় তার প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না; নিজেরই অজান্তে বা অবচেতন মনে সে তার স্বরূপ নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। বহুদিনের বিক্ষুব্ধ জীবনে পদ্মও তার নিয়ন্ত্রিত বাসনাকে মুক্তি দিয়েছিল। সামাজিক কুৎসার অসত্যতা তাকে তাড়িত করেছিল; এই মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করার মধ্যে সে কোনো পাপ দেখেনি। দেবুর কাছে নিজেকে নিবেদন করেছিল। দেবুর প্রত্যাখ্যান তাকে করে তুলেছিল লজ্জায় অপমানে দিগ্বিদিকশূন্য। পদ্মর সেই আজীবন লালিত স্বপ্ন পূর্ণতার পরিধি পেয়েছিল জোসেফ নগেন্দ্র রায়ের মাধ্যমে। এই স্বজাতি ক্রিশ্চানকে বিয়ে করে নিজেও হয়েছিল ক্রিশ্চান। সংস্কারের মাদুলির বোঝা খুলে রেখেও সে মা হয়েছিল। নারী জীবনের দীর্ঘ ব্যর্থতার পর সোনালি আলোয় আলোকিত হয়েছিল সে। সেই নতুন দিনের আলোয় অনিরুদ্ধ দেবু শ্রীহরি কারো বিরুদ্ধে তার কোনো অভিযোগ ছিল না।

> পদ্ম বলিল...আমার খোকন-আমার ঘর-পণ্ডিত, অনেক দুঃখে আমি গড়ে তুলেছি। পরকাল-?- বলিয়াই সে হাসিয়া বলিল–পরকাল আমার মাথায় থাক! এক-কালেই আমি স্বর্গ পেয়েছি। আমার খোকন!– বলিয়া সে ছেলেটিকে বুকে চাপিয়া ধরিল। (তারাশঙ্কর, ১৪২৩ব.: ২৬২)

দীর্ঘ যন্ত্রণার পর পদ্মর জীবনের এই প্রাপ্তি তাকে উদার করেছে। নারীর এই উদারতা তার স্বভাবজাত। সমাজ তাকে সহ্য করার, মানিয়ে নেয়ার শিক্ষা দিয়েছে সব সময়। পদ্মর মতো অসহায় নারীর পক্ষে এর বেশি আর কিই বা করা সম্ভব ছিল। *গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম* উপন্যাসে গণজীবন চেতনার যথার্থ রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। প্রকৃত অর্থে তিনি সমাজের নিচুতলার তথাকথিত অন্ত্যজ পতিত ব্রাত্য সম্প্রদায়ের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ইতিহাস রচনা করেছেন। বৃত্তিজীবী মানুষের জীবন ও জীবিকা, সামাজিক স্তরে বর্ণভেদ জনিত শোষণ এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দীন ও হীন প্রভৃতি অনুষঙ্গ সহজ-সরলরূপে বিদ্যমান। (সুবোধ, ২০১২ : ২৫০) এই যুগ্ম উপন্যাসের স্বল্প আলোকিত নারী চরিত্র রাঙাদিদি। 'রাঙাদিদি নিঃসন্তান চাষি সদগোপদের কন্যা। এখন সে প্রায় সত্তর বৎসর বয়সের বৃদ্ধা। দেবুদের বয়সীরা তাহাকে রাঙাদিদি বলিয়া ডাকে।' (তারাশঙ্কর, ১৪২৩ব. : ৭৯) *গণদেবতা*' য় রাঙাদিদি চরিত্রের সূচনা, *পঞ্চগ্রামে*'র প্রথমাংশে তার মৃত্যু ঘটে। তাকে অধিকাংশ সময় দেখা গিয়েছে রূঢ়ভাষী নারীরূপে। আত্মীয়-স্বজনহীন নিঃসঙ্গ জীবনের যন্ত্রণার জন্য সে তার পিতা আর ঈশ্বরকে গালিগালাজ করত।

> বুড়ী গাল দিচ্ছে নিজের বাপকে আর দেবতাকে। আজকাল রোজ সকালে উঠে দেয়, সকালে উঠে একা কাজকর্ম করতে কষ্ট হয়, সকালে উঠে তাই রোজ ওই গাল দেবে। বাপকে গাল দেয়-বাঁশ বুকো রাক্কোস, জমি-জেরাতগুলো সব নিজে পেটে পুরে দিয়েছে; আর দেবতাকে গাল দেয়-চোখ-খেগো, কানা হও তুমি! (তারাশঙ্কর, ১৪২৩ব. : ১৩৪)

তবে সে সজাগ ছিল সমাজের অন্যায় অত্যাচারগুলো সম্পর্কে। রাঙাদিদির সঙ্গে দেবুর সম্পর্কের যোগসূত্র ছিল চণ্ডীমণ্ডপকে কেন্দ্র করে। দেবুর পাঠশালা যে চণ্ডীমণ্ডপে তাকে প্রাত্যহিক পরিচ্ছন্ন করা ছিল বৃদ্ধার আবশ্যিক কর্মক্রিয়া। এটা ছিল তার পারলৌকিক পুণ্য-সঞ্চয়ের কর্ম। এ ছাড়া দেবুর সমাজ-সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডে তার ছিল এক নীরব সমর্থন। দেবুর বিপদে আপদে নিকট আত্মীয়ের মতো পাশে থেকেছে সরব মমতা ও সহানুভূতি নিয়ে সাহচর্য দিয়েছে। দেবু, দুর্গা ও পদ্মর পথ চলায় সেও একজন পথিক। পদ্মর নিঃসঙ্গতাকে ঘুচিয়ে দেয়ার জন্য পদ্মকে ইশারা ইঙ্গিতে বোঝানোর চেষ্টা করেছে, 'সে কতদিন পদ্মকে বলিয়াছে– ওলো, দেবাকে একটুকুন্ ভাল করে যত্ন-আত্যি করিস্। ও বড় অভাগা, ওকে একটু আপনার করে নিস্'।' (তারাশঙ্কর, ১৪২৩ব.: ৮৫) রাঙাদিদি পদ্মর প্রসঙ্গে দেবুকেও বিভিন্নভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছে। দেবুর স্ত্রী বিলুর মৃত্যুর পর দীর্ঘ নিঃসঙ্গ জীবনে তার

যথার্থ একজন সঙ্গীর প্রয়োজন ছিল সে কথা বোঝার সক্ষমতা তার ছিল। নিঃসঙ্গ জীবনের নীরবতার বেড়াজাল পেরিয়ে নতুন আলোর সান্নিধ্যে আসতে রাঙাদিদির তীর্যক আহ্বান-

> –দেবা, বিয়ে-থাওয়া না করিস্ তো একটা যত্ন আত্যিও লোক তো চাই ভাইঅ পদ্মকে তুই তো বাঁচিয়ে রেখেছিস– তা ওই তোর সেবা-যত্ন করুক। ওকে বরং তুই ঘরেই নিয়ে যা। মিছে কেনে দুটো জায়গায় রান্না-বান্না, আর তুই-ই বা হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাস্ কেনে! (তারাশঙ্কর, ১৪২৩ব.: ৮৫)

দেবু রাজি না হলেও হাল ছাড়েনি রাঙাদিদি; দেবুর প্রতি তার স্নেহের অধিকার অনেকটাই প্রপৌত্রের মতো। আবার স্বামী কর্তৃক অনাহূত পদ্মর প্রতিও মমত্বের আধার কোনো অংশেই কম ছিল না। এভাবে রাঙাদিদি তার স্বজনহীন জীবনে আত্মীয় তৈরি করে নিয়েছিল। রাঙাদিদির জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো তার উপার্জন-সক্ষমতা। নিঃসহায় জীবনে সে কারো অনুগ্রহ বা দয়া দাক্ষিণ্যের পরাবশ হননি। সে নিজের বাড়িতে সবজি বাগান করে ফল-ফলাদি বিক্রি করেছে। গরু ছাগল পালন করে তাদের দুধ হাঁটে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করেছে। সেই অর্থ আবার সুদে খাটিয়ে দ্বিগুণ করেছে। সেই অর্থ দিয়ে তার বর্তমান চালিয়ে ভবিষ্যতের পাথেয় সংরক্ষণ করেছে। গ্রামের সবার ধারণা, এই বৃদ্ধা প্রচুর অর্থের মালিক। শ্রীহরির মতো সমাজপতিরা তা আত্মসাৎ করতে বিভিন্ন কুৎসা-ষড়যন্ত্রের জাল রচনা করেছে। এই বৃদ্ধা তার সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থের সন্ধান ও বণ্টনের দায়িত্বও দেবুকে দিয়েছিল: ‘বলিয়াছিল– দেবো, ষোল কুড়ি টাকা আমার আছে, এই আমার বিছানা-বালিশের তলায় মেজেতে পোঁতা আছে। কোনমতে আমার ছেরাদ্দাটা করিস্, বাকিটা তুই নিস্–আর পাঁচ কুড়ি দিস্ কামারানীকে।’ (তারাশঙ্কর, ১৪২৩ব. : ৮২) গ্রামীণ জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞ পাঠক হয়তো এই ধরনের নারীর সাথে পরিচিত; কিন্তু বাংলা সাহিত্য এমন স্বাধীন স্বাবলম্বী নিম্নবর্গাধীন নারীর উপস্থিতি দুষ্প্রাপ্য। রাঙাদিদির চরিত্রের এই স্বাবলম্বী ও পরোপকারী তার চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য ও আলোকিত সত্তার পরিচায়ক। পার্শ্বচরিত্র হলেও তার উপস্থিতির দীপ্ততা তাকে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে।

গণদেবতা ও *পঞ্চগ্রাম* যুগ্ম উপন্যাস হলেও যে সমস্যার সূচনা হয়েছে গণদেবতায়, তার বিস্তৃতরূপকে পাঠক অনুধাবন করেন *পঞ্চগ্রাম* -এর পরিসরে। পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনৈতিক দুর্বলতা বা বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে তারাশঙ্কর সামাজিক অনাচারকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। সামাজিক অনাচারের আবাহন সমাজপতিদের হাত দিয়ে হলেও বিপর্যস্ত হয় তথাকথিত নিম্নবর্গের মানবসম্প্রদায়কে। যার ফলে বঞ্চিত মানুষগুলোকে বিভিন্ন ধরনের অপরাধপ্রবণতা উসকিয়ে দেয়। *পঞ্চগ্রাম* নামক উপন্যাসে আমরা এমনই একটি পরিবার দেখি। তিনকড়ির নামক ব্যক্তি; সে জাতিতে সদগোপ। সমাজপতি শ্রীহরির সাথে আত্মীয়তা ও বিরোধিতা দুইয়ের মধ্য দিয়ে তার চরিত্রের দুর্ধর্ষতা ও গোঁয়ার বৃত্তির প্রাদুর্ভাব

ঘটেছে। তিনকড়ি বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা আমাদের প্রাসঙ্গিক বিষয় নয়। তিনকড়ির অনেক সমস্যা থাকলেও তার সন্তানেরা বিদ্যাচর্চায় আগ্রহী। যা এই উপন্যাসের একটি ভিন্ন ধরনের ও চমকপ্রদ ঘটনা। সামাজিক সংকট আর অনাগ্রসরতার মধ্যে স্বর্ণর মতো একটি বাল্যবিধবা মেয়ের বিদ্যানুরাগ; ব্যক্তিজীবনে তা পরিচর্যা তাকে সবার মধ্যে থেকেও স্বতন্ত্র করেছে। স্বর্ণর প্রচেষ্টায় দেবু সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে স্বর্ণ তার অধ্যবসায়ের ব্রতকে অটুট রেখেছে। বাল্যবিধবার নিরাসক্ত জীবনে তার একমাত্র আশার তরী তার শিক্ষার্জনের প্রচেষ্টা। গ্রামীণ জীবনের অনেক দুরাচারের মধ্যে নারীর প্রতি সমাজের অনাচার আরো বেশি হয়ে থাকে। সেখানেও শ্রীহরির মতো সমাজপতিদের প্রতিহিংসা তৈরি হয় : 'শ্রীহরি বলিয়াছে – জুতা পায়ে দিয়া বিধবা মেয়ে চাকরি করিলে, সে সহ্য করিবে না।' (তারাশঙ্কর, ১৪২৩ব. : ২০৩) তারপরও দেবু তাকে সাহস জুগিয়েছে। গ্রামীণ নিম্নবর্গের এক নারীর সব প্রতিকূলতা অতিক্রম করে শিক্ষার আলোয় আলোকিত প্রচেষ্টা ও লেখার অভিজ্ঞতার সীমানার বাইরে নয়। স্বর্ণ তার নিজের দক্ষতায় এম.ই পরীক্ষায় বৃত্তি নিয়ে পাস করে জংশন স্কুলের শিক্ষক হয়েছে। একজন যথার্থ সমাজসংস্কারক হিসেবে দেবু তাকে সব ধরনের সহযোগিতা করেছে। স্বর্ণও বৈধব্য জীবনের যন্ত্রণাকে দূর করতে তার নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্নের একজন সারথীকে নিজের জীবনে আহ্বান জানিয়েছে-

> দেবু বলিল– তোমার আমার সে সংসারে সমান অধিকার, স্বামী প্রভু নয়–স্ত্রী দাসী নয়–কর্মের পথে হাত ধরাধরি করে চলব আমরা। তুমি পড়াবে এখানকার মেয়েদের–শিশুদের, আমি পড়াব ছেলেদের–যুবকদের। তোমার আমার দুজনের উপার্জনে চলবে আমাদের ধর্মের সংসার। (তারাশঙ্কর, ১৪২৩ব. : ২৭৩)

স্বর্ণ চরিত্রের মাধ্যমে লেখক আগামী দিনের নারী, নারীর সংকট মোকাবেলার সাহস, শিক্ষার আলোয় চারপাশের সমস্ত সংস্কারকে জয় করার আভাস দিয়েছেন। স্বর্ণ নতুন পৃথিবীর নারী, যে চারদেয়ালের বাইরে এসে কাজের জগৎ তৈরি করবে, বৈধব্যের সংস্কার মাড়িয়ে নতুন সঙ্গীর হাত ধরে জীবনের মাধুর্যে অবগাহন করবে। এখানেই স্বর্ণর স্বকীয়তা, স্বাতন্ত্র্য ও উজ্জ্বলতা।

সাম্রাজ্যবাদের বিষচক্ষু কীভাবে নিম্নবর্গের মানুষ অর্থাৎ কামার, ছুতোর, মুচি, নাপিত প্রভৃতি অস্পৃশ্য মানুষের সাজানো বাগানো ঝড় তুলে তাদের সর্বহারার নিগূঢ়ে পৌঁছে দিয়েছে তারই ধারাবাহিক কাহিনি *গণদেবতা* আর *পঞ্চগ্রাম*। নিম্নবর্গের মানুষের অসহয়তা, দারিদ্র্য, অভাব, অনটন, পল্লিজীবনের দুঃখ-কান্নার মর্মস্পর্শী ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে জনগণকে দেবতা করে নিম্নবর্গের প্রতিরোধের ঐতিহাসিক পথকে প্রশস্ত করে দিয়েছেন লেখক। বিপ্লবের সময় নিম্নবর্গ ঐক্যবদ্ধ হয়, সেই প্রতিবাদের চূড়ান্ত, সর্বাঙ্গীণ, সনাতন ও সার্বত্রিক রূপ কৃষক বিদ্রোহ। অনিরুদ্ধের দ্বারা শ্রীহরির বাগান

বিনষ্ট করার অকপট স্বীকারোক্তি জমিদারতন্ত্রের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদের সর্বোত্তম প্রকাশ। এই আলোচনার অভিজ্ঞান থেকে বলা যায়, তারাশঙ্কর বাংলা উপন্যাসে বাংলার নিম্নবর্গের মানুষের যথার্থ জীবনসত্যের সন্ধান করেছেন। সেখানে বর্ণগত শ্রেণিবৈষম্যের চিত্র যেমন স্পষ্ট, তেমনি অর্থনৈতিক বৈষম্যের নগ্ন চিত্রও যথার্থ অর্থে দৃশ্যমান। নারী তো সব সমাজেই নিম্নবর্গের মধ্যে নিম্নবর্গ। রাঢ়বঙ্গের নিম্নবর্গের নারী বৈচিত্র্য বরাবরই লেখক তারাশঙ্করের আগ্রহের পরিসীমাকে দীর্ঘায়িত করেছে। যার ফলে দুর্গার মতো অসামান্য নারী বাংলা সাহিত্যে অক্ষয় হয়ে রয়েছে।

৯.

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-৫৬) কল্লোলের কল্লোলীয় ধারার লেখক নন। সময়ের দিক থেকে তিনি দূরে ছিলেন, স্বভাবের দিক থেকে ছিলেন আরো বেশি দূরের। তাই কল্লোলীয় ভাব বা ভাবাবেশ কোনোটাই তাঁর মধ্যে খুঁজে লাভ নেই। তার অর্থ এটাও নয় যে তাঁর মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল না; তবে তিনি জীবনকে বাস্তবভূমিতে দেখেছেন। জীবনের গভীরে ঝাঁপ দিয়ে জীবনের জটিলতাকে আবিষ্কারের নেশায় তিনি দুর্দমনীয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অভ্যস্ত জীবনযাত্রার শৃঙ্খলের মধ্যে নয়, দুর্দমনীয় জীবন-প্রবাহের মধ্যে জীবনের রহস্যসন্ধান করেছেন, যেখানে মানুষের জীবনপ্রবাহের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে গিয়ে পুরনো বিশ্বাস ও আশ্রয় পরিত্যক্ত হয়েছে। তিনি দুঃসাহসী লেখক, জীবনের জটিলতা ও গভীরতা অন্বেষণে সদা তৎপর। (অরুণকুমার, ২০১৬ : ৮১) সমাজের ও সাহিত্যের প্রধান বিচার্য ও আলোচিত প্রাণী মানুষ। মানুষের এই সমাজে আবার রয়েছে এক বিভাজন, যার নাম নারী আর পুরুষ। সেখানে নারী এক আলাদা নির্মিতি; শুধু নারী বলেই রাষ্ট্র-সমাজ-পরিবারে তার ভিন্ন অবস্থা ও ব্যবস্থা। কারণ সামাজিক ব্যবস্থাপনায় নারী এক যৌনপুত্তলিকা। নারী পুরুষের মনোরঞ্জন করে; মানবসন্তান জন্মদানের মধ্য দিয়ে প্রজন্মের ধারাকে অব্যাহত রাখে। ‘বাংলা উপন্যাসে নারীকে মানুষ করে চিত্রিত করার কাজটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সচেতনভাবে করেছেন তাঁর উপন্যাসসমূহে।’ (নাহিদ, ২০১১ : ২৬) নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার অভিব্যক্তিই তাঁর একমাত্র কাম্য বিষয় নয়; নারীকে তিনি মানুষ হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। শ্রেণি, বর্ণ, গোত্রনির্বিশেষে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেবোধে একজন সম্পূর্ণ মানুষ হিসেবে নির্মাণ করতে চেয়েছেন।

৯.১

মানিকের লেখায় শ্রেণিচেতনাসহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রতিভাস থাকলেও নিম্নবর্গের জীবনালেখ্য সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় *পদ্মা নদীর মাঝি* উপন্যাসে। পদ্মা নদীর তীরবর্তী মানুষেরা

নেহাত আঞ্চলিক চরিত্র হয়ে থাকেনি, হয়ে উঠেছে ব্যক্তিত্বচিহ্নিত মানুষ হিসেবে। (আবদুল, ২০১৩ : ১২৩) মানিকের পূর্বে পদ্মা-বিধৌত পূর্ব বাংলার গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন নিয়ে এমন অকৃত্রিম আত্মপ্রকাশ ঘটেনি। মালো শ্রেণির মানুষের জীবন-জীবিকা, আনন্দ-বেদনায়, পদ্মার-প্রকৃতির অমোঘ রহস্য মিশে আছে এই উপন্যাসে। এই গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষগুলোর একমাত্র জীবিকা পদ্মায় মাছ ধরা বা নৌকা বাওয়া। লেখক কেবল এই দরিদ্র মানুষগুলোর বঞ্চনার বেড়াজালকেই প্রকটিত করেননি; পাশাপাশি তাদের অন্তর্গত জীবনের আদিমতার অঙ্গীভূত ঝড়সমূহের আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে নারীও কাহিনির অংশ তবে, অন্তর্বাস্তবতায়, কারণ বহির্বাস্তবতায় নারীর গমনাগম কম। গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে নারীর নিজেকে প্রকাশ করার সুযোগ কম ; তারপর সে যদি হয় পঙ্গু নারী, তাহলে তার জীবন পুরোটাই সীমাবদ্ধ। কুবেরের স্ত্রী মালা অজন্ম পঙ্গু এক নারী। জেলেপাড়ার অন্য নারীদের থেকে তার জীবন আলাদা; এর প্রধান প্রাসিঙ্গককরণ পঙ্গু বলে তাকে অলস জীবনযাপন করতে হয়।'মালা শুধু খোঁড়া হইয়া জন্মে নাই, আরো একটি পঙ্গুতা তাহার আছে; সে হাসিতে জানে না, জীবন তাহাকে অলস করিয়া বিষণ্ন করিয়াছে।' (মানিক, ২০১৯ : ৪৫) সমগ্র উপন্যাসে মালাকে আমরা তিনটি সমীকরণে দেখতে পাই। প্রথমত, আর্থ-সামাজিকভাবে সে একজন নিম্নবর্গের মানুষ ; দ্বিতীয়ত, সে একজন নারী; তৃতীয়ত, সে একজন অসম্পূর্ণ মানুষ। মালার যা কিছু পাওয়া তা, সন্তান ধারণ লালন-পালনের মধ্যে দিয়ে। কারণ কুবেরের সংসারে তার বংশ পরম্পরার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা ছাড়া মালার বিশেষ প্রয়োজন নেই :

> পঙ্গু মালা কুবেরের প্রাত্যহিক জীবনের নারী। এ জীবন অবসন্ন মৃত শাদা ইলিশের মতো।...এ জীবনের মতোই কুবেরের একাধিক সন্তানের জননী মালা। জীবনের এই প্রবাহ পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়া জেলে নৌকার পদ্মার বুকে ভাসার মতো, মালার মধ্যে দিয়েই কুবের অব্যাহত রাখে। (নাহিদ, ২০১১ : ৯৭)

মালার এই অপূর্ণ জীবনকে প্রকটিত করতেই বোধ হয় কুবেরের জীবনে কপিলার এত প্রয়োজন। তবু মালার এই অবহেলিত জীবনে মানবিক বোধের কোনো অভাব নেই।

> জেলেপাড়ার জননীদের মধ্যে কুবেরর খোঁড়া স্ত্রী মালার ব্যতিক্রমী স্নেহ দৌর্বল্যের পরিচয় দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক সাধারণ জেলেমেয়েদের স্নেহদীনতা, নির্বিকার ঔদাসীন্য ও রুক্ষ কঠোরতা বর্ণনা করেন, প্রসঙ্গ সূত্রে চলে আসে জেলে পুরুষের নিষ্ঠুরতার চরিত্র উল্লেখও। (নাহিদ, ২০১১ : ৮৭)

বলা হয়ে থাকে যে মালা জন্মদুঃখী এক নারী; তা সত্য, তবে সবটা সত্য নয়। কারণ জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তার পায়ের পঙ্গুত্ব সত্য, বাকিটার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে পরিবেশ, পরিপ্রেক্ষিত। মালার দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছে বোন কপিলা এবং স্বামী কুবের। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এটা ধারণা করেই নেয়

যে মালার মতো পঙ্গু নারীর যে বৈবাহিক জীবন রয়েছে, তার অন্ন-বস্ত্রের যোগান দেবার জন্য কুবেরের মতো স্বামী আছে, সেই তো তার জন্য পর্যাপ্ত। তারপর আবার কেনো স্বামীর বিশ্বস্ত ভালোবাসা ও সহানুভূতির প্রয়োজন? যে সমাজ কপিলার মতো চপল- চঞ্চলা যৌবনবতী নারীকে যথার্থ সম্মান দিতে পারে না, সেই সমাজে মালাদের অসহায়তা স্বাভাবিক। মালা পঙ্গু হলেও অন্ধ নয় :

> কপিলার চাপল্য ও হাস্যপরিহাসের জন্য ঈর্ষাও হয়তো মালার হয়, কোনোদিন হয়তো কুবেরের সঙ্গে কপিলার অন্যায় মাখামাখি চোখে পড়িয়াছে –তাহার একস্থানে ঠায় বসিয়া থাকিলেও দৃষ্টি তো সে পাতিয়া রাখে সর্বত্র। (মানিক, ২০১৯ : ৪৮)

জীবনের এই সব পরাজিত ইতিহাসের বাইরে মালার রয়েছে এক ঐশ্বর্যময় জগৎ; যা তার মাতৃত্বের সুধায় সুরভিত। শারীরিক পঙ্গুত্বের কারণে তার জগৎ সংকীর্ণ, বাইরের জগতের সাথে তার যোগাযোগ ঘটে সন্তান গোপী, লখা ও চণ্ডীর মধ্য দিয়ে। মালার মাতৃত্ব প্রখর, পঙ্গু বলেই জেলেপাড়ার অন্য নারীদের মতো তার ব্যস্ততা নেই। সন্তানের কথা ভাববার ও স্নেহ করার অফুরন্ত সময়। তাই সন্ধ্যার অবসন্নতায় তারা যখন ঘরে ফেরে, তখন তাদের এই পঙ্গু মাকে প্রয়োজন হয়; ভাত খাইয়ে দেয়ার সাথে সাথে রূপকথার মোহময় জালে আবিষ্ট হওয়ার প্রয়োজনে :

> সারাদিন মালার যে একতরফা অবহেলিত স্নেহ খাপছাড়া লাগিতেছিল, অপর পক্ষ গ্রহণ করামাত্র তাহা মধুর ও অপূর্ব হইয়া উঠে। মালার কাছে বসিয়া তাহারা ভাত খায়, এক ছেলের মুখে স্তন গুঁজিয়া রাখিয়া আর দুজনকে ভাত মাখিয়া গ্রাস মুখে তুলিয়া খাওয়ানোর শখ মালার একার নয়, এমনভাবে না খাওয়াইয়া না দিলে ওরা খাইতে চায় না। (মানিক, ২০১৯ : ৪০)

মালা শারীরিকভাবে পঙ্গু হলেও মানসিকভাবে পঙ্গু নয়। তার রয়েছে রূপকথা বলার সুনিপুণতা যা শুধু তার সন্তানদের আকৃষ্ট করে না, আকৃষ্ট করে জেলেপাড়ার অন্য নারী-পুরুষদেরকেও। গৃহের অন্ধকূপে বসে নিজের মৃত্যু কামনার মধ্য দিয়ে জীবনকে শেষ হতে দেয়নি সে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে নিম্নবর্গের নারী হিসেবে জীবনের জয়গানে মহিমান্বিত হয়েছে সে। নিজেকে জয় করার এই প্রণোদনায় মালাও কোনো কোনো সময় তার অস্তিত্বের প্রখরতায় প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পেয়েছে। ব্যক্তিত্বের সংরাগে রঞ্জিত করেছে নিজেকে,

> অকর্মণ্য মালার প্রতি কুবেরের এক রকম নিষ্ঠাও আছে, যার জন্য সে শাশুড়ির প্রশংসা পায়। কেউ মালাকে অসম্মান করবে তাও কুবের সহ্য করতে পারে না। তবু মালার শারীরিক পঙ্গুতার মধ্যেই নিহিত ছিল কুবের কপিলার অবৈধ ভালবাসার বীজ। (অশ্রুকুমার, ২০০৮ : ২০৮)

সমালোচকের এই মতামতের পাশাপাশি এও বলা যায় যে মালার অপূর্ণতা মালাকে যেমন ঋজুতা দিয়েছিল, তেমনি মাতৃত্বের অপরিসীম সুধাময়তা তাকে শক্তি দিয়েছিল। মালা-কুবের-কপিলা সম্পর্কের অন্তর্নিহিত সত্য বিশ্লেষণে গবেষক আবু হেনা মোস্তফা কামালের অভিমত নিম্নরূপ :

> বস্তুত মালা ও কপিলা যেন দুটি প্রতীক চরিত্র। মালা স্থির, অচল, নিশ্চিত। কপিলা অস্থির, জঙ্গম, অনিশ্চিত। মালা ঘর, সত্য, সামাজিক। কপিলা বাহির সম্ভাবনা, অসামাজিক।...মালা ও কপিলাকে প্রতীক হিসেবে ব্যাখ্যা করা গেলেও একথা স্বীকার করতেই হয় যে তারা কেউই টাইপ চরিত্র নয়। তাদের ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতাকে এমনভাবে আক্রমণ করে যে মালা অথবা কপিলার সামান্যতম অভিব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যেও আমাদের দৃষ্টি ও শ্রুতিতে এড়ায় না। (আবু হেনা, ২০১২ : ২৫)

মোট কথা, মালার পঙ্গুত্বের সুযোগ নিয়েছে কুবের; এই দায় ভার সম্পূর্ণরূপে কুবেরের নয়। কারণ সমাজ নামক অদৃশ্য যে শক্তি রয়েছে, তাই পুরুষকে যুগ যুগ ধরে এই সাহস সঞ্চার করে এসেছে। আসলে সমাজ নারীর প্রতি যে অপ্রতিরোধ্য শোষণের বেড়াজাল বিছিয়ে রেখেছে, সেখানে নারী পদে পদে অবরুদ্ধ। মালার মতো অসহায় নিম্নবর্গের নারীর জন্য তা যে আরো বেশি বৈরিতাপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

৯.২

কপিলা চরিত্রটি শুধু *পদ্মা নদীর মাঝি* কুবেরের নায়িকা রূপে প্রথিতযশা নয়। সাহিত্যের স্রষ্টা ও পাঠকের মনে নারীর প্রেমময়ীরূপের যে প্রতিরূপক প্রতিবিম্বিত হয় কপিলা সেখানে স্বরূপেই উদ্ভাসিত সে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের উক্তি ‘উপন্যাসটিতে প্রধানত প্রান্তিকজনদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান চিহ্নিত হলেও এর মানব-মানবীগুলো বিশেষমাত্রায় উন্নীত। এক্ষেত্রে লেখক পরস্পারিক সম্পর্ককে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।’ (আবদুল, ২০১৩ : ১২১) তারই জন্য চরিত্রগুলো কল্পনার সীমাবদ্ধ পরিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে বাস্তবের বৃহৎ পরিসরের ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। সাহিত্যিক মানিক অধ্যাত্মবাদ বা ভাববাদের মোহের গলি থেকে বেরিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে গুরুত্বের সাথে অবলোকন করেছেন। লেখকের চরিত্রগুলো দাঁড়িয়ে আছে দার্শনিক বিভিন্ন ভিত্তির ওপর, যা তাদের ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কপিলাকে উপন্যাসের নায়িকা হিসেবে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনপরিধির মধ্যে পাওয়া যায়। কুবেরের স্মৃতিচারণায় জানা যায় কপিলার শৈশব থেকেই তার চঞ্চলতা কুবেরকে টেনেছে। মাঝে শ্যামদাসের সঙ্গে বিয়ে সন্তান, সন্তানের মৃত্যু দীর্ঘ বিরতির পরে আবার দেখা। স্বামীর সঙ্গে কলহ করে পিতৃবাস, সেখান থেকেই কপিলা কুবেরের দ্বৈতবাস। দাম্পত্যরীতির সব সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও স্বামী শ্যামদাস তাকে উপেক্ষা করে দ্বিতীয় দ্বার পরিগ্রহ করেছে, যা তার জন্য অপমান ও

অনিশ্চয়তার। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ নারীর জীবনধারণের আর্থিক ভার বহন করে বলেই তাকে কাঠের পুতুল ভাবে। নারী যখন স্বামী গৃহের সব যন্ত্রণা অবাধে সহ্য করে, তখন তাকে লক্ষ্মী বা গৃহলক্ষ্মী বলে সমাদর করা হয়। সামাজিক অনুশাসনের বাইরে গেলে সে হয়ে ওঠে কলঙ্কিত, শ্বশুরালয়সহ তার স্বজনেরাও তার মৃত্যু কামনায় ব্যাপৃত হয়। পুরুষের গৃহলক্ষ্মীর ভাবনা থেকে কুবেরের মনে হয়- 'কে জানে কত শান্তশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে কপিলা আজকাল, কেমন সংসারী হইয়াছে তাহার মন?' (মানিক, ২০১৯ : ৪৪) কুবেরের উপলব্ধিতে শৈশবের দুরন্ত কপিলা না জানি যৌবনের উঠন্ত বেলায় কতই শান্ত স্থিতধী হয়ে সংসার করছে। সে রাধার মতো অপেক্ষা করতে পারে না; সে নিজের ইচ্ছাধীন হয়ে তার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করে। তার বেশ কিছু উদাহরণ উপন্যাসের মধ্যে পাওয়া যায়। আমিন বাড়ির হোটেলে কুবেরের সঙ্গে রাত্রিযাপন করা অথবা ঠাকুর দেখে নির্জন পথে কুবেরের সঙ্গে একা ফেরা। কুবের তাকে কাছে টানার চেষ্টা করলে কপিলা জানায় : 'মনডা ভালো না মাঝি, ছাড়বা না? মনডা কাতর বড়।' (মানিক, ২০১৯ : ৪৪) এই কাতরতার কারণ তার স্বামী। সেই স্বামী যার লাঞ্ছনার কারণে পতিগৃহ ত্যাগ করে পিতৃগৃহে আশ্রয় নেয় সে। কুবেরের মতো পাঠকের মনেও প্রশ্ন জাগে যে স্বামী তাকে অবহেলা করে অপদস্থ করে, সেই স্বামীর জন্য কপিলার কেনো কাতরতা জন্মায়! আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর নিজের কোনো বাড়ি থাকে না। আর বিবাহিত নারীর মনে জাগ্রত করা হয়, স্বামীগৃহ ছাড়া বাকি সব আশ্রয় তার জন্য অসম্মানের। তাই অবহেলিত হোক আর নিগৃহীতই হোক, শ্যামদাসের সংসারেই সে ফিরে যেতে চায়। একদা সন্ধ্যার অন্ধকারে নদীর তটে তামাকের জন্য অপেক্ষারত কুবেরকে কপিলা প্রশ্ন করে, 'আমারে নিবা মাঝি লগে'। (মানিক, ২০১৯ : ১১৪) কুবের তাকে উত্তর দিতে পারেনি। তীব্র ভর্ৎসনা করেছিল কপিলা কুবেরকে, কুবেরের পৌরুষকে। কপিলার কাঙ্ক্ষিত নীড়ের আশ্বাস কুবের দিতে পারেনি; সেই কারণেই বোধ হয় শত অপমান সত্ত্বেও কপিলাকে শ্যামদাসের কথা ভাবতে হয়েছে। জীবনের সংকটময় মুহূর্ত কুবেরের অস্তিত্ববাদী সত্তা সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্বকে উপেক্ষা করে কপিলাকে সঙ্গে নিয়ে ময়নাদ্বীপে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সমালোচকের মতে, 'উপন্যাসের মধ্যে এই প্রেমের উপাখ্যান যেন মৈমনসিংহ-পূর্ববঙ্গ গীতিকার মতো এক লৌকিক প্রণয়গাথা।'(অশ্রুকুমার, ২০০৮ : ২১০) এর মধ্যে দিয়ে শুধু কুবের নয়, কপিলার ব্যক্তিসত্তায়ও উদ্ভাসিত হয়েছে। সমাজ-সংসার সব কিছুর উর্ধ্বে উঠে একজন নারী নিজের স্বতন্ত্র বাসনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

কপিলা কলঙ্ক ভয়ে ভীত নয়, স্বামীর ভয়েও নয়; তবে সে জানে পুরুষের প্রেমের ক্ষণস্থায়িত্ব সম্পর্কে। কৃষ্ণ যেমন রাধাকে বিরহী করে চলে গিয়েছিল, হয়তো কুবেরও একদিন ভুলে যাবে। কিংবা যেভাবে স্বামী শ্যামাদাস একদিন তার ভালোবাসাকে মাড়িয়ে আর একজন নারীকে ঘরে এনেছিল। কিংবা পঙ্গু

মালাকে বঞ্চিত করে কুবের যেমন কপিলার জন্য ব্যাকুল হয়েছে। পুরুষ যুগে যুগে এভাবেই নারীকে বঞ্চিত করে। কিন্তু কপিলা তার সমস্ত সংকীর্ণতাকে কাটিয়ে একদিন তার প্রেমের প্রতিষ্ঠায় দুর্নিবার হয়ে ওঠে। দূর ময়নাদ্বীপে অভিসারী হয় কুবেরের সঙ্গে। পদ্মা নদীর মাঝি উপন্যাসের প্রান্তিক জনপদে মানুষকে যখন সব সময় লড়াই করতে হয়, তখন নারী অবস্থান যে আরো বেশি প্রতিকূলতায় আবদ্ধ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : 'ব্যাকুলতা লেখক সকলের মধ্যেই দেখেছেন। কুবেরের পঙ্গু স্ত্রীর মধ্যে, গ্রাম্য বালিকা মতির মধ্যে, গ্রাম্য বধূ কুসুমের মধ্যে।... এই ব্যবধান তাদের শ্রেণীগত অবস্থানের দূরত্বজ্ঞাপক।' (সিরাজুল, ২০১২ : ৮০) এর সঙ্গে আর সংযুক্ত করে বলা যায়, এই ব্যবধান লিঙ্গগতও বটে।

ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক দর্শন শোষিত ও বঞ্চিত মানুষ হিসেবে নারীর প্রতি যে সহানুভূতি ও সতর্ক দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তা বাংলা সাহিত্যের একটি অনবদ্য ও সৃষ্টিশীল দিক। সমাজ-সংসারে নারীরা যে লিঙ্গবৈষম্য ও শ্রেণিবিভাজনের মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে তাকে অস্বীকার করা যায় না। সে কারণেই লেখকের প্রতিটি উপন্যাসে অপ্রত্যাশিত বা অকুণ্ঠিতভাবে নারীর একটি সত্যভাষণ উঠে এসেছে।

গ্রন্থপঞ্জিঃ

১. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় (২০১৬)। *কালের প্রতিমা বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর বছর:১৯২৩-১৯৯৭*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

২. অরুণ সেন (সম্পা.)(২০১৪)। *বিভূতিভূষণ: আধুনিক জিজ্ঞাসা*, সাহিত্য অকাদেমি, ঢাকা

৩. অশ্রুকুমার শিকদার (২০০৮)। *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস*, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা।

৪. আবদুল মান্নান সৈয়দ (২০১৩)। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্তর্বাস্তবতা বহির্বাস্তবতা*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা

৫. আহমদ শরীফ (২০০৫)। *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, নিউ এজ পাবলিকেশন, ঢাকা

৬. আহমদ শরীফ (২০০৩)। *বঙ্কিমবীক্ষা অন্য নিরিখে*, উত্তরণ, ঢাকা

৭. কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৪১৩ব.)। *বাংলা উপন্যাসে উপকাহিনী(বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র)*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা

৮. গোপাল হালদার (১৪০৭ব.)। *বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা,১ম খণ্ড*, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা

৯. গোপীকানাথ রায়চৌধুরী (২০০৮)। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

১০. গোপীকানাথ রায়চৌধুরী (২০১৬০)। *বিভূতিভূষণ: মন ও শিল্প*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

১১. জহর সেনমজুমদার (২০১৭)। *নিম্নবর্গের বিশ্বায়ন*,পুস্তক বিপণি, কলকাতা

১২. জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (১৪০৬ব.)। *শরৎসাহিত্যে ব্যক্তি ও সমাজ*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা

১৩. তাশরিক-ই-হাবিব (২০১৮)। *বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে প্রান্তজনের জীবনচিত্র*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

১৪. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১৫)। *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়*, অবসর, ঢাকা

১৫. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৪২৩ব.)। *কালিন্দী*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা

১৬. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৪২৪ব.)। *গণদেবতা*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা

১৭. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৪২৩ ব.)। *পঞ্চগ্রাম*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা

১৮. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১৮)। *কবি*, অবসর প্রকাশনী, ঢাকা

১৯. দেবযানী ভৌমিক চক্রবর্তী (২০১৪)। *তুলনার প্রেক্ষিতে বঙ্কিম-রবীন্দ্র উপন্যাসে নারী-মনস্তত্ত্ব*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

২০. দেবীপদ ভট্টাচার্য (২০১৮)। *উপন্যাসের কথা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

২১. দেবেশ রায় (২০১৬)। *উপন্যাস নিয়ে*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

২২. নাহিদ হক (২০১১)। *মানিক উপন্যাসের নারীরা*, শুদ্ধস্বর, ঢাকা

২৩. নিতাই বসু (২০১১)। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজজিজ্ঞাসা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

২৪. নীলিমা ইব্রাহিম (২০০১)। *শরৎ প্রতিভা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

২৫. নির্মল দাশ (সম্পা.)(২০১৪)। *চর্যাগীতি পরিক্রমা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

২৬. প্রণব চৌধুরী (সম্পা.)(২০০১)। *গদ্যশিল্পী শরৎচন্দ্র প্রমথ চৌধুরী ও কাজী আবদুল ওদুদ*, বাংলাদেশ বইঘর ঢাকা

২৭. ফেরদৌসী হক (২০১১)। *বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে নারীজীবন রূপায়ণের তুলনা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

২৮. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (২০১৮)। *বঙ্কিম রচনাবলী উপন্যাস*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

২৯. বিপ্লব মাজী (২০১৭)। *তৃতীয় বিশ্বের প্রান্তিক নারী*, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা

৩০. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০০)। *পথের পাঁচালী*, আজকাল, ঢাকা

৩১. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৪০৮ব.)। *আরণ্যক*, আজকাল, ঢাকা

৩২. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১২)। *ইছামতী*, অবসর, ঢাকা

৩৩. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৪২৪ব.)। *আদর্শ হিন্দু- হোটেল*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ.কলকাতা

৩৪. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৪২৪ব.)। *অশনি সংকেত*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ.কলকাতা

৩৫. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১৪)। *উপন্যাস সমগ্র২*, সাহিত্যম্ কলকাতা

৩৬. বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০০৯)। *বাংলাদেশের সাহিত্য*, আজকাল, ঢাকা

৩৭. বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০০২)। *বাংলা সাহিত্য পাঠ*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী

৩৮. ভুঁইয়া ইকবাল (সম্পা.২০১২)। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

৩৯. ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.২০০৮) *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শতবার্ষিক স্মরণ*, অবসর, ঢাকা

৪০. মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় (২০০৯)। *গোষ্ঠীজীবনের উপন্যাস*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

৪১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১৮)। *উপন্যাস সমগ্র দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড*, অবসর, ঢাকা

৪২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১৯)। *পদ্মানদীর মাঝি*, অবসর, ঢাকা

৪৩. মুহম্মদ ইদরিস আলী (১৯৮৮)। *আমাদের উপন্যাসে বিষয়-চেতনা বিভাগোত্তর কাল*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৪৪. মনজুর রহমান (২০১৬)। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কাব্য চরিত্রায়ণ ও ভাষাপ্রযুক্তি, সৃজনী, ঢাকা

৪৫. রণেশ দাশগুপ্ত (২০১২)। *উপন্যাসের শিল্পরূপ*, প্যাপিরাস, ঢাকা

৪৬. রুমা বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১৪)। *বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসাদ, কলকাতা

৪৭. সুকুমার সেন (২০১৩)। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, আনন্দ, কলকাতা

৪৮. সুদীপ্তা চক্রবর্তী (১৪২০ব.)। *অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কবি ও কথাশিল্পী*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

৪৯. সুশোভন মুখোপাধ্যায় (১৪১৩ব.)। *প্রাক্-আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অন্ত্যজ জীবন*, করুণা প্রকাশনী,ঢাকা

৫০. সুবোধ দেবসেন (২০১২)। *বাংলা কথাসাহিত্যে ব্রাত্যসমাজ*,পুস্তক বিপণি, কলকাতা

৫১. সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায় (২০০৬)। *বিভূতিভূষণ: জীবন ও সাহিত্য*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

৫২. সেলিনা হোসেন ও বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পা.২০০৮)। *জেন্ডার আলোকে সংস্কৃতি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

৫৩. সৈয়দ আজিজুল হক (১৯৯৮)। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৫৪. সৌমিত্র শেখর (সম্পা.)(২০০৯)। *বিভূতিভূষণ কথা ও সাহিত্য*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

৫৫. Ralph Fox (1937) *The Novel and the people*, London.

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

নিম্নবর্গের নারীর সামাজিক অবস্থান

বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের জন্মের ইতিহাসের আছে এক সংগ্রামশীল পরিক্রমা; এই পরিক্রমার শুরুতে বাংলাদেশ নামে যাত্রা শুরু না হলেও, অল্প সময়ের ব্যবধানে রচিত হয়েছিল এই উপলব্ধির জয়যাত্রা। ধর্মকেন্দ্রিক রাষ্ট্রের সূচনাপর্বেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে সাংস্কৃতিক ব্যবধানের বিষয়টি। ধর্মকেন্দ্রিক এই রাষ্ট্রের নাম হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তান নামে ইতিহাসের যাত্রা শুরুর পূর্বে এই ভূখণ্ড পূর্ব বাংলা নামে অখণ্ড ভারতবর্ষে পরিচিত ছিল। বিভাগোত্তর পূর্ব বাংলায় নির্মিত হয়েছিল বাংলা সাহিত্যের বীজতলা। প্রাচীনকাল থেকেই জানা যায় এই ভূখণ্ডের মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য তাদেরকে জাতিগতভাবে আলাদা করেছে। পরবর্তী সময়ের খণ্ডতা যে রাজনৈতিক বৈরিতার জন্ম দিয়েছিল তারই মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে চেতনার পূর্ণতা :

> নির্দিষ্ট কৃষ্টি, আত্মসত্তার প্রকাশ, জাতীয় চেতনার উদ্বোধন–কার্যত দ্বান্দ্বিক জীবন পরিক্রমারই একটি স্ফটিকস্বচ্ছরূপ। সেটি চিরায়ত নৃ-সংস্কৃতির ধারায় স্নাত এবং ক্রমবর্ধিতও। তা স্থিতি পায় সিক্ত মাটি-হাওয়ার নির্দিষ্ট ভূগোলে। স্থান অস্তিত্বশাসিত পূর্ব-বাংলা তথা বাংলাদেশে। (শহীদ, ২০১৬ : ৯)

মূলত ত্রিশোত্তর বাংলা সাহিত্যে বাংলাদেশের সাহিত্যচর্চার সূচনাপর্ব পরিলক্ষিত হয়েছে। নব উন্মেষিত এই ধারাটি খুব দ্রুত আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক সচেতনতার মধ্য দিয়ে সমাজ-সত্তার গভীরে আর্তনাদরূপে প্রোথিত হয়েছে। পাশাপাশি নব্য-উপনিবেশমনস্ক চিন্তার আগ্রাসী আয়তন রাজনৈতিক পরিচ্ছেদের আবরণে বিস্তৃত হতে থাকে। এই ভূখণ্ডের সদ্য জাগ্রত চেতনা মুসলিম মধ্যবিত্ত বাঙালিকে সংঘবদ্ধ করে তোলে, প্রতিরোধের, প্রতিবাদের অনুঘটক হিসেবে কাজ করে পূর্ব বাংলার সাহিত্য। স্বাধীন বাংলাদেশের সমৃদ্ধ অধ্যায় সৃষ্টির বহুপূর্বে এই সাহিত্যচর্চার বিকাশ ঘটে, যা আজকের বাংলাদেশে, বাংলাদেশের সাহিত্য নামে পরিচিতি পায়। দেশভাগের পূর্বে অবিভক্ত বাংলার পূর্ব বাংলায় উপন্যাস রচনার যে চর্চা বিকাশ লাভ করেছিল তার স্বাতন্ত্র্য-চেতনার প্রশ্নটি অনালোকিতই থেকে যায়। যেহেতু উপন্যাসশিল্প জন্মলগ্ন থেকে সমাজবাস্তবতার অনুসারী ; তাই বিভাগ পূর্ব বাংলা উপন্যাসের যে আলোকচ্ছটা, সেখানে চলমান সমাজজীবনের চিত্র অবশ্যম্ভাবী।

বিভাগপূর্ব বাংলা উপন্যাসের ভিত্তি নির্মিত হয়েছিল নবজাগ্রত মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির হাতে। এই নবজাগ্রত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (১৯২১)এর প্রতিষ্ঠা একটি বড় ভূমিকা রাখে। এ ছাড়া ঢাকাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' ও 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন'- এর মতো সংস্কারমুক্ত, প্রগতিশীল, উদার মানবতাবাদী সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চাও নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে। এই সমস্ত সংগঠন ও চিন্তাধারা স্বকালে প্রভূত বিস্তার লাভ না করলেও; পরবর্তী সময়ের বাঙালি সংস্কৃতির প্রগতিশীল চিন্তাধারায় ও যৌক্তিক-বৌদ্ধিক পটভূমি নির্মাণে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। সেখানে বাংলাদেশের গ্রামীণজীবন গুরুত্ব পেলেও নিম্নবিত্ত, নিম্নবর্গের মানুষ তথা নিম্নবর্গের নারী বিশেষ আলোচনায় আসেনি। সামন্তবাদী মূল্যবোধ আর উদার মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির যৌথ সমন্বয়ে বাংলাদেশের উপন্যাসের সপ্রতিভ যাত্রাকে ফলবান করেছেন : মোহাম্মদ নজিবর রহমান (১৮৭৮-১৯২৩), কোরবান আলী, শেখ ইদরিস আলী (১৮৮২-১৯২৬)। দ্বিতীয় ধারার ঔপন্যাসিক হলেন কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬), কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), আকবরউদ্দীন (১৮৯৫-১৯৭৮), আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩) এবং হুমায়ুন কবির (১৯০৬-১৯৬৯) (সাইদুর, ২০১১ : ৩৩)। এই ধারার ঔপন্যাসিকদের লেখায় উনিশ শতক ও বিশ শতকের বিকাশ উন্মুখ পূর্ব বাংলার সমাজমানস, জীবনভাবনার শিল্পরূপ প্রতিপন্ন হয়েছে। উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে প্রাধান্য পেয়েছে ধর্মীয় সংস্কারসমূহ, পর্দাপ্রথা, আশরাফ-আতরাফ বৈশিষ্ট্য। কাজী আবদুল ওদুদ ও হুমায়ুন কবিরের উপন্যাসে পূর্ব বাংলার গ্রামীণ জীবন, চরাঞ্চল, নদীতীরবর্তী জনজীবন গুরুত্ব পেয়েছে। নিম্নবিত্ত, কৃষিকেন্দ্রিক জীবনের সংগ্রামমুখর জীবনবাস্তবতা প্রাধান্য পেলেও নির্দিষ্ট কৃষ্টি, আত্মসত্তার প্রকাশ, জাতীয় চেতনার উদ্বোধনের বৃহৎ কোনো প্রয়াস দেখা যায়নি। এই সমস্ত উপন্যাসে নারীর জীবন আলোচনায় এলেও বৃহৎ কোনো পরিবর্তন লক্ষ করা যায়নি। নিম্নবর্গের নারীর জীবনসমাচার, তাদের সমস্যা, বঞ্চনা প্রভৃতি বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনায় আসেনি।

১.

দেশভাগের রাজনীতি, ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের বিভাজন; এত সব পূর্বাপর ঘটনার মধ্যেও পূর্ব বাংলার লেখকেরা নিজেদের ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্যকে সামনে রেখে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক চর্চায় অবিনাশী থেকেছেন। স্বাতন্ত্র্যবোধের প্রচণ্ড জাত্যভিমান তাদের জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের পথকেও উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার পরিবর্তে, ভাষা ও সংস্কৃতিকেন্দ্রিক জাতীয়তাবোধের বিকাশকে সুস্পষ্ট করেছে। কারণ, তখন বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের সামনে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী অবাঙালি শাসকগোষ্ঠী; তাদের প্রতিহত করা, বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে নিজেদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করা

প্রভৃতি প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দ্বিতীয় মহাসমর পরবর্তী বিক্ষুব্ধময় পরিবেশে বৈশ্বিক পরিসরে বিপুল প্রসার ঘটেছিল সমাজতান্ত্রিক চিন্তাচেতনার। বাংলাদেশের লেখক-ঔপন্যাসিকদের চেতনায় বৈশ্বিক প্রাগ্রসরতার ধ্যানধারণা প্রভাবসঞ্চারী হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষের সার্বিক মুক্তির প্রশ্ন লেখকদের মননশীল প্রত্যয়ে সদা জাগ্রত থেকেছে; সৃষ্টি প্রবণতায় অভিব্যক্ত হয়েছে নির্বিত্ত মানুষের প্রতি অভিবাদন। ভাষা আন্দোলনের সামূহিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বাঙালি ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণি প্রথম অনুভব করে পূর্ববঙ্গের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিকসুলভ আচরণের মনোবৃত্তি। এই বৈরিতাসুলভ আচরণের বিরুদ্ধে অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্রমশ বেড়ে চলেছিল দুই ভূখণ্ডের মধ্যে। সেই বিপুল ব্যবধান দূরীকরণে শাসক বাহিনী যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তা ছিল পুরোপুরি ঔপনিবেশিক শাসন দ্বারা অনুপ্রাণিত ও আহরিত :

> বাংলা ভাষার ও ভাষাভিত্তিক একটি জাতি হিসেবে বাঙালির আত্মপ্রকাশের প্রায় এক হাজার বছরের ইতিহাসে উনিশ শ বাহান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি একটি অন্যতম মহত্তম দিন, একটি অনন্য দিন। এই দিনটি বাঙালির আত্মজাগরণের দিন, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দিন, নিজের সত্তাকে বিপুল গৌরবে ও মহিমায় ঘোষণা করার দিন। এই দিন থেকে বাংলাদেশবাসী বাঙালি আর কখনো পিছন ফিরে তাকায়নি, সে এগিয়ে গেছে নিজের জাতিসত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে, অসংখ্য প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের বজ্রঘোষণা উচ্চকিত করে লক্ষ প্রাণের আত্মাহুতির অনির্বাণ অনলশিখা প্রজ্বলিত রেখে। (অনুপম, ২০০৮ : ২০)

ফরাসি বিপ্লব যেমন মানব বিশ্বকে বৈষম্যহীনবিশ্বের স্বপ্ন দেখিয়েছিল; ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতি স্বপ্ন দেখেছিল তেমনি আত্মবিশ্বাসের। পরবর্তী সময়ে অধিকার আদায়ের সংগ্রামে, আত্মত্যাগ করার উদ্দীপনায়, তারই প্রত্যক্ষ প্রভাব স্পষ্ট। অন্তর্গতভাবে বাঙালি জাতি আত্মপ্রত্যয়ী হতে থাকে, কোন পথে বাঙালি জাতি প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবে; যে স্বাধীনতা শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতায় সীমাবদ্ধ থাকবে না। যে স্বাধীনতা এদেশের প্রতিটি মানুষকে অর্থনৈতিক মুক্তির স্বাদ দেবে; যে স্বাধীনতার প্রত্যয় প্রতিটি নাগরিককে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান করে গড়ে তুলবে। এই আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার প্রত্যাশাকে বাস্তবায়িত করতে বাঙালি জাতিকে দীর্ঘ সংগ্রাম বিক্ষুব্ধ পথে চলতে হয়েছে। এই সংগ্রামী আবাহনের ধারায় সফল ও সুদূরপ্রসারী স্তম্ভ উনিশশো বাহান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি; পরবর্তী স্তম্ভ উনিশশো একাত্তর সালের ছাব্বিশে মার্চ। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ফসল হিসেবে বাঙালি ঘরে তোলে তার পরম প্রত্যাশিত ফসল উনিশশো একাত্তর সালের ষোলই ডিসেম্বরের স্বাধীনতা। বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত হয় বাঙালি জাতির স্বতন্ত্র আত্মপরিচয়ের অধিকার।

১.১

সমাজসমূহের ইতিহাস হলো শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস– মানবসমাজ সম্পর্কে কার্ল মার্কসের এই প্রবাদ প্রতিম বাচন সতত স্মরণ রেখে মানবসমাজের তর্কাতীত আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যায়। (মহীবুল, ২০০২: ২৫) সভ্যতার প্রথম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মানবসমাজের সমস্ত অর্জন আত্মস্থ হয়েছে সংগ্রামের মাধ্যমে। কখনো সর্বার্থেই সবকিছুর ভিতর দিয়েই, কখনো অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো, আবার কখনো বর্ষা-সমাগমে দুকূলপ্লাবী স্ফীতকায়া স্রোতস্বিনীর মতো শ্রেণি-সংগ্রামের মূল সূত্রটি বয়ে চলেছে নিয়ত। এই প্রবাহমানতার প্রত্যয়ে প্রগতির ধারাসমূহ বিকশিত হয়েছে ইতিহাসের ধাপে ধাপে। সময়ের জটিল আবর্তে ঘটনার মূল স্রোতসমূহ প্রতিভাত হয়ে আছে দিনের আলোয় লুক্কায়িত রাতের তারার মতো। বিজ্ঞানের গবেষণালব্ধ বিভিন্ন শাখার মতো ইতিহাসের এই প্রাকৃতিক নিয়মও বিজ্ঞান হয়ে ওঠে। সমাজের বিকাশে দুটি ভিত্তি প্রধান উপাত্ত হিসেবে কাজ করেছে; তার একটি ভূমি ও অন্যটি পুঁজি। এই দুটি ভিত্তিকে অনির্বচন ধরে সমাজে বিকাশ ঘটেছে শ্রেণির। শ্রেণি-সংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে শ্রেণি-সংগ্রামই ইতিহাসের প্রধান চালিকাশক্তি। পৃথিবীর সর্বত্র সব সময় একই রূপে সমাজব্যবস্থা পরিচালিত হয়নি। ইউরোপ অনেকাংশেই শ্রেণিব্যবস্থার দ্বারা পরিচালিত হলেও –

> এশীয় সমাজে, প্রধানতঃ ভারতবর্ষের গ্রামীণ সমাজে কৃষক ও কৃষিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদক বা কারিগর শ্রেণীর অস্তিত্ব দেখতে পাই, যারা গ্রামীণ সমাজে নিজেদের অধিকার নিয়ে বাস করতো। এইসব কারিগরের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য–কামার, কুমার, ছুতোর, নাপিত, গোয়ালা, তাঁতী, তেলী, জেলে, স্বর্ণকার প্রভৃতি। (মহীবুল, ২০০২ : ১৫)

এই ব্যবস্থার রীতি-নীতি, আচার-আচরণের বহু স্মারক আজও আমাদের মধ্যে টিকে আছে। আদিম সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার পর বাংলায় সে যুগের সমাজ কী ধরনের ছিল, তাও এখান থেকে অনুমান করা যায়। তবে খ্রিষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে ও পরবর্তীকালে ধর্মীয় প্রথা, আচরণে গুরুত্বপূর্ণ সব পরিবর্তন দেখা যায়। ব্রাহ্মণদের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় সমাজব্যবস্থায় নতুন ধরনের দ্বন্দ্বের সমুত্থান হতে থাকে। কৃষক, সাধারণ মানুষ, কখনো রাজাও পুরোহিতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতো। ভূসম্পত্তির ক্ষেত্রে কৃষকসহ বিভিন্ন পেশার মানুষের মধ্যে বিতর্কের সূচনা হতে থাকে। এই দ্বন্দ্বের মোকাবিলা করার জন্য নতুন সব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে। ফলে সামাজিক বিন্যাসের ধাঁচে দ্রুত সব পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

১.২

বাঙালিসমাজ বরাবরই কৃষিজীবী। খেয়েপরে বাঁচার জন্য এদেশের মানুষের প্রধান সব উপকরণ কৃষিজাত। ষষ্ঠ-সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর দিকে সামন্ততন্ত্রের চরম বিকাশে এদেশের সমাজ আরও বেশি কৃষিনির্ভর হয়ে ওঠে। একটি মৌলিক পরিবর্তন দেখা দেয় কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে, কৃষক হয়ে গেল কৃষি-দাস আর কৃষি-শ্রমিক। এর অধিকাংশই ছিল শূদ্র; শূদ্র যখন এই প্রক্রিয়ায় উচ্চস্তরে উন্নীত হয় তখন বৈশ্য কৃষকেরা ভূমির মধ্যস্বত্বভোগীদের জন্য নিচুস্তরে নেমে গেল (রামশরণ, ২০১৬ : ৪৬)। সমাজে সামন্তীকরণে রূপান্তরের কারণ হিসেবে কৃষকের অবস্থার অধঃগতি সম্পন্ন হলো। শেষ পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া কার্যত থাকল, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাচীন সমাজ ও বর্তমান সমাজ, যেই সমাজের কথা বলি না কেন, সব সমাজেই দাস, ভূমিদাস, কৃষকসহ খেটে খাওয়া মানুষমাত্রই অন্ত্যজ শ্রেণি বা নিম্নশ্রেণিভুক্ত হয়ে অবস্থান করল। মোটকথায় এই সমস্ত শ্রেণিকেই সমাজ নিম্নবর্গ রূপে চিহ্নিত করতে শুরু করল।

১.৩

সামাজিক অসমতা যেমন ধনী আর দরিদ্রের জন্ম দেয়, তেমনি উচ্চবর্গ আর নিম্নবর্গেরও সৃষ্টি করে। বর্তমান থেকে অতীতের দিকে দৃষ্টি দিলে মানুষের জীবন অনেকটা বহতা নদীর মতো মনে হয়। জীবনের এই প্রবাহ পরিবর্তনশীল, কিন্তু সমাজের সমগ্র মানবগোষ্ঠীর দিক থেকে বিচার করলে এই প্রবহমানতার গতি মন্থর। হঠাৎ অপ্রত্যাশিত আমূল পরিবর্তন কোনো মানবসমাজে কখনোই হয় না। যেকোনো যুগে, যেকোনো সময় যদি সমাজে ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন ও গোষ্ঠীজীবনের ধারা লক্ষ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে সম্পূর্ণ নতুন বা সম্পূর্ণ পুরোনো বলে কিছু নেই, নতুন-পুরনো একসঙ্গে মিলেমিশে থাকে। সামাজিক জীবনে, কোনো সময় এমন কোনো ক্ষেত্র খুঁজে পাওয়া যায় না, যেখানে দেখা যায় পুরনো ধারা সম্পূর্ণ শেষ হয়েছে এবং সম্পূর্ণ নতুন কোনো ধারা পরিপূর্ণরূপে শুরু হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সামাজিক ইতিহাসবিদ G.M. Trevelyan তাঁর *English Social History* গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন :

> In everything the old overlaps the new—in religion, in family custom. There is never any clear cut; there is no single moment when all Englishmen adopt new way of life and thought. (Trevelyan, 1950 : 5)

এখানে এ কথাই সুস্পষ্ট হয় যে নিম্নবর্গীয় ইতিহাসে যেমন ক্ষমতাসীনদের ভেদবুদ্ধিই বিভাজনের কাজ করে থাকে; আবার তেমনিভাবে সামাজিক শ্রেণিশোষণ আর পরিবারের ভেতরের লিঙ্গগত বৈষম্য নারীকে ক্ষমতাহীন, নির্জীব প্রাণীতে রূপান্তরিত করেছে। সর্বক্ষেত্রে শ্রেণিচরিত্র দিয়ে নারীর শোষণের স্তরকে নির্দিষ্ট করা যায় না, সে-কারণেই লৈঙ্গিক বৈষম্যের প্রশ্নটি জরুরি হয়ে যায়। এই জটিল ও সূক্ষ্ম বুননির মধ্যে একজন নিম্নবর্গীয় নারীর জীবনের চেহারা কেমন ছিল বা কেমন হয়, তা যদি গবেষণার মধ্য দিয়ে বিশ্লেষণ করা যায়? তাহলে, সেই জীবনের সঙ্গে সামাজিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় সুতোগুলো কীভাবে পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার গভীর নকশাকে জানতে হবে। সাহিত্যের বিন্যাসে নারী চরিত্রগুলো সেই আদল নেয়, যা তাকে ঘিরে সামাজিক সম্পর্কগুলোকে নির্ধারিত করে দেয়। ইতিহাসের বিচারে নারীর সার্বিক মুক্তি কখনোই বিচ্ছিন্নরূপে আসতে পারে না। কারণ নারী-পুরুষের মধ্যেকার অসমতা, সামাজিক অন্যান্য অসমতার সঙ্গে সম্পৃক্ত। সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের বিভিন্ন নির্মাণে বর্ণ-বর্গ-লিঙ্গ দ্বারা সমাজ বিভাজিত হয়ে থাকে। এই বিভাজন নারীকে সর্বাধিক পরিমাণে বিপন্ন করে তোলে। প্রথমত বর্ণ-বর্গের অধীনে তার একটি বিভাজন, তার সঙ্গে থাকে ঐতিহাসিক বিনির্মাণের পথে লৈঙ্গিক বিভাজনের অবরুদ্ধতা। অর্থনৈতিক অবস্থানের কারণে সমাজে নারীর অবস্থান একধরনের আর লৈঙ্গিক বিভাজনের কারণে নারীর অবস্থান সব সময় নিম্নগামী। সমাজের যে দৃষ্টিভঙ্গি নিম্নবিত্তের মানুষের জন্য প্রযোজ্য হয়ে থাকে, সেই একই বিবেচনা নারীর জন্য অবধারিত হয়ে থাকে। যে কথা নিম্নবিত্ত ও নিম্নবর্গ সম্পর্কে প্রযুক্ত হয়ে থাকে, একই সামাজিক অন্বয় নারীকে ঘিরে তৈরি হয়ে থাকে। পুরুষতান্ত্রিকতা ও উচ্চবর্গীয় আধিপত্যর কাছে নারী ও নিম্নবর্গের নারী সব সময় পরাক্রান্ত, প্রান্তিকায়িত ও অন্তেবাসী। যে শৃঙ্খল সার্বিকভাবে তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, সেই শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভের মধ্যে নারীর বা নিম্নবর্গীয় চেতনাবাদের মূল লক্ষ্য। হাজার বছরের শোষণের যে পাথরস্তুপ তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, তারা আজ তা উন্মুক্ত করে দেখতে চায়। যথাপ্রাপ্ত পাঠকৃতি তারা বিনির্মাণ করবে, পাশাপাশি তাদের অস্তিত্বের পরিচয়কে প্রতিষ্ঠিত করবে। বাংলাদেশের উপন্যাসে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া নিম্নবর্গীয় নারীর যে বিস্তৃত পরিসর; তাকে সবিস্তারে উপস্থাপনের সর্বত্মাক প্রচেষ্টা করেছেন বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকগণ। এই গবেষণার অভিপ্রায় সেই সমস্ত তথ্য ও তত্ত্বকে যথার্থরূপে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে আলোকপাত করা।

২.

অদ্বৈত মল্লবর্মণ (১৯১৪-১৯৫১) বাংলাদেশের সাহিত্যে একজন স্বল্পপ্রজ বিশিষ্ট কথাকার। তাঁর জন্ম বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তিতাস-তীরবর্তী গোকর্ণঘাটের ধীবর বংশে। ধীবর বংশের সন্তান হওয়ার কারণে আশৈশব সমাজের নেতিবাচকতা, প্রতিহিংসা, প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে বড় হয়েছিলেন তিনি। কোনো বৈষম্যের প্রাচীর দমন করতে পারেনি তাকে, তাঁর ইচ্ছাশক্তিকে। সমাজের প্রান্তিকতায় অবস্থান করেও, শিক্ষা আর সংস্কৃতিচর্চার মধ্য দিয়ে উত্তরণের পথ-সন্ধান করে তিনি গড়ে তুলেছিলেন নিজেকে। তাঁর অন্ধকারাচ্ছন্ন এই জীবনকে মুক্তির আলো দিয়েছিল শিক্ষা। জ্ঞান অর্জনের প্রবল স্পৃহায় মালোজীবনের নিরক্ষতার রুদ্ধদ্বারকে অতিক্রম করতে পারলেও সর্বাংশে সফল হতে পারেননি তিনি। পারিবারিক বিপন্নতার কারণে মাধ্যমিকের গণ্ডি শেষ করার পরই তাঁকে প্রবেশ করতে হয়েছিল কর্ম জগতে। তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান-অর্জনের পথ বন্ধ হলেও বন্ধ হয়নি ব্যক্তিগত জ্ঞান- অনুশীলনের চর্চা। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পেশার পথকে এড়িয়ে জীবনকে প্রসারিত করার বাসনায় তিনি সংবাদপত্রের একনিষ্ঠ সাংবাদিক হয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। এই পরিক্রমায় তিনি ত্রিপুরা, নবশক্তি, মোহাম্মদী, আজাদ হয়ে সাগরময় ঘোষের আহ্বানে ১৯৪৫ সালে দেশ পত্রিকায় যোগদান করেন।

২.১

প্রতিটি মানুষের বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক নানান ঘটনার মেলবন্ধন ঘটে থাকে। ব্যক্তি অদ্বৈত মল্লবর্মণ যে পল্লিতে জন্মেছিলেন, তাঁকে ঘিরে প্রতিফলিত হয়েছিল তাঁর লেখক-সত্তার উন্মেষ ও বিকাশ। স্কুলে পড়ার সময় স্থানীয় পত্রিকায় কবিতা লেখার মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্যিক অগ্রযাত্রার সূচনা ঘটে। দেশ পত্রিকায় লেখা তাঁর ভ্রমণকাহিনি সাগরতীর্থ সমকালীন বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। লেখক অদ্বৈত মল্লবর্মণের শ্রেষ্ঠকীর্তি *তিতাস একটি নদীর নাম*, উপন্যাসটি মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ১৩৫২ বঙ্গাব্দে। ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯৫১ সালে অদ্বৈত'র মৃত্যু হলে; তাঁর বন্ধু সুহৃদদের সহযোগিতায় ১৯৫৬ সালে *তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাসটি গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়। এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ হয়েছিল পেঙ্গুইন প্রকাশন থেকে আর এটি অনুবাদ করেছিলেন কল্পনাবর্ধন এ-ছাড়া তাঁর অগ্রন্থিত গ্রন্থের মধ্যে আছে *রাঙামাটি* ও *শাদাহাওয়া* (১৩৫৫ব.)।

২.২

সাহিত্যিক অদ্বৈত মল্লবর্মণের শ্রেষ্ঠ রচনা *তিতাস একটি নদীর নাম*। জেলেজীবন বা নদী-তীরবর্তী গ্রামবাংলার জনজীবন নিয়ে অদ্বৈত'র পূর্বে বাংলা ভাষায় উপন্যাস লেখা হলেও সেগুলো ছিল ঐ সমাজের বাইরের মানুষের দৃষ্টিকোণে রচিত। এ প্রসঙ্গে লেখকের অভিমত নিম্নরূপ :

> সুবোধদা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বড় Artist, master artist; কিন্তু বাওনের পোলা–রোমান্টিক। আর আমি তো জাউলার পোলা।' জাউলা বা জেলের সন্তান অদ্বৈত মল্লবর্মণের এই উক্তির মধ্যে আছে জল ও জীবনের ঔপন্যাসিক প্রতিবেদন রচনার বিকল্প নন্দনসূত্র, বিকল্প বাচন এবং নিম্নবর্গের ভাবাদর্শকে শিল্পিত করার বিকল্প অঙ্গীকার। (বিশ্বজিৎ, ২০০৮ : ৬৭)।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, নদীনির্ভর বাংলা উপন্যাসের ধারায় *তিতাস একটি নদীর* নাম অর্জন করেছে বিশিষ্টতা। সেই বিশেষ জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ হতে পারে নিম্নবর্গের হাতে নিম্নবর্গ জীবনের শিল্পভাষ্য রূপ। উপন্যাসটির রয়েছে মোট চারটি খণ্ড। আর প্রতিটি খণ্ডের দুটি করে পরিচ্ছেদ বা পর্ব আছে। প্রতিটি খণ্ডের পর্বগুলোকে এভাবে ভাগ করা হয়েছে : ১. তিতাস একটি নদীর নাম ও প্রবাস খণ্ড; ২. নয়া বসত ও জন্ম মৃত্যু বিবাহ; ৩. রামধনু ও রাঙা নাও; ৪. দুরঙা প্রজাপতি ও ভাসমান। এই উপন্যাসের অভিনবত্ব রয়েছে প্রচলিত ও পরিচিত গ্রামীণজীবনের আবহের বাইরে, মানবজীবনের নদীকেন্দ্রিক পটভূমি আঁকার প্রচেষ্টায়। একই সঙ্গে আছে মালো জনজীবনের মূল সুর আর মালোসমাজের আর্থিক অনগ্রসরতার চিত্র। দারিদ্র্যপীড়িত এই জনজাতির জীবনের যে ইতিবৃত্ত, সেখানে নিম্নবর্গীয় ধারণার একটি বিনির্মাণগত প্রয়াস লক্ষণীয়।

২.৩

তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসের মালো সম্প্রদায় বর্ণগত ও অর্থগত উভয় বিচারে সামাজিক সম্মানে পশ্চাৎপদ। সেই মানদণ্ডের বিচারে *তিতাস একটি নদীর নাম* নিম্নবর্গের জীবন আখ্যানের সার্থক শিল্পপ্রতিমা। মালোজীবনের এই সত্যকে সামনে রেখে বলা যায়, জাতিবর্ণ-বিষয়ক প্রচলিত সামাজিক ধারণা অনুসারে সমাজব্যবস্থার সর্বনিম্নে যেসব জনগোষ্ঠী অবস্থান করে; যারা বা যাদের শ্রম দ্বারা যুগ যুগ ধরে সামজজীবনকে সচল রেখেছে বা রেখে চলেছে সেই সব শ্রমজীবী মানুষই সমাজের নিয়মে নিম্নবর্গ। নিম্নবর্গ বলতে আমরা কেবল বর্ণাশ্রিত মানুষদেরই চিহ্নিত করবো না ; শ্রেণি, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গনির্বিশেষে সকল শোষিত, বঞ্চিত, দলিত, নির্যাতিত মানুষকেই নিম্নবর্গ বলে সংজ্ঞায়িত বা

নির্ধারিত করব। এই সমাজের শাসকগোষ্ঠী, যারা উচ্চবর্গ বলে সাধারণভাবে পরিচিত; নিম্নবর্গের ওপর তাদের শোষণটা শুধু বর্ণগত বা অর্থনীতিগতই নয়, লিঙ্গগতও বটে। সামাজিক বৈষম্যের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক ও লৈঙ্গিক শোষণের প্রথম শিকার হয় নারী। এই আলোকেই *তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাসে নিম্নবর্গের নারীর উপর আলোকসম্পাতের চেষ্টা করা হবে।

২.৪

তিতাস একটি নদীর নাম (১৯৫৬) উপন্যাসের কাহিনির পট ও পটভূমি নির্মিত হয়েছে দারিদ্র্যপীড়িত জনপদের ইতিবৃত্তে সুবল-কিশোর-বাসন্তী আর অনন্তর মাকে কেন্দ্র করে। এই বৃত্তান্তের সূত্রেই আছে মালো সম্প্রদায়ের জীবনভূমি অন্বেষণের সূত্রায়ণ। সুবল, কিশোর, বাসন্তী, অনন্তর মা উপন্যাসের কাহিনির প্রধান নর-নারী। তারা শুধু তাদের ব্যক্তিজীবনের তাৎপর্যেই উপন্যাসে আলোচিত নয়; গোষ্ঠীকেন্দ্রিক জীবনাচারের টানাপোড়নেরও তারা সমান অংশী। নদীরূপে তিতাসই মালোদের বাঁচা-মরার প্রধান আশ্রয়স্থল; কখনো বন্ধু, কখনো শত্রু, আবার কখনো মাতা ও দয়িতার মতো জড়িয়ে থাকে মালোজীবনকে চিরায়তভাবে। পৃথিবী জুড়ে মানবসভ্যতার সুদীর্ঘ ইতিহাস নদীর কলতানে মুখরিত। নদীর সঙ্গে মিশে আছে নদীকেন্দ্রিক জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার মহৎ সব অধ্যায়। তিতাসের ইতিহাসে অন্তর্লীন হয়ে রয়েছে শ্রমজীবী মানুষের কথা, সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অনির্বচনীয়তার কথা। এ প্রসঙ্গে গবেষকের অভিমত প্রণিধানযোগ্য :

> বর্গ-বিভাজিত সমাজে সুবিধাভোগী বর্গ নয়, অদ্বৈত মল্লবর্মণ উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের নির্বাচন করেছেন দলিত বর্গ-উপবর্গ থেকে। তিতাস একটি নদীর নাম কেন্দ্র নয়, বরং প্রান্তিক জীবনের আনন্দ-বেদনার চিরায়ত প্রতিবেদন। অন্তেবাসী মালো জনগোষ্ঠীকে আজন্ম অভিজ্ঞতার আলোকে, পুনর্নির্মাণ করেছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ। তিতাসের মতোই তার তীরলগ্ন মালোরা ব্রাত্য-নদীর ব্রাত্য পরিচয় মালোদের প্রান্তিকায়িত পরিচয়ের সঙ্গে প্রকাশ্যমান প্রতিবেদনে একাত্ম হয়ে যায়। (বিশ্বজিৎ, ২০০৮ : ৭৫)

লেখক অদ্বৈত মল্লবর্মণ নিজে একজন মালো, তাকে মালোদের জীবনের আখ্যান বর্ণনায় ছাঁচ বদলের কোনো সীমা অতিক্রম করতে হয়নি। বরং শোষিত জনগোষ্ঠীর অংশ হিসেবে তাঁর নিকটে নারী হয়ে উঠেছিল প্রধান প্রত্যয়। কারণ নিম্নবর্গের জীবনে সমাজ আর ধর্মের অদৃশ্য ফাঁদে পড়ে নারীর প্রাণ হয়ে ওঠে ওষ্ঠাগত। শোষিত সমাজের অংশ হয়ে লেখক নারীর মধ্য দিয়ে সমাজের সর্বাপেক্ষা শোষিত শ্রেণিকে রূপায়িত করেছেন তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য-উপাখ্যানে।

২.৫

তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসের মূল কাহিনি-পর্বে রয়েছে তিনজন নর-নারীর অমীমাংসিত প্রেমের উপাখ্যান। বাসন্তী সেখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সে একজন নিম্নবর্গীয় নারী। সে শুধু একজন নারী নয়, একটি চরিত্রও নয়; সে একটি অমীমাংসিত একক সত্তা। অদ্বৈতর সৃষ্টিশীল সত্তায় তিতাসের-জলবৃত্তিক আবহের বাইরে যে রক্তমাংসের মানুষের প্রাধান্য লক্ষণীয়; সেখানে বাসন্তী একক ও বিশিষ্ট সত্তা। বাসন্তী দীননাথ মালোর একমাত্র কন্যা, সুবলের স্ত্রী, সবশেষে সে অনন্তর মাসী। বাসন্তী মালোর মেয়ে আর মালোর বউ। এ উপন্যাসে তার চরিত্রের ব্যাপ্তি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। সে একই সঙ্গে মালো সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধ অতীত আর ক্ষয়িষ্ণু বর্তমানকে অবলোকন করেছে ; নিজস্ব সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে নিয়োজিত হয়েছে ত্রাণকর্তার ভূমিকায়। এই সমস্ত কিছু ছাপিয়ে সে একজন ব্যক্তি। তার ব্যক্তিগত জীবন রেখার আদ্যোপান্ত এই সম্প্রদায়ের বিলীয়মান ইতিহাসের অংশ। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের অভিমত নিম্নরূপ :

> 'সুব্লার বউ এর মধ্যে বিপ্লবী বাস করে। সে দমিতে জানে না।' সে হারতে জানে না, নিজের বিশ্বাসের ভূমিতে স্থিত থেকে নিজ সিদ্ধান্তের সমর্থনে দৃঢ় থাকার বৈশিষ্ট্য তার চরিত্রকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে। দৃশ্যত শান্ত পরিস্থিতিতেই লুকিয়ে থাকে অগ্নিগর্ভ সম্ভাবনা। (দিলীপ, ২০১৫ : ৩৩)

বাসন্তীর এই আপাতদৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বের আড়ালে আছে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত এক চিরব্যথিত সত্তা। উপন্যাসের শুরু থেকেই আমরা জানতে পারি, বাসন্তী আর বাসন্তীর মা উভয়েই কিশোরের প্রতি ছিল অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। মা আর মেয়ের অনুভূতির সহভাব থেকে বোঝা যায় কিশোরের প্রতি তাদের একটি বিশেষ আকাঙ্ক্ষা আশৈশবের। বাসন্তীর আশৈশবের লালিত স্বপ্ন, স্বপ্নই থেকে যায়। অবদমিত বাসনার ইতি ঘটিয়ে সুবলের সঙ্গে বিয়ে আর সংসার নামের খেলাঘর নির্মাণ করেছিল সে। আবার ক্ষণিকের ঝড়ে সব হারিয়ে সে ফিরে এসেছে তার পুরোনো জীবনে। বাসন্তীর জীবনের এই ঝড় নিম্নবর্গীয় জীবনের চিরচেনা প্রতিবেশ। নিম্নবর্গীয় নারীর জীবনের বাস্তবতা নিয়ে বাসন্তী চরিত্রের ব্যাখ্যায় সমালোচকের অভিমত নিম্নরূপ :

> বালিকা থেকে প্রৌঢ়া, জীবনের এক বিশাল বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে অদ্বৈত বড় যত্ন করে বাসন্তীকে এঁকেছেন। গোকর্ণঘাটের মালোগোষ্ঠীর উত্থান-পতনের জীবন্ত সাক্ষী যেন বাসন্তী। অথবা বাসন্তীর জীবন কাহিনির মধ্য দিয়ে যেন তিনি দেখিয়েছেন এক জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষার এক আপসহীন যোদ্ধা হিসেবেও

আমরা তাকে দেখি। এবং এই যোদ্ধা রমণীর ট্রাজিক পরিণতিও আমরা দেখি বুক ভার করা এক শূন্যতার মধ্যে দিয়ে । (দিলীপ, ২০১৫ : ৩১)

কোনো কারণ ছাড়াই জীবনের পরতে পরতে বাসন্তী শিকার হয়েছিল বঞ্চনা আর নিগ্রহের। নিম্নবর্গীয় জীবনের নির্ধারিত ভবিতব্যকেই যেন স্মরণ করিয়ে দিয়েছে সে। জীবনের ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনাই তার ইচ্ছাধীন নয়। বিশ শতকের সৃষ্ট নারী হলেও বালিকা থেকে যুবতী পর্যন্ত বাসন্তী চরিত্রের নির্মাণ যেন উনিশ শতকী বাঙালি নারীর চিরপরিচিত পরিমণ্ডল। বৈধব্যের যন্ত্রণা নিয়ে সে পৌঁছেছে প্রৌঢ়ত্বের সীমানায়। জীবনের এই দীর্ঘ পরিমণ্ডলে সে নিজের কোনো ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে পারেনি। কেন পারেনি, সে কারণ তার কাছে অজানা। সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় তার উত্তর–সে নিম্নবর্গ, নারী, ব্রাত্যজন।

২.৬

বাসন্তীর জীবন রেখা ভেদ করে লেখক অদ্বৈত মল্লবর্মণ আসলে প্রবেশ করেছেন মালোজীবনের আবাসস্থলে। মালোপাড়ার সুবলার বউ বাসন্তী নিঃসন্তান বিধবা এক নারী। উপন্যাসের 'নয়া বসত' পর্বে অনন্তর মা যখন অনন্তকে নিয়ে স্বামী-সংসারের খোঁজে গোকর্ণঘাটে এসে পাড়ি জমায়, তখন ঘাটের পথে ক্রন্দনরত অনন্তর মাকে সমবেদনা জানিয়ে বুকে টেনে নিয়েছিল সে। এর মধ্য দিয়ে ব্যক্তি বাসন্তীর মানবিক হৃদয়বৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তারপর থেকে আত্মার সম্পর্কে জড়িয়ে অনন্তর মার 'ভইন' আর 'অনন্তর মাসি' হয়ে উঠেছিল সে। নিম্নবর্গের সর্বংসহা-জীবনে এই সব মানবিক-গুণাবলির পরিচর্যা করা কঠিন হলেও বাসন্তীর আত্মগত পরিচয় নিহিত ছিল এর মধ্যে। তার নিঃসঙ্গ জীবনে অনন্তর মার সান্নিধ্য সন্ধান দিয়েছিল এক নতুন পৃথিবীর। তার প্রমাণ পাওয়া যায় বাসন্তীর বক্তব্যে : 'ভাবছিলাম আমারই দুঃখের দুঃখী অনন্তর মার মত সাথী পাইয়া, অনন্তর মত ছাইলা কোলে পাইয়া সব জ্বালাযন্ত্রণা জুড়ামু।' (অদ্বৈত, ২০১৫ : ৪৭৭) এ কথাও সত্য যে এক বিধবাই পারে আর এক বিধবার বৈধব্যের যন্ত্রণা অনুধাবন করতে। বাসন্তী আর অনন্তর মার বন্ধুত্বের মধ্য দিয়ে লেখক আসলে তাদের শ্রেণিগত-সাম্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তাদের জীবনের যন্ত্রণা তাদেরকে মিলিয়ে দিয়েছে একরেখায়। অনন্তর মার পরিচয়ের রহস্যময়তা বাসন্তীকে চঞ্চল করলেও স্থিরতা দিয়েছিল অনন্তর বাৎসল্যের সুধাময়তা। অনন্তর মার সঙ্গে বন্ধুত্বের মধ্য দিয়ে দুই বিধবা নারী তাদের বিবর্ণ জীবনের সহযাত্রী হয়ে উঠেছিল। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় তার বিবরণ নিম্নরূপ :

> না দিদি, মন ঠাণ্ডা কর। পুরুষ মানুষ দিয়া কি হইব। তারা বৃষ্টির পানি-ফোঁটা, ঝরলেই শেষ। তারা জোয়ারের জল। তিলেক মাত্র সুখ দিয়া নদীর বুক শুইষ্যা নেয়। এই অনন্তই আম্‌রার আশা-ভরসা। দুইজনে এরেই মানুষ কইরা তুলি চল। এ-ই একদিন আম্‌রার দুঃখ ঘুচাইব। (অদ্বৈত, ২০১৫ : ৪৭৫)

নিম্নবর্গীয় নারীর জীবনে পুরুষকেন্দ্রিক বাসনার অপূর্ণ পরিপ্রেক্ষিতের পাশাপাশি সঙ্গীবিহীন জীবনের অন্তর্জ্বালাও সত্য হয়ে উঠেছে। জীবনের পূর্ণতার পরিধিতে নারীর বিবাহ নামক বৈতরণি পার হওয়ার পরে, সমাজ-সংসারের নিকট তার আর চাওয়া-পাওয়ার কিছু থাকে না। প্রান্তিক সমাজের নারীর শৈশব-কৈশোরের শিক্ষা তাকে প্রদীপের মতো পুড়ে পুড়ে বাঁচায় অনুপ্রাণিত করে। জোয়ারের জলের ক্ষণিক সুখের স্মৃতির নিয়ে প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মধ্যেও তারা বাঁচার রসদ খুঁজে পায়; অনন্তর মতো সন্তানেরা সেই অসীম শূন্যতায় ভেলা হয়ে ভাসিয়ে রাখে তাদের। এই উপদ্রুত জীবনে বাসন্তী আর অনন্তর মা একে অপরের সহযোদ্ধা হয়ে পাশে থেকেছে, শক্তি সঞ্চয় করেছে, বিরূপ পরিবেশে অস্তিত্বকে সচল রেখেছে জীবনের স্রোতকে ভালোবেসে।

২.৭

বাসন্তী প্রান্তিক মালো সম্প্রদায়ের নারী। তার রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কোনো জীবন নেই, আছে শুধু সামাজিক জীবন। সেখানে সে দীননাথ মালোর মেয়ে আর সুবল মালোর বিধবা স্ত্রী-এর বাইরে তার আর কোনো পরিচয় নেই। তারপরও মানুষ হিসেবে তার থাকে কতকগুলো মানবিকবোধের বিকাশ; যা স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। সেই সহজাত স্বভাব থেকে নারীর মধ্যে মাতৃত্বের প্রগাঢ়তার সৃষ্টি। স্বভাব-সিদ্ধভাবেই নারী মা হওয়ার মধ্যে নারীত্বের যথার্থ পূর্ণতা বলে মনে করে থাকে। বাসন্তীর চরিত্রে সেই অনুভূতির প্রকাশ দীপ্তিময়তার সঙ্গে জাজ্বল্যমান। অনন্তর মাসীরূপে বাসন্তীর মাতৃত্বের সুপ্ত সত্তার জাগরণ ঘটেছিল। এই অনাকাঙ্ক্ষিত জীবনের শেষ আশ্রয় রূপে অনন্তকে লালন-পালনের মাধ্যমে সে মেটাতে চেয়েছিল তার মাতৃত্বের ক্ষুধাকে। অনন্তর মাসীরূপে, বাসন্তীর মধ্যে ক্রমেই এই আশা-ভরসার তৈরি হতে থেকেছে। একজন মা যেমন সন্তানকে আশ্রয়স্থল ভেবে জীবনের দুর্গম পথকে পাড়ি দেয়ার কথা ভাবে; বাসন্তীও তেমনি ভাবতে থাকে তার নিঃসম্বল জীবনের সব দুঃখ, সব আঁধার, একদিন অনন্তর হাত দিয়ে বিলীন হয়ে যাবে। বাসন্তীর ভাবনাকে লেখক ব্যাখ্যা দিয়েছেন নিম্নরূপে:

> ঘরে গিয়া সে অনন্তকে আবির মাখাইল, চুমা খাইল, বুকে চাপিয়া ধরিল, ছাড়িয়া দিয়া আবার বুকে চাপিয়া ধরিল। অনন্তর মুখখানা সুন্দর, চোখ দুটি সুন্দর, শরীরখানা সুন্দর। যখন কথা বলে কথাগুলি সুন্দর। যখন কোনোদিকে চাহিয়া থাকে তখন তাকে অনেক বড় মনে হয় । (অদ্বৈত, ২০১৫ : ৪৭৫)

অনন্তর ক্রমবিকাশের বিবর্তনের পরিধি, অনন্তর শিশুসুলভ অভিব্যক্তি বাসন্তীর ভেতরের সুপ্ত মাতৃত্বকে সক্রিয় ও সচেষ্ট করে তুলেছে। বাসন্তীর মাতৃত্ববোধকে স্ফুরিত করার সুযোগ করে দিয়েছিল অনন্তর মার অন্যমনস্কতা। বাসন্তীর অতৃপ্ত সত্তা তাকে গ্রহণ করেছিল দুহাত ভরে। তবে তাও তার জীবনের অন্যসব ঘটনার মতো ক্ষণিক মোহে রূপ নেয়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অপর হয়ে বাসন্তী তার মাতৃত্বের সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। যে বাসন্তী 'কাঁচা রাড়ি', সে নিজেই পিতার সংসারে একটা বোঝা। সে কীভাবে আর একজনের মা হয়ে তার অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করবে। অনন্তর মায়ের মৃত্যুর পর আনুষ্ঠানিক সৎকার পর্যন্ত তাকে তার মা-বাবার কোপানল থেকে আগলে রাখলেও, তারপরে আর পারেনি। দারিদ্র্যের অপরিমেয় দুর্যোগ আর নিজের মায়ের নিষ্ঠুরতা বিফল করে দিয়েছে তার সেই প্রচেষ্টাকে। এই সবকিছুর মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই একজন নিম্নবর্গের নারীর সমগ্র জীবনের নিঃস্বতার প্রকটিত রূপকে। এর মধ্যে বাসন্তীর মানসিক সামর্থ্যের অভাব ঘটেছে এমন নয়; তবে অভাবের সংসারে তার চাওয়া-পাওয়া হয়েছে মূল্যহীন। কারণ সে নারী, সে দরিদ্র; তাই তার নিজের কোনো ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা থাকতে নেই। জীবনের এই বহুমাত্রিক বিপর্যয় তাকেও নিষ্ঠুর করেছিল অনন্তর প্রতি। ঔপন্যাসিকের বিবরণে বাসন্তীর সেই মনোভাব নিম্নরূপ :

> শত্তুর, তুই বাইর হ। এই ঘরে তুই ভাত খাস ত তোর সাত গুষ্ঠির মাথা খাস। তোর লাগি আমার মায়েরে মারলাম। তুই আমার কি, ঠ্যাঙ্গের তলা, পায়ের ধূলা। যা যা অখনই যা, যমের মুখে যা। ডাকিনী যোগিনীর মুখে যা, কালীর মুখে যা। ধর্মে যেন তোরে ফিরাইয়া না আনে। চোখের মাথা, নাকের মাথা খাইয়া যেখানে যমে টানে, সেইখানে যা। আমার সামনে আর মুখ দেখাইস্ না । তোর মা গেছে যে-পথে, তুইও সেই পথে যা। (অদ্বৈত, ২০১৫ : ৪৭৫)

যদিও মাতৃহীন বালকের প্রতি বাসন্তীর অভিসম্পাত নির্মমতায় পূর্ণ ছিল; দারিদ্র্যের নিপীড়ন আর বাবা-মায়ের অসহনীয় আচরণ নিষ্ঠুর করে তুলেছিল তাকে। তার সাময়িক কষ্টের অভিব্যক্তি ছিল এই ঘটনা; কিন্তু অন্তর্গত তাড়নায় তার মাতৃত্বের অনুভূতির বেদনা আবার খুঁজে ফিরেছে অনন্তকে। 'উঠিয়া হাত বাড়াইয়া স্খলিত কণ্ঠে ডাকিল, অনন্ত! অনন্ত! মাথা রাখিয়া সুব্লার বউ এলাইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ দুইটিও বুজিয়া আসিল।' (অদ্বৈত, ২০১৫ : ৪৯৭) মাসীর অনাকাঙ্ক্ষিত আঘাতে অনন্ত পা বাড়িয়েছে অজানার পথে বাসন্তীর সীমাকে অতিক্রম করে। অনন্তর এই চলে যাওয়া আরো নিঃস্ব করেছে বাসন্তীর শূন্য জীবনকে। তবু বাসন্তীর ভেতরের হার না-মানা সত্তা এক প্রবল শক্তিতে উজ্জীবিত। সে ভেতরে ভেতরে ক্ষত-বিক্ষত হবে; অন্তর-আত্মায় বয়ে চলবে প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ; বাইরে তার কোনো চিহ্নকে থাকবে না। অনন্তর চলে যাওয়ায় সে বলেছে : 'আপদ গেছে ভাল হইছে। কার দায় কে সামলাইবে গো দিদি? আমার পেটের না পিঠের না, আমার কেনে অত

ঝকমারি'। (অদ্বৈত, ২০১৫ : ৪৯৮) বাসন্তী কোনো অবস্থাতেই জীবনের কাছে, নিয়তির কাছে, হার মানতে রাজি নয়। জীবনে যখন, যে স্রোতে ভেসে থাকতে চেয়েছে, তাই চোরাবালি হয়ে ডুবিয়ে দিয়েছে তাকে। সমস্ত অপ্রতিরোধ্যতার মধ্যেও নিজেকে টিকিয়ে রাখার যে শক্তি, সে পেয়েছে তার সমাজ থেকে, তার শ্রেণি থেকে। জন্ম থেকেই যে নারী প্রতিকূলতাকে প্রতিরোধ করে বাঁচে, নিয়তির হাতে সে কখনো বন্দি হতে পারে না। বাসন্তী তেমনই এক আত্মপ্রত্যয়ী নারী। যে জীবনের রঙ, রূপ, স্বাদকে, সর্বাবস্থায় গ্রহণ করার সক্ষমতা নিয়ে জীবনকে বয়ে চলেছে।

চরিত্রের দ্বান্দ্বিকতায় বাসন্তী বরাবর যেন জীবন-রসধারায় এক মোমগলানো পলতে। শূন্য জীবনে ঘনায়মান আঁধারে আলোর দীপশিখারূপে অনন্তর আগমন ঘটেছিল তার জীবনে। অনন্ত নামক স্বপ্নের আলোছায়ায় প্রদক্ষিণ করতে করতে অগ্রসর হয়েছিল মাতৃত্বের মহামায়ায়। দীর্ঘ ব্যবধানের পর নৌকাবাইচের উৎসবমুখর পরিবেশে অনন্তকে পেয়ে আবার আকুল হয়েছিল বাসন্তী। পূর্ববর্তী স্নেহের স্রোতোধারা অনন্তকে মাসীর নিকট নিয়ে গেলেও পরিস্থিতির বৈপরীত্য চমকিত করেছিল বাসন্তীকে।'– আপন তো কোনো কালেই নই মাসী। মার সই তুমি। মা যতদিন ছিল, তোমার কাছে আমার আদরও ততদিনই ছিল। মা মরিয়া গেলে, সে আদর একটি হাট-বাজারের মতই ভাঙ্গিয়া পড়িল।' (অদ্বৈত, ২০১৫ : ৫৩৭) নাবালক শিশু মুখের এই আপ্তবাক্য বাসন্তীকে করে তুলেছিল দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য। যে মাতৃত্বের দাবি একদিন তার পরবর্তী জীবনের বাঁচার প্রেরণা হয়েছিল; সেই-মাতৃত্বের লজ্জা সে দিন কাতর করেছিল তাকে। যেন বাসন্তী কোনো দিন চায়নি অনন্তের আংশিক ভাগীদার হতে। অনন্তের যে মহা-ইন্দ্রিয়ে মুগ্ধ হয়েছিল সে, সে শুধু অনন্ত নয়; অনন্ত নামের বাতাবরণে হারিয়ে যাওয়া কিশোর নামের প্রাণের এক অংশ। সেই মহামায়ায় আশ্রয় নিতে চেয়েছিল বাসন্তীর চিরদুঃখী মন। জীবনের অমোঘ নিয়মে সে আশ্রয়ও হারালো বাসন্তী। বাসন্তীর অনভিব্যক্ত সেই ব্যথার প্রকাশকে ঔপন্যাসিক নির্মাণ করেছেন নিম্নবর্গীয় জীবনের পরাবাস্তবতায়। বাসন্তী জীবনের একরাশ শূন্যতার মধ্যেও বেঁচে থেকেছে অসীম ধৈর্য আর সহিষ্ণুতা নিয়ে। তার এই বয়ে চলা যেন তিতাসেরই মতো শত জঞ্জালকে বুকে নিয়ে নীরবে বয়ে চলার ইতিহাস।

২.৮

বাসন্তীর দৃঢ়তা আর ঋজুতাকে আমরা উপন্যাসের আর কোনো চরিত্রের সঙ্গে মেলাতে পারি না। সে উপন্যাসে অবতীর্ণ হয়েছে নিজেই নিজের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে। শৈশবের-কৈশোরে বন্ধু, সঙ্গী, প্রিয়জন, কিশোরের উন্মাদনা বাসন্তীর জীবনের ছককে পরিবর্তন করে দিয়েছে। তবু জীবনের ভেতরের দাহকে শক্ত প্রলেপে আবদ্ধ রেখেছে সে; জীর্ণতাকে জীবনের রঙ ভেবে বেঁচে থেকেছে, বাঁচার পথ খুঁজেছে।

দীর্ঘ জীবনের বিস্তৃত পরিসরে কিশোর আর কিশোরের প্রেমের মমার্থ কাউকে বুঝতে দেয়নি সে। তার অর্থ এই নয় যে অস্ফুট প্রেমের পুষ্পরাজি বিলীন হয়েছে অকালেই। তাকে বুকের কোঠরে গুপ্ত রেখে সে পথ চলেছে এবং দৃঢ়ভাবেই চেলেছে। যে মন স্বপ্ন দেখেছিল কিশোরের বউ হওয়ার; সে মন কি সুখী হয়েছিল সুব্লের বউ হয়ে? যদিও বাসন্তী মুখে সে কথা উচ্চারণ করেনি। অদ্বৈত মল্লবর্মণ জানতেন সমাজের প্রান্তে বাস করে যে নারী, তার নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ-অভিরুচির প্রকাশ সেদিনের সেই সমাজের নারীর জন্য অপ্রাসঙ্গিক। তবে সময়ের বিবর্তিত পরিসীমায় এ কথা বলা যায় যে সেদিনের সেই সমাজ নারীকে তার স্বতন্ত্র চাওয়া-পাওয়া থেকে বঞ্চিত করলেও, তার বহিঃপ্রকাশের সীমাকে রোধ করতে পারেনি। কারণ অনন্তর প্রতি বাসন্তীর প্রবল আকর্ষণ শুধুই মাতৃত্বের জারিত ক্ষুধার প্রকাশভঙ্গিই নয়, তার সঙ্গে রয়েছে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাওয়া কিশোরের প্রতি অবদমিত কামনার প্রকাশ। সে যেন অনন্তের মধ্যে খুঁজে ফেরে কিশোরের ছায়াকে, কিশোরের প্রেমবঞ্চিতা বাসন্তীরূপে। বাসন্তী চরিত্রের নীরব অনুভূতিকে সুপ্ত রেখেই লেখক নির্মাণ করেছেন তাকে। অদ্বৈত মানুষের মানবিক সূক্ষ্মতাকে গ্রহণ করেছেন অবাধে; সেই সমস্ত দক্ষতাকে প্রয়োগ করে উচ্চকিত করেছেন চরিত্র নির্মাণশৈলীকে। সেখানে বাসন্তী এক অনবদ্য সংযোজন।

২.৯

আধুনিক ভারতীয় সমাজে বিধবাবিবাহ আইনসম্মত করলেও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তার যথাযথ প্রতিস্থাপন ঘটেনি। সমাজে বিপত্নীকের বিবাহ যতটা দৃষ্টিনন্দিত, বিধবা-বিবাহ ততটাই দৃষ্টিকটু বলে গৃহীত। সমাজের প্রান্তে বসবাসকারী মানুষের জন্য সামাজিক বিধিনিষেধ আরো বেশি কঠোর, সেখানে নিম্নবর্গের ও নিম্নবর্ণের এক নারী বাসন্তীর জীবনব্যবস্থার উন্নতির পক্ষে সহায়ক ভাবনা দিবাস্বপ্নের মতো অপরিণত। এই প্রসঙ্গেই বলা যায় :

> নারী তার নিজের সত্তা ও কর্তৃত্ব অস্বীকার করে নিয়ে 'অপর' হতে বাধ্য হয়। এই ক্ষেত্রে 'অপর'-এর অবস্থান থেকে সৃষ্টি করা যায় না, কারণ 'অপর'-এর কোনো কর্তৃত্ব নেই। যে কর্তা সে সবসময় 'অপর'-এর অস্তিত্ব দিয়ে নিজের অস্তিত্বকে নিরূপণ করে। কিন্তু যে নিজে 'অপর' হয় সে কেমন করে তার সত্তাকে বিকশিত করবে। (সেলিনা, ২০০৯ : ১৬৬)

নিম্নবর্গের সমাজের অপর সত্তা হয়ে তিতাস-তীরের এই ধীবর কন্যা শুধু নিজের জীবনের দায়িত্বই পালন করেনি; তিতাস-কন্যা হয়ে তিতাসের সংস্কৃতিকে লালন করেছে, তার অস্তিত্বকে করে চলেছে সজীব। তিতাসকেন্দ্রিক মালো সংস্কৃতির বিলোপের দিনে হাল ধরেছে এই অন্ত্যজ নারী। প্রতিবাদে-প্রতিরোধে সে অগ্রবর্তী সৈনিকের দায়িত্ব পালন করেছে। তার উচ্চারণে : 'আমি সব পারি। আর কিছু

না পারি আগুন লাগাইয়া গাঁও জ্বালাইয়া দিতে পারি।' (অদ্বৈত, ২০১৫ : ৫৩৯)এভাবে শৈশব - কৈশোরের বহমানতার মধ্য দিয়ে সে একজন সাধারণ নারী থেকে তার স্বাতন্ত্র্যের মহিমায় অগ্নিগর্ভা নারীতে রূপান্তরিত হয়েছে। অন্তেবাসী জনগোষ্ঠীর কৌম জীবনে এমন দৃঢ় প্রতিবাদী নারীর দেখা মেলে না। তার মাটিবর্তী প্রাণ আর মূর্তিমান প্রতিবাদ বাসন্তীকে রূপান্তরিত করেছে তিতাসের মানসকন্যায়।

২.৯

একটি চরিত্র, একজন ব্যক্তি, একজন নারী আর একজন মা। সব পরিচয়ের উর্ধ্বে একটি সত্তার পরিচয় উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে, তা হলো অনন্তর মা। অনন্তর মা চরিত্রের মাতৃত্বের সুধা যতটা প্রকাশিত হয়েছে; তার চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে কিশোরের স্ত্রী বা প্রেয়সী সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রতিজ্ঞ থাকার দৃঢ়তা। যদিও মাতৃত্বের দায়িত্বই তাকে বাধ্য করেছে কিশোরের স্ত্রী পরিচয়কে প্রতিষ্ঠিত করতে। কারণ পিতা নিজেও জানে না, সে একজনের পিতা বা তার একটি সন্তান আছে। পিতা সন্তান সম্পর্কে অবহিত না হলেও মাকে হতে হয়। এটাই সামাজিক নিয়ম; তাই মা রূপে অনন্তর মার প্রধান দায়িত্ব তার সন্তানের পিতৃপরিচয়কে প্রতিষ্ঠিত করা। এখানেই তার চরিত্রের সংকট, সম্ভাবনা এবং সমগ্রতা। অনন্তর মার জীবনের স্বল্প আলোর, অল্প পরিসরে, কিশোরের আগমন ও প্রস্থান। যদিও তাকে আমরা পুরোপুরি প্রস্থান বলতে পারি না। তবে তারপরে কিশোরের যে অস্তিত্ব, সেখানে সে স্মৃতিভ্রষ্ট এক চৈতন্যহীন মানুষ। অনন্তর মার জীবনের কিশোরকেন্দ্রিক অন্ধকারের পশ্চাতে সামাজিক বা সংস্কৃতিক যে বৈষম্যগুলো ক্রিয়াশীল ছিল তার যথার্থ ব্যাখ্যার মধ্যে দিয়ে উত্তর-সন্ধান এই গবেষণার অভিপ্রায়। উপন্যাসের প্রবাসখণ্ডের শুকদেবপুরের দোল উৎসবে পাঠক প্রথম আবিষ্কার করেন নামহীন এই নারী অনন্তর মাকে। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় তা নিম্নরূপ :

> দলের ভিতরে সেই মেয়েটিকেও দেখা গেল। মার পায়ের দিকে তাকাইয়া সেই তালে তালে পা ফেলিতেছিল। কিশোরের সহিত চোখাচেখি হইয়া সে তাল-কাটা পড়িল। পা আর উঠিতে চাহিল না। (অদ্বৈত, ২০১৫ : ৪৩২)

এভাবেই উপন্যাসের স্বল্প পরিসরের অনন্তর মার পরিচয়, প্রণয় আর পরিণয়। এত সব ঘটনা, এত দ্রুত ঘটে চললো যে, কেউ কাউকে ভালো করে চেনা বা জানার সুযোগ পেল না। অন্ত্যজ জীবনের পরিসীমায় সবকিছুই দ্রুত ঘটে চলে; কারণ শ্রমশীল মানুষের জীবনে কোনো ঘটনা নিয়ে বেশি সময় অতিবাহিত করার মতো সময় থাকে না। 'মোড়ল-গিন্নির হাতে দুইটি ফুলের মালা। একটি কিশোরের হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল, 'শাস্ত্রমতে বিয়া কইর দেশে গিয়া। অখন মালা বদল কইরা রাখ'। (অদ্বৈত,

২০১৫ : ৪৩৪) নিম্নবর্গের এই নিয়মবদ্ধ জীবনে নারীর অবস্থান এতটাই দুর্বল যে সেখানে নারীকে একটি খেলার পুতুলের মতো বার দুয়েক দেখল; তারপর বৈবাহিক কার্য সম্পন্ন হলো। এই পুতুল নারী, নামহীন অনন্তর মার ভবিষ্যৎ কী হতে পারে? কেমন হতে পারে? তা নিয়ে তার অভিভাবক, স্বজন, সম্প্রদায়, কারো কোনো ভাবনার অবকাশ নেই। যেন দশমীর দুর্গা বিসর্জনের মতো অনূঢ়া নাম ঘুচলেই সবাই আত্মতৃপ্তির ঢেঁকুর তুলবে।

২.১০

লেখক অদ্বৈত মল্লবর্মণ ঐ সমাজের একজন হয়ে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন ঐ সমাজের নারীর প্রকৃত অবস্থানকে। সে কারণেই তাঁর সাহিত্যিকভাবনায় সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছিল এমন এক নারীর জীবন-পরিমণ্ডল। অনন্তর মার যাত্রা হয়েছিল সেই অনন্তের পথে, যার নাম, পরিচয়, ঠিকানা, কিছুই তার জানা ছিল না। সময়ের প্রবল আঘাতে স্বামীকে যখন হারিয়ে ফেলেছে, তখন নিম্নবর্গীয় সেই নারীর জীবনে এর অধিক বিপন্নতা আর কি হতে পারে? তাই সমগ্র উপন্যাসে অনন্তর মার জীবনকে একটা রহস্যের ঘেরাটোপে বন্দি করে রেখেছেন লেখক। নামহীন এই নারী সব হারালেও পেয়েছিল মাতৃত্বের অমৃত ছোঁয়া। যে কারণেই তাকে ফিরে আসতে হয়েছিল বিস্মৃত অতীতের নিকটে। যার কোনো নিদর্শনই তার কাছে ছিল না; ছিল শুধু তিতাসের দুর্নিবার আকর্ষণ। এই পরিস্থিতি তাকে নিয়ে চলেছে আধেক স্বপ্নে, আধেক জাগরণে হারানো স্মৃতি-সুধার পানে :

> শুধু জানে গাঁ-খানা তিতাস নদীর তীরে। নদী সোজা উত্তর দিকে আসিয়া এ গাঁয়ের গা ঘেঁষিয়া পশ্চিম দিকে মোড় ঘুরিয়াছে। এক একটা গ্রামের ছায়ায় নৌকা আসিল চমকাইয়া উঠিয়াছে, বিহ্বলের মত চাহিয়াছে এই বুঝি সেই গাঁ। গাঁ খানা তার মনকে টানিয়াছে শুধু আজ নয়, অনন্ত যখন পেটে, তখন থেকে। ...এই গাঁ হইতেই সে প্রবাসে গিয়াছিল। তার নাম মনে নাই, দেখিতে যেন কি রকম ছিল তাও মনে নাই। কতবারই বা দেখিয়াছে। (অদ্বৈত, ২০১৫ : ৪৪৩)

অনন্তর মার তিতাস-তীরে আগমন তার জীবনের আর একটি সংগ্রামমুখর অধ্যায়ের জন্ম দিয়েছে। সম্পূর্ণ স্বজনহীন পরিবেশে নিজের ও সন্তানের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার যুদ্ধে নিয়োজিত হয়েছে সে। বিবাহ নামক সামাজিক যে প্রতিষ্ঠান নারীর জীবনকে খোলামকুচিতে রূপান্তরিত করে সেখানে তার প্রয়োজনীয়তা নিয়েও প্রশ্ন থাকে। তবুও সমাজ নারীকে বিবাহ দেয়ার মধ্যে তার জীবনের পূর্ণতা আনতে চায়। কারণ সমাজ নারীকে মানবসভ্যতার পুনরোৎপাদনের যন্ত্র ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। সেই সংস্কারের পরাকাষ্ঠে নারীর জীবন আবদ্ধ হয়ে থাকে যুগের পর যুগ ধরে। আবার সে কারণেই নারীকে সারা জীবন ধরে পরীক্ষা দিতে হয়, সন্তানের জন্ম-পরিচয়ের পরীক্ষা, সতীত্বের

পরীক্ষা। যেমন দিতে হয়েছিল সীতা ও শকুন্তলাকে। সমাজ, ধর্ম নারীর কাছে সন্তানের পিতাকে চায়, ঐ সন্তানের যথার্থ সত্য পরিচয় প্রতিষ্ঠা করার পর মা রূপে ঐ নারীর মুক্তি মেলে। সেই অনাদিকাল থেকে এভাবেই নারীকে নির্মাণ ও নিপীড়ন করে আসছে সমাজ। অথচ আদিকালের সেই সমাজে রাজা দুষ্মন্তকে কারো কাছে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়নি। আর আজকের দিনের কিশোরকেও নয়, যদিও কিশোর অপ্রকৃতিস্থ। রাজা দুষ্মন্ত আর কিশোরের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে, কারণ রাজা দুষ্মন্তেরও স্মৃতিভ্রষ্ট হয়েছিল আর কিশোর হয়েছে উন্মাদ। তবে সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও অনন্তর মাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থেকে নারীত্বের দায়িত্বকে পালন করতে হয়েছে।

২.১১

বিবাহ-উত্তর দুর্যোগের রাত্রে স্বামী ও সংসার সমস্ত হারানোর পর অনন্তর মা তার পিতামাতার কাছে ফিরে যায়নি; কারণ সেখানেও তাকে বিভিন্ন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। নিজের নিয়তির সম্ভাব্য সমস্ত বিপত্তিকে নিজেই অতিক্রম করার অসামান্য আত্মশক্তি নিয়ে তিতাস-তীরের মালোপাড়ায় আবাস গড়েছে সে। স্বামীহীন, স্বজনহীন একা নারীর, একক লড়াইয়ে, সে বাংলা সাহিত্যের এক অনন্যসাধারণ নির্মাণ। অনন্তর মার জীবনসংগ্রামের মধ্য দিয়ে আরও একটি বিষয় খুব স্পষ্ট যে যেকোনো সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যেও নারী তার নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার, শক্তি ও সাহস রাখে। এই সংগ্রাম নারীর নিজস্ব সংগ্রাম, তারপরও কথা থাকে, যে শ্রেণিসমাজের মধ্যে নারী অবস্থান করে, সেই সমাজ পুরুষের নির্মিত; নারী সেই সমাজেরই অংশ। সেই সমাজের মধ্যে অবস্থান করেই নারী তার মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করে। নারীর এই শ্রেণিসংগ্রাম, সমগ্র সমাজের শ্রেণিসংগ্রামের অংশ হলেও, পুরুষ সেখানে আধিপত্য বিস্তার করতে চায়; আর নারীর অবদানকে অবদমন করতে চায়। সে ক্ষেত্রে গবেষকগণ মনে করেন যে নারীর সংগ্রামের যে সব উপাদান ইতিহাসের লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকে, তাকে প্রকাশ করে তাদের পুনর্মূল্যায়ন করা প্রয়োজন; নারীবাদী ইতিহাস ও সাহিত্যচর্চার যৌথ উদ্যোগে তা করা যেতে পারে। (যশোধরা, ২০১২ : ৬৯) *তিতাস একটি নদীর নাম* তেমনি একটি সাহিত্যিক উদ্যোগ, যেখানে নিম্নবর্গের নারীর অবদমিত জীবনকাহিনি প্রাধান্য পেয়েছে। এই গবেষণার মাধ্যমে প্রান্তিক এই নারীর সামাজিক অবস্থানের যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব।

২.১২

অনন্তর মা তার নামহীন জীবনকে বিলীন হতে দেয়নি সামাজিক অবকাঠামোর চোরাস্রোতে। নিজের লক্ষ্যে অটুট থেকে তার জীবনের সামাজিক সত্যকে অন্তঃশীলার মতো বয়ে নিয়ে চলেছে। এই একক

লড়াইয়ের পথে সবার প্রথমে তার প্রয়োজন হলো আর্থিক নিরাপত্তার পথ আবিষ্কার করা। লেখক তার জীবনের মূল সত্যের সূত্রায়ণে রহস্যাবৃত রাখলেও জীবন ও জীবিকার সূত্রে তাকে অন্য মালো নারীদের সমগোত্রীয় করে তুলেছেন :

> মালো পাড়ার অধিকাংশ নারী লক্ষ্মীরমতো সেও সূতা-বুননের মাধ্যমে জীবিকার্জনের উপায় বের করে নেয়। কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্য দিয়ে পুত্র অনন্তকে নিয়ে সে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে। এক অবিশ্বাস্য স্বপ্নঘোর বাস্তবতায় পথ চলে সে। যে নতুন সমাজ-প্রাকারে সে স্বেচ্ছাবন্দিনী, সে সমাজের-প্রথা-পদ্ধতি কখনও কখনও তাকে আতঙ্কিত-শিহরিত করে ; দুরদুর-বক্ষে সে অপেক্ষা করে ভয়ঙ্কর কোনো তথ্যচিত্রের। (গিয়াস, ২০০২ : ১৫)

নারীর জীবন সমাজের দৃষ্টিতে সর্বদা একটি কৌতূহলের কেন্দ্রস্থল। তারপর অনন্তর মার জীবন যখন যথার্থই এক অমীমাংসিত সত্যে বাঁধা পড়ে আছে; তখন এই সমাজের কাছে তার সংশয় আর সংকোচের শেষ নেই। সে কারণেই বোধ হয়, লেখক রহস্যের আড়াল থেকে বয়ান করেছেন তাকে ও তার কাহিনিকে। আর তাই কিশোরের সঙ্গে তার সম্পর্কের জট কখনোই খোলসা করেননি। পাঠক জানলেও গোকর্ণঘাটের মালো সম্প্রদায়ের কাছে অনন্তর জন্মপরিচয়, অনন্তর মা আর কিশোরের সম্পর্ক অবগুণ্ঠিত থেকে গিয়েছে। ইশারা ইঙ্গিতে কিশোরের প্রতি তার দুর্বলতা প্রকাশ করলেও সম্পর্কের সত্যতাকে বরাবরই অস্বীকার করেছে সে : 'পাগলে কারে কই হারাছে, তার আমি কি জানি। আমি কেবল জানি, একলাজীবন চলে না। পাগলেরে পাইলে তারে লখ কইরা জীবন কাটাই।' (অদ্বৈত, ২০১৫ : ৪৭৮) অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ততার সঙ্গে অনন্তর মা আড়ালে রেখেছে নিজের অতীতকে। নিম্নবর্গের মানুষের জীবনচরিত রচনা করতে গিয়ে লেখক অদ্বৈত মল্লবর্মণ এটা জানতেন যে নারী নিম্নবর্গের মধ্যেও নিম্নবর্গ। তাই বোধ হয় সম্ভব হয়েছে অনন্তর মার মতো একটি চরিত্র সৃষ্টি করা। সমাজিক নিয়ম অনুযায়ী বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পন্ন না হওয়ায় সন্তানের সামাজিক পরিচয়কে বারবার গোপন করতে হয়েছে তাকে। স্বামী কিশোরকে চিনতে পারার পরও নিজের সংসারে, নিজের অধিকারের কথা বলতে পারেনি। যদি তাকে তার সন্তানের জন্মপরিচয় নিয়ে কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে ; আবার কিশোর নিজেও যদি তাকে, তার সন্তানের পিতৃত্বকে অস্বীকার করে। সবর্দা এক বিষণ্নতার কালো মেঘ তাকে গ্রাস করে রেখেছে :

> পাগল যদি কোনোদিন ভাল হয়, সেও বলিবে, ডাকাতে তোমাকে অসতী করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। তুমি যে সতী, তার কোনো প্রমাণ নাই। তখন আমার অনন্তর যে কোনো উপায়ই থাকিবে না ।(অদ্বৈত, ২০১৫ : ৪৭৮)

এই সমাজব্যবস্থায় বারবার নারীকেই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। যে ঘটনায় তার নিজের কোনো সম্পৃক্ততা নেই; অথচ তার কারণে ঐ নারীকে জীবনের বিপর্যয়কে মেনে নিতে হয়েছে। যেমন অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছিল সীতাকে রাবণ কর্তৃক অপহরণের কারণে। তেমনি অনন্তর মাকেও অনন্তর সামাজিক পরিচয়ের কথা ভেবেই একটি নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে, আর একটি অনিশ্চয়তার পথে পা বাড়াতে হয়েছে। গোকর্ণঘাটে আবাস গড়ার একমাত্র কারণ অনন্তর পিতৃপরিচয় প্রতিষ্ঠিত করা, সেখানেও বিধি বৈরী। ভাবনা আর সংশয়ের দ্বিধায় সময়কে বয়ে যেতে দিতে হয়েছে: 'কিন্তু অনন্ত! সে তার বাপকে চিনিল না, তার বাপও তাকে চিনিল না, এ যে বড় নিদারুণ।' (অদ্বৈত, ২০১৫ : ৪৭৮)। এই আত্মপরিচয়ের দুর্ভাবনা তাকে স্থিত হতে দেয়নি; বারবার তার চেতনাজগতে আঘাত করেছে কিশোরের অসুস্থতা। কেন এত দাবানল একজন নারীকে বহন করতে হবে? কী তার অপরাধ এই সমাজের কাছে? শুধু সে নারী বলে, শুধু নিম্নবর্গ বলেই, এত সামাজিক উপেক্ষা তাকে বহন করতে হবে? তার কোনো উত্তর নেই সমাজ সংস্কারকের কাছে।

২.১৩

তিতাস-তীরে অনন্তর মার আগমনের হেতু কিশোর হলেও, মূল অনুঘটকের কাজ করেছে অনন্ত। মালোসমাজের ভবিতব্য জেনেই যেন লেখক নির্ধারণ করেছিলেন জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের মতো প্রাকৃতিক ভারসাম্যের মধ্যেই জীবনের স্থূলবোধ আর ট্রাজিক পরিণতির সীমানা। মালোজীবনের আঁধার যাত্রায় ছিন্নমূল নারী অনন্তর মা, তার অনন্ত যাত্রাপথের কোনো অন্ত পায়নি। অনন্তর মা তার এই নিঃসঙ্গ যাত্রাপথে একজন সঙ্গী পেয়েছিল, তার নাম বাসন্তী। তার সান্নিধ্য, সহযোগিতা তিতাস-তীরের স্থবির পরিবেশকে স্রোতশীল ও বেগবান করেছিল অনন্তর মার জন্য। উপন্যাসের পটভূমিতে আলোচনার পরিসর থেকে যায় গ্রামীণ নারীর বন্ধুত্বের প্রাসঙ্গিকতার। গার্হস্থ্য শ্রমের সঙ্গে নারীর যুক্ততা অনিবার্যভাবে নারীসত্তার অবস্থানকে অপরায়ন করে তোলে। এই অপরায়নের বৃত্ত নারীকে আর এক নারীর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেয়। উপন্যাসে আমরা দেখি বাসন্তী আর অনন্তর মার মধ্যে তৈরি হয়েছে সেই যোগাযোগ। তাদের বাস্তবতা তাদেরকে মিলিয়ে দিয়েছিল এক সুতায়। অন্যভাবে বলা যায়, পূর্ব থেকেই তাদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের সম্পৃক্ততা পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন ঔপন্যাসিক। আর তাদের অভীষ্ট যোগসূত্র হয়তো কিশোর বা কিশোরের প্রণয়মুগ্ধতা। 'হরিণী যেমন নিজের কস্তুরীর গন্ধ অনুভব করে, সুবলার বউয়ের আবির্ভাবও অনন্তর মা তেমনি করিয়া অনুভব করিল।' (অদ্বৈত, ২০১৫ : ৪৮৮) তিতাসের শ্রেষ্ঠত্ব শুধু মানুষ আর নদীর এক সত্তায় মিশে যাওয়ার মধ্যে নয়, গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজব্যবস্থায় নারীর জীবনাচারের সমৃদ্ধ এক সাহিত্যিক কাঠামো নির্মাণে। বাসন্তী আর

অনন্তর মার ব্যক্তিক মিলন হলেও মানসিক মিলন ঘটেনি। ব্যক্তিত্বের স্বমহিমায় তারা তাদের অতীতকে অবরুদ্ধ রেখেই পথ চলেছে। দুজনেই তাদের নিজস্ব যন্ত্রণার পরিসীমাকে অব্যক্ত রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় তা নিম্নরূপ :

> মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া রাখিয়াছে, যদি কোনোদিন চূড়ান্ত সময় আসে সেদিন বলিবে, তার আগে বুক যতই মুচরাইয়া দুমরাইয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাক সেখানেই উহাকে সযত্নে সংগোপনে লুকাইয়া রাখিবে। (অদ্বৈত, ২০১৫ : ৪৭০)

এখানেই অনন্তর মা চরিত্রের ব্যক্তিত্বের ঋজুতা স্পষ্ট। ব্যক্তিত্বের আবরণের আড়াল অনন্তর মার নিজেকে লুকানোর সমস্ত প্রচেষ্টা বাসন্তীকে স্পর্শ করেছে। কারণ তিতাসের মতোই তিতাসতীরের নারীর স্পর্শ সক্ষমতা সুনিবিড়। এই স্পর্শের আহ্বানে অনন্তর মা নিজেকে মনের আবেগ ঢেলে দিয়েছে সই বাসন্তীর নিকটে : 'তুমি না কইছিলা ভইন আমার একজন পুরুষ চাই। হ, চাই ইতো। পুরুষ ছাড়া নারী জীবনের কানাকড়ি দাম নাই।' (অদ্বৈত, ২০১৫ : ৪৭৭) পুরুষতান্ত্রিক সমাজের শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক কাঠামো নারীকে এই উপদেশই দেয় যে পুরুষ ছাড়া তার জীবন মূল্যহীন। এই আপ্তবাক্যকে মনেপ্রাণে মেনে সে তার গন্তব্যের পথে চলেছে। মাতৃত্বের দায়িত্ব হিসেবেই অনন্তর মাকে বারবার কিশোরের কাছে যেতে হয়েছে। জীবনের এই অন্ধকার তলদেশকে পুনরুদ্ধার করতে করতে সে ক্লান্ত। আবার যেখানেই যাবে, সেখানেও থাকবে জিজ্ঞাসু অতীতের অপমানের ভয়। এই অনিশ্চিত জীবনের দোলায় সে দ্বান্দ্বিক, তবু সে নিরুত্তর। পুরুষতন্ত্রের একটি বড় সফলতা হলো নারীর মনোজগতে জন্ম দিতে পেরেছে পরনির্ভরতা, অধস্তনতা ও দাসীসুলভ সত্তার। সমাজ নারীকে পতিভক্তিতে ও স্বামীর সেবার মধ্য দিয়ে জন্মকে সার্থক করায় বিশ্বাসী করে তোলে। পুরুষতন্ত্র এভাবে নারীকে প্রাণহীন, সংবেদনহীন বস্তুতে পরিণত করতে বাধ্য করেছে (আবদুল, ২০১২ : ৩৫)। এই সামগ্রিক অবস্থার মধ্য দিয়ে অনন্তর মার মতো নারীর পক্ষে একজন পুরুষের সামাজিক স্বীকৃতি সার্বিকভাবে অর্জন করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। কিশোরের আপাত অপ্রকৃতস্থ অবস্থার আড়ালে আছে তার ভালোবাসার, তার সামাজিক আশ্রয় ও সন্তানের বৈধ সত্তার অভিভাবকত্ব প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা। এ প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিকের বিবরণ নিম্নরূপ :

> একটা ধারণা কি জানি কেন তার মনে বদ্ধমূল হইয়াছে যে পাগল একদিন ভাল হইয়া যাইবে। রোজ রোজ অনন্তর মাকে দেখিতে দেখিতেই তার মাথা ঠিক হইয়া যাইবে।...হ্যাঁ, তার স্বামী স্মৃতির দিক দিয়া মনের দিক দিয়া এখন মরিয়া আছে। সেই দিন তার পুনর্জন্ম হইবে। ...একদিন সে সত্যের মূর্ত ব্যঞ্জনার মধ্যে দিয়া জানাইবে ডাকাতেরা তার কেশাগ্রও স্পর্শ করে নাই। সেই রাত্রিতেই সে নদীতে পড়িয়া সবকিছু বাঁচাইয়াছে। তা পাগল নিশ্চয়ই ভাল হইয়া উঠিবে। (অদ্বৈত, ২০১৫ : ৪৭৯)

এই অন্তর্দ্বন্দ্ব, এই আশাবাদিতা তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কিশোরকে সুস্থ করে তোলা যেমন তার দায়িত্ব হয়ে উঠেছিল, তেমনি তার মধ্যে প্রত্যয় ছিল নিজের সত্যকেও প্রতিষ্ঠিত করার। এই ধন্বন্তরি কর্মযজ্ঞে সে নিয়োগ করেছিল তার সর্বশক্তি। সেই পথের প্রতি পদক্ষেপে তাকে রক্ষা করেছে বাসন্তী। কারণ বাসন্তীরও মনে হয়েছিল, অনন্তর মার চাওয়ার মধ্যে তার জীবনের অপ্রকাশিত সত্যের আলোকজ্জ্বল দিগন্ত আছে :

> সে নিজের গায়ে নিজে জখম করিয়া চলিল। তার গায়ে এত জখম হইল যে, তার দিকে আর তাকানোই যায় না। অনন্তর মা কুলের বাধা লাজের বাধা ঠেকাইয়া কাজে নামিল। সে নিজে ঘোরাঘুরি করিয়া এক কবিরাজের কাছ হইতে গাছগাছড়ার ওষুধ আনিল। সাবানে গরমজলে ঘা ধুইয়া সে ওষুধের প্রলেপ দিল। ...সুবলার বউ পরিচিত অপরিচিত সকল মহলে এই কথা জোর গলায় প্রচার করাতে কারও মুখ দিয়া কোন বিপরীত কথা বাহির হইল না। (অদ্বৈত, ২০১৫ : ৪৮০)

অনন্তর মা তার বাসনার সবটুকু না পেলেও, তার প্রতীক্ষিত প্রেমের শিহরণ পেয়েছিল সে। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের অন্তিমাংশে এসে হোলি উৎসবের উদ্দীপ্ততায় কিশোরের হারানো স্মৃতিকে স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছিল অনন্তর মা। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় নিম্নরূপ :

> মেয়েটার খোঁপা খুলিয়া গিয়া সাপের মতো মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে। ...কিশোর পুরোপুরি পাগল হইয়া সে বুকে মুখ ঘষিতে লাগিল। দাড়ি গোফের জবর জঙ্গিমায় বুঝিবা সেই নরম তুলতুলে বুকখানা উপরাইয়া যায়। (অদ্বৈত, ২০১৫ : ৪৮৩)

সমবেত লোকের পক্ষে কিশোরের এই উন্মাদনা বোঝা সম্ভবও ছিল না। তাদের অসতর্ক আঘাতে কিশোরের মৃত্যু ঘটে। কিশোরের মৃত্যুর চার দিন পরে অনন্তর মারও মৃত্যু হয়েছে। এই মৃত্যু কোনো স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, জীবনের চড়াই-উতরাই পেরিয়ে হারানো প্রেমকে ফিরে পাওয়া, আবার তাকে হারিয়ে ফেলা; জীবনের এই চরম আঘাত তাকে পৌঁছে দিয়েছিল মৃত্যুর দুয়ারে। জীবনযুদ্ধে ক্লান্ত, অবসন্ন অনন্তর মা; তাই কিশোরের মৃত্যুর চার দিন পরই অনিবার্য হয়ে উঠেছিল তার মৃত্যুও। এই মৃত্যু এ কথাই প্রমাণ করে যে পৃথিবীতে নিম্নবর্গের নারীর অবস্থান কতটা নাজুক, কতটা অপার্থিব।

২.১৪

অদ্বৈত মল্লবর্মণ মালোসমাজের জীবনগাঁথা রচনা করতে বসে নির্মাণ করেছেন মালো নারীর জীবন-ইতিহাস। উপন্যাসের পরিসরে লেখক তিন ধরনের নারীকে উপস্থাপন করেছেন। প্রচলিত বাল্যবিধবার নিগড়ে বাঁধা বাসন্তী, দুর্যোগে স্বামী-সংসার হারানো অসহায় নারী অনন্তর মা, সমাজ-সংসারকে উপেক্ষা করে জীবনের চাওয়াকে প্রতিষ্ঠাকারী নারী উদয়তারা। বাসন্তী, অনন্তর মা,

উদয়তারা এই তিন নারীকে দিয়ে উপন্যাসের কাহিনিকে বিস্তৃত করেছেন লেখক। তবে তাদের মধ্যে ঔপন্যাসিক সংযোগ ঘটিয়েছেন অনন্তকে দিয়ে। এই তিন নারী জীবন-সংসারের তিন ধরনের যন্ত্রণায় কাতর। উদয়তারার স্বামী থাকলেও সন্তানহীন জীবনে সংসারের প্রতি আসক্তি তৈরি হয়নি তার। সে মালো সম্প্রদায়ের এক সাহসী ও উচ্ছল প্রকৃতির নারী। তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসের অনন্তকে কেন্দ্র করে কাহিনির যে আবর্তন, সেখানে উদয়তারা একজন গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। গোকর্ণঘাটের মালো সমাজে তার পরিচয় সে লবচন্দ্রের বউ। বাসন্তীকে বঞ্চিত করে অনন্তকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনার কোনো ইচ্ছা তার ছিল না। আশ্রয়হীন অনন্তর আশ্রয় হয়ে নিজের ঘরে ঠাঁই দিয়েছিল মাত্র উদয়তারা। এভাবেই মাতৃত্বকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্বের সূচনা হয়েছিল বাসন্তীর সঙ্গে উদয়তারার : 'খুব যে দরদ লবচন্দ্রের বউ-এর। স্বামীকে দিয়া খোঁজাইয়াছে। বলি কয়দিনের কুটুম? এতদিন দেখাশুনা করিয়াছে কে? মা যখন মরিল, লবচন্দ্রের বউ তখন কোথায় ছিল?' (অদ্বৈত, ২০১৫ : ৪৯১) এই সব বাসন্তীর অভিমানী উত্তেজনা আর পরিস্থিতির রূঢ়তা। আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দিলে তাকে দুকথা শুনতে হবে এটা গ্রামীণ নিম্নবর্গীয় সংস্কৃতিরই অংশ। উদয়তারা অনন্তকে শুধু পেটের আহার দেয়নি; তার শিশুমনের জন্ম দিয়েছিল উৎসুক জিজ্ঞাসার। পাশাপাশি উন্মুক্ত করে দিয়েছিল মালো নারীর প্রচলিত লোকসংস্কৃতির জগতকে। রামধনুতে পর্বে দেখা যায়, নবীনগরে যেতে যেতে উদয়তারার অনন্তকে একটি ধাঁধা বলেছে-

সু- ফুল ছিট্যা রইছে, তুলবার লোক নাই

সু-শয্যা পইড়া রয়ছে, শুইবার লোক নাই। (অদ্বৈত, ২০১৫ : ৫০৪)

উদয়তারার ব্যবহৃত এমনই বহু ধাঁধা সমগ্র উপন্যাসজুড়ে আছে। লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন ব্যবহারের মধ্যে উদয়তারার ব্যক্তি চরিত্রের অপ্রকাশিত দিকসমূহ প্রকাশিত হয়েছে। দাম্পত্যের আবর্তনলীলায় তার মধ্যে মাতৃত্বের আকুতি থাকলেও ছিল না উত্তেজনা। তার মনে হয়েছে 'বারো বছর বয়সে বিয়া হইছিল তারপর ন'বছর--মোটে ত একুশ বছর। এর মধ্যেই বড় হইয়া গেলাম?' (অদ্বৈত, ২০১৫ : ৫১৪) শারীরিক বয়সে সে বড় হলেও মনের মধ্যে তার শিশুসুলভ স্বভাবের উৎফুল্লতা থেকে গিয়েছে। ফলে তার আর অনন্তের মধ্যে মাতৃত্ব সূচক স্নেহের পরিসীমার বাইরে নির্মিত হয়েছিল বন্ধুত্বের সহজ সীমানা। গোষ্ঠীগত জীবনের যে পরিমণ্ডল নারীকে সন্তান উৎপাদন আর গৃহশ্রমের প্রধান নিয়ামক রূপে গড়ে তোলে; এর বাইরে তাদের স্বতন্ত্র কোনো সত্তার ধারণা বা জগৎ তৈরি হয় না। সেখানে উদয়তারা এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল বিনির্মাণ।

২.১৫

গ্রামীণ নারীর জীবনের স্বাভাবিক গতিবিধি অনুসারে বিয়ে হওয়ার কয়েক বছরের মধ্যে সন্তানের জন্ম হয়। তারপর সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে নারীর জীবনের বিস্তার ও মনের সরলতাকে ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু করে তোলে। গোষ্ঠীগত জীবনের এই পরিসীমাকে অতিক্রম করে সে তৈরি করেছে নিজস্ব এক জগৎ। তার স্বনির্মিত সেই জগতের আলোক স্তম্ভ তিতাস-তীরের লোকসংস্কৃতির আঁধার। কিশোর অনন্তর অন্দরমহলে ঢুকতে উদয়তারা বিছিয়ে দিয়েছিল মালো সংস্কৃতির বিস্তৃত জাল। মালোনারী উদয়তারা তার স্বভাবসিদ্ধ সংস্কৃতি সেবা দিয়ে জয় করেছিল অনন্তর মন। নবীনগরে এসে তার অপর দুই বোন নয়নতারা আর আসমানতারার সঙ্গে দেখা হলে তাদের হাস্য-পরিহাসের মধ্যেও মালো সমাজে প্রচলিত লোকসংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য ব্যবহার লক্ষণীয়। তিন সহোদরার সৌহার্দ্য, আন্তরিকতা ও মালোনারীর জীবনগাথারই অংশ। 'গাঙে গাঙে দেখা হয়, তবু ভইনে ভইনে দেখা হয় না।' (অদ্বৈত, ২০১৫ : ৫০৬) অন্ত্যজ সমাজে বিবাহিত বোনেদের একত্রিত হওয়ার সুযোগ কম, কারণ তারা তখন অন্য পরিবার বা পুরুষের নিয়ন্ত্রণে থাকে। তাই একজনের সঙ্গে অন্যজনের দেখা হওয়া সম্ভব হয় না। আবার অনেক সময় পিতামাতার সামর্থ্য থাকে না সব কন্যাকে একসঙ্গে আয়োজন করে নাইয়রে আনার। তাই এই সমস্ত প্রবাদ নিম্নবর্গের নারীদের জীবনের যথার্থ প্রতিরূপক।

২.১৬

অনন্তকে জীবনের পথের দাবির কাছে হারিয়ে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে স্বামীগৃহে ফিরে আসে উদয়তারা। এই ফিরে আসার মধ্য দিয়ে তার অন্তর-আত্মায় ঘটেছিল নতুন এক বোধের জাগরণ। যে সন্তানহীন দাম্পত্যের তিক্ততা তাকে গৃহবিমুখ করেছিল; স্বামীর আগমনে পতিগৃহাভিমুখী হলেও, পূর্বের অনুরাগ তাকে আর সঞ্চারিত করেনি। কারণ সময়ের বহমানতায় তিতাস তার যৌবন হারালে, মালোপাড়া গ্রাস করেছিল অভাবের করাল ছায়া। জীবনের এই সব ঘটনা তাকে স্নেহার্দ্র করে তুলেছিল বাসন্তীর প্রতি। পুরোনো তিক্ততাকে পেছনে রেখে সে নতুন বন্ধুত্বের আহ্বান জানায় বাসন্তীকে। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় তার বিবরণ নিম্নরূপ :

> আমারও ছোটকালেই বিয়ে ইহছিল। এই গাঁওয়ে আইয়া পাইলাম তোরে। বাড়ির লগে বাড়ি-- দুইজনে একসাথে গলায় গলায় রইছি, তখনও যেমন তুই বাসন্তী অখনও তুই আমার তেমুনই বাসন্তী । (অদ্বৈত, ২০১৫ : ৫৫৮)

উদয়তারার এই উদাত্ত আহ্বানের মধ্য দিয়ে তার সঙ্গে বাসন্তীর বিবাদের অবসান ঘটে। তারা ফিরে আসে তাদের পুরোনো ভালো লাগার প্রসঙ্গ অনন্তর আলোচনায়। মাতৃত্বের করুণ আকুতিতে তারা দুই

নিঃসম্বল নারী একে অপরকে প্রবোধ দিয়েছে : 'কি লা বাসন্তী, মনে বুঝি মানে না। আমারও মানে না। আমার ত ভইন কৃষ্ণহারা ব্রজনারীর মত অবস্থা। কিন্তু পরের পুত, তোরও পেটের না, আমারও পেটের না।' (অদ্বৈত, ২০১৫ : ৫৫৮) বাসন্তী ও উদয়তারা দুজনে মালো সম্প্রদায়ের নারী; তাদের জীবনের যন্ত্রণার ক্ষতও সুগভীর, সেই আজন্ম লালিত ক্ষতের একটি অংশ অনন্ত। এর বাইরে তাদের রয়েছে বেঁচে থাকার অজস্র লড়াই। সেই লড়াইয়ের লড়াকু সৈনিক তারা, তিতাসের বুকে জেগে ওঠা চর আঘাত করেছে তাদের অস্তিত্বে। ক্ষুধার লড়াইয়ে বাঁচার পর যদি কোনো দিন কোনো অবসর তারা পায়; তাহলে হয়তো তারা তাদের পুরোনো ব্যথাই খোঁচা দিয়ে বাৎসল্যের সুধায় অনুরণিত হবে। এটা যেন নারী ও নিম্নবর্গের জীবনের জন্য নির্ধারিত সত্য।

উপরিউক্ত এই আলোচনা থেকে বলা যায় যে নিম্নবর্গ আর নারী একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। নিম্নবর্গের সমাজেও নারী নিম্নবর্গের মধ্যেও নিম্নবর্গ, শ্রেণিহীনের মধ্যেও অধিকতর শ্রেণিহীন গোষ্ঠী। হাজার বছরের সামাজিক ইতিহাসে তাদের জীবনকথা অভিন্নরূপে গ্রথিত হয়ে রয়েছে। মালোদের গোষ্ঠী জীবনে নারীরা প্রথাসিদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির বাইরের নয়। উপন্যাসের প্রধান তিন নারীর জীবনের পরিপ্রেক্ষিত বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হয়েছে সমাজের প্রান্ত-প্রদেশে অবস্থিত সব নারীকে স্মরণ করার প্রচেষ্টা; যাদের অন্তর্দেশের কাতরতা কখনো সমাজ, রাষ্ট্র, ইতিহাসে, স্থান পায়নি। তবুও পৃথিবী ঋণী তাদের শ্রম, ঘাম আর রক্তের কাছে।

২.১৭

আলোচিত এই তিন নারীর বাইরে আর এক নারী অনন্তবালা। সে অনন্তের বাল্যকালের খেলার সঙ্গী, যৌবনের সারথি। সে নবীনাগরের মালোদের বড়বাড়ির মেয়ে। মালো হলেও তারা অন্য মালোদের তুলনায় আর্থিকভাবে সচ্ছল। অনন্তবালাও উদয়তারার মতো কথায় কথায় ছড়া কাটতে পারে। যৌথ পরিবারের একমাত্র কনিষ্ঠ কন্যা হওয়ায় সবার আদরে একটু বাচাল প্রবৃত্তির সে। তার চরিত্র বড় বৈশিষ্ট্য অনন্তের প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম। শৈশবের মুগ্ধতাকে লালন করেছে আজীবন; সচ্ছল পরিবারের আদরের সন্তান হওয়ায় নিজের বাসনাকে দৃঢ়তার সঙ্গে স্থাপন করতে পেরেছে। এ প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিকের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ :

> অনন্তবালার বয়স বাড়িয়াছে। তার বয়সের অন্যান্য মালোর মেয়েরা সকলেই স্বামীর ঘর করিতে চলিয়া গিয়াছে। সে এখনো মাঘমণ্ডলের পূজা করে। ... তার বয়সের অন্য মেয়েদের যখন একে একে বর আসিল, অনন্তবালা দেখিয়াছে, কিন্তু মনে করিয়া রাখিয়াছে, তারও একদিন বর আসিবে। সে বর আর কেউ নয়। সে অনন্ত । (অদ্বৈত, ২০১৫ : ৫৫৪)

অনন্ত ফিরে আসলেও অন্তবালার বধু হওয়ার সাধ পূর্ণ হয়নি। শৈশবের মুগ্ধতাকে যৌবনের স্বপ্ন করে সে তার জীবনের সোনালি দিনগুলোকে পার করে চলেছে। অনন্তবালার এই ত্যাগ, তিতিক্ষাকে উমার তপস্যার সঙ্গে তুলনা করেছেন লেখক। তবে তার জন্যও অনন্তবালাকে সহ্য করতে হয়েছে অনেক। 'মালোর ঘরের মেয়ে অত বড় হইয়াছে বলিয়া কত কথা তাকে শুনিতে হইয়াছে।' (অদ্বৈত, ২০১৫ : ৫৬০) সমাজনির্মিত বৃত্তের বাইরে নারী যা-ই করবে, তার জন্য তাকে মাশুল দিতে হবে। অনন্তর সকল কাজের ভিড়ে অনন্তবালার জন্য কোনো সময় তৈরি হয়নি। এটাই নিম্নবর্গীয় জীবনের মানচিত্র, নিম্নবর্গীয় পরিসীমায় এভাবেই জীবনের অপচয় ঘটে থাকে।

২.১৮

প্রধান এই তিন নারী ছাড়াও উপন্যাসে আরো বেশ কিছু নারী চরিত্র আছে, যারা কাহিনির প্রবাহে বড় অবদান না রাখলেও কাহিনির সামগ্রিকতায় তাদের অবস্থান অত্যাবশ্যক। কালোর মা, মঙ্গলার বউ, সুবলার মা, কিশোরের মা ও বাসন্তীর মা-সবার জীবন একই সুতায় বাঁধা। এদের মধ্যে কালোর মার জীবনপদ্ধতি অন্যদের থেকে একটু স্বতন্ত্র; স্বামীর মৃত্যুর পর সে জেলে রমণীদের সুতা কাটতে দিয়ে থাকে। সেই সুতা অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করে জাল তৈরি করে। তাই সে নিজেও হাসিঠাট্টা করে সময় কাটায় না, অন্যদেরও প্রশ্রয় দেয় না। সুবলের মা দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত এক জেলে রমণী, সুবলের বাবার নিজের নৌকা না থাকায় সারা জীবন নিঃসম্বলভাবে জীবন কাটিয়েছে। ভেবেছিল ছেলে কর্মক্ষম হলে সুখের মুখ দেখবে সে আশাও তার দুরাশা হয়েছে ছেলের অকালমৃত্যুতে। জীবনযুদ্ধের ক্লান্তি আর রিক্ততা তার একমাত্র সম্বল। বাসন্তীর মা অন্যদের তুলনায় আরো একটু সক্রিয় চরিত্র। বাসন্তীর জীবনের বিভিন্ন ঘটনায় তার রয়েছে সক্রিয় ও সজাগ ভূমিকা। একমাত্র বৃদ্ধ স্বামীর উপার্জনে তিনজন মানুষের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান হয়ে থাকে; সেখানে আর একজনের অবস্থান, তার জন্য আশঙ্কার বিষয় হয়েছিল। এর বাইরে তার চরিত্রে রয়েছে মাতৃত্বের উন্মুক্ত দিগন্ত, যেখানে সে অমোঘ অনুকম্পায় বিধবা কন্যা বাসন্তীর প্রতি সদা স্নেহার্দ্র। মঙ্গলার বউয়ের মধ্যে গ্রামীণ নারীর প্রথাগত জীবনবোধর সন্ধান পাওয়া যায়। সে বাসন্তী আর অনন্তর মার সখী হয়ে তাদের অন্তর্গত সত্যকে উদ্ধারের চেষ্টা করেছিল। আবার কখনো উদয়তারার অনন্তকে আশ্রয় দেয়াকে কেন্দ্র করে বাসন্তীর ক্ষুব্ধচেতনাকে জাগ্রত করে, উদয়তারাকে কথা শোনাতে প্রলুব্ধ করেছে। এভাবে ভালো-মন্দে, স্নেহে-প্রেমে, ক্রোধ-ক্ষমায়, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতে নারী চরিত্রগুলো হয়েছে দীপ্যমান। জীবনস্রোতের বহমানতায় তারা করেছে কৈবর্ত সমাজের প্রতিনিধিত্ব। এ প্রসঙ্গে গবেষকের মত :

> তিতাস একটি নদীর নাম- এর বাস্তব তথ্যের ক্ষেত্রে ফাঁক নেই কোথাও, তাই লঘু কল্পনার কুয়াশা দিয়ে পাঠকদের ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টাও নেই। তাই তিনি (অদ্বৈত) সেই বিরল ঔপন্যাসিকদের অন্যতম যাঁর লিখন-প্রণালীতে সাহিত্যের প্রাতিষ্ঠানিক ফন্দিফিকির ও বৌদ্ধিক চাতুর্য নেই, কল্পনাপ্রতিভা যাঁর আখ্যানে বিধৃত বাস্তবতাকে নতুন মাত্রা দেয়। (তপোধীর, ২০০০ : ৭৫)

ঔপন্যাসিকের শ্রেষ্ঠত্ব শুধু আখ্যান নির্মাণ বা বর্ণনায় নয়, চরিত্রকে যথার্থ বাস্তবতায় দাঁড় করানোর মধ্যেও লেখকের নৈপুণ্য দৃষ্টিগ্রাহ্য। জেলে নারীর বাইরে তিতাস-তীরবর্তী সাধারণ চাষি পরিবারের গৃহবধূর প্রতিদিনের জীবনযাপনের করুণ কাহিনি অদ্বৈত সার্থকতা ও সহানুভূতির সঙ্গে তুলে ধরেছেন। কৃষিকাজের গৃহভিত্তিক কর্মকাণ্ডে অবিরত শ্রম দানের পরও পতিগৃহ নারীর নিজের হয় না। যৌতুক রূপী গহনা পরিশোধ করতে না পারায় খুশির পিতাকে অপরাধীর মতো আসতে হয় মেয়েকে দেখতে; মেয়েকে নাইয়রে নেয়ার অধিকার থাকে না। তবে আর একটি বিষয় খুবই দৃষ্টিগ্রাহ্য যে পুরুষতন্ত্রের শিকড় যেখানে নিমজ্জিত সেখানে খুশির কোনো অধিকার না থাকালেও তাকে সমাদর করা হয় রামুর মা বলে। বংশের প্রথম সন্তান পুত্রসন্তান জন্ম দিতে পারায় শ্বশুর কাদিরের নিকট তার গ্রহণযোগ্যতা শতগুণ। তবু বন্ধ হয়নি খুশির বাবাকে আঘাত করার অনৈতিক উৎপীড়ন। তাই প্রতিবাদ করেছে সে স্বামী আর শ্বশুরের অন্যায় আর অন্যায্য আচরণের বিরুদ্ধে। *তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাসের শোষিত, বঞ্চিত, মানুষের ভিড়ে সে এক বিদ্রোহের প্রতিমূর্তি।

৩.

বাংলাদেশের সাহিত্যে নানামাত্রিক সৃজনশীলতায় পরিচর্চিত নাম শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮)। নানা উপচারে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন বাংলাদেশের উপন্যাসের সমৃদ্ধ সূচনাধারাকে। একজন বহুপ্রজ লেখক হিসেবে জীবদ্দশায় সুনাম ও সুখ্যাতি দুই-ই অর্জন করেছিলেন তিনি। কবিতা ছাড়া সাহিত্যের প্রতিটি আঙ্গিকে সাক্ষর রেখেছিলেন নিজের স্বাতন্ত্র্যের। তাঁর সাহিত্যিক সত্তার সূচনা ছাত্রাবস্থায় হলেও, খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা ঘটে দেশভাগ-উত্তর পূর্ব বাংলার পরিমণ্ডলে। এই খ্যাতির পশ্চাতে নিহিত ছিল তাঁর অমলিন মেধা, প্রগতিশীল মনস্বিতা, মানবিক জীবনদৃষ্টি। অনিঃশেষ প্রাণশক্তির আঁধার হয়ে তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন ধর্মীয় গোঁড়ামি, কুসংস্কার আর মানবতাবিরোধী সকল কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে। রাজনৈতিক স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি লেখকের প্রগতিশীল মুক্ত চিন্তায় অভিনিবেশ করে এবং নির্যাতিত মানুষের পক্ষে লেখনী ধারণ করতে অনুরণিত করেছে। শোষিত মানুষের মুক্তির সপক্ষে তাঁর সাহিত্যিক মতাদর্শ সর্বদা ক্রিয়াশীল থেকেছে। শ্রেণি-সংগ্রামের ইতিহাসে মানবজাতির সর্বাপেক্ষা শোষিত ও নির্যাতিত শ্রেণি নারী। অর্থনৈতিক পরাধীনতার সুযোগ নিয়ে বিকাশ লাভ করেছে লৈঙ্গিক

বৈষম্য। সেই পথের পরিক্রমায় নারী গৃহবন্দি এক অসহায় প্রাণী, যাকে কন্যারূপে, স্ত্রীরূপে, জননীরূপে প্রতিনিয়ত আবর্তিত হতে হয় সংসারের মায়াজালে। সর্বংসহা বসুন্ধরা রূপে জীবনের পথে পথে মূল্য দিতে হয় নারীকে। এই প্রবন্ধের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিত *জননী* উপন্যাসে নারীর মাতৃত্বসত্তার সর্বাবয়ব রূপ বিধৃত হয়েছে।

৩.১

জননী শওকত ওসমানের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস; উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালে। উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে সওগাত পত্রিকায় ১৯৪৪-৪৫ সালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। সওগাত পত্রিকায় প্রকাশকালে এর নাম ছিল *জিন্দান*, গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে এর নাম হয় *জননী।* নামকরণের মধ্যে নারীর জীবনকেন্দ্রিক কাহিনির আভাস সুনির্দিষ্ট। নারীর এই সৃষ্টিশীল মানবিক সত্তাকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্য ও বিশ্বসাহিত্যে বিভিন্ন ধরনের উপন্যাস রচিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের অভিমত :

> ভারতীয় উপমহাদেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে 'মা' চরিত্রটি বড়বেশি আইডিয়ালাইজড বা আদর্শায়িত। মা চরিত্রকে এমনই পবিত্র-জ্ঞান করি যে, তাঁর সম্পর্কে কোনো অপকথা বাঙালি সন্তান সহ্য করে না। না করার নেপথ্যে শুধু জন্মগত কারণই নয়, নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা রয়েছে। সমস্ত পবিত্র ধারণা দিয়ে আমরা মাকে ভাবতে শুরু করি আশৈশব। আমাদের এই ভাবনায় মা হয়ে ওঠেন স্বর্গের অধিবাসী। আমরা ভুলে যাই যে মাও মানুষ। ''পৃথিবীর আর দশটা নারীর মতো তাঁরও আছে মানসিক অতৃপ্তি, শারীরিক প্রয়োজন ও চারিত্রিক ত্রুটি। তিনিও যে জৈবিক কারণে স্বামীর শয্যার জন্য ব্যাকুল হতে পারেন, একথা আমরা ভাবতেই চাইনা।'' বাংলাসাহিত্যের মায়ের এই চরিত্রটি কে আদর্শায়িত করেই চিত্রিত করা হয়েছে। লেখকের ও পাঠকের জন্য এটা স্বস্তিকর। কিন্তু এর ব্যতিক্রমও আছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় *জননী* উপন্যাসে (১৯৩৫) এবং শওকত ওসমান *জননী* উপন্যাসে একটু ভিন্নভাবে মায়ের চরিত্রকে দেখতে চেয়েছেন। (ভূঁইয়া ইকবাল, ২০১২ : ২৯৮)

এর বাইরে ব্রেখট লিখেছিলেন নাটক *সাহসিকা* সে-ও একজন জননীকে নিয়ে, পার্ল বাকের নোবেল-সম্মানখ্যাত উপন্যাস *দি গুড আর্থের*ও কেন্দ্রে রয়েছে মা। শওকত ওসমানের *জননী* এই সব সাহিত্যকর্ম থেকে আলাদা। *জননী*'র দরিয়াবিবি বাংলার নিম্নবিত্ত ঘরের মা। সব মা শওকত ওসমানের সাহিত্যভাবনায় গভীরভাবে মানবতাবাদী সাধনার মন্ত্রপূত। এই সূত্র ধরে নিম্নবিত্ত মানুষের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধ সর্বক্ষেত্রে গুরুত্ব পেয়েছে। তাঁর সাহিত্যে সাহিত্যিক আদর্শরূপে সমাজবাস্তবতাই অধিক পরিমাণে গৃহীত ও অনুমোদিত শিল্পাকৃতি রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

৩.২

জননী উপন্যাসের কাহিনি নির্মিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মহেশডাঙ্গা নামক এক গ্রামীণ জনপদের দরিদ্র কৃষক পরিবারের দিনযাপনের চিরাচরিত আবর্তনের মধ্যে দিয়ে। এই পরিবারের পুরুষ সদস্য আজহার খাঁ, তার স্ত্রী দরিয়াবিবি; সন্তানদের নিয়ে নিরালম্ব জীবনের নিয়ত সংগ্রাম-সংক্ষুব্ধতা এখানে মূল উপজীব্য। সংসারের বাতাবরণে আজহার খাঁ অপেক্ষা দরিয়াবিবির সংকট, সংগ্রাম বহুমুখী। সন্তানদের অন্ন-বস্ত্রের মতো মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে দরিয়াবিবিকে মনোযোগী হতে হয়েছে পশুপাখি পোষাসহ অন্যান্য কাজে। স্বামী-সন্তানসহ প্রতিদিনের টিকে থাকার যুদ্ধে বারবার অবতীর্ণ হয়েছে ক্লান্ত সৈনিক রূপে। প্রতিদিনের দিনযাপনে স্বামীর নির্বুদ্ধিতা তাকে যাতনা দিয়েছে ; তাকে ভুলে নতুন দিনের কর্মপ্রেরণায় পথ চলেছে দরিয়াবিবি। এই পথচলা কখনো ভাসিয়ে নিয়েছে দীর্ণতায়, কখনো মহীয়ান করেছে আত্মমর্যাদায়। ‘জননী চরিত্র প্রধান উপন্যাস’ (অনীক, ১৯৯৫ : ৬৮)। প্রধান চরিত্র দরিয়াবিবি, দারয়াবিবির মাতৃত্ব। ঔপন্যাসিকের জীবনদৃষ্টির দ্বিধার কারণে উপন্যাসের প্রথমার্ধে চরিত্র মুখ্য হয়ে উঠতে পারেনি। বরং মনে হয় দারিদ্র্যের রূপায়ণই লেখকের মূল উদ্দেশ্য হয়েছিল। দ্বিতীয়ার্ধের অবশ্য দরিয়াবিবি চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্ব ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে পরিণামের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে এগিয়ে চলেছে। এর মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে দরিয়া চরিত্রের নির্মেদ প্রতিফলন আর মাতৃত্বের সংগ্রাম। দরিয়াবিবির জীবনের মূল কাহিনি আজহার খাঁকে কেন্দ্র করেই নয়, তার বাইরেও ছিল তার আর একটি সত্তা; যে জীবনকে সে ফেলে এসেছিল দূর অতীতে। যেখানে আছে প্রথম দাম্পত্যের স্মৃতি সৌরভের আঁধার; বাৎসল্যের ছায়ায় ঘেরা প্রথম মাতৃত্বের অভুক্ত স্বাদ। মোনাদিরের মা দরিয়াবিবি একজন নারী, যার জীবন শতদীর্ণতায় জরাজীর্ণ। প্রথম সংসার-জীবন ছিল মোনাদিরের বাবার সঙ্গে, সেখানে সে ছিল অবস্থাপূর্ণ কৃষি পরিবারের পুত্রবধূ। একান্নবর্তী সংসারের কাজ ছিল সব সময়, কিন্তু ভাতের কষ্ট ছিল না। স্বপ্নাতুর চোখ ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর ছিল সে। ‘বড় হোক, ছেলেকে আমি শহরে পাঠাবো লেখাপড়া শিখতে। মানুষ হোক, আর কিছু চাইনে। আল্লাহর কাছে দিনরাত দোয়া মাগি।..তিন বছরের শিশুকে লইয়া এত কল্পনা’। (শওকত, ২০১১ : ৫৩) প্রথম জীবনের এই সুখস্বপ্ন দরিয়াবিবির জীবনে বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। স্বামী, সন্তান নিয়ে সুখস্বপ্নের আদরে দিন কেটে গিয়েছিল। দুঃস্বপ্নের হঠাৎ অভিঘাতে সব ভেঙে পড়ে :

> স্বামীর কণ্ঠ অন্ধকারে এখনো বাজে। সে-ই শেষ রাত্রি। পরদিন সে গঞ্জে গিয়াছিল। পথে সর্প-দংশন। বাড়ি পৌছাইবার পূর্বেই গ্রামের হাটতলায় তার শেষ নিশ্বাস পড়িয়াছিল।... যৌথ সম্পত্তি বণ্টন হইতেছে ভাইয়ে ভাইয়ে। কিন্তু কানাকড়ির অধিকার নাই তার। স্বামীর পিতার কোলে ইন্তেকাল করিয়াছেন। শরিয়ৎ মত শ্বশুরের সম্পত্তির উপর তার বা মোনাদিরের কোন অধিকার নাই। স্বামীর অন্যান্য ভাইদের নিকট দরিয়াবিবি শেষ আবেদন জানাইয়াছিল, মোনাদিরের ভরণপোষণ কিরূপে নির্বাহ হইবে। কর্ণপাত করে নাই তারা। দরিয়াবিবির মরহুম শ্বশুরের অজ্ঞতার উপর হাজার লাসৎ বর্ষণ করিয়াছিল। তিনি জীবিত অবস্থায় এই বণ্টন-ব্যবস্থা করিয়া গেলে পথের ভিখারিনী হইত না সে। (শওকত, ২০১১ : ৫৩-৫৪)

জীবনের প্রথম আঘাত তাকে আহত করলেও করেনি বিমূঢ়। অল্প বয়সে স্বামীর মৃত্যু, সন্তানের উত্তরাধিকারের সম্পত্তি বেদখল, সমস্ত অন্যায়ের পরও সে থেমে থাকেনি; আত্মপ্রত্যায়ী নারী হয়ে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়িয়েছে, নতুন করে শুরু করেছে নিজের জীবনকে। আইন ও ধর্মের যে সামাজিক ছিদ্র তাকে নির্বিবাদে মেনে নেয়নি সে; প্রতিবাদ জানিয়েছে : 'ওসব হাদিস কালাম আমার কাছে শোনাতে এসো না। মানুষকে পথের ভিখিরি করতে আল্লা বলে দিয়েছে?'(শওকত, ২০১১ : ৫৪)। সমস্ত অধিকার হারিয়ে নিজের সংসারের দাসত্ব করার জীবনকে মানতে পারেনি দরিয়াবিবি। একবস্ত্রে সেই সংসার ত্যাগ করে এসেছে, তবু নিজেকে নির্ভার করতে পারেনি সে। কারণ মাতৃত্বের জ্বালা-যন্ত্রণা সমস্তই নারীর, কিন্তু সেই সন্তানের প্রতি আইনগত অধিকার নারীর নেই। দরিয়াবিবি সমস্ত অন্ধকারকে অতিক্রম করেছে, নতুন আশায় বুক বেঁধেছে, নতুন জীবনের পথে। ভুলে যায়নি তার অতীতকে, ফেলে আসা নাড়ির টানকে। পৈশাচিক স্বার্থোন্মত্ততার তিক্ততায় অন্তর্জগতের রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়নি তার। তবু জীবনকে বয়ে নিয়ে চলতে হয়েছে তাকে, দাসত্বের আবরণে নয়; আত্মমর্যাদায় মাথা উঁচু করে বাঁচতে শিখেছে দরিয়াবিবি।

৩.৩

দরিয়াবিবির বর্তমান জীবনে স্বামী আজহার খাঁ ও দুই সন্তান নিয়ে পরিপূর্ণ জীবন। দরিয়াবিবির জীবনে বৈচিত্র্যময় নানা বৈশিষ্ট্যের সম্মেলন ঘটেছে। সে একজন দৃঢ়চেতা নারী। তার চরিত্রের এই দৃঢ়চিত্ততা কোনো শিক্ষা বা আদর্শ দ্বারা অর্জিত নয়। তার অনেকখানিই প্রকৃতিগত বা ভূমিজ বৈশিষ্ট্য দ্বারা নির্মিত। তার আত্মমর্যাদার প্রথম পরিচয় দেখা যায় আসেকজানে দেয়া জাকাতের শাড়ি গ্রহণ প্রসঙ্গে :

> খবরদার এমন কথা মুখে আনবে না। বের করে ফেলে দেব আমার ঘর থেকে। তোমার জাকাতের মাথায় সাত পয়জার।...যারা জাকাত নেয় তারা আর মানুষ থাকে না। জানোয়ার হইনি এখনও। আল্লা আমার হাত-পা দিয়েছে। (শওকত, ২০১১ : ৩০)

এই ইস্পাত-কাঠিন্য আত্মসম্মানবোধ তাকে অন্য সব চরিত্র থেকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। ঔপনিবেশিক সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থায় নিম্নবিত্তের জীবন প্রতিদিনের ক্ষুৎমার্গিতায় ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাওয়া জীবনের সে এক জীবন্তসত্তা। অভাব দরিয়াবিবির জীবনের নিত্যসঙ্গী হয়েছে। অস্তিত্ববিনাশী দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে দরিয়াবিবি সংগ্রাম চালিয়েছে সর্বশক্তি দিয়ে। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় তা নিম্নরূপ:

> উঠানের উপর রান্না-শালা। উপরে কোন খড়ের ছাউনী নাই। কয়েকটি বাঁশের খুঁটি ও কঞ্চির ছায়ারেখা আগুনের ঝলকে মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। আর একটি রান্না-শালা আছে উঠানের দক্ষিণে গ্রীষ্মের দিনে কুঁড়েঘরের ভেতরে রান্নার কাজ কষ্টকর। আজহার খাঁ তাই দরিয়াবিবির জন্যে উঠানের উপর চালহীন রান্না-শালা তৈরী করিয়াছিল। কয়েকদিন আগেকার ঝড়ে তালপাতা উড়িয়া গিয়াছে। শুধু চালার ফ্রেমটি এখন অবশিষ্ট। (শওকত, ২০১১ : ২৫)

দারিদ্র্যপূর্ণ সংসারের এই পরিসর দরিয়াবিবির প্রতিদিনের জীবনচিত্র। কারণ ক্ষুধার যাতনায় কাতর সন্তান ভাত চায় মায়ের কাছে, বাবার কাছে নয়। অসুস্থ সন্তানকে বুকে নিয়ে বিনিদ্র রজনী পার করতে হয় মাকে। দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে নিষ্কৃতি পেতে আজহার খাঁ মাঝে মাঝে সংসার থেকে দূরে গিয়ে প্রতিদিনের ক্লান্তি ভুলে থাকতে পারেন। মা রূপে দরিয়াবিবির কোনো নিষ্কৃতি নেই। এত কৃচ্ছ্রতাসাধনের মধ্যে মাতৃত্বের অপরিমেয় সুধায় তার কোনো -ক্লান্তি নেই-

> চুলায় জ্বাল দিতে দিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল দরিয়াবিবি। মাস চার পরে নূতন সন্তানের জননী শিরোপা মিলিবে। এই চিন্তা বারবার পীড়া দিতেছিল তাকে। স্ফীত জঠর লইয়া পরিশ্রমের কামাই নাই। দারিদ্র্যের গৃহে ইহারা কেন ভিড় করিতে আসে । (শওকত, ২০১১ : ১০৭)

দরিয়ার ব্যক্তিত্বে মাতৃত্বের আখ্যানপ্রধান আলেখ্য নির্মাণ করলেও দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে যে জীবন ঘূর্ণায়মান, তাকে অস্বীকার করা যায় না। মাতৃত্বের মাহাত্ম্যের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসে জায়গা দখল করেছে দারিদ্র্যের বিকলাঙ্গতা। দীর্ঘদিন পরে ফেলে আসা নাড়ির টান মোনাদিরের আগমন তার জীবনকে দ্বিমুখী স্রোতে ভাসিয়েছে। নিষ্প্রাণ লৌহকাঠিন্যময় জীবনের তপ্ত প্রহরে আগমন ঘটেছে মোনাদিরের :

> বিস্মৃতির তিমির কে যেন এক নিমেষে মুছিয়া দিল। মোনাদি, আমার মুনি! অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে কয়েকটি কথা আধস্পষ্ট গুঞ্জরিত শুধু হয় নাই। সেইখানে বালকটিকে গভীরে বুকে বাঁধিয়া অকস্মাৎ বসিয়া পড়িল দরিয়াবিবি। তারপর শুরু হইল অঝোর আঁখির উৎসমুখের প্রস্তর-বিদারণ। (শওকত, ২০১১ : ১০৭)

জীবনের প্রবল পক্ষাঘাতে যাকে একদিন ফেলে আসতে হয়েছিল; তার আগমন দরিয়ার জীবনে নতুন উদ্দীপনার জন্ম দিয়েছে। তার কর্মক্লান্ত দুঃখদীর্ণ জীবনের সমস্ত অভিশাপকে পেছনে ফেলে নতুনের

টানে সে ছুটে চলেছে সামনে। এ-প্রসঙ্গে মহাভারতের কর্ণ-কুন্তি সংবাদের ক্ষীণ আলোকরেখা অনুভব করা যায়। যে মাতৃত্বকে একদিন ভয় আর শঙ্কায় দূরে ঠেলে দিয়েছিল; সেই মাতৃত্বকে সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে আলোকিত করার সাধ জাগে দরিয়ার। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে আজহার খাঁ ব্যক্তি হিসেবে প্রবল দায়িত্ববান না হলেও একজন মানবিক মানুষ। মোনাদিরকে সে-ও সন্তানস্নেহে আপন করে নিয়েছিল; কিন্তু শত জীর্ণতায় ভরা জীবনে কখন অসতর্কতায় কোন ভুলে সাজানো বাগান ভেসে যায় তা বলা কঠিন।

৩.৪

পরিবার হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সংগঠন, যার সাথে গোটা সমাজের অপরিহার্য উপাদানসমূহ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত (ছন্দশ্রী, ২০০৯ : ৯৩)। দরিয়বিবির মাতৃত্বের ফল্গুধারা পরিবার কাঠামোর অন্তর্সত্তায় বেড়ে উঠেছে, বিকশিত হয়েছে। সেখানে আজহার খাঁর উপিস্থিতি সুনিবিড় হলেও সহযোদ্ধার নয়। মা হয়ে সন্তানদের প্রতিদিনের মৌল প্রয়োজন নিবারণ করতে দরিয়াবিবি অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে। দারিদ্র্য আর ক্ষুধার জ্বালায় দিশেহারা দরিয়া তার সমুদয় সম্বল বিসর্জন দিয়েছে। বিয়ের সময় বাবার দেয়া পিতলের ঘড়া বন্ধক রেখেছে :

> দরিয়াবিবি লজ্জায় মুখ নিচু করে। ঘড়া প্রসঙ্গে তার মর্যাদা কোথায় যেন আহত হইয়াছে।... শৈরমী আড়াল হইলে দরিয়াবিবি ঝরঝর কাঁদিয়া ফেলিল। চোখের পানি স্বতই রোধ মানে না। প্রাঙ্গণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আবার তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ফেলিল দরিয়াবিবি। (শওকত, ২০১১ : ৯০)

কৃষকবধূ দরিয়াবিবি অভাব আর অসহয়তার মধ্যে ঘড়া বন্ধক দেয়ার পাঁচ টাকা দিয়ে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে নতুন করে অবতীর্ণ হয়েছে। সংসার নামক এই জাঁতাকলে নারীর প্রবেশের পথ থাকলেও বের হওয়ার পথ নেই। আজহার খাঁরা সংসার থেকে ছুটি নিতে পারে, দরিয়াবিবিরা পারে না। দরিয়াবিবি গ্রামীণ নিম্নবিত্তের নারী হলে তার চরিত্রের কতকগুলো উজ্জ্বল মৌলিক দিক আছে। যেসব গুণাবলি অন্যদের থেকে তাকে স্বাতন্ত্র্যে প্রতিভাসিত করেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার চরিত্রে রুঢ়তার আধিক্য হলে, ধর্মীয় সংস্কারমুক্ত মননশীলতা তার মধ্যে অধিক পরিমাণে পরিদৃষ্ট। খালাশাশুড়ি আসেকজানের সঙ্গে বিভিন্ন কারণে বিরূপ মনোভাব ব্যক্ত করলেও অন্য ধর্মের নিম্নবর্ণের নারী শৈরমীর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সহৃদয়তা লক্ষযোগ্য। শৈরমী অসুস্থ হলে গভীর রাতে ছুটে গিয়েছে তার শয্যাপাশে। শৈরমীর মৃত্যুতেও দরিয়াবিবি ভেঙে পড়েছে কান্নায়। কারণ গ্রামীণ পরিবেশের সংকীর্ণ পরিসীমায় এমন নিঃস্বার্থ বন্ধু সে আর পায়নি। আর সে কথা স্মরণে রেখেই পরবর্তী সন্তানের নামকরণে শৈরমীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে। ''শরী'– মৃত শৈরমীর কথা স্মরণ করেই এভাবে

জাতিধর্মের ব্যবধান অবলুপ্ত হয়েছে মানবতার মহিমার কাছে।' (ছন্দশ্রী, ২০০৯ : ৯৯) এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা আবশ্যক, নারীর সমস্যা আর একজন নারী যেভাবে অনুধাবন করতে পারে পুরুষ তা কখনই পারে না। দরিয়াবিবির সঙ্গে বাগদী নারী শৈরমী ধর্ম, বর্ণনির্বিশেষে যে নিঃস্বার্থ মানবিক বন্ধুত্ব, সেখানে তার সংস্কারমুক্ত মানবিক মনের প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

৩.৫

যে সম্মান নিয়ে বাঁচার জন্য দরিয়াবিবি একদিন ছেড়েছিল প্রথম স্বামীর সংসার, দারিদ্র্যের সীমাহীন নিস্পেষণ তার সেই আত্মমর্যাদাকে পথের ধুলায় লুটিয়ে দিল। সেই দরিয়াবিবিকে অর্থের কারণে ইয়াকুবের অকাতর দানকে দুহাত ভরে গ্রহণ করতে হয়েছে। স্বামীর অপারগতা কোনো কোনো সময় তাকে বাধ্য করেছে; তবে সবচেয়ে বেশি নিরুপায় হয়েছিল প্রথম সন্তান মোনাদিরের জন্য। দরিয়া চরিত্রের এই অশৌচতাকে আবুল ফজল এভাবে বর্ণনা করেছেন : 'খাবারের অভাবে ছেলে মেয়ের ম্লান মুখ, আরো হাজারো অভাবের তাড়না পাষাণকেও গলিয়ে দিতে পারে। দরিয়াবিবি ত মানুষ ও মা। সেও গলেছে অনেকটা তার অলক্ষ্যে।' (উদ্ধৃত, অনীক, ১৯৯৫ : ৭৩) নারী জীবনের সবচেয়ে দুর্বলতা তার মাতৃত্বে। সমাজ-সভ্যতা-সংসার নারীর এই সৃজনশীলতাকে সব সময় শোষণের পথ হিসেবে গ্রহণ করেছে। মাতৃত্বের অমৃতধারা যেমন নারীর জীবনকে ফুল ও ফসলে সুষমামণ্ডিত করেছে; তেমনি সমৃদ্ধ করেছে সভ্যতার বেগবান ধারাকে। 'লিঙ্গ-নির্মাণের ধাঁচ পিতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রতিটি পরতে বিন্যস্ত। কারণ আমাদের অবচেতনে ঢুকে গেছে কতকগুলো স্টিরিওটাইপ বিভাজন'। (মল্লিকা, ২০২০ : ১১৮) মাতৃত্ব সেখানে এক বৃহৎ পরিসর যেখানে নারী না চাইলেও ঐ পরিসেবার আওতায় তাকে আসতেই হবে। কারণ যে নারী সন্তান জন্মদানে অক্ষম, সমাজ-সংসারে তার অবস্থান আরো হীন। উপন্যাসের শুরু থেকে দরিয়ার মধ্যে স্বাধীন ব্যক্তিত্বের যে নারীকে পাওয়া যায়, তাকে তবৈচ অবস্থায় নিমজ্জিত মোনাদিরের শিক্ষাব্যয়ের আবদার। দরিয়ার প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের চরম পরাজয় হলেও, স্থির থেকে পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করতে হয়েছে তাকে :

> দরিয়াবিবি হঠাৎ অনুভব করে, কার যেন গভীর আলিঙ্গনে সে একদম নিপিষ্ট। চোখ খুলিয়া দেখিল ইয়াকুব। .... নিস্তেজ নিথরতায় দরিয়া বিবি চুপ করিয়া রহিল। আর সে চোখ খুলিল না। সে যেন অন্ধ হইয়া গিয়াছে। সমস্ত পৃথিবী তার নিকট নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারে আবৃত। বাহিরে পুত্র-হারা ঘুঘু জননী একমনে শুধু ডাকিয়া খুন হইতে লাগিল। (শওকত, ২০১১ : ১৯০)

দরিয়াবিবি সারা জীবনের সংগ্রামের অর্জন মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে যায়। সমাজে নারীর একমাত্র পরিচয় সে নারী, সে ভোগ্য বস্তু, সেই পথের দুয়ারে জীবন তাকে পৌঁছে দিল। 'হন্তারক দুপুর' দরিয়াবিবি

গৌরবান্বিত জীবনকে কালিমায় লেহন স্থাণুতে পরিণত করল। এই ঘটনার আকস্মিকতায় নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করলে সমূহ বিপর্যয়কে অতিক্রম করতে পারেনি সে। সমাজ নির্ধারিত প্রচলিত সতীত্বের ধারণায় আঘাত হানলেও পুরোপুরি ভেঙে পড়েনি দরিয়াবিবি। পরিস্থিতির বিমূঢ়তায় সে নিয়ন্ত্রণহীন হয়েছে তবে আত্মজ্ঞান বিলুপ্ত হয়নি। দরিয়াবিবির এই পরিণতিকে কোনো কোনো সমালোচক বলেছেন :

> যদিও আমরা প্রথমদিকে দেখি দরিয়া ইয়াকুবের দেওয়া জিনিসপত্র গ্রহণ করে না সহজে। ফেলে দেয় তরকারি। কিন্তু সেটি তো ছিল প্রথমদিকের ব্যাপার। পরে স্বামীর অবর্তমানে সন্তান-সংসারের দায়ে ইয়াকুবের উপরই নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ইয়াকুবের দানে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা পড়ে দরিয়াবিবি। এই ঋণ থেকে মুক্তির দায় অনুভব করে দরিয়াবিবি। তার চরিত্রের সমস্ত দৃঢ়তা, পবিত্রতা খেয়ে ফেলে ইয়াকুবের ঋণ। নারীত্বের অনুভূতি কি জাগেনি স্বামীহীনা দরিয়াবিবির মনে? দরিয়াবিবির প্রশ্রয়ী দৃষ্টি ইয়াকুবকে সাহসী করে তুলেছিল। (ভুঁইয়া, ২০১২ : ২৯৯)

সমালোচকের এই মন্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহমত পোষণ না করে বলা যায়, সংসারের অভাব, দারিদ্র্যের দাবানল তাকে হয়তো বিধ্বস্ত করে তুলেছিল। বাৎসল্যের অনুপ্রেরণায় সন্তানদের পেটে দুমুঠো অন্ন দেওয়ার লোভ হয়তো তাকে লোভাতুর করে তুলেছিল; তার এমন পরিণতি সে আশা করেনি। নিম্নবিত্তের, নিরক্ষর গ্রামীণ নারী পুরুষের অন্তর্লীন লালসাকে বুঝতে পারলেও প্রতিহত করতে পারেনি। দরিয়াবিবির এই অবনতি বা সহিষ্ণুতা মাতৃত্বের অক্ষমতাকে অবলোকন করার জন্য। অবুঝ কিশোর মোনাদির বোঝে না মা শুধু স্নেহের ভাণ্ড হতে পারে; আর্থিক অক্ষমতা মার কোনো দিন ঘোচে না। স্বামীহীন, স্বজনহীন এই নারীর অসহায়তাকে গ্রাস করেছিল কামুক ইয়াকুব। তীরবিদ্ধ দরিয়া যেদিকে নিঃশ্বাস নিতে চেয়েছে, সেদিক থেকেই আহত হয়েছে।

৩.৬

পুরুষশাসিত সমাজ নারীকে কখনো মানুষ হয়ে বাঁচার অধিকার দেয় না। এ প্রসঙ্গে বানার্ডশর একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য। তিনি নারীর উদ্দেশে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, 'ধর্ষণ যদি অনিবার্য হয় তো উপভোগ করুন।' এরকম উদাহরণ অজস্র রয়েছে, যেখানে যারা ধর্ষণ করতে চায় বা বঞ্চনা করতে চায়; তারা বিভিন্নভাবে এর নৈতিক সমর্থন খোঁজে (মল্লিকা, ২০২০ : ৯০)। নারী সবসমাজে, সবসময়ে বঞ্চিত হয়ে এসেছে এভাবে। সেই বঞ্চনার পথ বিভিন্ন রূপে, নারীর জীবনে এসেছে। তার কিছু কিছু দিক সার্বজনীনতার দিকসমূহ স্থান পেয়েছে সাহিত্যের পাতায়। দরিয়াবিবি তেমনি একজন নারী, বিভিন্ন ঘটনার উপাধ্যায়ে তার জীবন পূর্ণ হয়ে রয়েছে। নিম্নবর্গের দীনতাপূর্ণ জীবনে সুখ-

সমৃদ্ধিময় ঘটনা অপেক্ষা; অসুখ আর অসহায়তার ঘটনা বেশি ঘটে থাকে। গ্রামীণ জীবনভিত্তিক উপন্যাসের পটভূমিতে পারিবারিক জীবনে মানুষে মানুষে সম্পর্কের নিবিড়তা থাকে। তারপর যদি আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে, তখন তাকে সহ্য করা অনেকটা কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। সংসারের অভাব, মাতৃত্বের অসহায়তা তাকে এই দান গ্রহণে বাধ্য করলেও তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কের কোনো ইচ্ছা বা আগ্রহ তার ছিল না। গ্রামীণ নিম্নবিত্তের অসহায় নারী হিসেবে তার চিন্তা শক্তিতে কাজ করেছে ধনী অসুখী মানুষ; একটু সেবাশুশ্রূষা ও স্নেহ-মমতার জন্য এখানে আসে এবং দরিদ্র আত্মীয়কে সহযোগিতা করে। পুরুষের মনের দুরভিসন্ধিমূলক কামুকতাকে অনুধাবন করা এবং সেই অনুযায়ী সন্তর্পণে চলা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। বৈরী সমাজব্যবস্থাই দরিয়াবিবির জীবনের এই পরিণতিকে সম্ভবপর করে তুলেছে।

৩.৭

জননী উপন্যাসে জননীরূপ দরিয়াবিবি ছাড়াও রয়েছে আরো অনেক নারী চরিত্রের সমাগম। তার মধ্যে আসেকজান সর্বাপেক্ষা অসহায় এক বৃদ্ধা নারী। স্বামী সন্তানহীন নিঃসঙ্গ জীবনের দরিয়াবিবির নিকট বোঝাস্বরূপ। যদিও তার অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান হয় গ্রামের ধনী পরিবারের যাকাত ও দানের অর্থে। দরিয়াবিবির অভাবের সংসারে তার স্বল্প সামর্থ্যে সহযোগিতা করার বাসনা ব্যক্ত করলেও দরিয়াবিবি তড়িত গতিতে তা প্রত্যাখ্যান করেছে। তাদের আশ্রিতা হয়ে, কোনোভাবে সহযোগিতা করতে পারলে সে অনেক আনন্দিত হয়েছে। দরিয়াবিবির ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তার কাছে তা কখনো প্রশ্রয় পায়নি :

> তোমার কাপড়ের টানাটানি। দুটো কাপড় পেয়েছিলাম। আসেকজান তারপর আঁচল-ঢাকা কাপড় বাহির করিয়া বলিল, দুটো কাপড় তুমিই পর। আমার যা আছে চলে যাবে।... আমি নেব জাকাতের কাপড়? আমার স্বামী বেঁচে নেই? ছেলে নেই? মুখে তোমার আটকালো না? লাথি দিয়া একজোড়া কাপড় দরিয়াবিবি দাওয়ার নিচে ফেলিয়া দিল। (শওকত, ২০১১ : ৪৭)

অসহায় বৃদ্ধা অন্তরে আঘাত পেলেও মুখে কিছুই প্রকাশ করলেন না। জীবনের তিনকূল পেরিয়ে এক কূলে এসে এই নারী নিঃসঙ্গতার চূড়ান্তসীমায়। মৃত্যুও অপেক্ষায় দিন কাটানো ছাড়া তার আর কিছুই করার থাকে না। দরিয়াবিবিরি আশ্রিতা হওয়ায় তার ভালো আচরণ যেমন তাকে আনন্দিত করে। খারাপ আচরণ ব্যথিত করলেও সে নির্বিবাদে তা মেনে নিয়েছে :

> শনের মতো শাদা চুল সম্মুখ-পেছনে লুটাইয়া পড়িয়াছে। ফোঁপানির শব্দ উঠিল। কাঁদিতেছে বৃদ্ধা আসেকজান? দরিয়া বিবি সেই দিকে চাহিয়া রহিল। দারিদ্র্যের নারী-প্রতীক যেন ওই গৃহকোণে আশ্রয়

লইয়াছে। আল্লাহর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের জীবন। এই তার পরিণতি! দরিয়া বিবি অসোয়াস্তি অনুভব করে। দারিদ্র্যের দাবানলে সংগ্রাম-বিক্ষুব্ধ জীবনের সমগ্র ঐশ্বর্যসম্পদ ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। (শওকত, ২০১১ : ৪৮)

নারীর জীবন সব সময় নিরাপত্তাহীনতা আর অসহায়তার মধ্য দিয়ে কাটে। বৃদ্ধ বয়সে তা আরো বেশি প্রকটিত হয়েছে। উপন্যাসে আসেকজান বিবির দুঃখ-দুর্দশা সম্বলিত অবস্থা আমাদেরকে *পথের পাঁচালী* উপন্যাসের ইন্দির ঠাকুরণ চরিত্রের সঙ্গে তুলনীয়। স্বজনহীন সংসারে অন্যের আশ্রিতা নারীর জীবনযন্ত্রণা সমাজ-সংসারে তাদের অবস্থানকে স্পষ্ট করেছে। এভাবে যুগে যুগে নারী শোষিত বঞ্চিত হয়ে চরম নিঃস্বতার মধ্য দিয়ে জীবনের এই পথকে অতিক্রম করে চলেছে।

৩.৯

এছাড়া আমিরন চাচি, হাসু বৌ, এলোকেশী, চন্দ্রমণি-সবার জীবন একই স্রোতে বয়ে চলা নারী জীবনের অবিরাম প্রবাহ। এর মধ্যে হলো অন্যতম শৈরমী; বাগদী এই নারী দরিয়াবিবির কাছের মানুষ। বিপদে আপদে তার সহযোগিতা দরিয়াবিবিকে উদ্ধার করেছে। বিশেষত আজহার খাঁ যখন সংসার বিমুখ হয়ে এখানে ওখানে চলে যায়, তখন তার সেই দারিদ্র্যে ভরা দুরন্ত দিনে বিভিন্নভাবে তার পাশে দাঁড়িয়েছে। বিশেষত একান্ত বাধ্য হয়ে যখন সে ঘড়া বন্ধক রেখেছে, শৈরমী তার হয়ে সাহায্য করেছে।

৪.

বিভাগোত্তর বাংলাদেশের সাহিত্যের বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক সরদার জয়েনউদ্‌দীন (১৯১৮-১৯৮৬)। তাঁর আবির্ভাব বিভাগোত্তর সময়ে হলেও মানসগঠনের প্রস্তুতি হয়েছিল বিভাগ পূর্বকালেই। পর পর ঘটে যাওয়া দুটি বিশ্বযুদ্ধ বৈশ্বিক-সামাজিক-সংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আবহকে নানামুখী পরিবর্তনে ভর করেছিল। জীবনের প্রবাহ দ্রুত থেকে দ্রুততম সময়ে পাল্টে গিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগসহ নানান বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা বিক্ষুব্ধ করেছিল বাঙালির মননশীলতাকে। এই অস্থিরতা-সংশয়-জিজ্ঞাসা-হতাশা যুদ্ধোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যের মৌল বিষয় হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিল। এই কালখণ্ডে যাঁরা আবির্ভূত হয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যে, তাঁদের রচনায় বিনাশী যুগধর্মের প্রভাব প্রকট আকারে দেখা দিয়েছিল (বিশ্বজিৎ, ২০০২ : ১৪৮)। বিভাগোত্তর বাংলাদেশের উপন্যাসে গুরুত্ব পেয়েছিল পূর্ব বাংলার গ্রামীণ জীবন। সরদার জয়েনউদ্‌দীনের কথাসাহিত্যেও তার প্রবহমানতার ধারা লক্ষ করা যায়।

৪.১

সরদার জয়েনউদ্‌দীনের দ্বিতীয় উপন্যাস *পান্নামোতি* (১৩৬৫ব.)। ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদী শোষণের মধ্যে দাই সম্প্রদায়ের অন্ত্যজ একটি পরিবারের প্রতি ভোগলিপ্সুতার সার্বিক কৌশলসমূহ বর্ণিত হয়েছে উপন্যাসটিতে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের লোলুপতার মধ্যে অন্ত্যজ এই সম্প্রদায়ের নারীরা বংশপরম্পরায় শোষিত হয়ে আসছে। সামন্ততন্ত্রের কলঙ্কিত অধ্যায় নারী-বিলাস; সেই ভোগবাদের ফসল যে জারজ সন্তান, তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার সংগ্রামও উপন্যাসের মূল বিষয়। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ভাঙনের মধ্যে ধরা দিয়েছে নতুন প্রজন্মের নর-নারীর জাগ্রত সত্তা। উপন্যাসের কাহিনির আলোকে দাই সম্প্রদায়ের নারী অমৃত দাই ও তার দুই সন্তান বিশু আর পান্নাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে উপন্যাসের কাহিনি। বিশু আর পান্না মাতৃত্বের পরিচয়ে অমৃতের গর্ভজাত হলেও তাদের পিতৃত্বের পরিচয় লুকিয়ে আছে জমিদার শক্তিপদ চৌধুরীর মধ্যে। যদিও অমৃতের সামাজিক বিয়ে সম্পন্ন হয়েছিল খোঁড়া লালনের সঙ্গে। খোঁড়া লালন সামাজিক পরিচয়ে পিতা হিসেবে থাকলেও তাদের প্রকৃত পিতৃপরিচয় সে নয়। পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরে বিরাজমান বর্ণপ্রথা হিন্দু সমাজের মতো প্রকট না হলেও তার প্রচলন ছিল সর্বার্থেই। প্রাচীনকাল থেকে সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন পেশার মতো দাই সম্প্রদায় একটি বৃত্তিনির্ভর শ্রেণি। দাই শব্দটি সংস্কৃত ধাই শব্দ থেকে এসেছে। সংস্কৃত ধাই অর্থ দুধ-মাতা। পূর্ববঙ্গে ধাই হলো ধাত্রী। ধাত্রীরা সাধারণত মুসলমান। ধাত্রী পেশার ধারকবাহক সাধারণত নারী হয়। ধাই শব্দ আবার বিবর্তনের মাধ্যমে দাই নামে ব্যবহৃত হয়েছে। সন্তান প্রসবের সমস্ত প্রক্রিয়ার সঙ্গে এরা জড়িত থাকে। দাইয়ের কাজ হলো, প্রসববেদনা দেখা দিলে প্রসব-প্রক্রিয়া সহজ করার জন্য যত কৌশল আপ্ত করা ও তার যথাযথ প্রয়োগ ঘটানো। (মুনতাসীর, ২০১৪ : ৮৩)। শিক্ষার আলো বঞ্চিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাংলার নারীদের সন্তান জন্মদানের একমাত্র আস্থার জায়গা দাই। মানবসভ্যতার ধারাকে পৃথিবীর আলোয় আলোকিত করতে তাদের ভূমিকা অসামান্য হলেও সামাজিক সম্মানের দিক থেকে তাদের অবস্থান একেবারে নিম্নবর্তী।

৪.২

পান্নামোতি উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্র পান্না। তার নামে উপন্যাসের নামকরণ। পান্না অমৃত দাইয়ের কন্যা। চন্দনপুরের জমিদার শক্তিপদ চৌধুরীর আশ্রয়-প্রশ্রয়ে তাদের জীবন এবং তার মায়ের জীবিকা। দাই পেশা হিসেবে মানবিক ও সেবাদায়িনী হলেও সমাজের কাছে তারা অস্পৃশ্য। সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে চন্দনপুরের জমিদার, এই পরিবারের নারীদের ভোগ করেছে এবং নামমাত্র বিয়ে দিয়ে তাদের আশ্রিতা করে রেখেছে। সময়ের বিবর্তনে সম্প্রদায়গত এই পেশার ছায়া গ্রাস

করেছে পান্নার জীবনকে। পান্না বিশ শতকের নারী, গ্রামের স্কুল থেকে বৃত্তি নিয়ে পাস করেছে সে। স্কুলের শিক্ষা শেষ করার পরও পাঠ অভ্যাস রয়ে গিয়েছিল তার। শিক্ষার আলো তার জীবনের অন্ধকার দিক সম্পর্কে তাকে সতর্ক করে আলোর পথকে করেছে প্রসারিত। সমাজের কাছে তার যে পরিচয়, তার কোনোটিই তাকে নির্মল জীবন দিতে পারে না। এই কলঙ্কিত অধ্যায়ের বিনাশই পান্না ও তার ভাইয়ের একমাত্র চিন্তা :

> পান্নাকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে আবেগজড়িত কণ্ঠে বিশু বললো,... তোকে বিয়ে দেব, তুই সংসার করবি, আমাদের বংশে আর জারজ সন্তান জন্মাবে না। জারজ সন্তানের যে কি দুঃখ, জীবনে কি বিড়ম্বনা তা তুইও যেমন বুঝিস আমিও তেমনি বুঝি। মুখের দিকে তাকিয়ে সবাই হাসে, ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়। বড় দুঃখরে মানুষ হয়ে জন্মের মানুষের জাত পেলাম না।...কিন্তু কে আসবে এই জারজ মেয়েটাকে ঘরে নিতে? (সরদার, ১৩৬৫ব. : ৮৬)

সামন্তপ্রথার ভাঙনের মুখে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উন্মেষ ও এই উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ অন্বিষ্ট। উপন্যাসের প্রেক্ষাপট নির্মিত হয়েছে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এই ত্রিমাত্রিক সম্পর্কের পুনর্মূল্যায়নের পথে। সমাজকে নিখুঁতরূপে নিরূপণের মধ্যে আছে লেখকের সচেতন রাজনৈতিক প্রয়াস ও মানবিকবোধের স্ফুরণ। পান্নার ন্যায় নিম্নবর্গের নারীর জীবনযন্ত্রণাকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন লেখক। বাংলা তথা ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় নারীকে বহুযুগ ধরে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ও স্বাধীন মর্যাদার অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থায় বিরাজমান অর্থনৈতিক বৈষম্যের মধ্যেও প্রকটিত রূপে আছে লিঙ্গবৈষম্যের লেলিহান শিখা। লিঙ্গবৈষম্যের এই বিরূপতায় পান্নার মা বা তার পূর্ববর্তী প্রজন্মকে মূল্য দিতে হয়েছে। সরদার জয়েনউদ্‌দীনের মননশীলতার প্রগতিশীল ও মানবিক উদাহরণ *পান্নামোতি*। বিশ শতকের নারীজাগরণের প্রতিধ্বনি তাকে তাড়িত করেছিল; পাশাপাশি মানুষের মানবিক অধিকারের প্রতিও তিনি আস্থাশীল ছিলেন। এ প্রসঙ্গে লেখকের নিজস্ব অভিমত এমন : আমি শোষিত ও নিপীড়িতের অব্যক্ত প্রহৃত প্রতিবাদের কথা উচ্চারণ করেছি। এ কথার মধ্যে সমাজ সম্পর্কে তাঁর শৈল্পিক মানসের শ্রেয়োত্বের বোধ পরিষ্কারভাবে ধরা পড়েছে (উদ্ধৃত, মহীবুল, ২০০২ : ১০৫)। পান্না নিম্নবর্গের নারী হলেও তার অন্তর্নিহিত আত্মমর্যাদাবোধ তাকে নবজন্ম দিয়েছে। জন্মপরিচয়ের এই কলঙ্ককে জীবন থেকে মোচন করার একমাত্র পথ সম্প্রদায়গত বৃত্তি এবং জমিদারের নীল রক্তের প্রতাপ থেকে দূরে থাকা।

৪.৩

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে নানা ধরনের শোষণ-বৈষম্য-বঞ্চনা বিরাজমান; সেখানে নিষ্কণ্টক জীবনের আশা করায় বৃথা। তারপর যদি হয় তা নারীর জীবন, তাহলে আরো বেশি নিরাশার ভেলায় ভাসা। পান্না আর বিশু তাদের প্রচেষ্টা অনুযায়ী কূল পেয়েছিল। গোঁড়া মুসলিম দাই পরিবারে পান্নার বিয়ে হয়েছিল মধু মোল্লার ছেলে মনিরুদ্দি মোল্লার সঙ্গে। এ প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিকের বয়ান নিম্নরূপ :

> পান্না পাল্কীতে চেপে শ্বশুর বাড়ী গেল। শিশুরা পুতুল নিয়ে খেলা করে, পুতুল বিয়ে দেয়, সে পুতুল শ্বশুর বাড়ীও যায়, পান্নাও গেল সেরকম। পুতুল কনের মুখের মত মুখে কথা নাই, একখানা বিষাদকল্প মুখ। পার্থক্য শুধু এইটুকু পান্নার শুধু দেহ মন বলে একটা চিজ আছে, সে মনে উপলব্ধির বেদনা আছে যে বেদনা তাকে অহরহ কেবলি অস্থিও করে তুলেছিল।... শ্বশুর বাড়ীর ভিটেয় পা দিতেই নতুন শাড়ীর আঁচল দিয়ে চোখের পানি মুছে নিল পান্না। তার পর কি হয় কে জানে এমনি একটা আশঙ্কা নিয়ে অদৃষ্টের দিকে চেয়ে রইলো। (সরদার,১৩৬৫ব. : ১৩২-১৩৩)

সমাজে বিবাহিত নারীর জীবন অর্গল খুলে যাওয়া অন্দরমহলের মতো। এক পরিবার থেকে আর এক পরিবারে যখন আসে নারীজীবনের দাসত্বের কদর্য চেহারা একে একে উন্মুল হতে থাকে। নারী জন্মের নামে হাজারো বদনাম, তার পর যদিও কেউ জন্মসূত্রে বদনাম সঙ্গে করে আনে, তবে তার আর কূলকিনারা থাকে না। পান্নার জন্ম যখন পঙ্কের পাঁকে তাকে রক্ষা করে কেউ নেই। যে স্বপ্নের শিখায় পান্না তার জীবনকে আলোকিত করতে চেয়েছিল; যে জন্মের অন্ধকারকে পথকে পাড়ি দিতে স্বর্গ ছেড়ে মর্ত্যের ধুলা মাখতে চেয়েছিল, তার স্বপ্ন অকালেই ঝরে গিয়েছিল। সমাজ-সংসারে নারীর অবস্থা যখন প্রচণ্ড নাজুক তখন নিম্নবর্গের এই নারীর জীবন পরিসর যে সুখকর হবে না তার আভাস লেখক পূর্বেই পাঠককে দিয়েছেন; শুধু বাকি ছিল তার সমূল উদ্‌ঘাটন। অল্প দিনের ব্যবধানে পান্নার বিভিন্ন ত্রুটি বের হতে থাকে; বিশেষ করে নামাজ পড়তে না জানা :

> যখন জানা গেল বউ নামাজ জানে না, ওজু জানে না তখন যে কি কাণ্ড। মধু মোল্লা, শুধু মধু মোল্লা কেন শাশুড়ী তক ভয়ানক নারাজ হয়ে গোস্বা হোলেন, ওমা আউছি কি কাণ্ড! এমন বে-নামাজী বউ নিয়ে ঘর করবি কি করে?...মাটির ওই একবিঘৎ জায়গা ছাড়া দৃষ্টি তার আর কোথাও নাই। সেদিক পানে নিরুপায় পান্না মার-খাওয়া হাবা- গোবা মেয়ের মত দৃষ্টি নিয়ে সজল চোখে চেয়ে থাকতো। তারপর এক সময় মনে হত ভাইগো! এ তুমি আমায় কোথায় দিয়ে গেলে? (সরদার, ১৩৫৬ব. : ১৩৬)

ধর্মাচ্ছাদিত সমাজে নামাজ না জানা গর্হিত অপরাধ, লেখাপড়া জানা মেয়ে পান্না তা হয়তো রপ্ত করে নিতে পাড়ত; সমাজ ও সামাজিক ব্যবস্থা কেউ তাকে সেই সুযোগ দেবে না। কারণ সে নারী, তারপর তার রয়েছে জন্ম দোষ। নারীর জন্য সমগ্র সমাজব্যবস্থা এক অন্ধকার গহ্বরস্বরূপ। সাহিত্যে ইতিহাসে উচ্চবর্গ নিম্নবর্গের শোষণের স্বরূপ যতটা প্রকটিত রূপে এসেছে; নারীর প্রতি ঘটে যাওয়া শোষণের বিভেদরেখা ততটা স্পষ্ট করে তাত্ত্বিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেনি। সমগ্র উপন্যাসে পান্নার যে সংগ্রাম, যে দীর্ণতা, তা উপন্যাসের কাহিনিকে পরিণতি দান করেছে। সমাজজীবনের প্রতি ক্ষেত্রে নারী নিজে কোনো অপরাধ না করেও সেই অপরাধের শাস্তি বহন করে চলে সে। প্রতিদিনের জীবনে শাশুড়ি-শ্বশুরের তীর্যক কথার বাণ, স্বামীর নিগ্রহ ও নির্লিপ্ততায় পান্নার জীবন ও জীবনবোধ দুই বিপন্ন হয়ে উঠেছিল। তবুও সে চেষ্টা করেছিল এই জীবনকে মানিয়ে নেয়ার, পুরোনো জীবনের ছায়া ভুলে প্রশান্তি খুঁজে নেয়ার। হাজারো প্রশ্নের বাণে যখন সে ক্ষত-বিক্ষত, তখন নির্যাতনের বহ্নিশিখা ছিল নিম্নরূপ :

> মনিরদ্দি পান্নার দু'হাতের বাধা ডিঙ্গিয়ে চোখে মুখে নরি চালাচ্ছিলো। সে আঘাতে পান্নার কপাল ফেটে রক্তে নেয়ে উঠছিলো পান্না। ...পান্না অনেক কষ্টে উঠে আবার দৌড়ে ছুটতে লাগলো ইছামতীর তীর ধরে।...ততক্ষণে আশ্বিনের ইছামতীর বেগবতী স্রোত কোন অতলে তলিয়ে নিয়ে গেছে পান্নাকে, হয়তো সে এতক্ষণে ইছামতীর স্নিগ্ধ কোলে শান্তির ঘুমে ঘুমিয়ে পড়েছে। (সরদার, ১৩৬৫ব. : ১৭৯-১৮১)

নারীর জীবন পুরুষ শাসকের দ্বারা শুধু নিয়ন্ত্রিতই হয় না শারীরিক নিপীড়নের শিকারও হয় বিভিন্নভাবে। জীবনের বাঁকে বাঁকে সমাজ, পুরুষ, তার জন্য নানা কারণ নির্মাণ করে রাখে। নারী শুধু শারীরিকভাবে নারী হওয়ার কারণে, সামাজিকভাবে নিম্নবর্গাধীন হওয়ার কারণে পুরুষের তিরস্কার-নির্যাতনের লক্ষ্যবস্তু হয়ে থাকে। পান্না তারই দৃষ্টান্ত। সমাজ মানুষকে বাঁচার পথে সহযোগিতা করে না বরং ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দেয়। প্রচলিত সমাজ-শিক্ষারীতি নারীকে স্বামী-সন্তানের মধ্যে জীবনের পূর্ণতা খোঁজার যে শিক্ষা দেয়া হয়, তার মধ্যে লুকিয়ে থাকে তাদের জীবনের ট্র্যাজেডি। গভীর মর্যাদাবোধে তারা বহুক্ষেত্রেই স্বামী বা দয়িতের সঙ্গ স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করে। পান্না যার জীবন্ত উদাহরণ। অত্যন্ত পশ্চাৎপদ, নিরক্ষর, কুসংস্কারপূর্ণ এই সমাজ নারীর স্বাভাবিক বিকাশের সুস্থ পথ বন্ধ করে রেখেছে। তার সঙ্গে আছে ধর্মীয় কুসংস্কার, অন্ধ ধর্মীয় উন্মাদনা, নারীকে অবদমিত করা, নির্যাতন করা, প্রভৃতিভাবে নারীর জীবনকে সংকটাপূর্ণ করে তোলে। পান্নার আত্মহত্যায় উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয় লেখকের কাঙ্ক্ষিত চরিত্র পান্না। উপন্যাসের আয়োজনে লেখক সমাজের সর্বাপেক্ষা শোষিত শ্রেণি নারীর প্রতি সহানুভূশীল ছিলেন। পান্নার করুণ পরিণতির মধ্যে নারীর প্রতি সমাজের নিষ্ঠুরতার চিত্র জাজ্বল্যমান। আপাতনিস্তরঙ্গ বাংলার

গ্রামগুলোতে নারীর প্রতি এ ধরনের শারীরিক, মানসিক নিগ্রহ চালানো হয়। পান্নার আত্মহত্যার মধ্যে দিয়ে সমাজে নারীর তুচ্ছ তৃণতুল্য অবস্থানটি আরো এবার চিহ্নিত হয়েছে। সর্বোপরি পান্না চরিত্রের অন্তঃশীলায় ঔপন্যাসিকের সমাজসচেতনতার সামগ্রিক প্রতিফলনের প্রকাশ স্পষ্ট (মহীবুল, ২০০২ : ১০৬)। চলমান সমাজের স্বরূপ প্রতিফলিত হয় সাহিত্যে। সামাজিক পরিকাঠামো বা প্রতিবেশের অন্তরালে যে শোষণ, অশিক্ষা, কুসংস্কার আর পুরুষতান্ত্রিকতার প্রচণ্ড প্রতাপ তাকে চিহ্নিত করেছেন লেখক। গণ্ডিবদ্ধ জীবনের পরতে পরতে পুরুষের স্বেচ্ছাচারের বেড়াজালে নারীর জীবন হারিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে ভারতীয় লেখক ইন্দিরা গোস্বামীর *ব্লু নেকড গড* (১৯৭৬) উপন্যাসের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। যেখানে সৌদামিনী নামক এক তরুণীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। যে প্রতিবাদী, সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী নারী। প্রচলিত সংস্কারের বাইরে এসে বাঁচতে চেয়েছিল সে। তার প্রতিবাদী, আত্মপ্রত্যায়ী স্বভাবের জন্য সমাজ তার বাঁচার পথকে অবরুদ্ধ করেছিল। পান্নার মতো মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অবরুদ্ধতা থেকে মুক্তি পেয়েছিল।

> According to the reachers, The Blue-necked God, Soudamini is a brave character. She wanted to live her life to the fullest. She tells others that she is not Gods. She lives by herself. She is an ordinary girl; she cannot pass herself for society. But she was very shocked when she heard that her had left her and offered her life to river Jamuna. Finally, she makes a courageous decision by throwing herself; instead she will choose to die and thus sets her free from the system. At this point, she acts as an independent woman not ready to be victimized. (Prosenjit, 2022:41)

উপন্যাসের পরিপ্রেক্ষিত এক না হলেও সৌদামিনী ও পান্নাকে একইভাবে সামাজিক প্রথার কাছে হার মেনে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে হয়েছিল। সরদার জয়েনউদ্‌দীন কাহিনিতে সমাজের জটিল বিশ্লেষণ পরিহার করে চেষ্টা করেছেন সাধারণ মানুষের জীবনকে স্পর্শ করার। সমাজের রূপরেখার যে পরিধি, তাকে বদলানো তার পক্ষে সম্ভব ছিল না; তাই তার অধরা স্বপ্নের ইতি ঘটিয়ে তাকেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। এই সমস্ত মানদণ্ডের বিচারে জয়েনউদ্‌দীনের একজন জীবনঘনিষ্ঠ ঔপন্যাসিকের পরিচয় দিয়েছেন।

৪.৫

অমৃত একজন নিম্নবর্গের নারী, এক অসহায় মা আর একজন সমাজসেবক দাই। দাই সম্প্রদায়ের এই নারী চিকিৎসার সেবাশূন্য গ্রামীণ সমাজে মাতৃত্বের আলোর পথের প্রধান সহায়ক শক্তি। মানুষের

মানবিক জাগরণে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান সত্ত্বেও সমাজের কাছে তারা অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য। এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে চন্দনপুর গ্রামের জমিদার পরিবার বছরের পর বছর ধরে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই পরিবারের নারীদের শোষণ করে আসছে। এই নিয়ে অমৃতের মনে অনুশোচনা নেই :

> সে চিরকাল দেখে এসেছে চন্দনপুরের দাই বাড়ির মেয়ে বউ হয়ে কোনোদিন ভিন গাঁয়ে যায় না। তাছাড়া দাই বাড়ির মেয়ে সমত্ত হলো কি না হলো এ নিয়ে দাইরা কেন কেউই মাথা ঘামায় না। বিয়ে একদিন হয় বটে কিন্তু বিয়ের আগেও যেমন ছিল বিয়ের পরেও ঠিক তেমনি থাকে, ভোল কিছু বদলায় না। ...অমৃত চিরকাল দেখে আসছে রাজাবাবুর বাড়ীর লোকেরা দাই বাড়ীর কাছে হিল্লে হয়ে আসা বটগাছের মতন। তার নিজের জীবনেও অমনি হয়েছে, তার মা এমন কি তার দাদীর বেলায়ও। (সরদার, ১৩৬৫ব. : ৭৮)

অমৃতর এই উপলব্ধি তার জীবনজাত; কোনো শিক্ষা-সংস্কার দ্বারা তাড়িত নয়। সে তার জীবনকে, তার পূর্ববর্তী প্রজন্মের জীবনকে এভাবে দেখে এসেছে। যুগ যুগ ধরে পার করে আসা সামন্ত পরিবারের আশ্রয়ের পঙ্কিলতাকে সংস্কারবশত দৃষ্টিগোচর করতে পারেনি অমৃত। নিঃস্বার্থ সমাজসেবার বিনিময়ে সমাজ যে অপমান আর কলঙ্কের গ্লানি তার পরবর্তী প্রজন্মের মাথায় চাপিয়ে দিয়েছে, তাকে বোঝার সক্ষমতা অমৃতর হয়নি। জীবনের রুদ্রতা দেখতে দেখতে তার দুচোখ যখন অন্ধ, সেখানে রাজাবাবুদের কদর্যতা তার চোখে পড়ে না। সে চোখে শুধু প্রেম, মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম, নারীর প্রতি পুরুষের প্রেম। সে শুধু বোঝে মানুষের জীবন বাঁচানো তার পেশা। সমাজের মানুষ তাকে নিয়ে কি ভাবল, কী বলল –এসব নিয়ে তার ভাববার সময়-সুযোগ কোনোটাই তার ছিল না। সে কারণেই ছেলে-মেয়েকে বারবার বলেছে লোকের কথায় কান না দিয়ে প্রথাগত জীবনের অনুরূপ চলতে। তাই বিশুকে বলেছে :

> বিয়ে যদি তুই দিতে পারিস দি গে, আমি বাধা দেব কে, আমি বাধা দেবারই বা কে, অমৃত রূঢ়কণ্ঠে জবাব দিলো। তার কণ্ঠের স্বর শুনে বুঝা গেল বিয়েতে তার কত আপত্তি আছে। তারপর একটু থেমে ধরা গলায় বললো, পান্নাকে লালন-পালন করেছি, ও আমাকে ছেড়ে গেলে মনে বড় দুঃখ লাগবে আমার, এই যা ভাবনা। (সরদার, ১৩৬৫ব. : ৮০)

সন্তানদের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান ব্যবধান তাকে একা ও নিঃসঙ্গ করে তোলে। নতুন জীবনাদর্শের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে ব্যর্থ হওয়ায় সন্তানদের চোখে বিরোধী পক্ষ হয়ে উঠেছে সে। নতুন আর পুরাতনের যে দ্বন্দ্ব, সেই প্রত্যয়টি উপন্যাসের মা আর সন্তানের জীবন অভিপ্রেতে প্রতিমূর্ত হয়েছে। সংস্কারাচ্ছন্ন অমৃত জীবনের কাছে এর বেশি কিছু পায়নি। সরদার জয়েনউদ্‌দীন গ্রামের মানুষকে খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। গ্রামীণ মানুষের জীবন, জীবনবোধ, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, জীবনের জটিলতা, নির্মোহতা প্রভৃতি। সেখানে অমৃতর মতো সাদামাটা, সহজ-সরল নারীর রূপায়ণ সম্ভব ;

পুরুষতান্ত্রিকতার দীর্ঘ ঐতিহ্য তার জীবনকে যেভাবে মুড়িয়ে দিয়েছে, তার বাইরের পৃথিবী তার কাছে অন্ধকার। সে জানে তার কাজকে, তার পেশাকে–যে জীবন মানবিক আর মানবতার সেবায় নিয়োগকৃত। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় :

> সে জানে এই দুটি জীবের জান এখন তার হেফাজতে। এ যুদ্ধে তার হারলে চলবে কি করে? তাকে জিততেই হবে। আহার নেই বিশ্রাম নেই নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ নেই, একের এক কায়দা কৌশল বা তার শিক্ষা বিধান যা আছে সে সব প্রয়োগ করের চলেছে অমৃত। এক নাগারে ঘণ্টা কয়েক পরিশ্রাম করে তার পর এক সময় উঁকি দিয়ে মুখ দেখিয়ে বললো, তোমাদের মেয়েটাকে বাঁচিয়ে দিলেম বাছা। (সরদার, ১৩৬৫ব. : ৫৪)

অমৃতর এই জীবনদায়িনী শ্রমকে, শিক্ষাকে, সমাজ সম্মান দেয়নি, মূল্য দেয়নি, বিনিময়ে তাকে কীভাবে শোষণ করা যায়, সেই পথ দেখেছে। সন্তানদের বিরোধী মতকে মানতে না পারলেও বিরোধিতা করে আশ্রয়শূন্য করেনি। বরং নিজে কষ্ট পেয়েছে তারও অধিক। সমগ্র উপন্যাসে পান্না, পান্নার মা অমৃত ছাড়াও আরো বেশ কয়েকটি নারী চরিত্রের সমাবেশ লক্ষ করা যায়; তার মধ্যে দীনুর পুত্রবধূ লালবানু এবং পান্নার শাশুড়ি হাজেরা বানু।

৪.৬

লালবানু এই উপন্যাসের দীনুর শেখের পুত্রবধূ আর পলানের স্ত্রী। সহজ-সরল এই গ্রামীণ নারীর স্বামী পলান আর শ্বশুর দীনুকে নিয়ে সংসার। নারীর আজীবনের স্বপ্ন যে সুখের সংসার সেখানে লালবানু পেয়েছিল দীনু শেখের মতো হৃদয়বান শ্বশুর। শ্বশুর-শাশুড়ির সেবাশুশ্রূষা করে তাদের আশীর্বাদ অর্জন করা গ্রামীণ নারীর ধর্ম। লালবাবু তারই প্রতিমূর্তি। সরদার জয়েনউদ্‌দীনের গ্রামীণ জীবনকে যথার্থরূপে তুলে ধরার প্রচেষ্টায় লালবানু চরিত্র অনবদ্য সংযোজন। লালবানুর মতো সদার্থক চরিত্রের পাশাপাশি হাজেরা বানুর মতো নেতিবাচক চরিত্রও উপন্যাসে আছে। যেখানে পুরুষতান্ত্রিকতার অনুশাসনের আজন্ম লালিত হাজেরা বানু পান্নাকে অপদস্থ করতে পারলেই আত্মতৃপ্তি পায়। পান্নার সুন্দর, সাবলীল জীবন নির্মাণের পথে প্রধান অন্তরায় হয়েছে হাজেরার সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারণে পান্নাকে বংশপরিচয় ধরে মানসিক অত্যাচার করা; শ্বশুর, স্বামীকে কথা লাগিয়ে শারীরিকভাবে নির্যাতন করেছে। বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে পান্নাকে ছোট করে, অপদস্থ করে, অদ্ভুত আনন্দ লাভ করেছে সে। এখানে নারী জীবনের পুনঃপৌনিক ঘটনার সমাহার ঘটেছে :

> প্রথম প্রথম এসব হাজেরার মোটেই ভাল লাগতো না, মাঝে মাঝে অজু করতে ভুল হয়ে যেত, ডানহাত ধোবার আগেই বাম হাত ধুত, কখনও বা শতেক কাজের ঝামেলায় নামাজের কথা মনেই আসতো না,

> নামাজ কাজা হয়ে যেত। রোজা রেখে ভুল করে পানি খেয়ে বসতো। ফল যা হবার তাই হত, মধু মোল্লা মাঠের গরু চরাণ নড়িখানা হাজেরার পিঠে নির্মম ভাবে ভাঙতো। কখনও তার মত বে-নামাজীর হাতে পানি খাওয়াই ছেড়ে দিত মধু মোল্লা, এমন কি তার ছোঁয়া পানি পর্যন্ত স্পর্শ করতো না। হাজেরা হা পিত্যোশ করে স্বামীর পা দু'খানি জড়িয়ে ধরে ক্ষমা চাইতো। (সরদার, ১৩৬৫ব. : ১৩৪)

গ্রামীণ নিম্নবর্গের পশ্চাৎপদ দরিদ্র নারী যখন দুমুঠো অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করতে ক্লান্ত, তখন ধর্মের সমস্ত রীতিনীতি তাদের দ্বারা সঠিকভাবে প্রতিপালন করা সম্ভব হয় না। পান্না তার জীবনে কলঙ্কিত জন্মের গ্লানি নিয়ে তৎপর হতে গিয়ে সামাজিক অন্যসব বিষয়কে ভুলে গিয়েছিল। সে জানে না নারীর জন্য সমাজের পরতে পরতে কত গভীর খাদ খোঁড়া আছে। যে খাদে একবার পা ফসকে পড়লে ওঠার পথ বন্ধুরতায় ভরা। হাজেরার মতো নারীরা জীবনের যে ধাপসমূহ অতিক্রম করে আসে, সেই নির্মমতার প্রতিরূপ অন্যের প্রতি প্রয়োগ হতে দেখে আনন্দ পায়। আত্মতৃপ্তির কারণে সে পান্নাকে বিভিন্নভাবে দোষারোপ করেছে, নির্যাতন করার পথ নির্মাণ করে আনন্দ পেয়েছে। ঔপন্যাসিক চরিত্র নির্মাণে চরিত্রের অন্তর্গত ক্ষরণ, দ্বন্দ্ব অপেক্ষা, সামাজিক অবস্থান মূল্যায়নকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। উপন্যাসে দাই সম্প্রদায়ের জীবনচিত্রের অন্তর্দাহে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নবর্গের মানুষের সামাজিক–অর্থনৈতিক জীবন, সমস্যা প্রভৃতি বিষয়কে বাস্তবসম্মতরূপে নির্মাণ করতে অধিক আগ্রহী ছিলেন। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের অভিমত নিম্নরূপ : 'মানুষের বেদনা, বঞ্চনা ও ব্যর্থতা সরদার জয়েন-এর হৃদয় মোহিত করে, তাঁর সহজ মন সেসব কষ্টের দানাগুলো নিয়ে কাহিনীর মালা গাঁথতে বসে। আলোচ্য উপন্যাস তারই প্রতিচিত্র।' (ফজলুল, ২০০৮ : ১২১) পুরুষশাসিত সমাজে নারী নিজের সত্তাকে প্রতিষ্ঠার কোনো সুযোগ পায় না; জীবনকে বয়ে নেয়ার জন্য যেটুকু পরিসর পায় তা প্রকারান্তে পুরুষের তৈরি। যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে নারী এভাবেই শোষিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত হয়ে জীবন কাটায়। নিম্নবর্গের এই সম্প্রদায়ের নারীর জীবনের জটিলতা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির খেরোখাতা চিত্রিত হয়েছে অভিজ্ঞতা ও কৌশলী শিল্পীর নিপুণতায়।

৫.

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-৭১) বাংলাদেশের সাহিত্যের আধুনিক শিল্পমানস সমৃদ্ধ ও বর্ণময় এক অধ্যায়। সাহিত্যজীবনের শুরু থেকেই তিনি বিস্ময়কর স্বাতন্ত্র্য ও শিল্প-সমুন্নতির সাক্ষর রেখেছেন। সাহিত্যিক মানদণ্ডে তিনি একটি পরিণত, সচেতন, দার্শনিক, নিরীক্ষাপ্রবণ শৈল্পিক চেতনাকে জাগ্রত রেখে বাংলাদেশের সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন সমন্বয়-সাধনের প্রাণনা নিয়ে আত্মনিয়োগ করেছেন। একজন লেখক শুধু স্বপ্রণোদিত শৈল্পিক-পিপাসা থেকে সাহিত্যসাধনা করেন না; এর পশ্চাতে দেশ ও

সমাজের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা ও মননশীল অভিজ্ঞতারও বহিঃপ্রকাশও ঘটে থাকে। ওয়ালীউল্লাহর লেখায় লেখকের দায়িত্বশীল অনুভূতির সঞ্চার পাঠকের মনে বিস্ময়ের জন্ম দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে হাসান আজিজুল হকের মন্তব্য যুক্তিযুক্ত :

> বাংলাদেশের উপন্যাসে কিভাবে অচেতন প্রয়াসের ক্লান্তিকর অনুবর্তনের মধ্যে প্রথম সচেতন শিল্পীর পদাঘাত ঘটে তা বুঝতে গেলে আমাদের সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর রচনার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। জীবননিষ্ঠা ও আধুনিক শিল্প-প্রকরণ, তীব্র শৈল্পিক সচেতনতা ও দক্ষতা, স্নায়ু- ছেঁড়া সংযম ও পরিমিতিবোধ, নিচু ও নির্বিকার উচ্চারণ–আধুনিক সুনির্মিত উপন্যাসের সমস্ত বৈশিষ্ট্য সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহতে পাওয়া যায়। (হাসান, ২০১৩ : ১৯)

বাংলাদেশের উপন্যাসের দৃষ্টিকোণ-নির্বাচনে, ভাষা প্রয়োগ ও জীবনার্থ অনুসন্ধানে তিনি প্রাতিস্বিক হয়ে উঠেছেন। শুধু তাই নয়, সমকালের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে তিনি মুখ-মুখোশের দ্বন্দ্বময় রক্তিময়তা, শ্রেণিলীন ও শ্রেণিহীন অস্তিত্বের বোধকে বাংলাদেশের উপন্যাসে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। স্বদেশ-স্বভূমি থেকে বহুদূরে অবস্থান করেও প্রচণ্ড রকম অন্তর্তাগিদ তাঁর লেখায় দগদগে গাঢ়তায় আবির্ভূত। দীর্ঘ প্রবাসজীবন তাঁর অন্তর্গত সত্তা থেকে স্বদেশ ও স্ব-সমাজের ভাবনাকে বিস্মৃতির অতলে নিমজ্জিত হতে দেয়নি। সাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর জীবন-অভিজ্ঞতা, আত্মদর্শনবোধ ও সৃষ্টিপ্রবাহ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। শৈশব থেকে অন্তর্মুখী মানসপ্রবণতা, তাঁর বোধ-চৈতন্যে এক নৈর্ব্যক্তিকতার জন্ম দিয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিত তার গ্রন্থমগ্নতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিশীলিত প্রতিবেশ নির্মাণে, বিশ্লেষণিক মানস-দর্শন বিন্যাসে ভূমিকা রেখেছে। কেবল অন্তর্বাস্তবতা নয়, সমকালীন উত্তাল উষ্ণ বহির্বাস্তবতার ঘটনাবহুল আবর্তনগুলোও তাঁর বর্ণময় চৈতন্যেকে অনাক্রান্ত রাখেনি (অনিন্দিতা, ২০১৯ : ১১)। বিশ্বনাগরিক বলতে যা বোঝায়, তিনি সম্পূর্ণার্থেই তাই ছিলেন। তিনি বিশ্বব্যাপী ঘুরেছেন, কখনো নিজের ইচ্ছায়, কখনো কর্মসূত্রে। বিগত শতাব্দীর বিশ্বসাহিত্যের চিন্তাজগতের শাখা-প্রশাখাকে আত্মস্থ করে বহুমাত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন নিজস্ব সৃজনশীলতার।

৫.১

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ গ্রামীণ জীবনভিত্তিক উপন্যাসে যে নব্য আধুনিকতার জন্ম দেয়, তার নাম *লালসালু* (১৯৪৯)। বাংলা সাহিত্যে তাঁর পূর্বে ও পরে বহু উপন্যাস রচিত হয়েছে গ্রামীণ জীবন নিয়ে। *লালসালু*'র যে চেতনাগত বিস্তার, তা বাংলা সাহিত্যের অধিজগতে নির্মিত হয়েছে অনধিক। উপন্যাসের বিষয়বস্তু পরিচিত জগতের হলেও এর গভীরের তলদেশ মনস্তত্ত্বের যে নিবিড় ও সূক্ষ্ম প্রতিবেদনের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়; তার অনন্যতা বাংলা সাহিত্যে অনিস্বীকার্য। কোনো বিচ্ছিন্ন

তাত্ত্বিক দর্শনে প্রকর্ষিত নয়, বরং আত্মবিশ্লেষণিক অভিজ্ঞতায় আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ পটভূমিতে নির্মিত হয়েছে উপন্যাসের কাহিনি। *লালসালু* অঞ্চলভিত্তিক ও বিশেষ পেশাজীবী মানুষের কাহিনি হলেও, বিপুল মানুষের মর্মস্পর্শী কাহিনি হিসেবেও অনুক্ত হবে না। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর প্রথম উপন্যাস *লালসালু* শুধু বাংলাদেশের সাহিত্যের নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের এক অনাবিষ্কৃত স্বভূমির শিল্পরূপ। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর সমাজ, সমাজ-মন সম্পর্কিত তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণশীলতার ফসল এই উপন্যাস। *লালসালু* উপন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছে মজিদ আর মজিদের সুকৌশলে লালিত ধর্মের জাল। ধর্মকেন্দ্রিক সেই নিরীক্ষার খণ্ড খণ্ড চিত্রের সমাহারে গড়ে উঠেছে পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশিত পূর্ব বাংলার সমকালীন পরিস্থিতির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ অবস্থা। ১৯৪৮ সালে উপন্যাসটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে নব্যনির্মিত রাষ্ট্রের গতিপথকে চিহ্নিত করেছেন তিনি। এ প্রসঙ্গে লেখকের একটি উক্তি গুরুত্বপূর্ণ :

> মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে আমরা কেউ হয়তো অজ্ঞ নই; কিন্তু অধঃপতনের এই যে চূড়ান্ত অবস্থা এই অবস্থা নিয়ে লিখে আমার লেখা কলঙ্কিত করতে চাই।...পশ্চিম জগত আজ যতখানি এগিয়েছে ব্যক্তিগতভাবে আমি হয়তো ততখানি এগিয়ে যাবো বা ছাড়িয়ে যাবো, কিন্তু আমার লেখা পিছিয়ে রাখবো তাদের জন্য যারা পিছিয়ে আছে।' (শামসুদ্দিন, ২০০৭ : ৫৬)

স্বদেশ ও স্ব-সম্প্রদায় সম্পর্কে তাঁর দায়বদ্ধতার চিত্র যেমন পাওয়া যায়, তেমনি তাঁর আত্মকথায়ও সে বিষয়ের প্রকাশ চোখে পড়েছে। জীবনের কাছে তিনি এতটাই দৃঢ়বদ্ধ ছিলেন যে নিজের শিকড়কে চিনতে কোনো দিন ভুল করবেন না।

৫.২

লালসালু (১৯৪৮) উপন্যাসে মজিদ ধর্মকে পুঁজি করে জীবনধারণ করেছে ও ক্ষমতায়িত হয়েছে। ক্ষমতার আধাররূপে স্থাপন করেছে লালসালুর নিচে ঢাকা এক অপরিচিত অজ্ঞাত ব্যক্তির কবরকে। মহব্বতনগর নামক অন্ধ-অজ্ঞ অজপাড়াগাঁয়ের মানুষ তার অলৌকিক ক্ষমতাকে না মানলেও, মানতে বাধ্য করা হয়েছে। মহব্বতনগরের অসহায়-শক্তিহীন অধিবাসীদের চিত্র যেমন সমকালীন পূর্ববঙ্গের অধিবাসীদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ; তেমনি মজিদের স্ত্রী রহিমাও মহব্বতনগরের অধিবাসীদের প্রধানতম সংস্করণ। একই সঙ্গে সমকালীন সমাজের নারীর যে কারুণ্যময় জীবনপরিধি, তারও প্রতীক রহিমা। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থায় আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষ সামাজিকভাবেও দুর্বল হয়ে থাকে। ক্ষমতাবান মানুষের শাসন আর সব ধরনের শোষণের প্রথম শিকার তারাই হয়ে থাকে। সেই সমস্ত বিবেচনায় নারী সব সময়, সব সমাজে আর্থিকভাবে এবং সামাজিকভাবে দুর্বলরূপে থাকে। সামগ্রিক পরিস্থিতির

মধ্যে তিনজন গুরুত্বপূর্ণ নিম্নবর্গের নারী চারিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়, যার মধ্যে প্রথমেই বলা যায় হাসুনির মায়ের কথা; হাসুনির মা আসলে তাহেরের বিধবা বোন। সমগ্র উপন্যাসে তার নিজের কোনো নাম নেই। গ্রামীণ নিম্নবর্গীয় সমাজে বিবাহিত বা বিধবা নারীর নিজের নাম বিলোপ পায়। স্বামী অথবা সন্তানের নামে সে সমাজে পরিচিত হয়। এই নারী তার নিজের জীবন নিয়ে উপন্যাসে যতটা না আলোচিত হয়েছে; তার অপেক্ষা অধিক মূর্ত হয়েছে তার বাবা-মায়ের দ্বন্দ্বের ছায়াচিত্র হিসেবে। যুবতী বিধবা এই নারী পিতা ও ভাইয়ের সংসারের বোঝা। মজিদের আর্থিক অবস্থা ভালো হওয়ায় রহিমার একার পক্ষে সংসারের সব কাজ সামলিয়ে ওঠা কঠিন। তাই গৃহস্থ কর্মে সহযোগিতার প্রয়োজনে হাসুনির মার আসা-যাওয়া মজিদের গৃহে। ‘বসে বসে অন্ন ধ্বংস করতে লজ্জা লাগে হাসানুর মায়ের। সে তো একা নয়, তার হাসুনিও আছে। তাই বাড়িতে-বাড়িতে ধান ভানে। কিন্তু কিছু একটা মুখ ফুটে চাইতে আবার লজ্জায় মরে যায়।’(ওয়ালীউল্লাহ, ২০১৬ : ১৪)

বিগত শতাব্দীর গ্রামীণ সমাজে নিম্নবর্গের নারীর প্রধান পেশা ছিল বাড়ি বাড়ি ধান ভানা। জীবন ধারণের নিমিত্তে মানুষের প্রধান প্রয়োজন দুবেলা দুমুঠো অন্নের। ধান ভানার মধ্য দিয়ে একজন নারী যেটুকু চাল অর্জন করে, তা তার পরের দিনের শ্রমের শক্তি জোগায়। ঔপনিবেশিক বাংলার সমাজব্যবস্থায় নারীর অবস্থান সর্বদা শোষিত প্রাণীর। নিম্নবর্গের নারীর এই স্তব্ধ জীবনকে বয়ে নিয়ে যেতে হয় সংগ্রাম আর দ্বন্দ্বের সীমারেখার মধ্য দিয়ে। যুবতী বিধবা এই নারী এক পুত্রসন্তানসহ পিতৃগৃহে অবস্থান করে, পিতৃগৃহে তার অবস্থান সুখকর না হলে দ্বিতীয়বার দ্বার পরিগ্রহ করতে সে ইচ্ছুক নয়। তবে ফসলভরা মাঠ দেখে, উঠানভরা ধান দেখে তার মনেও আনন্দের বার্তা খেলা করে :

> ধানক্ষেতের তাজা রঙে হাসুনির মায়ের মনে পুলক জাগে। আপন মনকেই ঠাট্টা করে বারবার সুধায়: নিকা করবি মাগী, নিকা করবী? কিন্তু কাকে করবে? ওই বাড়ির মানুষকে পেলে করে কি? তেল চকচকে জোয়ান কালো ছেলে। গলা ছেড়ে যখন গান ধরে তখন ধানের ক্ষেতে যেন ঢেউ ওঠে। (ওয়ালীউল্লাহ, ২০১৬ : ১৪)

সার্ত্রের মতে, মানবসত্তা কোনো পরিস্থিতিতে স্থির নয়, নিজেকে অবিরাম ভেঙে-গড়ার মধ্যে বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা করে। নিম্নবর্গের জীবনে এই অস্থিরতা আরো বেশি করে বিরাজমান, অর্থনৈতিক অসঙ্গতি তার স্বপ্ন আর সাধকে অবিরত নিয়ন্ত্রণ করে। মহাযুদ্ধের বীভৎসতা, দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া, মানুষের জীবনে অনেক পরিবর্তন আনলেও নারীর জীবনে কোনো পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যায় না। হাসুনির মার মতো নারীর পরিচয়হীন জীবনে কোনো পরিবর্তন আসে না। সামাজিক জীবনের নানান স্তরে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক প্রকল্প সক্রিয় থাকে। এদের মধ্যে যাদের ব্যাপকতা বেশি তারাই সামাজিক ও জাতীয় স্তরে ঐক্য ও সংহতি বিধায়ক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে।

পুরুষতান্ত্রিকতার প্রবল প্রতাপ নিম্নবর্গীয় নারীর জীবনকে সব সময় আলো-অন্ধকারের সামূহিকতার সঞ্চার করে এবং সময়বাহিত পরিসীমার মধ্যে অন্বয়ের পথনির্দেশ করে (তপোধীর, ২০১৪: ৮৬)। সত্তা বা আত্মার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে যত আলোচনা-পর্যালোচনা নির্মিত হোক না কেন নারীর জন্য তা অভাবিতই থেকে যায়। সংস্কৃতির গভীরতর স্তরে প্রোথিত ভাবাদর্শে নারীর প্রতি শোষণের সংস্কৃতি জাগ্রত থাকে আর নারী যুগ যুগ ধরে সেই পথে রক্তাক্ত হয়ে চলে।

৬.

বাংলাদেশের উপন্যাসের স্বল্পপ্রজ ও সমধিক সফল কথাকার ঔপন্যাসিক আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩)। বিভাগোত্তর বাংলা উপন্যাসের কর্কটময়কালকে ধারণ করে, নিম্নবর্গীয় জীবনাভিজ্ঞতাকে পারঙ্গমতার সঙ্গে নির্মাণ করার অভিব্যক্তিতে তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁর প্রথম উপন্যাস *সূর্য-দীঘল বাড়ী* (১৯৫৫) তাঁকে লেখক হিসেবে পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠা দুই-ই দিয়েছে। লেখক হিসেবে তাঁর মৌলিক ও স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি তাকে করেছে মহীয়ান। কর্মের সূত্রে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের সহায়-সম্বলহীন-নিরন্ন মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামকে তিনি দেখেছেন ও অনুভব করেছেন খুব কাছে থেকে। ঔপনিবেশিক শাসন, শোষণ আর সামন্তবাদী সমাজনীতির প্রকোপে বাংলার খেটে খাওয়া মানুষের দৈনন্দিন জীবন রিক্ততায় পূর্ণ। এই পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে যখন রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির অপকৌশল যুক্ত হয়; তখন এই মানুষগুলোর বেঁচে থাকার শেষ আশাটুকু হারিয়ে যায়। একজন মানবিক মূল্যবোধে উজ্জ্বল মানুষ হিসেবে ঔপন্যাসিক আবু ইসহাক সেই সব অপশাসন আর সংস্কারের অন্তর্জালের ছাপসমূহ উন্মোচন করেছেন। তাঁর দুটি উপন্যাস লেখক সত্তার দুটি দিককে স্পষ্ট করেছে। একদিকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক দুরাচারে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বেহাল দশা; অন্যদিকে শোষণের চোরাজালে আটকে পড়া প্রান্তিক মানুষের ক্ষয়ে যাওয়া জীবনের সমাচার। তেরোশ পঞ্চাশের মন্বন্তর, দেশভাগ, স্বাধীনতার প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির স্বপ্নভঙ্গ, দুর্ভিক্ষের নির্মমতায় উন্মুলিত মানুষের অস্তিত্বের সংগ্রাম, মূল্যবোধ আর চরিত্র বিনষ্টের নানা কৌণিক মাত্রাভেদ। গ্রামীণ জীবনের বৈচিত্র্যহীন জটিলতার মধ্যে নারী আর শিশুর সংগ্রামশীলতার অবিচ্ছিন্ন কাহিনি পাঠকচিত্তের মর্মমূলে আঘাত করেছে। লেখক আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে জীবনযাত্রার জটিল সংমিশ্রণকে শৈল্পিক ঐক্যে সংযোজন করেছেন। ক্ষুধা আর দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে চরিত্রগুলোর নিয়ত সংগ্রামশীল উপলব্ধি তাদেরকে জীবন্ত করে তুলেছে (মনসুর, ২০০৮ : ৭৮)। একই সঙ্গে উপন্যাসটি বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের সমৃদ্ধ যাত্রাপথের গৌরব উজ্জ্বল সংযোজন।

৬.১

যুদ্ধ, দাঙ্গা বা মন্বন্তরের মতো আপৎকালীন সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগের শিকার হয় নারী ও শিশু। এই বিষয় নিয়ে বাংলা সাহিত্যসহ বিশ্বের অন্যান্য সাহিত্যে অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় ভারতীয় নারীবাদী লেখক উর্বশী বুটালিয়ার *দ্য আদার সাইড অফ সাইলেন্স* (১৯৯৮) গ্রন্থের কথা। যেখানে তিনি দেখিয়েছেন যুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গার ফলে মানুষ যখন ছিন্নমূল হয়, তখন সবচেয়ে বেশি দুর্যোগের শিকার হয় নারী আর শিশু। আবার আপৎকালীন সেই সংকটে নিম্নবিত্ত ও মেহনতি মানুষের পারিবারিক কাঠামোগুলো দাঁড়িয়ে থাকে নারী আর শিশুর শ্রমের ওপর। *সূর্য-দীঘল বাড়ী* উপন্যাসের পরিপ্রেক্ষিত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে এই সমস্ত অভিজ্ঞতাকে। এই উপন্যাসের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দেশভাগ-পরবর্তী খাদ্যসংকট ও মন্বন্তর প্রভৃতি বিষয়সমূহ। *সূর্য-দীঘল বাড়ী* উপন্যাসে প্রতিফলিত রাজনৈতিক-সামাজিক পশ্চাদ্ভূমি বিচার করলে দেখা যায় যে রচনাকালের অনতি-অতীত এর রাজনৈতিক-সামাজিক ঘটনাপ্রবাহে ছায়াপাত করেছে। দ্বিতীয় মহাসমর পরবর্তীকালের বিপর্যস্ত রাজনৈতিক স্থিতিহীনতায় ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ, ১৯৪৬-এর দাঙ্গা, ১৯৪৭-এর দেশভাগ প্রভৃতি রাজনৈতিক অপপ্রয়াস; গ্রামবাংলার দরিদ্র, খেটে খাওয়া মানুষের জীবনকে আরও দুষ্কর-দুর্যোগ-দুর্জ্ঞেয়তায় ছেয়ে ফেলেছিল। গোটা উপন্যাসে সেই সব বিপত্তিজনক পরিবেশে সমাজের সবচেয়ে অনাদৃত মানুষের কথা বিবৃত হয়েছে। যারা সব সময় সব আপৎকালীন পরিস্থিতিতে আরো বেশি প্রতিবন্ধকতায় পড়ে তারা হলো; নারী ও শিশু। দুর্ভিক্ষতাড়িত মানুষ একমুঠো খাবারের আশায়, দুরাচরণীয়-দুর্ভিক্ষকে মোকাবেলা করার আশায়, জীবন ও জীবিকার ভাবনায় দলে দলে শহরে এসেছিল। ভিটে মাটি ত্যাগ করে অথবা যে ভিটে মাটি তাদের শেষ সম্বল তাকে বন্ধক বা বিক্রি করে, চেষ্টা করেছিল পেটের ক্ষুধাকে নিবারণের। সেই ফেলে আসা দিনে আর ফিরে যাওয়া সম্ভব হয় না; এই বাস্তবতাকে স্মরণে রেখে যাত্রা শুরু হয়েছে *সূর্য-দীঘল বাড়ী* উপন্যাসের। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র একজন নারী, একজন মা। সামাজিকভাবে আশ্রয়হীন, বিত্তহীন এই নারী আর তার সন্তানদের ঘিরে কাহিনির প্রবাহ।

৬.২

'উপন্যাস শিল্পের মৌলিকতা হলো তার ক্রমান্বিত ব্যাপ্তি এবং গ্রহণ ক্ষমতা' (রণেশ, ২০১২ : ৬৬)। এই ব্যাপ্তির আর গ্রহণ ক্ষমতার মধ্যে সমাজের সমগ্রতা, ব্যক্তির ব্যাপ্তিকে খুঁজে পাওয়া যায়।

সমাজের নিচুতলার পোড় খাওয়া মানুষেরা বাস করে অদ্ভুত এক দুর্বোধ্যতার জগতে; যেখানে সমাজ তাদের তিলে তিলে ক্ষয় করে। উপন্যাসের নামকরণের মধ্যেই আছে গ্রামীণ অন্ধকার-তমসাচ্ছন্ন এক জগতের হাতছানি। গ্রামের অজ্ঞতাপ্রসূত জনমানুষের ধারণায়, পূর্ব-পশ্চিম প্রসারী সূর্য-দীঘল বাড়ি হলো একটি অপয়া বাস্তুভিটা। সেই জমিতে যারা বাস করে, তাদের পারিবারিক অমঙ্গল অনিবার্য। এই ধারণা থেকে, এই জাতীয় ভূখণ্ড পরিত্যক্ত হয়ে থাকে। এই বাড়িতে বাস করা নিয়ে গ্রামীণ সংস্কারাবদ্ধ মানুষের অজ্ঞতার অন্ত নেই। নিরুপায় দুই নারী জয়গুন আর শফীর মার শরণাপন্ন জীবনে এটাই শেষ আশ্রয়। বাড়িতে ওঠার পূর্বে তাকে শুদ্ধিকরণ করার প্রচেষ্টায় ফকির জোবেদ আলীর সহায়তায় মন্ত্রপূত করে। বাড়ি চার কোণে চারটা তাবিজ পুঁতে এসে সে বলে,

> এই বার চউক বুইজ্যা গিয়া ওড বাড়ীতে। আর কোন ডর নাই। ধুলাপড়া দিয়া ভূত-পেত্নীর আড্ডা ভাইঙ্গা দিছি। চাইর কোণায় চাইড্যা আলীশান আলীশান পাহারাদারও রাইখ্যা আইছি। সব আপদ-বিপদ ওরাই ঠেকাইব। বাগীর সীমানার মইদ্যে ভূত-পেত্নী, জিন-পরী, ব্যারাম-আজাব-কিছু আইতে পারব না। (আবু, ২০১৭ : ১১)

এই পটভূমি, গ্রামীণজীবনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধকার জীবনের সংকীর্ণ বাস্তবতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সমাজসংলগ্ন কথাকার আবু ইসহাক এই কাহিনি পরিসীমার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনব্যবস্থায় নিরীহ-নির্বিকার মানুষের প্রচ্ছদপটকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে অভিব্যক্ত করেছেন। বিভাগোত্তর পূর্ব বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিবৃত্তের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিণতি দান করেছেন উপন্যাসের কাহিনিকে। লেখক জীবনকে দেখেছেন ও দেখিয়েছেন একজন মর্মস্পর্শী নির্মাতার চোখ দিয়ে। তাঁর শৈল্পিক নৈয়ায়িকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য জীবনকে নির্মেদ বাস্তবতা ও নিরাবেগ মূর্তিতে তুলে ধরা :

> সমাজ-মানসের যে সূক্ষ্ম বিষয়গুলি আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় গভীর জীবনবোধ থেকে তিনি সেদিকেই আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে সাহায্য করেন। যে সমাজ ক্ষুধা, দারিদ্র্য, শোষণ ও অজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবন ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে সংগ্রাম করে চলে জয়গুন ও হাসুর মতো অসহায় ছিন্নমূলের দল সেই সমাজের আপাত-জীবনাচরণের অন্তরালে সূক্ষ্ম তাৎপর্যগুলিকে তিনি ইঙ্গিতময় করে তুলতে সচেষ্ট । (শিরীণ, ২০০৭ : ২৫)

সমাজপতিদের দুর্বৃত্তায়ন ও ধর্মীয় অপবিধানের দ্বারা দুর্বল-নিঃস্ব মানুষকে আরো জর্জরিত করার যে চেষ্টা-চরিত্র, তাকে পশ্চাতে সরিয়ে লেখক সংগ্রামী মানুষের বাঁচার পথের অবরুদ্ধতার বিরুদ্ধে প্রতিস্থাপন করেছেন প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে। উপন্যাসটির মোট উনিশটি পরিচ্ছেদে, সংগ্রামশীল মানুষের বিপন্নতাকে লেখক উপস্থাপন করেছেন শ্রমনিষ্ঠতায়। উপন্যাসের শুরু হয়েছে ছিন্নমূল সেই

সব মানুষের কথা দিয়ে, যারা দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার আশায় শহরে গিয়েছিল। তাদের সেই যাত্রা যে নিতান্ত ঝকমারিতে পূর্ণ ছিল তা বুঝতে বেশি দিন সময় লাগেনি; তাই বিড়ম্বিত ভাগ্যের সেই দুরাশাকে বুকে করে স্বস্থানে ফিরে এসেছে তারা। 'আবার তারা গ্রামে ফিরে আসে। পেছনে রেখে আসে স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, মা-বাবা, ভাই-বোন। ভাতের লড়াইয়ে তারা হেরে গেল।' (আবু, ২০১৭ : ১৫) এখান থেকেই শুরু হয়েছে *সূর্য-দীঘল বাড়ী*-কেন্দ্রিক ছিন্নমূল মানুষের বাঁচার লড়াইয়ের অনায়ত জীবনকথা।

৬.৩

সূর্য-দীঘল বাড়ী উপন্যাসের চরিত্র সৃজনে ঔপন্যাসিক আবু ইসহাক চরিত্রগুলো সৃজন করেছেন তারা বাংলাদেশের সমাজে দুর্লভ নয়। বৃহত্তর গ্রামীণ সমাজে সহজেই এদের দেখা পাওয়া যায়। অর্থাৎ চরিত্রগুলো কেবল উপন্যাসের বাস্তবতায় সীমাবদ্ধ থাকেনি; সরস ও জীবন্ত হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছে স্বকাল ও স্বসমাজের (হোসনে আরা, ২০১১ : ৪৭)। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র জয়গুন একজন নিম্নবর্গীয় নারী, একজন মা। নারীজীবনের সমৃদ্ধি যেমন মাতৃত্বে, তেমনি নারীজীবনের প্রতিবন্ধকতার বিভিন্ন পথকে সুগমিত করেও মাতৃত্ব। জয়গুন চরিত্রের প্রধান সত্তা তার মাতৃত্ব; মাতৃত্বের দায়িত্ববোধ তাকে একজন সাধারণ নারী থেকে পরিণত করেছে একজন সংগ্রামী, যোদ্ধা নারীতে। জয়গুনের জীবনও স্পর্ধিত শক্তিকে স্বাগত জানিয়ে একজন সমালোচক লিখেছেন–'জয়গুনেরা যে জীবন যাপন করে, তাকে মানুষের জীবন যাপন বলে স্বীকার করতে আমি রাজি নই–এমন কি তাকে গৃহপালিত পশুরস্তরের জীবন বলে মেনে নেওয়াও শক্ত।' (হাসান, ২০১৭ : ১৩) সমালোচকের এই কথার সত্যতাকে স্বীকার করে বলা যায়, সেদিনের সেই সময়ের গ্রামীণজীবনের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবন এই অমানবিকতায় পূর্ণ। জীবনের এই দীর্ণতাকে মেনে নিয়ে জয়গুন তার দুটি সন্তানের মুখে দুমুঠো অন্নের আশায় পা বাড়িয়েছিল জীবিকার্জনের কঠিন পথে। জীবনের সর্পিল পথে সদা হোঁচট খাওয়া জয়গুনের বাইরের বাহ্যিক অবয়ব ও আচরণ, রুক্ষতা ও কর্কশতায় পূর্ণ হলেও সন্তানের প্রতি স্নেহকাতরতার ফল্গুধারাটি সদা বহমান ছিল তার অন্তঃশীলায়। মাতৃত্বের এই সুধাময়তাকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে ও বিশ্বসাহিত্যে অনেক উপন্যাস রচিত হয়েছে। তার মধ্যে ম্যাক্সিম গোর্কির *মা* (১৯০৬) পৃথিবীখ্যাত উপন্যাস। বাংলা সাহিত্যেও তার অনুগমন নিতান্ত কম নয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *জননী* (১৯৩৫) বা শওকত ওসমানের *জননী* (১৯৫৮) কোনোটিই গুরুত্বের বিচারে কম নয়। জয়গুনও তার সন্তানের প্রতি কর্তব্যজ্ঞান ও তেজোময়তায় দীপ্ত। কিন্তু জীবনযুদ্ধে সে কেন একা এক নিরস্ত্র সৈনিক? উত্তর হলো জয়গুন একজন নারী, দরিদ্র ও নিম্নবর্গীয় নারী। তাই তাকে

যখন ইচ্ছা বিয়ে করা যায়, আবার যখন ইচ্ছা তালাকও দেয়া যায়। বিস্তৃত আলোচনায় এই সমস্ত প্রশ্নের সারাৎসার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এই গবেষণার অন্বিষ্ট। জয়গুনের প্রথম স্বামী জব্বার মুনশীর মৃত্যুর পর করিম বকশের সঙ্গে তার দ্বিতীয়বার বিয়ে হয়। প্রথম স্বামীর ঘরের সন্তান হাসু আর দ্বিতীয় স্বামীর ঘরে জন্ম নেয় মায়মুন, কাসু ও নবজাত আর এক কন্যা। যুদ্ধের ডামাডোল ও দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাবে যখন জনজীবন বিপর্যস্ত, তখন বিনা কারণেই করিম বকশ জয়গুনকে তালাক দেয়। রেখে দেয় পুত্রসন্তান কাসুকে আর বিতাড়িত করে স্ত্রী আর দুই কন্যাসন্তানকে। কারণ :

> তখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। দুর্নামের ভয়ে স্বামী-পরিত্যক্ত জয়গুন তখনও ঘরের বাহির হয়নি। খেতে না পাওয়ায় তার বুকে দুধ ছিল না। দুধের শিশু দুধ না পেয়ে শুকনো পাটখড়ির মত হয়েছিলো। শেষে ধুঁকতে ধুঁকতে একদিন মারা গেল। তাকে কবর দিতে কাফনের কাপড় জোটেনি। (আবু, ২০১৭ : ২৯)

এরপর জীবনের আশায়, জীবিকার আশায় ভিটেমাটি বিক্রি করে, দুই সন্তান হাসু ও মায়মুন আর আত্মীয় শফীর মার সঙ্গে পা বাড়ায় শহরের রাজপথে। সে শহর নিষ্ঠুর আর নির্মমতায় ভরা বড় বড় সব বাড়ির বন্ধ দরজায় কড়া নেড়ে কোনো সাড়া পায়নি তারা। সেই শহর জয়গুনদের মতো পোড় খাওয়া পতিতদের জন্য নয়। জীবনের প্রহরে প্রহরে নির্মমতার শিকার হয় যে নারী, তার কাছে স্বামী-সংসার-সমাজ সব ভেসে যায় ধূলিকণার মতো। অবশিষ্ট থাকে শুধু পেটের নির্লিপ্ত ক্ষুধা, যাকে কোনো বাঁধ দিয়েই বাঁধা যায় না। থাকে শুধু দিনান্তের আশ্রয়ের জন্য খড়কুটোর একটি নীড়, যেখানে সারা দিনের ক্লান্তি শেষে শরীরের বিষণ্নতাকে ঝেড়ে ফেলা যায়। সে কারণেই একান্ত নিরবলম্বন হয়ে অপয়া *সূর্য-দীঘল বাড়ি*তে তাকে আবাস গড়তে হয়েছে; জীবনের পরবর্তী দিনের সংগ্রামের শক্তি ও সাহস সঞ্চয় করার জন্য। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মত নিম্নরূপ :

> জয়গুন ব্যক্তি হয়ে উঠেছে এমন এক সমাজে, যেখানে শোষণ, নির্যাতন, কুসংস্কারের জালে আবদ্ধ গ্রাম-সমাজ। জয়গুন এমন কোনো অসাধারণ রমণীও নয়, যাকে খুব আলাদাভাবে শনাক্ত করা সম্ভব। (মহীবুল, ২০০২ : ১৫৮)

কারণ জয়গুনের এই যুদ্ধ এ দেশের প্রতিটি পোড়খাওয়া নিম্নবর্গের নারীর। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে উপন্যাসের বর্ণনায় জয়গুন চর্মচক্ষুর কল্পনায় দৃশ্যমান হয়ে ওঠে; বাকিটা পাঠকের কাছে অদৃশ্যমান।

৬.৪

উপন্যাসে চিত্রিত সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে চরিত্রের চিত্রণ ঘটেছে বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে। ঔপন্যাসিক চরিত্রের উদ্দেশ্য, ভাবাদর্শ, চিন্তা এবং অনুভূতিকে বিশ্লেষণ করেছেন আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতকে সামনে রেখে। কোনো অস্বচ্ছতার আবরণ না রেখে ব্যক্তি

চরিত্রের অন্তর্গত প্রত্যয় ও প্রত্যাশাকে পটভূমির মানবিক আবেদনে নির্মাণ করেছেন। পরিবার, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, ধর্ম ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে পুরুষতন্ত্রের বহুমাত্রিক রূপ ফুটে ওঠে। বিদ্যমান সমাজকাঠামোয় পুরুষতন্ত্র তার অস্তিত্বকে রক্ষার যন্ত্র হিসেবে বিভিন্ন মাধ্যমকে আশ্রয় করে। ধর্ম তার মধ্যে প্রধান হাতিয়ার। ধর্মের নামে পুরুষতান্ত্রিকতা তার সমস্ত কূটকৌশলকে সামাজিকভাবে সিদ্ধ করে নেয়। পুরুষতন্ত্রের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয় নারী, বিশেষ করে সার্বিকভাবে অনগ্রসর নারী জয়গুন ও তার কন্যা মায়মুনাকে নিয়েও সেই ষড়যন্ত্র জালের বিস্তার চলেছে। মায়মুনের বিয়ে উপলক্ষে অনুষ্ঠানে মৌলভি এবং গেদু প্রধান একত্রিত হয়ে জয়গুনকে 'তোবা' বা প্রায়শ্চিত্ত করার শর্ত আরোপ করে। যার মধ্যে লুক্কায়িত থাকে জয়গুনকে গৃহবন্দি করার কৌশল। এর অর্থ জয়গুন বোঝে আর সেই কারণে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয় : 'তো'বা আমি করতাম না। আমি কোনো গোনা করি নাই। মৌলবী সা'ব বিয়া না পড়াইলে না পড়াউক। আমার মায়মুনের বিয়া দিমু না।' (আবু, ২০১৭ : ৬৮) জীবনের অচেনা পথে হাঁটতে বারবার আঘাত পাওয়ার মধ্য দিয়ে জয়গুনের মধ্যে প্রচণ্ড সংগ্রামশীল মানসিকতার জন্ম হয়েছে। সর্বংসহা জয়গুন আত্মসম্মানবোধের প্রচণ্ডতায় আপোষ করতে অস্বীকার করেছে। আবার সামগ্রিক পরিস্থিতির বৈরিতায় তাকে মাথা নোয়াতেও হয়েছে। এই 'তোবা'র অর্থ সে বোঝে, জানে যে তাকে গৃহবন্দি হওয়া, অন্নাভাবে তিলে তিলে মরে যাওয়া। তবুও আত্মজার সমূহ অমঙ্গলের কথা ভেবে সে সম্মত হয়েছে। জীবনের উপহাস তাকে পদে পদে বুঝিয়েছে ধর্ম আর সমাজের অন্তঃসারশূন্যতাকে। গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে সমাজ আর ধর্মের অনুশাসনকে উপেক্ষা করেই জীবনসংগ্রামের পথে পা বাড়িয়েছে সে :

> ক্ষুধার অন্ন যার নেই, তার আবার কিসের পর্দা, কিসের কি? সে বুঝেছে, জীবন রক্ষা করাই ধর্মের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ মূলমন্ত্র। জীবন রক্ষা করতে ধর্মের যে কোন অপ-আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে সে প্রস্তুত। উদরের আগুন নিবাতে দোজখের আগুনে ঝাঁপ দিতেও তার ভয় নেই। (আবু, ২০১৭ : ৭০)

ধর্মশাসিত সমাজে নারীর অর্থ উপার্জন অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়েছে। তাকে রোধ করতে সমাজ, পুরুষ সবাই একত্রে কাজ করেছে। পর্দাপ্রথার কারণে গ্রামীণ নারীর ঘরের বাইরে গিয়ে কাজ করা নিষিদ্ধ প্রায়। বাংলাদেশের গ্রামীণ পটভূমিতে নারী জীবিকা অর্জনের পথে এভাবেই সামাজিক প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়। জীবনের চাহিদার কাছে ধর্মের অনুশাসন খসে পড়ে। ধর্ম মানুষের নিমিত্তে, মানুষ ধর্মের নিমিত্তে নয়। জীবনের প্রতিবন্ধকতা হিসেবে ধর্ম নয়, ধর্ম জীবন যাপনের সহায়ক; অথচ সামাজিক প্রতিবন্ধকতায় ধর্মের মানবতা অপেক্ষা অমানবতায় নীতি হয়ে দাঁড়ায় (হোসনে আরা, ২০১১: ৪৫)। গোটা সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার নারীকে অবরুদ্ধ করার পথে ধর্মকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে। ধর্মকেন্দ্রিক মানুষকে শোষণ-শাসন বাংলাদেশের উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ দিক। সৈয়দ

ওয়ালীউল্লাহর *লালসালু* (১৯৪৮) সেখানে প্রধান সংযোজন বলে মনে করা করা হলেও অনেক উপন্যাসেই এই বাস্তবতার চিত্র উঠে এসেছে। সীমাহীন দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও গৃহস্থলির কাজে গৃহবন্দি রাখার মধ্যে নারীকে নিজের অক্ষমতাকে বড় করে দেখায় আর তার সক্ষমতাকে আড়াল করতে শেখায়। নারীকে সম্পূর্ণ মানুষ হতে যা বাঁধা সৃষ্টি করে, তার কর্মক্ষমতাকে ব্যাহত হয়।

৬.৫

'প্রখর জীবনবোধের প্রেরণায় নির্মিত *সূর্য-দীঘল বাড়ী* উপন্যাসের বিষয়বস্তু এবং প্রধান চরিত্র জয়গুন।' (মহীবুল, ২০০২ : ১৫৯) জয়গুনের মধ্য দিয়ে পুরো সমাজ আর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে নারীর প্রতি, কন্যাশিশুর প্রতি সমাজের দৃষ্টিপাতও জাগ্রত। জয়গুনকে শোষণের পথে ব্যবহার করেছে তার কন্যা ময়মুনাকে। তার স্বাধীন জীবন, জীবিকার পথে প্রাচীর তৈরি করতে উপলক্ষ করেছে মায়মুনার বিয়েকে। কন্যাসন্তানের প্রতি সমাজে যে বৈমাত্রেয়সুলভ দৃষ্টিভঙ্গি তা প্রকাশিত হয়েছে পিতা করিম বক্শের আচরণে। দুই কন্যাসন্তানসহ আর জয়গুনকে পরিত্যাগ করেছে করিম বক্শ; অথচ পুত্রসন্তান কাসুকে রেখে দিয়েছে নিজের কাছে। পরবর্তীতে শিশুকন্যার মৃত্যু যেমন তাকে স্পর্শ করেনি, তেমনি উপেক্ষা করেছে মায়মুনের প্রতি পিতা হিসেবে তার কর্তব্যকে। সন্তান হিসেবে মায়মুনা তার পিতার নিকট সন্তানের অধিকারও পায়নি, মর্যাদাও পায়নি। শুধু কন্যাসন্তান বলে তার প্রতি এই অবহেলা। অভাব আর দারিদ্র্যের সুযোগে দশ বছরের মায়মুনের বিয়ে হয়েছে বিপত্নীক তিরিশ বছরের ওসমানের সঙ্গে। দশ বছরের বালিকার পক্ষে ঐ পুরুষের শারীরিক চাহিদা পূরণ করা কখনো সম্ভব নয়। বিয়ের পর পর তার কর্মক্ষমতা ও শারীরিক সক্ষমতা, খাবারের চাহিদা নিয়েও প্রশ্ন তোলে শাশুড়ি। 'আমার মনে অয় গলার তন পাও পর্যন্ত বেবাকখানি ওর প্যাট। এমুন হাবাইত্যা ঘরের মাইয়া বেশী দিন ভাত-কাপোড় দিয়া রাখলে তোমারে আর বিচরাইয়া পাওয়া যাইব না– তাল্লুক-মুল্লুক বেচতে অইব।' (আবু, ২০১৭ : ৮১) তাকে বিদায় করে দেয়ার মধ্যে তাদের শ্রেয়বোধ কাজ করেছে। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে পুরুষতান্ত্রিক এ রকম বিভিন্ন অভিভাষণের জোরে নারীর চিন্তা আর আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে নারীকে দিয়েই নারী নিপীড়নের কাজটি করা হয়ে থাকে। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় প্রকরণে এমন সব পুরুষ অভিভাষণের কথামালা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এইসব অভিভাষণ শুনতে শুনতে নারী নিজের অজ্ঞাতসারেই পুরুষতান্ত্রিক ভাবনায় সংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে (সেলিনা, ২০০৮ : ১২৪)। মায়মুনা স্বামীর ঘর থেকে বের হয়ে আসার পর শফির মা তাকে বোঝায় স্বামীর ঘরই মেয়েদের আসল ঘর। এই সমস্ত ঘটনা সমাজে বিরাজমান লিঙ্গবৈষম্যের চূড়ান্ত অবস্থাকে তুলে ধরেছে। ঔপন্যাসিকের বয়ানে সেই ব্যাখ্যা নিম্নরূপ :

> পুরুষের ঘর-ই মাইয়ালোকের হাপন ঘর। হেইখানে জিন্দিগী কাডাইতে অইব। হউর -হাউরীর খেজমত করতে অইব। মরলেও হেই মাডি বুকের ওপর লইয়া তাকতে অইব। হেই মাডি ছাড়তে আছে? হেই মাডি কামড় দিয়া পইড়্যা থাকতে অয়। (আবু, ২০১৭ : ৮৩)

পুরুষতান্ত্রিকতা শুধু পুরুষই লালন করে না, নারীও লালন করে। পুরুষতান্ত্রিকতার সফলতা এখানে যে তার নির্মিত শিক্ষা আত্মস্থ করাতে পেরেছে নারীকে। শফির মা তারই একটি দৃষ্টান্ত। শফির মার মতো নিরক্ষর নিম্নবর্গের আপ্ত শিক্ষা তাকে এটা জানিয়েছে যে পুরুষ ছাড়া নারীর নিজস্ব কোনো অস্তিত্ব নেই। এ কথার মধ্য দিয়ে নারীর মনোজগতের দাসত্বকেই স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। গোটা সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে পরিবার ও সমাজে নারীর প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ আচরণ। এই ঘটনা সামগ্রিক রূপে সমাজে শৈশব থেকে জীবনকাল পর্যন্ত নারীর অবস্থানকে প্রতিম্বিত করে।

৬.৬

গবেষক হোসনে আরার নিকট জয়গুন চরিত্রকে স্কেচধর্মী বলে মনে হলেও তা তথ্যগত জীবনচিত্রের পুঞ্জীভূত রূপ। কারণ জয়গুন চরিত্রের যে পরিধি, যে প্রসারিত রূপ, তা ঐ সমাজ ও সময়ের প্রতিচ্ছবি হলেও তা বস্তুগত সত্যতায় নিবিষ্ট থাকেনি। (হোসনে আরা, ২০১১ : ৪২) উপন্যাসে সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক বিস্তৃতিকে সঙ্গে করে নিম্নবর্গের একজন নারীর মধ্য দিয়ে সমগ্র পরিপ্রেক্ষিত নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মাণ করা হয়েছে জীবনের দ্বান্দ্বিকতাকে; সমাজের কাছে আপোস করতে বাধ্য হয়েছে আবার সীমারেখা লঙ্ঘন করেছে অস্তিত্বের প্রয়োজনে। সমাজ-ধর্ম-প্রথা-সংস্কার সমস্ত হার জীবনের চাহিদার কাছে; মাতৃত্বের উদ্বেলিত ফল্গুধারার কাছে। এ প্রসঙ্গে হাসান আজিজুল হকের মন্তব্য আবারও স্মর্তব্য : 'জয়গুনের গল্প বাংলাদেশের মায়েদের গল্প, চিরায়ত বাংলাদেশের গল্প।' (হাসান, ২০১৭ : ১৮) জয়গুনের সকল শক্তি, সকল বিদ্রোহের প্রেরণা তার মাতৃশক্তি। তার মধ্যে যে জীবনমুখী, সংস্কার ভাঙার প্রবল তাড়না, তাও তার মাতৃত্বের উৎস থেকে উৎসারিত। জয়গুনকে বলা যেতে পারে মাতৃত্বের Archetype। আদিম সমাজ থেকে সভ্য সমাজ-সর্বত্র মাতৃত্ব নারীকে মহীয়ান করেছে। (হোসনে আরা, ২০১১: ৪৫) *ভোলগা থেকে গঙ্গা* উপন্যাসে রাহুল সাংকৃত্যায়ন আদিম সমাজে নারীর অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিয়েছে। ঔপন্যাসিক সব সময় চেষ্টা করেন জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে। মানবাত্মার যে বহির্বাস্তবের বিস্তার চরিত্রকে সার্বজনীন করে তাই হয়ে ওঠে সামগ্রিক সত্যের প্রতিকৃতি (রণেশ, ২০০৮ : ৪৯)। সেই বিবেচনায় জয়গুন সমকালীন প্রতিনিধি। সর্বগ্রাসী সংকটের মধ্যেও শেষ হয়ে যায়নি তার অন্তরের ঐশ্বর্য। সমাজ-সংস্কার আর পুরুষতান্ত্রিকতার মধ্যে অন্তর্হিত তার জীবনমুখী চেতনার জয়গান : 'আগেত সোনার মানিকগ লইয়া

বাইর অ। খোদার এত বড় দুইন্যায় কি আর এট্টু জায়গা পাইমু না আমরা।' (আবু, ২০১৭ : ৮৫) আপাত উন্মুল, ভাসমান পথে যাত্রা করলেও তাদের জীবনাকাঙ্ক্ষা তাদের জীবনের পথ প্রসারিত করবে।

৬.৭

সূর্য-দীঘল বাড়ী উপন্যাসে জয়গুন ব্যতীত আরো একজন নিম্নবর্গের নারী কাহিনির ব্যাপ্ততায় স্থান পেয়েছে, তিনি শফীর মা। স্বল্প আলোতে হলে প্রবীণা ভিক্ষুক শফীর মার দুঃখ-দুর্দশাক্লিষ্ট জীবনে সদা বিচরণ করেছে জয়গুনের সহযাত্রী সহমর্মী হয়ে। শফীর মা সম্পর্কে জয়গুনের ভাবি, নিরাশ্রয় জয়গুনের আশ্রয় হয়ে, সমব্যাথী হয়ে উঠেছে। দুর্ভিক্ষের ভয়াল থাবা তাকে নিঃস্ব করে পথের ভিখারী বানিয়েছে। নয় সন্তানের জননী শফীর মা আট সন্তানকে হারিয়ে একমাত্র শফীকে অবলম্বন করে জীবনসায়াহ্নের দিনগুলো অতিক্রম করে চলেছে। জীবনের বেদনাসিক্ত যে স্মৃতি তাকে ভারাক্রান্ত করে তোলে; হৃদয়ের অতলে ঢাকা পড়া ক্ষতকে তিনি ভুলে থাকতে চান :

> তার এই পঞ্চাশ বছর বয়সে সে নয় সন্তানের জননী। কিন্তু একমাত্র শফিই বেঁচে আছে–বাকী আটটির চারটি আঁতুড়েই শেষ হয়। দুটি কলেরা, আর একটি বসন্তে মারা যায়। আর একটি – তার নাম মফি, শফির দুই বছরের বড় ছিল–দুর্ভিক্ষের বছর সে কোথায় হারিয়ে গেল! শফির মা আজও এ ছেলেটির আশা ছাড়ে নি। তার ধারণা মফি এখনও বেঁচে আছে। (আবু, ২০১৭ : ৪১)

দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ নিঃসঙ্গ এই নারীর জীবনের মূল কাঠামোকে দুমড়েমুচড়ে দিলেও তার ভেতরের মানবিক মানুষটি মরে যায়নি। স্বামী পরিত্যক্ত ননদ জয়গুনকে সামাজিক সহযোগিতা ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের মানবিক সহযোগিতা করে পাশে দাঁড়িয়েছে। গ্রামের বিভিন্ন মানুষের যৌন নিপীড়নসুলভ আচরণে অতিষ্ঠ জয়গুনকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়েছে। গ্রামের সব সুবিধাবাদী প্রভুত্বশালী মানুষের কুপ্রস্তাবকে স্বভাবসুলভ সরলতার দৃষ্টিভঙ্গিতে জয়গুনের কাছে পেশ করেছে : 'আমি তোর ভালার লেইগ্যা কই কি না। বয়স ত অহনো তিরিশ অয় নাই। অহনো গণ্ডা গণ্ডা বাচ্চা-কাচ্চা পেডে ধরনের বয়স আছে।' (আবু, ২০১৭ : ৪৩) ভাইয়ের স্ত্রী হিসেবে, আপনজন হিসেবে সে জয়গুনকে গেদু প্রধানের প্রস্তাব ভেবে দেখতে বলে। যে সমাজে নারী পুরুষের ভোগদাসী, যেখানে নারীর যৌন সক্ষমতাকে বড় করে দেখা হয়। একজন নারী হয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীর প্রতি যে সহিংস মনোভাব পোষণ করে তা জয়গুন তার তিরিশ বছরের জীবনে পদে পদে অনুধাবন করেছে। গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় নারীর ভূমিকা একেবারেই গৌণ; এই ধরনের ব্যবস্থার মধ্য একজন বিবাহিত নারী তার পূর্বতন সন্তানসহ বৈবাহিক সম্পর্কে যাওয়া ঐ নারী ও সন্তানদের জন্য আরো বেশি যন্ত্রণার কারণ

হয়ে ওঠেঃ '–না বইন, বিয়া ত দুই খানে অইল। অনেক দ্যাখলাম, অনেক শিখলাম, আর না।' (আবু, ২০১৭ : ৪৩) *সূর্য-দীঘল বাড়ী* উপন্যাসে জয়গুন ছাড়াও যেসব নিম্নবর্গের নারীর দেখা পাওয়া যায় তারা অধিকাংশই নির্যাতিত, নিপীড়িত। করিম বক্‌শ তার প্রথম স্ত্রী মেহেরনকে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় নিপীড়ন করে মেরেই ফেলে। পরবর্তী স্ত্রী আঞ্জুমানকে সর্বদা ভয় সংকোচে তটস্থ করে রাখার মধ্যে করিম বক্‌শর আনন্দ। এর পাশাপাশি জয়গুনের সঙ্গে ট্রেনে চাল কিনতে যাওয়া লালুর মা, গেদীর মা, রাজার মা-সবাই একই পরিমণ্ডলের পরিবৃত্তে বাস করা নারী। বিপন্ন জীবনের রুক্ষ-কঠিন পরিস্থিতি তাদের ক্রমান্বয়ে নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর করে তুলছে। মাতৃত্বের স্নেহ-মমতা তাদের জীবনের সংগ্রামের পথে প্রেরণা হিসেবে বয়ে নিয়ে চলেছে। ভয়াবহ দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে তারা ক্লান্ত, তবু তাদের ক্লান্তি নিবারণের মতো স্নেহের কোনো সুধাময় পরশ নেই। নিম্নবর্গীয় জীবনের দুঃখ দারিদ্র্যেকে তারা জীবনের অনির্বচনীয় সত্য বলে মেনেই নিয়েছে; তবু সমাজের রোষানল তাদের প্রতি একটু সদয় হলে তারা একটু প্রশান্তির পরশ পেতে পারত।

৭.

প্রাক্-সাতচল্লিশের পর্বেই পূর্ব বাংলার নদীবিধৌত ভৌগোলিক কাঠামোতে বাংলা উপন্যাসের উপনয়ন ঘটেছিল। সেখানে চেতনাগত বিকাশের ধারায় দুটি স্রোতের আবর্তন ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল ; প্রথমটিতে ছিল সামন্ত মূল্যবোধে বিশ্বাসী চেতনাজাত বহিঃপ্রকাশের ধারা। অন্যটি ছিল উদার বুর্জোয়া মানবতাবাদে বিশ্বাসী চেতনাগত প্রকাশ। যেই সমাজের বিন্যাস যত জটিল, স্তরবহুল ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় সেই সমাজের জনগোষ্ঠীর মানসগঠন, মস্তিষ্ককোষও ততো বেশি সূক্ষ্মতায় পূর্ণ। ঐ সমাজস্থত মানুষের জীবনের বহুবর্ণিল ধারাকে প্রতিমূর্ত করে তোলেন একজন ঔপন্যাসিক। কেবল জীবনের অবলোকন আর রূপায়ণই ঔপন্যাসিকের সাফল্যকে উপদিষ্ট করে না। তারও চেয়ে অধিক ফলপ্রসূ হয় মানুষের অস্তিত্ব-সংরাগের বিচিত্র সত্তাসমূহকে শিল্পের অনিবার্য আকারে প্রতিমূর্ত করার মধ্যে। এক্ষেত্রে বলা চলে, ঔপন্যাসিকের বিষয়জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে তার সময়জ্ঞান, সমাজজ্ঞান, ইতিহাসজ্ঞান এবং ব্যক্তিমানসের জ্ঞান-এই সমস্তের বিষয়ের সারাৎসার (রফিকউল্লাহ, ১৯৯৭ : ৫৫)। ইতিহাসের এই স্বভাবসুলভ নিয়মকে ধারণ করে পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের উপন্যাসের যাত্রা সূচিত হয়েছিল। সেখানে বাংলাদেশে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা ও জীবনযুদ্ধ বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছিল আবু ইসহাকের (১৯২৬-২০০৩) ঔপন্যাসিক সত্তায়। নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদী ও নদীকেন্দ্রিক জীবন নিয়ে বেশ কিছু বিশিষ্টতাসূচক উপন্যাস রচিত হয়েছে। তার মধ্যে কাজী আব্দুল ওদুদের *নদী বক্ষে* (১৯১৯), হুমায়ুন কবীরের *নদী ও নারী* (১৯৪৫), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মা*

নদীর মাঝি, সমরেশ বসুর *গঙ্গা* (১৯৫৭), অদ্বৈত মল্লবর্মণের *তিতাস একটি নদীর নাম* (১৯৫৬) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর *কাঁদো নদী কাঁদো* (১৯৬৫) প্রভৃতি উপন্যাস। এই ধারার আরো একটি সংযোজন *পদ্মার পলিদ্বীপ* (১৯৮৬)। (হোসনে আরা, ২০১২; ১০) নদীমাতৃক বাংলাদেশের জীবনধারার বিশ্বস্ত প্রতিনিধি এই সমস্ত উপন্যাস। নদীকেন্দ্রিক জীবনের দ্বন্দ্বমুখরতা ও সংগ্রামী প্রতিবেশের পাশাপাশি, নিম্নবিত্তের জীবনের বহুমাত্রিক সংকট-সংকীর্ণতার প্রতিফলন ঘটে থাকে। বাংলাদেশের সামগ্রিক জীবনবাস্তবতার যা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

৭.১

বাংলাদেশের ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্যের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো নদী ও চরকেন্দ্রিক জীবনব্যবস্থা। বাংলাদেশ নামক এই ভূখণ্ডের সমাজজীবন ও সংস্কৃতির ধারায় এই ঐতিহ্যে স্বতন্ত্ররূপে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। জীবনের রূপ ও স্বরূপ যেকোনো জনগোষ্ঠীর শিল্পকে প্রভাবিত করবে এটাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত। শিল্পীর অভিজ্ঞতা ও জীবনদৃষ্টির সহজাত প্রেরণা নতুন মাত্রা যোগ করেছে লেখকের শিল্পস্বভাবে। নদী, চর ও দ্বীপের ভাঙা-গড়া ও অস্তিত্বসংগ্রামের ক্রমধারা বাংলাদেশের উপন্যাসের অন্যতম প্রধান প্রবণতা। জনমানুষের জীবনের সঙ্গে শিল্পের অনিবার্য সম্পর্কের সূত্র বিচার করলে নদীর ভাঙা-গড়ায় লালিত জীবনের সুর বাংলাদেশের সাহিত্যে প্রাধান্য বিস্তার করবে তা খুব স্বাভাবিক ও সহজাত। (সৈয়দ আকরম, ২০০৮ : ৯৩) এর পাশাপাশি রাজনৈতিক সংক্ষুব্ধতা ঐ জনজীবনে বিভিন্ন ধরনের দ্বন্দ্বময় পরিবেশের জন্ম দিয়ে থাকে। সময় ও সমাজের অভিজ্ঞতা নদী ও নদীতীরবর্তী জনজীবনে নানামাত্রিক সংক্ষুব্ধতাকে বেগবান করে তোলে। গ্রামীণ জীবনের সমাজসত্যের সমগ্রতা ঔপন্যাসিক আবু ইসহাকের নিরাসক্ত শিল্পদৃষ্টির এক প্রাগ্রসর প্রতিভার পরিচয়। নদীমাতৃক বাংলাদেশের মৃত্তিকাসংলগ্ন জীবনের কর্মধারা ও আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিন্যাসের সুস্পষ্ট প্রকাশে *পদ্মার পলিদ্বীপ* বাংলা উপন্যাসের এক তাৎপর্যপূর্ণ নির্মাণ।

৭.২

উপন্যাসে উন্মোচিত কাহিনির পরিপ্রেক্ষিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজাত দুর্ভিক্ষের রূঢ় পরিবেশ মানুষের বাঁচার পথকে সংকীর্ণ করে তুলেছে। মানুষ তার অস্তিত্বের প্রবাহে গা ভাসিয়ে চলার শক্তি অর্জন করতে তৎপর হয়েছে। সেই সময়ের প্রবাহে দাঁড়িয়ে এরফান মাতব্বরের পুত্র ফজলকে শখের মাছ শিকারকে সাময়িক পেশা হিসেবে নিয়ে জীবনকে চালিয়ে নিতে হয়েছে। মাছ শিকারের প্রয়োজনে আগত ফজল রাত্রির অন্তিমাংশে জনবিরল পদ্মার প্রবাহে জাগ্রত ভূমির পূর্বাভাস লক্ষ করে। বারি রাশির প্রবল প্রবাহে

সক্রিয় ভূমির সজাগ অস্তিত্ব পদ্মাবক্ষে লালিত মানবসন্তানের পক্ষে সহজে অনুধাবন করা তার সহজাত বৈশিষ্ট্য। দশ বছর পূর্বে লাটবনিয়ার নরম পলিকে নিজেদের দখলে নিতে গিয়ে স্বজন হারানোর যে যন্ত্রণা ফজল ও তার পরিবার বহন করে চলেছে; তার স্মৃতি আজও জাগ্রত ক্ষত হয়ে আছে তার জীবনীশক্তির অন্তরাত্মায় :

> দশ বছর আগে একবার জেগেছিল এ চর। তখন নাম ছিল লটাবনিয়া। এ চরের দখল নিয়ে মারামারি হয়েছিল দুই দলে। দুই দলেরই প্রধান ছিল এরফান মাতব্বর আর চেরাগ আলী সরদার। দুই দলের পাঁচজন খুন হয়েছিল। এরফান মাতব্বরের দলের দু'জন আর চেরাগ আলীর দলের তিনজন। এরপর থেকেই লোকের মুখে মুখে লাটবনিয়ার নাম হয়ে যায় খুনের চর। এরফান মাতব্বরের বড় ছেলে রশীদ চরের এ মারামারিতে খুন হয়েছিল। (আবু, ২০১৬ : ৯১)

আত্মজের রক্তে রঞ্জিত খুনের চর খুব বেশি দিন আত্মগত রাখতে পারেনি এরফান মাতব্বর। অল্প দিনের ব্যবধানে চরটি পদ্মার গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। সেই চরটিই আবার জেগে উঠেছে, এখান থেকেই উপন্যাসের শুরু এই মূল ঘটনার পাশাপাশি উপন্যাসে গুরুত্ব পেয়েছে নর-নারীর অপ্রতিরোধ্য আদিম-বাসনার চিহ্নরাজি। অন্তর্জগতের এই চাহিদার কাছে নারী-পুরুষ, সমাজ, সংস্কার ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি কতটা অসহায় তার, অন্তর্দাহ বিশেষ ভূমিকা রেখেছে উপন্যাসের প্লট নির্মাণে। চর-দখল-বেদখল করার কাজে নিয়োজিত মানুষগুলো কী রকম সমস্যায় আবর্তিত হয়েছে, তার যথার্থ বাস্তব চিত্র বিনির্মাণে ঔপনাসিক আবু ইসহাকের নিষ্ঠা নিয়ে সমালোচকের মতামত :

> পদ্মার পলি সারা অঙ্গে মেখে নিয়েই যেন এই উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র কথা বলেছে। চরের ভাঙ্গা-গড়া এখানে ধরা দিয়েছে জীবনের আরেক নাম হয়ে। উপন্যাসের প্রতিটি অধ্যায়ে বাঙ্ময় হয়ে যেন পদ্মার চর-পদ্মার পলিদ্বীপ। উপন্যাসে যে সব চরিত্র চিত্রিত হয়েছে–তারা আশায়-আকাঙ্ক্ষায়, আনন্দ-বেদনায়, ক্রোধে-বিদ্বেষে, প্রতিহিংসায়-–মমতায় একান্তভাবেই সেই মাটির মানুষ, যে মাটিকে আকড়ে ধরে আবহমান কাল থেকে জীবনের ধারা কখনো সাধনায় মগ্ন কখনো সংগ্রামে লিপ্ত। উপন্যাসের নায়ক কিংবা নায়িকা -– উপনায়ক বা পার্শ্বচরিত্রের আর আর যারা –তারা কেউ অতি মানুষ নয়; আবার পুরো অমানুষও নয় । (ফজলুল, ২০০৭ : ১০১)

পদ্মার পলিদ্বীপ উপন্যাসের সার্বিক বিবেচনায় প্রধান চরিত্র ফজল। সময়ের ঘূর্ণিবর্তে একটি জনগোষ্ঠীর মানুষের জীবনের উত্থান-পতন, সংগ্রামী চেতনার মধ্য দিয়ে ফজল চরিত্রের বেড়ে ওঠা। চরজীবনের চরম বাস্তবতা অনুসারে চরিত্রের অন্তর্জগৎ নদীর ভাঙা-গড়ার মতো বহুমাত্রিক টানা-পোড়নের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। ফজলকে কেন্দ্র করে উপন্যাসে দুজন নারীর আগমন ঘটেছে, একজন তার প্রাক্তন, আর একজন তার বর্তমান স্ত্রী। তবে উপন্যাসের কাহিনিপর্বে বর্তমান অপেক্ষা

প্রাক্তন বেশি সক্রিয়, সংবেদনশীলতায় পরিণত হয়েছে রক্ত-মাংসের মানবীতে। ফজলের জীবনের বর্তমান আর প্রাক্তন নিয়ে দ্বন্দ্ব আর দোলাচলতার যে আবহ, সেখানেও মূর্তমান হয়ে রয়েছে বাংলাদেশের চরাঞ্চলের প্রতিবেশ। চরাঞ্চলের জীবনের সংস্কারাচ্ছন্ন ও অজ্ঞতার দিককেও স্পষ্ট করতেই লেখক নারী-পুরুষের দাম্পত্যে ক্ষমতা, প্রভাব ও সামন্তবাদী অভিভষণের বিষয়টিকে স্পষ্ট করেছেন। ফজলের পিতা এরফান মাতব্বর তার ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের বশবর্তী হয়ে বিনাশ করেছেন ফজল-জরিনার দাম্পত্যের সম্পর্ককে। অন্যদিকে ফজলের পরবর্তী স্ত্রী রূপজানকে অবরুদ্ধ করে তার পিতা এই দাম্পত্যকে নিয়ে এসেছে ভাঙনের মুখোমুখি। সেখান থেকে সংকটের সূচনা; পূর্বজনের আগমন কাহিনিকে দ্বান্দ্বিক পরিবেশের পরিসরতায় করেছে আবর্তিত। এই দ্বন্দ্বের দোলাচলে ফজলের জীবন কখনো চরের মতোই হয়েছে সম্ভাবনাময়, আবার কখনো পদ্মার মতোই হয়েছে অনিশ্চিত। পুরো উপন্যাস পদ্মাকে ঘিরে। পদ্মার বুকে লালিত মানুষের জটিলতা, কুটিলতার মধ্যেও প্রেম-বিরহ-বিচ্ছেদ-যন্ত্রণার পরিপ্রেক্ষিতকে ঘিরে। সেখানে দুঃখিনী জরিনা সামাজিক সংস্কার আর প্রভাবশীলতার হীন ষড়যন্ত্রের শিকার। চরজীবনের এই শক্তি, প্রভাব আর সংগ্রামের জীবন পুরুষময়; পুরুষতন্ত্রের প্রবল প্রতাপে নারী এখানে এক দূরাগত ভূমির যাত্রী। বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদে নারীর যে ভঙ্গুর দশা, তা আরো প্রবলভাবে লক্ষ করা যায় এই উপন্যাসে। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের নর-নারীর বিবাহ, প্রেম ও দাম্পত্য জীবন সম্পর্কিত নিয়মনীতি অনেকটাই পরিবারের প্রধান, মুরবি মাতব্বর বা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ইচ্ছা বা মর্জির ওপর নির্ভর করে। *পদ্মার পলিদ্বীপ* উপন্যাসের গ্রামীণ মানুষের জীবনে এই জাতীয় সিদ্ধান্ত কী ধরনের সংকট তৈরি করে, তার একটি বাস্তবানুগ চিত্র উদ্ভাসিত হয়েছে। এর পাশাপাশি উপন্যাসে আছে একটি আইনের কথা, ১৯২৯ সালের বাল্যবিবাহ নিরোধসংক্রান্ত সারদা আইন। এই আইনের প্রভাবে গ্রামীণ সংস্কার অনুযায়ী অল্প বয়সে ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিতে পারবে না; সেই ভয়ে গ্রামগঞ্জে বিয়ের হিড়িক পড়ে যায়। এই আইন আর ভীতির মুখে এগারো বছরের বালক ফজলের সঙ্গে দশ বছরের জরিনার বিয়ে দিয়েছিল তাদের অভিভাবকগণ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বয়স বাড়ে, চেতনার জগতে বিস্তৃতি আসে। পাঁচ বছর পর জরিনা ও ফজলের মধ্যে একটি হৃদয়িক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে (গিয়াস, ২০০২ : ৩৫)। ফজলের পিতা এরফান মাতব্বর এই সম্পর্ককে দৃষ্টিকটু ও অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করে। ঔপন্যাসিকের বয়ানে তা নিম্নরূপ :

> পনেরায় পা দিয়ে জরিনা গা গতরে বেড়ে ওঠে লকলকিয়ে। জরিনার শ্বশুর এরফান মাতব্বর চিন্তিত হয়। কারণ মেয়ের অনুপাতে ছেলে বড় হয়নি। আর ফজল তখন স্কুলে পড়ে। এ সময়ে বউয়ের আঁচলের বাঁও

> যদি ছেলের গায়ে লাগে একবার, তবে কি আর উপায় আছে? লেখাপড়া একেবারে শিকেয় উঠে যাবে। (আবু, ২০১৬ : ৮৬)

এই অজুহাতে প্রথমে জরিনাকে বাবার বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হলো। এরপর তাদের যোগাযোগ বন্ধ করে বিচ্ছেদ ঘটানো হলো। যে সম্পর্কের শুরু ও শেষ কোনোটাতেই তাদের মতামত ছিল না। সবটাই ঘটেছে অভিভাবকদের অযাচিত আচরণে। এখানে পাত্রপক্ষ হিসেবে এরফান মাতব্বরের সরব উপস্থিতি থাকলেও পাত্রীপক্ষের অভিভাবকের কোনো মতামত লক্ষ করা যায়নি। এরফান মাতব্বরের মতো ক্ষমতাবান অভিভাবকের অবিমৃষ্যকারী সিদ্ধান্তে পিতৃমাতৃহীন জরিনার জীবন নিমজ্জিত হলো চির-অন্ধকারে। এই ঘটনার বিস্তার এটাই প্রমাণ করে যে :

> নারী পুরুষের হাতের ক্রীড়নক মাত্র, এখানে নারীর মতামতের প্রতি কিছু মাত্র ভ্রুক্ষেপ করা হয় না। প্রতিনিয়ত শক্তিমান পুরুষেরা পদদলিত করে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা মানবিক চেতনার স্বাভাবিক স্ফূর্তিকে। (হাসান, ২০১৭ : ১৪১)

জরিনার দ্বিতীয় বিবাহের ক্ষেত্রেও একই নিয়মের অনুবর্তন। যেন সমাজের চোখে সে মস্ত বড় অপরাধ করেছে; যার শাস্তি স্বরূপ হাত-পা বেঁধে তাকে নির্বাসনে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। হেকমতের সঙ্গে তার যে বৈবাহিক জীবন তাকে নির্বাসন ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

৭.৪

উপরিউক্ত পরিপ্রেক্ষিতের বিচারে স্পষ্ট হয়েছে গ্রামীণ সমাজে নারীর অবস্থান। জরিনা একজন গ্রামীণ নারী হওয়ায় তার বাল্যবিবাহ, তুচ্ছ কারণে বিবাহবিচ্ছেদ, সমস্ত ঘটনার পরিক্রমা প্রমাণ করেছে পুতুল সাদৃশ্য মানুষরূপে। দাম্পত্য সম্পর্কের বিচ্ছেদে পুরুষ হিসেবে ফজলের জীবনে তৈরি করেনি কোনো প্রতিবন্ধকতা; কারণ সে পুরুষ। প্রচলিত সামাজিক সংস্কারের কাছে নারী শুধুই ভোগ্য পণ্য; একজনের পরিবর্তে আর একজন আসলেই শূন্যস্থান পূরণ হয়ে যায়। সেই সামাজিক বোধ থেকেই জরিনার প্রতি এই অনাচার করা সম্ভব। তারপর জরিনার পৈতৃক অবস্থানের নাজুকতা এরফান মাতব্বরকে তার এই অন্যায় আচরণকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রলুব্ধ করেছে। সামাজিক এই সমস্ত অসন্তোষের বাইরে থেকে যায় দুটি কোমল মনের অস্ফুট মনের প্রেমের আবাহন; যার কুড়িতেই বিনাশ ঘটেছিল সেদিন। জরিনার অভুক্ত ভালোবাসার পিপাসা একদিন অনাকাঙ্ক্ষিতভাবেই পেয়েছিল পরিণতির পথ। ফজলের বর্তমান স্ত্রী রূপজানের পিতা যখন তাদের মিলনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তখন সেই পথের অন্ধকারের গা বেয়ে জরিনা পৌঁছায় তার পরম আরাধনার পুরুষ ফজলের শয্যা সান্নিধ্যে : 'বিকাশোন্মুখ সে পুরুষটি এখন পূর্ণ বিকশিত।...তার অঙ্গে প্রত্যঙ্গে শক্তির সজীবতা,

আজকের সান্নিধ্যের এমন অপূর্বতায় তা স্পষ্ট অনুভূত।' (আবু, ২০১৬ : ৮৮) জরিনার প্রথম প্রেমের অতৃপ্ত বাসনার নাম ফজল। বাল্যবিবাহের অভিশাপ তাকে নিয়ে এসেছে ফজলের কাছে। বিয়ে আর তালাক নামের এক ভয়ঙ্কর খেলা চলে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে। সমাজ আর সমাজপতিগণ যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই এই খেলায় লিপ্ত হয়ে ওঠে আর আইনও সেখানে নির্লিপ্ত থাকে। বাংলাদেশে গ্রামীণ সমাজে অর্থনৈতিক অসচ্ছল বা নিম্নবর্গীয় নারীর সামাজিক অবস্থান অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। মানুষ হিসেবে যা নারীর স্বাভাবিক বিকাশের সুস্থ পথকে করেছে রুদ্ধ। জন্মের পর থেকে একজন কন্যাশিশুকে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে বড় হতে হয়। জীবনভর অসম পরিবেশের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যেতে হয় নারীকে। বিয়ে, তালাক, যৌতুক, নানাবিধ সামাজিক দীনতা নারীর অবস্থানকে করে তোলে হেয় ও যন্ত্রণাময়। সামাজিক রীতির সঙ্গে ধর্মীয় রীতির অন্ধ উন্মাদনা নারীর স্বার্থকে অবদমিত করে; সেই সঙ্গে নারীকে অধস্তন করে রাখার সংস্কৃতিকে রাখে অব্যর্থ। জরিনার জীবনের অন্ধকারের অধ্যায়ের আড়ালে কলকাঠি নেড়েছে সমাজের দুরভিসন্ধিমূলক এই সব সামাজিক রীতিনীতি (আব্দুল, ২০১১ : ১২)। শৈশবের কোমলতায় বরণ করা স্বামী ফজল আজ তার কাছে দূরদেশের তারা। পেশায় চৌর্যবৃত্তিক হওয়ায় স্বামী হেকমত ঘরে থাকে না। দারিদ্র্যের আঘাতে নিমজ্জিত জীবনকে বয়ে নিতে সে আজ রূপজানের পিতার গৃহ দাসীতে পরিণত হয়েছে। পেটের ক্ষুধার নিবারণ ঘটলেও অভুক্তই রয়ে যায় তার শরীরের ক্ষুধা। এরফান মাতব্বর জরিনার জীবন থেকে ফজলকে সরিয়ে দিলেও নিয়তির দুর্নিবার সনির্বন্ধ মিলিয়ে দিয়েছে তাদের। সবার অজান্তে নিকষ কালো রাতের অন্ধকারে প্রেমময়ী জরিনা তার কাঙ্ক্ষিত পুরুষ, প্রাক্তন স্বামী ফজলের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। জীবনের এক গভীর ছলনার চোরাবালিতে নীরবে জ্বলছে দুজন মানুষ, তাদের না বলা বেদনার দীপশিখায়; রক্তমাংসের অমোঘ দাবির কাছে তারা পরাজিত:

> সে ভুলে যায় ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়। ভুলে যায় নিজের নাম-পরিচয়। এ মুহূর্তে তার কোনো নাম নেই, পরিচয় নেই। এখন সে শুধু একটি পুরুষ। তার দেহ অতিথি হয়েছে যে দেহের, তা শুধু একটি রমণীর। তারও কোনো নাম নেই, পরিচয় নেই।এ মুহূর্তে পরিচয়ের কোনো প্রয়োজনও বোধ করে না তারা। দুটি নর-নারী। আদিম রক্তবাহী দুটি দেহ। রক্ত-মাংসের অমোঘ দাবির কাছে তারা পরাজয় মানে। এক দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাথী খুঁজে পায় অন্য দেহে। তারা মগ্ন হয় উচ্ছল আলাপনে, এক হয়ে দোলে তরঙ্গের দোলায়। (আবু, ২০১৬ : ৫৭)

রাত্রির এই নির্জনতায় জরিনা তার সারা জীবনের অপূর্ণ সাধকে পূর্ণ করে নিয়েছে। অভুক্ত অপমানিত যৌবনের প্রবল কামনা তাকে নিয়ে গিয়েছে ফজলের অন্তরঙ্গতায়। *পদ্মার পলিদ্বীপ*-এ জরিনার সংসার ভেসে গেলেও প্রেম ভেসে যায়নি। সেখানে ফজলের জন্য তার পূর্বরাগের সঞ্চার আজ আগের মতো

কম্পন জাগায়। নিজের হারানো প্রেমকে ফিরে পেতে সে দ্বিধান্বিত নয়, ফজলের পৌরুষদীপ্ত সান্নিধ্যকে সে সানন্দে গ্রহণ করেছে। 'পলাতক অতীত ফিরে আসে। সাত বছরের বিচ্ছেদ-প্রাচীর ডিঙিয়ে সে অতীত আশ্রয় খোঁজে বর্তমানের বুকে।' (আবু, ২০১৬ : ৫৭) এই রাতের স্পর্শ-কাতর ক্ষণটি জরিনার কাছে মূল্যবান সম্পদে পরিণত হয়েছে। এই রাতের ফসল জরিনার গর্ভে বেড়ে ওঠে, জৈবিক স্বাদের আস্বাদন তাকে করেছে আলোড়িত। যে সত্যের গহ্বর কেউ খুঁজে পাবে না, তাকে ধারণ করে সামনে এগিয়ে যায় জরিনা। দুর্ভাগ্যের করালছায়া চিরদিনের জন্য অন্ধকারে ছেয়ে দিয়েছে জরিনার জীবনকে। সেই আঁধারের সীমানা অতিক্রম করে আলোর পৃথিবীর আলোকশয্যায় তার আর ফেরা হবে না। তবু যে প্রেম সে ফেলে এসেছে, তাকে গ্রহণ করার সুযোগে সে অপ্রতিরোদ্ধ। পাপ-পুণ্যের সীমানায় আবদ্ধ না থেকে তাকে গ্রহণ করাই জীবনের ধর্ম বলে মনে করেছে সে। সমগ্র উপন্যাসে জরিনার জীবনের এই অভিসারপর্ব তাকে অন্য সব নারীর তুলনায় উজ্জ্বলতা দান করেছে। রক্তমাংসের মানুষ হয়ে নিজের অপূর্ণ অধিকারকে পূর্ণতা দিয়েছে, প্রতিষ্ঠিত করেছে ব্যক্তিক চাওয়াকে। সমাজ, ধর্ম সবার রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে প্রতিষ্ঠিত করেছে তার অধিকারকে। তার চরিত্রের এই আলোকিত দিককে এভাবে অভিবাদন জানিয়েছেন গবেষক :

> পল্লীর সোঁদা মাটির গন্ধে লালিত এবং বর্ধিত জরিনা নানা ঘাত-প্রতিঘাত মুখর এবং উপন্যাসের ঘটনা প্রবাহের অন্যতম নিয়ামক। অভুক্ত অপমানিত যৌবনে প্রবল কামনা, ভালোবাসার সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা, পাপ-পুণ্য বোধ এবং অভাব-অনটনে নিয়ত সংগ্রাম ইত্যাকার টানাপোড়নে সে জর্জরিত হয়েছে, ভাগ্যের হাতের ক্রীড়ানক হয়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। (রজিকুল, ২০০৭ : ৬৭)

জরিনার ভালোবাসা, তার পূর্ণতা, তার স্পর্ধিত ব্যক্তিত্বেরও প্রমাণ। ভালোবাসার দায়বদ্ধতা থেকে সে ফজলকে তার দারিদ্র্যপূর্ণ অবস্থার মধ্য দিয়েও আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছে। বিনিময়ে কিছুই আশা করেনি, এমনকি সে যে ফজলের সন্তানের মা হতে চলেছে, তাও তাকে জানায়নি। জরিনা দরিদ্র হলে তার আত্মজ্ঞান আছে; নিজের ভালোবাসার দায়িত্ব সে, নিয়ে ফজলকে নিরাপদ রেখেছে। ফজলের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা তার একমাত্র ধ্যান ও ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্পূর্ণ নিঃস্ব, রিক্ত এক জীবনপথের যাত্রী হয়েও সমাজ-সংসারের ভয়কে পেছনে ফেলে জেল পলাতক ফজলকে আশ্রয় দিয়েছে। সময়ের বিচিত্র বীক্ষায় সে আজ হেকমতের স্ত্রী হলেও এই পরিচয় তার আকাঙ্ক্ষিত নয়। বরং ক্ষমতাবান পুরুষতন্ত্রের আরোপিত সিদ্ধান্ত তাকে বয়ে বেড়াতে হয়েছে। সে কারণে ফেলে আসা অতীত তার কাছে আজও সজীব আর সতেজ। তার আহ্বানকে সে অস্বীকার করতে পারে না। নিয়তির এই দুর্যোগপূর্ণ জীবনকে সে মেনে নিলেও, তার মন মানেনি। তাই তার সবটুকু দিয়ে সে তার প্রেমকে পূর্ণতা দিয়েছে, ভালোবাসার সাধকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মানবমনের এই বহমানতা

সমাজ-সংসারের কাছে অনৈতিক বা অযথার্থ বলে মনে হলেও মানবিক স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের কাছে তা যথার্থই পরিশুদ্ধ ও পরিমেয়।

৭.৫

নরনারীর ব্যক্তিজীবনের সামগ্রিক রূপায়ন ও সত্যানুসন্ধানই উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। চরিত্রের মনোবিশ্লেষণের আলোকে তার অন্তর্লোকের আবরণ উন্মোচন করা, ব্যক্তিচরিত্রের অন্তর্নিহিত সত্য বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠা করা উপন্যাসের মৌল প্রেরণা। জরিনার অপূর্ণবাসনার তৃপ্তি ঘটলেও সামাজিক সংস্কার আর বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব তাকে বিদীর্ণ করেছে। একদিকে সমাজ আর ধর্মের ভীতি আর একদিনে প্রিয় মিলনের আকুলতায় দোদুল্যমায়তা। জেল পলাতক ফজল জরিনার ঘরে আশ্রয় নিতে হাজির হলে প্রথমে জরিনা কিছুটা কুণ্ঠিত হয়েছে; আবার দ্বিধা-উত্তীর্ণ হয়ে সে কামনা করেছে ফজলের সান্নিধ্য। ফজলের পছন্দের খাবারের আয়োজন করেছে, তারপরও দোটানায় জীর্ণ করেছে তাকে। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় :

> হঠাৎ তার মনে হয়, বেগানা পুরুষের জন্য এমন করে চিন্তা করা তার অন্যায়। ঘোর অন্যায়। নিজের স্বামীর জন্য সে-তো এমন করে ভাবে না। তার স্বামী ফেরার। পুলিসের ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। কি খায়, কোথায় থাকে, ঠিক-ঠিকানা নেই। তার জন্য একফোঁটা পানিও ঝরে না তার চোখ থেকে।.... সে অজু করে নামাজের জন্য দাঁড়ায়। অজু করা সত্ত্বেও কেমন না-পাক মনে হয় তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। সারা শরীর ছেয়ে রয়েছে কেমন এক অশুচিতা। (আবু, ২০১৬ : ১২৩)

জরিনার মনের এই দ্বিধা, এই দ্বন্দ্বের জন্ম দিয়েছে সমাজ, ধর্ম আর তাদের তৈরি সংস্কার। অথচ এই সমাজ যখন তার নিরাপদ জীবনের আশ্রয়টুকু কেড়ে নিয়েছে, তখন কেউ এগিয়ে আসেনি। দ্বিতীয়বার বিয়ের নামে একজন অপরাধীর সঙ্গে হাত-পা বেঁধে তাকেও গ্রামের শেষ প্রান্তে জনবিবর্জিত ভূমিতে ফেলে রেখেছে তাকে; সেখানও সমাজ বা ধর্ম তার হয়ে কোনো প্রতিকার করেনি। তবু জরিনাকে সমাজ নিয়ে ভাবতে হয়, সমাজের নির্ধারিত শুচিতা-অশুচিতা তার মনে দ্বিধার দেয়াল তুলে তাকে জর্জরিত করেছে। সামাজিক শুচিতা আর কামনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে তার মানবিক সত্তারই জয় হয়। এখানে জরিনা বহু দ্বন্দ্বে, বহু কৌণিকতায় ছিন্নভিন্ন এক নারী :

> জরিনা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। তার বুকের ঝড় ছিন্নভিন্ন করে দেয় সব বাঁধা-বন্ধন। চোখের প্লাবনে ভেসে যায় সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। সে চোখ মুছে ঘোমটা টেনে ধীর পায়ে এসে দাঁড়ায় রান্নাঘরের দরজায়। (আবু, ২০১৬ : ১২৫)

শুরু থেকেই জরিনা চরিত্রটি দ্বন্দ্বে মুখর। আর্থিক দীনতা তাকে দাসী বানিয়েছে, ভালোবাসার অপূর্ণতা তাকে ফজলের প্রতি অনুরক্ত করেছে। জরিনা আহত হয়েছে, ভেঙে পড়েনি, তার ধর্মীয় সংস্কার তাকে এই প্রবোধ দিয়েছে এভাবে : 'হঠাৎ জরিনার বেদনাভারাক্রান্ত মনটা হালকা মনে হয়। ফজল হবে তার দোজখের সাথী। রূপজান সতী-সাধ্বী, নিষ্পাপ।' (আবু, ২০১৬ : ১৩৪) নারীর চিরায়ত প্রেম, প্রণয়ের আলিঙ্গন আর ঘৃণায় আবর্তিত করেছে জরিনার জীবনকে। সমস্ত সংকোচ আর দ্বিধাকে অতিক্রম করে জরিনা শত দারিদ্র্যে জর্জরিত সংসারে প্রেমিক তথা পূর্বতন স্বামীর পছন্দের খাবারের আয়োজন করেছে। লোকচক্ষুর অন্তরালে তাকে প্রাণ ভরে খাওয়াবে বলে তার প্রাণাতীত প্রচেষ্টা। শাশুড়িকে ভালোবাসায় ভরিয়ে আত্মীয়ের বাড়িতে পাঠিয়ে নিরালায় ফজলকে দুচোখ ভরে দেখবে বলেও তার এই আয়োজন। শত সংশয়তার পরও তার যে অন্তর্জারিত প্রণয়াকাঙ্ক্ষা তা জরিনাকে করেছে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। রাধার মতো কৃষ্ণমিলনের সমূহ সম্ভাবনায় তার শত প্রচেষ্টা। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মত :

> এতে গ্রাম-বাঙলার এক অন্ত্যজ নারীর খাদ্যসংগ্রহ ও রন্ধনের কিছু নিবিড় চিত্র উঠে এসেছে। এই বর্ণনার দ্বারা উপলব্ধ হয় পরম কাঙ্ক্ষিত পুরুষের জন্য সমাজ-সংসারকে অগ্রাহ্য করা জরিনার নিবিড় প্রেম । (হাসান, ২০১৯ : ১৪০)

সমাজ ও সংস্কারের অন্ধ আগ্রাসনে নারীর জীবন যতই শুষ্ক মরুভূমি হোক, তবু চাতকের মতো একটু মেঘের আভাসে তা আবার প্রেমের লাবণ্যে সপুষ্ট হতে উদ্‌গ্রীব থাকে। বৈষম্যমূলক সমাজে নারীর শোষণ বহুমুখী। এই শোষণের রোষানলের বন্দিত্বের সীমা নেই; তাই জীবনের প্রতি ভালবাসার পরিবর্তে জাগে বিতৃষ্ণা, ঘৃণা ও হতাশা। নৈরাশ্যের বাধাতীরে বারবার প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে নিজের কাছে, তবু প্রেমিকের মঙ্গলকমনায় নিজের জীবনকে বিপন্ন করেছে। যার পরিণতিতে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হয়েছে জরিনার। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নবর্গীয় নারীকে এভাবেই জীবনের ঘাটে ঘাটে দাম দিতে হয়। ফজলের শত্রুপক্ষ জঙ্গুরুল্লা যখন হেকমতের মতো নিম্নবর্গীয় মানুষকে হত্যা করে তার দায় ফজলের ওপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছে, সেখানে প্রতিবাদ করেছে জরিনা। তার এই আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ফজলের প্রতি তার দুর্নিবার প্রেম যেমন সত্য, তেমনি সত্য মানবতার পক্ষে তার বিড়ম্বিত জীবনকে বিলিয়ে দিয়েছে। ফজলের প্রতি জরিনার চির-অবদমিত প্রেম এভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। নিম্নবর্গীয় জীবনের এ এক অতিপরিচিত সত্য, উচ্চবর্গ আর তাদের ক্ষমতার কাছে জরিনাদের জীবন তুচ্ছ-মূল্যহীন এক সত্তা।

৮.

শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম (১৯২৬-১৯৯৭) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানান অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এক বরেণ্য কথাকার। শিল্প-সাহিত্যের প্রতি অপরিসীম কৌতূহল তাঁকে প্রেরণা জুগিয়েছিল ইউরোপের দেশে দেশে, পথে পথে পরিভ্রমণের। মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) মতো তিনিও দেশ, দেশের মানুষ ও দেশের মাটিকে তপস্যাজ্ঞান করেছিলেন। তাঁর সাহিত্যিক মানস গঠিত হয়েছিল দুটি বিশ্বযুদ্ধ-মধ্যবর্তী অস্থির সময়ের আবহে। সাহিত্যিক শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের সমৃদ্ধ পথের প্রসারতায় উজ্জ্বল নির্মিতি *কাশবনের কন্যা* (১৯৫৪)। তাঁর সর্বাধিক পাঠকপ্রিয় ও নন্দিত উপন্যাসও বটে। শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম তাঁর সাহিত্যিক মননশীলতায় 'দেশজ সংস্কৃতি ও জীবন'-এর প্রতি ছিলেন গভীর অনুভূতিশীল ও দায়বদ্ধ। তাঁর প্রথম উপন্যাসেই সেই উপলব্ধি ও অনুরাগের ছাপ স্পষ্ট :

> *কাশবনের কন্যা* -র প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। শুধু প্রচ্ছদই নয়, উপন্যাসটির অঙ্গভূষণ করেছিলেন তিনি। শিল্পাচার্যের অঙ্গভূষণের কাজ এই বইটির বড়ো সম্পদ। লোকজ জীবন, নিসর্গ আর প্রেম তাঁর রেখা ও রঙে এক অসামান্য মরমি শিল্পমহিমায় প্রকাশিত। এই চিত্রাবলি ও তার পাশাপাশি প্রতি পরিচ্ছেদের মুখপাত্রে উদ্ধৃত লোকগানের যুগলবন্দীতে *কাশবনের কন্যার* গল্পটি যেন আভাসে ফুটে উঠেছে। এ-যেন কাহিনীর সূচক, পরিপূরক অথবা ক্রম-পরিণতির নির্দেশক। (আবুল, ২০১৯ : ১৬)

উপন্যাসটি কিছু অংশ *তাহজিব* নামের একটি মাসিক পত্রিকায় ছাপানো হয়, উপন্যাসটি তখনই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার পর, এর তিনটি সংস্করণের প্রকাশ ঘটে, যা বইটির পাঠকপ্রিয়তা ও জনপ্রিয়তার নিরিখকে স্মরণ করে দিয়েছে। পূর্ব বাংলার জনজীবনের আখ্যানকে চিরপরিচিত পরিসরে উপস্থাপন করা হয়েছে উপন্যাসটিতে।

৮.১

আলোচনার অভিপ্রকাশ *কাশবনের কন্যা* উপন্যাসে চিত্রিত নিম্নবর্গের নারীর ওপর আলোকক্ষেপন। উপন্যাসের কাহিনিতে খুব বেশি চরিত্রের প্রেক্ষণ রূপায়িত হয়নি, নায়ক অর্থে কবিয়াল কানু শিকদার আর তার বন্ধু হোসেন। হোসেনের কাহিনিতে দুজন নারীর কথা গুরুত্ব পেয়েছে, প্রথমজন সখিনা, দ্বিতীয়জন মেহেরজান, কানু শিকদারের সমস্ত জীবন জুড়ে আছে জোবেদা। আনুষাঙ্গিক চরিত্র হিসেবে এসেছে আসগরউল্লাহ, তার মা, ছাবদার মাঝি, তার স্ত্রী, পুত্র জাফর, মনসব। এই সব মানুষের

জীবন, জীবিকা, ধর্ম, সংস্কৃতি, সমাজ, সামাজিকতার অসামান্য সব দিক অসাধারণ ঔজ্জ্বল্য নিয়ে বর্ণিত হয়েছে পঁচিশটি পরিচ্ছেদ। লিঙ্গ বিভাজিত সমাজে নারী স্বভাবতই নিম্নবর্গ; সেই দৃষ্টিপাত থেকে ঔপন্যাসিক শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের শব্দ-বর্ণের রূপরেখায় সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত নির্মিত হয়েছে নারীর মূল্যায়ন। *কাশবনের কন্যারা* সবাই গ্রামীণ নিম্নবর্গের নারী। গ্রামীণ নারীর জীবন স্বভাবতই লাঞ্ছনা আর বঞ্চনায় ভরা। শোষণ আর বৈষম্যে নিমজ্জমান নারী জন্ম থেকেই বেড়ে ওঠে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে। জীবনের দ্বান্দ্বিকতাকে মেনে নিয়ে তারা নিজেকে সমর্পণ করে প্রকৃতি আর নিয়তির কাছে। যে বৈরী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে তারা বেড়ে ওঠে, সেখানে ব্যক্তিগত জীবনের কোনো স্বপ্ন দেখা তাদের জন্য অপরাধ বলেই বিবেচিত হয়। তাদের প্রেম বা প্রেমাকাঙ্ক্ষা চির-অব্যক্ত যন্ত্রণায় দুঃখ আর দীর্ঘশ্বাসের অজন্ম সাথি হয়ে থাকে। ঔপন্যাসিক দৃষ্টিকোণে তার যথার্থ পরিচয় মেলে :

> ...ঠিক ঠিক জিনিস চিনতে হইলে সব রকম দৃষ্টি চাই, যে-জিনিস চাই তার সম্বন্ধে একটা ধ্যান চাই । আসলে আমার মাঝে মধ্যে কী মনে কয় জানো ঐ কাশবনের আড়ালে,ঐ দূরে দূরে গাঙ্গ যেইখানে আঁকাইয়া-বাঁকাইয়া দূর দিক সীমানার মধ্যে মিলাইয়া গেছে, তার সব কিছুর মধ্যে দেখি একজন অসহায় কন্যার মুখ, ক্যান জানি না, সেই মুখখানি যেন উপবাসে কাতর, নিজ যৌবনের ঐশ্বর্য লইয়া তার বিড়ম্বনারও শেষ নাই। (শামসুদ্‌দীন, ২০১৬ : ১৩৭)

কানু শিকদারের দাদা করমালীর চোখ দিয়ে ঔপন্যাসিক দক্ষিণ বঙ্গের নিম্নবর্গের নারীর একটি সামগ্রিক অবয়ব দান করেছেন। যাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় কাশবনের আড়ালে, নলসিঁড়ির ঘাটের ধারে, রূপার ঝোরের তীরে অথবা বৈশাখিয়া গাঁয়ের নারকেল কুঞ্জের আড়ালে। করমালীর কল্পলোকের চোখে দেখা যেসব নারী-তারা প্রত্যেকেই যেন এক একটি অসহায় কন্যার মুখ, সে-মুখ যেন উপবাসে কাতর, জগতের শতেক বেদনায় করবী-নীল (বিশ্বজিৎ, ২০১৯ : ২০)। যাদের মুখের আদলে ফুটে আছে হাজার বছরের নির্যাতন আর নির্মমতার ছবি। শত বছরের বিষণ্নতায় তারা ক্লান্ত, তবু তারা বাঁচতে চায় জীবনের বিপন্নতাকে সঙ্গে নিয়ে।

৮.২

জোবেদা *কাশবনের কন্যা*দের মধ্যে সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যমণ্ডিত নারী নির্মিতি। নিম্নবর্গের একজন নারীর সামগ্রিক রূপ তার চরিত্রের বিন্যাসে ধরা পড়েছে। জোবেদার অবয়বে ভেসে উঠেছে চিরায়ত নারীর বঞ্চনার প্রতিভাস, স্বামী-শাশুড়ির, শারীরিক-মানসিক নির্যাতন, যা হাজার বছরের বাঙালি নারীর জীবনের অংশ। বিবাহিত জীবনের স্বামী আসগরউল্লার স্থূল দেহসম্ভোগ তাকে তীর বিদ্ধ বিহঙ্গের

মতো যন্ত্রণায় কাতর করে তুলেছে। মুক্তির অন্বেষায় সে স্মৃতির অতলে ডুব দিয়েছে, তার নস্টালজিক ভাবনায় উঠে আসে স্বপ্নলোকের কথা :

> কোথায় গেল জোনাক-জ্বলা নিশুতি রাত্রির উসের মধ্যে হইতে শোনা ডাহুকের ডাক? সে যেন এখনও নিজেকে স্পষ্ট দেখিতে পায়, উঠানের একধারে চুলাশাকের কাছে সে কখনও ধাঁধার মীমাংসায় অস্থির হইয়া আছে, কখনও নিজেকে স্পষ্ট দেখিতে হইয়া আছে, কখনও-বা কোন সওদাগর অথবা কোন রাজপুত্রের কাহিনি শুনিত শুনিত ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। .....কতবার ইচ্ছা হইয়াছে তাহাকে জোর করিয়া সেইসব আসর হইতে উঠাইয়া লইয়া যায় ঘরের কাছে একটা পেঁপে গাছের তরায় তাহার মিছামিছি সংসার খেলার আসরে, মিছামিছি রান্না খাওয়াইয়া সে কেবলই জানিতে চায়ঃ পোলার বাপ বাবা, রান্না কেমন হইলো। (শামসুদ্‌দীন, ২০১৬ : ৮০)

যে জীবনের স্বপ্ন বুকে নিয়ে জোবেদা আসগারউল্লার সঙ্গে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিল; স্বামী শাশুড়ির সম্মিলিত নিপীড়নে তার স্বাভাবিক জীবন হয়ে উঠেছিল দুর্বিষহ। যদিও এই নির্যাতন বাংলার গ্রামীণ নারীর রূঢ় বাস্তবতা, যা তাদের প্রাত্যহিক জীবনকে সামনে মুখব্যাদন করে দাঁড়ায়। এর সঙ্গে যোগ হয়েছিল তার শারীরিক প্রতিবন্ধকতা, যা তার নির্যাতনের মাত্রাকে করে তুলেছিল দ্বিগুণ। জোবেদা বন্ধ্যা, সামাজিক দৃষ্টিতে যা নারীর জন্য চরম গর্হিত অপরাধ। শারীরবৃত্তীয় এই প্রাকৃতিক বৈকল্যে নারীর দায় না থাকলেও তাকে পোহাতে হয় নানা নির্যাতন আর নিপীড়ন। পীর-ফকির-ওঝা-দরবেশ, হাতুড়ে-বৈদ্য প্রভৃতি চিকিৎসায় জোবেদার নিজের ইচ্ছা না থাকলেও হার মানতে হয়েছিল স্বামী আর শাশুড়ির ইচ্ছার কাছে। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় তার অভিব্যক্তি নিম্নরূপ :

> শাশুড়ি কেবলই শাসাইতেছিল কূলগুরু সেই পীর, তোর বাপে ও তার বাপেও তার কথা ঠেলতে পারে না। ....প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে সে একটা উদ্ধরণের উপায় খুঁজিতেছিল। সেই মুহূর্তে শিকদারের দেখা পাওয়া শিকদারের দেখা পাওয়া কল্পনারও অতীত বিষয়। জীর্ণশীর্ণ শরীর, বেশবাসও ততধিক ঔদার্যভরা ; আবারও মনে হইল সে যেন কোনো সুদূর শৈশবের কথা কহিয়া উঠিল, জোবেদা কাঁপিয়া উঠিল। (শামসুদ্‌দীন, ২০১৬ : ৮৩)

জোবেদা এক জীবনবিলাসী ও জীবনপিপাসু নারী; স্বপ্ন আর সত্যের সারথিতে তার জীবনের বিনির্মাণ। স্ত্রী হিসেবে স্বামীর কাছে চরমভাবে অপমানিত হওয়ায় তার মনে হয়েছিল সংসারের চেয়ে বড় দোজখ বোধ হয় ভূমণ্ডলে আর দ্বিতীয়টি নেই। গ্রামীণ নারীর যে দিনযাপন, সেখানে তাদেরকে একটা ভয়ের সংস্কৃতিকে লালন করতে বাধ্য করা হয়। শাশুড়ির সেবা-যত্ন আর খেয়াল-খুশিমতো চলার এক জীবন্ত প্রাণী পুত্রবধূ। স্বামী, শাশুড়ির ইচ্ছা ও পছন্দের বাইরে জোবেদার কোনো চাওয়া-পাওয়া, ইচ্ছা-অনিচ্ছা থাকতে নেই। বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে দিয়ে শাশুড়ি তাকে সেই লক্ষণরেখাই স্মরণ

করিয়ে দিতে চেয়েছে : ‘চোপা সামলাও বউ। পোলারে যদি বলি ওই চোপা ছেইচ্চা দেবে কইলাম।’ (শামসুদ্‌দীন, ২০১৬ : ৮১) এই শাসনের বাণীকে সব সময় নির্বিবাদে মানা সম্ভব হয়নি জোবেদার পক্ষে। কারণ বিত্তহীন, বীর্যহীন হলেও সে মানুষ, রক্তমাংসের প্রবাহে নির্মিত তার শরীর ; জোবেদাও প্রতিবাদ জানাত, তবে তার ভাষা ছিল কারুণ্যে নির্মিত :

> জোবেদা সংযম হারাইয়া ফেলিত, ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিয়া ফেলিত: ক্যান আপনে আমারে একটু শান্তিতে থাকতে দেখতে পারেন না? কোন চাহিয়া কী দেখছিলাম, কী ভাবতে আছিলাম সবই কওন লাগবে আপনারে? আমার উপর এমন চৌখ রাখার কী দরকার পড়ছে? (শামসুদ্‌দীন, ২০১৬ : ৮১)

নারীকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করা পুরুষতন্ত্রের অন্যতম হাতিয়ার। ভয়ভীতি প্রদর্শনের জন্য বিভিন্ন ধরনের কৌশল থাকে পুরুষতান্ত্রিকতার নিয়ন্ত্রণে; তার মধ্যে চোখ রাঙানো, ধমক দেয়া, গালমন্দ করা, গায়ে হাত তোলা উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত কৌশলের প্রায় সব কয়টিই আরোপ করা হয়েছে জোবেদার ওপর।

৮.৩

জীবনের যে নির্মম জতুগৃহ বাংলাদেশের নারীদের অনাদিকাল থেকে শুরু হয়েছে তার কোনো শেষ নেই। পুরুষতন্ত্রের যে অমোঘ বিধান, তা পুরুষের দ্বারাই সব সময় পরিচালিত হয় না; বরং নারী নিজেই অনেক সময় তার প্রতিপালক হয়ে ওঠে। যুগ যুগ ধরে পুত্রবধূর প্রতি শাশুড়ির নির্দয় আচরণ তা অনেক সময় পুরুষকেও হার মানিয়ে দিয়েছে। দাম্পত্যের অন্তর্বেদনা যখন জোবেদাকে নিক্ষেপ করেছিল অন্ধকারের দিশাহীন পথে, তার শূন্যসত্তা শেষ আশ্রয় বলে গ্রহণ করেছিল কবিয়ালকে। জোবেদার যন্ত্রণাদগ্ধ চিত্তলোকের আহাজারি জোবেদার জবানিতেই শোনা যেতে পারে :

> গলায় দড়ি দিতে গেছিলাম সব জ্বালা জুড়াইতে। দড়ি লইয়া গাছের ডালে বাঁধিতে গিয়া হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল তোমার কথা, সেই ছোটকালে তুমি কোথায় হইতে এই দড়ি, এই তক্তা যোগাড় করিয়া দোলনা বাঁধিয়া দিতা। ....আমিও সেই ফুলের লাহান উড়িয়া ভাসিয়া ছড়াইয়া পড়তে চাইতাম। তোমার সেই জোবেদা, আমি যেন লোহার শিকলেই এই এতোগুলান বছর বাঁধা পড়িয়া আছিলাম। মুক্তি খুঁজিয়া আমি তোমার কাছেই আইলাম। (শামসুদ্‌দীন, ২০১৬ : ৮১)

সমাজ-সংসার-সংস্কার সবকিছু জলে ভাসিয়ে জোবেদা চলে এসেছিল কানু শিকদারের কাছে পরম আপনজন ভেবে। ‘সমাজ-সংসারের বৈরী অভ্যর্থনাকে পেছনে ঠেলে সে প্রত্যাবর্তন করে শিকদারের কাছে। জোবেদার এই প্রত্যাবর্তন এক বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বময়ী নারীর নবজীবন প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা থেকে উদ্ভূত।’ (সাইদুর, ২০১১ : ২২৮) জোবেদার এই বলিষ্ঠতা তার চরিত্রের অনন্য দিক। পুরুষতন্ত্রের

নির্মম-নিপীড়ন নারীকে দুর্বল করলেও মানসিক শক্তিকে বিলীন করতে পারেনি। সব পিছুটান ফেলে জোবেদার পথে পা বাড়ানো তার ব্যক্তিক স্বাধীনতা ও সাহসিকতারও পরিচয় বটে।

৮.৪

সমাজ যে অদৃশ্য শৃঙ্খল নারীর পায়ে বেঁধে রেখেছে তাকে খণ্ডাবে তার সাধ্য কার! যে কানু শিকদারের জীবন-যৌবন সমস্ত ব্যর্থ হলো শ্রী রাধিকা রূপী জোবেদার বিহনে, তাকে দুহাতের মুঠোয় পেয়েও ধরে রাখার সাধ্য তার হলো না। কবিয়ালের ভালবাসা-আবেগ-স্বপ্ন সব নতিস্বীকার করল সমাজ আর সংস্কারের কাছে। সমাজ নির্দিষ্ট বিধিলঙ্ঘনের ঔচিত্যবোধের নিকট শিকদার তার প্রেমকে পরাজিত করল। কবিয়াল তার প্রেমের অধিকারকে এড়িয়ে গেলেও জোবেদা তার প্রেমের পুরাণকে মেলে ধরেছে। তার স্মৃতির-মেঘ ঠেলে স্পষ্টরূপে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে তার বাসনার কথাকে :

> তোমারেই এই নিদান কালের পুরুষ বলিয়া গণ্য করিয়া তোমার কাছে আইলাম। মনে তো কয় একদিন তুমি আমারে চাইছিল। এই লও এখন আমি তোমার। ...তুমি সেই কোনো ছোটকাল হইতে আমারে কত কন্যার কাহিনী শুনাইছো, আর আমিও স্বপ্ন দেখছি এমন পুরুষের যদি কোথাও কেউ না-ই থাকে তবে সেই পুরুষ তুমি হও। আমারে উদ্ধার করো। (শামসুদ্দীন, ২০১৬ : ৮১)

জোবেদার এত আত্মকথনের পরও কানু শিকদারের কোনো ভাবান্তর নেই। কোন রুদ্র ঝড়ে নিভে গেল কবিয়ালের প্রেমের আবেগ-আকুতি; দায়িত্ব নেয়ার সময় প্রেমিক হিসেবে, স্বজন হিসেবে পাশে দাঁড়াতে পারেনি কবিয়াল। নারীর অসহায়তার সময় পুরুষ তার কর্তব্যজ্ঞান ভুলে যায়, তার মধ্যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কতকগুলো অকাঠ সংস্কার মাথা চড়া দিয়ে ওঠে। জোবেদার অসামান্য নারীসত্তা ব্যথায় মুষড়ে পড়েনি, প্রতিবাদ জানিয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমর সৃষ্টি নিম্নবর্গীয় নারী কপিলার মতো জোবেদা প্রতিবাদ জানিয়েছে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে। কবিয়ালের নীতি বাক্য তত্ত্বকথার বিরুদ্ধে জীবনমুখী প্রতিবাদে ধিক্কার জানিয়ে বলেছে :

> : হায়রে পুরুষ !– জোবেদা মুখ ফিরাইয়া লইল: আপন প্রয়োজনেও তুমি যে কেন নিজের দাবি ছিনাইয়া লইতে জানলা না, সে কথা ভাবিয়াও আমি অবাক হইয়া যাই। কোন অধিকারে কোন কন্যার স্বপ্ন দেখো তুমি যদি এমন অত্যাচারের মুখেও রুখিয়া খাড়াইতে না পারো ? কী সেই গীত-কথা কাব্যের মূল্য যদি আসল জীবনের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক না থাকে? ঠিক আছে, আমার কোনো ভাবনাই আর তোমার করিতে হইবে না। (শামসুদ্দীন, ২০১৬ : ১২৭)

জোবেদার প্রেম আর প্রেমের প্রদীপ্ত শিখা এখানেই নিভে যায়নি, তাকে খুঁচিয়ে তুলতে সময় ব্যয় করতে হয়েছে। জোবেদা তার প্রেম দিয়ে কবিয়ালের অন্তর্জগতের দুয়ার খোলে; তাকে আমন্ত্রণ

জানায় নবতর জীবনার্থের-উপলব্ধিতে। নারীদেহের অজ্ঞাত-অন্তরালে যে সৌন্দর্য উপাদান সাজানো আছে, গীতকথার উচ্ছল উপাদানে তাকে নির্দ্বন্দ্বরূপে নিবেদন করেছে কবিয়ালের নিকট। নিরীহ নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে সে বলে চলে তার অবহেলিত প্রেমের আখ্যান :

> ... নারীকে না জানিয়া কী ভাবে তুমি এতো সহজে বলো জীবনের কথা?... এই দেখো, এই আমি যার জন্য এখনও তোমার কাব্য কথার অন্ত নাই, সেই আমি সম্পূর্ণ নিরাবরণ করিয়া মেলিয়া ধরলাম, তোমার কাছে। ...তুমি যা- ইচ্ছা করো, তুমি পারো আমার সকল সংশয় সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্তি দিতে, পারো তোমার লাহান বিশ্বাসী হইতে। আমিও তোমার মধ্যে মিশিয়া যাইতে চাই। (শামসুদ্‌দীন, ২০১৬ : ১২৭)

জোবেদা শুধু বোধেই আত্মজ্ঞানবান এক নারী নয়, প্রেমের পূর্ণতায়ও সে সংস্কারমুক্ত দীপ্তমান এক নারী। তার সাবলীল প্রজ্ঞাময় আত্মনিবেদনের মধ্যে আছে অন্তর্গত সত্তার এক প্রগাঢ় প্রেমময় প্রকাশ। নিম্নবর্গের সংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশে বেড়ে ওঠা এক নারীর যা কাছে অকল্পনীয় বোধের সমতুল্য; অথচ সেই নির্মেদ ভাষ্যকে কি সহজ-সরলতায় সে প্রকাশ করেছে। তার প্রেমের প্রাবল্য প্রতিষ্ঠায় সর্বসংস্কারের উর্ধ্বে উঠে সে প্রেমের মহিমাকে মহিমান্বিত করেছে। একজন গ্রামীণ নারীর প্রেমের অধিকার প্রতিষ্ঠায় এরূপ তীর্যকতার প্রমাণ বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। গ্রামীণনারী তার স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য সংস্কারে আনত, বিড়ম্বিত জীবনের পরিপ্রেক্ষিতের বাস্তবতায় সে ফেলে আসা প্রেমের অধিকার প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়চিত্ত; তথাকথিত সতীত্বের ভার থেকে মুক্ত হয়ে নিজের অধিকারকে আদায় করে নিতে অনড় হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য নিম্নরূপ :

> শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম উপন্যাসে সমাজচিত্রণ ব্যক্তিসত্তার অন্তর্মুখী উন্মোচনের দিকে অগ্রসর হয়নি। ফলে চরিত্রের বহুমাত্রিকতার পরিবর্তে ঘটনা পেয়েছে অধিক গুরুত্ব। কাহিনীর একমুখী পরিণতিতে চরিত্র এসেছে একের পর এক –চরিত্রগুলো লেখক-বিন্যস্ত কাহিনীতে গতিসঞ্চার করে কিংবা সমাজের কোন একটি বিশেষ দিক তুলে ধরে। এভাবে আমরা প্রচুর চরিত্রের দেখা পাই কালামের উপন্যাসে। কিন্তু এসব চরিত্র শেষ পর্যন্ত আত্মতার আততি নিয়ে সম্পূর্ণ অবয়বে ধরা দেয় না; আংশিক আদল রেখে মিলিয়ে যায়। (মহীবুল,২০০২ : ১৪৪)

নিম্নবর্গের নারীর স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গ, আশা-হতাশার, সাহস-সংগ্রামের মাঝে জোবেদা এক পোড়খাওয়া অসামান্য নারী। জীবনের কাছে হার মানা তার স্বভাববিরুদ্ধ। এই অপ্রতিরোধ্য জীবনীশক্তি তাকে করে তুলেছে অসামান্য নারীতে; রক্তমাংসের চিরায়ত আর সব নারীর বিপরীতে। স্বামীর অবহেলা, অপমান, সন্তান-প্রজননের অক্ষমতা তাকে বিদ্রোহী করে তুলেছে। এখানেই জোবেদার ব্যক্তিত্বের আলোকিতরেখা সংসারের চারদেয়ালের প্রথার বাইরে নিজের যুক্তি, বুদ্ধির শক্ত অবস্থান। শাশুড়ি,

স্বামীর শোষণের বিরুদ্ধে সে আশার আলো ভেবেছিল প্রেমিক পুরুষ কবিয়ালকে। এত সব প্রতিকূলতা তাকে জীবন সম্পর্কে একটি শিক্ষা দিয়েছিল যে, সমাজে নারীর অবস্থান কী আর কোথায়?

> পিতৃকুলের মধ্যেও তখন আর এমন কেউ ছিল না, যাহার কাছে আশ্রয় চাইতে পারে। যাহারা ছিল, তাহাদের কাছে কিছু বলিলেই কেবল শুনিতে হইয়াছে, পরের বাড়িতে মেয়েদের অমন একটু-আধটু অসুবিধা হয়ই। আরও বলে 'পর'-এর বাড়িকে আপন করিয়া লওয়ার মধ্যেই ত কৃতিত্ব, নারীজন্মের সাফল্য। বেশি খামখেয়ালী কি তেজ দেখাইয়া কোনও কন্যাই কখনও কোনও সংসার সুখের করিতে পারে নাই। (শামসুদ্দীন, ২০১৬ : ৮১)

জীবনের বিপন্নতার মধ্যে পতিত হয়ে জীবন সম্বন্ধে তার যে বোধের সঞ্চার হয়েছিল, সেখানে নারী সমাজের কাছে শুধুই খেলার পুতুল। তার অস্তিত্ব, অস্তিত্বের সচেতন স্বীকৃতি-কোনো কিছুই সমাজের নিকট বিবেচনাধীন নয়। পিতার ঘরে নারীর যে নির্মাণ শিশুকাল থেকে তৈরি হয়, তার পূর্ণ পরিণতি ঘটে বিয়ের পর পতিগৃহে গমনের মধ্য দিয়ে। আত্ম-উপলব্ধিতে তার নিজস্ব যন্ত্রণা যেমন প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি করে জাগ্রত হয়েছে অন্য নারীর অন্তর্নিহিত বেদনাকে অনুভব করার অন্তর্দৃষ্টি। নিম্নবর্গের নিরক্ষর এই নারীর মধ্যে লেখক যে বোধভাষ্যের জন্ম দিয়েছে, তা তার চরিত্রের অসাধারণত্বের প্রধান নির্ণায়ক। 'প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও জোবেদা নিজস্ব ব্যক্তিত্বের মহিমায় উজ্জ্বল। সে সনাতন বাঙালি নারীর ভবিমূর্তি নয়'। (আশরাফুল, ২০১৬ : ৪৩) জীবনপিপাসু জোবেদা কাঙ্ক্ষিত সুখের কাছাকাছি আসে শিকদারের সান্নিধ্য আর আশ্বাসে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাঙালি নারীর যে নিয়তি সমাজ নির্ধারণ করে দিয়েছে, তাকে উপেক্ষা করার শক্তি জোবেদা অর্জন করতে পারেনি। তাই তাকে ফিরে যেতে হয় অসম্মান আর অন্ধকারের সেই জীবনে, যেখান থেকে সে মুক্তি চেয়েছিল। 'অথচ গড়পরতা গ্রামীণ বাঙালি নারীর মতো সে নয়। তার স্বপ্নকে সফল করার জন্য স্বামীর ঘর ছেড়ে আসার মতো বিদ্রোহী উদ্যম সে দেখিয়েছে, প্রজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার সবল ব্যক্তিত্ব'। (সাইদুর, ২০১১ : ২২৮) ব্যক্তিত্ববান নারী জোবেদার এই প্রত্যাবর্তন সাধারণের দৃষ্টিতে তার জন্য অসম্মান বা অপমানের হলেও এর মধ্যে রয়েছে আত্ম-উপলব্ধির চরম অর্জন। জীবনের যে স্বরূপ-সন্ধানের উদ্দেশ্যে সে বের হয়েছিল; স্বামীর ঘর, কবিয়ালের ঘর, পিতৃগৃহ পরিক্রমার মধ্যে দিয়ে জোবেদা চিনেছে নিজেকে, নিজের অবস্থানকে। সমাজ-সংসারের দৃষ্টিতে নারী কি এবং নারীর অবস্থান কোথায়? পাশাপাশি সহায় সম্বলহীন নিম্নবর্গের নারীর প্রতি সমাজের ক্ষত, গলদের ছিদ্রগুলোতে পুরুষতান্ত্রিকতার প্রতিষ্ঠা কীভাবে ও কতভাবে হয়, তাও বুঝেছে। জীবনের এই পরিভ্রমণের মধ্য দিয়ে জোবেদা নারী হিসেবে, নিম্নবর্গ হিসেবে সমাজে তার সার্বিক প্রতিষ্ঠাকে প্রতিস্থাপন করেছে।

৮.৫

আলোচ্য উপন্যাসে মেহেরজানের আগমন শিকদারের বন্ধু হোসেনের মাধ্যমে। হোসেন তার সংসারজীবন শুরু করার প্রস্তুতি হিসেবে নৌকার মাঝির কাজের জন্য গঞ্জে যায়; সেখানে ছাবদার মাঝির আন্তরিকতায় তার সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে। ছাবদার মাঝির পরিবারের অবস্থা এতটাই নাজুক ছিল যে ছাবদার মাঝির মৃতদেহ পরিবারের কাছে পৌঁছে দেয়া বা সৎকারের পরই দায়িত্ব শেষ করতে পারেনি হোসেন। আত্মীয়-পরিজনবিহীন জীবনে হোসেন এই পারিবারিক জীবনের নৈকট্যের আশ্লেষকে দমন করতে পারেনি। পাশাপাশি ছাবদার মাঝির স্বামী পরিত্যক্ত কন্যা মেহেরজানের জন্য মানবিক সহানুভূতি বোধ করেছে : 'ছাবদার মাঝির মেয়ে মেহেরজানকে বিবাহ দিয়েছিল অনেক আশা করিয়া, কিন্তু পণের টাকা জোগাইতে পারে নাই বলিয়া সেই মেয়ের সংসারও সুখের হয় নাই।' (শামসুদ্দীন, ২০১৬ : ৮৪) নিম্নবর্গের নারী হিসেবে সমাজে বা পুরুষতান্ত্রিক প্রথার নিগড়ে সেও জোবেদারই মতো শোষিত-বঞ্চিত-নির্যাতিত নারী। হতদরিদ্র ছাবদার মাঝির কন্যা সে, স্বামীর চাহিদা অনুযায়ী যৌতুকের টাকা পরিশোধ করতে না পারায় স্থান হয়নি স্বামীগৃহে। বাঙালি নারীর স্বপ্নের যে সৌধ সংসার-স্বামী-সন্তান; সেই চিরায়ত জীবনের ভালোবাসার রং-বর্ণহীন হয়ে তার যৌবনের ঐশ্বর্যকে করে তুলেছে নিস্তরঙ্গময়। জোবেদার নিজের অস্থির অবস্থাকে অনুকূলে আনার শক্তি ও মানসিকতা ছিল। মেহেরজানের তা ছিল না। মেহেরজান একেবারেই চিরায়ত চিরন্তন বাঙালি নারী শত যন্ত্রণার মধ্যেও নিজের স্বপ্ন আর আকাঙ্ক্ষার কথা মুখে বলতে পারেনি; তাকে প্রতিষ্ঠিত করার পথ আবিষ্কার করতেও পারেনি। নিম্নবর্গীয় জীবনের অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা মেহেরজানের জীবনের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে উঠেছে।

৮.৬

সামাজিক নিপীড়নের মধ্যে নারীকে নানান অসাম্য, বঞ্চনা আর অপ্রাপ্তি নিয়ে জীবন যাপন করতে হয়। সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিকভাবে শ্রেণিগত বৈষম্যের পাশাপাশি নারীর জন্য আরেকটি বৈষম্য প্রকট হয়ে দেখা দেয়, যা হলো লৈঙ্গিক বৈষম্য। উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলোর মধ্যে এই বৈষম্যের দিকগুলো উদ্ভাসিত হয়েছে বিভিন্নভাবে। মেহেরজান গরিব প্রান্তিক মাঝির কন্যা বলেই যৌতুক প্রথার অসম-বিধান তার জীবনকে অধোগতিতে নিমজ্জিত করেছে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মত নিম্নরূপ :

> *কাশবনের কন্যা* উপন্যাসে নারীর মুখে ভেসে উঠেছে দেশের মুখ, কখনো বা দেশের মুখে নারী। নারী দেশ আর প্রকৃতি এখানে এক হয়ে গেছে একাকার। দেশকেও এ উপন্যাসে কল্পনা করা হয়েছে নারী-প্রতিমায়। দেশের দুঃখ আর নারীর এখানে মিলিত হয়েছে এক মোহনায়। (বিশ্বজিৎ, ২০১৯ : ২০)

মেহেরজানের অপূর্ণ জীবনে হোসেনের ক্ষণিক সান্নিধ্য জাগ্রত করেছিল তার ভেতরের সুপ্ত প্রেমময়রূপকে। স্বামী পরিত্যক্ত সধবা নারী বলেই একজন অনূঢ়া মতো প্রাণখুলে হোসেনের আকাঙ্ক্ষায় আগ্রহ দেখাতে পারে না। সমাজ-সংসারের দগ্ধ অনলে তার জীবন পোড়াকাঠে পরিণত হলেও, তার চিত্তলোকের কল্যাণী রূপটি নিভে যায়নি। সেবা-শুশ্রূষা ও কল্যাণকর কামনার মধ্য দিয়ে হোসেনের চিত্তলোককে আন্দোলিত করেছিল মেহেরজান। মেহেরজানের এই স্বগত উক্তির মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে তার সত্তার বহুবিধ বৈশিষ্ট্য :

> আপনে যে কী চায়েন তা আমি বুঝি। কিন্তু আমার হাত-পাও বাঁধা, আমার কোনো উপায় নাই। যায়েন আপনে, সুমায় মতো নিজের কামে রওয়ানা হইয়ে যায়েন। যদি পারেন আবার আসিয়েন, পথ তো চিনিয়া গেলেন, আমার ঠিকানা বদল হইবে না। (শামসুদ্দীন, ২০১৬ : ১২৩)

অতিশৈশবে বিবাহ নামক সামাজিক শিকলে আবদ্ধ হলেও, সামাজিকভাবে অনূঢ়া নাম ঘোচালেও তার কোনো সংসর্গ সে এই জীবনে পাইনি। তার স্বামীর কাছে বিয়ে একটা ব্যবসা, কন্যাদায়গ্রস্ত দারিদ্র্য পিতার কন্যাদায়ের মোচন করলে পরবর্তীতে যৌতুকের দায়ে তাদের পিতৃগৃহের অভিশাপ হিসেবে জীবন পার করতে হয়। আবার ঐ বিপন্ন জীবনের বাঁধা শিকল থেকেও তাদের মুক্তি নেই; কারণ নিম্নবর্গের সংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশে নারীর বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষমতা নেই, তার জন্যও পুরুষ স্বামীর অনুগ্রহ ও অর্থ প্রয়োজন। তাই সব বুঝেও তার পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মতো ডানা ঝাপটানো ছাড়া কিছু করার নেই।

৮.৭

জোবেদা আর মেহেরজানের মতো আলোকিত প্রেয়সী, প্রেমময় নারী ছাড়া আরো দুজন নারীর স্বল্প পরিসরের পরিবৃত্তে উপস্থিত। তারা দুজনে, দুটি ভিন্ন কারণে, কাহিনির অন্তর্বয়নে অবতারণ করেছে। একজন জোবেদার শাশুড়ি, অন্যজন মেহেরজানের মা, ছাবদার মাঝির অসহায় স্ত্রী। এদের মধ্যে জোবেদার শাশুড়ির অত্যাচরী আচরণ অনেকাংশেই তার জীবনের অশান্তির জন্য দায়ী। বাংলাদেশের পারিবারিক জীবনে শাশুড়ি সম্পর্কে সনাতন যে ধারণা প্রচলিত আছে, জোবেদার শাশুড়ির ব্যবহারে তার পূর্ণ প্রকাশ। জোবেদার সন্তান না হওয়ায় ক্রমাগত তাকে মানসিক চাপে বিধ্বস্ত করেছে; ন্যূনতম মানসিক অবসরকে বাধাগ্রস্ত করে তুলেছে, বিভিন্ন ভয়-ভীতি প্রদর্শন করেছে। এই সমস্ত পরিপ্রেক্ষিতে

জোবেদার চোখে নিজের অবস্থান 'যেন বাজ-চিলকেও হার মানাইয়া দিত'। (শামসুদ্‌দীন, ২০১৬ : ৩৮) গ্রামীণ সংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশ নারীর মজ্জাগত সত্তাকে পুরুষতান্ত্রিক চিন্তার গূঢ়তায় এমনভাবে অধিগত করে যে এই সমস্ত সীমাবদ্ধতাকে অস্বীকার করে উদারতার আলোয় জীবনকে, নারীকে দেখার শিক্ষা, চিন্তা তাদের মননে এসে পৌঁছায় না।

৮.৮

মেহেরজানের মা তারই মতো অসহায়-শান্ত-সুবোধ এক নারী। ছাবদার মাঝি বিধবা স্ত্রী সে, দুটি সন্তান মেহেরজান আর জাফর। গ্রামীণ নিম্নবর্গের চিরায়ত নারীর মতো তার নিজের কোনো নাম-পরিচয় নেই, স্বামী সন্তানের নামে সে সমাজে পরিচিত। দরিদ্র স্বামীর সংসারে আজীবন কষ্ট করেছে, তবে সেই কষ্ট নিয়ে তার কোনো আক্ষেপ নেই। তবে তার সবচেয়ে বেশি চিন্তা কন্যা মেহেরজানকে নিয়ে; স্বামী পরিত্যক্ত যুবতী কন্যাকে সবরকম নিরাপত্তা দিয়ে ঘরে রাখা তার জন্য কঠিন। হোসেনের অবস্থান তাকে কিছুদিনের জন্য আশ্বস্ত করেছিল নিরাপত্তাজনিত কারণে। হেসেনকে ঘিরে সেও কিছুটা স্বপ্নও দেখেছিল, তাই হোসেনের ফিরে যাওয়া তাকে চিন্তিত করেছিল :

> এতে ছিদ্দত করিয়া আপন চোখেই তো দেখিয়া গেলা সব। আছিতো এই জঙ্গলের মধ্যে, আসমানে শকুন, বাইরে শেয়াল, এমনই ঘটনা দাঁড়াইয়াছে যে সর্বক্ষণ সন্ত্রস্ত থাকতে হয়। নানা কুলোকের চৌখ সবসময় চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া রাখছে। কতজনে কতো প্রস্তাব দেয়, আভাসে ইঙ্গিতে কী না বুঝাইতে চায়, আমরা ডরে মরি। এ কয়দিন তুমি আছিলা, কেউ তেমন সাহস করিয়া আউগায় নাই। এখন ভরসা কেবল আল্লার উপর। এইসব দেশে সেই বিশ্বাসটা কেই বড় করিয়া দেখান ছাড়া আমাগো আর গতিক নাই। (শামসুদ্‌দীন, ২০১৬ : ১২১)

ছাবদার মাঝির স্ত্রী নিরন্ন, অসহায় হলেও সে জ্ঞানচেতনাহীন নয়। বরং মেয়ের কষ্টকে অনুধাবন করে, তার প্রতি সহৃদয় ও সংবেদনশীল আচরণ করেছে। নিম্নবর্গের আর্থ-সামাজিক বিপন্ন অবস্থার কথা ভেবে মা তাকে স্বামীর ঘরে ফিরে যেতে বাধ্য করবে সেটাই স্বাভাবিক ছিল। মেহেরজানের মা তা করে না, যেখানে সম্মান নেই, অধিকার নেই, সেখানে ফিরিয়ে না দিয়ে, দুঃখ-কষ্টে, অনাদর-অবহেলায়, নিজের সন্তানকে বুকের মধ্যে আগলে রেখেছে মাতৃত্বের সুধায়। সেই সঙ্গে সে গ্রামীণ জীবনের সংস্কারময় পরিবেশে স্রষ্টার উপর ভরসা রেখে বাকি দিন পাড়ি দেয়ার প্রত্যয়ে প্রতিশ্রুতিশীল।

৯.

গ্রামীণ নিম্নবর্গের আর্থ-সামাজিক অভিজ্ঞতা নিয়ে শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের অন্যতম উপন্যাস *কাঞ্চনমালা* (১৯৬১)। ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব বিচিত্র জীবনের বৈচিত্র্যময় সমস্যার মধ্যে দিয়ে জীবনের সমগ্রতার সন্ধান করা। উপন্যাসটি বাঙালির অতিপরিচিত নৃগোষ্ঠী বেদে সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে লেখা। বাংলা সাহিত্যে বেদেদের সম্পৃক্ততা বহু প্রাচীন। মধ্যযুগের জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থ *মনসামঙ্গল* বা *পদ্মপুরাণ*-এ বিধৃত রয়েছে সর্প দেবী মনসার জন্ম ও কর্মবৃত্তান্ত। মানসাকে নিয়ে বেদেদের যে কর্মযজ্ঞ, তা পৌরাণিক আখ্যান থেকেই প্রচলিত। এছাড়া আধুনিক বাংলা সাহিত্যের *'পূর্ববঙ্গ গীতিকার'* মহুয়া পালা বেদে জীবনাচার কাহিনির আবহ। এছাড়া শরৎচন্দ্রের *বিলাসী* ছোটগল্পে আর *শ্রীকান্ত* উপন্যাসেও রয়েছে বেদেজীবনের সামগ্রিক সমাচার। এর বাইরে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ে উপন্যাস ও ছোটগল্প রাঢ় বাংলার বেদেজীবনের বৃহৎ পটভূমি। এরই ধারাবাহিকতায় পূর্ব বাংলার আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের আবহকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে *কাঞ্চনমালা*। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মালা, বেদে সর্দার মঙ্গল মাঝির একমাত্র কন্যা। বেদে সম্প্রদায়ের নারী হওয়ায় গ্রাম বাংলার অন্য নারীদের তুলনা তার স্বাতন্ত্র্য সহজেই চোখে পড়ে। পেশাগত কারণেই তাকে যেতে হয়েছে ঘরের বাইরে, সর্পনির্ভর নৃত্যকলাসহ আরো বিভিন্ন কাজে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে তার পারঙ্গমতা। এই যাযাবর জীবনের বৃত্তি সম্পর্কে লেখকের মত নিম্নরূপ :

> সাপ ধরে, নানারকম ওষুধ-মাদুলী, শিকড়, গাছ-গাছড়া বেচে, টেটকা চিকিৎসা করে, ওঝালি করে, চুড়ি বেচে, আর বেচে রেঙ-বেরঙের তাগা, ছোট আরশি আর কাছের 'কাঁকই'। বিষ বেচা, কাহাকে ও বশ করা বা পাগল করিয়া দেওয়া মন্ত্র দিয়া, কিংবা বাঁদরের হাড় ভিতে পুঁতিয়া কাহাকেও নির্বংশ করাও সাধ্যের মধ্যে। (শামসুদ্‌দীন, ১৩৬৮ব. : ৭)

বেদেবহরের যাযাবর জীবনে এই সমস্ত বিভিন্ন পেশাকে অবলম্বন করে বাঁচে। এই জীবনব্যবস্থায় মালার গুরুত্ব অপরিসীম; প্রথমত সে সর্দারের মেয়ে, তারপর সুন্দরী ও গুণবতী। বেদেদের বৃত্তি নির্ভর যে সমস্ত কার্যকলাপ আছে তা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে মালার ওপর। কাঞ্চনের প্রতি মালার প্রণয়াকর্ষণ তার চরিত্রের দৃঢ়তা ও ব্যক্তিত্বের পরিচয়কে আরো উৎকর্ষমণ্ডিত করেছে। নিম্নবর্গের মানুষের গভীর ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে এই বোহিমিয়ান মানুষদের জীবন-জীবিকা ছবি নির্মাণ করেছেন লেখক :

> উপন্যাসে সমকালীন সমাজ-জীবনের চেয়ে বাংলার ঐতিহ্যপূর্ণ লোক-জীবনের কথা অধিকার গুরুত্ব পেয়েছে। মহুয়া গীতিকার মহুয়া ও নদের চাঁদের কাহিনির যথেষ্ট মিল লক্ষণীয়। এ প্রসঙ্গে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের মূল্যায়ন স্মর্তব্য–'সমগ্র উপন্যাসের পটভূমি ও বক্তব্য পূর্বাপর পূর্ববাংলার বিখ্যাত লোকগীতিকা 'মহুয়া'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়'। (আশরাফুল, ২০১৬ : ৪৬)

সম্প্রদায়গত বৃত্তির পাশাপাশি তার রয়েছে আরো অন্যান্য গুণাবলি ; রান্নার কাজে মাকে সহযোগিতা করা ও পিতাকে তামাক সাজিয়ে দেয়া প্রভৃতি। বেদের মেয়ে পরিচয়ের বাইরেও তার ধমনীতে অন্য কোনো সত্তা বিরাজমান। মানুষের সে কথার সত্যতা খুঁজতে সে বাবা-মার কাছে অনেকবার জানতে চেয়েছে তার সত্য পরিচয়। 'মানসে কয় আমারে নাকি বাদ্যার মাইয়া বলিয়া মনেই হয় না।... হাত থামাইয়া সে মেয়ের মুখের দিকে চাহিল।' (শামসুদ্‌দীন, ১৩৬৮ব. : ১২৬) মালার মনের মধ্যে বেদে জীবনের যাযাবর বৃত্তি ভালো লাগে না। তার মনে হয় 'আমার ভালো লাগে না এই ঘুরিয়া বেড়ানো। ইচ্ছা হয় কোথাও বসত করি।' (শামসুদ্‌দীন, ১৩৬৮ব. : ১১৯) মালার মানসিক গঠনও বেদে নারীদের তুলনায় অন্যরকম। বেদে সম্প্রদায় সামাজিকভাবে প্রান্তিক, নদীকেন্দ্রিক জনগোষ্ঠী। শামসুদদীন আবুল কালাম আসলে নিম্নবর্গের মানুষের সেই বেঁচে থাকার সংগ্রামটাকেই বড় করে দেখেছেন। বেদেজীবনের বিরূপ পরিবেশে নারী কীভাবে তার স্বাধীন সত্তা নিয়ে বাঁচতে পারে সে বিষয়েও পাঠককে অবগত করেছেন লেখক। মালা সেখানে প্রধান সূত্রধর।

৯.১

পলাশপুরে অবস্থানকালে কাঞ্চনের সঙ্গে তার মানসিক সম্পর্ক গড়ে উঠলেও তা নিয়েও সে অত্যন্ত সর্তক থেকেছে। কাঞ্চন বেদেবহরে যোগ দিলে তাকে অসম্মানিত-অযোগ্য প্রমাণ করতে মদন বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। সেখানে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে মালা : 'তোমার দেওয়া মালা না হয় না-ই পইলাম, দড়ি তো আমার জুটবে! নেও আমার রাস্তা ছাড়ো।' (শামসুদ্‌দীন, ১৩৬৮ব. : ৬৮) গীতিকার নায়িকাদের মতো তাকে প্রেমের জন্য মরিয়া হতে দেখা যায়নি। বরং সহনশীলতার সাথে সমস্ত সংকটকে উত্তরণের চেষ্টায় ব্যাপৃত হতে দেখা গিয়েছে। চাঁপাকে পুঁতির মালা দেয়ার ঘটনার মধ্যে কাঞ্চন মালার জন্ম পরিচয়ের সূত্র খুঁজে পেয়েছে। 'কৃষ্ণ কর্মকার, পলাশপুর' লেখা দেখে কাঞ্চনের সন্দেহ হয়েছে; এই সত্যের অনুসন্ধানে সে তৎপর হয়েছে। শেষ পর্যন্ত কাঞ্চন মালার সত্য পরিচয় আবিষ্কার করে তাকে নিতে আসলে, দলের প্রতি, গোষ্ঠীর প্রতি, একনিষ্ঠতা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে :

> মালা আত্মসম্বরণের চেষ্টা করিয়া কহিল: কইও না মাঝি, ওকথা আর কইও না। আমারে দুনিয়া যেন চোউখের সামনে থেইকা মুছিয়া গেছে তুমি যাবার পরের ক্ষণ হইতে।...না না মালা বেদের মাইয়া তুমি না। এই দেখো–এই বাজু মিলাও তোমার হাতের বাজুর সংগে। আমি নিশ্চিত প্রমাণ পাইছি যে তুমি গেরস্থ ঘরের মাইয়া। আমার গ্রামেই তোমার ঘর।... মালা চমকিয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। কি কইতে আছো মাঝি? সত্য এ সব কথা? (শামসুদ্দীন, ১৩৬৮ব. ৭০)

শত বিপর্যয়ের মধ্যেও নিম্নবর্গের মানুষের নৈতিক দৃঢ়তা মানুষ হিসেবে সমাজে তাদের অবস্থানকে শক্তিশালী করে। সব জানার পরও মালা এই জীবন থেকে পালাতে চাইনি, পিতা-মাতা হিসেবে মঙ্গল মাঝি আর ময়না বিবিকে সে অস্বীকার করতে চায়নি। মদনের শঠতা আর নির্দয়তার কাছে তাকে হার মানতে হয়েছে; নতুন জীবনের সঙ্গে পা বাড়াতে হয়েছে দয়িতের সঙ্গে। মৈমনসিংহ গীতিকার নায়িকার চরিত্রগুলোতে যে অপরিসীম ধৈর্য আর সহিষ্ণুতা, তাও মালার মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়।

৯.২

যাযাবর বেদেজীবনের জীবনালেখ্য নির্মাণ করতে গিয়ে পূর্ববঙ্গের গ্রামীণ মানুষের সাধারণ জীবনের সহজ-সরল সৌন্দর্যের সন্ধান করেছেন লেখক। সেখানে মালা ছাড়াও মালার মা ময়না বিবি একটা বড় ভূমিকা রেখেছে। নিঃসন্তান এই বেদে রমণী আর দশজন বাঙালি মায়ের মতো স্বামী, সন্তান আর সংসার নিয়ে জীবনিপাত করেছে। তার বাইরে তার জীবনে বড় কোনো জগৎ বা জীবনাকাঙ্ক্ষা ছিল না। ময়না দলের সকলের জন্য রান্নার ভার নিয়ে সকলের ভালোমন্দের বিষয়ে সর্বদা সচেতন থেকেছে। অবসর সময়ে বাড়তি উপার্জনের জন্য 'জালি' বানিয়ে দলকে সহযোগিতা করেছে। এ ছাড়া প্রচলিত গ্রামীণ নিম্নবর্গের নারী চরিত্রের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য ময়না বিবির মধ্যে সদা লক্ষ করা যায়। সংযম-সহিষ্ণুতা, পাতিব্রত্য, আত্মত্যাগ, আত্মসচেতনতায় সর্বপরি মাতৃত্বের অনন্যসুধায় সে এক উজ্জ্বল নারী চরিত্র। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মত নিম্নরূপ : ''*কাঞ্চনমালা*' র কাহিনীতে নতুনত্ব নেই। বর্ণনার পরিমিতি এবং সুষমায় গতানুগতিক কাহিনীটিও সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে। ঘটনার আকস্মিকতা এবং অসংগতি আছে, তবে চরিত্রগুলো সজীব ও প্রাণবন্ত।' (মনসুর, ২০০৮ : ৭৭)

৯.৩

মালা ছাড়াও তারই মতো আরো একজন নারী এই উপন্যাসের কাহিনিকে ভাস্বর করেছে; সে পবন মাঝির মেয়ে চাঁপা। চাঁপা আপাদমস্তক একজন প্রেমময় নারী, তার প্রেয়সী সত্তার বাইরে কোনো রূপ বিকশিত হয়নি। অন্ধ ও অসুস্থ পিতা পবন মাঝি, মাতৃহীন ভাই মধুর ভাবনা তাকে চঞ্চল করেনি। তার একমাত্র ভাবনা ভালোবাসার মানুষ মদনকে কেন্দ্র করে :

> মদনের দিকেও সতৃষ্ণনয়নে তাকাইতেছিল আরেক জন। সে পিছনের নৌকার চাঁপা। পায়ে জড়ানো বৈঠাখানা ধরিয়া সে বোধহয় মৃদুস্বরে একটা গানও গাহিতেছিল। বয়সে সে প্রায় পূর্ণ যৌবনা। সবুজ শাড়িখানি সুঠাম দেহে জড়াইয়া খোঁপায় বুনোফুল গুজিয়া সাজিয়াছে। (শামসুদ্‌দীন, ১৩৬৮ব. : ৩)

চাঁপার নাচ-গান দলের উপার্জন বাড়ানোর পথে সহায়ক হবে ভেবে সর্দার তাকে ও তার পরিবারকে আশ্রয় দিয়েছিল। তার বিনিময়ে চাঁপার পরিবার পেয়েছিল থাকা-খাওয়ার একটি নিরাপদ আশ্রয়। তার সমস্ত ভাবনাজুড়ে শুধুই মদন। ব্রাত্য জীবনের আচার-অনুষ্ঠান, জীবনবৈচিত্র্য, মদনের প্রতি তার যে অনুরাগের সঞ্চার করেছিল; কুচক্রী মদন তার সুযোগ নিয়েছিল। মদনের প্রতিহিংসা চরিতার্থতার মাধ্যম হয়ে নিজেকে জলাঞ্জলি দিল চাঁপা। প্রেমের উত্তপ্ত আবেগে অমৃত আস্বাদনের প্রলোভনে পতঙ্গের ন্যায় পাপের আগুনে পুড়ে দগ্ধ হলো। ‘চাঁপা পাগল হইয়া গেল, কেবল প্রাণে মরিল না।’ (শামসুদ্‌দীন, ১৩৬৮ব. : ২০২) অনেক কষ্ট পেয়ে, অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে সে উপলব্ধি করলো যে সে অন্যায় করেছে : অস্ফুট কণ্ঠে সে বারবার বলিতে লাগিল :‘পাপ হইছে মালা বু, পাপ করছি আমি।’ (শামসুদ্‌দীন, ১৩৬৮ব. : ২১৩) তার আত্ম-অপরাধের স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে তার চরিত্রের উত্তোরণ ঘটেছে। দয়িতকে পাওয়ার আশায় চাঁপার এই হীনকর্ম তার প্রেমকে গভীরতা দিলেও অপ্রাপ্তির বেদনাই শেষ পর্যন্ত তার জীবনের সঙ্গী হয়েছে (সাইদুর, ২০১১ : ২৪১)। সমাজের প্রান্তিক মানুষের অংশ হিসেবে নারীজীবনের বৈচিত্র্যমণ্ডিত সব সত্তার উদ্ভাসনে ঔপনাসিকের মানবিক মূল্যবোধের গভীরতর পরিচয়।

৯.৪

উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত পরিসরে মালা, চাঁপা ছাড়াও আরো বিভিন্ন ধরনের নারীর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। তার মধ্যে পলাশপুর গ্রামের বুড়ি, কাঞ্চনের আশ্রয়দাতা নানি উল্লেখযোগ্য; একজন প্রৌঢ় নারীরূপে কাহিনির যোগসূত্রতায় স্থান পেয়েছে সে। স্বামী, সন্তানহীন এই নারীর একমাত্র আপনজন কাঞ্চন। নিজের শূন্য জীবনের ব্যথা ভুলতে অনাথ কাঞ্চনকে নিজের পৌত্ররূপে আশ্রয় দিয়ে আত্মার সম্পর্কে জড়িয়েছে। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে কাঞ্চন ফিরে আসলে তার অনুভূতি ছিল নিম্নরূপ–

> বুড়ীর সহসা বাকস্ফুর্তি হইল না।..দাওয়ার পাশে দাঁড়ানো কাঞ্চনকে সে জড়াইয়া ধরিয়া ব্যগ্র এবং ক্ষিপ্রভাবে গায়ে-মুখে-মাথায় হাত বুলাইয়া বার বার কহিতে লাগিল: তুই ফিরিয়া আইলি! কখন আইলি, কেমন আছো, আর তো যাবি না? (শামসুদ্‌দীন, ১৩৬৮ব. : ১৯০)

কাঞ্চনের ফিরে আসা বুড়ির জীবনের নতুন আনন্দের বার্তা নিয়ে এসেছিল। বুড়ি তার হারানো নাতনির সন্ধান পেয়েছিল কাঞ্চনের মাধ্যমে। নিম্নবর্গের শূন্য জীবনে সে এক আশার বার্তা নিয়ে আসে। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায়:

> বুড়ী কহিল: আমার নাতনীর বাজু দুইখানা ছিল। একখানা আছিলো তার হাতে, আরেকখানা এই যে, তাগা বান্ধার কোণাটা ভাঙ্গিয়া গেছে দেখতে আছো, ওইটা সারাবার জন্য কৃষ্ণ কর্মকারের কাছে দেওয়ার কথা আছিলো– কাঞ্চনের আবার কি খেয়াল হইল, তাড়াতাড়ি বাজুকানা হাতে লইয়া সে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে শুরু করিল। মালার কাছে যে বাজুখানা দেখিয়াছে, ইহাও অবিকল তাহারই মত, পিছনে সেই কর্ম্মকারের নাম লেখা। (শামসুদ্দীন, ১৩৬৮ ব. : ১৯১)

এভাবে কাঞ্চনের প্রচেষ্টায় বুড়ি তার হারানো স্বজনের সন্ধান পেয়েছিল। এই ঘটনা উপন্যাসের কাহিনিকে পরিণতির দিকে নিয়ে গিয়েছে। বুড়ি চরিত্রের মধ্যে গ্রামীণ নারীর দুঃখদীর্ণ জীবনে পরকে আপন করে নেয়ার স্বভাবসিদ্ধ বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। গ্রামীণ জীবন, সংস্কৃতির অংশ হিসেবে বুড়ি চরিত্রের সার্থকতা।

৯.৫

গ্রামীণ নিম্নবর্গের জীবনের অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির এক জাগ্রতচেতনায় দীপ্যমান। তার অংশ হিসেবে উপন্যাসে বৈষ্ণবীর আগমন, স্বল্প পরিসরে তার চরিত্রের মানবিক গুণাবলির ঔদার্যপূর্ণ দিকসমূহের প্রকাশ। উপন্যাসের মূল কাহিনিতে তার ভূমিকা নেই। লেখক গ্রামীণ জীবনের একটি সামগ্রিক রূপকে তুলে ধরার প্রচেষ্টায় এই বৈষ্ণবীকে কাহিনিতে সংযোজন করেছেন। বুড়ির নিঃসঙ্গ জীবনে মানবিক সহানুভূতি জানাতে বুড়ির বাড়িতে তা, আগমন ঘটত। গল্পের মধ্য দিয়ে সময় পার করতো তারা : ‘মাঝে মাঝে বৈষ্ণবী আসে। সে বুড়ীকে উৎসাহ দিতে চেষ্টা করে : এতো চিন্তা করিও না নানী, তার রাগ পড়িয়া গেলে ফিরিয়া আসবে, দেখিও সেও ফিরিয়া আসবে, দেখিও, ফিরিয়া আসবে সে।’ (শামসুদ্দীন, ১৩৬৮ব. : ১০৮) বৈষ্ণবীর কথায় বুড়ি কিছুটা আশা পেত, কিছুটা হলেও তার শূন্য জীবনের বসন্তের ছোঁয়া পেত। বৈষ্ণবীর বৈষ্ণব ছাড়া বিরহী মন নিয়ে গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘুরে গান গেয়ে সবাইকে আনন্দ দিত। এভাবে সেও তার বিরহী মনের ব্যথাকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিত। এ ছাড়া ভানু আর করিম খাঁর স্ত্রী সবাই গ্রামীণ জীবনের সামগ্রিক রূপ। এই সব ছোট চরিত্রের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের সামগ্রিক পরিসর পূর্ণতা পেয়েছে।

১০.

শহীদুল্লা কায়সার (১৯২৭-১৯৭১) বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের একজন সমৃদ্ধ কথাকার। তাঁর সাহিত্যিক মননশীলতা রাজনৈতিক জ্ঞান-অনুশীলন দ্বারা প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত। ঔপনিবেশিক শোষণের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা বাঙালির মননশীলতাকে আলোড়িত করেছিল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রাজনৈতিক প্রজ্ঞার দ্বারা। এই মতবাদ শুধু বাঙালির প্রগতিশীল চিন্তায় নয়, বিশ্বের অর্থনৈতিক ও সমাজিক ব্যবস্থায়ও গভীর প্রভাব রেখেছিল যুগের পর যুগ ধরে। বাংলা সাহিত্য ও বাংলাদেশের সাহিত্যেও তার প্রভাব কোনো অংশে কম নয়। শহীদুল্লা কায়সার সেই সমৃদ্ধ সময়ের এক সূর্য-সন্তানের নাম। তিনি ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক কর্মী ও সংস্কৃতিসেবী। তাঁর শিল্পকর্ম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্যের পরিসরে মাইলফলক স্বরূপ (সরিফা, ২০১৮ : ১১)। শহীদুল্লা কায়সার ছাত্রজীবনে আকৃষ্ট হয়েছিলেন মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি। দেশভাগের পরে তাঁর রাজনৈতিক কর্মস্পৃহা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল, পাকিস্তান সরকার কর্তৃক কমিউনিস্ট পার্টির নিষিদ্ধ হলে তাঁর আশ্রয় হয়েছিল কারাগারের অন্ধকূপে। শহীদুল্লা কায়সার তাঁর সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনে বিভিন্ন কারণে তিন পর্যায়ে মোট আট বছর কারাবাস করেছেন। এই কারাবাস তাঁর জীবন থেকে অনেক সোনালি ভোরের আলো কেড়ে নিলেও, কারাগারের বদ্ধ দেয়াল তাকে দিয়েছিল সৃজনশীল মেধা বিকাশের অফুরন্ত পরিসর। কারাজীবনের বন্দিদশায় তিনি শোষিত-বঞ্চিত মানুষকে নিয়ে নতুন করে ভাবনার অবসর পেয়েছিলেন; উপলব্ধির এই পরিমণ্ডল তাকে দিয়েছিল সৃষ্টিশীল অনুভূতি প্রকাশের তাগিদ ও প্রেরণা। শোষকশ্রেণির ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করার প্রত্যয় থেকেই জনজীবনের গভীর তলদেশকে নির্মোহরূপে তুলে ধরেছিলেন তিনি। নিম্নবর্গের বঞ্চনার ইতিহাসকে তুলে ধরার প্রচেষ্টায় লেখক তাদের নিজস্ব জীবনপ্রণালির দিকগুলোকে বিপুল বর্ণাঢ্যতায় রূপায়িত করেছেন। সেই মানদণ্ডের বিচারে *সারেং বৌ* ও *সংশপ্তক* নিম্নবর্গের জীবন-আখ্যানের সার্থক শিল্পপ্রতিমা।

১০.১

সমাজপ্রগতির অগ্রযাত্রায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সোপান হলো নারী। নারীর জীবনকে পশ্চাতে রেখে কোনো সমাজের অগ্রগতি সম্ভব নয়; সে কথা স্পষ্টরূপে জানতেন লেখক শহীদুল্লা কায়সার। সমাজের শোষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা শোষিত জনগোষ্ঠী যে নারী, এই বিষয়েও লেখক ছিলেন সচেতন। সমুদ্র উপকূলবর্তী প্রোষিতভর্তৃকা শ্রমজীবী নারীর জীবনযন্ত্রণা লেখক তাঁর আঞ্চলিক

অভিজ্ঞতা থেকে অর্জন করেছিলেন। অন্যদিকে মধ্যযুগীয় ফিউডল বা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় নারীর অসহায়তাকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন রাজনৈতিক সচেতনতার মধ্য দিয়ে। এই দুই প্রতিবেশের নিম্নবর্গের নারী তাঁর সাহিত্যিক সত্তার উজ্জ্বল অধ্যায়। (রণেশ, ২০০৮ : ১১২) এই সমাজের শাসক গোষ্ঠী, যারা উচ্চবর্গ বলে সাধারণভাবে পরিচিত; নিম্নবর্গের ওপর তাদের শোষণটা শুধু বর্ণগত বা অর্থনীতিগতই নয়, লিঙ্গগতও বটে। সামাজিক বৈষম্যের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক ও লৈঙ্গিক শোষণের প্রথম শিকার হয় নারী। এই আলোকে *সারেং বৌ* ও *সংশপ্তক* উপন্যাসের নিম্নবর্গের নারীর উপর আলোকসম্পাতের চেষ্টা করা হবে।

১০.২

সারেং বৌ (১৯৬২) শহীদুল্লা কায়সারের প্রথম উপন্যাস। সমুদ্রোপকূলীয় গ্রাম বামনছাড়িকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই উপন্যাসের আখ্যানভূমি। উপন্যাসটি মূলত সারেং বধূ নবিতুনের একক যুদ্ধ জয়ের কাহিনি। নবিতুন 'এক শক্তিমতি নারী' জীবনযুদ্ধে কোনো অবস্থাতেই সে ভীত নয়। জীবনের এই পরিসীমায় সে অর্ধাহারে, অনাহারে, বারাবানা, দাসীবৃত্তি প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে জীবিকা পরিচালনা করেছে। তবু কোনো কিছুর কাছে সে নিজেকে ও নিজের সম্ভ্রমকে পরাজিত হতে দেয়নি। সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করে সে নিরন্তর অপেক্ষায় থেকেছে স্বামীর ফিরে আসার পথ-চেয়ে। সারেং জীবনের বিসর্পিত পথে শুধু প্রাকৃতিক দুর্যোগই তাদের একমাত্র শঙ্কার কারণ নয়; মনুষ্য-সৃষ্ট দুর্যোগও যে কোনো সময় হানা দিতে পারে তাদের জীবনে। এ প্রসঙ্গে সমলোচকের অভিমত নিম্নরূপ :

> এ-উপন্যাসে বঙ্গোপসাগরের তীরের জনজীবনের সত্য, সমুদ্র ও সমুদ্র-উপকূলবর্তী বহির্বিশ্বের জীবনধারার বৈশিষ্ট্য, বাংলাদেশের সমুদ্র–উপকূলবর্তী জনপদের অভিশাপ সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিবন্যার মত বিধ্বংসী প্রকৃতি এবং অনুন্নত ও শোষণ-নির্ভর জনজীবন রূপায়িত। (মুহাম্মদ, ১৯৮৮ : ৩৩)

সারেং জীবন সম্পর্কিত এই সংক্ষুব্ধতা, সংকট শুধু নবিতুনের জন্য নয়, তার স্বামী কদম সারেংয়ের জন্যও সমভাবে প্রযুক্ত। নবিতুনের স্বামী কদম সারেং সরলতার বশবর্তী হয়ে নিজের বিপদ ডেকে এনেছিল। যে কারণে তিন বছরের কারাবাস হয়েছিল তার। লজ্জায় অপমানে স্ত্রীর নিকট সেই সত্য গোপন করেছিল সে। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছিল স্থানীয় জোতদার শাসকশ্রেণি। প্রতীক্ষার দীর্ঘ পাঁচ বছর নবিতুনের সংগ্রামী জীবনে হাজার বছরের সমান হয়ে উঠেছিল। তারপরও সে টিকে থেকেছে অসীম ধৈর্য আর স্থির মনোবল নিয়ে। এর মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়েছে নবিতুনের সংগ্রামীসত্তা। তার এই সংগ্রামকে ব্যর্থ করতে নিয়োজিত হয়েছিল গুঁজাবুড়ি : 'নবিতুন ও নবিতুন, বলি আর কতকাল! ...ভেবে দেখরে নবিতুন, আমার কথাটা ভেবে দেখ। পালঙ্কে

বসে পায়ের উপর পা তুলে খাবি, থুবি, হুকুম চালাবি। হু করবি অমনি হাঁ করে ছুটে আসবে এক গণ্ডা দাসীবান্দী।' (শহীদুল্লা, ২০১৭ : ১০) গুঁজাবুড়ি নামক এই নারী স্থানীয় শাসকশ্রেণির প্রতিনিধি; সে নিম্নবিত্তের নারীদের আর্থিক সংকটের সুযোগে নিয়ে তাদের বিপথগামী করে থাকে।

১০.৪

নবিতুনের জীবনপরিসর বিস্তৃত নয়। মাত্র বারো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল তার, এগারো বছরের দাম্পত্যজীবনে নয়-দশ বছরের কন্যাসন্তান আক্কিকে নিয়ে তার সংসার-স্রোতে ভেসে থাকা। এক সন্তানের জননী নবিতুনের পাতলা গড়ন আর সুশ্রী মুখমণ্ডল পুরুষকে লোভাতুর করে তোলে। স্বামীর খোঁজ খবর না থাকায় আর্থিক সমস্যায় নিমজ্জিত হয়েছে সে। আর্থিক অনটন থাকলেও অসহায় নয় সে। কারণ সমস্ত প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করার ব্যক্তিক প্রত্যয় তার মধ্যে আছে। শ্রমশীল কর্মতৎপরতার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে যে একটি অদৃশ্য বিভাজনের প্রাচীর রয়েছে, সেই সমস্ত প্রচেষ্টা ঘিরে ধরেছে নবিতুনকে। নিম্নবর্গের জীবনে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে মানুষ যখন অন্ন-বস্ত্রের সংস্থানে জীবনীশক্তির শেষবিন্দু নিঃশেষ করে; তখন একটি কুচক্রী মহল সক্রিয় থাকে শ্রমজীবী নারীর জীবনকে সংকীর্ণ আর অবরুদ্ধ করতে। রাত্রির অন্ধকারে হিংস্র জানোয়ারের মতো নিজেই হাজির হয় সেই হীন প্রবৃত্তির পুরুষ। এই অপমান আর যন্ত্রণা ক্ষতবিক্ষত করেছে নবিতুনকে :

> কিন্তু এমন করে নিজেকে কত রাত রক্ষা করে চলবে নবিতুন! এত উৎপাত। এত যন্ত্রণা, এত অভাব, এত প্রলোভন। কতদিন কতদিক সামলাবে নবিতুন? ভেসে যায় নবিতুনের বুকটা। রাতের আঁধারের মৌন সমর্থন পেয়ে গমকে-গমকে বেরিয়ে আসে কান্না আর নিঃশব্দ একটি জিজ্ঞাসা–সারেং কি আর আসবে না? (শহীদুল্লা, ২০১৭: ২৮)

একজন বিবাহিত নারীর স্বামী প্রবাসী হওয়া বা বিধবা হওয়া দুই-ই তাদের জীবনের প্রতিবন্ধকতাকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে তোলে। নারী যখন স্বামীর তত্ত্বাবধানে থাকে, তখন তার সমস্যা একমাত্রিক থাকে। স্বামীর অনুপস্থিতিতে সামাজিক পরিসরে তার সমস্যা বহুমাত্রিকতায় রূপ নেয়। অন্য যে কোনো শ্রেণি থেকে নিম্নবর্গের মানুষকে এই ষড়যন্ত্র ও বিপন্নতার শিকার হতে হয় বেশি। রাষ্ট্র ও বৈশ্বিক আর্থ-সামাজিক ধারাবাহিকতার মধ্যে শ্রেণিস্বার্থের ধারাবাহিকতা নানাভাবে, নানা স্বার্থে নিম্নবর্গকে শোষণ করে থাকে। বন্দি পশুর মতো নারীকে আত্ম-আদর্শে যুদ্ধ করতে হয়, ক্ষীণ গহ্বর খুঁজে নিরাপদ আশ্রয়ের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। এই পরিস্থিতিতে লুন্দর শেখের মতো নারীলোলুপ মানুষদের অত্যাচারের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। তাদের আধিপত্যবাদের হাত এত বিস্তৃত যে সেখানে শোষিতের দীর্ঘশ্বাস পৌঁছায় না। নবিতুনের স্বনির্ভরতার পথে ডাকযোগে আসা কদমের চিঠি, টাকা, সমস্ত কিছু

হস্তগত করে নেয় লুন্দর শেখ। প্রান্তিক এবং গ্রামীণ এলাকায় রাষ্ট্রীয় যে সমস্ত সেবা প্রতিষ্ঠান থাকে তা অনেকটা স্থানীয় শাসকবাহিনীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। এ যেন চর্যাপদের 'আপনা মাংসে হরিনা বৈরী'। এই বিরুদ্ধ পরিবেশকে মোকাবেলা করার জন্য নবিতুনকে হতে হয়েছে আরো বেশি সাহসী ও কর্মতৎপর। সমাজদেহে নারীর এই সংগ্রাম শুধু নবিতুনের নয়। প্রতিদিনের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা নারীকে এই পথ দিয়ে নিয়ে চলেছে। নারীর ইতিহাস বা নারীবাদের মূল কথায় সিঁমোন দ্য বোভেয়ার বলেছেন, সমাজ নারীকে বস্তুবাদী ও প্রয়োজনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নির্মাণ করেছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ, পুরুষের প্রয়োজনে নারীকে অধস্তন করে নির্মাণ করেছে আর তার জীবনের পরিসীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে (উদ্ধৃত, সেলিনা, ২০০৭ : ২৪)। এই কাঠামোর মধ্যে নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় না। তার সুযোগ নিয়ে পুরুষ আজীবন ধরে নারীর ওপর এই আধিপত্যের আগ্রাসন চালিয়ে যায়। নবিতুন তার জীবনের সম্মুখযুদ্ধে এই আগ্রাসনকে মোকাবেলা করেছে :

> পাটক্ষেতের আলে নেবে গা-টা কেমন ছমছম করে নবিতুনের। আলটার দু'পাশে ঘন পাট চারা নবিতুনের মাথা ছাড়িয়েও হাত দু'হাত উঁচু সব পাটের মাথা। পাটপাতার ঘন অন্ধকারের মাঝে আলোর পথটা বড় আবছা।....জানোয়ারটার নিঃশ্বাসে যেন আগুন। পশুত্বের বন্যতার বর্বরতার হিংস্র এক আগুন।..ও ছুটছে বাড়ির দিকে। এইটুকু তো পথ। তবু নবিতুনের মনে হয় সেই কখন থেকে ছুটছে ও। ছুটতে ছুটতে একসময় ও পৌঁছে গেল বরই গাছের সীমানা দেয়া উঠোনে। আক্‌কি আক্‌কি, ক্লান্ত দুটি স্বর যেন বহুদূর থেকে ডাকল। তারপর দোরগোড়ায় মূর্ছা খেয়ে পড়ে গেল নবিতুন। (শহীদুল্লা, ২০১৭ : ৬৯-৭২)

পুরুষের সর্বব্যাপ্ত প্রতিহিংসার বলয় থেকে দুঃসাহসিকতা, আত্মশক্তি ও বুদ্ধিমত্তার বলে নিজেকে, নিজের সম্ভ্রমকে রক্ষা করেছে সে। নবিতুনের মতো দুর্দমনীয় ও দৃঢ়চেতা নারী বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। সামাজিক ভয়-ভীতি, জীবনের নিরাপত্তাহীনতা, সবকিছুকে তুচ্ছ করে নিজের প্রতিজ্ঞায় অটুট থেকেছে সে। নারীর শরীর আর যৌনতায় পুরুষ ও পুরুষতান্ত্রিকতা এতটাই আচ্ছন্ন যে প্রতিটি দেশে, সমাজে, নারীকে এর বাইরে আর কিছু ভাবতে পারে না। এই লালসার আরেক নাম যৌনতার রাজনীতি। এই রাজনীতির প্রধান দিক ধর্ষণ, সেখানে নারীর জীবন, কর্ম, অবস্থান সমস্ত কিছু আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। সভ্যতার অগ্রগতিতে সমাজের অনেক পরিবর্তন হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে; কিন্তু নারীর প্রতি পুরুষের এই যৌনতাকেন্দ্রিক আগ্রাসনের কোনো পরিবর্তন হয়নি।এ প্রসঙ্গে গবেষক সুলাস্মিথ ফায়ারস্টোন[১] অর্থনৈতিক স্তরায়নের অপেক্ষা লিঙ্গীয় স্তরায়নকে নারীর নিগ্রহের কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন। লিঙ্গের সঙ্গে ক্ষমতাকে অভিন্ন বলে গণ্য করার ফলে সামাজিক স্তরায়নে পুরুষ আধিপত্য বিস্তার লাভ করে। নারীবাদ অনুসারে এই আধিপত্য নারীকে সকল প্রকার সামাজিক ভূমিকায় অবদমন করে রাখে।

(উদ্ধৃত, সেলিনা, ২০০৮ : ২৫৮) এই পরিক্রমা অনুসারে সমাজজীবনের সকল পর্যায়ে পুরুষ নারীর প্রতি সহিংস, জোরপূর্বক ভোগ ও নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়াস পেয়ে থাকে। নবিতুন নিরক্ষর, নিম্নবর্গীয় এক নারী। সে জানে তার সাম্যক অবস্থান, জেনেই সে সংগ্রাম করেছে।

১০.৫

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে পশ্চিমা সভ্যতা আগত যন্ত্রশিল্পের অবাধ প্রসার গ্রামীণ জীবনে নতুন সংকটের জন্ম দিয়েছিল। যন্ত্রের আবিষ্কার সভ্যতায় গতি আনলেও শ্রমজীবী মানুষ কাজের সুযোগ হারায়। নবিতুনের সংগ্রামের পথে আরো এক নতুন বাধার প্রাচীর তৈরি করেছিল চাল ভাঙার কলের আবির্ভাব । জীবনের নির্মাণবয়ন আর প্রযুক্তির নির্মাণবয়ন সব সময় একই সমান্তরালে কাজ করে না। প্রযুক্তির আধুনিকায়ন যেমন মানুষের জীবনে শ্রমলভ্যতা এনেছে, তেমনি ঐ শ্রমব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষের জীবনে সরাসরি আঘাত হেনেছে। পুঁজিবাদের অদৃশ্য জালে আটকে পড়া মানুষ বুঝতে পারে না কোনটা সাম্যবাদের প্রসারণ আর কোনটা আধিপত্যবাদের সুপ্ত সন্ত্রাস। (জহর, ২০১৭ : ১০১) কেবল প্রকৃতিলালিত মানবজীবনের অস্তিত্বের কাঠোমোর রূপাঙ্কানই লেখকের মূল অভিপ্রায় নয়। সমাজ বিবর্তনের অনিবার্য অভিঘাত প্রান্তিক নারীর জীবনে যে প্রভাব রেখে চলেছে, তাও তুলে ধরেছেন লেখক। বিশ শতকের সূচনাকালে বিদেশি প্রযুক্তির প্রত্যক্ষ অবদানে শ্রমজীবী নারীর নিরাপদ শ্রম বিনিয়োগের এই পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শ্রমজীবী নারীর জীবনে অন্ধকার নেমে এলে, তার সুযোগ নিতে উদ্‌গ্রীব হয়েছে পুঁজিপতি শ্রেণি। কারণ চালকলগুলোর মালিকানা থাকে উচ্চবর্গের হাতে। এই সমস্ত সংকট নবিতুনের মতো নিম্নবর্গের মানুষের অস্তিত্বের সংকটকে আরো অধিক বিপন্ন ও বাধাগ্রস্ত করে তুলেছে। এ প্রসঙ্গে গবেষকের মত নিম্নরূপ :

> যন্ত্রসভ্যতার উদ্যত থাবা নবিতুনের অস্তিত্বসংগ্রামকে গভীরতর সংকটের মধ্যে নিক্ষেপ করে। কদমের চিঠি, টাকা, সংবাদবঞ্চিত নবিতুন ও তার মেয়ে আককির অস্তিত্বের অন্ধকার ক্রমশ দীর্ঘায়িত হতে থাকে। নবিতুনের এই অসহায়ত্বের মূল কারণ বামনছাড়ি গ্রামের উঠতি ধনিক শ্রেণীর বিকৃত প্রতিচ্ছবি লন্দুর শেখ। তার ষড়যন্ত্রেই স্বামী প্রদত্ত টাকা ও চিঠি থেকে বঞ্চিত হয় নবিতুন। ফলে আরেপিত দারিদ্র্য নবিতুননের অস্তিত্বকে সীমাহীন অনিশ্চয়তায় নিক্ষেপ করে। (রফিকউল্লাহ, ২০০৯ : ১২৫)

পুঁজিবাদ নিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থায় জীবনের মূলমন্ত্রগুলো ঢেকে দেয়া হয় নিরপেক্ষতার অলীক মুখোশের আড়ালে। যার ফলে বস্তুবিশ্বের দ্বান্দ্বিক প্রকল্পের মধ্যে মানুষ তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক অস্তিত্বকে হারিয়ে ফেলে। এর মধ্য দিয়ে ক্ষমতাবানদের কাছে ক্ষমতাহীন মানুষেরা পণ্য হয়ে উঠেছে। নবিতুন সেই সব নারীদের দলে, যারা পুরুষের কর্তৃত্বের ঐতিহ্যের নিচে চাপা পড়া অনাম্নী

অঙ্গনার ঐতিহ্যের অংশ। সেই ভুলে যাওয়া, চাপা পড়া ঐতিহ্য আসলে নারী নিজস্ব ইতিহাস। মানুষ যখন বুঝতে পারে তার পায়েরতলার মাটি আসলে মাটি নয়, চোরাবালি। তখন বালির তলায় ডুবে মরার পূর্বে সে বাঁচার জন্য শেষবারের মতো মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়ায়। এই সোজা হয়ে দাঁড়াবার নাম আত্মসম্মান আর বাঁচতে চাওয়ার নাম বিপ্লব। পুরুষতন্ত্রের সম্মিলিত শক্তিকে অস্বীকার করে মেরুদণ্ড শক্ত করে দাঁড়িয়ে নবিতুন সমাজকে দেখিয়েছে নারী বাঁচতে পারে, বাঁচতে জানে।

১০.৬

পাঁচ বছর ধরে অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে নবিতুনকে নতজানু করতে না পারলেও, কদম সারেংকে দিয়ে লুন্দর শেখ তার কুমতলব সফল করেছিল। আকারে-ইঙ্গিতে, ইনিয়ে-বিনিয়ে তারা কদমকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল যে তার স্ত্রী নবিতুন বহুচারিণী। সংস্কারাচ্ছন্ন কদম পুরুষতান্ত্রিকতার মোহে অন্ধ হয়ে যায় :

> তুই নাকি চৌধুরী বাড়ি বান্দীর কাম করেছিস? রাত কাটিয়েছিস? রাত কাটিয়েছিস? জিজ্ঞেস করল কদম। ...তাহলে আমার নামকাম মান-সম্মান সব ডুবিয়ে দিয়ে বান্দীগিরি করেছিস তুই? কেন?... আর কি করেছিস? বল; শিগগীর বল।... দরজার গোড়ায় ঠায় দাঁড়িয়ে আছে নবিতুন। এতই যখন দেমাক তোর, ছুঁড়ে ফেলে দিস আমার টাকা, তা আমার বাপদাদার নামে কলঙ্ক না দিয়ে চৌধুরী বাড়ি উঠে গেলেই পারিস? (শহীদুল্লা, ২০১৭ : ১০৭-১০৮)

যে স্বামীর প্রতীক্ষায় অমানুষিক যন্ত্রণায় দিন কাটিয়েছে নবিতুন; সেই স্বামী যখন তার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলে, তখন নবিতুনের কিছু বলার থাকে না। নারীর প্রতি পুরুষ, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ দিনের পর দিন যে নির্মম যৌন আচরণ করে থাকে, সেখানে সমাজ কোনো অপরাধ খুঁজে পায় না। কিন্তু জীবনের তাগিদে, জীবিকার তাগিদে নারীর সামান্যতম স্খলনই গর্হিত অপরাধ হয়ে নেমে আসে তার জীবনে (মাসুদুজ্জামান, ২০১৯ : ১০৪)। নবিতুন সেই প্রথাগত পরিস্থিতির শিকার। অশিক্ষা আর কুসংস্কারাচ্ছন্নতায় বিভোর বাংলার গ্রামীণ নিম্নবিত্তের সমাজে নারীর প্রকৃত অবস্থাকে রূপায়িত করার দায়বদ্ধতা থেকেই লেখক অঙ্কন করেছিলেন নবিতুনের মতো সংগ্রামী নারী চরিত্র। সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অসহায়তার কারণে নিম্নবর্গের নারীর প্রতি অপমানজনক আচরণকে প্রতিষ্ঠিত করে সমাজ, এর মধ্য দিয়ে তাদের কর্ম ও কণ্ঠ দুই রোধ করে থাকে। নবিতুনের সংকটও সেখানে দানা বাঁধার সুযোগ পেয়েছে। সমালোচকের ভাষায় তা নিম্নরূপ :

> লুন্দর শেখের লোভ-প্রলোভন, তন্ত্র-মন্ত্র-ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করে বামনছাড়ির নবিতুন নিবিষ্ট চিত্তে বছরের পর বছর যে কদমের ধ্যান করেছে, সে কদমই অবশেষে নির্দয়ভাবে হরণ করলো নবিতুনের গর্ব; পিষ্ট ও দলিত করল নবিতুনের ইচ্ছাশক্তি। (গিয়াস, ২০০২ : ২১৭)

জীবনের প্রতি মুহূর্তে নিজেকে প্রমাণ করার দায়িত্ব নারীর একপাক্ষিক দায়বদ্ধতা। এই অসহায়তা শুধু নবিতুনের নয়, যুগ যুগ ধরে নারীকে বাঁচতে হয়েছে এই যন্ত্রণার রক্তক্ষরণ নিয়ে। বাংলাদেশের গ্রামে পুরুষশাসিত সমাজে নারীর অবমূল্যায়ন এবং পুরুষ কর্তৃক নারী-নিপীড়নের ইতিহাস যথেষ্টই রয়েছে। তাতে এটাও প্রমাণিত হয় যে সামগ্রিকভাবে নারী পুরুষের দ্বারা শাসিত ও ইচ্ছাধীন। নবিতুনের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাসমূহ এই আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার প্রকৃত প্রতিচ্ছবি। নব্যধনী লুন্দর শেখ আর দালাল পোস্টমাস্টারের ষড়যন্ত্রের কাছে নবিতুনের সংগ্রাম পরাহত হলেও, মাথা নত করেনি নবিতুন :

> হঠাৎ নবিতুনের মনে হল সমস্ত ঘরটাই ঘুরেছে। ভীষণভাবে ঘুরছে, ঘরের বেড়া, ঘরের পালা, ঘরের চাল! আর কাঁপছে পায়ের তলার ভিটাটি। ঘুরতে ঘুরতে গোটা ঘরটাই যেন ভেঙ্গে পড়ল নবিতুনের মাথার ওপর। ...বাইরে নবিতুন আর কুঁকাচ্ছে না।...ভোরের ঘুম ভেঙ্গে সারেং বাড়ির মেয়ে-মরদ সবাই দেখল, একটি মরা ছেলেকে পায়ের কাছে নিয়ে ঘুমিয়ে আছে নবিতুন। (শহীদুল্লা, ২০১৭ : ১০৮)

বিনা অপরাধে, অকারণ সন্দেহের প্রতিস্পর্ধায় নবিতুনের কষ্টের ফসলের বিনাশ ঘটেছে। পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতামূলক আচরণের ফসল হিসেবে সে পেয়েছে অপমান আর নিগ্রহ। সন্দেহের বশবর্তী হয়ে অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর প্রতি কদমের নির্মমতা নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির হীন প্রবৃত্তিরই প্রতিরূপ। অপ্রত্যাশিত আঘাতে অপরিণত মৃত সন্তানের প্রসব ঘটেছে নবিতুনের, দীর্ঘ দাম্পত্যের সংগ্রামমুখরতাকে চরম পরিণতি দিয়েছে এই আঘাত।

১০.৭

বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীর সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক অতি গভীর ও অবিচ্ছেদ্য। গ্রামীণ নারী তার পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না বরং তার জীবন পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত, নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে নারীর জীবন চিন্তা করা যায় না; বিশেষত উপকূলবর্তী বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীর জীবন। ঝড়, জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ সমুদ্র-তীরবর্তী মানুষের সাংবৎসরিক অভিজ্ঞতার অন্তর্গত। নবিতুনের সঙ্গে ঘটে যাওয়া অন্যায়-অপমানে প্রকৃতিও যেন তার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছে :

ঢেউটা ওদের পায়ের তলা দিয়ে চলে গেল। ওদের পায়ের তলা দিয়ে চলে গেল, কিন্তু ডুবিয়ে গেল বামনছাড়ি গ্রামটা। ভাসিয়ে নিল ঘরবাড়ি।...বলল কেমন করে ওই শুয়রের জাত লুন্দর আর ওই হারামির ব্যাটা 'পোস্টমাস্টার' সাজস করে আটকে রেখেছিল তোমার সব চিঠি। আমার চিঠিগুলোও যেতে দেয়নি। আর বলল, কার কার হাত দিয়ে তোমার টাকা আসত লুন্দরের কাছে। লুন্দর এক পয়সা ও দেয়নি আমাকে.....। নবিতুনের কথাটা শেষ হবার আগেই চেঁচিয়ে উঠল কদম, এ্যাদ্দিন --- এ্যাদিন এসব কথা বলিসনি কেন? (শহীদুল্লা, ২০১৭ : ১২১)

দারিদ্র্য-পীড়িত জীবনে কষ্ট আছে, অভাব আছে; তার মধ্যে নবিতুন আর কদমের মধ্যেকার মানসিক বিযুক্তি আর ভালোবাসার ছন্দপতনও আছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের অনিবার্য অনুবর্তন তাদের ভেতরের স্থবিরতার অচলায়তনকে ভেঙে মানবচৈতন্যের সুস্থধারাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। শাসকশ্রেণির অবিচারের ভেদরেখাটি যেমন স্পষ্ট হয়েছে, তেমনি তারাও সক্ষম হয়েছে তাদের জীবনের চিরচেনা স্বাদ উপলব্ধি করতে। মুমূর্ষু, সামন্ত-প্রভুদের দুরাচারী অভিসন্ধি এবং স্বার্থসর্বস্ব জোতদার-মহাজনের চক্রান্তে জীবন যেখানে নিয়ত বিপর্যস্ত, সেখানে বহুকাল পরের আকস্মিক জলোচ্ছ্বাসের উপদ্রব শ্রেণি-কৌলীন্যের বাছবিছার ধ্বংস করে দিয়েছে। সাইক্লোন এখানে তাই প্রকৃতির আক্রোশমাত্র নয়, দুর্নিবার উপপ্লবী জীবনসংগ্রামের প্রতীক। (মুহম্মদ, ১৯৮৮ : ৩৫) বিরুদ্ধমান প্রকৃতি দ্বন্দ্বময় দম্পতির মনের দূরত্ব ঘুচিয়ে তাদের চিরন্তন সংগ্রামী শক্তির উদ্বোধন ঘটিয়েছে :

যদি মরি একসাথেই মরব, বুঝলি? নবিতুন বলল, হ্যাঁ। নবিতুনের আঁচলটা নিজের কোমরে বাঁধা হয়ে গেলে আককির আঁচলটা টেনে নিল কদম। আঁচলটা নবিতুনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, নে এটা বেঁধে নে তোর কোমরে। তিন জন একসাথেই ভাসব। এ গাছ আর বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। (শহীদুল্লা, ২০১৭ : ১২২)

উপন্যাসের এই অংশের সঙ্গে আমরা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত গল্প 'তারিণী মাঝির' তুলনা করতে পারি। ময়ূরাক্ষীর প্রবল বন্যায় ভাসিয়ে নিয়েছিল তারিণী মাঝি আর তার স্ত্রীকে। বেঁচে থাকার প্রবল নেশায় ভেসে গিয়েছিল প্রেম, প্রণয় আর মানবিকতা। সেখানে প্রকৃতির রুদ্রতার কাছে হার মেনেছিল প্রেম। আর এখানে রুদ্রতা হার মেনেছে প্রেমের নিকট। নবিতুন-কদম দম্পতির বিষাদময় পরিণতির মধ্যে লেখক তাদের জীবনবোধের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন; পাশাপাশি ঔপন্যাসিক গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন সমুদ্রতীরবর্তী জনপদের জীবনসত্যকে। নিম্নবর্গের নারীর শিকড় সংসারের চারকোনায় এমনভাবে আবদ্ধ থাকে যে তাদের দুঃখভোগের কোনো সীমা-পরিসীমা থাকে না। ক্ষুন্নিবৃত্তির দুঃখভোগের পরে আসে, চারিত্রিক শুচিতার পুরুষতান্ত্রিক সমাজজাত ষড়যন্ত্র, তারপর

বৈরী প্রকৃতির অনিবার্য আক্রমণ। এতসব যুদ্ধের রক্তাক্ত পথ পাড়ি দিয়ে বাঁচতে হয় উপকূলবর্তী প্রান্তিক নারীকে। এ বিষয়ে গবেষক মনসুর মুসার অভিমত নিম্নরূপ :

> শহীদুল্লা কায়সার এই জীবনকে গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং নিষ্ঠার সঙ্গে তাকে তাঁর 'সারেং বৌ'-এর রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। সারেং বৌ নবিতুনের প্রতীক্ষা, আর্থিক অভাব অনটন, অনন্যমনা নায়িকার সতীত্ব রক্ষার প্রয়াস, সারেং এবং ...পরিস্থিতির নাটকীয় উপস্থাপনা, পরিবেশ ও ঘটনার আবেগময় বর্ণনা, চরিত্রের তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল ঋজুতা এবং ভাষার গতিময় চলমানতা 'সারেং বৌ' এর অন্যতম আকর্ষণ। 'সারেং বৌ' জীবন-রহস্য উদঘাটনের প্রয়াস নয়, জীবন-রূপ তুলে ধরার চেষ্টা। তাই গভীর জীবন-জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হতে লেখক চাননি। (মনসুর, ২০০৮ : ৭১)

জাতিভেদ, বর্ণভেদের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে লিঙ্গভেদের বৈষম্যের বীজ যে বিষবৃক্ষে পরিণত হয়েছে, লেখক সেটাকে দেখাতে চেয়েছেন এবং পাঠককে উপলব্ধিও করাতে চেয়েছেন। সে কারণেই তিনি নারীর যন্ত্রণাকে, শূন্যতাকে, হৃদয়ের রক্তক্ষরণকে দরদ দিয়ে দেখার সূত্রপাত করেছেন। সাম্যবাদী রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী লেখকের সত্তার গভীরে নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের প্রতি যে গভীর মমত্ববোধ; তাই মাতৃহীন আজন্ম সংগ্রামী নবিতুনকে নির্মাণ করতে প্রেরণা দিয়েছে। উপন্যাসের পরিণতিতে নবিতুনের অশেষ জীবনমুখী সত্তার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রলয়ংকারী জলোচ্ছ্বাসের ঝঞ্ঝা শেষে, শান্ত-ক্লান্ত মাটির পৃথিবী যখন জেগে উঠেছে, তার বর্ণনায় লেখক বলেছেন :

> কদমের মাথাটা কোলে তুলে নিল নবিতুন। কদম চোখ মেলেই আবার চোখ বুজল। বলল, পানি। পানি? দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখল নবিতুন... উদার আকাশটা সূর্য স্নেহমাখা হাতে প্রলয় বিধ্বসত এ পৃথিবীর ক্ষতে বুলিয়ে চলেছে প্রীতি-উষ্ণতার আরোগ্য-পরশ। বুঝি মুছে দেবে সব ক্ষত। সব ক্ষতি। (শহীদুল্লা, ২০১৭ : ১২৫)

জীবনের প্রীতি-রসে সিক্ত নবিতুন সমস্ত সংস্কার আর বিশ্বাসের ঊর্ধ্বে উঠে প্রতিষ্ঠিত করেছে জীবনের সত্যতাকে। আত্মবিশ্বাসে অবিচল ও দৃঢ় নবিতুন তার মুহূর্তের সিদ্ধান্তে ধর্মের নির্মোক মোহ থেকে মুক্ত হয়ে যৌক্তিক ভিত্তিভূমিতে প্রতিস্থাপিত হয়েছে। নারী চরিত্রের প্রথাগত পরিণতির বাইরে এসে, সংস্কারমুক্ত নবজীবনের অভিলাষী এক মানুষকে, এক নারীকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন লেখক। নবিতুন চরিত্রের এই মানবিক দিকের সঙ্গে *দি গ্রেপস অফ র‍্যাথ* (১৯৩৯) উপন্যাসের রোসাশার্নের চরিত্র তুলনা করা যায়। মৃত সন্তানের জন্ম দিয়ে স্তনবতী নবিতুন তার স্তনের সুধায় নতুন জীবন দিয়েছিল কদম সারেংকে। রোসাশার্নের দীর্ঘ যাযাবর জীবনের ক্লান্তিতে মৃত সন্তানের জন্ম দিয়ে যখন বিমর্ষ আর বিষণ্নতার মধ্যে দিয়ে যাত্রা করেছিল; তখন মৃতপ্রায় এক মুমূর্ষু ব্যক্তিকে স্তন্যের সুধায় নবজীবন

দানের চেষ্টা করেছিল। নোবেল বিজয়ী মার্কিন কথাসাহিত্যিক জন স্টাইনবেকের (১৯০২-১৯৬৮) এক কালজয়ী সৃষ্টিকর্ম এই উপন্যাস। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে সবকিছুর উর্ধ্বে মানবিকতার জয়কে প্রতিফলিত করেছেন লেখক। নবিতুনের মতো একজন নিম্নবর্গীয় নিরক্ষর নারীর এই মানবিক বোধ অতুলনীয়; গ্রামীণ নারীর প্রচলিত ধর্মীয় সংস্কারকে অতিক্রম করে সে উজ্জীবিত হয়েছে প্রকৃত মানুষের সমান্তরালে। নিম্নবিত্ত মানুষের মধ্যে থাকা মানবিকতা ও প্রগতিশীলতার যথার্থ প্রতিমূর্তিও সে। নবিতুন চরিত্রের নির্মোহ রূপদানে লেখকের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সদা সতর্ক প্রহরায় জাগ্রত ছিল। (সরিফা, ২০১৮: ৪২) যার ফলে প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রান্তিক পরিবেশে থাকা নবিতুনের পরিশীলতা ও স্বাতন্ত্র্যকে নির্মলভাবে নিরূপণ করতে পেরেছিলেন তিনি। নবিতুন চরিত্রটির সর্ব-সংস্কারমুক্ত বিশিষ্ট জীবনবোধ উপন্যাসটিকে তাৎপর্যমণ্ডিত করেছে।

১১.

শহীদুল্লা কায়সারের দ্বিতীয় উপন্যাস *সংশপ্তক* (১৯৬৪)। এই উপন্যাস সম্পর্কে তাঁর সহযোদ্ধা ও মার্কসবাদী সাহিত্যতাত্ত্বিক রণেশ দাশগুপ্তের অভিমত নিম্নরূপ :

> '*সংশপ্তক*' উপন্যাসে একটি যুগান্তরের ইতিকথা বিন্যস্ত।...দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষাবস্থা, যুদ্ধাবসান ও কলকাতার সাম্প্রাদয়িক দাঙ্গা, দেশ বিভাগ এবং দেশ বিভাগের পরে মুক্তি সংগ্রামের পালাবদল এবং বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সূচনা–এই কয়েকটি পর্বের পটভূমিতে বাংলাদেশের দুটি গ্রামের কয়েকটি চরিতকথা 'সংশপ্তকে' উন্মোচিত। (রণেশ, ২০০৮ : ১৫৫)

বাখতিনের কার্নিভাল তত্ত্ব অনুসারে উপন্যাসটি বহু নর-নারীর কোলাহলে মুখরিত। মহাকাব্যিক এই উপন্যাসে বিন্যস্ত গ্রামবাংলার শুধু বস্তুগত বিন্যাসেই সীমাবদ্ধ নয়, এর মানবিক বিন্যাসেও রয়েছে আশ্চর্য সজীবতার আবরণ। ঔপন্যাসিক তাঁর কাহিনির ব্যাপ্তিতে চিরায়তনিক গতিধারায় যেসব চরিত্রের নির্মাণ করেছেন, তাদের মধ্যে বিকশিত হয়েছে যুধ্যমান দ্বান্দ্বিক সত্তা।

১১.১

উপন্যাসের পরিপ্রেক্ষিত নির্মিত হয়েছে বাকুলিয়ার তালতলির প্রধান দুই আধিপত্যবাদী পরিবারকে কেন্দ্র করে, এর পাশাপাশি রয়েছে ঐ দুই গ্রামের নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীন মানুষের কথা। সাধারণত দুটি গ্রামের জনজীবনের কাহিনির মধ্যে লেখক নির্মাণ করেছেন সামন্তবাদী শাসনের দীর্ঘ ইতিহাসকে। জনজীবনের ইতিহাসের অন্তঃসলিলায় স্থান করে নিয়েছে জাতীয় রাজনীতির গতিধারা। সময়ের বিস্তীর্ণজালের বিশাল জলরাশিতে উঠে এসেছে সামন্ত শোষণে নিঃশোষিত পূর্ব বাংলার গ্রামীণ

জীবনের সংকীর্ণতা আর সংস্কারের কলধ্বনি; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রুদ্রানলদিনের বঞ্চিত মানুষগুলোর বঞ্চনার চালচিত্র। সবমিলিয়ে স্রষ্টার ইতিহাসচেতনা এবং সমাজবাদী জীবনাদর্শের স্পর্শে উপন্যাসের চরিত্রগুলো উচ্চকিত হয়েছে দ্রোহে ও বিদ্রোহে।(বিশ্বজিৎ, ২০০৯: ১১৮) লড়াই করে টিকে থাকা জনমানুষের জীবনের আলোহীন ইতিহাসের আলোক-উজ্জ্বল গাথা লেখকের চেতনার স্বরূপ। তাদের জীবনের অভিজ্ঞতার রূপায়ণে *সংশপ্তক* সংযোজন করেছে জনমানসের ক্রমবিকাশের রেখাকে।

১১.২

পুরুষশাসিত সমাজে রূপচিত্র নারীর লাঞ্ছনার নির্মম স্বরূপ প্রত্যক্ষ করা যায় সামন্তবাদী আদর্শ ও ধর্মচর্চায় স্থবির সমাজের মধ্য দিয়ে। উপন্যাস শুরু হয়েছে বাকুলিয়া গ্রামে দেহোপসারিণী হুরমতির বিচারসভার মধ্য দিয়ে। পুরুষতন্ত্র, নিম্নবর্গ, নারী-সমস্ত প্রত্যয় একত্রে এসে যেন ছোবল বসিয়েছে হুরমতির শরীরে। গ্রামীণ সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থায় নিম্নবর্গের নারীকে বিচারের নামে এভাবে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করা হয়। মানুষের পরিচয় থেকে নারীকে বঞ্চিত করে পুরুষের সঙ্গে নারীর সকল ক্ষেত্রে অসাম্য-বৈষম্য-বঞ্চনাকে সামাজিক-পারিবারিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। সেই সঙ্গে ধর্মান্ধতাকে প্রচারের মাধ্যমে বিশ্বাসযোগ্য করে নারী নির্যাতনের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। হুরমতির এই লাঞ্ছনা, অপমানের পথ যেভাবে প্রসারিত হয়েছে, সে কথা জানাতে উপন্যাসের কাহিনি অবলোকন করা প্রয়োজন :

> হুরমতির মায়ের জন্ম মিঞা বাড়িতে। আরিফার আম্মা যখন মিঞা বাড়ি ছেড়ে সৈয়দ বাড়ি এলো বাড়ির বড় বৌ হয়ে তখন বাঁদি হিসেবে সঙ্গে এসেছিল হুরমতির মা। তারও অনেক বছর পর হুরমতির জন্ম হয়েছিল এই সৈয়দ বাড়িতে। হুরমতির তখন কতই বা বয়স, পাঁচ কি ছয়, ওর মা মিঞা বাড়ি গিয়েছিল বেড়াতে সৈয়দ গিন্নির সাথে। সেই সময় একদিনে বার তিন বমি করেই শেষ নিঃশ্বাস ছেড়েছিল। (শহীদুল্লা, ২০১৭ : ২৮)

হুরমতি ও তার মায়ের জীবনের এই পরিমণ্ডল এ কথাই প্রমাণ করে যে পুরুষশাসিত সমাজের দ্বারা নারী শুধু নির্যাতিতই হয় না, নিয়ন্ত্রিতও হয়। পুরুষতান্ত্রিকতার এই নিয়ন্ত্রণ কখনো আসে সমাজের নামে, কখনো আসে ধর্মের নামে, আবার কখনো আধিপত্যবাদী শ্রেণির মধ্য দিয়ে।

১১.৩

নারীর জীবন সারা পৃথিবীতে একটি 'অপর ইতিহাস' হিসেবে নির্মিত হয়। তারপর সেই নারী যদি হয় ঔপনিবেশিক একটি রাষ্ট্রের সামন্তবাদী ব্যবস্থার চূড়ান্ত নিম্নের একজন মানুষ; তাহলে তার জীবন যে

সংকীর্ণময়তায় পূর্ণ হবে, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। নারী যখন নিম্নবর্গের হয়, তখন গ্রামীণ সমাজের জমিদার-মহাজন আর তাদের অনুসারী সবারই রিরংসা-লালসার শিকার হয়ে থাকে। তাই ধর্মের নামে, বিচারের নামে তারা এই প্রহসনের খেলা খেলে যায় সমাজ। সামন্তবাদী সমাজের এই কুৎসিত কদর্য খেলায় হুরমতি নির্বিকার :

> এত যে গালি তাতে ভাবান্তর নেই ওর মুখে। একটু হেলছেও না, কাঁপছেও না। মিঞার ধমকে মাথায় ঘোমটা তুলল নাও। একটিবার চেয়ে দেখল না হুকুমদাতা ফেলু মিঞার অথবা রমজানের দিকে। বাঁশের ছিলার মতো দেহটাকে টান করে, ঘাড়টিকে তেরছা করে অদূরের এক খণ্ড চেলা কাঠের দিকে চেয়ে সেই যে চেয়ে সেই যে দাঁড়িয়ে আছে, আছেই। (শহীদুল্লা, ২০১৭ : ১৫)

হুরমতির এই অপ্রতিরোধ্য অনড় অবস্থান পুরুষশাসিত সমাজ আর ঐ সমাজের বিচারকে চরমভাবে ধিক্কার জানিয়েছে। যেই শক্তির বলে তারা নিজেদের ক্ষমতাধর ভেবে একটি অসহায় নারীকে অমানবিক শোষণে প্রতিহার্য করেছে; শোষিত এই নারী দৃঢ়তার সঙ্গে অবিচল থেকে সমস্তব্যবস্থার প্রতি বৃদ্ধা আঙুলি দেখিয়েছে। হুরমতির নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে যে বিদ্রোহ প্রকটিত হয়েছে, তাকে লেখক অস্বীকার করতে পারেনি। সেই সঙ্গে বিচারের সমস্ত রায় মেনে নিয়ে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে তার প্রচণ্ড আত্মশক্তির পরিচয় বহনও করেছে। ঔপন্যাসিকের প্রাগ্রসর জীবনচেতনার চরম প্রকাশ ঘটেছে হুরমতি চরিত্রের মধ্য দিয়ে। জন্ম থেকেই যারা জ্বলতে শেখে তাদের পোড়ার ভয় থাকে না। বিচারে হুরমতির বক্তব্য শোনার প্রয়োজন কেউ অনুভব করেনি। কারণ বিত্তহীন অন্ত্যজ শ্রেণির নারী হুরমতি, ছোটলোকের জাত সে, পুরুষশাসিত উচ্চবর্গের সমাজে নির্ধারিত শাস্তি মাথা পেতে নেয়ায় তার নিয়তি। আর তাই বোধ হয়, এই প্রহসনের বিচার কোনো গুরুত্বই বহন করে না হুরমতির কাছে। আবার অর্পিত এই বিচারের শাস্তি নিয়েও শঙ্কিত নয় সে।

১১.৪

নিম্নবর্গের এই নারী সামাজিক ও আর্থিকভাবে দুর্বল হওয়ায় মুখোমুখি সংঘর্ষকে পরিহার করেছে। তার ভেতরের ধূমায়িত ক্রোধকে জাগ্রত রেখেছে, প্রলম্বিত করেছে প্রতিশোধের স্পৃহাকে। প্রকাশ্য বিচার সভায় দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে, তার শারীরিক ও মানসিক ভঙ্গিতে দৃশ্যমান হয়েছে ঔদ্ধত্য, অনমনীয় ও দৃঢ়চেতনার সপ্রতিভ প্রকাশ। ঔপন্যাসিকের বর্ণনার লালিত্যে তা আরো দীপ্তময় হয়ে উঠেছে :

> সম্রাট পঞ্চম জর্জের প্রতিকৃতি আঁকা তামার একটি পয়সা। কাঠকয়লার আগুনে পুড়ে পেয়েছে নতুন এক চেহারা। না আছে মুকুট, না আছে সম্রাটের মুখ, মনে হয় জমাট আগুনের একটি গোলাকার পাত।...

> মেয়েটির কপালের ঠিক মাঝখানে যেখান থেকে কিঞ্চিৎ ঢালু হয়ে নেমে গেছে ওর সুন্দর টিকোল নাকটি আর দু'পাশে ছড়িয়ে পড়েছে দুটো কাজল রেখা ভ্রু। (শহীদুল্লা, ২০১৭ : ১৯)

হুরমতি বিচার সভার আদিম পৈশাচিক নির্যাতন মাথা পেতে নির্বিবাদে মেনে নিয়েছে। মেনে নেয়া ছাড়া ঐ একা নারীর অন্য কোনো গত্যন্তর ছিল না। প্রচলিত পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে নারী যুগ যুগ ধরে এমনই নির্যাতন, শোষণ ও সহিংসতার শিকার হয়ে এসেছে। এই ঘটনা তার একটি প্রতিচ্ছবি মাত্র। শহীদুল্লা কায়সারের মতো সমাজসচেতন ঔপন্যাসিকের সৃষ্ট চরিত্রে সমাজবাস্তবতার যথার্থ প্রতিরূপ পাঠক প্রত্যাশা করে। তবে সত্য এই যে ক্ষমতালিপ্সু পুরুষের নিয়ন্ত্রণ-নির্যাতনের মধ্যেও হুরমতির মতো নারীরা আত্মচেতনায় বিদীর্ণ হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। এ ক্ষেত্রে হুরমতি একটি অন্তঃসলিলা ঋদ্ধিকারী চরিত্র, যে সামন্ততন্ত্রের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়েও সমুন্নত রেখেছে নিজের মেরুদণ্ডকে।

১১.৫

ভারত উপমহাদেশে নিম্নবর্গের যে গতিপথ তা এ কথাই বলে যে নিম্নবর্গ চিরকাল নিম্নবর্গই থাকবে। দাসের সন্তান দাস, বাঁদির সন্তান বাঁদি, শ্রমিকের সন্তান শ্রমিক। পারস্পরিক উন্নতি সাধনের নিমিত্তে মানবসমাজের যে উৎকর্ষ হয়েছিল; তাতে ফাঁক থাকে, ফাটল থাকে, ধ্বংসের বীজ থাকে। সেই ফাঁক-ফাটলের চেনাপথে নিম্নবর্গ চিরকাল নিম্নবর্গই থেকে যায়। তারই একটি ক্ষুদ্র ইতিহাস হুরমতি, হুরমতির জীবনপরিক্রমা। হুরমতির মতো যেকোনো গৃহনির্ভর শ্রমদানকারী নিম্নবিত্ত নারী-ই পরিচারিকা। অর্থাৎ 'পরিচারিকা' শব্দটির একটি বিশেষ অর্থ যে বা যারা পরিবারের সেবাকর্মে নিয়োজিত, সেখানে তারা দান করে তাদের আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা। মানবসভ্যতার গোড়া থেকেই এই জীবিকার নারীদের উপস্থিতি লক্ষণীয়। অর্থাৎ নারীর এই জীবিকাটি মানবসভ্যতার ন্যায়ই প্রাচীন (দেবযানী, ২০১৪: ১৫৭)। হুরমতির জীবনবৃত্তান্ত তার সাক্ষ্য দেয়; তার মায়ের পরে সে, তারা বংশ পরম্পরায় বকুলতলির মিঞা বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করেছে। এই পরিসরে তার জীবন গড়ে ওঠেছে আশৈশব মাতৃহীন, পোড়-খাওয়া, আশ্রিতার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থায় ওরা ছায়ার মতো বেড়ে ওঠেছে ; উচ্চবর্গের অত্যাচারে আশ্রিত এই নিম্নবর্গীয় নারীরা মূক বা বোবার মতো আচরণ করে। হুরমতি বিদ্রোহ করেছে এই প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। সে সেই সব বুদ্ধিমতী নারীর দলে, যারা নিজেদের অধিকার বুঝে নিতে চায়। সে সামাজিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর।

১১.৬

হুরমতিদের জীবন শোষণের বংশানুক্রমিক ধারায় প্রবাহিত, হুরমতি নিজেই জানে না তার পিতৃপরিচয় কী? আবার গ্রামে তার পরিচয় 'যারবা' অর্থাৎ পিতৃপরিচয়হীন অবৈধ সন্তানের মা। প্রশ্ন হলো সে কার অবৈধ সন্তান গর্ভে ধারণ করেছে? এই ইতিহাস খুঁজতে গেলে বের হয়ে যাবে সামন্তবাদী শাসনের কলঙ্কিত অধ্যায়। যেই সন্তানের আগমন হেতু হুরমতিকে সহ্য করতে হয়েছিল দানবীয় যন্ত্রণা, তার প্রতি মাতৃত্বের স্নেহধারায় কোনো কমতি ছিল না তার। কারণ, সন্তানের বৈধ, অবৈধতার দৃষ্টিভঙ্গি সমাজ নির্ধারণ করে, তার সাথে মাতৃত্বের কোনো সম্পর্ক থাকে না। সন্তানের অস্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ থেকে শুরু করে পৃথিবীর আলো দেখানো পর্যন্ত সব মা একই মানবিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায়। বরং অবৈধ সন্তানের মাকে বেশি যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, সামাজিকভাবে ও মানসিকভাবে। তবু সে সব অপমানকে মেনে নিয়েছিল মা হওয়ার সুখকর অনুভূতির বিনিময়ে। এ প্রসঙ্গে পুরুষতান্ত্রিক ব্যাখ্যা এমন যে পুরুষ নারীকে শারীরিকভাবে উর্বর করে তুলেছে; যার ফলে নারী সন্তান জন্মদানে সক্ষম হয়েছে। বলা বাহুল্য, পুরুষের এই প্রতিষ্ঠা সহজ-সরল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে করা হয়নি। এর পেছনে কাজ করছে পুরুষতান্ত্রিক রাজনীতি। এই রাজনীতি অনুসারে পুরুষ যৌনসত্তার স্বাভাবিক পরিচিতি অর্জন করেছে আর নারী চলে গিয়েছে প্রান্তে। প্রান্তবর্তী নারীর কোনো সক্রিয়তা নেই, সে শুধু পুরুষের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে (মাসুদুজ্জামান, ২০১৯ : ১৩৪)। প্রান্তবর্তী জীবনের পরিক্রমায় আর সামন্তবাদী সমাজের অপপ্রয়াসে যাদের জন্ম, তাদের মানুষ হয়ে বাঁচতে দেয় না এই সমাজ ও সমাজের অধিকর্তারা। কিন্তু হুরমতি কোনো বাধাকেই বাধা মনে করে না, তার সাহস অপরিমেয়, অসীম। হুরমতির এই অপ্রতিরোধ্য আত্মশক্তি তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এ প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *গণদেবতা* ও *পঞ্চগ্রাম*-এর উপন্যাসের অত্যন্ত সাহসী নিম্নবর্গের নারী দুর্গার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের অভিমত:

> গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম -এ কলোনিয়াল সমাজের ক্রম-বিবর্তনের দ্বন্দ্বজটিল রূপের সঙ্গে ব্যক্তি ও সমষ্টির আন্তঃসম্পর্কের স্বরূপ বিধৃত হয়েছে। বাকুলিয়া-তালতলির নিস্তরঙ্গ গ্রামীণ প্যাটার্নের মধ্যে ভারতবর্ষীয় রাজনীতি এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদ্বন্দ্বের অভিঘাত যে তরঙ্গ -কম্পন সূচিত করে, তার প্রতিক্রিয়ার বহুমাত্রিক রূপ শহীদুল্লা কায়সার নিরাসক্ত দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন। (রফিকউল্লাহ, ২০০৯ : ১৯৪)

দুর্গার চরিত্রকে রূপদান করতে গিয়ে লেখক একদা বলেছিলেন, উচ্চবর্গের পাপের বোঝা বহন করতে যুগে যুগে, কালে কালে, দুর্গাদের জন্ম হয়। পূর্ব বঙ্গের সামন্তবাদী সমাজ ও উত্তর সমাজে হুরমতিদের জন্ম হয়েছে।

১১.৭

বিত্তহীন হুরমতি স্বাধীনচেতা, সাহসী আর জেদি। রমজান আর ফেলু মিঞার ষড়যন্ত্রমূলক বিচারে তাকে ছ্যাঁকা দিয়ে একঘরে করা হবে জেনেও সে বিচলিত হয়নি। কপালে আঁকা কলঙ্কের প্রতিচিহ্ন তাকে শক্তি দিয়েছিল প্রতিশোধের। ফেলু মিঞাকে হাতের নাগালে না পেলেও নারী লোলুপ রমজানকে তার ফাঁদে পা দেয়ার ব্যবস্থা করেছিল সে। শিকার লোভী শিয়ালের মতো রমজান নিজের অস্তিত্বের পরিচয় দিয়েছিল হুরমতির ঘরের আশে পাশে প্রতিধ্বনি তুলে। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে প্রতিশোধের নেশায় বুঁদ হয়েছিল হুরমতি :

> লোমশ গরিলা বাহুর যাঁতায় একদলা মাংসের মতো ওকে পিষে চলে রমজান।...হুরমতি হাসে। ছিনালী হাসি। ছিনালী কটাক্ষ। একী রহস্য হুরমতির তবে কি এমনি করেই আজ ওকে বিদায় দিয়ে দেবে হুরমতি? চৌকি ছেড়ে এক পা দু'পা এগিয়ে আসে রমজান । ট্যাঁক খুলে থলেটা তুলে দেয় হুরমুতির হাতে।... আধো অন্ধকারে ঠাহর করে ওকে স্পর্শ করে রমজান। আর এতক্ষণ সামলে রাখা পশুত্বটা যেন চেরাগের উপর ধরে রাখা গালার মধ্যেতা গলে গলে ঝরে পড়ে। হঠাৎ কি যেন হয়ে গেল। তীব্র তীক্ষ্ণ এক চিৎকারে বাজ খাওয়া কাকের মতো ছিটকে পড়ল রমজান। বন্ধ দরজায় টুঁ খেয়ে মাথা ফাটালো। যন্ত্রণার চিৎকারে রাত্রির নীরবতা চিরে বেরিয়ে গেল রমজান, আর হুরমতির খিলখিল হাসিটা যেমন বিষ মাখা তীরের মতো ওর পিছু ধাওয়া করল। প্রতিশোধ নিয়েছে হুরমতি। (শহীদুল্লা, ২০১৭:১৭০)

লোমশ গরিলাসম হিংস্র শিকারি রমাজানকে সমাজের সামনে কানকাটা রমজানে অভিহিত করে হুরমতি শুধু স্বীয় প্রতিশোধ স্পৃহাকে প্রশমিত করেনি, পাশাপাশি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে পৈশাচিক বর্বর সমাজের চরম দনবীয়তার বিরুদ্ধে। নারী বলে, অবলা বলে, সে শুধু মার খেতেই পারে না প্রতিশোধের প্রবল শিখায় সেও পোড়াতে পারে ব্যক্তিকে, সমাজকে। আত্মজিজ্ঞাসা আর আত্মপীড়নের দহন তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে রমজানের প্রবল প্রতাপকে প্রতিহত করতে। হুরমতির এই-প্রতিশোধ-স্পৃহায় তাকে শক্তি দিয়েছিল সেদিনের অপমান, তিরস্কারকে সহ্য করার। *সংশপ্তক* এর বিস্তৃত, ব্যাপক আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন-রসধারায় হুরমতি এক অপরিসীম জীবনীশক্তির আধার। একজন নিম্নবর্গের নারীর চরম দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত তাকে স্বতন্ত্র করেছে অন্য সব চরিত্র থেকে। ঔপন্যাসিক শহীদুল্লা কায়সারের সামগ্রিক সাহিত্যসত্তায় নারীকে শক্তিমতী রূপে প্রতিষ্ঠিত করার একটি বিশেষ মানসপ্রবণতা লক্ষ করা যায়। সেই আলোকিত পটভূমিতে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের

নারী আপেক্ষা নিম্নবর্গের, নিরক্ষর, পোড়খাওয়া নারী, অধিক আকৃষ্ট করেছে তাঁর মননশীলতাকে। সে ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, শোষিত মানুষের পক্ষে রাজনীতি করার মানবিক ঔদার্যতা তাকে অনুপ্রাণিত করেছে সমাজের সর্বাপেক্ষা শোষিত মানুষ, নিম্নবর্গের নারীর সংগ্রামশীলতাকে শিল্পরূপ দিতে।

১১.৮

উপন্যাসে হুরমতির মতো আর একজন নিম্নবর্গের নারী আছে, যার নাম আম্বরি। হুরমতির মতো স্বাধীন জীবন এবং জীবিকা কোনোটাই তার ছিল না। স্বামী লেকু আর একমাত্র কন্যা ভুনিকে নিয়ে তাদের সংসার। রোগা-পটকা চেহারার আম্বরি এককালে সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবতী ছিল। লেকুর সংসারে দিনান্ত শ্রমের বিনিময়ে যে খাবারের জোগান আসে, তা তিনজনের জন্য যথেষ্ট নয়। তারপর আছে বিনা কারণে লেকুর নির্মম, নির্দয় নির্যাতন; ক্রোধে অন্ধ লেকু মানুষ থেকে পশুতে রূপান্তরিত হয়। তার পশুত্বের আক্রোশ শিকার উন্মাদ সিংহকে হার মানায় :

> দ্বিগিদিক জ্ঞান নেই লেকুর। হিস সিং হিস সিং আর্তনাদ তুলছে ঝাঁটার বাড়ি আর নারকেল শলাগুলো দাগ কেটে বসে যাচ্ছে আম্বরির উদলা পিঠে। এর পিঠের এক ইঞ্চিও চামড়াও বোধহয় আজ আস্ত রাখবে না লেকু, থেঁতলে দেবে সারা পিঠ। যেমন ক্ষেপেছে!... হারামজাদি মাগি। (শহীদুল্লা, ২০১৭: ৩৪)

গ্রামীণ নারীর জীবনে স্বামীর হাতে নির্যাতন আজ পর্যন্ত খুব স্বাভাবিক ঘটনা রূপে বিবেচিত হয়ে আসছে। একবিংশ শতাব্দীর এই সময়েও শিক্ষিত, অশিক্ষিত, উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত সব শ্রেণির নারী স্বামীর দ্বারা নির্যাতিত হয়। পুরুষতান্ত্রিকতার নির্মিত অনেক অলিখিত নিয়মের মধ্যে নারীর প্রতি শারীরিক এই অবদমন একটি নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিম্নবিত্ত বা নিম্নবর্গের নারীর নির্যাতন সবার সামনে ঘটে তাই তার প্রমাণ থাকে; অন্যদের অপমান জনমানসের বাইরে ঘটে তাই গোচরে আসে না। নারীর এই অবরুদ্ধতা, বিকাশবিরোধী জীবন, তাদেরকে জীবনের প্রতি ভালোবাসার পরিবর্তে জন্ম দেয় বিতৃষ্ণা, ঘৃণা ও হতাশার। এ প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানী এরিখ ফ্রমের মতামত : সমাজে নিরাপত্তাবোধ, সম্মানজনক অবস্থান, ন্যায়বিচার এবং স্বাধীন মূল্যবোধ্য-এসব উপস্থিত থাকলেই ব্যক্তির মনে জীবনের প্রতি অনুরাগ, ভালোবাসা জন্মে। কিন্তু দেখা যায়, অস্তিত্বের নিরাপত্তাহীনতা, সমাজের হতশ্রী অবস্থান, বৈষম্যমূলক আচরণ এবং নিয়ন্ত্রণ–এসব পারিপার্শ্বিকতায় নারীর অবস্থান অত্যন্ত সংকুচিত। বাংলাদেশের গ্রামে এই সংকীর্ণ অবস্থানে থেকেই নারী কাটিয়ে দিয়েছে যুগের পর যুগ। (উদ্ধৃত, মহীবুল, ২০০২: ২১৮) আম্বরি সেই সব নারীদের একজন, যারা নীরবে, নিভৃতে স্বামীর নির্যাতন, অপমানের অন্তর্দাহ নিয়ে আজীবন বাঁচে, বেঁচে থাকে। প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করার ভাষা তাদের অজানা।

১১.৯

শহীদুল্লা কায়সার জীবনবোধ ও জীবনবাস্তবতাকে শিল্পরূপ দিতে গিয়ে জনজীবনের অভিজ্ঞতাকেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। সমাজ ও সময়ের জটিল দ্বন্দ্ব ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গের জীবনসংশ্লিষ্ট ঘটনা-অনুষঙ্গের নাটকীয় গীতিময়তা দিয়েছে অনিবার্য প্রভাব কাহিনিকে। নিম্নবর্গের ইতিহাস তাত্ত্বিকদের মতে নারী লিঙ্গগত বৈষম্যের কারণে সব সময়ই নিম্নবর্গের মানুষ। তারপর যখন অর্থনৈতিকভাবে নিম্নবর্গাধীন হয়ে থাকে, তখন তাকে দুইভাবে বৈষম্যের শিকার হতে হয়। এই বৈষম্যের কারণে নারীকে বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের শিকার হতে হয়, তা কখনো আসে সমাজ থেকে, কখনো আসে পরিবার থেকে। শুধু নারী হওয়ার কারণে পুরুষশাসিত সমাজে হুরমতিকে যেমন করে সমাজনির্ধারিত সমস্ত শাস্তি, অপমানকে মাথা পেতে গ্রহণ করতে হয়েছে; ঠিক তেমনিভাবে আম্বরিকে স্বামী লেকুর দ্বারা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়ে সংসারে স্থিত হতে হয়েছে। হুরমতির কোনো স্বামী না থাকায় তাকে শোষণ করেছে ফেলু মিঞা, রমজানের মতো পুরুষেরা। আম্বরির স্বামী থাকায় তাকে নির্যাতিত হতে হয়েছে স্বামীর হাতে। দুই ক্ষেত্রেই নির্যাতনকারী পুরুষ; প্রথম ক্ষেত্রে আর্থিক ও লৈঙ্গিকভাবে উচ্চবর্গ, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে লৈঙ্গিকভাবে উচ্চবর্গ। এই পরিস্থিতিতে বলা যায়, নারী সর্বক্ষেত্রে, সর্বাবস্থায় নিম্নবর্গ। হুরমতি আর আম্বরির জীবন একই সুতায় বাঁধা। বাংলাদেশের নারীর সমস্যার দিকে দৃকপাত করলে সমাজের পশ্চাৎপদতা, নিরক্ষরতা, কুসংস্কারপূর্ণ এই সমাজ নারীর স্বাভাবিক বিকাশের সুস্থ পথ বন্ধ করে রেখেছে। জন্মের পর থেকেই মেয়েদের বিশেষ সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, যেখানে তারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে 'না' দ্বারা প্রতিপালিত হয়। এই 'না' -এর সার্বভৌমিক অবস্থানে নারী জীবনভর এক প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের যে কাঠামো, তাতে ভূম্যধিকারী শ্রেণি চিরকাল কর্তৃত্ব করে এসেছে আর তার অধীনস্থ কৃষকশ্রেণির ওপর; সামাজিকভাবে তারা নিম্নস্তরে থেকে নিম্নবর্গে পরিণত হয়েছে। একই পরিক্রমায় নারী সামাজিক ও পারিবারিকভাবে নিম্নবর্গাধীন হয়ে চলেছে। সমাজের সবল মানুষেরা, অপেক্ষাকৃত দুর্বল নারীদের বারবার নির্যাতন-নিপীড়ন করেছে। হুরমতি আম্বরির মতো অজেয় সব নারীর প্রাণশক্তি সেই দমন-পীড়নকে সহ্য করে অন্তিম পর্যন্ত প্রাণশক্তিকে উজ্জীবিত রেখেছে। এই চরিত্রের পরতে পরতে আছে বাংলাদেশের গ্রামীণ নিম্নবর্গের নারীর জীবনসংগ্রামের প্রতিভাস। আম্বরির মৃত্যু ঘটলেও ঔপন্যাসিকের আশাবাদী জীবনদর্শনের প্রেরণা নিয়ে জীবনযুদ্ধে এগিয়ে চলেছে হুরমতি। সমস্ত বিপর্যয়ের মধ্যেও সে বেঁচে থেকেছে জীবনকে ভালোবেসে। *সংশপ্তকের* বিস্তৃত পরিসরে সামাজিকভাবে নিম্নস্থ নারীর অসাধারণ হয়ে ওঠার ইতিহাস শহীদুল্লা কায়সারের মানবিক জীবনদৃষ্টির গুণে সমৃদ্ধ।

১২.

জহির রায়হান (১৯৩৩-১৯৭২) একজন কথাসাহিত্যিক, চলচ্চিত্র নির্মাতা ও রাজনৈতিক কর্মী। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনেরও একজন কর্মী তিনি। সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর সখ্য কৈশোরের, যৌবনের প্রেম চলচ্চিত্র আর রাজনীতির সঙ্গে তাঁর বসবাস সর্বাঙ্গীন। ছাত্রাবস্থায় তিনি রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। একজন সর্বাঙ্গীন সংস্কৃতিকর্মী রূপে রূপান্তরিত হতে তার মননের অন্তঃশিলায় বহমান ছিল রাজনীতি। কলকাতার 'নতুন সাহিত্য' নামক পত্রিকায় লেখা প্রকাশের মধ্য দিয়ে। এর পরে পঞ্চাশের দশকে ছাত্র অবস্থায় তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ *সূর্যগ্রহণ* (১৩৬২ব.) প্রকাশিত হয়েছিল। *শেষ বিকেলের মেয়ে* তাঁর প্রথম উপন্যাস। তিনি বাংলা সাহিত্যে নিজের পাকাপোক্ত আসন তৈরি করেন *আরেক ফাল্গুন* (১৯৬৯) নামের ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়ে। সাহিত্যে 'আদমজী সাহিত্য পুরস্কার' অর্জন করেন *হাজার বছর ধরে* (১৯৬৪) উপন্যাসে। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন ও সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবিকেন্দ্রিক সাহিত্যিক উপাখ্যান তাঁর এই উপন্যাস। তীক্ষ্ণ জীবনবোধ ও বোধিসত্তার কারণে যখন যে কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেছেন, সেখানেই তিনি সফলতায় উচ্চকিত হয়েছেন। বহুমাত্রিক এই প্রতিভার সাহিত্যিক সৃষ্টিশীলতাকে *হাজার বছর ধরে* উপন্যাসের পরিধিতে প্রত্যক্ষ করব।

১২.১

জহির রায়হান শুধু একটি নাম নয়, একটি চেতনা ও আদর্শের প্রতীক। বাঙালির মুক্তির সংগ্রামের ইতিহাসে লুকিয়ে আছে তাঁর ব্যক্তিত্বের বিকাশের ইতিহাস। 'আসছে ফাগুনে আমরা দ্বিগুণ হবো' *আরেক ফাল্গুন* উপন্যাসের এই সংলাপের মধ্যে তাঁর চেতনার ক্ষুরধার সম্পর্কে স্বীকৃতি পাওয়া যায়। বায়ান্নকে নিয়ে ঔপন্যাসিকের এই ঘোষণা শতগুণ হয়ে বাঙালির জীবনে প্রতিফলিত হয়েছিল উনসত্তর আর একাত্তরে। জহির রায়হান তাঁর গভীর আন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বাঙালির জীবনের পরিবর্তনের বাতাবরণকে। একজন রাজনৈতিক কর্মী ও একজন সংস্কৃতিকর্মী হয়ে তাঁর জীবন আর ইতিহাস একই ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। তাঁর শিল্পে রয়েছে তারই পরিপূর্ণতার প্রতিচ্ছবি। এ প্রসঙ্গে গবেষকের অভিমত :

> তিনি বাংলাদেশের সাহিত্য প্রতিবাদী চেতনার রূপায়ন করেন। তাঁর সাহিত্যে আমরা খুঁজে পাই স্বদেশ চেতনার আন্তরিকতা, গভীর জীবনবোধ এবং জীবন সম্পর্কে এমন অনেক জিজ্ঞাসা উত্থাপিত হয়েছে,

> যেগুলো সামাজিক, রাজনৈতিক, অনেক ক্ষেত্রে মানবিক। ... মানব মনের বিচিত্র স্তর উদ্‌ঘাটনে উৎসাহী, তবে অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে গভীরতর ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে যথাযথ নয়। উপস্থাপন রীতিতে জহির রায়হান নিরীক্ষাধর্মী । (আহমেদ, ১৯৯৭ : ৪০)

এভাবেই তিনি বাঙালির মানসচেতনার সত্যটিকে শিল্প-সাহিত্যে বিস্ময়করভাবে উপস্থাপনে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। *হাজার বছর ধরে* (১৯৬৪) লেখকের উদীয়মান চেতনার বিকল্প ধারার হলেও তাঁর রাজনৈতিক চেতনার বাইরের কোনো সাহিত্যিক প্রয়াস নয়। বরং সাম্যবাদী দর্শনের সক্রিয় কর্মী হিসেবে আবহমান বাংলার প্রান্তিক মানুষের কথাসাহিত্যের সমতলভূমিতে তুলে ধরার দায়বদ্ধ তাঁর ছিল। এ প্রসঙ্গে গবেষক রফিকউল্লাহ খানের মত স্মর্তব্য :

> সময় ও সমাজের চলিষ্ণুতার পটভূমিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে গভীরতর অর্থে কোনো গুণগত পরিবর্তন ছিলো অনুপস্থিত। রাষ্ট্র-কাঠামোর আপাত-উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ড সত্ত্বেও রাষ্ট্রের স্থূল অস্তিত্বের প্রয়োজনে জাতিশোষণ, শ্রেণী শোষণ ও ধর্মশোষণ রূপবদল করেছে মাত্র–সমাজদেহ থেকে অপসারিত হয়নি। আর্থ-সামাজিক কাঠামোর গুণগত পরিবর্তনহীনতা বৃহত্তর গ্রামীণ জীবনকে সেই প্রথাজীর্ণ, নিস্তরঙ্গ অবকাঠামোর মধ্যে করে রেখেছে অবরুদ্ধ। জহির রায়হান অন্তরঙ্গভাবে জীবনের এই স্বরূপসত্য উন্মোচন করেছেন হাজার বছর ধরে উপন্যাসে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিচিত্র অন্তঃঅসঙ্গতির মধ্যেও তিনি সন্ধান করেছেন জীবনের চিরায়ত আবেগী স্পন্দন। (রফিকউল্লাহ, ২০০৯ : ১২১)

পূর্ব বাংলার গ্রামীণ পরিবারের মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের পৌরাণিকতা, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বহুবিবাহের বীভৎসতা সবই এই উপন্যাসের অন্তর্গত। বিশেষ করে আদিম আধিপত্য, কর্তৃত্ব ও অত্যাচার, নারীকে যেরূপ ভারবাহী পশুতে পরিণত করেছে তার বহুমাত্রিকতা এই উপন্যাসের প্রধান প্রতিপাদ্য। পশ্চাৎপদ গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক-সংস্কৃতিক অবকাঠামোয় নিরীহ মানুষের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম উপন্যাসটিকে আলোকিত করেছে। আধুনিক উপন্যাসের ব্যক্তিকেন্দ্রিক যে সংকট ও সম্ভাবনা তা অপ্রকাশিত থেকেছে এখানে। সম্মিলিত জীবনের ঐতিহ্যের পাশাপাশি সংস্কার আর প্রথায় আচ্ছন্ন মানুষের সামষ্টিক রূপায়ণকে প্রতিমূর্ত করেছেন লেখক। গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজব্যবস্থার ক্ষয়িষ্ণু রূপের মধ্যে ব্যক্তি ও নারীর অধীনতা, অসহায়তাকেও প্রকটিত করেছেন ঔপন্যাসিক।

১২.২

উপন্যাস বাস্তবানুগ ও জীবন-সংলগ্ন শিল্প-প্রয়াস। এখানে জীবনের বিস্তৃতরূপের ব্যাখ্যান থাকে। উপন্যাসে জীবনের চলমানরূপ থাকে বলে একজন কথাশিল্পীর পক্ষে এখানে নিস্পৃহ বা নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব নয়। উল্লেখ্য যে পল্লি-প্রতিবেশ ও তার জীবনসত্য অঙ্কন বাংলাদেশের উপন্যাসের একটি মৌল সত্য। এই উপন্যাসটি মাটির কাছাকাছি মানুষের জীবন ও জীবনের পারিপার্শ্বিকতায় আবর্তিত।

উপন্যাসের অধিকাংশ ঘটনা কেবল জীবনের স্থুল উপরিতলের বিবরণে ভারাক্রান্ত, কেবলই চিত্রধর্মী; বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত কুশীলবের জীবনসংগ্রামই এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য। উপন্যাসের সফলতা নিয়ে, শিল্পতাত্ত্বিক রূপায়ব নিয়ে সমালোচকগণের বিভিন্ন মতামতের মধ্যে কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হকের এই অভিমতটি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে :

> অসামান্য স্বচ্ছ গদ্যে রূপকথার ধাঁচে লেখা এই বইটিতে একটি আদিম সারল্য আছে। কিন্তু জীবনের শাখা-প্রশাখাময় জটিলতা, জীবনের বিশাল ব্যাপ্তি, মানুষের বেঁচে থাকার উন্মত্ত কলরোল কোনো কিছুই নেই হাজার বছর ধরে উপন্যাসটিতে। থাকতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। সব উপন্যাস তো একরকম নয়। (হাসান, ২০১৩ : ২২)

এই মন্তব্যকে স্মরণে রেখে বলা যায়, সব উপন্যাস আধুনিকতার নবনির্মিতিতে মোড়ানো নয়। তবু প্রথাগত দৃষ্টিসীমার বাইরের জীবনকে, যে জীবন বাংলার চিরন্তন লোকায়ত সংস্কৃতিকে লালন করে ; *হাজার বছর ধরে* বাংলার ফেলে আসা সেই জীবনের চিরন্তন প্রতিচ্ছবি। বহুকালের প্রচলিত গ্রাম-বাংলার স্থিরচিত্রকে পাঠকের সামনে আরও একবার উপস্থাপন করলেন লেখক; বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিনির্মাণ করলেন বাংলার জনমানুষের জীবনচিত্রকে। পাশাপাশি উদ্ভাসিত করেছেন কুসংস্কারাচ্ছাদিত বাংলার গ্রামীণ সমাজে নারীর অবহেলিত, নির্যাতিত, নিপীড়িত জীবনের বহুবর্ণিল রূপকে। এখানে টুনি প্রধান ও ব্যতিক্রমী চরিত্র; পাঠককে মুগ্ধ করেছে তার চঞ্চলতা, বুদ্ধিমত্তা, সংস্কার বিমুখতা ও সৎসাহস দিয়ে। মূলত টুনিই এই কাহিনি-কাব্যের প্রাণ, তাকে কেন্দ্র করেই কাহিনির আবর্তন ঘটেছে। কাব্যিক ব্যঞ্জনায় এক কিশোরী নারীর জীবন পরিবৃত্তকে অঙ্কন করেছেন ঔপন্যাসিক। সমালোচক রণেশ দাসগুপ্তের মতে :

> 'হাজার বছর ধরে' শহীদুল্লা কায়সারের 'সারেং বৌ' উপন্যাসের মতোই বাংলা লোককাব্য। এ উপন্যাসে বাংলাদেশের আবহমান চাষা-জীবনের যে সব ছবি দেয়া আছে, তার মধ্যে কোন যুগান্তর নেই। প্রকৃতি হচ্ছে একই সঙ্গে 'শত্রু এবং বন্ধু'। সুখদুঃখ ভালমন্দ, আলো অন্ধকার, ঘৃণা ভালোবাসার 'এপার ভাঙ্গার ওপার গড়ার' পালা, যে যাকে পায় তাকে চায় না, যে যাকে চায় তাকে পায় না। গভীর দুঃখের ধারা বয়ে চলেছে সারা বইটিতে।' এরকম গ্রামীণ অঞ্চল যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেও দেখা যায় না তা নয়। সুতরাং 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের ঘটনাধারা অবাস্তব নয়। (রণেশ, ২০০৮ : ১৬৭)

এ উপন্যাসে গ্রামীণ সমাজের কৃষিকেন্দ্রিক জীবনের প্রান্তিকতার পঙ্কিলতাকে, হাজার বছরের মন্থরতাকে, বিনির্মিত করা হয়েছে। শিল্পায়িত করা হয়েছে প্রান্তিক জীবনের নানাবিধ প্রতিকূলতা, মানবীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা, অচরিতার্থ বেদনার রূপবৈচিত্র্য।

১২.৩

উপন্যাসের মূল কাহিনি নির্মিত হয়েছে মকবুল নামক একজন গোষ্ঠীপ্রধান ও তার পরিবারকে কেন্দ্র করে। মকবুলের নিজের পরিবারের পাশাপাশি নিকটতম স্বজনদের নিয়ে আছে তার নেতৃত্বাধীন আর এক বৃহৎ পরিবার। তিনি গোষ্ঠী ও পরিবারের প্রধান, তাই উপন্যাসের মূল-পর্ব আবর্তিত হয়েছে তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে। এই উপন্যাসের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এর পরিপ্রেক্ষিতের সকল নর-নারী নিম্নবর্গাধীন। মকবুলের সংসারে আছে তার তিন স্ত্রী আমেনা, ফাতেমা ও টুনি আর আছে একমাত্র কন্যা হীরন। গ্রামীণ যৌথ জীবন বৈশিষ্ট্যের আরো অনেকে থাকলেও, সবার গৃহ ও অন্ন সংস্থান আলাদা। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় :

> মকবুলের পাশের ঘরটা ফকিরের মার। তার পাশের টা আবুলের। তার পাশে রশিদ। পাশাপাশি তিনটে ঘর। সবার দক্ষিণে যে ঘরটা সবার চেয়ে ছোট, ওটায় থাকে মন্তু। একা মানুষ। বাবা মা ভাই বোন কেউ নেই। বাবাকে হারিয়েছে ওর জন্মের মাসখানেক আগে। মাকে দশবছর বয়সে। লোকে বলে, মন্তু নাকি বড় একগুঁয়ে আর বদমেজাজি। স্বভাবটা ঠিক জানোয়ারের মতো। টুনি বলে, অমন মাটির মানুষ নাকি এ জন্মে আর দেখেনি সে। আহা অমনটি আর হয় না। ওপাশে আর কোনো ঘর নেই। পশ্চিমের সারে, দক্ষিণের ঘরটা মনুর। তার পাশে থাকে সুরত আলী। তার পাশে গনু মোল্লা। (জহির, ২০১৭ : ১৪০)

লেখক আবহমান জীবনের স্বরূপ সন্ধান করেছেন শিকদার বাড়ির যৌথ নিস্তরঙ্গ জীবনের মন্থরগতির মধ্য দিয়ে। এই পরিবারের নারী-পুরুষ উভয় প্রান্তিকতার আবহে লালিত। সাম্যবাদী দর্শনে আকৃষ্ট ঔপন্যাসিক অবহেলিত মানুষের প্রতি ছিলেন আন্তরিক ও শ্রদ্ধাশীল। প্রান্তিক এই জীবনাচারের মধ্যে নারীর অবস্থান সর্বাপেক্ষা নিম্নতর। লৈঙ্গিক বিভাজন আর অর্থনৈতিক বৈষম্যে নারী শোষিত হয়ে আসছে দুর্বল ও নিম্নতর শ্রেণি হিসেবে। দুর্বলের ওপর প্রবলের অত্যাচার সমাজের প্রবহমান ঐতিহ্য ও নীতি। রাষ্ট্রের আয়তন আঙ্গিক ও গঠনকাঠামোয় অনেক পরিবর্তন ঘটলেও, বদলায়নি নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি। নারীর জীবনচক্রের পরিপূর্ণতায় তিনটি অবস্থা স্বীকৃত হয়ে আছে, কন্যা-জায়া-জননী-এই তিন নামেই তার পরিচিতি। সামগ্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এই ত্রি-স্তরের মধ্যে নারীত্বের সার্থকতা নিহিত। লক্ষণীয় বিষয় হলো, এই তিন স্তরের মধ্যেই নারী পুরুষের দ্বারা অধিকৃত থাকে। এই সমাজ হাজার বছর ধরে নারীর জন্য একইভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। *হাজার বছর ধরে* উপন্যাসের নারীরা তারই একেকটি প্রতিচ্ছবি। ঔপন্যাসিকের বয়ানে :

ধপাস ঢেঁকির শব্দে গমগম শিকদার বাড়ি। ঘুমে ঢুলুঢুলু বউ দুটোর গা বেয়ে দরদর ঘাম নামে। এতক্ষণে রীতিমতো ধপাস তা হাঁপিয়ে উঠেছে ওরা। ... মকবুল ভাবলো, বউ দুটোকে লাঙলে জুড়ে দিয়ে...দূর এটা ঠিক হবে না। লোকে গালাগাল দেবে ওকে। বলবে দ্যাহো বউ দুইডা দিয়া লাঙলও টানায়। তার চেয়ে এক কাজ করলে কি ভাল হয় না? না। বউদের দিয়েই লাঙল টানাবে সে। দিনে নয়, রাতে। বাইরের কোনো লোকে দেখবার কোনো ভয় থাকবে না তখন। বউরা আপত্তি করতে পারে। কিন্তু ওসব পরোয়া করে না মকবুল। (জহির, ২০১৭ : ১১৫)

শিকদার বাড়ির আট ঘরের প্রধান ব্যক্তি মকবুল। তিন স্ত্রীকে নিয়ে মকবুলের পারিবারিক অবয়ব। এখানে নারীরা গ্রামীণ সমাজের নিয়ম অনুযায়ী সামাজিক, মানসিক ও শারীরিকভাবে বিভিন্ন ধরনের নিগ্রহের শিকার হয়ে থাকে। মকবুলের তিন স্ত্রী গ্রহণের মানসিকতায় যতটা ভোগবাদী আকাঙ্ক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়; তারও অধিক আধিপত্যবাদী মানসিকতার পরিচয় প্রকাশিত। তারা একেকজন মকবুলের সংসারের একেকটা ভারবাহী পশুর তুল্য। ঢেঁকিতে ধান ভানা থেকে শুরু করে চাটাই বানানো, ক্ষেতের জমি তৈরি করা, লাঙল দেয়া সমস্ত কাজই এই তিন স্ত্রীকে দিয়ে করিয়ে নেয় সে। মকবুল মালিক হয়ে হুকুম করে, যথার্থরূপে শ্রম বিনিয়োগ হচ্ছে কি না, তা পরীক্ষা করার জন্য সেখানে উপস্থিত থেকে সম্পন্ন করিয়ে নেয়। এই অমানবিক নিষ্ঠুর নিপীড়নের কারণ হিসেবে তার যুক্তি : 'মুফতে বিয়ে করেনি সে। পুরো চার-চারটে টাকা মোহরানা দিয়ে একটা বিয়ে করেছে।' (জহির, ২০১৭ : ১৪২) যা সেদিনের বাজারমূল্যে একটি ভারবাহী পশুর তুলনায় সামান্য বেশি। মোহরানা দিয়ে বিয়ে করা বউ ঘরের সব কাজ করবে সেটাই সমাজের স্বাভাবিক নিয়ম; হোক সে পশুতুল্য। সমাজে নারীর প্রকৃত অবস্থানের চালচিত্র, নারীর পীড়ন এগুলো নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখিয়েছেন লেখক। এর মধ্য দিয়ে নারী কখনো সরবে, কখনো নীরবে, পুরুষশাসিত সমাজকে জিজ্ঞাসার সামনে দাঁড় করিয়েছে।

১২.৪

এই অস্বাভাবিক দমবন্ধ অবস্থার মধ্যে আমেনা আর ফাতেমা তাদের জীবনের বেশ কিছুটা সময় পার করলেও, টুনি পারেনি। বাহ্যিক পরিবেশের চাপে তার জীবন ক্ষত-বিক্ষত হলেও; অন্তর্লোকে আনন্দময় জগতের সন্ধান করে চলেছে সে। চঞ্চল তরুণী টুনিকে অসম দাম্পত্য আর অবিশ্রাম শ্রমদান ক্লান্ত করে তোলে। সেই ক্লান্তির অবসাদ ভুলে যায় মন্তর উষ্ণ সান্নিধ্য আর প্রকৃতির উদার রূপ-মুগ্ধতায়। কিশোরী টুনি তার জীবনের অপার্থিব সুখকে খুঁজে নেয়ার পথকে তৈরি করে নিয়েছে। সর্বদক্ষিণের ঘরে বসবাসকারী মন্তু মিয়া, টুনির কিশোরী মনের সুখ পাখি :

> মাচাঙের ওপর থেকে কাঁথা-বালিশটা নামিয়ে শোবার আয়োজন করছিলো মন্তু। টুনি দোরগোড়া থেকে বলে, বাহ, বারে! মন্তু মুখ তুলে তাকায় ওর দিকে। বলে, ক্যান কী অইছে? টুনি ফিসফিসিয়ে বলে, আজ যাইবা না? ...জলদি কইরা আইসো। বিছানাটা আবার গুটিয়ে রেখে বেড়ার সঙ্গে ঝোলানো জালটা মাটিতে নামিয়ে নেয় মন্তু। (জহির, ২০১৭ : ১৪২)

টুনির অন্তর্গত প্রাণকে আপ্লুত করেছে মন্তু। মন্তুর সহাচর্য, ছোট ছোট ইচ্ছাপূরণের প্রাচুর্যে ভরিয়ে তোলে তার অন্তর্সত্তাকে। মন্তুর বন্ধুত্বের নিবিড় সান্নিধ্য শিকদার বাড়ির আনন্দবিহীন অমানবিক জীবনের যন্ত্রণাকে ভুলিয়ে টুনির বাঁচার পথকে আলোকিত করেছে। কিশোরী বয়সের দুরন্তপনার মধ্যে সে ভুলে গিয়েছিল যে সে কারো বিবাহিত স্ত্রী। ‘টুনি বাংলাদেশের গ্রামীণ এক সরল মেয়ে, ভালোবাসার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ সে জানে না।’ (আহমদ, ১৯৯৭ : ৪০) সে বোঝে না মন্তু তার আপনার নয়; মন্তুর সঙ্গের সময় কাটানোর জন্য তাকে সামাজিকভাবে হেয় করা হতে পারে। টুনির সঙ্গে মন্তুর আন্তসম্পর্ক নির্মাণের একটা মাধ্যম টুনির বাবার বাড়ি যাওয়া-আসার দীর্ঘ নৌপথ। যেটা পারিবারিকভাবেও সমর্থিত ছিল। টুনির মধ্যে জহির রায়হান গ্রামীণ নারীর চিরন্তন প্রতিকৃতিকে এঁকেছেন, যে নারী প্রেমে-স্বপ্নে-মোহে কাতর; সেও সমাজ শাস্ত্রাচারকে উপেক্ষা করতে পারে না। টুনির আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থান এতটাই প্রকৃতি আশ্রিত যে মন্তুর সঙ্গে তার মনোগত যোগাযোগ নিবিড় হলেও জৈবিক কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। সাধারণ নারীর জীবন-বীক্ষণে যে সংকীর্ণ সীমাবদ্ধতা দেখা যায়, সেখানে টুনি এক অসাধারণ নির্মাণ। মধ্যযুগীয় বহুবিবাহের প্রবল প্রতাপে দগ্ধ হয়েছে টুনির জীবন। তবে সে এতটাও ভীরু নয় যে নিজের ভালোবাসাকে রুদ্ধ দ্বারে আটকে রেখেছিল। বাবার বাড়ি চলে যাওয়ার আগে তার ভালোবাসার স্মৃতিচিহ্ন রেখে গিয়েছিল মন্তুর ঘরে। ঔপন্যাসিকের বয়ানে তা নিম্নরূপ :

> পিদিম জ্বালিয়ে ঘরে ঢুকে অবাক হলো মন্তু। মাচাঙের ওপর একরাশ শাপলার ফুল ঝুলছে। বকের মতো সাদা ধবধবে পাতার মাঝখানে হলুদ রঙের কুঁড়ি। ডাঁটাসহ ফুলগুলো মাচাঙ থেকে মাচাঙ থেকে নামিয়ে নিলো মন্তু। আজ সন্ধ্যায় বাপের বাড়ি চলে গেছে টুনি। যাবার আগে এগুলো রেখে গেছে ওর ঘরে। একটুকরো ম্লান হাসি জেগে উঠলো মন্তুর ঠোঁটের কোণে। ফুলগুলো আবার মাচাঙের উপর তুলে রেখে বিছানাটা নামিয়ে নিলো মন্তু। (জহির, ২০১৭ : ১৫৭)

প্রেমের ব্যাখ্যা নিয়ে আলোচনা, ব্যাখ্যার শেষ নেই। বায়রন বলেছেন, প্রেম পুরুষের জীবনের একটা অংশ, আর নারীর সমগ্র অস্তিত্ব। নিটশের মতে, পুরুষ ও নারীর কাছে একই শব্দ প্রেম, কিন্তু অর্থ বোঝায় দুটি জিনিস। নারী প্রেম বলতে যা বোঝে তা খুব স্পষ্ট তা শুধু ভক্তি নয়, তা প্রত্যাশাহীন নিঃশর্ত সমর্পণ। সংস্কারের বেড়ি টুনিকে আটকাতে না পারলেও নিজেকে সামলিয়ে চলেছে মন্তু।

মন্তুর নীরবতা টুনিকে কষ্ট দিয়েছে, কাতর করেছে, ক্রোধান্বিত করেছে। সমাজ ও অর্থনৈতিক বাস্তবতায় নিম্নবিত্তের স্বপ্ন অধরায় থেকে যায়। দারিদ্র্য আর সামাজিক অজ্ঞতা একজন নারীর জীবনকে কীভাবে নিরাপত্তাহীনতার পরাকাষ্ঠে বন্দি করতে পারে, তার জীবন্ত দৃষ্টান্ত টুনি আর টুনির জীবনবাস্তবতা। সদ্য কিশোরী এই তরুণীকে পিতার বয়সী এক বৃদ্ধের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে চির-অন্ধকারের অধঃপতিত করা হয়েছে। তার জীবনের জীবনানন্দকে ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছে স্বামী-সংসার নামের নির্মমতার বন্দিশালায়। শুধু নারী বলেই তার জীবনের এই পরিণতি। সমাজ, ধর্ম, সমস্তই মন্তুকে পাওয়ার সব অধিকার হরণ করে টুনিকে বন্দি করেছে মকবুলের খাঁচায়। এই খাঁচা ভাঙার পথ টুনির জানা নেই। নিম্নবর্গের গ্রামীণ নারীর জীবনপিপাসা মেটানোর পথ সমাজ চিরদিনের জন্য অবরুদ্ধ করে দিয়েছে। যে সমাজ নারীর শ্রম, শরীর ও মনকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেখানে নারীর কোথাও কোনো অধিকারের বৈধতা নেই।

১২.৫

'জীবনের হাটে সকল বেচাকেনা শেষ করে দিয়ে একদিন অকস্মাৎ কোথায় যেন হারিয়ে গেছে ওরা...। প্রথম -প্রথম খোঁজখবর নিতো। আজকাল সে সময় হয়ে ওঠে না মন্তুর।' (জহির, ২০১৭ : ১৯৫) টুনির এই অনীহার মধ্যে দেরিতে হলেও তার ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটেছে। যে মন্তুকে পাওয়ার জন্য তার এত যুদ্ধ, সেই যুদ্ধে সে একা একমাত্র সৈনিক। মন্তু নির্মোহের মতো নিজের অবস্থান অনড় থেকেছে, যেন তার কিছুই করার ছিল না, বলার ছিল না। যখন তার চরম দুর্দিন, তখনও নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে মন্তু। মন্তুর এই নির্লিপ্ততা, নিরাসক্তি টুনিকে শিখিয়েছে জীবন আর জীবনের বাস্তবতা। টুনি-মন্তুর সম্পর্কের বাইরের আবরণ সরিয়ে নিলে, সম্পর্ক স্থাপনে পুরুষের মনস্তত্ত্বের একটি বিশেষ সাক্ষ্য বহন করে; যা আসলে একটি বৃহত্তর সামাজিক প্রকল্পের অংশ। নারীর জীবন অবলম্বন শূন্য হয়ে যাওয়া, ভালোবেসে প্রতিদান না পাওয়া, সমস্তই নিম্নবর্গীয় জীবনের অভিন্ন সব দিকসমূহ। এই সমগ্র বিষয়টি তখনকার এবং এখনকার নারীর সামাজিক প্রেক্ষিতে অত্যন্ত বাস্তব একটি অভিজ্ঞতা। তখনই আম্বিয়ার বাড়িতে মন্তুর সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, আম্বিয়ার সঙ্গে সময় কাটাতে তার বেশি আগ্রহ।

> একদিন বিকেলে মন্তু যখন বা বেরুবে তার সামনে এসে দাঁড়ালো টুনি। বললো জ্বরডা ওর ভীষণ বাইরা গেছে। কবিরাজের কাছ থাইকে একটু ওষুধ আইনা দিবা? ওর মুখের দিকে নীরবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো মন্তু। ভীষণ শুকিয়ে গেছে টুনি....ওর ঠোঁটের কোণে একটুকরো ম্লান হাসি। মন্তু বললো, মাঝি-বাড়ি না গেলে। তুমি খুশি অও? টুনি পরক্ষণে শুধালো, আমার খুশি দিয়া তুমি কইরবা কী? (জহির, ২০১৭ : ১৯০)

টুনির সঙ্গে ঘর বাঁধার সব রাস্তা যেদিন খোলা, সেদিন মন্তুকে উপেক্ষা করার কোনো কারণ আর থাকতে পারে না। টুনি গ্রামের নিম্নবর্গের এক নারী হলেও এইটুকু বোঝে, তার প্রতি মন্তুর আবেগের আবাহন কতটুকু। টুনিকে পাওয়ার মধ্যে মানসিক সুখ থাকলেও, অন্যের স্ত্রীকে বিয়ে করার অপবাদ ছিল। তাই টুনির প্রতি তার অবজ্ঞা, অবহেলা, আর অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করা। এর মধ্য দিয়ে টুনির মতো নিম্নবর্গীয় নারীর স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের, আশা ও আশ্বাসের, সাহস ও ব্যক্তিত্বের আখ্যান নির্মিত হয়েছে। টুনির মতো নিম্নবর্গীয় নারীর স্বপ্নভঙ্গের গল্প এই বঙ্গভূমির নারীর চিরকালীন নিয়তি। এই প্রসঙ্গে সমালোচক মনসুর মুসার মন্তব্যঃ

> ‘হাজার বছর ধরে’র সবচেয়ে বড় সার্থকতা হচ্ছে হাজার বছর ধরে বাংলাদেশের যে জীবনরূপ সাহিত্যে অনাদৃত রয়ে গেছে, তার রূপায়ণে। লেখক গভীর মমতায় এ জীবনকে উপলব্ধি করেছেন এবং অবিকৃত রূপায়ণের চেষ্টা করেছেন? (মনসুর, ২০১৭ : ৮৬)

নারীকেই ভুলতে হয়, ছাড়তে হয় আশা আর আনন্দের জগৎ। আশা-আকাঙ্ক্ষা, চাওয়া-পাওয়ার উত্তাপকে দূরে সরিয়ে একা হতে হয় নারীকেই। নারীর এই অপূর্ণতার মানবিক আবেদন নিয়ে টুনিকে চলতে হয়, এটাই টুনিকে বাংলা সাহিত্যে জীবন্ত করে রেখেছে। এ প্রসঙ্গে গবেষকের মত নিম্নরূপঃ

> বাংলাদেশের উপন্যাসে টুনি এক সরল নারী চরিত্র-যে কাঁদে, দ্বিধা দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয় কিন্তু সমাজের অনির্ধারিত শৃঙ্খলের কারণে নিজের ভালবাসার কথা মনখুলে জানাতে পারে না। আত্ম-অভিমানে অন্তরের দাবীকে উপেক্ষা করে মন্তুকে ফিরিয়ে দেয়, তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। (আহমদ, ১৯৯৭ :৪০)

হাজার বছর ধরে যেন হাজার বছরের নারীর অবহেলিত আর বঞ্চনাময় জীবনের উপাখ্যান। উপন্যাসের শুরু হয়েছে শিকদার বাড়ির পূর্বসূরি এক সন্তানহীন নারীর বঞ্চনাময় মৃত্যুর কাহিনি দিয়ে। সমাজ নারীকে যে কাঠামোয় নির্মাণ করতে চেয়েছে তার সফল ইতিহাস রচিত হয়েছে শিকদার পত্নীর এই আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে। তারপর বহুদিন, বহুবছর অতিক্রান্ত হলেও পরিবার, সমাজে নারীর অবস্থানের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। বহুদিনের পরের ইতিহাসের নির্মাণকারী মকবুল, বহুবিবাহকারী লোভী পুরুষ সে।

১২.৬

হাজার বছর ধরে উপন্যাসে যে সব নারী চরিত্র নির্মিত হয়েছে তারা, সবাই গ্রামীণ নিম্নবর্গের শোষিত বঞ্চিত মানুষ। তাদের জীবনের কোনো ভবিতব্য নেই, তারা চিরকালীন সংস্কার আর নিয়তির কাছে নিজেদের জীবন, বর্তমান-ভবিষ্যৎকে, সমর্পণ করে বসে আছে। যে সাংস্কৃতিক প্রতিবেশ তাদের নারীরূপে মানুষ হয়ে বাঁচার পরিবর্তে, পশুর মতো নির্যাতিত আর অবহেলা করে, তার প্রতিবাদের

ভাষা চির-অব্যক্ত। উপন্যাসে টুনি ছাড়াও মকবুলের রয়েছে আরো দুজন স্ত্রী, যথাক্রমে আমেনা ও ফাতেমা। তিন স্ত্রী যথাযথভাবে তার আদেশ পালন করছে কি না, তার তদারকি করাই স্বামী হিসেবে মকবুলের দায়িত্ব। নারীর শ্রম আছে, সেই শ্রমের কোনো প্রাপ্তি নেই। আবার শ্রমের বিনিময়ে অর্থ উপার্জিত হলেও সে অর্থে নারীর কোনো অধিকার থাকে না। নিম্নবর্গীয় পরিবারগুলোতে নারীর কায়িক শ্রমের সঙ্গে যুক্ত থাকা প্রায় বাধ্যতামূলক। শুধু আধুনিক সাহিত্যেই নয়, প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যেও তার বিভিন্ন উদাহরণ পাওয়া যায়। যেহেতু উপার্জিত অর্থে তাদের কোনো অধিকার থাকতো না, তাই তারা হয়ে পড়ত উপার্জনের মাধ্যমমাত্র। অর্থনৈতিকভাবে নিম্নবর্গীয় হওয়ার কারণে দারিদ্র্য তাদের মূলগত সংকট, পাশাপাশি পুরুষতান্ত্রিক নির্যাতন আর বঞ্চনা তাদের নিয়তি। মকবুলের সংসারে এত শ্রম দেয়ার পরও স্বামীর চতুর্থ বিয়ে করার প্রস্তাবে বিরোধিতা ও প্রতিবাদ করায় মুহূর্তে তাদের তালাক দিতে মকবুলকে দ্বিতীয়বার ভাবতে হয় না। এই সম্পর্কের ভিত্তি এতটাই ঠুনকো যে বেরিয়ে যেতে বললে আর কোনো উপায় থাকে না অসহায় নারীর :

> নিমকহারাম বলে, হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো বুড়ো মকবুল। তারপর অকস্মাৎ এক অবাক কাণ্ড ঘটিয়ে বসলো সে। ঘরের মাঝখানে, এতগুলো লোকের সামনে হঠাৎ আমেনা আর ফাতেমা দুজনেকে একসঙ্গে তালাক দিয়ে দিলো সে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললো, তোরা বাইরইয়া যা আমার বাড়ি থাইকা। (জহির, ২০১৭ : ১৮৮)

বিবাহসংক্রান্ত ব্যাপারে নারীদের কোনো স্বাধীনতা থাকে না, যত স্বাধীনতা সব পুরুষ ভোগ করে থাকে। একজন পুরুষ বিয়ে করার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে যেমন অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে, তেমনি বিবাহবিচ্ছেদের ব্যাপারেও আছে অপার স্বাধীনতা। একজন স্বামী যেকোনো মুহূর্তে এবং যেকোনো তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে।(আবদুল, ২০১২: ১৫) এই জীবন হাজার বছরের বাংলার নারীর জীবন। লেখক হাজার বছরের গ্রামীণ প্রান্তিক জনসাধারণের যে ছবি এঁকেছেন সেখানে, প্রান্তিক নারীর প্রতিভাসই নির্মিত হয়েছে।

১২.৭

জীবনের জটিল আবর্তে ডুবে যাওয়ার আগের মুহূর্তে বারবার নতুন করে বাঁচার মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়েছে এমন লড়াকু নারীও এই উপন্যাসে রয়েছে। শিকদার বাড়ির আবুলের স্ত্রী হালিমা। কথায় কথায় বউ পেটানো আবুলের অভ্যাস। পূর্বে যে দুজন নারী নির্যাতনে মারা গেল তার কোনো বিচার বা আইনি ব্যবস্থা হয়নি। আর তাই তৃতীয় স্ত্রী হালিমাকেও সে একইভাবে নির্যাতনের সাহস পায় আবুল :

> হঠাৎ দাওয়া থেকে ছুটে এসে মুহূর্তে হালিমার চুলের গোছা চেপে ধরলো আবুল। তারপর কোনো চিন্তা না করে সজোরে একটা লাথি বসিয়ে দিলো ওর তলপেটে। ....ভেতরে নিয়ে গিয়ে ঝাঁপি বন্ধ করে মনের সুখে মারবে। ওর ইচ্ছেটা হয়তো বুঝতে পেরেছিলো হালিমা। তাই মাটি মাটি আঁকড়ে ধরে গোঙাতে লাগলো সে। ওগো তোমার পায়ে পড়ি। আর মাইরো না, মইরা যামু। (জহির, ২০১৭ : ১৪৪)

পুরুষশাসিত সমাজের ইতিহাসে পুরুষ যেন অঘোষিত অধিকার পেয়েছে স্ত্রীকে শারীরিক নির্যাতনের। এ প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা আবশ্যিক, বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে একটি প্রবাদ প্রচলিত; 'ভাগ্যবানের বউ মরে আর অভাগার মরে গরু'-এর অন্তর্নিহিত অর্থ এটাই দাঁড়ায় যে নারী বা স্ত্রী গরুর চেয়ে কম মূল্যবান। অভাগা স্ত্রী মরলে পুরুষের কিছুই যায় আসে-না, কিন্তু গরু মরলে পুরুষ সর্বস্বান্ত হয়। এভাবেই সমাজে নারী-পুরুষের সম্পর্কের মূল্যায়ন করে (সেলিনা, ২০০৮ : ২৭৬)। শিকদার বাড়ির এই সংকীর্ণ পরিবেশে এভাবেই নারীর জীবন বিলীন হয়। লজ্জায়, অপমানে হালিমা কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। এরপর একদিন আচমকাই তার জীবনী শক্তি নিঃশেষ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে।

১২.৮

হাজার বছর ধরে উপন্যাসে নারীর শোষিত, নির্যাতিত-নিপীড়িত পরিবেশের মধ্যে আম্বিয়া এক পরিপূর্ণ মানবী। নন্তু শেখের মেয়ে আর করিম মাঝির বোন আম্বিয়া। শিকদার বাড়ির পাশের বাড়ির মেয়ে আম্বিয়া যে অত্যন্ত পরিশ্রমী, সুন্দরী ও হাসি-খুশি এক নারী। আম্বিয়ার দৈহিক সৌন্দর্য, শ্রমশীলতা সবই পুরুষের আগ্রহ ও আকর্ষণের বিষয়। আম্বিয়া অনেকাংশেই রক্তমাংসের গড়া নারী। পুরুষতন্ত্র নারীর ওপর অযাচিত যে আধিপত্য বিস্তার করে, নিরাপত্তা প্রদানের নামে শোষণ করে, নারীর স্বাভাবিক বিকাশের পথ রুদ্ধ করে; এই সমস্ত পরিসরের মধ্যে আম্বিয়া এক স্বাধীন নারী। বাবার সংসারে উদাসীনতা, ভাইয়ের অসুস্থতা তার শ্রমজীবী মানসিকতা ঐ সমাজের অন্যদের থেকে তাকে স্বাধীন করেছে। হাজার বছরের এই মন্থর জীবনে আম্বিয়া একজন স্বাধীন ও স্বনির্ভর নারী। সে রাত জেগে ধান ভানে আর দিনে অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমায়। সতের-আঠার বছরের এই নারীর পরিপুষ্ট শরীর অফুরন্ত পরিশ্রম করতে উৎসাহিত করে। পিতা ও ভাই কেউই তার এই স্বাধীন জীবিকার পথে বাধা হয় না। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় :

> সারারাত মিয়া-বাড়িতে ভেনেছে সে। এই শীতের রাতেও ধান ভানতে গিয়ে সারা দেহে ঘাম নেমেছে ওর। পুরো গায়ের কাপড়ে ঘামের বিশ্রী গন্ধ। তাই সকাল-সকাল গোছল করে নিয়েছে আম্বিয়া। খেয়েদেয়ে একটু পরে ঘুম দেবে। উঠবে সেই অপরাহ্নে। তারপর আবার মিয়া-বাড়ি চলে যাবে ধান ভানবে সারারাত। (জহির, ২০১৭ : ১৫৮)

তার এই স্বাধীন কর্মজীবন তার জীবনের সিদ্ধান্ত নেয়ার শক্তি দিয়েছে। সেদিনের সমাজে ও নিম্নবর্গীয় এক নারীর জন্য দুর্লভ দৃষ্টান্ত। বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে সেও জীবনসঙ্গী হিসেবে মন্তুকে পছন্দ করেছে। কলেরায় পিতা ও ভাইয়ের মৃত্যুর পর সে মানসিকভাবে একা হয়ে পড়লে মন্তু তাকে সহযোগিতা করেছে। উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে পাত্রী হিসেবে সে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ভাইয়ের অবর্তমানে বসতভিটা, সামান্য ক্ষেতের জমি ও নৌকা সমস্ত কিছুর মালিক হয়েছে সে। নিঃস্ব ও বৈষয়িক মন্তুর কাছে আম্বিয়ার গ্রহণযোগ্যতায় বড় হওয়ার কারণ এই সমস্ত অনুষঙ্গ। তারপরও গ্রামীণ সংস্কারের নিকট তার একটি সমস্যা বড় হয়ে দেখা দেয়, তার হাঁপানির রোগ।

> ও মেয়ে গতর খাটাতে পারে সত্যি। কিন্তু ঘরের বউ করে আনার মতো মেয়ে নয়। মকবুল বললো, ওগো বংশে হাঁপনি রোগ আছে। শেষে হাঁপানি হইয়া মন্তুও মরবো । (জহির, ২০১৭ : ১৫৭)

নারীর সম্পর্কে সমাজের সংকট ও সংকীর্ণতার সীমা নেই। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে গ্রামীণ সমাজের অজ্ঞতার নিকট হাঁপানি একটি ছোঁয়াচে রোগ। ঐ রোগীর সংস্পর্শে কেউ থাকলে তারও রোগ হবে। আম্বিয়া চরিত্রের সার্থকতা এখানে যে শেষ পর্যন্ত সে তার নিজের সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করতে পেরেছে। স্বল্প পরিসরের প্রেক্ষাপটে লেখক এই নারীকে যতটুকু তুলে ধরেছেন, তার মধ্যে একটি বিষয় স্পষ্ট, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নারীকে স্বাধীন জীবন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছে। গ্রামীণ সমাজের নিম্নবর্গীয় জীবনে যা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

১৩.

আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩৪-২০০৯) বাংলাদেশের একজন বহুমাত্রিক লেখক। কবি, নাট্যকার ও সমালোচক হিসেবে পরিচিতি থাকলেও কথাসাহিত্যিক হিসেবে তিনি সমধিক পরিচিত। বিভাগোত্তর কালে তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার বিকাশ ঘটে। তাঁর সর্বাধিক জনপ্রিয় ও আলোচিত উপন্যাস *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র* (১৯৬০)। এটি ছাড়াও তাঁর আরো অনেক উপন্যাসই শিল্পমর্যাদায় উদ্ভাসিত, তার মধ্যে *ক্ষুধা ও আশা* অন্যতম। ‘যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-মহামারী-যুগ সংক্ষোভ-স্বাধীনতা সংগ্রাম–এই বিস্তৃত ক্যানভাসে রচিত *ক্ষুধা ও আশা* উপন্যাসে আলাউদ্দিন আল আজাদের শিল্পচেতনায় প্রাগ্রসরমাণ।’ (বিশ্বজিৎ, ২০০৯ : ১১৫) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ঔপনিবেশিক শোষণের করালগ্রাসে বাংলার শ্যামল পটভূমি দুর্ভিক্ষের অনলে যখন দগ্ধ; তখন এই বৈশ্বিক ও জাতীয় ষড়যন্ত্র বাংলা সাহিত্যে জন্ম দিয়েছে অসংখ্য কালজয়ী সাহিত্য-সম্ভারের। উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাটের শতকের বাংলা সাহিত্যের অবিশ্রাম পথচলা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, গণবিক্ষোভ এই সমস্ত জাতীয়, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ভারসাম্যহীনতার মধ্য দিয়ে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মত :

> নানা পরস্পর বিরোধী কাটাকুটি খেলায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর জনমানস ছিল যেমন খণ্ডিত, জনমানস ছিল যেমন খণ্ডিত, শিল্পীমানসের বৃহৎ অংশেও ছিল তারই অনুরূপ এক পন্থা-বিহ্বলতা। চতুর্থ দশকের সমস্ত জিজ্ঞাসার স্রোত যেন যুদ্ধোত্তর বালুকাময় খাতের ওপরে বিশুষ্কতায় মুখ গুঁজে-গুঁজে, কখনও নিজেকে হারিয়ে ফেলে কখনও কোন ঘোলা জলের ঋণ থেকে ঈষৎ গতি সঞ্চয় করে এগিয়ে চলছিল। (সরোজ, ২০০০ : ৩০২)

ঔপন্যাসিক আলাউদ্দিন আল আজাদ বৈশ্বিক বিক্ষুব্ধতার এই পরিসরে পূর্ব বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামের নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনকে নির্মাণ করতে চেয়েছেন বিস্তৃত প্রেক্ষাপটের পটভূমিতে। অন্নাভাবের ক্ষুধার্ত মানুষের দলবেঁধে গ্রাম ত্যাগ করে শহরে যাওয়া; শহরের নাগরিক জীবনের নির্মমতায় তাদের পিষ্ট হওয়া প্রভৃতি জীবনাভিজ্ঞতার সত্যনিষ্ঠ রূপায়ণ ঘটেছে এই উপন্যাসে। জীবনের বাস্তবতায় ছিন্নমূল মানুষের জীবনে নেমে এসেছিল মূল্যবোধের বিনষ্টির দুর্দিন। জীবন যত প্রতিকূলতার কাছে সমর্পিত হোক, যতই দুর্বিষহ হোক না কেন, তবু মৃত্যু তার বিকল্প হতে পারে না। এই বোধ তখনও বাংলাদেশের জনমানসে ছিল সক্রিয়।

১৩.১

ক্ষুধা ও আশা (১৯৬৪) তেরশো পঞ্চাশ ও তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষে বিলীন হওয়া মানুষের কথা। উপন্যাসের পটভূমিতে পাশাপাশি দুটি শ্রেণির মানুষের কথা বলেছেন লেখক। একদিকে দুর্ভিক্ষপীড়িত নিম্নবর্গীয় মানুষের দুঃখ, দুর্দশায় একটি পরিবারের কাঠামো ভেঙে পড়ার চিত্র, অন্যদিকে সামন্তবাদী চিন্তাচেতনার একটি পরিবারের বিকলাঙ্গ জীবনকে করেছে উদ্ভাসিত। সবকিছু ছাপিয়ে নিম্নবর্গীয় জীবনের নির্মম অভিজ্ঞতায় কাহিনিকে নিয়ে চলেছে পরিণতির দিকে। আপৎকালীন সময়ের কদর্যতা শুধু কি মানুষের মৃত্যু ঘটায়? মৃত্যু ঘটায় মানবতার, স্নেহের, প্রেমের, সর্বোপরি সার্বিক মানুষের আর মানব আত্মার। মানুষের মিছিলে মানবিকতা হারিয়ে যায়, থাকে শুধু নিরন্তর অস্তিত্বের সংগ্রাম। সেই কারণেই বোধ হয় সদ্যপ্রয়াত সন্তানকে মাটির তলায় চাপা দিয়ে জীবিতদের প্রাণের আশায় ঘর ছেড়েছে হানিফ-ফাতেমা দম্পতি। দুর্ভিক্ষের দুর্বিষহতায় সম্পন্ন চাষি হানিফ পরিণত হয়েছে কামলায়। তারপরও জীবনের অনিশ্চয়তা থেকে বাঁচতে পারেনি তারা। বিবর্ণ সময়ের বিক্ষুব্ধতায় মানুষ বেঁচে থাকার অবলম্বন খুঁজেছে। রতনপুর গ্রামের মানুষ হানিফ আর ফাতেমা তাদের সন্তান জোহা ও জোহরাকে নিয়ে বাঁচার আশায়, একমুঠো অন্নের আশায় গ্রাম ছেড়ে এসেছে শহরে।

১৩.২

যুদ্ধ মানবসভ্যতার এক বিকলাঙ্গ সন্তান। যুদ্ধের বীভৎসতা ধ্বংস করে মানুষের নির্মিত সভ্যতা, আর নিরস্ত্র খেটে খাওয়া মানুষের জীবন ও জীবনী শক্তিকে। যুদ্ধের ফলস্বরূপ আসে মন্বন্তর, ভয়ংকর শূন্যতা-এই পরিস্থিতিতে মানুষ বাঁচতে চায় যেকোনো মূল্যে। মানুষের অবিনাশী এই বাঁচার আকাঙ্ক্ষা তাদের ভেতরের মনুষ্যত্বকে মেরে ফেলে। সভ্যতার ইতিহাসে মানুষ যতবার সংকটে-সমরে অবতীর্ণ হয়েছে, মূল্য দিতে হয়েছে ততবারই তাকে। তবে সবচেয়ে বেশি মূল্য দিতে হয়েছে নারীকে। আপৎকালে শ্রম দিয়ে, শরীর দিয়ে, পরিবারকে, আপনজনকে, বুক দিয়ে, পিঠ আগলাতে হয়েছে নারীকে।

১৩.৩

উপন্যাসের পরিসরে নিম্নবর্গের জীবন আখ্যানে দুই নারীর সংগ্রাম ও পরাজয়ের কাহিনিকে প্রশস্ততা দিয়েছে। এখানে ফাতেমা এক সংগ্রামী জায়া ও মাতা। গ্রামীণ নিম্নবিত্তের আর দশটা নারীর মতোই ফিকে একরঙা তার জীবন। দুর্ভিক্ষের দাবানল তার জীবনের সেই রঙটুকু কেড়ে নিয়ে মলিন বিবর্ণতায় ভরে দিয়ে যায়। স্ত্রী হয়ে স্বামীর সঙ্গে সমান শ্রমে ও মর্মে সংসারের দায়িত্ব-কর্তব্য বহন করেছে সে। শেষ রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়ে শেষে শহরে আশ্রয় নিয়েছে। সেখানেও সেই প্রথম কাজের ব্যবস্থা করে পরিবারের সবার মুখের অন্ন আর আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছে। বিত্তবানের বাড়ির দাসীবৃত্তির কাজ স্বাধীন গৃহিণী ফাতেমার জন্য সম্মান বা সুখের নয়। দারিদ্র্যের প্রবল প্রদাহে আত্মগত প্রাণকে বাঁচাতে এর বিকল্প কোনো পথ তার সামনে ছিল না। সময় ও পরিপ্রেক্ষিতের বাস্তবতায় নিম্নবিত্তের এই নারী পরিচারিকার কাজ করতে বাধ্য হয়েছে। ঔপন্যাসিকের বয়ানে :

> ফাতেমা মাংসের পাতিলটা উনুন থেকে নামিয়ে কাপড়ের কোণে চোখ মোছে; সে ঘাম না কান্না বোঝা যায় না।...রান্নার পর টেবিলে সব হাজির করা, এক হাতে সব। পয়সাওয়ালা লোক, এমন কিপটে অন্তত দুএকটি ছেলেছোকরাও রাখতে পারে? ...খাবার বেড়ে দিয়ে বারান্দায় বসে থাকাটাও কম দিগদারী নয়। কখন কি দরকার পড়ে। আবার খাওয়া শেষ হলে এঁটো বাসনপত্র কলতলায় নিয়ে জড়ো করে রাখা। তিনটের আগে রেহাই নেই। (আলাউদ্দিন, ২০১৩ : ৫৫)

পরিচারিকা হলেও তার এই বর্ণহীন একঘেয়ে কর্মতৎপরতা এবং যান্ত্রিক আচরণের পশ্চাতে লুকিয়ে থাকে মানবিকতা, বাস্তবতাবোধ আর আত্মমর্যাদার জ্ঞান। পারিপার্শ্বিকের চাপে অবদমিত বঞ্চিত

ফাতেমা গৃহদাসী। তার অন্তর্দাহে বহমান থাকে মানবাত্মার ক্রন্দন। সময়ের অক্ষমতায় তার এই পরিণতিকে এভাবেই আত্মপ্রবোধ দিয়েছে ফাতেমা :

> জিভ দিয়ে বিষ ঝরুক, তাতে কান না দেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। ভাত -তরকারি ভরা বাসনটা কাপড়ের তলায় নিয়ে গেট পেরিয়ে এলে যেন মুক্তি; তখন, সারাদিন সকল গ্লানিকে ছাপিয়ে একটা ব্যাকুলতা, স্বামী-পুত্র কন্যার সঙ্গে মিলবার জন্য। একটা অনুভূতিটা অতি পুরাতন, তবু চির নতুন; সময় আর অবস্থার হেরফের মাত্র। (আলাউদ্দিন,২০১৩ : ৫৫)

দুর্ভিক্ষের দিনে জীবিকার সংস্থান করে জয়ী হয়েছে সে। কঠোর পরিশ্রম আর সংগ্রাম শেষে যখন শেষ সম্মানটুকুও আর রক্ষা করতে পারে না। তখন তার ধৈর্যের বাঁধে ফাটল ধরে, প্রচণ্ড আক্রোশে ফেটে পড়ে মেয়ের প্রতি। স্বামীর নিরুদ্দেশ আর মেয়ের নির্বুদ্ধিতা তাকে অমানবিকতার চূড়ান্তে নিয়ে যায়। সংসারের ঘানি টেনে ক্লান্ত মায়ের সমস্ত ক্ষোভ এসে পড়ে কিশোরী জোহরার ওপর। স্বামী, পুত্র ও পরিস্থিতির অপ্রতিরুদ্ধতায় পলে পলে ফাতেমাকে যে যন্ত্রণা দিয়েছে, তার মাশুল দিতে হয়েছে জহুরকে। ঔপন্যাসিকের বয়ানে :

> কিল চাপড় লাথি সমানে পড়তে থাকে ; জোহা উঠে এসে মাকে ধরেছিল, কিন্তু ওকে ফেলে দিয়েছে এক ঝটকায়। ভূতে পাওয়ার দশা! ভূতে পাওয়ার দশা! ভূতে পেলে একজনের গায়ে দশজনের শক্তি আসে। এখানে দশজন নয়, কুড়ি জনের জোর। বাপকে ঠেকায়নি একি ওর আপরাধ? যদি দোষ হয়েও থাকে, তার শাস্তিটা একটু কড়া হচ্ছে বৈকি। কিন্তু না, অপরাধ বা দোষের জন নয়, সহজলভ্য ও করায়ত্ত শিকারে ওপর একটা কিছু অছিলায় মনের ঝাল মেটানো। ঝাল নয় যেন আক্রোশ। অথবা কেবল প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছাটাকেই এমন আযৌক্তিত ও প্রবলভাবে কার্যে পরিণত করা যায়। (আলাউদ্দিন,২০১৩ : ৫৬)

রুদ্রমূর্তির ফাতেমা তার সমস্ত ক্ষোভের বিষ ঢেলে দিয়েছে জোহরার ওপর। পুত্রসন্তানের প্রতি একজন মা যত আপ্লুত হয়, ঠিক ততোটা খুশি কন্যাসন্তানকে ঘিরে তৈরি হয় না। আবার এও হতে পারে, মা তার নারীজীবনের ব্যর্থতা আর গ্লানির ব্যথা থেকেও হয়তো নিজের কন্যাসন্তান প্রাপ্তিতে আহ্লাদিত হতে পারে না। ফাতেমা মা হয়েও দুই সন্তানের মধ্যে সাম্যতার বিধান স্থাপন করতে পারেনি। এর জন্য ফাতেমা দায়ী নয়, দায়ী ফাতেমার সমাজ; যে সমাজ তাকে সব সময় এই শিক্ষা দিয়েছে। অভাব-দারিদ্র্য-দুর্যোগের ভয়াল দিনে নিজের অবদমিত ক্রোধের যে প্রকাশ ঘটিয়েছে ফাতেমা নিরাপরাধ জোহরার ওপর। তার দাম তাকে দিতে হয়েছে জীবনভরে। ফাতেমার দুর্ব্যবহার তার কন্যা জোহরার জীবনে করুণ পরিণতি বয়ে এনেছে। মেয়েকে হারানোর পর অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছে সে। ফাতেমার জীবন থেকে গিয়েছিল উপন্যাসের অমীমাংসিত সত্যে। যেন ভবিষ্যতের পৃথিবী আবার সব সংকটে পরিবারের ত্রাণকর্তা রূপে নারীকে এভাবেই কর্তব্যনিষ্ঠতায় পাবে। যেন আদি-অনন্ত কাল ধরে

এটাই নারীর একমাত্র কর্মযজ্ঞ। এই উপন্যাসের সামগ্রিক সফলতা নিয়ে সমালোচক, গবেষক মনসুর মুসার মত :

> যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিকায় রচিত এই উপন্যাসে একটি বিপর্যয়-যুগের হৃদয়বিদারী চিত্র বিধৃত হয়েছে। বিপর্যয়-যুগের জীবন-প্রবাহ বিচ্ছিন্ন এবং অসংলগ্ন; ঘটনা-প্রবাহে যৌক্তিক শৃঙ্খলার অনস্তিত্ব। এই উপন্যাসের সামগ্রিক ব্যাপ্তিতে কোনো একক কাহিনী জমাট বুনোনিতে উজ্জ্বল হয়ে প্রাধান্য লাভ করে নি; ব্যক্তিমনের বিচিত্র গতি পরিবর্তন, কালের চক্রতল মানবাত্মার আর্তনাদ, ইতিহাসের অমোঘ আবর্তনে বিপর্যস্ত মনের অজস্র কাতরতা প্রোজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। ব্যক্তিমনের অনুভাবনার অনুপ্রবেশে আখ্যানের গাল্পিক সংলগ্নতা দূরান্বয়ী হয়েছে, কিন্তু জীবনোপলব্ধির গভীর আন্তরিকতা তাকে নিবিষ্ট আকর্ষণের গাঢ়তায় ঐক্যবদ্ধ করে নিয়েছে। (মনসুর ,২০০৮ : ৯১)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর অঘোষিত অস্ত্রের আস্ফালন সমগ্র বিশ্বকে স্তম্ভিত করলেও ; পশ্চিমা বিশ্বের ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক সমস্যা হয়েছিল তীব্র। শোষণ আর নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছিল দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোর মানুষের জন্য। ক্ষুধা, বৈষম্য, রোগ-শোক ও অপমৃত্যুতে বিধ্বংস্ত হয়েছিল সমগ্র প্রতিবেশ। ইতিহাস সাক্ষ্য আছে বহুবার সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের অভ্যন্তরীণ সংকট অপরিহার্য অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রসমূহের সংকটে। উপন্যাসটি লেখক ১৯৬৪ সালে লিখলেও, এর প্রতিবেশে ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ।

১৩.৪

ক্ষুধা ও আশা উপন্যাসের ঘটনা ধাবমান হয়েছে নারীচরিত্র দুটিকে কেন্দ্র করে। প্রবাহের মূলস্রোত বহমান হয়েছে জোহরার মধ্য দিয়ে। হানিফ-ফাতেমার প্রথম সন্তান জোহরা; সব কাজে তাকে দশ কথা শোনানো যায়, দশ ঘা মারাও যায়। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় কন্যা সন্তানের প্রতি বৈষম্যমূলক এই দৃষ্টিভঙ্গি সর্বজাত সত্য। নারীজীবনের স্বাভাবিক যে আবর্তন সেখানে কন্যা, জায়া, জননীর মধ্য দিয়ে নারীর জীবন আবর্তিত হয়। নারীজীবনের বৈষম্যের সূত্রপাত হয় কন্যাসন্তান হিসেবে জন্ম নেয়ার মধ্য দিয়ে; জীবনের ঘাটে ঘাটে নারী হয়ে ওঠার মধ্য দিয়ে তার পূর্ণ বৃত্তায়ন সম্পন্ন হয়। কন্যাসন্তানের জন্মের শুরু থেকেই পরিবারের ধারণা থাকে নেতিবাচক। পিতামাতার ধারণা থাকে কন্যাসন্তান তাদের কোনো কাজেই আসে না, উল্টো বিয়ের সময় যৌতুকের অর্থ গোনা, যা অভাবের সংসারের পক্ষে বিশেষ বিড়ম্বনা। শৈশব থেকেই মা-বাবার তিরস্কারকে নিয়ে বেড়ে ওঠা যেন তাদের আজন্ম নিয়তি। দুর্ভিক্ষপীড়িত দুর্দিনে অস্থিরমতি জোহরা তার সহজ স্ফূর্তিকে অবদমিত করেছে দিনের পর দিন। মনোগহনের জটিল অন্ধকারে ডুবে মরে, আত্মপীড়ন আর অন্তর্দাহকে সে

আপন করেছে। সবকিছুর উপর তার এক দুর্বোধ্য বিতৃষ্ণা জন্মায়। যুদ্ধের এই অনাহার আর হাহাকারময় দিনের এই পীড়ন সেও আর বইতে পারছিল না। গ্রামের সহজ-সরল জীবনের বেড়ে ওঠা গ্রামীণ কিশোরী ক্ষুধার অন্নের আশায় শহরে আসলেও, নাগরিক জীবনের জটিল মানুষের দুরভিসন্ধিমূলক আচরণকে বোঝার সক্ষমতা তার ছিল না। সম্মুখের ভালো মানুষের চেহারার পশ্চাতে লুকিয়ে থাকা পশুত্বের ক্ষিপ্রতাকে অনুধাবন করা গ্রাম্য কিশোরীর পক্ষে অকল্পনীয় ছিল।

> লোকটা বেশ আদর করে। মিষ্টি খাইয়েছে আরো কত কি দিতে চায়। তাকে খারাপ ভাবা উচিত নয়। তার বৌ ছেলে মেয়ে কোথায় তা জানবার দরকার নেই; বাসার কাজ করবার জন্য যদি রাখতে চায় পেটেভাতে হলেও থাকবে! ভাত রাঁধবে খাওয়াবে, কাপড় কাঁচবে ফুটফরমাশ করবে। আর যদি না রাখে? তখন দুঃখ। অচেনা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হবে একটা ব্যবস্থার জন্য, কারণ মায়ের ওপরে থাকতে অনিচ্ছা। (আলাউদ্দিন, ২০১৩ : ৬১)

অবুঝ কিশোরী বিশুষ্ক প্রাণাবেগ তিলে তিলে তার জন্য যে মৃত্যুপুরী তৈরি করেছিল, তা সে বুঝতেও পারেনি। ভাগ্যবিড়ম্বিত এই নারীর মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি রচনায় লেখক সূক্ষ্মস্তরের পরম্পরা রচনা করেছেন। নাগরিক মানুষের ঘৃণ্যকুটিল মনোবৃত্তি, সমাজের অবিবেচনা আর অমানবিকতার শিকার হয়েছে সে। দুর্ভিক্ষের প্রতাপ যতটা প্রকৃতির সৃষ্টি ছিল তারও অধিক ছিল, মানুষের সৃষ্টি। এই সামূহিক সংকট তৎকালীন মানববিশ্বে একটি দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল। সংবেদনশীল, অন্তর্মুখী জোহরা পঙ্কের সেই পাঁকে ডুবে গিয়েছিল, বের হওয়ার পথ পায়নি।

১৩.৫

আপৎকালীন অমঙ্গলতায় সবার পূর্বে বিলীন হয় নারী, কন্যা, শিশু-উপন্যাসের শুরুতে থেকে শেষ পর্যন্ত তারই চিত্র লক্ষ করা যায়। সমাজবহির্ভূত যে জীবন নারীর জন্য সদা ওত পেতে থাকে, সেখানে নারীর শারীরিক মৃত্যু না হলেও মানসিক মৃত্যু অনিবার্য হয়ে থাকে। মায়ের বিক্ষুব্ধ আচরণ জহুর কোমলমতি মনে অভিমানের পাহাড় জমায়, যা তাকে নিরাপদ আশ্রয়ের নিশ্চয়তা থেকে অনেক দূরে নিয়ে যায়। যেখান থেকে ফেরার পথ দূর পাহাড়ে হারিয়ে যায়। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় :

> নিমেষে সব মনে পড়তে পাংশু হয়ে ওঠে মুখখানা, ষোলো ঘণ্টার ব্যবধানে সে যেন এখন আর একজন; একরাতে অনেক বড় হয়ে গেছে, এক নতুন মানুষ। শত কাকুতি-মিনতি করলেও ওরা ছেড়ে দেবে না এটা বুঝলো; কিন্তু মুক্তি তাকে পেতেই হবে। নষ্ট করেছে বলেই এমন পাষণ্ড আধবুড়ো লোকটার বৌ হবে নে? না না না। অন্য কেউ না নিক, বাপ-মায়ের কাছে তো থাকতে পারবে? খুঁজে না পেয়ে ওরা বোধ হয় এখন কাঁদছে, নিশ্চয় কাঁদছে। (আলাউদ্দিন, ২০১৩ : ৭২)

বাঁচার পথ খুঁজতে গিয়ে গ্রামীণ কিশোরী নরকের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে যায়; সেখানে থেকে ফিরে আসা যায় না। সরলা কিশোরী বয়সের দ্বন্দ্বমধুর সংরাগে জীবনের সব আনন্দ বিষাদে পরিণত হয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থান বরাবরই প্রান্তিক, তাকে আরো প্রান্তিকায়িত করে যখন কোনো নারী সামাজিক অনুশাসনের গণ্ডিকে অতিক্রম করে; 'না'-এর লক্ষণরেখার বাইরে পা ফেলে। এই যে নারী পথ হারালো, সে আর কোনো দিন মূল স্রোতে ফেরার পথ পায় না। কারণ সমাজ তাকে পরিত্যক্ত, অবাঞ্ছিত বলে অঘোষিত স্বীকৃতি দিয়েছে। বাঁচার তাগিদে এক হাত থেকে অন্য হাত হয়ে বারবার দেহের বিনিময়ে অর্থ উপার্জনের পথকে বেছে নিতে হয়েছে তাকে। সমাজ তাকে নাম দেয় বারাঙ্গনা বা দেহোপজীবিনী, পরিত্যক্ত বা পতিতা হয় সে :

> এমনিভাবে, কোনো কোনো রাতে দু'একজন লোককে মন্দ লাগত না, কিন্তু কিছুদিনেই এমন ক্লান্ত হয়ে পড়ল, মনে হল, এভাবে চালিয়ে গেলে আর অস্তিত্বটাই যেন থুবড়ে থুবড়ে থেৎলে যাবে। আর বাঁচবেনা ; এর চাইতে কাউকে ফুসলিয়ে নিয়ে পালিয়ে গেলেই ভালো। আজকাল পাহারার কড়াকড়ি শিথিল হয়েছে এবং অনেক সময় রীতিমত সুযোগও মিলে যায় অনেকখানি। কিন্তু এ শুধুই ভাবনা; সত্যিকারভাবে বেরিয়ে পড়বার কথা যখন চিন্তা করে, মনের ভিতরে কোনো সাড়া জাগেনা; বরং একটা অনির্দিষ্ট নিরাবয়ব আতংক, যা নিস্তব্ধতার দেয়ালের মতো অদৃশ্য, কম্পমান। (আলাউদ্দিন, ২০১৩ : ১২৭)

পরিস্থিতির প্রবাহে জোহরা নিরুচ্ছ্বসিত মৃন্ময় মূর্তির মতো যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। দিনের পর দিন পুরুষের স্থূল ভোগলিপ্সায় জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণস্পন্দন হারিয়ে মৃত্যু উপত্যকায় দিন গুনেছে সে। জোহরার ক্ষণিক ভুল তাকে নরকের দ্বারে পৌঁছে দিয়েছে। এখান থেকে মুক্তির পথ তার জানা নেই। নাম পাল্টে যায় গ্রামের নিতান্ত নিপাট ভালো মেয়ে জহুর 'কিন্তু সে আর জোহরা খাতুন নয়, জয়শ্রী, যাকে জয়া বলে ডাকে এপাড়ার সবাই।' (আলাউদ্দিন, ২০১৩ : ১৩০) বারাঙ্গনা এই সমাজেরই অংশ, তবু সমাজে তাদের কোনো স্থান নেই। তার পূর্ববর্তী জীবনের সব স্মৃতি গলাটিপে হত্যা করে, নিজের জীবনকে পেছনে ফেলে অন্যের খোলসে বাঁচে। তারপর একদিন পৃথিবী থেকে নেই হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন জাপানিরা আরাকান দখলের পর ব্রিটিশরা চট্টগ্রামের হাটহাজারী, দোহাজারী, চিড়িঙ্গা, কক্সবাজার প্রভৃতি স্থানে সামরিক ঘাটি নির্মাণ করেছিল। যুদ্ধরত সৈনিকদের বিনোদনের খোরাক জোগাতে ঐসব স্থানে নতুন, নতুন যৌনপল্লি গড়ে উঠতে থাকে। যুদ্ধকালীন ভঙ্গুর অর্থনীতি সমগ্র বাংলার জনজীবনকে করেছিল বিপর্যস্ত। তার সুযোগ নিয়েছে কুচক্রী নারী পাচারকারীরা, দুর্ভিক্ষ-আক্রান্ত বাংলার আনাচে-কানাচে থেকে নারীকে অপহরণ করে পশুর দামে বিক্রি করেছে এই সব পল্লিতে। উপন্যাসে জোহরা ঢাকা থেকে অপহৃত হলেও তার শেষ আশ্রয় হয় চট্টগ্রাম শহরতলীর কোনো এক যৌনপল্লিতে। 'বললো একটু গোলমাল করলে, সঙ্গে সঙ্গে খতম, এই

ধারালো চোখা অস্ত্রটা পেটে চালিয়ে দিয়ে একটানে নাড়িভুঁড়ি বার করে ফেলবে। গাড়িতে থাকতে হবে বৌয়ের মতো, নতুন বৌ, শ্বশুর-বাড়ি যাচ্ছে এমনি।' (আলাউদ্দিন, ২০১৩ : ৭৩) যুদ্ধরত ইংরেজ সৈনিকসহ বহু মানুষের যাওয়া-আসা ছিল এই সব যৌনপল্লিতে। দুর্ভিক্ষের কালো বাজারে বহু মানুষ আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। অবৈধ সেই সব টাকা ব্যয় করার বড় ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায় এই সব যৌনপল্লি। একদিকে অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অন্যদিকে যুদ্ধের লাগামহীনতার রাষ্ট্রীয় দুর্যোগ। প্রাকৃতিক আর কৃত্রিম সংকটের সুযোগে নিয়ে দুর্বৃত্তায়িত শ্রেণি টাকার কুমির হওয়ার খেলায় মেতে ওঠে। খেলা শেষে বিনোদনের পসরায় দাবার ঘুঁটি হতে হয় প্রান্তিক এই সব নারীকে। যে সমাজ নারীকে মানুষ থেকে পণ্য বানিয়েছে, সেই সমাজের কাছে নারীর জন্য এর চেয়ে বেশি কি আশা করা যায়? উপন্যাসের নামকরণে *ক্ষুধা ও আশা* র কথা থাকলেও ক্ষুধার পাশবিক রূপায়ণের পরও দেখা পাওয়া যায় না আশার। এই বিষয়ে গবেষকের মত :

> লেখক দুর্ভিক্ষ-কবলিত, মৃত্যুর দিন-গোনা, উন্মুলিত অসংখ্য পরিবারের চিত্র বর্ণনা করেছেন, শুধু দেননি সেই ইঙ্গিত কি করে এরা একত্র হবে, শক্তি অর্জন করবে। সেই জন্য ক্ষুধা কি করে আশাতে উত্তীর্ণ হবে, এমন কোনো পথের ইঙ্গিত বা প্রতীতি এই উপন্যাস থেকে পাওয়া যায় না। (নাজমা, ১৯৮০ : ২৮৩)

এই মন্তব্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে বলা যায়, ক্ষুধার যন্ত্রণাময় দিনকে অতিক্রম করে অভুক্ত মানুষগুলো কীভাবে সমৃদ্ধ আগামীর পথে পা বাড়াবে, তার কোনো ইঙ্গিত নেই এখানে। ক্ষুধিত মানুষের সংঙ্ঘবদ্ধ কোনো প্রচেষ্টা এখানে প্রতিফলিত হয়নি। জোহরার সামাজিক পরিচয়হীন সন্তানের প্রতি জোহার মানবিক সহানুভূতিতে উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটায়। রাত্রির অন্ধকারে বিদীর্ণ করে উষার আলোর সমাগম ক্ষণিক আশার উদ্ভাসন করলেও, তাৎপর্যপূর্ণ কোনো দিককে নির্দেশ করেননি লেখক।

১৪.

বাংলা সাহিত্যের প্রায় সকল মাধ্যমে সদা সক্রিয় ও নিরীক্ষাপ্রবণ বিরল সাহিত্য প্রতিভা সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৫)। কবিতার মতো কথাসাহিত্যও তাঁর প্রধান স্বভূমি। সৈয়দ হকের নিরন্তর নিরীক্ষণশীলতার বিষয়কে বিবেচনায় নিলে বাংলাদেশের সাহিত্যের ক্ষেত্রে তো বটেই; রবীন্দ্রোত্তর সমগ্র বাংলা সাহিত্যেই তিনি এক দুর্লভ অন্তহীন পরিব্রাজক। নির্মাণ ও নিরীক্ষায় তিনি নিজেই নিজেকে অতিক্রম করেছেন, গণ্ডি ভেঙেছেন বারবার। সে-কারণেই তিনি সময়ের তুলনায় এগিয়ে যাওয়া লেখক। পুনরাবৃত্তির সংক্রমণ আক্রান্ত করতে পারেনি তাঁর সাহিত্যিক সত্তাকে। একজন সৃষ্টিশীল মানুষ হিসেবে তিনি ইতিহাস আর ঐতিহ্যের দীর্ঘ সঞ্চয়ের পথে অনুসন্ধান করেছেন জাতিসত্তার উৎস ও অস্তিত্বের। মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর বিপন্ন সময়ের পদাঘাতে ঐতিহ্য আর কল্পনার জৈব-

ঐক্যে নির্মাণ করেছেন বাংলা সাহিত্যের নবতর দিকসমূহ (বিশ্বজিৎ,২০০৯ : ৩৮২)। আধুনিক বাঙালির জাতিসত্তা গঠনের নেপথ্যে এই জনপদের ইতিহাস আর ঐতিহ্য যে প্রগাঢ়রূপে প্রভাব রেখেছে; সেই সমস্ত ইতিবাচক দিকসমূহ তাঁর সাহিত্যকর্মে সঞ্চারিত হয়েছে নতুন নতুন আবহে। ঐতিহ্যের ধারাক্রম তাঁর সাহিত্যের প্রবহমান অনুষঙ্গে নির্মিত হয়েছে শিল্প-সাহিত্যের নানাবিধ মাধ্যমে। সৈয়দ শামসুল হকের উপন্যাসের বিশাল পটভূমি জুড়ে আছে গ্রামীণ পরিবেশ, পটভূমি আর জনপদের পরিচয়। পরিবেশ-প্রতিবেশ ও আঞ্চলিক জীবনছবি, সংস্কার, বোধ, জীবন-প্রতীতির সঙ্গে লেখকের নিজস্ব জীবনদর্শনের অন্বয় উপন্যাসগুলোকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। গ্রামীণ নিম্নবিত্ত জীবনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের বহুভঙ্গিম অন্তরায়সমূহ তুলে ধরেছেন রাজনৈতিক বিভিন্ন পটপরিবর্তনের সঙ্গে অঙ্গিভূত করে (মোস্তাফা, ২০০৮ : ৩০৬)। চরিত্রের মানসগঠনে সমাজ পরিপ্রেক্ষিতের আয়োজন ভূমিকা রেখেছে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে গ্রামবাংলার গ্রামীণ জীবনের ঐতিহ্যিক অনুষঙ্গ–যা বাঙালির অতীত ইতিহাসের সঙ্গে নতুন করে সম্পর্ক নির্মাণে সহায়তা করে।

১৪.১

*আয়না বিবির পালা (*১৯৮৬) সৈয়দ শামসুল হকের বৈচিত্র্যময় অভিযাত্রার স্বাতন্ত্র্যের চিহ্নায়ক। উপন্যাসের কাহিনিটি একটি গাথা কাহিনিনির্ভর আখ্যান। বাংলাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলে এবং ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের প্রচলিত কোনো এক অর্বাচীন কবির সৃষ্টি। লেখক সৈয়দ হক তাকে স্বকাল ও স্বসমাজের উপযোগী এক নতুন আবহে, নতুন উন্মাদনা দিয়েছেন। লোকনাট্যের উপকরণের কাহিনিকে সাম্প্রতিক জীবনচাঞ্চল্যের আবর্তনে স্থাপন করে জন্ম দিয়েছে নবমাত্রিকতার। উপন্যাসের কাহিনি সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য এমন : প্রাচীন *আয়না বিবির পালার* মূল কাঠামো থেকে আমি মাত্র কয়েকটি প্রাথমিক বাঁক গ্রহণ করেছি–যেমন মামুদ উজ্জ্যালের বাল্য, কৈশোর ও প্রথম জীবন, আয়নাবিবির সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ ও অন্বেষণ, বিদেশ থেকে ফিরে এসে লোকের কথায় আয়নাকে পরিত্যাগ করা। জামালের আয়না অপহরণ, মউফলের কাছে আয়নাকে বিক্রি করে দেয়া, অন্তিমে আয়নার ঘরে মামুদ উজ্জ্যালের গমন ইত্যাদি আমার উদ্ভাবিত উপকরণ। আবার পরিচ্ছেদগুলোতে উপশিরোনাম হিসেবে আমি প্রাচীন গাথা থেকেই পংক্তি চয়ন করে উদ্ধৃত করেছি। এই রচনায় প্রাচীন গাথা রচয়িতাদের উপমা, বর্ণনা ও নাট্য নির্মাণের ভঙ্গি ও কৌশল আমি আধুনিক মাত্রায় প্রয়োগ করতে চেয়েছি (ফরিদা, ১৯৯৯ : ৮৬)। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কাহিনি সব সময় পুরুষনির্ভর হয় নারী সেখানে উপলক্ষমাত্র; যদিও উপন্যাসের নামকরণ নারীকে কেন্দ্র করে এবং কাহিনির সমাপনেও নারীর রয়েছে একটি বিশেষ ভূমিকা।

১৪.২

লোকায়ত সাহিত্য-সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখায় ও প্রকরণে যুগে যুগে পুরুষতন্ত্রের যে বিস্তার ঘটেছে তার একটি দৃষ্টান্ত এই উপন্যাস। ময়মনসিংহ গীতিকাসহ বাংলাদেশে প্রচলিত সব গীতিকায় নারী চরিত্রের উল্লেখযোগ্য বিস্তার লক্ষণীয় হলেও; পুরুষতন্ত্রের আদলে নির্মিত নারীর বিচিত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ পাওয়া যায় এখানে। পুরুষতন্ত্রের সংকীর্ণ-সীমাবদ্ধ আবহের মধ্যেও তারা নিজস্ব বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে প্রতিভাসিত হয়েছে। এসব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে প্রেম-নিষ্ঠা, সংযম-সহিষ্ণুতা, তেজস্বিতা, সতীত্ব, পতিব্রতা, আত্মত্যাগ, আত্মসচেতনতা, ব্যক্তিত্ব ও সরলতা। এই সমস্ত গুণের দৃঢ়তায় নিম্নবর্গে নারী চরিত্রগুলো হয়ে উঠেছে আবহমান বাংলার চিরায়ত নারীর প্রতীকীরূপ। আয়নাকে উপন্যাসে সমগ্ররূপে পাওয়া যায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে। মামুদ উজ্জ্যাল বিদেশ যাবার উদ্দেশ্যে বের হয়ে ঢাকার বাস না পেয়ে পিতার বন্ধুর বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেছে। সেখানে মামুদের সাক্ষাৎ হয় আয়নার সঙ্গে। আয়নার সৌন্দর্য ও অতিথিপরায়ণতায় মুগ্ধ হয় নবীন যুবক মামুদ। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে পুরুষতন্ত্রের অভিভাষণের জোরেই তারা নিয়ন্ত্রণ করেছে নারীর চিন্তা ও আচরণকে। নারী নিজের অজ্ঞাতসারেই পুরুষতান্ত্রিক ভাবনায় ভাবিত ও সংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। আপাতদৃষ্টিতে তাকে নারীর নিজের ইচ্ছা বা সহজাত প্রবৃত্তি বলে মনে হলেও মূলত তা নারীকে অবোধ করে রাখার মোহমায়া (সেলিনা, ২০০৮ : ১২৪)। সেই মোহমায়ায় আকৃষ্ট হয়ে নারী তার নিজেকে সমর্পণ করে পুরুষের পদতলে। আবেগে আপ্লুত নারী মনে করে এখানেই তার জীবন সকল সার্থকতা নিহিত। চির ব্যথিত আয়নার ভাবনায় উচ্চারিত হতে থাকে সেই কথা :

> তুমি কি আমার সেই নিকট বন্ধু তবে? যদি হও, আমি তোমাকে আমার এই ছোট্ট জীবনের দিনগুলো, যেন এক মুঠো ফুল, মালা গাঁথি নাই, ...আমার এই জীবন, আমার এই সামান্য জীবনের অতি সাধারণ দিনগুলো, যার একমাত্র অসামান্যতা এতেই যে, সবগুলো দিন যেন একটি দিন এবং একটিই তার উদয়ের কারণ কারো প্রতীক্ষা। তুমি কি সেই প্রতীক্ষার অবসান সাধু ।(সৈয়দ,শামসুল, ২০০২ : ৫২)

এভাবে আয়নাবিবি আপনজন, সাধু, সজ্জন ভেবে মামুদ উজ্জ্যালের নিকট সর্মপণ করেছে নিজেকে। সব যুগে, সব সমাজেই, পুরুষতন্ত্র নারীকে নির্মাণ করেছে তার নিজস্ব আদলে। আয়না সেই সমাজেরই নির্মিতি।

১৪.৩

আয়না একান্ত বাধ্য নারীর প্রতিমূর্তি। শাশুড়ির সেবা, স্বামীর সেবা-সবই সে করেছে প্রশ্নহীন আনুগত্যের সঙ্গে। গ্রামীণ নারীর ব্যক্তিসত্তায় নিজস্বতা বলে কিছু থাকে না। সে অন্যের ওপর নির্ভর করে অন্যের জন্য বাঁচে। আয়নার ভালো থাকাটা বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। স্বামী মামুদের চিন্তার জগত এলোমেলো করে দিয়েছিল বন্ধু জামাল। মামুদের মনে জেগেছিল বিত্তের নেশা, স্ত্রীর প্রেম অপেক্ষা বিত্ত-বৈভবের প্রেম তাকে অন্ধ করে দিয়েছিল। এর মূলে ছিল বন্ধু জামালের ষড়যন্ত্র। মামুদকে বিদেশ পাঠাতে পারলে তার নবাগত সুন্দরী স্ত্রীর সান্নিধ্য পাওয়া সহজ হবে। সব পুরুষের নিকট নারী একটি ভোগ্যপণ্য। কোন উপায়ে তাকে হস্তগত করা যায়, সেটাই তাদের একমাত্র ভাবনা। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় :

> মদ নেশা, ভাঙ নেশা, বাইচ নেশা, তারও চেয়ে বড় নেশা–রূপের নেশা। রূপের নেশা এমন নেশা, আত্মা মানে না, অপর বোঝে না।...আয়না বিবি না তোমার বন্ধুর বড় আদরের ধন হয়? সেই ধন তুমি আজ লোভের হাতে নিশির অন্ধকারে চুরি করার নষ্টস্বপ্ন বসে বসে দেখ? তাইও যার ধন তারই পাশে বসে একা আসনে বসে (সৈয়দ শামসুল,২০০২ : ৭০)

সব সময়, সব পরিসরে, পুরুষতন্ত্র তার নিজের মতো করে নারীকে সম্বোধন করে, নির্ধারণ করে। বিবাহিত নারীর ক্ষেত্রে এই ভাবনার সীমা আরো অনেক বেশি নির্দিষ্ট। মামুদ মত্ত হয়ে উঠেছিল প্রবাসে গিয়ে টাকা উপার্জনের নেশায়। সে ভুলে গিয়েছিল আয়নার বর্তমান-ভবিষ্যতের ভাবনা। তাকে ছাড়া আয়নার জীবন কীভাবে কাটবে? কিংবা প্রবাসে যাওয়ার ব্যাপারে আয়নার মতামতের মূল্য ও মূল্যায়নের ভাবনা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ভাবনায় নারীর মন বলে কিছু থাকে না। সামগ্রিক এই অবস্থান থেকে নারীকে যে স্থান নির্ধারণ করে দেয়া হয়, সেখানে আয়নাবিবির কোনো কথায় গুরুত্ব পায় না। বরং সেবাদাসী হিসেবে স্বামীর হুকুম পালন করাই তার একমাত্র কর্তব্য।

১৪.৪

এই উপন্যাসের ঘটনার আবর্তনের মধ্যে আয়না বিবির প্রতি জামালের লোলুপ দৃষ্টি বিরাজমান। স্বামী মামুদের দৃষ্টিতে আয়না মোহময়ী ভোগ্যপণ্যের ন্যায়। স্ত্রী আয়নাকে দিয়ে বন্ধু জামালকে আপ্যায়ন ও হাসিঠাট্টার মাধ্যমে আনন্দিত করতে পারলে তার বিদেশ যাওয়া সহজ হবে :

জামালের পাতে ভাত বেড়ে দেয় আয়না বিবি, ব্যঞ্জন তুলে দেয়। মামুদ উজ্জ্যাল হা হা করে ওঠে, আরে, কর কী, কর কী? বন্ধুর পাতে আমার প্রাণের বন্ধুর পাতে ভাজা পোড়া দিলে কোন আক্কেলে?...আয়না বিবি ফিরে এসে আবার সব পরিবেশন করে ; এবার সে তুলে দেয় কলাই শাক দিয়ে শরপুটিমাছের ঘন্ট, লাউয়ের বেসর, খলসে-পুঁটির চচ্চড়ি, আধফোটা মাষের ডাল, মুগের ডালে রুই মাছের মাথা, বোয়াল মাছের পেটির ঝোল, সে ঝোল যেমন লাল তেমনি ঝাল, তারপর রুই মাছের লেজের তেলানি; সবার শেষে ঘরে পাতা মহিষের দুধের দৈ।...জামালও তখন হাসতে থাকে। বলে, এত খেলাম একটুখানি খিদে তবু ছিল ভাবি। আপনার হাসিতে সেই ক্ষিদে পূরণ হলো। ডালিমের মতো রাঙা হয়ে যায় আয়না। মামুদ উজ্জ্যাল খপ করে বৌয়ের হাত ধরে বলে, বৌ তাহলে আরো একটু হাসো। বন্ধুর মনে হয় আরো ক্ষিদে আছে। (সৈয়দ শামসুল, ২০০২ : ৭০)

পুরুষতন্ত্রে নারীর প্রধান ও প্রথম পরিচয় যৌনদাসী হিসেবে। আয়নাবিবি যেন যৌনদাসী রূপী কাঠের পুতুল। আয়না নির্জীব এক গ্রামীণ নারী স্বামীর আদেশকে পালন করা তার প্রধান দায়িত্ব। লেখক সচেতনভাবে নারী-পুরুষের বৈষম্যের দিকটি স্পষ্ট করেছেন। গ্রামীণ সমাজের রীতিনীতি সামাজিকতা পালন করতে করতে তার ভেতরে যে এক আমি আছে, তাকে ভুলে গিয়েছিল আয়না। মামুদ উজ্জ্যালের সামাজিক, অর্থনৈতিক, উচ্চাক্ষা বহুমুখী ভাঙনের সম্মুখীন করেছে আয়নাকে। গ্রামবাংলার সমাজনীতি ও অর্থনীতির বিপ্রতীপ চারিত্র্য সাধারণ নিম্নবিত্তের মানুষদের সাধারণ ও স্বাভাবিক জীবনবোধ ও সরল বিশ্বাসকে বিপর্যস্ত করেছে; নারী সেখানে প্রধান হাতিয়ার। এমনই এক প্রেক্ষাপটে আয়নাবিবিকে আবর্তিত করে মামুদের বন্ধুরূপে জামাল। বিভিন্ন ছলচাতুরীর মাধ্যমে আয়নাকে হস্তগত করতে ব্যর্থ হয়ে রাতের অন্ধকারে স্বামীর সমূহ বিপদের কথা বলে তাকে ঘরের বাইরে এনে নিজের কামুক প্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করতে আগ্রাসী হয়ে ওঠে। এত দিনের নির্জীব আয়না নিজেকে রক্ষা করতে সকল সাহস ও শক্তির প্রয়োগ করেছে :

আয়নাবিবি জামালের বাহু বাঘিনীর মতো কাপড়ে ধরে, রক্তের লবণস্বাদও সে এখন মিষ্ট বলে গণনা করে, অবিলম্বে আর্তনাদ করে ছেড়ে দেয় তাকে জামাল, ...অতএব আমার আলিঙ্গনে সম্মত হয়ে নিজেকে তুমি অপবাদ থেকে রক্ষা কর। কেবল আলিঙ্গনই বা কেন? তুমি যদি সম্মত হও, আমি তোমাকে বিয়ে করতে প্রস্তুত। ঐ কৃষকের চেয়ে তুমি আমার কাছে অধিক যত্ন পাবে। (সৈয়দ শামসুল, ২০০২ : ৭৪)

নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করতে সে পানিতে লাফ দিয়েছিল। সমাজ তা বিশ্বাস করতে অপারগ, কারণ রাতের অন্ধকারে সে পরপুরুষের সঙ্গে ঘরের বাইরে এসেছে। পুরুষতন্ত্র বহুগামী পুরুষকে ক্ষমার চোখে দেখলেও নারীর বহুগামিতা অমার্জনীয় অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এরূপ অপরাধের জন্য নারীকে কঠিন শাস্তি এমনকি এমনকি প্রাণদণ্ডের ফতোয়া দেয় গ্রামের সামাজিক-ধর্মীয় নেতারা। বিশেষ করে এরূপ অপরাধ যদি কোনো দরিদ্র ও অসহায় নারী করে, তাহলে তার একেবারে রক্ষা

নেই (আবদুল, ২০১৬ : ৩৯)। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে এভাবেই নারীর ওপর নিয়ন্ত্রণ, নির্যাতন যুগ যুগ ধরে প্রচলিত হয়ে আসছে। জীবিকার সন্ধানে দেশত্যাগী মানুষের পরিবার-পরিজনকে সংকটে নিমজ্জিত করে বিকৃত ক্ষুধার নিবারণ করে ক্ষমতাধর শ্রেণি। ক্ষমতাধর মানুষের উৎপীড়নে পুরুষের তুলনায় নারীর জীবনে নেমে আসে মর্মান্তিক পরিণতি। পুরুষ যেখানে শুধু শ্রেণিশোষণের শিকার হয়, নারী সেখানে শ্রেণিশোষণের পাশাপাশি লৈঙ্গিক শোষণের শিকার হয়ে থাকে। দুঃস্বপ্নের কবলে রাতের অন্ধকারে যে নারী ঘর ছেড়েছিল, তার জন্য সমাজ-সংসার কোনো স্থান রাখে না। ঔপন্যাসিকের বিবরণে নিম্নরূপ :

> আয়না বিবি দুঃস্বপ্নের মতো চাঁদের ভিটায় ফিরে আসে দু'দিন পরে। ...আয়না বিবি বাড়ির উঠানে এসে দাঁড়ায়। ... স্থির দৃষ্টিতে বোবার মতো তাকিয়ে থাকে সে। কার সঙ্গে গিয়েছিলে, বিবি, কার সঙ্গে গিয়েছিলে? নিরুত্তর আয়না, হা, এও এক আয়না। (সৈয়দ শামসুল, ২০০২ : ৭৫)

গ্রামবাসীর শতকণ্ঠের সঙ্গে মামুদ উজ্জ্যালের মাও একটি বড় ভূমিকা রাখে। যিনি নিজেও একজন নারী হয়েও নারীর অবস্থানে থাকেনি; নিজের অজান্তেই হয়ে উঠেছে পুরুষতন্ত্রের প্রতিনিধি। মামুদ উজ্জ্যালের মা সমাজ-সংসারের অংশ হয়ে বলে উঠেছে : 'যতক্ষণ এই রমণী এই সংসারে আছে ততক্ষণ তার গর্ভধারিণী অন্নজল গ্রহণ করবে না।' পুরুষতন্ত্রের শিক্ষা এভাবে এক নারীকে আর এক নারীর প্রতিপক্ষে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

১৪.৫

সৈয়দ শামসুল হক আয়নাকে প্রথাবদ্ধ নারী হিসেবেই সৃষ্টি করেছেন। প্রথাবদ্ধ নারী হয়েও আয়না পুরুষতন্ত্রের নিষ্ঠুরতা থেকে রেহাই পায় না। গ্রামীণ সমাজের পরিশুদ্ধ পরিসীমায় স্থান হয় না ভাগ্য বিড়ম্বিত এই অসহায় নারীর। মনোবিজ্ঞানের মতে মানুষের মানসগঠনের ক্ষেত্রে অভিভাবন বা সাজেশনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরোক্ষভাবে মনে বা চিন্তায় বিশেষ ধারণা সৃষ্টি করাই অভিভাবন বা সাজেশনের কাজ। সম্মোহনকারী মানুষের মনের বিশেষ ধারণাকে প্রত্যক্ষ করে জাগ্রত মানুষকে বিভিন্নভাবে অভিভাবিত করে থাকে। ফলে জাগ্রত মানুষও অনেক সময় আধা-জাগ্রত অবস্থায় থাকে। এ প্রসঙ্গে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী মনোবিজ্ঞানীর বক্তব্য নিম্নরূপ :

> এমন অনেক কিছু আমরা নির্বিচারে গ্রহণ করি, যার বাস্তব ভিত্তি নেই। গোটা মস্তিষ্কের যুক্তিতর্ক, সামগ্রিক বিচার পদ্ধতি আমরা সব সময় মেনে চলি না। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে বলা উচিত, মস্তিষ্ক সব সময় সামগ্রিকভাবে কাজ করে না। খণ্ডিত আধা-ঘুমন্ত অংশ সমগ্র থেকে আলাদা হয়ে অভিভাবনের জোরে আমাদের কাজকর্ম, আচার-ব্যবহারকে অনেক সময়ই নিয়ন্ত্রিত করে। (সেলিনা, ২০০৮ : ১২৪)

এমনই এক মানসিক অবস্থার মধ্য দিয়ে আয়নার সংসারজীবন বিপন্ন হয়েছে, তাকে নিক্ষেপ করেছে অসহায়ত্বের স্থিতাবস্থায়। গ্রামবাসীর সংস্কারাচ্ছন্নতার সামূহিক বিস্তার আয়নাকে দুর্বল ও নিষ্প্রভ করে তুলেছে। এই সমাজ নারীকে সব সময় দুর্বল-ভীরু করতে পারলে আনন্দ পায়। গ্রামীণ সমাজের রীতিনীতি, সামাজিকতা, ধর্মবিশ্বাসের দায়ভার সমস্তই বর্তায় নারীর ওপর। পুরুষতন্ত্র পুরুষের বহুগামিতাকে ক্ষমার চোখে দেখলেও নারীর সামান্য স্খলন অমার্জনীয় অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করে। এই জাতীয় অপরাধে নারীকে কঠিন শাস্তি এমনকি প্রাণদণ্ডের ফতোয়া দিয়ে থাকে গ্রামীণ সামাজের ধর্মীয় নেতারা। বিশেষ করে সেই অপরাধ যদি কোনো দরিদ্র ও অসহায় পরিবারের নারী করে থাকে, তাহলে তার রক্ষা নেই (আবদুল, ২০১৫ : ৩৯)। প্রথাগত সমাজব্যবস্থায় পুরুষ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, সেখানে সমাজ ও ধর্ম তার নিয়ন্তা। তাই তার অনুমতি বা অজ্ঞাতে নারী যাই করে, তা সমাজের চোখে অপরাধ।

১৪.৭

সমাজ নারীকে বহিরাগত হিসেবে মূল্যায়ন করে। তার অসহায়তার সুযোগ তাকে আরো বিপন্ন করে ধর্মের বাতাবরণে। সমাজের ধর্মীয় প্রধান হিসেবে মৌলবি বয়কট করেছে আয়নাকে। তার বক্তব্য নিম্নরূপ :

> নদীর ঘাটেই মৌলবি তাকে, সোনা নয় রুপা নয়, যে ভেঙে আবার গড়া যায় নারীর সতীত্ব এই মতো হয়।.. মামুদ উজ্জ্যাল হচকিত হয়ে জননীর দিকে তাকায়; জননীর ঘরে গিয়ে সশব্দে দুয়ার বন্ধ করে দেয়; মামুদ উজ্জ্যাল অনুভব করে ওঠে যে যতক্ষণ এই রমণী এই সংসারের প্রাঙ্গণে আছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার গর্ভধারিণী অন্নজল গ্রহণ করবে না। (সৈয়দ শামসুল, ২০০২ : ৭৬-৭৮)

আয়নাকে সন্দেহের তালিকায় ঠেলে দিতে সমস্ত সমাজ একযোগে ব্যগ্র হয়ে পড়েছে। সমাজের বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে যেসব উচ্চারণ, তা থেকে নারীর প্রতি সামগ্রিক মনস্তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে। গ্রামীণ ক্ষমতার কাঠামোতে নারীর কোনো স্থান নেই, তাই শারীরিক ও মানসিক উভয়ভাবে তাকে নির্যাতন করা হয়। আয়নাবিবি সেই কাঠামোর অধীনস্থ একজন নারী, তাকে নির্বাসিত করার লক্ষ্যে যেমন গৃহহীন করা যায়, তেমনি তার শরীরে আঘাতের চিহ্ন এঁকে টুকরো কাগজের মতো দুমড়ে মুচড়ে পরিত্যক্তও করা যায়। 'সতীত্ব' নামক এই শব্দটির জন্ম, ব্যবহার ও প্রয়োগ সবই যেন নারীর জন্যর; পুরুষের জন্য এর কোনো বিধিমালা নেই, অন্তত পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায়। সতীত্ব শব্দটি মূলে আছে জৈবিক সম্পর্কের ভিত্তি। সামাজিক নির্মিত জৈবিক সম্পর্কের এই মূল্যায়ন নারীর চারিত্রিক সততার মাপকাঠি। তাই আয়নার কথা কেউ শোনার প্রয়োজনবোধ করেনি :

> আয়নাবিবি ধীরে ধীরে মাথা তোলে এবং স্বামীর দিকে তাকায়। আমি তোমারই ফিরে আসার প্রতীক্ষায় ছিলাম; তুমি আমার সকল শোনো। আমার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না বলেই এ ক'দিন নীরব ছিলাম, আজ আমি বিনা প্রশ্নেই বিবরণ দেব, কারণ এ বিবরণ তুমি ছাড়া কেউ বিশ্বাস করবে না।.. তোমা ভিন্ন আমি জীবন জানি না, তোমা ভিন্ন মৃত্যু বলেই সমস্ত কিছু জ্ঞান করি। তোমার আলিঙ্গন আমার স্বর্গবাসের নিমন্ত্রণ; তোমার উচ্চারণ আমার গীত শ্রবণের পরম; তোমার মুখ আমার আমার জগতের সূর্য। তবু তুমি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ, আমি এই দ্বিতীয় হাহাকার করে উঠলাম। (সৈয়দ শামসুল, ২০০২ : ৭৭)

সমাজের এই শোষণের অন্ধগুহায় নারীর সমস্ত হাহাকার নির্বাক ধ্বনিরূপে প্রকাশিত হয়েছে। যুগ যুগ ধরে শোষিত ও শাসিত নারী যখন মুক্তির পথ পায় না, তখন মৃত্যুতে প্রশান্তি খোঁজে। ১৬৬২ সালে মার্গারেট লুকাস নাম্নী ওলন্দাজ এই নারী 'ফিমেল ওরেশনস' শিরোনামে প্রবন্ধে লিখেছিলেন 'পুরুষ আমাদের বিরুদ্ধে দারুণ বিবেচনাহীন ও নিষ্ঠুর আচরণ করে করে, ওরা সব ধরনের স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে কিন্তু আমাদের বেলায় অবরোধ সৃষ্টি করে মেয়েদের সাথেও মিশতে দেয় না। আমরা বাদুড় অথবা পেঁচার মতো বাস করি, পশুর মতো ভারবাহী জীব যেন আমরা। আমরা প্রতিনিয়ত পোকামাকড়ের মতো মৃত্যুবরণ করি।' তাঁর এই বক্তব্য শুধু খোদোক্তি প্রকাশের জন্যই ছিল না, তারও অধিক নারীর প্রকৃত অবস্থানকে তুলে ধরার প্রয়াস ছিল (উদ্ধৃত, মালেকা, ২০১৬ : ১৬)। মানবসভ্যতার আদিযুগ থেকেই সমাজ ও ধর্ম একত্রিত হয়ে নারীকে পীড়ন করেছে। এর পাশাপাশি নারীর চারিত্রিক শুদ্ধতার প্রাচীর তাকে আরও শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছে। বিশেষ করে পুরুষের নির্মিত লক্ষণরেখা, যা নারী অতিক্রম করলে তার জন্য বিভিন্ন শাস্তি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে; যেমন হয়েছিল *সংশপ্তক*-এর হুরমতির সঙ্গে।

১৪.৮

পুরুষের আধিপত্য যেখানে প্রবলভাবে বিরাজমান সেখানে নারীর জন্য নিগ্রহ ছাড়া কিছু অবশিষ্ট থাকে না। তাই সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত নারীর স্থান হয় বারাঙ্গনা পল্লিতে, অসতী অশূচি আয়নাকে টাকার বিনিময়ে বিক্রি করেছে মামুদ উজ্জ্যাল।

একজন স্বামীরূপী পুরুষ মামুদ উজ্জ্যালের এই ঘটনাক্রম নারীকে পশু ছাড়া আর কিছু প্রমাণ করে না। নির্বাক নারী সব মেনে অধঃপতনের পথে হেঁটে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে যায়। অসহায় আয়নাও সব নিয়তির হাতে ছেড়ে অতিক্রম করেছে জীবনকে :

> সাধু, যখন আমি সতী ছিলাম তুমি ত্যাগ করেছ, এখন আমি সত্য সত্যই অসতী, এবার নিশ্চয়ই আমাকে তুমি গ্রহণ করবে? ......তুমিই না একদিন বলেছিলে, সৃষ্টিকর্তার কী লীলা মানুষের এই হাতেই হয়, আবার

> এই হাতেই লয়। সতী সে তোমারই জন্য; অসতী– সেও তো তোমারই জন্য। সতীকেও একদিন তুমি গ্রহণ করেছ, আজ অসতীকে একই অস্তিত্ব দিয়ে গ্রহণ করলে। আমার এই ছোট্ট জীবনে ক্ষুদ্রতম পাখির চেয়ে ক্ষুদ্র আমার এই হৃদয়ে এর চেয়ে বড় সুখ আর কী বা হতে পারে? (সৈয়দ শামসুল, ২০০২ : ৮৭)

আয়নার এই আক্ষেপ ধ্বনি নারীর চিরকালীন যন্ত্রণার প্রকাশ। সতীত্ব প্রমাণ বস্তুনিরপেক্ষ সত্তা নয়, একমাত্র বিশ্বাস আর অনুভূতি দিয়ে তাকে অনুভব করা সম্ভব। কলঙ্কিনী পাপী স্ত্রীকে রঙ্গালয়ে বিক্রি করে পুণ্য অর্জন করেছে মামুদ উজ্জ্যাল। সেই পুণ্যের টাকার বিনিময়ে সুখ কিনতে গিয়েছিল সে পাপালয়ের পরিত্যক্ত স্ত্রীর কাছে। স্ত্রী পরিত্যক্ত কিন্তু স্ত্রীর শরীর পরিত্যক্ত বা অগ্রহণযোগ্য হয় না। বরং অন্য আর যেকোনো দিনের তুলনায় আরো বেশি আহারযোগ্য হয়ে উঠেছে। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় : 'মামুদ উজ্জ্যাল ঝাঁপিয়ে পড়ে আয়নার দেহ থেকে রূপ ও মাংস আহার করতে শুরু করে। অবিরল ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ে আয়নার চোখ দিয়ে। অথচ ঠোঁটে তার স্মিতহাসি লক্ষিত হয়।' (সৈয়দ শামসুল, ২০০২ : ৮৭) আয়নার অন্তর্দাহ স্পর্শ করে না স্বামী ও সমাজকে। কারণ স্বামীরূপী মামুদ উজ্জ্যাল ভোগবাদী সমাজের অংশ; নারী সেখানে সর্বাপেক্ষা জীবন্ত ভোগ্যপণ্য। বাংলার লোকসমাজে প্রচলিত জীবনের অংশ আয়নাবিবি। লোকগাথার চিরন্তন প্রবাহ থেকে তাকে সমকালেও সর্বকালের উপযোগী করে নবনির্মিতি দিয়েছেন সৈয়দ শামসুল হক। সামাজিক প্রচলিত সত্যের উপলব্ধিতে নারী শেষ পর্যন্ত পণ্য হয়ে উঠেছে। সমাজ-সংসার থেকে উচ্ছিষ্ট হয়ে অনিকেত যে জীবন, সেই জীবনকে বয়ে নেয়ার ইচ্ছা বা আগ্রহ কেনোটাই আর তার মধ্যে উদ্বৃত্ত ছিল না। স্রোতের শ্যাওলার মতো ভাসমান জীবন থেকে মুক্তি পেতে মৃত্যুই তার কাঙ্ক্ষিত ছিল। নারীর এই নিম্নবর্গীয় সত্তাকে সমাজ শুধু একটি সংখ্যা হিসেবে বিবেচনা করে। ভারতীয় ইংরেজি ঔপনাসিক অমিতাভ ঘোষের '*সি অফ পপিজ*'(২০০৮) উপন্যাসে দিতি নামে এক নারীর দেখা মেলে, যার আর্থ-সামাজিক অবস্থার নাজুকতা তাকে আত্মহত্যায় বাধ্য করেছে। দিতির অধঃপতিত অবস্থার বর্ণনায় গবেষক বলেছেন :

> Deeti is a real representation of the subaltern; she could not speak anything or even asked her husband about something she wonders form. For example, why he could do that to her? Or why did he marry her? What is the reasoin? She likes the live statue in the human body. She feels anything but her mouth just keeps silent. Her hands just wiped off her tears and pretend to be a happy wife in front of her husband. Even she hates a man who likes to consume opium, but she has no option except still being his wife. Deeti is the victim of the patriarchal system in India. (Sophia, 2020 :6-7)

সামাজিক সংকীর্ণ পরিবেশে নারীকে এভাবে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেয়া হয়। সতীত্বের প্রমাণ দিতে আয়না নিজের জীবনকে যেমন অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছে, তেমনি দিতি অমানবিক পরিস্থিতি ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নিকট বিশেষ কোনো মূল্য বহন করে না। সমাজের লেলিহান শিখায় নারী বছরের পর বছর ধরে নিম্নবর্গ হয়ে বেঁচে মরে আবার কখনো মরে বাঁচে।

১৪.৯

আয়নাবিবি উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হলেও মাউফল তার মতো একজন প্রান্তিক নারী। লেখক তার জীবনের আদি ইতিহাস সম্পর্কে একই ইতিহাসের সন্ধান দিয়েছে। যে পুরুষকে নারীর তার জীবনের পরম আশ্রয় বলে গ্রহণ করে, সেই পুরুষই তার জীবনের চূড়ান্ত ক্ষতি করে। সমাজের অবাঞ্ছিত এই আলয়ে বসবাসরত সব নারীর রয়েছে জ্বল জ্বল অগ্নিতে পোড়া একেকটি অতীত। কেউ নিজ ইচ্ছায় বা স্বাধীন প্রচেষ্টায় এখানে আসে না; মাউফলও তাদেরই একজন। 'মাউফলের কাহিনী আছে। তার স্বামী তাকে এখানে বেচে দিয়েছিল, সেই অভাবের সময়। রূপের এত বাহার তার, অনেক টাকাই পেয়েছিল, মনে হয়।' (সৈয়দ শামসুল, ২০০২ : ৫৭) নারীর নিজের জীবনে নিজের কোনো সিদ্ধান্ত থাকে না। শৈশব-কৈশোরের থাকে পিতার অথবা ভাইয়ের অধীনতা আর বিয়ের পরে থাকে স্বামীর সার্বিক অধীনতা। নারীর শ্রমকে অবমূল্যায়নের মধ্য দিয়ে তার সামাজিক ও পারিবারিক অধিকার জলাঞ্জলি দেয়া হয়েছে। বিবাহের মাধ্যমে যে সমাজ নারীকে, নারীর জীবনের সকল নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কথা বলে; সেই সমাজে বৈবাহিক সম্পর্কের দোহাই দিয়ে নারীর প্রতি সকল অত্যাচারকে জায়েজ করে নেয়। আর সে-কারণেই মাউফল আয়নাবিবির মতো অসহায় নারীদের শেষ আশ্রয় হয় পতিতালয়। সেই পুরুষেরা বউ বেচার টাকায় ফুর্তি করতে যায়, সেই সব রঙ্গালয়ে যেখানে আছে মাউফল আয়নাবিবির মতো নির্বাক নিরবলম্ব নারীরা :

> কত ভাই দেখলাম, কত স্বামী দেখলাম, বোনের কামাই খায়, বৌ এনে বেশ্যাপাড়ায় বেচে দেয়।...নতুন শুনলে বুঝি? কেন বেচে দেয়.? বৌ কেন বেচে দেয়? খিলখিল করে হাসে মাউফল। টাকা নিয়ে বউ বেচে দেয়? নিজের বৌ? কী বলো তুমি বোন?...মামুদ উজ্জ্যালের ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে ঠেলে বের করে দিতে দিতে বলে, কত সাধু দেখেছি হে, কত গাঙের পানি আমি দেখলাম। যাও আবার এসো। আসবেই তুমি। ঘরের বৌ বেচতে আসবে, আমার কাছে এসো, আমি মহাজন হয়ে বসে রইলাম পথ চেয়ে। (সৈয়দ শামসুল, ২০০২ : ৫৭)

মাউফল জানে এই সমাজ নারীকে কোন চোখে দেখে? কী অবস্থার মধ্য দিয়ে একজন নারীকে জীবনের প্রতিদিনের পথ পাড়ি দিতে হয়? এটুকু বোঝার জন্য তাকে কোনো তত্ত্বকথার আশ্রয় নিতে

হয় না। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা তাকে সমাজ-সংসার আর নারীর অবস্থানকে স্পষ্ট রূপে জানিয়েছে। 'আমি তোমাকে একদা বলেছিলাম যে তুমি একদিন আসবে এবং বিক্রি করতে আসবে; আমার সেই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে বলে আমি উৎফুল্ল, এ কারণে তোমাকে আমি দামের ওপরে এক হাজার বেশি দেব।' (সৈয়দ শামসুল, ২০০২ : ৮০) মাউফল তার উপলব্ধি থেকে যে ভবিষ্যদ্বাণী বাণী করেছে, তার সম্পূর্ণ সমীকরণ মিলেছে। মাউফলের জীবনের পুনরাবর্তনের ঘটনা তাকে সাময়িক আনন্দ দিলেও, পরে সে ব্যথিত হয়েছে আয়নার এই পরিণতি জন্য। বিবাহ নামক যে ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে পুরুষ তার যৌনতৃষ্ণা ও প্রেমাবেগকে সার্থক করেতে চেয়েছে; আর নারীকে জননীর বাৎসল্যরসে অবগাহন করে নিজেকে সম্প্রসারিত করেছে। যে অজানা-অচেনা পুরুষের সঙ্গে নারীকে বিয়ের বাঁধনে বেঁধে দেয়া হয়েছে, সেই পুরুষকেই নারী বলেছে প্রাণনাথ বা পতিধন। এই স্বামীর কাছেই সে সর্বস্ব সমর্পণ করে ধন্য হতে চেয়েছে। কিন্তু ধন্য হওয়ার বদলে প্রায়শ তাকে ব্যর্থতাকেই বরণ করতে হয়েছে বারবার। (সেলিনা, ২০০৮ : ১২৮) নারীর এই ব্যর্থতা ক্ষোভের কথাসাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় ধ্বনিতে হয়েছে। মাউফল আর আয়নাবিবি সেই সব বঞ্চিত আর পীড়িত নিম্নবর্গীয় নারীর প্রতিচ্ছবি। সমাজবদ্ধ জীবনের পারিবারিক পরিসীমায় এই সমস্ত নারীর প্রতিদিনের শোষণ-বঞ্চনা সাদা চোখের সাধারণ দৃষ্টিতে পরিদৃষ্ট হয় না। সাহিত্যের প্রতিকৃতিতে তার যথার্থ দৃষ্টিকোণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১৫.

আল মাহমুদ (১৯৩৬–২০২০) বাংলা সাহিত্যের অন্যতম একজন কবি ও কথাসহিত্যিক। কবিতার পাশাপাশি গল্প ও উপন্যাসে তিনি প্রদান করেছেন কাব্যের সৌকর্য ও শোভা। সমাজ ও সমাজস্থ মানুষের সমূহ উত্থান-পতন, স্বপ্ন-আশাভঙ্গের নৈপুণ্যময় জীবনঘনিষ্ঠ ছবি স্থান পেয়েছে তাঁর কথাসাহিত্যে। বর্ণনার কৌশলে তাঁর এককেটি কাহিনি-কাঠামো বস্তুঘনিষ্ঠ জীবনযন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি। লেখকের সাহিত্যিক প্রবণতা হিসেবে নারী-পুরুষের সম্পর্ক, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের কাজ ও কলার সাদৃশ্য ও সান্নিধ্য, প্রেম-বিচ্ছেদ প্রভৃতি বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে উঠে এসেছে। তাঁর প্রথম উপন্যাস *ডাহুকী* (১৯৯২) এর পরবর্তী এক দশক ধরে তাঁর ঔপন্যাসিক প্রতিভার বিকাশ হয়ে চলেছে। উপন্যাসের কাহিনির প্রসার সম্পর্কে লেখকের মতে উপন্যাস লিখলেই যে সেটা তিনশ পৃষ্ঠা হতে হবে, এর কোনো তাৎপর্য নেই। আঙ্গিকের দিক থেকে সেগুলোকে বড় গল্প মনে হলেও তাতে উপন্যাসের বিভঙ্গ আছে; প্রেম-প্রীতি, আনন্দ-বেদনা আছে। অনেকে এ ধরনের উপন্যাসকে মাইক্রো উপন্যাস বলে। তবে আমার যে কাজ, সেটা একজন কবিরই কাজ। ঔপন্যাসিকের এই ধারণা থেকে

তাঁর উপন্যাসের কাঠামো সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায়। আল মাহমুদের এমনই একটি উপন্যাস *নিশিন্দা নারী* (১৯৯৫)।

১৫.১

নিশিন্দা নারী মাত্র ত্রিশ পৃষ্ঠায় একটি স্বল্প কলেবরের উপন্যাস। আয়তনে ছোট হলেও ইতিবাচক বহুবিধ অভিধায় এটিকে বিশেষায়িত করা যায়। আল মাহমুদের কথাসাহিত্যে নারী, নারীত্ব ও নারী চরিত্রের মনস্তত্ত্ব সব সময় গুরুত্ব পেয়েছে। এর বাইরে রয়েছে নারী প্রকৃতির বর্ণনা, প্রকৃতির সঙ্গে নারীর তুলনা, পরিবার, সমাজে নারীর অবস্থান প্রভৃতি বিষয় এই উপন্যাসের প্রধান দিক। বাম রাজনীতির একজন সক্রিয় কর্মী আবদুল্লাহ মাঝির নিখোঁজ হওয়ার পর, তার যবুতী স্ত্রী নিশিন্দার একা একক সংগ্রাম এই উপন্যাসের আলোকিত দিক। নিশিন্দা দত্তখোলার চামারপাড়ার ঋষিদের মেয়ে। নিশিন্দাকে ভালোবেসে ধর্মান্তরিত করে বিয়ে করেছিল আবদুল্লাহ মাঝি। 'নিশিন্দা দত্তখোলার চামারের মেয়ে।' (আল মাহমুদ, ২০০৮ : ৩৩৪) তাদের সুখের সংসারে খাওয়াপরার অভাব থাকলেও ভালোবাসার অভাব ছিল না। নিম্নবর্গের এই নারীর স্বামীর অবর্তমানে সামাজিক নিরাপত্তা ও ক্ষুধার অভাব প্রকট আকার ধারণ করে। এই সংকটাপন্ন অবস্থায় স্বপ্ন আর বাস্তবতার মধ্য দিয়ে একটি রহস্যময় প্রেক্ষাপট নির্মাণ করেছেন ঔপন্যাসিক। দুই দিন অনাহারে থাকার পর দুধের সন্ধানে বাথানে গিয়েছিল নিশিন্দা 'ছোটো বয়েস থেকে নিশিন্দা তার বাপের গাই গরু চড়িয়ে, দুইয়ে অভ্যস্ত। গাইটার ওলানে হাত দিয়ে সে বুঝেছ, দুধে টৈটম্বুর।...মনে হচ্ছে টানলেই ফিনকি দিয়ে দুধের সূক্ষ্ম স্রোত নেমে আসবে।' (আল মাহমুদ, ২০০৮ : ৩৪০) নিশিন্দার মনে হতে থাকে গরুগুলো যেন বাক্সম্পন্ন। তারা যেন আবদুল্লাহর গোপন অস্ত্রভাণ্ডার সম্পর্কে জ্ঞত; সেই সঙ্গে তারা এও বলে যে তারা আবদুল্লার দলে নাম লিখাবে। এভাবে ঘুম আর জাগরণের মধ্য দিয়ে চেতন-অবচেতনের একটি রহস্যময় পরিস্থিতি তৈরি হয়। স্বামীবিহীন একা নারীর একক জীবনে বহু পুরুষের হাতছানি তাকে বিব্রত করেছে। তবে পুরুষ তার কাছে প্রশ্রয় পায়নি, তাদের চাওয়াগুলোকে সে ধারলো অস্ত্রের আঘাতে প্রতিহত করেছে। তার মতো সাহসী নারী বাংলা সাহিত্যে কম দেখা যায়। প্রথম দৃষ্টান্তে দেখা যায় পুলিশের টর্চের আলোকে চিহ্নিত করে সে বলেছে 'আগে ছতর থেকে বাতি নামান দারোগা সাব। আবদুল্লাহ কি আমার বুকের ভেতর লুকিয়ে আছে না-কি? বাত্তি নামান।' (আল মাহমুদ, ২০০৮ : ৩৩৪) ইট খোলার ম্যানেজার আবদুল্লার ভিটে জমি কিনতে এসে 'লোকটা আর মুহূর্তে বিলম্ব না করে নিশির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে বিছানায় কাত করে ফেলতেই নিশিন্দার হাত চলে গেল রাম দা'টার ওপর। সে দা'টা টেনে এনেই মুখ ও মাথা বরাবর একটা কোপ বসিয়ে দিল। ...লোকটা

'মাগো' বলে এক লাফে বিছানা থেকে নেমে চারণভূমির দিকে দৌঁড়াতে লাগল। (আল মাহমুদ, ২০০৮ : ৩৫৯) নিজেকে বাঁচাতে নারীর এই প্রতিবাদী রূপ তার চরিত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ সাবলীল। সমাজে ক্ষমতার একটি অর্থনৈতিক দিক আছে, আর আছে একটি পিতৃতান্ত্রিক দিক। নিশিন্দা দুই দিক থেকে ক্ষমতাশূন্য মানুষ কিন্তু মনের শক্তিতে সে সবকিছুর ঊর্ধ্বে। তাই দারোগাও তার কাছে যেমন পুরুষ, ইটখোলার ম্যানেজারও তেমনি। ক্ষমতা আর যৌনবিকার–মনুষ্যত্বের অবমাননায় হাত ধরাধরি করে চলে। পুরুষের লালসাকে সেই জন্তু ভেবে দমন করেছে নিশিন্দা। আর নিজের মধ্যে আত্মশক্তি অর্জন করে প্রবোধ দিয়েছে নিজেকে 'ভেতরে গুমরে উঠেছে একটি যুক্তি, আমি আবদুল্লাহর বৌ, আমার ইজ্জত বাঁচাতে আমি যা করেছি সেটাই এক অসহায় নারীর বাঁচার পথ। কি করবে আইন?' (আল মাহমুদ, ২০০৮: ৩৬০) নিশিন্দার জীবনের এই টুকরো টুকরো ঘটনার সমাবেশ তাকে এক আত্মশক্তিতে বলীয়ান নারীতে পরিণত করেছে। স্বামীহীন বিধবা এই নারীর সম্ভ্রম রক্ষার প্রচেষ্টা প্রসঙ্গে শহীদুল্লা কায়সারের *সারেং বৌ* উপন্যাসের নবিতুনের সংগ্রামী চেতনা স্মরণীয়। যে ধারালো অস্ত্রের সহযোগে নিজেই নিজের রক্ষক। কোনো অবস্থাতেই সে নিজেকে ও নিজের বাস্তুভিটাকে হস্তচ্যুত হতে দেয়নি। প্লটের পরিমিতিবোধ এবং বিবরণের সৌকর্ম '*নিশিন্দা নারী*' উপন্যাসটিকে অসাধারণত্বে উত্তীর্ণ করেছে। ঔপন্যাসিক সচেতনভাবে ছোট কলেবরে নির্মাণ করেছেন এই উপন্যাসটিকে। (ফজলুল, ২০২২ : ৪) এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে আল মাহমুদ চরিত্র নির্মাণে নারীকে সব সময় এগিয়ে রেখেছেন। নারীর অন্তর্গত সাহসী প্রত্যয়দীপ্ত আলোক শিখা চরিত্রকে ব্যঞ্জনাময় করে তুলেছে।

১৫.২

আল মাহমুদ তাঁর সাহিত্যচেতনায় স্বপ্ন, অভিজ্ঞতা মানসবিভ্রম, প্রেম-ভালোবাসা, যৌনতা, বিশ্বাসভঙ্গ ও বিশ্বাসের জটিল প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করেছেন। সংগ্রামী জীবনের প্রতিঘাত, অভিযাতনা আর আঞ্চলিক সৌষম্যে তিনি প্রস্তুত করেছেন চরিত্রের ভিতর। আর এভাবেই তিতাসের নিবিড় প্রকৃতি নদী-খাল-কাদামাটিতে লেপ্টে থাকা লোকভূমিকে অত্যন্ত আপন করে নিয়ে এসেছেন লেখক। শিল্প-সাহিত্যে সীমিত ভৌগোলিক পরিসীমা পেরিয়ে যায় মানবিক অন্তর্দহন। সেখানে কোনো সাহিত্যই আঞ্চলিক থাকে না, হয়ে ওঠে আন্তর্জাতিক। আল মাহমুদের কথা সাহিত্য যেন জীবনের ভয়াবহ কৌতুকের চকিত ছটা। সেখানে নিশিন্দা অনিন্দ্য নিদর্শন। সে নারী বলে থেমে থাকতে বা পিছনে হাঁটতে শেখেনি। সে নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে, প্রতিরোধ করতে শিখেছে পুরুষের লোলুপ দৃষ্টিকে। মানবিক বোধে উজ্জ্বল নিশিন্দা চিন্তাচেতনায় নিরাবেগ ও বাস্তববাদী। উপন্যাসের এই নারী

চরিত্রের সৃজন উৎসাহ থেকে ধারণা করা যায় লেখক পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়ানো শক্তির উদ্বোধন করেছেন এই চরিত্রের স্বভূমিতে। এই গবেষণায় নিম্নবর্গ নির্ধারণে অর্থনৈতিক অবস্থা যেমন মাপকাঠি হিসেবে বিবেচ্য; তেমনি পুরুষতান্ত্রিক প্রভাবের বলয়ে লৈঙ্গিক বৈষম্য বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। (মেহেদি, ২০০৮ :২০৪) গ্রামীণ সমাজে নারী ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের সঙ্গে এত বেশি যুদ্ধ করে যে তার নিজস্ব যে একটি যৌনজীবন থাকতে পারে, সে সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পরিসর পায় না। সেখানে বিয়ে একটি অর্থনৈতিক নিরাপত্তার বলয়। কোনো কারণে সেই পরিমণ্ডল যখন ভেঙে পড়ে, তখন তার ওপর বহুমাত্রিক লৈঙ্গিক নিষ্ঠুরতা প্রসার ঘনিয়ে আসে। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের মত অনুসারে নিম্নবর্গ যে নিজের কথা নিজে বলতে পারে না, তার প্রধান কারণ নারীর সামাজিক সীমাবদ্ধতা ও অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা। পুরুষতান্ত্রিকতার সমস্ত ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করে একজন নারী কীভাবে নিজের সাহস ও প্রেমে একনিষ্ঠ থেকেছে তারই জীবনালেখ্য নিশিন্দা হয়ে উঠেছে অসাধারণ (ইয়াহিয়া, ২০২০ : ৬৭)। নিশিন্দার মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব কাহিনিতে সময়-সমকাল-চরিত্র সবকিছুকেই জটিল ও প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে। যার ফলে লেখক চরিত্রের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সংকটগুলোকে যথার্থরূপে ফুটিয়ে তুলতে পারেনি।

১৬.

বাংলাদেশের উপন্যাসের ইতিহাসে শওকত আলী (১৯৩৯-২০১৯) একজন সচেতন, পর্যবেক্ষণধর্মী ও প্রত্যয়দীপ্ত লেখক। কথাসাহিত্যের দুই আঙ্গিকে তিনি সমান প্রতিস্পর্ধী হলেও, তাঁর প্রধান বিচরণক্ষেত্র রূপে অভিজ্ঞাত হয়েছে উপন্যাস। তাঁর সমগ্র উপন্যাসচেতনায় দুটি বিষয় প্রধান প্রবণতা রূপে এসেছে- প্রথমত, মধ্যবিত্ত শ্রেণির কথা, দ্বিতীয়ত, শ্রেণিসচেতনতা বা শোষণ-নির্যাতনের পটচিত্র নির্মাণ। এই সমস্ত অভিব্যক্তির মধ্য উপজীব্য হয়ে উঠেছে মধ্যবিত্তের ব্যবচ্ছেদ, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির শ্রেণিচরিত্র হয়ে ওঠা প্রভৃতি বিষয়াদি। তবে এই সমীক্ষার বাইরেও আছে তাঁর বহু বিচিত্র বীক্ষণে সমৃদ্ধ প্রতিভার সাক্ষর। সেখানে আঙ্গিকগত বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে আছে পটভূমি ও বিষয়বস্তুর বহুমাত্রিক অভিপ্রেতের অভিষেক। তার মধ্যে শওকত আলীর ইতিহাসকে পুনরুজ্জীবিত করা, ইতিহাসচর্চায় সচেতন দৃষ্টিভঙ্গির সফল প্রচেষ্টা তাঁর সাহিত্যচেতনার আরও একটি উল্লেখযোগ্য দিক। সাহিত্য সৃষ্টির প্রজ্ঞাময় পরিমণ্ডলে তিনি বরাবরই মানবজীবনের বিচিত্র রহস্যময়তার আয়ুধকে উন্মোচন করেছেন। এই সমস্ত প্রায় ব্যাখ্যাতীত এক অন্বয়ের ভেতর দিয়ে শওকত আলীর ঔপন্যাসিক সত্তার সামগ্রিক প্রতিষ্ঠা ঘটেছে।

১৬.১

বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে, ইতিহাসচর্চার ধারাপাত সূচনাকাল থেকেই বিরাজমান। সে ক্ষেত্রে প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন যাঁরা; ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) প্রমুখ কথাসাহিত্যিক। বাংলা উপন্যাসের, ঐতিহাসিক ধারার সূচিপত্র তাঁদের মননশীল অভিপ্রায়ে চেতনাপুষ্টি লাভ করলেও, তাতে অব্যক্ত থেকেছে সাধারণ মানুষের জীবনের কথা। ইতিহাসের প্রাখার্যময় সময়ে দাঁড়িয়ে ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের মনোজগতের নানা টানাপোড়নে ইত্যাকার পরিবেশ-পরিস্থিতি নিয়ে উপন্যাসদেহে অতীতকে সংস্থাপন করা যেমন জটিল, তেমনি কঠিন। সৃষ্টিশীল সাহিত্যের অভ্যন্তরে ইতিহাসের ফসিলকে প্রাণবান করে; তাকে জাগ্রত রূপ দেয়া শক্তিধর প্রতিভার প্রত্যয়। ঔপন্যাসিক শওকত আলী সেই জটিল ও দূরূহ কাজটি অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে সমাপন করেছেন তাঁর *প্রদোষে প্রাকৃতজন* উপন্যাসে। এখানে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার একটি সুদীর্ঘকালের ঐতিহাসিক ছায়া পড়েছে; সেই সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে সমকালীন সাধারণ মানুষের জীবন, যারা ছিলেন ইতিহাসে সব সময় অবাঞ্ছিত ও অপাঙক্তেয় (খোরশেদ, ২০১১ : ১১৭)।

১৬.২

প্রদোষে প্রাকৃতজন (১৯৮৪) বাংলাদেশের উপন্যাসের বিস্তীর্ণ পথে একটি ধ্রুপদী সংযোজন। কারণ এই উপন্যাস কোনো আবেগতাড়িত সময়ের শৈল্পিক সংযোজন নয়, ইতিহাস- ঐতিহ্যে-সংস্কৃতির বিমূর্তরূপের বিদ্বৎকল্প; যা জগৎ, জীবনের স্পর্শযোগ্য অতীতের নিরপেক্ষ শিল্পরূপ। প্রতিটি উপন্যাস একটি স্বয়ম্ভু, স্বতন্ত্র শিল্পমাধ্যম; যেখানে প্লট-পটভূমি, কাহিনি-আখ্যান আর জনসম্পৃক্তার ত্রিবেণীসঙ্গমের ভেতর দিয়ে প্রকাশ ঘটে প্রবাহমান শৈল্পিক সংযমের। বাংলাদেশের উপন্যাসশিল্পের বিপুল সম্ভারের মধ্যে *প্রদোষে প্রাকৃতজন* অসাধারণ এক শিল্পপ্রয়াসের স্বর। উপন্যাসটিতে বাঙালির প্রদোষকালীন সময় হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত সেনবংশের সর্বশেষ রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালের অন্তিম মুহূর্তটিকে। সেন রাজত্বের ক্ষীণ, ভগ্নদশায় সামন্ত-মহাসামন্তদের দৌরাত্ম্য আর উৎপীড়নে অতিষ্ঠ জনজীবনের সাহিত্যিক দলিল এই উপন্যাস। বাংলায় তুর্কি আক্রমণ অত্যাসন্ন এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায় ও অন্ত্যজ প্রাকৃত জনগোষ্ঠীর প্রতিরোধ সংগ্রামের যে পটভূমি তার ঘটনাংশ এখানে বলয়িত হয়েছে (শামসুন, ২০১৬ :২৭২)। বিশ

শতকের শেষাংশে দাঁড়িয়ে সুদূর পেছনের ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে জনজীবনের আঁধারময় জীবনে আলোকক্ষেপণ করেছেন লেখক। এই উত্তাল সময়ে গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষ, প্রান্তিকজন কীভাবে হয়েছিল ভূমিছাড়া, হয়েছিল উদ্বাস্তু। পাশাপাশি সংক্ষুব্ধ সময়ের জটিল আবর্তে আটকে পড়া নর-নারীর বিচিত্র সম্পর্কের টানাপোড়েনে কীভাবে রক্তাক্ত হয়েছিল; সে সবের নানা মাত্রিক বুনন-বিন্যাসে গড়ে উঠেছে উপন্যাস *প্রদোষে প্রাকৃতজন*। ইতিহাসের প্রদোষকালে ব্রাত্যজনের অস্তিত্বের সংকট উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিষয়। সংকটের শুরু হয়েছে একজন ব্রাত্যশিল্পীর স্বাধীন চেতনার মধ্যে দিয়ে, তা বিকশিত হয়েছে সামগ্রিক পরিসরের বৃত্তান্তে। মৃৎশিল্পী শ্যামাঙ্গের স্বাধীন শিল্পকৃতি ব্যাহত হয়েছে গুরু বাসুদেবের তিরস্কারে। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে সমকালীন রাষ্ট্র ও সমাজের সঙ্গে স্পষ্ট হয়েছে নিম্নবর্গের সম্পর্ক; অবস্থা ও অবস্থান ।

১৬.৩

বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গের কথা প্রথম এসেছে চর্যাপদে, বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন হিসেবে যা সর্বজনবিদিত। শাসকগোষ্ঠীর শাসন, শোষণ আর নিপীড়ন সত্ত্বেও এই অন্ত্যজ, ব্রাত্য জীবন লুক্কায়িত থাকেনি। প্রতিদিনের জীবনযাপনের তুচ্ছতার মধ্যেও তার সূচনা হয়েছে। *প্রদোষে প্রাকৃতজন* উপন্যাসে ইতিহাসের আলো-অন্ধকারের যুগে নিজেদের অস্তিত্বের জয়গানকে সরব করার পথ খুঁজে পেয়েছে নিম্নবর্গ। ইতিহাস আর সাহিত্যের বোঝাপাড়ার মধ্য লেখক প্রতিষ্ঠিত করেছেন নিম্নবর্গের এই মানুষগুলোর নিজস্ব অবস্থান, স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্বকে। শ্যামাঙ্গের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের কাহিনিলোকে ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। ব্যক্তি শ্যামাঙ্গের শিল্পসত্তার স্বাধীন অভিভাষণ কাহিনিচক্রের প্রদোষে উপস্থাপন করলেও; পরতে পরতে তাকে ছাড়িয়ে চলেছে অন্যসব চরিত্র। সেদিনের সমাজ-রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে নারী একান্ত অন্তঃপুরবাসিনী হলেও, তার ব্যক্তিত্বের সম্ভাষণ করেছে লীলাবতী ও মায়াবতী নামক দুজন নারী। যে জীবনতৃষ্ণা আর জীবনাকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব নিয়ে উপন্যাস সাহিত্যের যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সময়ের এই দ্বন্দ্ব মুখরতার তাৎপর্য বিস্ময়কর। কারণ শিল্প কালনিরপেক্ষ নয়; বরং দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতির মধ্যে শিল্প নির্মাণের মনোভূমি তৈরি হয়। তবে ইতিহাসের বিক্ষুব্ধ সময়ে রাজরাজড়াদের জীবনকথা লিপিবদ্ধ থাকলেও সাধারণ, অন্ত্যজ ও ব্রাত্য শ্রেণিকে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা কেউ উপলব্ধি করে না। সেই অন্ত্যজের মধ্যে যারা অন্ত্যজ, নিম্নবর্গের মধ্যেও যারা নিম্নবর্গ তাদের জীবন, জীবনাকাঙ্ক্ষাও যে বিপুল বিশৃঙ্খলায় পতিত হয়, সে কথা কারো ভাবনায় আসে না। সেই অভাবিত অভিপ্রেত পরিচর্যা পেয়েছে এই উপন্যাসের পটভূমিতে। গভীর মমত্ববোধ ও প্রগাঢ় জীবনাকাঙ্ক্ষার

অসাধারণ শিল্পশক্তি নিয়ে ঐ সময়ের নারীর নীরব অবস্থানকে সরব করে তুলেছেন ঔপন্যাসিক শওকত আলী।

১৬.৪

প্রদোষে প্রাকৃতজন উপন্যাসে ব্যক্তি চরিত্র অপেক্ষা বড় চরিত্র হয়ে উঠেছে, সময় ও সমকালীন পরিপ্রেক্ষিত। তারপরও আপৎকালীন সময়ের বৃহৎ প্রেক্ষাপটে ব্রাত্যজনের সংকট বড় হয়ে উঠেছে ; অস্তিত্বসংকটের সন্ধিক্ষণ যাদের মধ্য দিয়ে দৃশ্যমান হয়েছে; তারা যথাক্রমে, শ্যামাঙ্গ-লীলাবতী, বসন্তদাস-মায়াবতী, মিত্রানন্দ, কৃষ্ণা, ছায়াবতী, বিভাবতী প্রভৃতি নর-নারীর কায়ার মধ্য দিয়ে। ইতিহাসের দূরারোপিত আলোয় এই ব্রাত্য নর-নারীর জীবনাকাঙ্ক্ষা গুরুত্ব না পেলেও; তাদের জীবনের কারুণ্যময় পথচলা, জীবনের স্রোত থেকে হারিয়ে যাওয়া, চির-অন্ধকারে বিলীন হওয়া, সবকিছুই ঐ সংক্ষুব্ধ সময়ের অভিঘাত। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সমস্ত পরিসেবার বিপত্তিকাল নারীর জীবনকে আরো অধিক ওষ্ঠাগত করে তোলে। কাহিনিপর্বের সূচনাকালে নিম্নবর্গের একজন ডোম সম্প্রদায়ের নারীর প্রতি সামন্ত হরিসেনের সৈন্যরা যে দলন-নিগ্রহ চালায়, তা মানবসভ্যতার নিকৃষ্টতম শাসন প্রক্রিয়া। নিম্নবর্গের পরিপ্রেক্ষিতে অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের নারী গৃহকর্মের বাইরে উৎপাদনমূলক বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকে। সে-কারণে অন্তঃপুরবাসী নারীর তুলনায় তারা মুখরা ও চঞ্চল প্রকৃতির হয়ে থাকে :

> কুসুম তার স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় বলে ওঠে, অরে ছিনাল পুত্র, আমরা যে তোর পিতার কর্মস্থলের দ্বারদেশ থেকে তোকে টেনে এনে জগৎ দেখাবার সময় কর দিয়ে এসেছি, সে সংবাদ কি তোর মা তোকে জানায়নি? ...অতঃপর যা ঘটতে থাকে তার বর্ণনা দেওয়া মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য । ভয়ানক উত্তেজিত এবং উৎক্ষিপ্ত মানুষ মার মার ধর ধর করতে থাকে। (শওকত, ৪৯ : ২০১৬)

পিপ্পলী হাটে সংঘটিত ঘটনার সকরুণ মূল্য দিতে হয়েছিল ডোম সম্প্রদায় ও পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষকে। নিম্নবর্গের মানুষের সংস্কার সংস্কৃতি উচ্চবর্গের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ নাই হতে পারে! তার অর্থ এও নয় যে শাসকবর্গকে কদর্যতার সীমাকে অতিক্রম করতে হবে। নিম্নবর্গের জীবনে উচ্চবর্গের অত্যাচার-অবদমন-আধিপত্যবাদের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক আগ্রাসনের সূচনা ঘটে। রাজনৈতিক অশনিসংকেতে রাজনীতি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জীবন যত না ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তারও অধিক অপচায়িত হয় প্রান্তিক মানুষের জীবন। উপন্যাসের এই পটভূমিতে প্রধান দুজন নারীর উপস্থিতির আধিক্য লক্ষ করা যায়। তার মধ্যে প্রথমজন লীলাবতী, তাকেই কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র বলা যায়, আর আছে তার সখী মায়াবতী। এই দুই নারী উজুবট গ্রামের কন্যা। পিতা হরকান্ত আর আছে মাতুল সিদ্ধপা, এ ছাড়া

সংসারে আর কোনো আপনজন নেই তার। রাষ্ট্রবিপ্লবের সংকটকালে যুবতী কন্যা নিয়ে পিতা হরকান্ত ও মাতুল সিদ্ধপা উভয়ই চিন্তিত : 'ভ্রাতঃ দিনকাল ভালো নয়–যুবতী মেয়েরা ক্রমেই অরক্ষণীয়া হয়ে পড়েছে–তোমার সৌভাগ্য যে রাজপুরুষের দৃষ্টি তোমার কন্যাটির উপর পড়েনি।' (শওকত, ২০১৬ : ৩৯) সমাজ-সংসারের কাছে নারী যে পরিচয়, সেখানে স্বজনের চিন্তিত না হয়ে উপায় নেই। তারপর বিবাহিত কন্যা যখন স্বামীর সংসারে অবস্থান না করে, পিতৃগৃহে থাকে, তখন তা ঐ নারীর জন্য প্রথাগতভাবে প্রশ্নের জন্ম দেয়। তারপর যদি তার চরিত্রে যদি কোনো অবাঞ্ছিত কালিমার ছায়া পড়ে, তাহলে ঐ নারীর জীবন নিয়ে বেঁচে থাকা সংশয়কর হয়ে ওঠে।

১৬.৫

লীলাবতীর বৈবাহিক জীবন এক বিষাদময় অভিজ্ঞতায় ভরা। বিবাহের পূর্বে স্বামী সম্পর্কে কোনো জানাশোনো না থাকায় তার অস্বাভাবিক আচরণের ব্যথাভার তাকে কাতর করে তুলেছিল। ফুলশয্যার রাতে স্বামী অভিমুন্যর অযৌক্তিক অভিযোগ ও প্রশ্নবাণ স্বামীর প্রতি অশ্রদ্ধার সঞ্চার করলেও সে নীরব ছিল :

> অতি মৃদুস্বরে সে জানতে চেয়েছিলো, কি বিশ্বাস হয় না আপনার? উদভ্রান্ত দৃষ্টিতে মুখপানে চেয়েছিলো অভিমুন্য–আর বলেছিলো, বিবাহে বিশ্বাস হয় না, নারীতে বিশ্বাস হয় না, তোমাকেও বিশ্বাস হয় না।......লীলার আর সন্দেহ থাকে না। বদ্ধ উন্মাদের হাতে তুলে দিয়েছেন তাকে তার পিতা। এর চেয়ে যে মরণ ছিলো ভালো। সে স্বামীর প্রলাপ শুনেছিলো এবং প্রতি প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলো–হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। যতোবার প্রশ্ন ততোবার হ্যাঁ। অভিমুন্য দাস হা হতোস্মি, আমার ভাগ্যে এই ছিলো, বলে শয্যায় পতিত হয়। ঐভাবেই তার অতিক্রান্ত হয়ে যায় কুসুম শয্যার রাত্রিটি। (শওকত, ২০১৬ : ৪০)

নারীজীবনের খেরোখাতা ছোট ছোট রোজনামচায় ভরা, সমাজের অনেক পর্যায়ে তাকে পরীক্ষা দিতে হয়। লোকচক্ষুর অন্তরালে তাকে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয় স্বভূমি নির্মাণের আশায়। সমাজ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা ও তার উৎস সন্ধান করলে পৌঁছে যাওয়া যায় সেই সব পূর্বসূরীদের কাছে– যাঁদের নিরলস আত্মবীক্ষণ তাড়িত করেছে সমাজে নারীর অবস্থান সম্পর্কে। লীলাবতীর আত্মসমীক্ষার মধ্যে, ব্যক্তিমানসের ওপর লিঙ্গবৈষম্য ও বিভাজনের অভিঘাত কখনো এককভাবে, কখনো যৌথভাবে পড়েছে। কেননা পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর বেঁচে থাকাটাই স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াই করে। এই 'প্রতিলোম' অস্তিত্বে অস্মিতাবোধ বেঁচে থাকে নিয়ত সংগ্রাম করে (যশোধরা, ২০১২ : ৫৬)। এই সংগ্রামের কষ্টিপাথরে যাচাই করে তবে অন্দরমহলের দরজা ঠেলে বেরিয়ে আসে নারীর নিজের দেখা জীবনের চেনা পথ। প্রতিটি নারীর অন্তরসত্তায় আত্মপ্রত্যয়ের সেই জিয়নকাঠি লুকানো আছে। সেই

চাবিকাঠি দিয়ে নারী জীবনের ক্লান্তিকর অবসন্ন পথকে পাড়ি দেয়। লীলাবতীকেও সেই পথ পাড়ি দিতে হয়েছে :

> তুমি গবাক্ষ পাশে কেন দাঁড়িয়েছিলে, বলো, কি দেখছিলে? পুষ্পবতীর স্বামী ভীমনাথকে? তোমার তাকে ভালো লাগে? তার সান্নিধ্যে যেতে চাও, তাই হবে।... কখনও আবার ঊরুদেশে হাত রেখে জানতে চাইতো, লীলা, এখানে কেন নখরাঘাতের চিহ্ন নেই? সেই ব্রাহ্মণ কিশোর কি নাগর রাখতো না? অবশেষে লীলাবতী পিতৃগৃহে এলো। এবং সেই যে এলো তারপর বৎসরাধিককাল হতে চললো অভিমন্যুর কোনো সংবাদ নেই। (শওকত, ২০১৬ : ৪১)

এই সমস্ত পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে একজন নারীকে দাম্পত্য জীবনের সামাজিক রীতিনীতিকে পরিচালিত করে চলতে হয়। যে নীরবতা আর নৈঃশব্দ্যকে আশ্রয় করে নারী জীবনকে যাপন করে, তা সবসময়, সব কালে একইভাবে চলে। নারীত্বের সামাজিক চেহারা এরকমই হয়ে থাকে; এর অন্তর্নিহিত কৌশল সাধারণের অজ্ঞতার আড়ালে থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চলে। এই ধরনের সামাজিক ঐতিহ্য আসলে, সামাজিক মৌলবাদের নামান্তর। নারীর শরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করায় যার প্রধান অভীষ্ট। যে রাষ্ট্রব্যবস্থা নারীর জীবনকে প্রথার নিগড়ে, শোষণের নিগড়ে, বাঁধা ছাড়া অন্য কোনো ভূমিকা রাখে না; তার সম্পর্কে নারীর কোনো সদর্থক ভাবনা তৈরি হয় না। তাই লীলাবতীর মনে হয়েছে :

> রাষ্ট্রবিপ্লব সম্পর্কে তার ধারণা নেই, যুদ্ধ কাকে বলে তাও সে কল্পনা করতে পারে না। তবে আসন্ন কোনো বিপদের আশঙ্কা যে তার মাতুল করছে, সেটা সে বুঝতে পারে এবং সে জন্য তার যে স্বামী অবস্থান করা উচিত, সেটা বুঝতেও তার অসুবিধা হয় না। কিন্তু এইখানেই তার বিদ্রোহ । প্রলয় যখন হবে তখন কে বাঁচবে, কে মরবে, তার কোনো স্থিরতা নেই। বাঁচবো বলে কৌশল অবলম্বন করলেই যে বাঁচা যাবে, তার কি কোনো নিশ্চয়তা আছে? সুতরাং ও চেষ্টা কেন? সে স্থির করে পিতৃগৃহ ত্যাগ করে সে কোথাও যাবে না। (শওকত, ২০১৬ : ৪১)

খ্রিস্টাব্দের বারো-তেরো শতকের পুনর্ভবাকূলের বাংলার যে জনজীবন; সেই জীবনে লালীবতীর অন্তরাআত্মায় লেখক নির্মাণ করেছেন নারীর চেতনা, প্রেম-কাম-ভোগ-দ্রোহ সমস্তরই প্রতিফলন। প্রতিবাদহীন নিম্নবর্গের নারীর যে ধারণা সমাজে প্রতিষ্ঠিত, তা যে সর্বাংশে সত্য নয়; তার প্রমাণ লীলাবতীতে নিহিত। আত্মমর্যাদাহীনতার যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে লীলাবতীর সংবেদনশীল মন। পিতা এবং মাতুলের কথার বা ভাবনার প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করার সক্ষমতা তার না থাকলেও, বৈবাহিক জীবনের যে অপমান সে অভিমুন্যর দ্বারা সে হয়েছে, তার স্মৃতি জীবনকালে কখনোই সে বিস্মৃত হবে না। এভাবে শোষিতের, নিম্নবর্গের মৌন প্রতিবাদ, অদৃষ্ট অশ্রুত থেকে যায় ; চাপা পড়ে

যায় ক্ষমতাসীন আর উচ্চবর্গের ডিসকোর্সের অন্তরালে। সে দিনের যে বাংলা, সেখানে কৈলীন্যপ্রথা-সতীদাহ-সহমরণ সবই ছিল প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত। সেখানে নারীর নিজস্ব কোনো মতামত না থাকলেও উজবুট গ্রামের লম্পট অভিমুন্যর পরিত্যক্ত স্ত্রী লীলাবতী বোধগম্যতায় ধরা দিয়েছিল সবকিছু স্বচ্ছ জলের মতো। গায়ত্রী স্পিভাক নিম্নবর্গ সম্পর্কীয় প্রবন্ধসমূহে নিম্নবর্গীয় নারীর অবস্থান আর অক্ষমতার সূত্রগুলো ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথা আর অনুশাসনের নিগড়ে বাঁধা সমাজে প্রতিনিধিত্বহীন, ভাষাহীন, নারীর সীমাহীন অসহায়ত্বের কথা উত্তর-ঔপনিবেশিক সাহিত্যেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রপঞ্চ। ইতিহাসের পরতে পরতে আঁকা প্রাকৃত নারীর অন্তর্গত বেদনাকে সত্যিকার ভাষ্য দিয়েছেন ঔপন্যাসিক।

১৬.৬

স্বামী ছাড়াও লীলাবতীর জীবনে আরও একজন পুরুষের আগমন ঘটেছে; যাকে কেন্দ্র করে সমগ্র উপন্যাসের কাহিনিতে প্রকাশিত হয়েছে লীলাবতীর লীলাময়তা। মৃৎশিল্পী শ্যামাঙ্গ গুরুদেব বাসুদেব কর্তৃক তিরস্কৃত হয়ে উন্মনা হয়ে ঘোরার পথে তার সঙ্গে দেখা হয় লীলাবতীর। উপন্যাসের এই প্রেক্ষাপটে লেখক লীলাবতীর চরিত্র ও উৎপ্রেক্ষাকে দেখাতে চেয়েছেন একটি নারীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। লীলাবতীর জীবন উপস্থাপন ও বিশ্লেষণের মধ্যে লেখকের নিম্নবর্গ সম্বন্ধীয় পারঙ্গমতা যেমন অন্তর্নিহিত আছে; পাশাপাশি এই উপন্যাসের চারিত্রিক কার্যকারিতার বীজ রোপিত হয়েছে এখানে। লীলাবতী তার জীবনের সজীব ও স্বতঃস্ফূর্ত চাহিদার কাছে হার মেনেছে শ্যামাঙ্গ। তার ব্যক্তিত্বের আলোক রেখা তাকে ঋজু করে রেখেছে সব সময়। সে সমাজ-সংস্কারের কাছে মাথা নোয়াবার পাত্র নয়। স্বামী অভিমন্যুর কদর্য মানসিকতার কারণে ভুলক্রমেও তার নাম স্মরণে আনেননি। উপন্যাসে লীলাবতী চরিত্রের জীবনকে গভীরভাবে অনুধাবন, চরিত্রের মনোগভীরে প্রবেশের সক্ষমতা, তাদের পরমসূক্ষ্ম ও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাকে উন্মোচন ও বিশ্লেষণের দক্ষতার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে ঔপন্যাসিকের প্রাজ্ঞতার পরিপূর্ণতা (আনোয়ার, ১০৫ : ২০১৬)।

১৬.৭

ইতিহাস আর সাহিত্যের বোঝাপড়ার মধ্যে *প্রদোষে প্রাকৃতজন* একটি ভিন্নমাত্রিক সংযোজন বলে বিবেচিত হতে পারে। উপন্যাসের সৃষ্টি হয়েছে ব্যক্তিমানুষের স্ফুরণ উৎস থেকে, সেখানে নারী-পুরুষ উভয় ব্যক্তিমানুষের উদ্ভাসন ঘটতে পারে। উজবুট গ্রামের ধ্বংসলীলা শ্যামাঙ্গ আর লীলাবতীর কাছাকাছি আসার পথকে প্রসারিত করে দেয়। শ্যামাঙ্গের শিল্পসত্তার দার্শনিক দ্বন্দ্ব তাকে বিবাগী

করেছিল; সেই অবিন্যাস্ত পথের পরিভ্রমণে লীলাবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও পরবর্তীতে প্রণয়। অন্যদিকে লীলাবতীর অনাদৃত জীবনের সর্পিল পরিসরে শ্যামাঙ্গের বন্ধুত্ব, পরিজন পুরুষের প্রয়োজন খুব জরুরি ছিল। পিতার মৃত্যু তার জীবনকে আরো সংকটাকীর্ণ করে তোলে। মানবহৃদয়ের হাহাকার যত তীব্রই হোক, সময় ও সমকাল তো থেমে থাকে না। লীলাবতীও পিতৃশোক পালনের সময় পায় না; কারণ সময় নিজেই চলেছে শোকাবহতার মধ্য দিয়ে। সেখানে ব্যক্তিগত আর্তিকে বড় করার সুযোগ নেই। ঔপন্যাসিকও তাঁর চলার গতিকে দ্রুত থেকে দ্রুততর করে এগিয়ে যান অবধারিত পথের ক্রম উন্মোচনে। যেখানে সময় আসে ব্যর্থ দাম্পত্যর বিকারগ্রস্ত বিস্মৃতি পার হয়ে নতুন করে বাঁচার; নতুন জীবনের সন্ধান করার। নানান দ্বন্দ্বের পারিপার্শ্বিকতাকে অতিক্রম করে লীলাবতী-শ্যামাঙ্গের জীবনে আসে নতুন দিনের স্বপ্নের ভোর। শ্যামাঙ্গের আন্তরাআত্মায় তা বহুদিন পূর্বে আবির্ভূত হলেও, লীলবতীর ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তার কাছে তা প্রশ্রয় পায়নি। শ্যামাঙ্গের নির্মিত পুত্তলিকায় লীলাবতীর অবয়বের ছাপ দেখে প্রথমে কিছুটা আশ্চর্য ও পরবর্তিতে বিরক্তি প্রকাশ করে লীলাবতী :

> কাননভূমি নির্জন। লীলাবতী একটি পুত্তলিকা হাতে নিলো, দেখলো সেটি, অতঃপর সেটি রেখে পুনরায় অন্য একটি পুত্তলিকা তুলে নিলো, সেটিও দেখলো। সম্মুখেই শ্যামাঙ্গ অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে –সেদিকেও বার দুয়েক দৃষ্টিপাত করলো। লীলাবতীর অবয়ব ফুটে রয়েছে পুত্তলিকাগুলিতে, সম্ভবত সেই কারণেই তাঁর দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে প্রকাশ পাচ্ছিল লজ্জা এবং অপরাধবোধ। শ্যামাঙ্গকে ঐভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার অন্তরাআত্মা জ্বলে গেলো। বললো, কী দেখছেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে? তুমি বড় কৃশ হয়েছো। কেনো, স্থুলা হলে উত্তম হতো? দেখতে আরও আকর্ষণীয়া হতাম? নতুন একটি পুত্তলিকা গড়তেন? (শওকত, ২০১৬ : ১১১)

জীবনের প্রথম পরিসরে পুরুষের যে বিকৃত পরিচয় লীলাবতী পেয়েছে; তাতে পুরুষকে বিশ্বাস করতে, আস্থা রাখতে সে সংশয় দীর্ণ। নিজের চেনা পরিমণ্ডের বাইরের একজন মানুষ শ্যামাঙ্গের প্রতি তার হৃদয় আসক্তি তৈরি হলেও অত্যন্ত সন্তর্পণে সুপ্ত রেখেছে তাকে। আর সেই বাসনার বহিঃপ্রকাশকে রুদ্ধ করতে শ্যামাঙ্গের প্রতি তার অহেতুক রূঢ়তার প্রকাশ। সমাজ নারীর জন্য যে শিক্ষা-দীক্ষার অনুশাসন নির্মাণ করে, তার বাইরে প্রতিস্পর্ধী হওয়ার শক্তি ও সাহস কোনোটাই থাকে না তার। নিজেকে দমন করার জন্য লীলবতী তার অস্তিত্বের বহিঃপ্রদেশকে আবৃত রাখে শক্ত খোলসে। যাতে করে তার দুর্বলতার সুযোগ শ্যামাঙ্গ বা কোনো পুরুষ নিতে না পারে। ভারতীয় নারীর জন্য মনুসংহিতা বিধান ছিল অলঙ্ঘনীয়, যেখানে বলা হয়েছে স্বামী পুণ্য অর্জনের জন্য বিদেশে গেলে স্ত্রী তার জন্য আট বছর অপেক্ষা করবে, উচ্চশিক্ষার্থে গেলে ছয় বছর এবং অন্য স্ত্রীর কাছে গেলে তিন বছর। স্ত্রীর পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে নীরব থেকেছেন মনু (মল্লিকা, ২০২০: ৮৩)। মনুর নীরব থাকার মধ্যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়।

১৬.৮

কোনো নারী একবার পুরুষের সঙ্গে বৈবাহিক নিবন্ধনে আবদ্ধ হলে তার মুক্তির কোনো পথ নেই। শ্যামাঙ্গ চাইলেও লীলাবতীকে নিয়ে নতুন জীবন গড়ার কোনো বিধান সামাজ ও ধর্মীয় পথে খোলা নেই। সময়ের নিষ্ঠুরতায় লীলাময়ীর একজন পুরুষ অভিভাবক অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অন্যদিকে আশ্রয়দাতা শীলনাথ তাকে সাধনসঙ্গী করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। শ্রেণিবৈষম্য ও লিঙ্গবৈষম্যে পরিপূর্ণ সমাজে নারী কোথাও, কোনো সময়ই নিরাপদ নয়। সেন, পাল আর তুর্কি শাসকদের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কবলে পড়ে রাষ্ট্রকাঠামো যখন দোদুল্যমান, তখন নিম্নবর্গ ও নারী সর্বাপেক্ষা পিষ্ট হয়। সমুপস্থিত প্রদোষকালে সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতির ত্রিমুখী তীরে বিদ্ধ হয়ে শক্তিহীন, সংহতিহীন নিম্নবর্গ পঙ্গু ও বিকারগ্রস্ত। জনজীবনের জনমানসে কী ভয়াবহ বিনষ্টি নেমে আসতে পারে, তার ইতিহাস আশ্রয়ী বিবরণ এই উপন্যাস ও তার পাত্রপাত্রী। তা শুধু উপন্যাসের তেরো শতকের গোড়ার কথা নয়; তা চিরকালীন সত্যের বার্তাবহ। তাই ইতিহাস সমাজ ও ব্যক্তির পারস্পরিক অন্বয়ের উদ্দেশ্যে মাতুল সিদ্ধার্থ যোগী নিলেন এক তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত :

> গ্রামের প্রান্তে উপনীত হলে সিদ্ধপা দাঁড়ালেন। ঊর্ধ্বাকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, নক্ষত্রমালা সাক্ষী, রাত্রির অন্ধকার সাক্ষী, তোমার আমার নিঃশ্বাস বায়ু সাক্ষী–শ্যামাঙ্গ, লীলাবতীকে আমি তোমার হাতে সমর্পণ করলাম, ওকে তুমি রক্ষা ক'রো। তোমাদের বিবাহ হবে না–কেননা শাস্ত্রের কোনো বিধান নেই যে তোমাদের বিবাহ হয়–এ বড় দুষ্কাল বৎস, জানি, তোমাদের সংসার হবে না–তথাপি আমি তোমাদের মিলিত করে দিলাম– পারলে যোগব্রত পালন ক'রো, শিব তোমাদের মঙ্গল করুন। (শওকত,২০১৬ : ১১৪)

শাস্ত্র নারীর জন্য, নিম্নবর্গের জন্য কোনো বিধান দেয় না। শাস্ত্রের সৃষ্টি উচ্চবর্গের জন্য, উচ্চবর্গের সমস্ত অমানবিকতাকে ন্যায্যতা দিতে। লেখকের জীবনপ্রত্যয়ী অভিপ্রায়ে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে নিম্নবর্গের প্রতি উচ্চবর্গের অভিসন্ধির দুরাচারী পর্যবেক্ষণসমূহ। হলায়ুধ যেন নিম্নবর্গের মানুষদের নিয়তিকেই নিশ্চিত করে বলেছেন, 'ব্যক্তির ইচ্ছায় কিছু হয় না-সমস্ত রাষ্ট্রের প্রয়োজনে।...কর্মফল থাকবেই-দাসও থাকবে, প্রভুও থাকবে। প্রভু যে শাসন করে সে যেমন কর্মফল, দাস যে শাসিত হয়, সেও কর্মফল।' (শওকত, ২০১৬ : ১২২) শাসন প্রণালিতে উচ্চবর্গ ও সামন্ত শ্রেণির সুবিধামতো তুলে দেওয়া হয় প্রাচীর, যেন জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে নিম্নবর্গের জীবনে; তেমনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের তৈরি শাস্ত্রে নারীর ভাগ্য তারাই নির্মাণ করে ও নিয়ন্ত্রিত করে। মাতুলের যথার্থ

দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে লীলাবতীর জীবনের প্রবাহ একটি গতি পায়। তারপরও সময়ের যে বিপর্যস্ততা তাকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল তার নিগড় থেকে মুক্তি ছিল না তাদের।

> আমি তোমাকে মনে স্থান দিয়েছি সেই প্রথম সাক্ষাতের দিন থেকে, মনে আছে তোমার, ...কিন্তু তুমি এলে আমার সম্মুখে, আর জীবনের অর্থ আমার নিকট অন্যরূপ হয়ে গেলো। এখন আমার পূর্বজীবন বলে কিছু নেই, আমি মনে করি, সেই জীবন উজবুটে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। তুমি ব্যতীত এখন আমার কেউ নেই। (শওকত, ২০১৬ : ১১৫)

লীলাবতীর এই সাহসী সম্ভাষণ শুধু তার প্রণয়গাথার অব্যক্ত বাসনারাজির প্রকাশই নয়; পাশাপাশি স্বাধীনচেতা, প্রখর ব্যক্তিত্বের এক অন্ত্যজ নারীর প্রজ্বলিত প্রদীপ্ততার সাক্ষরও বটে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীর মনোদৈহিক বৃত্তির ওপর যে বিধান আরোপ করে, সেখানে লীলাবতী সমস্ত সংস্কারকে বিরুদ্ধাচার করে ব্যক্ত করেছে নিজের মনোগত প্রত্যয়। যা অন্ধকার সংস্কারাচ্ছন্ন সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে এক নারীর নীরব লড়াকু মনের সাহসী পরিচয়। কাহিনির পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে লীলাবতী আরো অধিক উদীপ্ত ও জীবনমুখী ভাবনার পরিচয় দিয়েছে। লীলাবতীর দীপ্তিমুখরতা চরিত্র হিসেবে তাকে বাংলা উপন্যাসের অনন্য নারীবাদী নির্মিতিরূপেও প্রতিষ্ঠিত করেছে। সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের নির্মাণে লেখকের ইতিহাস ও অন্ত্যজ জীবনের প্রতি প্রাগ্রসর ও প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় সদা উদ্দীপ্ত।

১৬.৯

নারী শরীরের সৃষ্টিশীলতায় যেমন তাকে সভ্যতার কারিগর বলা যায়, তেমনি তার আকৃতির অবিনাশী দাহ, তার জীবনের বড় দহন হয়ে উঠেছে। পুরুষের লোলুপ আধিপত্য আর আগ্রাসনে নারী জীবনের পথ রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে বারবার। জীবনের পরতে পরতে সেই বিরূপ অভিজ্ঞতা পুরুষকে বন্ধুরূপে বিশ্বাস করতে দ্বিধান্বিত করেছে। সেই ভয়-সংকোচ-সংকটের জন্ম পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অভিজ্ঞতাজাত। উপন্যাসের প্রথম পর্বে লীলাবতীর জীবনেও এমন কিছু ঘটনার সাক্ষ্য পাওয়া যায়, যার ফলে পুরুষ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতায় তার মধ্যে জন্ম দিয়েছে বিরূপতার অভিঘাত। আবার তার সেই ধারণা যে বাতুলতা নয়, তার প্রমাণও উপন্যাসে বারবার পাওয়া যায়। সেই শঙ্কা তাকে বারবার বাধা দিয়েছে শ্যামাঙ্গের শারীরিক বাসনাকে সহজ-স্বতঃস্ফূর্ত রূপে গ্রহণ করতে। তার প্রথম জীবনের বিরূপ স্মৃতিকে ভুলে যেতে চাইলেও অবচেতনে ক্রীয়াশীল হয়ে উঠেছে সেই সত্তা :

> তুমি আমাকে ত্যাগ করে যাও–আমার ক্ষমতা নেই যে আমি তোমাকে গ্রহণ করি–যখনই তুমি আমার দিকে চাও, তখনই নিজেকে অপরাধী মনে হয়– কিন্তু তবু আমি নিজেকে নিঃশেষে দান করতে পারি না।

> ....যখনই তুমি আমার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাও, মনে হয় তুমি দেহ সম্ভোগের পরিকল্পনা করছো।...তুমি যাও প্রিয়তম। আমার ললাটে যা আছে তাই হবে– আমি তোমার সঙ্গে মিথ্যাচার করতে পারবো না। (শওকত, ২০১৬ : ১৫৩)

নারী-পুরুষের সম্পর্ক একটি মূল্যবান প্রত্যয়, যা অল্পেই সুদূরপ্রসারী নির্ভেজাল অন্তর্জাল নির্মাণ করতে পারে। আবার অত্যন্ত আহ্লাদী আগুনে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে দ্রুতই। ভোগবাদী মানসিকতার মানুষেরা পারস্পরিক চেনা ছকের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে, তাকে দেখে চেনা স্বাভাবিক কোনো প্রক্রিয়া নয়। শ্যামাঙ্গের প্রেমকে বিশ্বাস করলেও, তার কামনায় আস্থাশীল হতে পারে না লীলাবতী বা লীলাবতীর সন্দিহান মন। চারপাশের পৃথিবীর ক্রমাগত ধ্বংস, ক্লান্তি আর বেদনা তাকে দীর্ঘস্থায়ী বিষণ্নতায় গ্রাস করেছে। জীবনের অতলের অন্ধকারকে দহন করতে পারে না উপরিতলের আলো। তার বিষণ্নতার অনুভব গভীর অন্ধকারের যে ছায়াতল নির্মাণ করেছে তা কাটতে পারে শ্যামাঙ্গের প্রেমের উজ্জ্বল আলোয়। আসলে আত্মবিশ্বাসহীন মানবসমাজ এভাবে পারস্পরিক অজাচারে লিপ্ত।

১৬.১০

এই উপন্যাসে প্রথম পর্বের দশটি অধ্যায়ে ঔপন্যাসিক বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে কাহিনি ছড়িয়েছেন। যদিও লেখক খুব সচেতনভাবে অধ্যায় বিন্যাস করেননি; তবুও দ্বিতীয়পর্বের নাম উল্লেখ রয়েছে- দুষ্কালের দিবানিশি। সমগ্র উপন্যাস দুটি ভিন্ন নামে, দুটি পর্বে বিভক্ত হলেও এর অন্তর জুড়ে আছে জনপদের প্রাকৃত মানুষের জীবন দৈন্যতার প্রতিচ্ছায়া। এই আঁধার ঘোচানোর উষার অভুদ্যয়ে প্রাকৃতজন মানুষের দুঃখ-বেদনার সুদীর্ঘ দিবস-রজনী অতিক্রান্ত করতে হয়েছে। প্রত্যাশিত সেই প্রদোষের অদ্ভুত চোরাটানে নিম্নবর্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে পাড়ি দিতে হয়েছে সুদীর্ঘ তিতিক্ষাকাল। মানবসমাজে অনাদৃত-অপাঙক্তেয় যে তারও অধিকার আছে একটি নীড় রচনা করার; জীবনের গভীরে ডুব দিয়ে জীবনের অমৃত স্বাদকে ভোগ করার অধিকার। সময় এবং সমাজ সেটুকু অধিকারও দেয়নি লীলাবতীকে। সময়ের চলমান উত্তাপ ভুলতে এতটুকু শান্তির রসদ খুঁজতে চেয়েছিল লীলাবতী-শ্যামাঙ্গ। যে সমাজ, যে ধর্ম চিরকালীন প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তায় মানুষের জীবনকে সংকুচিত করার আবর্তে ঘুরপাক খায়; তাকে ত্যাগ করে নতুন সমাজ, নতুন ধর্মের আশ্রয়ে জীবনের প্রশান্তি পেতে চেয়েছিল লীলাবতী। লীলাবতী-শ্যামাঙ্গ তাদের আত্মগত ব্যবধানকে ভুললেও, সমাজের প্রাচীরকে দহন করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সমাজের প্রচলিত নিয়মের কাছে তাদেরকে বারবার জবাবদিহি করতে হয়েছে। বারবার সমাজস্থ মানুষের কৌতূহলের কারণ হয়ে উঠতে হয়েছে তাদেরকে :

> লীলাবতীর কান্না উদ্বেলিত হয়। বলে, এভাবে আর কত দিন বলো? জীবন কি পথে পথে যাপিত হয়? এমন জীবন আমি চাইনি–আমার সংসারের প্রয়োজন। লীলাবতী দুবাহু দিয়ে শ্যামাঙ্গকে সজোরে আলিঙ্গন করে রাখে আর কাঁদে। বলে,...তুমি ত্যাগ করে যাও আমাকে । আমি তাহলে মরতে পারি। তুমি ত্যাগ না করলে যে আমার বাসনা শতবাহু মেলে জীবনকে ধরে রাখতে চায়। কিন্তু এ কেমন জীবন বলো, এ জীবনযাপন করা অসম্ভব, তুমি যাও শ্যামাঙ্গ, আমাকে ত্যাগ করে চলে যাও। (শওকত, ২০১৬ : ১৫৮)

এখানে কাল ও কালীন দ্বান্দ্বিকতায় নারীর অস্তিত্ব সংগ্রাম ও পারিপার্শ্বিক বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন লেখক। রাজনৈতিক সংক্ষুব্ধতার কোলাহলে নিঃসঙ্গ নারী তার নিজেকে খুঁজে চলেছে। জীবনের ঘূর্ণায়মান আবর্তে নিজের আকাঙ্ক্ষা, দাম্পত্য জীবনের সামাজিক বৈধতার প্রশ্নের অন্তর্দাহ। সবকিছুর মধ্যে নিজের জীবনের দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করার অবশ্যসম্ভাবী ভাবনা বিকশিত হয়ে চলেছে। পিতৃতন্ত্রের অবদমিত সুবিধাবাদী কৌশলে মাথানত না করার মানসিক সম্ভবতাকেও স্পষ্ট করেছেন লেখক। জীবনের ভেতরের বৃত্ত থেকে জীবনকে উপলব্ধি করার অভিব্যক্তিতে, জাগ্রত সত্তায়, উচ্চকিত হয়েছে জীবনের জয়গানের কথা :

> তুমি কি আমাকে এই অবস্থায় রেখে দিতে চাও? বলো, আমার কী অপরাধ? আমি কেন সমস্ত দিক থেকে বঞ্চিত হবো। আমি তো বলেছি তোমাকে, জীবনকে আমি পরিপূর্ণভাবেই চাই। আমি সংসার চাই, স্বামী চাই, সন্তান চাই– প্রত্যেকটিই আমার প্রয়োজন, একটি নূন্য হলে চলবে না। ...রাত্রির অন্ধকারে পলায়ন, এই তো? এভাবে কতবার পলায়ন করবো, কোথায় পলায়ন করবো , বলো? চুরি করেছি, না দস্যুতা করেছি?...কিন্তু আমি বালিকা নই। জীবন আমার কম বিপর্যস্ত নয়, লাঞ্ছনা কম হয়নি, আমাকে যদি জীবিত থাকরত হয়, তাহলে আমার সেই জীবন আমার নিজেকেই গঠন করে নিতে হবে। (শওকত, ২০১৬ : ১৮৭)

লীলাবতীর জীবনপরিক্রমার দীর্ঘ ব্যথাদীর্ণ অভিজ্ঞতা, অব্যক্ত উপলব্ধি ভাষায় প্রবহমানতার গতি পেয়েছে। সামাজিক প্রথা আর অনুশাসনকে ছিন্ন করে মনোদৈহিক স্বাধীনতার স্বভূমি নির্মাণে সে দৃঢ়প্রত্যয়ী। কালের করাল স্রোতে যখন সবকিছু হারিয়ে যায়, যখন সে নিঃস্ব আর রিক্ত হয়েছে; তখন দীর্ণতায় জর্জরিত তাকে শক্তি আর সাহস জুগিয়েছে তার আত্মচেতনা। জীবনের পথে হোঁচট খেতে খেতে সে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। যাপিত বর্তমানে দুঃসহ স্মৃতিকে উত্তরণ করে সে নতুন জীবনের সন্ধান করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সে পরিপূর্ণ জীবনের স্বাদ চায়, আর দশজন মানুষ যেভাবে পায়। যে-ধর্ম, যে সমাজ তাকে বারবার লাঞ্ছিত করেছে, আশ্রয়হীন করেছে; পিতৃপুরুষের ঐতিহ্য আর অনুশাসন বলে আর কত দিন তাকে আঁকড়ে থাকবে। প্রতিবাদহীন নিম্নবর্গের এ এক পুনর্জন্মের ইতিহাস। শ্রেণিবিভক্ত সমাজের বৈষম্য-পীড়িত জনজীবনে ক্রমে ক্ষয়ে যাওয়া অনুভূতির ব্যঞ্জনায় এ এক উপলব্ধির আধার।

১৬.১১

স্পিভাকের সাবলটার্ন তত্ত্ব অনুযায়ী মধ্যযুগীয় ভারত উপমহাদেশীয় নারীদের নিজস্ব বক্তব্য না থাকলেও লীলাবতী তার সৃষ্টিশীলতায় প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠেছে (রাশিদ, ২০২১ :২০৯)। সমাজ, ধর্ম, জীবন-পদ্ধতি সমস্ত প্রথাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার স্পর্ধিত উচ্চরণ নিম্নবর্গের এই নারীর উজ্জ্বল বির্নিমাণের কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। নোরার আত্মোপলব্ধিজাত আত্মমর্যাদার অভিঘাত প্রদাহ সৃষ্টি করেছিল সমগ্র ইউরোপের চিন্তার জগতে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রথাবদ্ধতাকে অবমাননা করে স্বামী মুখের সামনে সশব্দে দরজা বন্ধ করার কম্পন কাঁপিয়ে দিয়েছিল ইউরোপের পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিতকে। কালগত বিবেচনায় পাশ্চত্য সমাজের বহুযুগ পূর্বে বাংলাদেশের মধ্যযুগের ধর্মাশ্রয়ী সমাজের এক নিম্নবর্গের নারী তার চেতনার দ্বারা, অভিজ্ঞতার দ্বারা, প্রথা-অন্ধ সমাজকে, ধর্মকে অস্বীকার করার শক্তি এবং সাহস দেখিয়েছে। তার জীবন ও জগতের পরিমণ্ডলে, তার স্বাভাবিক জীবনের প্রকর্ষে যা প্রয়োজনীয়। একজন নারী হিসেবে জীবনের প্রত্যেকটি স্তরে তার কিছু স্বভাবসিদ্ধ বৈশিষ্ট্য অবশ্যম্ভাবী, তার মধ্যে অন্যতম নিরাপদ বৈবাহিক জীবন। যা তাকে সামাজিক একটি পরিচয় ও পরিণতি দেবে; যেখানে সে সংসার ও সন্তানের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ ঘটাবে মানবজীবনের সম্ভাবনাময় দিকসমূহের। নোরা স্বামী-সংসার ছেড়েছে, অধীনস্থতার শৃঙ্খল ভেঙে আত্মমর্যাদায় নিজের সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টায় হয়েছে সচেষ্ট ও সক্রিয়। লীলাবতী সর্ববিস্তারী সংকটময় পরিবেশের পরাধীনতার শিকল ভেঙে নিজের জীবনের স্বাভাবিক স্রোতকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দুজনের কাল-পরিবেশ-পরিমণ্ডল আলাদা হলেও; তাদের উপলব্ধির ক্ষেত্রটা এক ও অভিন্ন (রাশিদ, ২০২১ : ২১০)। লীলাবতী শুধু তার ভাবনাকে প্রকাশ করে ক্ষান্ত নয়, তার সীমাবদ্ধ জীবনের বাস্তবতাকে অস্বীকার করে, নতুন জীবনের স্বপ্নকে প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রাসী হয়েছে। তার সহযাত্রী শ্যামাঙ্গ যখন জীবনের পূর্বসূরিদের কথা ভেবে, প্রথা ও ঐতিহ্যের কথা ভেবে নতুন দিনের নতুন স্বপ্নকে গ্রহণ করতে অসম্মতি জানায়; তখনও সে তার সিদ্ধান্তে অনড় : 'আমি তোমার পুত্তলিটি নই শ্যামাঙ্গ, আমি জীবন্ত নারী– আমার স্বামী চাই, সংসার চাই, সন্তান চাই–ঐগুলিই আমার ধর্ম, অন্য ধর্ম আমি জানি না–আমাকে তুমি প্রকাশ্যে বিবাহ করো।' (শওকত, ২০১৬ : ১৮৮) লীলাবতীর আত্মোপলব্ধিজাত ভাবনার মধ্যে এমন অনেক উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়, যা নারীবাদী ভাবনায় আলোকিত। যেখানে দেশ-কালের পরিসীমার বাইরে সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিকভাবে নারীর দীর্ঘদিনের অবদমিত সত্তা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। যার দৃষ্টান্ত বিভিন্নভাবে প্রতিকায়িত হয়েছে বিশ্বসাহিত্যের বিভিন্ন শাখায়।

তার মধ্যে সর্বাধিক আলোচিত চরিত্র নোরা। প্রখ্যাত নরওয়েজিয়ান নাট্যকার হেনরিক ইবসেনের (১৮২৮-১৯০৬) *ডলস হাউজ* (১৮৭৯) নাটকের নারী চরিত্র নোরা। নোরা স্বাগতোক্তিতে প্রতিভাসিত হয়েছে তার চেতনার আধার:

> Very likely. But you neither think nor talk like the man I could sbare my life with. When your terror was over-not for me, but for yourself-when there was nothing more to fear,-then it was to yon as though nothing had happened. I was your lark again, your doll-whom you would take twice as much care of in future, because she was so weak and fragile. (*Stands tip*).Torvald, in that moment it burst upon me, that I had been living here these eight years with a strange man, and had borne him three children----Oh! I can't bear to think of it-- I could tear myself to pieces! (Henrik, 1880: 135)

নোরা ও লীলাবতীর প্রেক্ষিত আলাদা হলেও তাদের আত্মগত চিন্তার প্রতিস্পর্ধা তাদের মিলিয়ে দিয়েছে। ইউরোপীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির মেলবন্ধনে নোরার উপলব্ধির আলোকিত হলেও মধ্যযুগীয় আলোহীন জগতে লীলাবতীর আলোকিত সম্ভাষণ নতুন চিন্তার ফসল। এখানে লীলাবতীর ব্যক্তিত্বের দর্পণ তাকে দাঁড় করিয়েছে অন্যদের থেকে স্বাধীন স্বতন্ত্রের জায়গায়। মধ্যযুগীয় বাংলার ধর্মীয় অন্ধকারাচ্ছন্ন, সমাজ, সংস্কারের ভ্রুকুটিকে অস্বীকার করে উন্মোচন করেছে সমাজে পুতুল নারী হয়ে বাঁচার খোলসকে। আত্ম-অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমাজ-ধর্মকে অস্বীকার করেছে, এমনকি তার প্রিয়জন একমাত্র অবলম্বন যে শ্যামাঙ্গ তার মতামতও অগ্রাহ্য রূপে বিবেচিত হয়েছে। ইতিহাসের পাতায়, সমাজের প্রথাগত দিনলিপিতে, নিম্নবর্গের অবস্থান প্রতিবাদ প্রতিরোধহীন হলেও, তার জীবন ইতিহাস সাহিত্যের সৃজনশীলতায় তা পুনর্নির্মিত হয়েছে।

১৬.১২

লীলাবতী ছাড়াও উপন্যাসে আমরা আরো কয়েকজন নারীর সাক্ষাৎ পাই, যারা বিভিন্নভাবে উপন্যাসের কাহিনিকে সমগ্রতা দিয়েছে। লীলাবতীর সখি মায়াবতী, পুনর্ভবা তীরের কন্যা, উজবুট গ্রামের শুকদেব মহাশয়ের কন্যা আর বসন্তদাসের স্ত্রী। উপন্যাসের সূচনাংশে লীলাবতী আর মায়াবতীর আগমন একই সঙ্গে ঘটেছে। লীলাবতী স্বামীর দ্বারা পরিত্যক্ত আর মায়াবতীর স্বামী বসন্তদাস বাণিজ্য করায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে দিনাতিপাত করে। সেই সঙ্গে বিভিন্ন নারীর প্রতি তার আসক্তির কথা উল্লেখিত হয়েছে আলোচনা প্রসঙ্গে। প্রোষিতভর্তৃকা এই যুবতী নারী স্বামীর অপেক্ষায় দিন গোনা, যা বাঙালি নারীর চিরন্তন দিনগুজারের কাহিনি। যখন পিপ্পলী হাটে ডোমনীদের সঙ্গে মহাসামন্ত হরিসেনের

সৈনিকদের সাথে বিবাদ-বিপর্যয়ের মধ্যে দিন কাটছিল, সেই সময় মায়াবতীর স্বামী বসন্তদাসের আগমন ঘটেছে। 'শোনা যায়, সে পূর্বদেশ অঞ্চলে বাণিজ্য যাত্রায় গিয়েছিলো। তবে নিজ গ্রামে প্রত্যাবর্তন না ক'রে, কেন শ্বশুরালয়ে তার আগমন ঘটলো সেই রহস্য উদ্ধার করা যায় না। বিশেষত দীনদাস ঘটনাটি সহজভাবে মানতে পারলেন না।' (শওকত, ২০১৬ : ৪৭) পুনর্ভবার তীরবর্তী এলাকায় মহাসামন্ত হরিসেন অথবা যবন সেনাদের আক্রমণের সমূহ সম্ভাবনা থাকলেও বহুদিন পরে স্বামীর আগমন প্রান্তিক এই নারীকে আনন্দে আন্দোলিত করেছিল। নিম্নবর্গের জীবনের সুখের আবাহন খুব স্বল্প সময়ের জন্য। বসন্তের অভ্যাসে কিছু পরিবর্তন তার অন্তর্দেশকে শঙ্কিত করলেও, প্রশ্ন করার অধিকার বা সাহস কোনোটাই তার হয় না। কারণ 'বিবাহের পর মাসাধিককাল তার স্বামীগৃহে অতিবাহিত করেছে। স্বামীসঙ্গে প্রথম ক'দিন তার ভয় হতো–...তারপর বসন্তদাস হঠাৎ বাণিজ্য যাত্রা করে। শুরু হয় তার বিরহযাপন।' (শওকত,২০১৬ : ৫৪) বিরূপ বিশ্বে নারী নিয়তই শোষিত, বঞ্চিত; মায়াবতীর ক্ষেত্রেও তা বাইরে কোনো ঘটনা নয়। পুরুষশাসিত বিশ্বে নারীকে বিভিন্ন যুক্তির আঁধারে নির্মাণ করা হয়েছে নিম্নপদ করার কৌশল। তার মধ্যে নারীর আবেগকে স্থাপন করা হয়েছে একটি অকাট যুক্তি হিসেবে। পুরুষ জ্ঞানের অধিকারী, বুদ্ধির অধিকারী, অর্থাৎ যুক্তির অধিকারী; অন্যদিকে নারীকে নির্মাণ করা হয় আবেগের অন্ধ অনুসারী রূপে। এভাবে পুরুষ নারীর উপর আধিপত্য বিস্তারের অধিকার লাভ করে। নারী আবেগ দিয়ে সবকিছু বিচার করে বলেই সে এবং তার চিন্তা নিতান্তই আটপৌরে। পুরুষ যুক্তিবাদী বলে তার চিন্তা উচ্চমার্গের আসীন আর নারী আটপৌরের সত্তার অধিকারী বলেই তাকে অগ্রাহ্য করা যায় (রাশিদা, ২০১৮ : ৯৫)। সামাজিক এই ভিত্তির অনুশাসন আমরা মায়াবতীর ক্ষেত্রেও প্রয়োগ হতে দেখি। স্বামীর গতিবিধি, স্বামীর কথা-আচরণ কিছুই সে বুঝতে পারে না, কারণ তাকে বুঝতে দেয়া হয় না।

> রাত্রির শেষ যামে যখন জাগলো, তখন দেখে, দ্বার আর্গলমুক্ত এবং বসন্তদাস শয্যায় নেই। বাইরে তখনও ঘোর অন্ধকার।...তখন মায়াবতীর চিন্তা হতে লাগলো, মানুষটা গেলো কোথায়? জননীকে ডাকবে কি না এ চিন্তায় যখন সে দ্বিধান্বিতা, তখনই দেখলো, সন্তর্পণে বসন্তদাস কক্ষে প্রবেশ করছে। (শওকত, ২০১৬ : ৫৭)

বসন্তদাসের চলাফেরা শুরু থেকে সবার কাছে সন্দেহের উদ্রেক করে; মায়াবতীর জিজ্ঞাসু কৌতূহলের যথার্থ উত্তর মেলে না। সময়ের সংক্রান্তিতে উপন্যাসে ত্রিমাত্রিক সংকট প্রচ্ছদিত। সেখানে একদিকে রাষ্ট্রের নিপীড়ন, অন্যদিকে যবন আক্রমণ, বৌদ্ধ ভিক্ষু ও যোগীদের সন্তর্পণ কার্যক্রম সমস্ত কিছু মিলিয়ে সাধারণ মানুষের জীবন সংশয়পূর্ণ। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও যোগীদের সঙ্গে বসন্তদাসের গোপন যোগাযোগ শ্বশুর শুকদেব ও মাতুল দীনদাসকে চিন্তাগ্রস্ত করলে তারা সরাসরি কোনো জিজ্ঞাসাবাদে

যেতে পারে না। কারণ জামাতা শ্বশুরালয়ে অত্যন্ত সম্মনীয় পাত্র, তার আগমনে তারা কৃতার্থ হয়, তাই এমন কোনো কথা বলা যাবে না, যাতে তার সম্মানের হানি ঘটে। তাই মায়াবতী স্বামীর কাছে কৌশলে কার্যকারণ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছে :

> তোমাকে বলতে হবে, তুমি কেন চঞ্চল হয়েছো, কেন তুমি চিন্তাগ্রস্ত আর অস্থির?...শুধু আমাকে তুমি বিশ্বাস করো। সম্মুখে কাল বড় ভয়াবহ। আসন্ন ঐ দুর্যোগের কালে অবিশ্বাস ও সন্দেহের অনুপ্রবেশ ঘটলেই আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো। বিশ্বাস আর ভালোবাসায় আমাদের সংহত এবং দৃঢ় হতে হবে। (শওকত, ২০১৬ : ৫৮)

স্বামীর কথার অর্থান্তর অনুধাবনযোগ্য না হলে শুধু ভালবাসা শব্দতে মায়াবতী অনুরক্ত হয়ে থাকে। নারীকে সামাজিকভাবে এমনভাবে নির্মাণ করা হয়ে থাকে যেন সে সমাজ-রাষ্ট্র-অর্থনীতি কোনো কিছু না বুঝে শুধু স্বামী আর সংসারের অনুগামী হয়। তার বাইরের কোনো চিন্তা যুক্তি আলোচনা তার বোধগম্যতায় প্রবেশ করবে না। যখন হরিসেনের দুজন লোক বসন্তদাসের সন্ধানে শুকদেবের গৃহে আসে, তখন তাদের অবস্থা সংকটাপূর্ণ। বসন্তদাস যে বৌদ্ধভিক্ষুদের দলের লোক, সে কথা জানতেও বাকি থাকে না। বসন্তদাসের সন্ধানে সামন্ত হরিসেনের সৈন্য শুকদেবের গৃহে এলে তারা ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে; অন্যদিকে বিপদের সম্ভাবনা দেখে বসন্তদাস আবার পলায়ন করে। সব মিলিয়ে শুকদেবের গৃহে যেমন বিপন্ন দশা, তেমনি বিপন্নতা মায়াবতীর অন্তর্সত্তায় :

> লীলাবতীর ক্রোড়ে মাথাটি রেখে মায়াবতী কান্নায় ভেঙে পড়লো। বললো, সখী এ আমার কি হলো? লীলাবতী সান্ত্বনার ভাষা খুঁজে পায় না।.....সে বললো, সখী, কাঁদিস না– জীবন বিরূপ হয়ে উঠেছে ব'লে কি তুই তাকে পরিত্যাগ করবি? বরং ওঠ তবু, আয় আমরা শেষ অবধি দেখি, জীবন আমাদের জন্য কিছু দান করতে পারে কি না। (শওকত, ২০১৬ : ৬৮)

গ্রামীণ নারীর জীবন স্বামীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের অর্বাচীন যুগে তা আরো বেশি কেন্দ্রভূত ছিল। স্বামীর সঙ্গে নারীর সম্পর্ক বিচিত্র ও বহুমুখী, ভয়-ভালোবাসার। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা ভয়ের, অসম ও শোষণমূলক। এ যেন শিকারি বাঘের সঙ্গে কালযাপনের অভিজ্ঞতা। অন্য সকল বিষয় বাদ দিলেও জীবনের প্রাত্যহিক কথাবার্তা ও সম্বোধনে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১৬.১৩

পুরুষতন্ত্রের একটি বড় সফলতা, নারীর পরনির্ভরতা, অধস্তনতা ও দাসীসুলভ মনোজগত নির্মাণ করতে সর্বতোরূপে সফলতা। নারীকে শক্তির বলে নিয়ন্ত্রিত করা অপেক্ষা, মনোজগতের দাসত্ব দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করা সহজ। যে কারণে মায়াবতীর কাছে স্বামীর অপরিণামদর্শী

চলাফেরা ও জীবনের ঝুঁকিতে নিজেকে অপরাধী বলে মনে হওয়া। বিবাহিত জীবনের সমস্ত সফলতা-ব্যর্থতা নারীর ওপর নির্ভর করে। সমাজ এভাবে নারীকে বন্দি করে রেখেছে, আরোপিত এই বোঝা নারী আজীবন বহন করে চলেছে। গোটা সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়ার মধ্যে নারীকে এভাবে একধরনের অপরাধবোধ ও অসহায়ত্বের মধ্য দিয়ে জীবনকে অতিবাহিত করতে হয়। মায়াবতীর মধ্যে সনাতনী বাঙালি নারীর চিরন্তন প্রবাহকে অবারিত হতে দেখা যায়। যেকোনো পরিস্থিতিতে নারী বিনা প্রতিবাদে স্বামীর প্রতি অগাধ আনুগত্যে অনুপ্রাণিত। আশ্রয়হীন উদ্বাস্তু জীবনে একটি পরিবারের সবাইকে নিয়ে জীবনযাপন করার কারণে একান্তে স্বামীকে কাছে পাবার সুযোগ কম। তারপরও স্বামী দৃষ্টিরগোচরে থাক, নিরাপদে থাক। স্বামীর যাবার কথায় : 'অভিমানে ওষ্ঠ স্ফুরিত হয়, অশ্রু উদ্বেল হতে দেখা যায়।' (শওকত, ২০১৬ : ১৬৫) বসন্তদাসের যে কর্মযজ্ঞ তা স্ত্রীর সান্নিধ্যে থেকে সম্ভব নয়। তাই তাকে আবার গৃহের মায়া ত্যাগ করে পথের ঠিকানায় ফিরতে হবে। কিন্তু মায়াবতী বুদ্ধিদীপ্ত না হলেও নির্বোধ নয়। বসন্তদাসের আচরণ তাকে অনেক কিছু বুঝিয়ে দিয়েছে। 'মায়াবতী যেন অনুভব করে তার স্বামী উন্মনা। উজবুটে যেমন মনে হতো–এ তার চাইতেও অধিক। সর্বক্ষণ যেন কী চিন্তা করে। একদিন দ্বিপ্রহরে হঠাৎ বলল, তুমি কি আবার চলে যাবে?'(শওকত, ২০১৬ : ১৬৬) মায়াবতীর সন্দেহ সত্য, কিন্তু বসন্তদাসের মতো ধূর্ত এত সহজে স্ত্রী বুদ্ধির কাছে ধরা দেবে না। তাই অন্য পথের সন্ধান করে, যেখানে স্ত্রীর অভিযোগ অনুযোগের কোনো গত্যন্তর থাকবে না। তাই পিতামাতার প্রতি কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। এভাবে বহুগামী উন্মনা স্বামী বসন্তদাস স্ত্রীর আনুগত্য নিয়ে খেলা করে। মায়াবতীর মতো নারীরা দিনের পর দিন সেই-সমস্ত স্বামীর অপেক্ষায় প্রহর গুনে দিন পাড়ি দেয়। এ দিনের কোনো শেষ আছে কি না ঔপন্যাসিক জানাননি। তবে এদেশের নারীর জীবনপ্রদীপের তলায় চির অন্ধকারের মতো নিঃস্বতায় ভরা। মায়াবতী তার এক উদাহরণ বটে। মায়াবতী ছাড়া উপন্যাসে একজন চিরন্তন মাকে প্রত্যক্ষ করা যায়, যিনি যোগমায়া। একমাত্র পুত্রকে হারিয়ে যার জীবন মরুভূমির ন্যায় ঊষরতায় ভরে গিয়েছে। যেখানে কোনো আনন্দ নেই, অনুভূতির কোনো বিস্তার নেই। এ ছাড়া উপন্যাসে আরো দুজন নারীর দেখা পাওয়া যায়, যারা কোনো গার্হস্থ্য নারী নয়; যারা মন্দিরে থাকে মন্দিরের সেবাদাসী হিসেবে। পাশাপাশি তারা অস্থির রাজনৈতিক পরিবেশে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সহযোগী হিসেবে কাজ করে।

১৭.

বাংলাদেশের সাহিত্যে অগ্রগামী ও প্রতিনিধিত্বশীল কথাসাহিত্যিকদের অন্যতম রিজিয়া রহমান (১৯৩৯-২০২০)। কথাশিল্পী হিসেবে রিজিয়া রহমানের বিচরণ জীবনের বিচিত্র ও বিস্তৃত পরিসরে।

বাঙালির ইতিহাস-ঐতিহ্য-নৃতত্ত্ব, সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতি, ভূগোল-পরিবেশ-প্রকৃতি, সংকট-সংগ্রাম-স্বাধীনতাসহ সুখ-দুঃখ-মিলন-বিরহ প্রভৃতি নিত্যদিনের জীবনের সামগ্রিক ও ব্যক্তিক সংগ্রামের পর্যায়সমূহকে তিনি তুলে ধরেছেন স্বাচ্ছন্দ্যে। তাঁর প্রথম উপন্যাস *ঘর ভাঙা ঘর* (১৯৬৮) নাগরিক পরিবেশে নিম্নবর্গের নারীর সংগ্রামী জীবনের পরিপ্রেক্ষিত গড়ে উঠেছে উপন্যাসের অবয়ব। আধুনিক বিশ্বের মানবসভ্যতার চূড়ান্ত অগ্রগতির মুখে দাঁড়িয়েও নারী-পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান সীমারেখাটি মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। প্রকৃতিগতভাবে নির্মিত লিঙ্গবৈষম্যকে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা দেয়ার প্রবণতা সমানভাবে বর্তমান। এই প্রচেষ্টা উপেক্ষা করা যায়নি বলেই নারীর ভূমিকাকে স্বতন্ত্রভাবে মূল্যায়ন একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক পরিমণ্ডলরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

১৭.১

বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা নদীর ভাঙন আর মহাজনের লালসায় ভিটেমাটি হারানো মানুষের আহাজারির সমাহার নাগরিক এই বস্তিজীবন। ভূমিহীন ছিন্নমূল মানুষেরা একটু বাঁচার আশায়, অস্তিত্বের শ্বাসটুকু আর একটু দীর্ঘায়িত করার প্রচেষ্টায় এই নাগরিক ক্লেদাক্ত পরিবেশে জীবনকে খোঁজে। বস্তির মানুষের দুঃখ-দুর্দশা-ক্লেদ নিয়ে এই উপন্যাসটির মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছিলেন লেখক। বস্তি পরিবেশে নারীকেন্দ্রিক এই জীবনাচার লেখকের একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গির ফসল। লেখক উপন্যাসটি রচনা করেছেন সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে। এখানে কেউ প্রধান চরিত্র আর কেউ পার্শ্ব চরিত্র নয়; সবাই একটি প্লাটফর্মে স্ব স্ব সত্তা নিয়ে হাজির হয়েছে। কাহিনির গতিময়তায় সবাই তৈরি করে নিয়েছে তাদের নিজস্ব জায়গা। *ঘর ভাঙা ঘর* উপন্যাসের ঘটনাবৃত্তে যেসব নারী চরিত্র স্থান পেয়েছে, তারা কেউ নিজের নামে পরিচিত নয়, তারা স্বামী বা সন্তানের নামে পরিচিত। জন্মগতভাবেই তাদের জীবনের পরিসীমা এতটা নাজুক যে তারা তাদের অস্তিত্বের পরিচয়টুকু হারিয়ে ফেলে স্বামী-সন্তানের অংশীজন হয়ে বেঁচে থাকে। এর মধ্যে আছে বিক্রমপুরের জোলেখার মা, খালেকের মা, জয়নালের দাদি ওমরতুন, বিশু মোল্লার বৌ ময়না, চান্দুর মা, কানিবিবি, রবের মা, কার্তিকার নানি, ছাওনারের খালা প্রভৃতি নাম্নী নারী।

১৭.২

এই উপন্যাসে ব্যক্তিজীবন অপেক্ষা নাগরিক প্রেক্ষাপটে সামগ্রিক নিম্নবর্গ জীবনের প্রতিবেশ নির্মিত হয়েছে অধিক। উপন্যাস ব্যক্তি প্রধান না হলেও ব্যক্তির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবস্থান থেকে একটি সম্পূর্ণ অবয়বের বিনির্মাণ ঘটেছে। উপন্যাসের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে জোলেখার মার উপস্থিতি সর্বাপেক্ষা

বেশি লক্ষ করা যায়। বিক্রমপুরের মানুষ জোলেখার মা। নদীর ভাঙনে সব হারিয়ে স্বামী আর চার সন্তান নিয়ে ঢাকা শহরের বস্তিজীবনের অংশীজন। জোলেখার মা ছয় বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে সংসারের চাকায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে রেখেছে। জোলেখার মা নিম্নবর্গের খেটে খাওয়া জীবনে বিভিন্নভাবে বঞ্চিত হলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা ও সাহস অর্জন করেছে সে। অসুস্থ, পীড়িত, বৃদ্ধ মাকে নিজের কাছে এনে রাখতে চাইলে স্বামীর নিষেধকে উপেক্ষা করে পাল্টা জবাব দিয়ে বলেছে : 'ক্যা? রোজগার বড় তোমার একলার নি! আমি কাম করি না? আমি ট্যাকা আনি না? আমার মায়রে আমি খাওয়ামু।' (রিজিয়া, ২০১৭ : ২৩) নিজের হাড়ভাঙা শ্রমের শক্তি তার কণ্ঠে প্রতিবাদের ভাষা দিয়েছে। নিজের অধিকারের প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছে সে। সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে তাদের সামাজিক মর্যাদা অর্থনৈতিক, শ্রেণি, লৈঙ্গিক, পরিচয় প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিভাজনের চেষ্টা প্রাচীনকাল থেকেই লক্ষ করা যায়। (মেহেদী, ২০০৮ : ১৭) সেখানে নারীর অবস্থান সব দিক থেকেই নাজুক। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে নারী যে দুর্দশাময় অবস্থায় অধঃপতিত, উপন্যাসের সোনাবড়ু তারই দৃষ্টান্ত।

১৭.৩

উপন্যাসে ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান নির্ধারিত হয়েছে অর্থনৈতিক পরিচয়ের মধ্য দিয়ে। ব্যক্তিমালিকাধীন এই বস্তিবাড়িতে এক একজন মানুষ একেকটি অর্থনৈতিক মানদণ্ডে অবস্থান করে। কেউ থাকে আট টাকার ঘরে, কেউ চার টাকার, কেউ থাকে দুটাকার ঘর ভাড়ায়। ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ থানার সোনাবড়ু দুটাকার ঘরে ভাড়া থাকে। তার ঘরে রঙচঙে লাস্যময়ী সিনেমার তারকার ছবি আঁটা থাকে। নাইট ডিউটির চাকরির নামের আড়ালে সোনাবড়ু দেহ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। এই প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিকের বক্তব্য নিম্নরূপ:

> সন্ধ্যার পর পরিপাটি প্রসাধন করে কোমর অবধি একটা রংচটা কালো বোরকা জড়িয়ে রবারের গোলাপি স্যাণ্ডেল ফটফটিয়ে প্রতিদিন চাকরিতে যায়। ফেরে মাঝরাতে, শেষরাতে অথবা ভোরে। খালেকের বউ নাকি দেখেছে কীরকম বিশ্রী বিধ্বস্ত চেহারা হয় তার। এই চেহারা নিয়ে বাড়ি ফেরে সোনাবড়ু। কপালের টিপ ধেবড়ে বেঁকে চোখের কাজল লেপটে, ঠোঁটের রং শুকিয়ে উস্কখুস্ক । (রিজিয়া, ২০১৭ ; ৬৮)

এই বিবরণ থেকে সোনাবড়ুর চাকরির প্রকৃতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। বিশ্বের অন্যতম আদিম জীবিকা বারাঙ্গনাবৃত্তি। পুরুষের অনিয়ন্ত্রিত জৈব চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে বারাঙ্গনাবৃত্তির উদ্ভব হলেও, বারাঙ্গনা সমাজের দৃষ্টিতে বরাবরই অচ্ছুৎ, অপাঙক্তেয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর জীবন বরাবরই প্রান্তিক। সেই নারীর জীবন আরো প্রান্তকায়িত হয়েছে, যখন সে পেশায় বারাঙ্গনা বা

দেহপোজীবিনী। বস্তিবাসীর এই জীবনে নারী-পুরুষ, পাঙক্তেয়-অপাঙক্তেয় সবাই একই স্রোতে মিশেছে। সেখানে কোনো বৈষম্যের প্রাচীর তৈরি হয়নি, তাই সমাজের চোখে সোনাবড়ু যতই গর্হিত অপরাধী হোক, ফকিরচাঁদের নিকট সে আর দশজন মানুষের মতো শুধুই মানুষ। ফকিরচাঁদকে কেন্দ্র করে সোনাবড়ু দেখেছিল নতুন জীবনের স্বপ্ন; অধরা সেই স্বপ্ন তার স্বপ্নই থেকে যায়। তার শরীরে বাসা বেঁধেছে মরণ রোগ সিফিলিস। নতুন জীবনের স্বপ্নে ফকিরচাঁদকে পাশে না পেলেও, জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে বন্ধুর হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল সে।

> কে কইছে তুই পথে মরবি! আমি ঘরভাড়া দিমু। চিকিৎসা করামু। যত ট্যাহা লাগে পথে পড়িয়া মরবার দিমু কেন আমি থাকতে।' থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে ফকিরচাঁদের পায়ের কাছে বসে পড়ে হু হু করে কেঁদে উঠল সোনাবড়ু। (রিজিয়া, ২০১৭ : ১২০)

বস্তির এই পঙ্কিল পরিবেশের মানুষগুলোর জীবন ক্লেদাক্ততায় ভরা হলেও, মন ও মানবিকতা ক্লেদাক্তাপূর্ণ নয়। তারা সবাই একে আপরের বিপদে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। সময়ে অসময়ে পরস্পরের মধ্যে যতই বাকযুদ্ধ তীব্র হয়ে উঠুক না কেন, ব্যথা আর দীর্ণতায় সবাই সবার আপন হয়ে উঠেছে। ঔপন্যাসিকের বক্তব্য তারা 'স্বজন নয়; তবে মূল যেন তাদের একই সূত্রে গেঁথে রেখেছে। সেই গ্রাম ফেলে শহরে আসা, কষ্ট করে ভাত জোটানো দুঃখী মেহনতি মানুষ তারা। তারা সবাই এক।' (রিজিয়া, ২০১৭: ৪৫) বস্তিবাসীর ভগ্ন জীবনযাপন আর বিচিত্র পেশার সমাহার নিম্নবর্গীয় জীবনের মর্মান্তিক পরিণতিকে বেগবান করে তোলে।

১৭.৫

খালেকের মা উপন্যাসের কাহিনিতে একটি বিশেষস্থান জুড়ে আছে, বিশেষ করে তার পুত্র খালেকের অনৈতিক কাজকে সমর্থন করার মধ্যে তার এক নীরব বিদ্রোহ রয়েছে। যে জীবনে বেঁচে থাকা, একমাত্র সত্য সেখানে সৎ-অসৎ, নীতি-নৈতিকতা কোনো ভূমিকা রাখে না। চোরের মা হলেও তার কোনো দ্বিধা বা সংকোচ ছিল না। সগর্বে পুত্রের পেশাকে সমর্থন করেছে সে। তার পুত্র চোর বা ডাকাত যাই হোক মাতৃত্বের সুধাময়তার কাছে তার কোনো মানদণ্ড হয় না। খালেক যেদিন চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল, সেদিন তার মাতৃত্বের আকুতি দৃষ্টিগোচর হয়েছিল বস্তিবাসীর নিকটে। খালেকের মায়ের চরিত্রের সঙ্গে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চোরের মা' গল্পের মায়ের মিল পাওয়া যায়। মাতৃত্বের কাছে সব সন্তানই বাৎসল্যে ভরা। মাতৃত্বের আসলে কোনো শ্রেণি হয় না, সম্প্রদায় হয় না। *ঘর ভাঙ্গা ঘর* উপন্যাসের হাবুর মার মধ্যেও একই রকম মাতৃত্বের আহাজারি দেখা যায়। হাবুর মা ফুলজানের ছেড়ে যাওয়া ঘরে দুটাকার ভাড়াটে হিসেবে বস্তিতে আসে। মাতৃত্বের সংকট

তাকে করেছে ঘরহীন, স্বজনহীন। একরকম বাধ্য হয়ে শহরে এসে মেস বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে নিজের ও সন্তানের দায়িত্ব নিয়েছে সে। অন্তঃসত্ত্বা এই নারী তার অনাগত সন্তানের পিতৃত্বের পরিচয়ে নিজেকে লুকিয়ে রাখে তাই প্রয়োজনের বাইরে বস্তিবাসী কারো সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটেনি। এই অনাদৃত, সংকটময় জীবনে বড় আঘাত হয়ে আসে হাবুর হারিয়ে যাওয়া।

> সেদিন সন্ধ্যায় ভাত নিয়ে ফিরে হাবুকে দেখতে পেল না হাবুর মা। অন্যদিন মায়ের ফেরার সময়টিতে সে গলির ধারটায় উৎসুক দৃষ্টি মেলে প্রতীক্ষা করতে থাকে। দূর থেকে মাকে আসতে দেখলে ছুটে গিয়ে মায়ের হাত ধরে।...চিৎকার করে ডাকল– 'হাবু...ও হাবু...উ...হা...বু...রে।' হাবু এলো না। দোকানদারদের সবাইকে জিজ্ঞাসা করলে কেউই সঠিক জবাব দিতে পারল না।...জনে জনে ডেকে উতলা প্রশ্ন করতে লাগল– 'তোমরা আমার হাবুরে দেখছ?'... উতলা পাগলিনীর মতো বুকভাঙা কান্নায় পথে পথে ছুটে ডাকতে লাগলো–'হা...বু! ওরে বাবা। ও হাবু তুই কই গেলি...রে। ওরে আমার ...মানিক ... রে...। (রিজিয়া,২০১৭ : ৯০)

শহরের অচেনা অনিকেতে হারিয়ে যায় হাবু। আর কোনো দিন মায়ের বুকে ফিরে আসেনি। সেই উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ মায়ের বুকে জাগ্রত ছিল আজীবন। শিশুপুত্র হাবুকে হারিয়ে আবার সে মা হয়েছিল, নবাগত সন্তানকে গ্রহণ করতে পারেনি, অচেনা ভয় আর ক্ষোভ গ্রাস করেছিল তার মাতৃত্বকে। 'খালেকের মা আদেশ অমান্য করতে না পেরে দুধ তুলে দিল বাচ্চার মুখে। কান্না বন্ধ হলো শিশুর।' (রিজিয়া,২০১৭ : ৯২) এই অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তান তার জীবনের নতুন অধ্যায় রচনা করেছে। হাবুকে হারিয়ে তার মা আর এক হাবুর মধ্যে বাৎসল্যের নতুন আধার পেল। এভাবে জীবনের নানান চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গের নারী জীবনসংগ্রামে টিকে থাকে।

১৭.৬

রিজিয়া রহমানের সুদক্ষ হাতে নিম্নবর্গের নারী জীবনের অন্তর্জ্বালা ও বহির্জ্বালার বহুমাত্রিক রূপকে অঙ্কিত করেছেন। ফুলজান চরিত্রটি খুব বেশি জায়গা দখল না করলেও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে সে অন্যদের থেকে আলাদা। তার স্বামী থেকেও জীবনসংগ্রামে তার আর্থিক সহযোগিতা সে পায়নি। একদিন তাদের সুখের সংসার ছিল, স্বামী ছিল, প্রেম ছিল। মহাজনের ঋণের বোঝায় ধানের জমি ভিটেমাটি সব চলে যায়। তিন সন্তান আর স্বামী আকবরের প্রাণঘাতি ক্ষয়রোগ নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল শহরের বস্তিতে। শহরের পাঁচ বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে কোনো রকমে অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করেছে সে। স্বামী সন্তান ও সংসারের দায়িত্ব নেয়ার পরও সহ্য করতে হয়েছে স্বামীর নিপীড়ন : 'চোপ হারামজাদী, তোর চালাকি বোঝার পারি না? মানষির বাড়ি সারাদিন থাইয়ে আইস। কিছু আমি বুঝি

না ভাবছাস? দ্যাশে যাইয়ে তরে ঢেহিতি কোটাব।' (রিজিয়া,২০১৭ : ২১) সারা দিন খেটে সবার মুখে অন্ন জোগাবার পর স্বামীর এই নিপীড়ন সহ্য করতে হয়েছে তাকে। বস্তির ক্লেদাক্ত পরিবেশের অন্তেবাসী নারীদের মধ্যে সেই একমাত্র আত্মসচেতন নারীসত্তারূপে প্রতিষ্ঠিত। যে নারী স্বামীর অন্যায়ের প্রতিবাদে রুদ্রমূর্তি ধারণ করতে পারে ; সেই নারী স্নেহ, মমতার ঔদার্যে অসুস্থ মুমূর্ষু স্বামীর সেবায় আত্মনিয়োগও করতে পারে। অসুস্থ স্বামীর পথ্য সংগ্রহের জন্য চুরি করতেও তার হাত কাঁপে না। নিম্নবিত্তের এই জীবন তাদের এমন অবস্থায় নিপতিত করে, যেখান থেকে মুক্তির পথ তাদের অজানা। ফুলজান জানে না তার এই দুঃখ-দুদর্শা পীড়িত অবস্থা থেকে মুক্তি কোথায় 'এ বাড়ির সবাইকে ফুলজানের মনে হলো দুঃখী, ক্ষুধার্ত আর অসহায়।... কেন সব দুঃখের বোঝা কোন অনির্দিষ্ট কারণে, ফুলজান জানে না, শুধু তাদেরই বইতে হয়?' (রিজিয়া, ২০১৭ : ৫১) এত সব যন্ত্রণা আর অসুস্থতার মাঝেও স্বামীকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছে সে। পাশাপাশি আছে অশিক্ষা-কুশিক্ষার প্রভাবে নানারকম সামাজিক অধঃগতি। বস্তির ক্ষুদ্র পরিবেশে ফুলজানের স্বামীর ক্ষয়রোগ অন্যদের শঙ্কার কারণ হয় দাঁড়ায়। যক্ষ্মারোগীর স্বজন হওয়া যেন তার অপরাধ, তাই এই বস্তি ছেড়ে অন্য কোনো ঠিকানার খোঁজ করতে হয়েছে তাকে। এভাবে ফুলজানের মতো নারীদের জীবনের প্রয়োজনে একূল থেকে ওকূলে ভেসে বেড়াতে থাকে। উপন্যাসের কোনো চরিত্রই প্রধান চরিত্র নয়, অর্থাৎ লেখক এমন একক কোনো চরিত্র নির্মাণ করেননি, যাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে কাহিনির প্রবাহ। বরং বস্তির গন্ধময় এক একটি ঘরই যেন এক একটি চরিত্র, কাহিনির এক একটি অংশ। (মেহেদী, ২০০৮ : ১২০) ফুলজান তারই অংশ। তার অবর্তমানে আর একজন আসে, ঘর খালি থাকে না কারো জন্য। সময়ের গতিতে বস্তির এই জীবন এভাবেই চলে।

১৭.৭

রিজিয়া রহমানের দৃষ্টিভঙ্গি ও চেতনায় সব সময় উচ্চকিত হয়েছে অবহেলিত অবদমিত মানুষের প্রতি মানবিক চেতনার সমস্বর। আলোচিত উপন্যাসে তেমনি সব নারীর সমাহার, যারা জীবনযুদ্ধে পরাজিত ও ক্লান্ত। সত্তর-উর্ধ্ব ওমরতুন ফরিদপুরের হাজীগঞ্জের মানুষ। স্বামী-সংসার-সন্তান হারানো নিঃস্ব এক নারী সে। তার জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা ছিল নাতি জয়নাল। প্রাপ্তবয়স্ক জয়নালের কাছে সে বোঝা ছাড়া আর কিছুই মনে হয়নি; তাই বৃদ্ধ বয়সে ঘরছাড়া ওমরতুনের স্থান হয়েছে এই বস্তিতে। ওমরতুনের জীবনের গল্প সবার জানা, তবু বারবার বলে নিজের কষ্ট-লাঘব করতে চেয়েছে সে। তার জীবন অবহেলা ও লাঞ্ছনার হলেও তার জীবনদৃষ্টি অন্যদের চেয়ে আলাদা। মাতবরের স্ত্রী হওয়ায় সমাজে পর্দাপ্রথার বাড়াবাড়িকে এক অর্থে বন্দি জীবন বলেই ভাবত সে। নারী যেন পুরুষের

গোপন সম্পদ, স্বামী ছাড়া আর কোনো পুরুষের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি তাদের ছিল না। সেই পর্দাপ্রথার কড়াকড়ি বর্তমান সমাজে না থাকলেও নারীর জীবনের তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। নারী এখনো পুরুষের ভোগ্যপণ্য রূপে বিবেচিত হয়ে আসছে। বস্তির সংকীর্ণ পরিবেশের জীবনযাপন তার দৃষ্টির পরিসীমাকে সংকীর্ণ করেনি। এভাবে বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন নারীর জীবনযুদ্ধের বাস্তবতা উপন্যাসটিকে নারীকেন্দ্রিক অবয়ব দিয়েছে। যদিও লেখক বলেছেন তিনি তত্ত্বের প্রভাবে সাহিত্যকর্ম রচনা করেননি। আলোচিত সবাই এই বস্তির নিম্নবর্গীয় জীবনব্যবস্থার অংশ।

১৭.৮

বস্তির এই নির্মম, নির্মোহ, পরিবেশে সবচেয়ে বিলাসী জীবন ময়নার। সে দাউদকান্দির বিশু মোল্লার দ্বিতীয় স্ত্রী। আট টাকার ঘরের ভাড়াটিয়া সে, স্বামী স্কুটার চালায়। তার সম্পর্কে লেখক বলেছেন :

> আপন আনন্দে সে যেন আপনিই বিভোর। ...সেই নির্মম পাঁকে পা না ছুঁইয়ে জীবনের উপরের স্বচ্ছ আবরণটুকুতে সে হালকা প্রজাপতির মতো ভেসে বেড়াতে চায়। এমনকি নিজে সে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, তার সতীন আছে, এতেও সে কিছু যেন দোষের দেখতে পায় না। নিজের রূপ আর আঠারোটি বসন্তের আনন্দে সে মশগুল। (রিজিয়া, ২০১৭ : ৪২)

জীবনকে ভোগ করার নেশায় মত্ত ময়না, বস্তির পরিবেশের বিরূপ পরিস্থিতি তার মনে কোন প্রভাব ফেলে না। জীবনের সংরাগে বিমোহিত ময়না নিজের মনের অতলে নিজের জন্য সুখের স্বর্গ গড়ে তোলে। ভোগবাদী জীবনের মোড়কে নিজেকে বন্দি করে দিনযাপন করেছে সে। অসম দাম্পত্যের যন্ত্রণাকে ভুলতে রাতের অন্ধকারে হাসেমের ঘরে গিয়েছিল। হাসেমের অবহেলাকে মানতে না পেরে প্রতিশোধ নিয়েছিল অন্যভাবে। কাহিনির প্রবাহে এই সব নিরন্তর পোড় খাওয়া নারী ছাড়াও রয়েছে কিশোরী, যুবতী, মধ্যবয়সী সংগ্রামী নারী, বৃদ্ধা ভিখারী নারী। যারা লেখকের সৃষ্টিশীল সত্তায় বড় জায়গা না নিলে, সংগ্রাম, সংক্ষুব্ধতায় বস্তির পরিবেশের অংশ। উপন্যাসের সামগ্রিক সত্তায় সবাই ছোট-বড় স্তম্ভের দায়িত্ব পালন করেছে।

১৮.

শোষিত-বঞ্চিত মানুষের জীবনচিত্র রূপায়ণে লেখক রিজিয়া রহমানের আর একটি প্রত্যয়ের নাম *সূর্য সবুজ রক্ত* (১৯৮১)। উপন্যাসটি চা-শ্রমিকদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জীবনাভিজ্ঞতার এক বিস্তৃত পরিমণ্ডল। উপন্যাসের পটভূমি গড়ে উঠেছে আসাম, জলপাইগুড়ি ও সিলেট অঞ্চলের চা-বাগানকে কেন্দ্র করে। ভারত উপমহাদেশের সংগঠিত শিল্পগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো শিল্প চা-বাগান

শিল্প। উনিশ শতকের প্রথমভাগে এই শিল্পের যাত্রা শুরু হওয়ার পর এখানে শ্রমিক নিয়োগ দেয়া হয় অন্যত্র থেকে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অনুন্নত পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল এখানে। তাদের আড়কাঠির মাধ্যমে নিয়ে আসা হয়েছিল নানা ছলে বলে কৌশলে। বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা যায় যে এত শ্রমিকের চা-শিল্পে যাওয়ার কারণ, ১৮৮০-১৯২০ সালের সেই সময়ে কৃষিসংকট, ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ, ইনফ্লুয়েঞ্জা, মহামারি, খাদ্যসংকট, অনাহার, চরম দারিদ্র্য ইত্যাদি নানা কারণ। বিদেশি চা-কোম্পানিগুলোতে শ্রমিক নিয়োগের জন্য অত্যন্ত অত্যাচারী ছিল ঠিকাদারেরা। আড়কাঠিরা সুদূর গ্রামাঞ্চল থেকে শ্রমিক সংগ্রহের চেষ্টা করত এবং তাদের উপরে বিস্তার করত নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ। চা-বাগানের মালিকরা পরিবারকেন্দ্রিক নিয়োগ পছন্দ করতেন, কারণ তাতে তাদের লাভ ছিল; আড়কাঠিরা এই দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীকে মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে চা-বাগানে নিয়ে আসত। অন্যদিকে নারীরাও দারিদ্র্যের কারণে অথবা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত পারিবারিক কাঠামোর বাইরে যাবার তাগিদে চা-বাগানের আয়ের পথকে একরকম বেছে নিয়েছিল। চা-বাগানের মালিকেরা জানতেন যে স্বামী-স্ত্রী-সন্তানসহ চা-বাগানে কাজ করতে আসলে তারা সহজে পালাবে না এবং বাগানে স্থায়ীভাবে বসবাস করবে (অমল,২০১৩ : ৮০-৮১)। এমনই বিভিন্ন পরিকল্পনা করে ব্রিটিশ বেনিয়া চা-বাগানে শ্রমিক নিয়োগ করেছিল। শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে দূরবর্তী স্থান থেকে শ্রমিক আনার ব্যাপারে ইংরেজ শাসকদের বিশেষ কাজে লেগেছিল পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা। স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে দিয়ে নীল চাষ করার ফলে যে বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল, তাকে মোকাবেলা করতে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল ব্রিটিশ শাসকদের। সে কারণেই চা-শিল্পের বিনিয়োগে তারা অনেক ভাবনা-চিন্তা করে পা বাড়িয়েছিল।

১৮.১

দুটি পাতা একটি কুঁড়ির গল্প হলো *সূর্য সবুজ রক্ত* উপন্যাসের কাহিনি। এই উপন্যাসে লেখকের সফলতা শুধু চা-বাগানের কাহিনি বর্ণনায় নয়, পাশাপাশি চা-শ্রমিকদের জীবনের নানামুখী সমস্যা, বঞ্চনাকে, অসাধারণ বর্ণনায় উপস্থাপন করার মধ্যে। লেখক সব সময় শোষিত মানুষের কথা বলতে চেয়েছেন, সেই সঙ্গে শোষিত মানুষের খোঁজে নারী হয়ে উঠেছে প্রধান উপাধ্যায়। মানুষরূপে নারী সমাজে যে শোষণ আর নিপীড়নের শিকার হয়ে থাকে, সে বিষয়ে সচেতন দৃষ্টিতে সমাজ-সংসারকে দেখেছেন তিনি। চা-বাগানের কুলি কামিনরা মানুষ হয়ে সকল পুরুষ শ্রমিকের কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে শ্রম বিনিয়োগ করে থাকে; নারী হয়ে গৃহকর্ম সম্পন্ন করেছে, সন্তান লালন-পালন করেছে আবার পুরুষের অত্যাচার সহ্য করেছে। তাই নারীর জীবনকে আরও একটু আলাদা দৃষ্টিতে, আলাদা

পটভূমিতে নির্মাণ করা হয়ে থাকে। এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক কোনো ব্যক্তিজীবনের কথা বলেননি, বলেছেন সামষ্টিক জীবনের কথা। সেই সামষ্টিক জীবন নারী শ্রমিকের জীবন; যে জীবন আপাদমস্তক শ্রম আর শোষণে বিবর্ণ। নারীজীবনের বহুবর্ণিল রূপকে সামষ্টিক আখ্যানে তুলে ধরেছেন লেখক। উপন্যাসকে বলা হয় ব্যক্তি মানুষের মহাকাব্য। মূলত, সমাজ ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে ব্যক্তিমানুষের সংগ্রাম রূপায়িত হয় উপন্যাসে (বদিউর, ২০০৮ : ৩৮)। এই উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে কোনো ব্যক্তি চরিত্র বিকশিত হয়ে ওঠেনি; ব্যক্তির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্মপ্রয়াস জীবনবৃত্তান্তের সামগ্রিকতা কাহিনিতে রূপ নিয়েছে।

১৮.২

বিন্দিয়া চা-বাগানের নারীশ্রমিক, তার স্বামী রাজিন্দর। উপন্যাসের আর সব নারীর মতো সেও একজন নারী শ্রমিক। যুবতী এই বিবাহিত নারীর সংসারে সে আর তার স্বামী ছাড়া আর কেউ নেই। তার মা-বাবা কাজ করে ফুলছড়ির বাগানে, বিয়ের পর থেকে সে স্বামীর সঙ্গে মংলাছড়ির বাগানেই থাকে। স্বামী রাজিন্দরের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালোবাসার হলেও তাদের মধ্যে প্রতিদিনের বিবাদ অনিবার্য। রাজিন্দর কাজ শেষে কমলীর ঘরে গিয়ে চুয়ানীর নেশা করে, রাত কাটায়। কমলীর নাম শুনলে বিন্দিয়ার গাঁ জ্বালা করে। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় সেই ব্যাখ্যা নিম্নরূপঃ

> এই নিয়ে রোজ রাতে ওদের ঝগড়া, মারপিট। রাজিন্দর বিন্দিয়াকে পেটায়। মুখ খারাপ করে গালি দেয়, ঘরের থালাবাসন আছড়ায়। বিন্দিয়াও ছাড়ে না। চিল চিৎকারে রাজিন্দরের চৌদ্দগুষ্টির শাপান্ত করে। ...পরদিন সকালে দুজনই ভালো মানুষ। যেন কোনো কালে ওদের মধ্যে ঝগড়া, মারপিট হয়নি। (রিজিয়া,২০১৭ : ২৩৪)

এই প্রত্যাহিক সংঘাতময় দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে তাদের ভালোবাসা। জীবনের বঞ্চনা থেকে বিন্দিয়ার স্বামীর প্রতি ক্ষোভ থাকলেও ভালোবাসার অন্ত নাই। নিম্নবর্গের শ্রমজীবী জীবন, নারী জীবনের একটি দিককে উন্মুক্ত করেছে, সে হলো অর্থনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ততা। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থাকার কারণে সে চাইলে রাজিন্দর থেকে আলাদা জীবন বেছে নিতে পারে; নেয়নি, কারণ সে রাজিন্দরকে ভালোবাসে। ভারতীয় উপমহাদেশের নারীরা স্বামীকেন্দ্রিক এক মোহজালে আচ্ছন্ন থাকে। শত অত্যাচার-নির্যাতনের মধ্যেও তারা স্বামী সম্পর্ক ছিন্ন করার সাহস অর্জন করতে পারে না। সমাজের এই প্রান্ত প্রদেশের এই নারীর জন্য আছে ধর্ম, সমাজ আর পঞ্চায়েতের বন্ধন।

১৮.৩

যেহেতু মানুষের প্রতিদিনকার সংগ্রাম আর জীবন হচ্ছে শিল্প-সাহিত্যের মূল উপজীব্য বিষয়। (মাসুদুজ্জামান, ২০০৭ : ২২) সেখানে নারী সম্পর্কিত লেখালেখির মাধ্যমে নারীর সমস্যাসমূহের সালুক-সন্ধান পাওয়া যায়। উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে নারী জীবনের চঞ্চলতা সমাজ কীভাবে দেখে ঐ সমাজের পরিসরে তার কিরূপ ভূমিকা পড়ে; এমনই সব বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতের মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হয়েছ শ্রীমতীর জীবন। শ্রীমতি চা-বাগানের মদ্রাজি মেয়ে। সে বিভিন্ন কারণেই অন্য নারীদের তুলনায় সাহসী ও স্বতন্ত্র। নিজ সম্প্রদায়ের ছেলে সুরেশের সঙ্গে কিছুদিন বসবাসও করলেও, সুরেশের মতো ঠাণ্ডা প্রকৃতির ছেলেকে তার মনে ধরেনি শ্রীমতীর: ‘লোকে আমায় বলে ঢেমনি। তা ছাড়া আমি তো ছোট জাতের মেয়ে। আমার ঘরে তোর জাত যাবে না? শ্রীমতীকে কে কঠিন দুবাহুর বাঁধনে বাঁধল হরিশ–কিসের জাত! ...এতদিনে কি সেই পুরুষ এলো শ্রীমতীর জীবনে যে পুরুষের স্বপ্ন দেখে তার মন।’ (রিজিয়া, ২০১৭ : ৩৩৬) শ্রীমতীর দীপ্তিময় শরীর হরিশের মনে আগুন জ্বালিয়েছিল। পঞ্চায়েতের নিয়মকে অমান্য মুসলিম হয়ে বিয়ে করেছিল তারা। শ্রীমতীর সুখকে মানতে পারল না সুরেশ, তাই ইচ্ছাকৃত বিবাদে পুড়িয়ে মারল হরিশকে। নারীর স্বাধীন ও স্বনির্ভরতাকে পুরুষ কখনোই ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে না। নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করা নারীর নিজস্ব সংগ্রামের অংশ। যে শ্রেণি সমাজের মধ্যে পুরুষ বিচরণ করে, নারী সেই সমাজের অংশ। এখানে একজন শ্রমজীবীর সংগ্রাম আর নারীর সংগ্রাম এক নয় (যশোধরা, ২০১২ : ৭৮)। নারী সর্বত্র লৈঙ্গিক বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকে। শ্রীমতী এক দুঃসাহসী ও আধুনিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারীও বটে। প্রেমের জন্য সে সমাজ-সংসার, আত্মীয়স্বজন, কুল-মান সমস্ত ত্যাগ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি। সামাজিক অনুশাসন, সংস্কার-সবকিছু তছনছ করে সে এগিয়ে চলেছে আপন হৃদয়ের প্রত্যাশা পূরণের তাগিদে।

১৮.৫

শ্রমজীবী জীবনের প্রতিটি সময়, প্রতিটি দিন, বঞ্চনা আর অবহেলায় ভরা। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তা আরো কঠিন, আরো রিক্ততায় ভরা হয়ে থাকে। জীবনযুদ্ধের দীর্ঘ সময়ের পর বৃদ্ধ অসহায় নর-নারী সন্তানের আশ্রয় ও সহযোগিতা দুইই কামনা করে। সব সন্তানের মধ্যে সেই শিক্ষা ও কর্তব্যবোধের যথার্থ প্রতিফলন লক্ষ করা যায় না। সন্তান থাকা সত্ত্বে অবাঞ্ছনীয় বিড়ম্বনার পাত্র হয়ে

থাকে; উপন্যাসের রজার মা তেমনি এক শ্রমজীবী নারী। সন্তান দায়িত্ব অস্বীকার করলেও, তার বেঁচে থাকার ক্ষুধা শেষ হয়ে যায় না; জীবনের ভারকে তার বয়ে চলতে হয়েছে নিরন্তর। বৃদ্ধা এই নারী শারীরিক অক্ষমতার জন্য যেমন বিভিন্নভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে, তেমনি অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতার জন্য প্রতি পদক্ষেপেই হয়েছে মর্মাহত। কখনো নিজ সম্প্রদায়ের সহযোগিতা পেয়েছে, কখনো পায়নি। রজর মার এই জীবনকে বয়ে চলা যেমন দুর্বিষহ ছিল তেমনি হৃদয়স্পর্শী তার মৃত্যু :

> বিন্দিয়া অবাক হলো। দুহাতে গাছ জড়িয়ে গাছের ওপর মুখ রেখে দাঁড়িয়ে আছে রজর মা।... সাই ছুটে এসে ঘিরে ধরল চারিদিক থেকে। ব্যাপারটা বুঝতে কারো বাকি রইল না। কিন্তু এ কি অদ্ভুত ভঙ্গির মৃত্যু! মনে হয় চা গাছকে জড়িয়ে চা গাছের বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছে রজর মা। (রিজিয়া, ২০১৭ : ৪০১)

এভাবে শ্রমজীবী মানুষের জীবন শ্রমসিক্ত পরিবেশে নিঃশেষ হয়ে যায়। রজর মার মতো আরো দুজন নারীকে উপন্যাসের পরিসরে আবিষ্কার করা যায়। একজন হরমতী আর একজন কালিন্দী। বৃদ্ধ বয়সের এই দুর্যোগপূর্ণ সময় চা বাগানের রূঢ় পরিবেশে আরো অনেক সংকটময় হয়ে ওঠে।

১৮.৬

চা-বাগানের কাজে শুরু থেকেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীরা কাজ করে। বিশেষ কিছু ধরনের কাজ আছে, যা পুরুষ অপেক্ষা নারীরা বিশেষ ভালো করে থাকে। তাই বাগান মালিকগণ সেখানে নারী শ্রমিকদের নিয়োগ দিতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। যেমন চা-পাতা তোলা, কুড়ানো এবং ছাঁটার কাজে পুরুষের চেয়ে নারীরাই বেশি দক্ষতার পরিচয় দিয়ে থাকে। নারীর নরম ও সরু আঙুল অতি সূক্ষ্মভাবে এই কাজগুলো করতে সক্ষম হয়। চা-বাগানের শ্রমিক নারীরা গ্রামের কৃষি সমাজ থেকে উদ্ভূত। ঔপনিবেশিক শিল্পায়নের ধাক্কায় যে লক্ষ লক্ষ জনগোষ্ঠী মজুরি ও শ্রমিক হয়েছিল, এরা তাদেরই একটি অংশ। উড়িষ্যা, মধ্য প্রদেশ ও মাদ্রাজ থেকে দেশান্তরী নারী শ্রমিকরা বাগানে কাজ করতে এসেছিল (অমল, ২০১৩ : ৮৩)। এই নারীরা কাজ করতে এসে শোষণের শিকার হয়েছিল বিভিন্নভাবে। নারী হিসেবে লৈঙ্গিক শোষণ-নিপীড়ন যেমন তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল; তেমনি শ্রমিক হিসেবে মজুরি-বৈষম্যেরও শিকার হতে হয়েছে তাদের। ১৮৭০ সালের আইন অনুযায়ী নারী-পুরুষ উভয়ের বাগানে মোট ৯ ঘণ্টা করা বাধ্যতামূলক। অনেক সময় এই আইন সঠিকভাবে মানা হয় না। নারীদের শ্রমের হার অনেক বেশি কারণ, নারীরা বাগানের কাজের পাশাপাশি সংসারের কাজে তারা শ্রম দেয়; ফলে তারা ঘরে বাইরে প্রায় ১৫-১৬ ঘণ্টা শ্রম দিয়ে থাকে। আবার মজুরির ক্ষেত্রে নারীরা বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকে। অথচ বাগানের আশি ভাগ কাজ নারীরা সম্পন্ন করে থাকে। এভাবে এই জনপদের নারী শ্রমিক বছরের পর বছর ধরে বিভিন্নভাবে শোষিত হয়ে আসছে।

১৮.৭

চা-বাগানের দুঃখ-কষ্টময় জীর্ণ জীবনের একমাত্র সুখী সংসারের গল্প বিষ্ণুর স্ত্রী চন্দনীর। এ পাড়ায় সবচেয়ে অবস্থাপন্ন ঘর তাদের। চন্দনীর দুই জোয়ান ছেলে তিন মেয়ে সবাই বাগানে কাজ করে। তাছাড়া তার স্বামী বিষ্ণু জমি থেকে ফসল তোলে, নেশা করে পয়সা উড়ায় না। চা-বাগানের সহজ - সাধারণ জীবনে সে ও তার পরিবারের সদস্যরা তাতে অভ্যস্ত হয়ে চলেছে। সবাই বলে চন্দনী কপাল করে এসেছে বটে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শাড়ি, কানে কানপাশা সব মিলিয়ে তাকে অভিজাত অভিজাত লাগে। চা-বাগানের দুঃখ কষ্টভরা বিড়ম্বিত জীবনের মধ্যে সে ও তার পরিবারের সদস্যরা সমৃদ্ধ জীবনের ইতিহাস। চন্দনীর পরিবার এই অভাবক্লিষ্ট দীর্ণ জীবনের পাশে একমাত্র সমৃদ্ধ ইতিহাসের অংশ।

১৮.৮

চা-বাগান শিল্পে পরিবারভিত্তিক কাজের উপর গুরুত্ব দেয়া হলেও তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কোনো ভাবনা ভাবা হয় না। নারী শ্রমজীবীদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য বাগান কর্তৃপক্ষ ছুটি ছাটা ও অন্যান্য আইন প্রবর্তনের ওপর জোর দিয়েছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল মাতৃত্বকালীন ছুটি। ১৯৬১ সালে প্রণীত মাতৃত্বকালীন আইন অনুযায়ী গর্ভবতী নারী শ্রমিক সন্তান প্রসবের আগে ও পরে মোট ১২ সপ্তাহ ছুটি পাবে। এই ছুটিটা নারীরা পারিশ্রমিকসহ পেয়ে থাকে। এখানে রয়েছে নানা ধরনের সমস্যা, শ্রমজীবী নারীর স্বামীরা এই সুযোগের অপব্যবহার করতে থাকে। উপন্যাসে দেখা যায় ঝাড়ু এই ছুটি আর বেতনের আশায় বারবার সন্তান নিত। পর পর চার সন্তানের মা হওয়ার কারণে ঝাড়ুর স্ত্রী এক্লামশিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। এভাবে চা-বাগানের কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের অপচেষ্টায় বিলীন হয়েছে নারীর জীবন। নিম্নবর্গের নারীজীবনের ভালো উদ্যোগও শেষ পর্যন্ত কার্যকর হতে পারে না। চা-বাগানের শ্রমজীবী নারীদের জীবন বিভিন্ন অপচেষ্টায় নিরবেই ঝরে পড়ে। কেউ তাদের নিয়ে ভাববার বা তাদের নিয়ে কথা বলার নেই।

১৯.

বাঙালির জাতীয় জীবনের মহাকাব্য হলো মুক্তিযুদ্ধ। মহাকাব্যস্বরূপ সেই মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা আবহে একটি বড় ক্ষত হলো দুই লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমহানি। মুক্তিযুদ্ধকে পটভূমিতে রেখে বহু সাহিত্য নির্মিত হলেও মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে লাঞ্ছিতা নারীর পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে খুব বেশি

সাহিত্য রচিত হয়নি। *রক্তের অক্ষরে* (১৯৭৮) সেই সমস্ত নারীকে কেন্দ্র করে রচিত উপন্যাস, যেখানে মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বীরাঙ্গনা নারীর লাঞ্ছিত জীবনের একটি সর্বাবয়ব চিত্রের প্রতিচ্ছবি। সমাজ-সংসার তার স্বাভাবিক জীবনের নিশ্চয়তা দিতে না পারায় তার আশ্রয় হয়েছে বারাঙ্গনা পল্লিতে। ইয়াসমীন উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হওয়ায় তাকে কেন্দ্র করে বারাঙ্গনা পল্লির নারী জীবনের চিত্র উঠে এসেছে। পুরান ঢাকার গোলাপি পট্টি একটি নিষিদ্ধপল্লি। 'পতিতাপল্লির আদিম রিরংসায় ভারাক্রান্ত পরিবেশে জীবনের প্রকাশ ও তার সমূহ বিনাশ এ উপন্যাসের উপজীব্য।'(রফিকউল্লাহ, ১৯৯৬ : ২৭৩) এখানে দেহ ব্যবসায় রত কুসুম, বকুল, শান্তি, জরিনা, পিরু, পারুল, ফুলমতি, ইয়াসমীন, জাহানারা সবাই। এদের সবার বয়সের ভিন্নতার মতো কাজেরও ভিন্নতা আছে। কারো উপার্জন স্বল্প, কারো বা উচ্ছ্বসিত যৌবনের চাহিদায় টাকাওয়ালা দামি কস্টমারের ভিড়। দেহ বিকিকিনির এই ব্যবসায় কেউ স্বাধীন আবার কেউ হারু সর্দার বা কালু গুণ্ডার অধীন। তবে কেউ-ই স্বইচ্ছায় এই পেশায় আসে না, বিভিন্ন ঘটনা, বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে দিয়ে তারা এখানে আসে। এখানকার একেকজন নারীর জীবন এক একটি গল্পের আধার।

১৯.১

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ইয়াসমীন, তার চারপাশে অবস্থানকারীরা তারই মতো সংগ্রামশীল নারী। গোলাপি পট্টির সংকীর্ণ পরিবেশ ও জীবনধারার মধ্যে ইয়াসমীন এক ব্যতিক্রমী নারী ও বৈচিত্র্যময় সত্তা। সে ছিল আর দশজন মধ্যবিত্ত, আধুনিক, শিক্ষিত নারীর স্বত্বাধিকারী। মুক্তিযুদ্ধের বৈরী আঘাত তার জীবনের পরিচিত পরিমণ্ডলকে পাল্টে দিয়েছিল। পাকিস্তানি সৈনিকের হিংস্র থাবা তার জীবনের গতিপথকে পাল্টে বিষাক্ত আর দূষিত হাওয়ায় করে তুলেছিল অবাঞ্ছিত। যুদ্ধের কাল রাত পরিবারের সবাইকে নিশ্চিহ্ন করে দিলেও বাঁচিয়ে রেখেছিল তাকে। কারণ সে তো নারী, তাকে তিলে তিলে মরতে দেখে পুরুষের আনন্দ। ১৯৭১ সালের নয় মাসে বাংলাদেশের শত শত নারী সম্ভ্রম হারিয়ে যেভাবে ক্ষয়ে ক্ষয়ে বেঁচেছিল, ইয়াসমীন তাদেরই একজন। রাষ্ট্র তাদের দলবেঁধে বীরাঙ্গনা খেতাব দিয়েছিল, কিন্তু সমাজ-পরিবারে তাদের ঠাঁই হয়নি। তাদের কারো কারো শেষ পর্যন্ত আশ্রয় হয়েছিল বারাঙ্গনা পল্লিতে। প্রতিকূল পরিবেশকে মোকাবেলা করতে করতে ইয়াসমীন শেষ পর্যন্ত বেছে নিয়েছিল অন্ধকারের এই জীবনকে। যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে স্বজনের নিকট সে হয়েছিল বিড়ম্বিত সত্তা, চাকরির ইন্টারভিউ বোর্ডে সে হয়েছিল কৌতূহলের পাত্রী। যেমন :'...আপনি বীরাঙ্গনা কেমন করে, কোথা থেকে ধরেছিল আপনাকে? ... আরেকজন প্রশ্ন করেছে- কি ধরনের টর্চার করত ওরা?' (রিজিয়া, ২০১৭ : ৪০৯) এমনই অসংখ্য যুক্তিহীন, অবান্তর প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করতো সমাজ তাকে।

মনের এই ক্ষতকে রক্তাক্ত করে যারা আনন্দ পেত, তাদের কাছে ইয়াসমীন ছিল এক কিম্ভূতাকার প্রাণী। প্রতিদিনের এই মৃত্যু থেকে বাঁচতে তাকে আশ্রয় নিতে হয়েছিল গোলাপি পট্টির দমবন্ধ পরিবেশে। এ প্রসঙ্গে *আমি বীরাঙ্গনা বলছি* গ্রন্থের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। যেখানে বীরাঙ্গনার আত্মকথার আদলে যুদ্ধের দাবানল কীভাবে দগ্ধ করেছিল এদেশের নারীর জীবনকে তার বিশ্বস্ত রূপরেখা পাওয়া যায়। 'আমার পরিচয় জানতে চান? আমি প্রকৃতপক্ষে একজন বীরাঙ্গনা; শুধু দেহে নয়-মনে, মননে, হৃদয়ে।...আমি তো বীরাঙ্গনাই ছিলাম। আপনারা বানাতে চেয়েছেন বারাঙ্গনা।' (নীলিমা, ২০১৩ : ৮০) পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির কদর্যতা বীরাঙ্গনাকে বারাঙ্গনার পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে। বীরাঙ্গনা নারীকে বাধ্য করেছে বারাঙ্গনার জীবন বেছে নিতে; ইয়াসমিন নামক চরিত্রটি সেই ক্ষতর অবধারিত রূপ।

১৯.২

ইয়াসমীন তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে হাজির হয়েছে উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, যে সমাজে বেশ্যা মানুষ হিসেবে অধিকার পাবে না, সে সমাজব্যবস্থা নারীর সব ধরনের দাসত্বকেই নির্দেশ করবে। (হুমায়ুন, ২০১৫ :২৯৯) এখানে অবস্থানকারী প্রত্যেকটি নারীর আলাদা আলাদা একটি অতীত থাকলেও তার অতীত অন্যদের থেকে তাকে মহিমামণ্ডিত করেছে। তার অতীতের সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেশ ও জাতির রক্তাক্ত ইতিহাস। যে অতীত তার জন্য সম্মানের হতে পারত সেই অতীত তাকে পৌঁছে দিয়েছে গ্লানি আর ক্লেদাক্ত পরিবেশের পরিসীমায়। এই যন্ত্রণা আর বঞ্চনার বহ্নিশিখা থেকে সে মুক্ত হতে পারে না। সে পারে না পঙ্কিল পরিবেশের এই পঙ্কিলতায় অবগাহন করতে; একই সঙ্গে পুরোনো জীবনের রুচিশীল কিছু অভ্যাস আর আদর্শকে বিসর্জন দিতে। তার এই না পরার যন্ত্রণাকে লেখক বিভিন্ন ঘটনার অনুষঙ্গে তুলে ধরেছেন। তবে গোলাপি পট্টির অসহায় নারীদের প্রতি তার সহযোগিতা আর সহমর্মিতার কোনো অভাব হয় না। বিশেষ করে কারো বাড়ি থেকে আসা চিঠি পড়ে দেওয়ার বা চিঠি লিখে দেওয়ায় তাকে সবার প্রয়োজন হয়। তারপরও শুধু বাঁচার জন্য সমস্ত আলো আর আলোকিত পরিবেশ ছেড়ে সে আশ্রয় নিয়েছিল নগর জীবনের অন্তরালবর্তী এই অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে। তার চেতনাদীপ্ত সত্তাকে মানতে পারেনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজ; তাদের পেশিবহুল শক্তি শেষ করেছে ইয়াসমিনের বিদ্রোহী সত্তাকে। 'ইয়াসমীনের মর্মান্তিক মৃত্যু পুরুষশাসিত ও শ্রেণিবিভক্ত সমাজে নারীর বিপন্ন অস্তিত্বকেই কেবল নির্দেশ করে না, একটি জাতির স্বপ্ন এবং স্বপ্নভঙ্গজনিত ট্র্যাজেডির স্বরূপও উন্মোচন করে।' (রফিকউল্লাহ, ১৯৯৬ : ২৭৩) যে সমাজ নারীকে মানুষরূপে বাঁচতে দেয় না, সেখানে ইয়াসমিনের বীরাঙ্গনাকে এভাবেই জীবন দিতে

হয়। একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার পরবর্তী সময়ের আখ্যান এই উপন্যাস। উপনিবেশ-উত্তর স্বাধীন রাষ্ট্র হয়ে এদেশের সমাজ-রাজনৈতিক কাঠামো বহন করে ঔপনিবেশিক মূল্যবোধ ও সংস্কার। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক যে বলেছেন নিম্নবর্গ নিজের কথা বলতে পারে না; বলতে না পারার সীমাবদ্ধতায় এই পরিমণ্ডল। ইয়াসমিন চেতনাগত স্তরে উচ্চবর্গ হলেও যাপিত জীবনে নিম্নবর্গ। (মেহেদী, ২০০৮: ১৮৯) এই বৈপরীত্যে বাস করে একজন নারীর মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা কিরূপ হতে পারে, তারই নিরীক্ষা করেছেন লেখক রিজিয়া রহমান। শুধু নারী হওয়ার কারণে ইয়াসমিনের জীবন নিম্নবর্গের তলানিতে এসে দাঁড়িয়েছে। ইয়াসমিনের নিম্নবর্গ হয়ে ওঠার সুদীর্ঘ ইতিহাস এই উপন্যাসের অন্যতম আলোকিত দিক।

১৯.৩

জাহানারা গোলাপি পট্টির সর্বাপেক্ষা উপর্জনকারী নারী। তার নিজের উপার্জনের টাকায় দুটি মদের দোকান চলে আর স্বাধীনভাবে ঘর ভাড়া করে সে গোলাপি পট্টিতে ব্যবসা করে থাকে। তার মতো সুন্দরী রূপবতী নারী এই পাড়ায় না থাকায় তার কদর বেশি। ময়না নামক এক নারী তার ফায় ফরমাশ খাটে। দুহাতে টাকা উপার্জন করে এ পাড়ার মধ্যে সবচেয়ে বিলাসী জীবনযাপন করে সে। এভাবে বয়সের স্রোতে ভেসে যায় জাহান আরার সময়। যৌবনেই বারাঙ্গনাদের যত কদর, বয়স বাড়তে থাকলে নেমে আসে অপরিসীম দুর্দশা। রূপ যৌবন থাকলে খদ্দের আসবে, কিন্তু যখনই রূপ-যৌবনের চাকচিক্য শরীর থেকে বিতাড়িত হবে; তখনই স্বাভাবিকভাবে খদ্দের আর রাস্তা মাড়াবে না। জাহান আরার জীবনে এই দুটি দিকই এসেছিল :

> জাহান আরার ভাগ্যের অতিমাত্রার প্রসন্নতাকে যারা এতদিন ঈর্ষা করেছে, তারা মুখ মুচরে হাসল–কই গেল এত পয়সাওয়ালা দামি দামি কাস্টমার? এত শাড়ি-গয়নার ফুটানি! গাড়ি চইড়া হাওয়া খাওন? দিন গ্যাছে। সবতেরই যায়। বেশ্যার কপাল হইল পূর্ণিমা-আমাবইস্যার জো। (রিজিয়া, ২০১৭: ৪৯৮)

সময়ের পথ বেয়ে যৌন রোগ তার শরীরে বাসা বেঁধেছে। শরীরের শক্তি থাকা অবস্থায় তার মনের শক্তি নিভে যায়। এ পাড়ার অন্য নারীদের শরীরেও এই রোগের প্রাদুর্ভাব সে দেখেছিল। ভয়ংকর ক্ষত আর বীভৎসতায় ছেঁয়ে গিয়েছিল তাদের শরীর। রহিমুন তার জ্বলন্ত উদাহরণ হিসেবে চোখের সামনে দণ্ডায়মান। নিজেকে সুস্থ করার জন্য সমস্ত চেষ্টা সে করেছে। তবু সম্ভাব্য অন্ধকার তার মন আর শরীরকে গ্রাস করেছে।

> জাহান আরা মাঝে মাঝে ক্ষেপে উঠে। কুৎসিত ভাষায় গালাগাল দেয় ময়নাকে, বাড়িসুদ্ধ সবাইকে। ...তারপর তার বিগত দেহ প্রেমিকদের নাম ধরে গালাগালি করতে করতে একা ঘরে পাগলের মতো দেওয়ালে মাথা কুটতে লাগল নিরুপায়, নিঃসহায় জাহান আরা। (রিজিয়া, ২০১৭ : ৪৯৮)

গোলিপি পট্টির দুর্গন্ধময় পঙ্কিল পরিবেশে জাহান আরার মতো নারীরা একদিন ফুলের মতো সৌরভ নিয়ে ফুটে ওঠে, আবার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কালিমায় লিপ্ত হয়ে নিঃশেষে প্রাণ দান করে ঝরে যায়। যে সমাজ পচা পানির ডোবা হয়ে উঠেছে, যার তীর্যক গন্ধে চারপাশকে জানান দিয়েছে, সেখানে প্রত্যেকেই বেঁচে থাকার ভান করেছে, কিন্তু প্রত্যেকেই মৃত। শুধু বেঁচে থাকার অভিনয় করেছে, জাহান আরা তাদের মধ্যে একজন। জাহান আরার এই নির্মম পরিণতির সঙ্গে মিল পাওয়া যায় মিশেল ফুকোর একটি বক্তব্যের। ফুকোর মতে, পুঁজিবাদ মানুষকে ততটুকুই মূল্যায়ন করে, যতটুকু মুনাফা তার নিজের প্রয়োজন হয়। ব্যক্তির মুনাফা অতিরিক্তি কোনো মূল্য পুঁজিবাদের কাছে নেই (অভিজিৎ, ১৯৯৬ : ৬৮)। ঐ সমাজে জাহান আরার প্রয়োজন তত দিন ছিল, যত দিন তার শরীর পুরুষের তৃষ্ণা মিটিয়েছে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো মূল্য জাহান আরারা এই সমাজের কাছে পায় না। গোলাপি পট্টিতে কেউ বানের স্রোতে ভেসে আসেনি, এসেছে দুর্ভিক্ষের প্রচণ্ড থাবায়, নয়তো গুণ্ডা আর দালালের খপ্পরে পড়ে। ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রশ্ন নেই, বাঁচার তাগিদে কখনো গুণ্ডাদের মারের ভয়ে তাদের গলিতে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। শরীরের কষ্টের মূল্য এখানে নেই, তারা পালিয়ে রক্ষা পায় না, অক্ষমতার সর্দারদের কাছে (কল্যাণ, ২০২০ : ১৬৬)। কুসুম তেমনি একজন নারী, এ পাড়ায় যাদের উপার্জন কম। উপার্জন যাদের কম, যারা নিয়মিত খদ্দের ধরতে পারে না, তাদের কষ্ট বহুমাত্রিক। কুসুম জরিনা শান্তির সঙ্গে এক ঘরে থাকলেও সে স্বাধীন নয়, সে কালু গুণ্ডার অধীনে থেকে ব্যবসা করে। অন্যদের মতো তাদের জীবনে বিলাস ব্যসন নেই। উপার্জন করতে না পারলে দিনের পর দিন তাদের না খেয়ে থাকতে হয়। লুকিয়ে দুটো পয়সা আলাদা করলেও তার জন্য খেসারত দিতে হয়।

> ওই যমের মতো লোকটা কালও তাকে দুটো ভারি ওজনের লাথি মেরে গেছে। তলপেটে এখনো চাপধরা ব্যথা হয়ে আছে।... রোজের পয়সা তো সে চোখে দেখে না। তবু যেদিন রোজ দিতে পারে না, সেদিন ডাল-ভাতও আসে না। দুদিন রোজ দিতে পারেনি কুসুম। লোক পায়নি। তাও পায়নি। ঠিকে মাসিকে দিয়ে মুড়ি কিনে লুকিয়ে ঘরে ঢুকছিল। কালু কোথা থেকে ঝড়ের মতো এসে পড়ল।...ততক্ষণে কালুর চড়-লাথি কুসুমের ছোট্ট শরীরকে শ্রান্ত করে ফেলেছে। (রিজিয়া, ২০১৭: ৪৭৭)

এই অত্যাচার-নির্যাতনের জীবনে কেউ কারো দিকে ফিরেও তাকায় না। কেউ কারো কেনা মেয়ে তো সে তার দাসেরও অধম। আর্থিক অনটন কঠিন বাস্তবের যেন এক একটি প্রতিমূর্তি। প্রতিটি চরিত্র উঠে এসেছে নিদারুণ, নিরন্ন আর অসহায়তার মধ্যে থেকে। নির্দিষ্ট সময়ের প্রেক্ষিতে ঔপন্যাসিক

সমকালীনের বিশ্বস্ত চিত্রকে তুলে ধরেছেন এই উপন্যাসে। এখানে প্রত্যেকে প্রত্যেকের যন্ত্রণা বোঝে, তাই কুসুমের অসহায়তা অপারগতায় শান্তি মাঝে মাঝে তাকে সহযোগিতা করেছে। শান্তির ফায়ফরমাশ খেটে দিলে, একটা ডালপুরি দিয়ে, একটু বাসি-পচা খাবার দিয়ে সাহায্য করেছে। এই স্বার্থমগ্ন পৃথিবীতে এইটুকু পাওয়ায় অনেক হয়ে দেখা দিয়েছে তাদের নিকটে। স্বার্থের বাইরে এসে সবার সবাইকে সহযোগিতা করার ইচ্ছা থাকলে দারিদ্র্যের অপরিমেয় দুর্যোগে পেরে ওঠে না। গণিকা পল্লিতে সবার মতো কুসুমেরও একটি অতীত আছে :

> দূর-ঝাপসা একটা স্মৃতি... কোথায় যেন পড়ে আছে মনের কোণে। এমনি করে, ঠিক এমনি ভঙ্গিতে মা তার ছোট ভাইটার মুখে দুধ তুলে দিত। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল। ফুলমতীর রোগা টিকটিকির মতো বাচ্চার দিকে তাকিয়ে ভাবল। (রিজিয়া, ২০১৭ : ৪১৫)

গণিকার জীবন যে বড় দুর্বিষহ। ফেলে আসা অতীতের সুন্দর মধুময় জীবনের কথা মনে পড়তেই তাদের প্রাণ-মন বারে বারে কেঁদে ওঠে, প্রতিনিয়ত অসহায় রুদ্ধ-আবেগেকে দমন করে বেঁচে থাকা যে কষ্টকর, তারই চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে এখানে। আজ যেখানে এসে সে দাঁড়িয়েছে শত, চেষ্টাতেও সেখান থেকে ফিরে যেতে পারবে না। শুধু কান্নাকে সম্বল করে এভাবেই বেঁচে থাকতে হয় তাদের।

১৯.৪

বকুল এপাড়ার উঠতি ভাগ্যবতীদের একজন। তার ঘরে বাঁধা মানুষ থাকে, তার শরীরের সুগঠিত গঠন অন্যদের চোখে জ্বালা ধরায়। তার বিলাসী স্বভাবের মধ্যে আছে দামি সিগারেট খাওয়া, প্রতি সপ্তাহে সিনেমায় যাওয়া, বেছে বেছে খরিদ্দার নেয়া। এই সমস্ত হাজারও বিলাস-ব্যাসনের অভ্যাসের মধ্যে তার আছে যন্ত্রণা, আছে কষ্টের তীব্রতা। একবার এক খদ্দের তাকে চাবুক দিয়ে মনের সুখে পিটিয়েছিল। সেদিন বকুলের দুঃখের আগল ভেঙ্গে গিয়েছিল : ‘বকুল হঠাৎ অজানা কোনো দুঃখ উথলে উঠল। রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত শরীরের বেদনা নিয়ে ডুকরে কাঁদতে শুরু করল সে।’ (রিজিয়া, ২০১৭ : ৪৭৫) এই পট্টিতে কত রকমের পুরুষ কত রকমের ক্ষুধা মেটাতে আসে। তাদের বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে বিপন্ন হয় নারীর জীবন। পুরুষের প্রবঞ্চনা আর লালসার শিকারে নারীর স্বাভাবিক জীবনের পথ অবরুদ্ধ হয় চিরতরে। লেখক বারাঙ্গনা চরিত্রের মধ্য দিয়ে সমাজের আর পাঁচটা অবহেলিত মানুষের মতো শোক-দুঃখ, জীবনযন্ত্রণাকে পাথেয় করে বেঁচে থাকার চিত্র তুলে ধরেছেন।

১৯.৫

শান্তির স্বাধীন ব্যবসা, তার ব্যবসার বাজারও এখন উঠতি। তার বয়স কুড়ি বছর, সিনেমার নায়িকার মতো সুগঠিত শরীর। শান্তির অতীতও আর সবার মতো তিক্ততায় ভরা। ক্ষুধার অন্ন জোগাতে না

পেরে শহরে এসছিল কাজের আশায়, কাজ করেও পেটের ক্ষুধা নিবারণ করতে না পারলে, বাধ্য হয়েই নেমেছিল এই পথে। সে কথা মনে করে মর্জিনাকে বলেছে :

> –তরা তো এমুন কথা কবি-ই। যহন আমি রাইতে না খাইয়া ছটফটাইছি, তখন তার বউ একনলা ভাত আউগাইয়া দিছেনি? আমারে হামলাইয়া পোলাপান লইয়া ঘরে দুয়ার দিয়া ভাত খাইছে। মা-বাপ আছিল না। এক ভাই, তাও বউর ডরে কথা কইবার পারে নাই। (রিজিয়া,২০১৭ : ৪৪৯)

সব গণিকার বুকের মধ্যে গুমড়ে মরে এমনি সব দুঃখের স্মৃতি। কিন্তু তারা নিরুপায়, কান্নাকে সম্বল করে বেঁচে থাকতে হয়েছে তাদের। জীবনের নানান উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে তারা এই স্থানে পৌঁছায়। মমতার কাহিনি একটু অন্য রকম, প্রতারণার স্রোতে সে ভেসে এসেছে এই পল্লিতে। সে স্বপ্ন দেখত নায়িকা হওয়ার। এমনি ছলনার জালে তার স্বপ্নের পুরুষ হয়ে যে জীবনে এসেছিল, সেই তাকে বিক্রি করে দিয়ে যায় এখানে। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় :

> এ পাড়ায় অনেকেই জানে বরিশালের মমতা সিনেমার নায়িকা হওয়ার জন্য বাড়ি থেকে পালিয়েছিল। কিন্তু তারপর সিনেমার নায়িকা কেন, পর্দায় মুখটা পর্যন্ত দেখার সুযোগ তার হয়নি।... পাশবিক লালসা চরিতার্থ করতে যারা আসে, তাদের মধ্যে নায়কের ছাপ পাওয়া যায় না। তারা যেন ভিলেন হয়ে আসে।... মমতা ভুলে যায় সিনেমা-জগতের অন্ধকার দিকটা, যে অন্ধকার তাকে এই জীবনে নিয়ে এসেছে। (রিজিয়া, ২০১৭:৪৪৩)

অবস্থার বিপর্যয় নারীকে সঁপে দেয় সমাজের ঘৃণিত অন্ধকূপে। যুদ্ধোত্তর সমাজে দুর্ভিক্ষ আর দারিদ্র্যের করাল ছায়ায় বিপর্যস্ত হয়েছিল জনজীবন। যুদ্ধোত্তর জনজীবনের পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সমাজবোধের দৃষ্টান্ত হিসেবে *রক্তের অক্ষর* উপন্যাসকে মানবিক এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে ধারণা করা যায়। উপন্যাসের এই নারীদের জীবনের পটভূমি নির্মাণে যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের পটভূমি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

১৯.৬

এই পল্লির সবচেয়ে কম বয়সী মেয়ে পারুল আর পিরু। পারুল মাতৃহীন, সৎমায়ের সংসারে নানা যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে দিন কেটেছিল তার। দুর্ভিক্ষের চূড়ান্ত দুর্দিনে সৎমা তাকে দালালের হতে, বিক্রি করে দিয়েছে। সেই সময় থেকে সে এখানে, এই পল্লিতে থাকে। তার অতীত জীবন নিয়ে মাথাব্যথা নেই, বরং এই জীবনকে মেনে নিয়েছে সে, এই কাজের কলা কৌশল রপ্ত করে নিজের সমৃদ্ধির পথ রচনা করতে চেয়েছে সে। এই পেশায় সে জাহান আরাকে অনুসরণ করেছে, '– আমি একদিন জাহান আরা বুর মতো হমু। গাড়ি চইড়া বাইরে যামু। দোকান কিনুম। পায়ের ওপর পা দিয়ে সবটিরে হুকুম

করুম। (রিজিয়া, ২০১৭ : ৪৪৪) গণিকারা সমাজের এমন স্তরের জীব যে তাদের স্বপ্ন দেখাও অবাঞ্ছনীয়। গণিকাদের স্বপ্ন দেখতে নেই। কেবল একরাশ হতাশা, যন্ত্রণা, ব্যথা, দুঃখ বুকের মধ্যে চেপে রেখে তাদের শেষদিনের জন্য প্রতীক্ষা করতে হয়। অথচ নাগরিক জীবনের অন্যতম অনুষঙ্গ থেকে তাদের সৃষ্টি ও বিকাশ; তারাও যে এই সমাজের আর দশজন মানুষের মতো রক্ত মাংসের মানুষ এ কথা সমাজ ভুলেই যায়। কোনো সহৃদয় সচেতন নাগরিকের ভাবনায় এ কথার জন্ম হয় না যে কখনো কোনো নারী বারাঙ্গনা হয়ে জন্মায় না। সমাজ, সভ্যতা, রাষ্ট্রযন্ত্র তাদের বারাঙ্গনা তৈরি করে।

১৯.৭

নারীমাত্রেই স্বামী চায়, সন্তান চায়, সংসার চায়। পতিতা কেমন করে মেটাবে সেই সাধ, তাই সন্তান তাদের জন্য শত্রু সমান। তাদের পেটের ভাতের নিশ্চয়তা না থাকলেও জন্মবিরতি পিল অবশ্যই গ্রহণ করতে হয়। যে নারী প্রতিনিয়ত দেহ বিকিয়ে অর্থোপার্জন করে, তার নিকট স্বামী-সন্তান বৃথা স্বপ্নমাত্র। এই গোলাপি পট্টিতে একমাত্র সন্তানবতী নারী ফুলজান। সন্তানের মা হওয়ার সুখ তাকে আনন্দিত করলেও নিজের পেটের অন্ন যোগানো, সন্তানের দুধের যোগান দেওয়া দুইই তার জন্য কষ্টকর। সময়মতো বাড়িভাড়া দিতে না পারায় এর-ওর কাছে হাত পেতে বেড়ায় সে। খরিদ্দার আসলে তাকে বিপাকে পড়তে হয় প্রচণ্ড। ‘খরিদ্দার এলে ফুলমতী বাচ্চাটাকে কাঁথায় মুড়ে ওদিকের ঘরে সখিনার নানির কাছে রেখে আছে।’ (রিজিয়া, ২০১৭ :৪১৫) সন্তান নিয়ে এভাবেই খেয়ে না খেয়ে দিন কাটাতে হয় এই মাকে। অসুস্থ সন্তানের চিকিৎসার জন্য কোনো অর্থের ব্যবস্থাও সে করতে পারে না। সবাই কথা দিয়ে সহমর্মিতা জানালে একমাত্র জাহান আরা তাকে কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিল। সন্তানবতী এই নারীর দুঃখ বুঝতে পেরেছিল সে, নিজের সন্তান না থাকলেও এই পল্লির নারীর জন্য মাতৃত্বের দুর্ভোগ অনুধাবন করতে পেরেছিল। শরীরসর্বস্বতা ও প্রতিদিনের নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা আর অমানবিকতা মধ্যে গড়ে ওঠে মানবিক এই সব ঘটনা এই উপন্যাসটিকে পূর্ণতা দিয়েছে। (মিল্টন, ২০১৭ : ২১৩) আসলে প্রাণের প্রকাশ এখানে অবরুদ্ধ নয়; বরং উন্মোচিত। তাই ফুলমতীর অভুক্ত, দুঃখী চেহারা কারো চোখে না পড়লেও, চূড়ান্ত দুর্দশার মুহূর্তে ফুলমতীকে টাকা দিয়ে সাহায্য করেছে জাহান আরা।

১৯.৮

যৌবন যে নারীর একমাত্র সম্পদ, তার যৌবনের পূজা করা ছাড়া বিকল্প কোনো পথ বা পাথেয় নেই। বারাঙ্গনার জীবনের একমাত্র সম্পদ তার শরীর রূপ-যৌবন থাকলেই তার উপার্জন হবে ; যখনই বয়সের ভারে রূপ- যৌবন সমস্ত বিদূরিত হবে, তখন স্বাভাবিকভাবেই খদ্দের আর রাস্তা মাড়াবে না। ক্ষুধার অন্ন যোগানো তার জন্য অসাধ্য হয়ে উঠবে। অধিকাংশ বারাঙ্গনাকে তাই শেষ জীবনে চূড়ান্ত দুর্দশার মুখোমুখি হতে হয়েছে। হতভাগিনী কুরূপা নারীর সেই মর্মান্তিক বাস্তব সমস্যার বীভৎস রূপ লেখক তুলে ধরেছেন রহিমন চরিত্রের অবয়বে।

> গলির অন্ধকার ফুঁড়েই পাগলি রহিমন বেরিয়ে এলো। ওকে একটা কঙ্কাল ছাড়া আর কিছুই ভাবা যায় না। বুক-পিঠ সমান। ডানদিকের গালের পাশে একটা ফুটো। নাকটা খসে গেছে খারাপ ব্যামোতে। সামনের দাঁত নেই। কার কাছে কবে প্রচণ্ড মার খেয়ে দাঁত দুটো খুইয়েছে। চোখের নিচে মাংসপেশি অস্বাভাবিক ফোলা। কত মাস গোসল করে না কে জানে! (রিজিয়া, ২০১৭ : ৪১২)

অবস্থার বিপর্যয় বিগতযৌবনা নারীকে পথের ভিখারিতে রূপান্তরিত করেছে। বারাঙ্গনা পল্লির এমনই দুর্দশাগ্রস্ত নারীর চিত্র পাওয়া যায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' গল্পের বেগুন চরিত্রের মধ্যে। গোলাপি পট্টিতে রহিমন ছাড়া পাওয়া যায় এক সর্বজনবিদিত মাসিকে। যে হিন্দু বাল্যবিধবা এক নারী, প্রথমে বড় বোনের স্বামীর দ্বারা তার প্রথম স্খলন ঘটেছিল; তারপর বিভিন্ন হাতবদলের মধ্য দিয়ে এই পল্লিতে তার অবস্থান। জীবনের কলেবরে নিজের আত্মীয়, পরিজন, বংশমর্যাদা সব বিস্মৃত হয়েছে সে। এভাবে জীবনের পালে ভাসতে ভাসতে এখানে এই পল্লিতে জীবন কাটে তার। প্রাচীনকাল থেকে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর স্থান নির্ধারণ করতে গেলে যে বৈষম্যের চেহারা সামনে আসে, সেখানে নারীকে বর্ণ-বর্গজনের মধ্যে অবস্থানরত নিম্নশ্রেণির দ্বারাও শোষিতের বর্গে স্থান দিতে হয়। লেখকের ভাবনায় নিপীড়িত মানবমুক্তির সঙ্গে নারীমুক্তির ভাবনা এক বিন্দুতে সমাপতন ঘটিয়েছে।

২০.

নিম্নবর্গের মানুষকে নিয়ে লেখা রিজিয়া রহমানের আরো একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস *ধবল জ্যোৎস্না* (১৯৭৬)। তিনি সমুদ্র উপকূলীয় বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত নিম্নবর্গের মানুষের জীবনজীবিকার অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছিলেন এই উপন্যাসে। উপন্যাসটি আকারে ছোট হলেও নিম্নবর্গের মানুষের

জীবনবোধ ও জীবনযাপনের সমস্যাসমূহ গভীর মমতা ও দৃঢ়তায় উপস্থাপিত হয়েছে। উপন্যাসে অবস্থানগত দিক থেকে ফাতেমা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। ফাতেমা অল্প বয়সী কিশোরী নারী। তার বাবা ফয়জুল্লাহ ভবঘুরে ধরনের মানুষ সংসার, স্ত্রী , পুত্র, কন্যা নিয়ে তার কোনো ভাবনা নেই। ভাই ইয়াকুব, পেশায় ডাকাত, বেশির ভাগ সময় নিরুদ্দেশ থাকে। মা, ভাবি হেমা, ফাতেমা মিলে সংসার। ফাতেমা বনে জঙ্গলে কাঠ কেটে আর তার মায়ের বানানো চুরুট বিক্রি করে তাদের সংসার চলে। এই কিশোরী নারী চরিত্রের একটি বিশেষ দিক হলো প্রতিবেশী মকবুলের প্রতি তার বিশেষ আকর্ষণ। মকবুল আর ফাতিমার সম্পর্কের বিন্যাস অদ্ভুত ও বিচিত্রগামী। দুজনের বয়স অসম (সৌমিত্র, ২০১৭ : ২৪৮)। ফাতেমা মকবুলের প্রতি এই আকর্ষণকে গুরুত্বের সঙ্গে উপলব্ধি করলেও মকবুল তাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয় না। মকবুলের অবহেলা তাকে গুলজারের প্রতি আগ্রহী করেছিল। নিম্নবর্গের জীবনে বিভিন্ন রকম যন্ত্রণা থাকায় মানসিক প্রশান্তির জন্য সে একজন সঙ্গী খুঁজেছিল। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে গুলজার ফাতেমাকে ভোগ করেছে; অন্তঃসত্ত্বা হলে ভাবি হেমা তাকে সহযোগিতা করেছে। উপকূলবর্তী জীবনে প্রাকৃতিক দুর্যোগ একটি অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। পাহাড়ি ঢল আর ঝড়ের প্রচণ্ড তাণ্ডবে পরিবারের সবাইকে হারিয়ে শেষ পর্যন্ত মকবুলের নিকটই আশ্রয় পেয়েছে ফাতেমা।

> খুঁজতে খুঁজতে ফাতেমাকে পাওয়া গেল ধানক্ষেতের মধ্যে। মকবুল দেখল রক্তের মধ্যে ভাসছে ফাতেমার লাশ নয়-ফাতেমা।... ফাতেমার শরীরটা দুর্বল। তবু আকাশ আর সমুদ্রের মিলিত সীমারেখায় তাকিয়ে প্রশ্ন করল– আর কত দূর?...ধবল জ্যোৎস্নার সুতার স্বপ্ন মাখিয়ে বাকিটা বুনতে থাকল ফাতেমা। নতুন দ্বীপে নতুন আবাদ হবে। সেখানে না খেয়ে পাহাড়ে কাঠ কাটতে হবে না। (রিজিয়া,২০১৭ : ২১৬)

সমুদ্র উপকূলবর্তী প্রান্তিক জীবনে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সব সময় ওত পেতে থাকে। এই সমস্ত সংকটকে অতিক্রম করে আগামী দিনের সোনালি ভোরের আশায় তারা বেঁচে থাকে। সংগ্রাম-সংক্ষুব্ধ এই জীবনে ফাতেমার অসম প্রেম শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ফাতেমার এই জীবন পরিসরের আলোচনায় বলা যায় যে নারীত্বের প্রকাশ শান্তি ও সুস্থিতিতে; সংসারে নারী যেভাবে সবার মুখে অন্ন জোগায়, তেমনি তার প্রকাশ ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রামে, দারিদ্র্য দূরীকরণে। সে যেমন প্রকৃতির জীবন্ত প্রতিমা, তেমনি তার নারীত্ব ফুটে ওঠে পরিবেশ সংরক্ষণে এবং জগৎ ও জীবনের সমন্বয়ে অব্যাহত মানবকল্যাণে। (যতীন, ২০০৮ : ১১৭) এভাবেই নারী আদিমকাল থেকে পরিবার পরিবেশকে রক্ষা করে আসছে। ফাতেমা প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা নারীত্বের তেমনি এক অভিন্ন রূপ।

২০.১

উপন্যাসে সর্বাপেক্ষা সংগ্রামী ও পরিশ্রমী নারী হ্লামে। সে আরাকানী মেয়ে। ফাতেমার ভাই ইয়াকুবকে ভালোবেসে সে আরাকান ছেড়ে এই দেশে চলে আসে। স্বামী ইয়াকুব পেশায় ডাকাত হওয়ায় বেশির ভাগ সময় ঘরের বাইরে থাকে। নিজের অন্নের ব্যবস্থা সে নিজেই করেছে। এ কারণেই সে বিভিন্ন রকম শ্রমশীল কাজের সঙ্গে জড়িত থাকে।

> ভরদুপুরে একা একা জঙ্গলে গিয়ে বাঁশ কেটে আনে। সারাদিন বসে বাঁশ চিরে রোদে শুকায়। টুকরি বোনে। অনেকটা পথ হেঁটে গিয়ে বাসে চড়ে টাউন থেকে সুতো কিনে আনে। অবসর সময় নিজের তৈরি তাঁতে খট খট শব্দ তুলে থামি বোনে। (রিজিয়া,২০১৭ : ১২৪)

বিবাহিত নারী হয়েও সে স্বামীর ওপর নির্ভরশীল নয়। নিজের জীবনের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। নিজের দুঃখ দূর করার জন্য কাজের মধ্যে সে আপনমনে গান গেয়ে চলে। তার বন্ধু বুমাংয়ের সঙ্গে বসে চুরুট খায়, চোলাই অ্যারো খেয়ে হাসাহাসি করে আড্ডা দেয়। এর কোনোটিই ইয়াকুবের মা পছন্দ করে না। 'বলে –ডাইনি ওটা। ছেলে বাড়ি না থাকার জন্য হ্লামেকে গালাগাল দেয়।' (রিজিয়া, ২০১৭ : ১২৪) বাঙালি শাশুড়ির যা প্রথাগত আচরণ, ছেলের সমস্ত বদ অভ্যাসের জন্য পুত্রবধূ দায়ী। মানুষ হিসেবে হ্লামে অসাধারণ, কারো কোনো কথায় সে গায়ে মাখে না, আপনমনে নিজের কাজ করে চলে। ফাতেমার সঙ্গে তার সুনিবিড় বন্ধুত্ব। শুধু ভাবি-ননদ সম্পর্কের বাইরে এসে প্রকৃত মানবিক সত্তায় তার পাশে দাঁড়িয়েছে, পরামর্শ দিয়েছে, পথ দেখিয়েছে। ফাতেমা চরিত্রের পরিণতির পশ্চাতে হ্লামের একটি বিশেষ ভূমিকা স্মরণযোগ্য। দীর্ঘদিন পর ইয়াকুব ফিরে এলে তার আবেগের প্রকাশ তার মধ্যে রয়েছে তার ভালোবাসার গভীরতা। 'হঠাৎ অনেক দিনের বন্দি কান্না ছাড়া পেল। ইয়াকুবের বুকে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল হ্লামে।' (রিজিয়া, ২০১৭ : ১৮৪) স্বদেশ স্বজাতি ছেড়ে যার আকর্ষণে সে বাঙালি পল্লিতে এসে উঠেছিল তার অনুপস্থিতি তাকে পীড়া দিয়েছে, কষ্ট দিয়েছে, দীর্ঘদিন পরে সেই প্রিয়জনের আগমন তাকে বিহ্বলিত করেছে। তার জীবনের শান্তি বিনষ্টে ইয়াকুবের মা বিভিন্ন সময় ভূমিকা রেখেছে। পুরুষতন্ত্র-প্রণীত বিভিন্ন রকম অনুশাসন নারীর মনে এমনভাবে গেঁথে আছে যে সেগুলো অমান্য করার কথা তারা চিন্তাও করতে পারে না। বাড়ির বৌয়ের ওপর বৌকাট্‌কি শাশুড়ির শারীরিক ও মানসিক নানা উৎপীড়নের কথা বাংলা সাহিত্যের একটি বড় অংশ জুড়ে আছে (যতীন, ২০০৮ : ১২৩)। উপন্যাসের এই অংশটুকু তারই তুলনীয়।

নিম্নবর্গের জীবনে যেখানে আর্থিক দুর্বৃত্তায়ন বেশি, সেখানে এই ধরনের সংস্কৃতির চর্চা আরো বেড়ে যায়।

২০.৩

গিরিদাসী *ধবল জ্যোৎস্নার* (১৯৮১) আর একজন বহুমাত্রিক নারী। জেলেপাড়ার হরলাল জেলের মেয়ে সে। মকবুলের বন্ধু ছেকুর বাঁধা নারী সঙ্গী। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই পথে এসে দাঁড়িয়েছে সে। যৌবনের ডাকে প্রথম সে ঘর ছেড়েছিল শুঁটকি ব্যাপারীর সঙ্গে। তারপর থেকে সমাজে তার অবস্থান প্রান্তিকতার প্রদেশে নেমে আসে। জেলেপাড়ার সমাজ একঘরে করেছিল তাদেরকে। দরিদ্র জেলে পিতাকে কেউ কাজ দেয়নি সেদিন; সেই সুযোগ গ্রহণ করেছিল ছেকু। অসহায় জেলে হরলালকে সহযোগিতার মধ্য দিয়ে গিরিদাসীর কাছাকাছি আসে সে। ধূর্ত শিয়ালের মতো অপেক্ষা করেছিল ছেকু :

> সারাটা দুপুর কাটিয়ে ছেকু পরিতৃপ্ত হয়ে ফিরে গেল। গিরি বাধা দেয়নি। বাবা তাকে মূলধন করে মাছ ধরছে। মায়ের হাঁড়িতে ভাত ফুটছে।...গিরি একদিন ছেকুকে বলল- এমন করে তো চলবে না। চল আমরা বিয়ে করি। আমি না হয় মুসলমান হয়ে যাবো।... গিরিকে জড়িয়ে ধরে ছেকু হাসে– বিয়ে -বিয়ে করে মাথা গরম করছিস কেন। বিয়ে করলে মেয়েমানুষ পানসে হয়ে যায়।.. বলিস তো এখান থেকে সরিয়ে তোকে আলাদা ঘর করে দিই। (রিজিয়া, ২০১৭ : ১৭৫)

এভাবে গিরিদাসী স্বাধীন স্বতন্ত্র নারী থেকে পরিণত হয়েছে ছেকুর বাঁধা নারীতে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থান বরাবরই প্রান্তিক, তা আরো প্রান্তিকায়িত সন্নিহিত হয়, যখন কোনো নারী সামাজিক অনুশাসনের গণ্ডিকে অতিক্রম করে। নারীর একবার পদস্খলন ঘটলে মূলস্রোতে ফেরার উপায় থাকে না। ছেকু তাকে ভোগ করলেও সামাজিক সম্মান দিতে রাজি নয়। গিরি বুদ্ধিমান নারী, ছেকুর জাল কেটে বের হওয়ার জন্য খ্রিস্টানধর্ম গ্রহণ করে যিশুর সেবক হলো। ‘ফাদারের কথামতো জলদিয়ায় চলে যাচ্ছি। ওখানে কাজ করব। অনেকদিন তো পাঁকে থাকলাম। এবার পরিষ্কার জলে যাব। ওখানকার জেলেপাড়ায় কাজ করতে হবে আমাকে।’ (রিজিয়া, ২০১৭ : ২০৮) এভাবে পাঁকের কাদায় জীবন শেষ না করে নিজেকে নতুন পথের সৈনিক করল গিরিদাসী। সে নিম্নবর্গের সাধারণ নারী হয়ে বুদ্ধিদীপ্ততায় অসাধারণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছে। উপন্যাসে তার উপস্থিতি স্বল্প পরিসরে হলেও চরিত্রের বিশিষ্টতায় সে হয়ে উঠেছে আলোকদীপ্ত।

২০.৪

সবজান উপন্যাসের আর একটি উজ্জ্বল সংগ্রামী নারী চরিত্র। উপন্যাসে তার পরিচয় সে হাঙর শিকারি মকবুলের স্ত্রী। উপকূলীয় পরিবেশে নারীর লড়াই বহুমুখী। স্বামী মকবুল থাকে হাঙর শিকারের নেশায়, সংসার, স্ত্রী তার কাছে কখনোই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেনি। নিত্য অভাবের সংসার চালাতে সবজানকে বিভিন্ন কাজ করতে হয়েছে। তার মধ্যে প্রধান দুটি কাজ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। মকবুলের ভাষ্যে: 'তার বউ চেউয়া মাছ ধরে শুঁটকি দেয়। মাছ না পেলে লবণ তৈরি করে বাজারে বিক্রি করতে নেয়। তবু অভাব মেটে না।' (রিজিয়া, ২০১৭ : ১৪৩) অভাবের সংসারে স্বামীর এই উদাসীনতা বিক্ষিপ্ত করেছে সবজানকে। সবজানের অভাবক্লিষ্ট জীবনে ছায়া পড়ে হাসেম রাজার। চরম উত্তেজনা আর নিষ্ঠুর দৈহিক পীড়নের পর মকবুল তাকে তালাক দিলে সবজান চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সবজান তার ভালোবাসার পরীক্ষা দিয়েছে; তখন হাসেম রাজাকে হত্যার দায় নিজে নিয়ে মকবুলকে মুক্ত করেছে।

> মকবুল সবজান ঠেলে বের করে দিয়েছিল ঘর থেকে। পরদিন খেয়াঘাটে মকবুল শুনল সম্পানের মাঝিরা উত্তেজিত আলোচনা করছে। হাসেম রাজাকে তার নিজের মেয়ে মানুষ খুন করে পুলিশের কাছে দোষ স্বীকার করেছে।... মেয়েলোকটার ফাঁসি হবে বোধ হয়। তবু একটা বড় কাজ করে গেল। পরাজয়ের গ্লানিতে পুড়তে লাগলো মকবুল। এবারও সাবজান জিতে গেল। (রিজিয়া, ২০১৭ : ১৯৭)

হাসেম হত্যার মধ্য দিয়ে সবজানকে নতুন করে আবিষ্কার করেছে মকবুল। সবজান নিজেও হাসেম রাজার সঙ্গে থাকতে চায়নি। প্রেমহীন, সম্মানহীন, অমর্যাদার জীবন থেকে মুক্তি চেয়েছিল সে। নারীর কাছে একনিষ্ঠ প্রেম অত্যন্ত মূল্যবান। নারী নিজেও প্রেমে একনিষ্ঠ থাকতে চায়; সে ক্ষেত্রে পুরুষের সহযোগিতা বিশেষ প্রয়োজন। (যতীন, ২০০৮ : ১২৬) সবজানও তার মূল্য দিয়েছে, হাসেম রাজাকে হত্যার দায় নিজের ওপর নিয়ে এ কথাই প্রমাণ করেছে তার মধ্যে কোনো অসততা ছিল না। মকবুলের অবহেলা আর নিরাসক্তিই তাকে এই পথে ধাবিত করেছে।

২০.৫

ছোট পরিসরের এই উপন্যাসটিতে লেখক প্রত্যেকটি নারীকে আলাদা আলাদা জায়গা দিয়েছে নিজের অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। উপন্যাসের প্রতিটি নারীচরিত্র আর্থ-সামাজিক নিম্নবর্গীয় পরিসীমায় স্ব স্ব ক্ষেত্রে অস্তিত্বের প্রয়োজনে যুদ্ধ করেছে। নিম্নবর্গীয় জীবনের এই পরিমণ্ডল তাদের সংগ্রামশীল

সত্তার অভিন্ন সব রূপ। ঔপন্যাসিক রিজিয়া রহমান সমুদ্র উপকূলীয় মানুষের জীবনসংগ্রাম আঁকতে গিয়ে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রেমকে দেখিয়েছেন মানবিক আয়োজনে। উপদ্রুত এই জীবনে নারী বিভিন্নভাবে আক্রান্ত হয়েছে; শ্রেণি হিসেবে দরিদ্র হওয়ার কারণে, লৈঙ্গিকভাবে নারী হওয়ার কারণে।

২১.

রিজিয়া রহমানের সৃষ্টিশীল চেতনায় অবদমিত সংখ্যাগরিষ্ঠের বাঁচার যে প্রচেষ্টা সেখানে প্রতিটি চরিত্র অন্যায়, অসত্য এবং নির্যাতনের বিরুদ্ধে উচ্চকিত (কল্যাণ, ২০২০ : ১৫৭)। এই চেতনার ধারাবাহিকতায় *একাল চিরকাল* (১৯৮৪) শোষিত জনগোষ্ঠীর অংশ হিসেবে সাঁওতাল জনজাতির প্রসঙ্গ এই উপন্যাসকে বিশেষ মাত্রা দিয়েছে। বাংলা সাহিত্যের সূচনালগ্ন থেকে আদিবাসী জনজীবন বিভিন্নভাবে গুরুত্ব লাভ করলেও আধুনা কল্লোলজাত সাহিত্যে নবরূপ লাভ করেছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যয়ের (১৮৯৪-১৯৫০) *আরণ্যক* (১৯৩৯) একটি মাইলফলক। অরণ্যবাসী মানুষের জীবনযাত্রার একটি সামগ্রিক রূপকে অনুপুঙ্খ বিবরণের মাধ্যমে পাঠকের চোখে নতুন জগতের অবতারণা করেছিলেন লেখক। তারই পরিক্রমায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭১) *কালিন্দী* (১৯৪০), সতীনাথ ভাদুড়ীর (১৯০৬-১৯৬৫) *ঢোঁড়াই চরিত মানস* (১৩৫৮) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস, যেখানে আদিবাসী জীবন নবরূপ লাভ করেছে। ১৯৪৭-পরবর্তী বাংলাদেশের সাহিত্যে আদিবাসী জীবনের প্রাসঙ্গিকতা খুব বেশি লক্ষণীয় নয়। বাংলাদেশের সাহিত্যে সাঁওতাল-জীবন নিয়ে রচিত প্রথম উপন্যাস *মহুয়ার দেশ* (১৯৫৯)। তাসাদ্দুক হোসেনের *মহুয়ার দেশে* দিনাজপুর জোলার ফুলবাড়ি উপজেলার উত্তরডাঙ্গা অঞ্চলের সাঁওতালদের জীবন গুরুত্ব পেয়েছে। তবে বাংলাদেশের সাহিত্যে সাঁওতাল জনজাতির সংগ্রাম, সংস্কৃতির একটি পরিপূর্ণ রূপ পাওয়া যায় রিজিয়া রহমানের *একাল চিরকাল* উপন্যাসে (১৯৬৪) (হোসনে আরা, ২০১৮ : ৪৫)। এই উপন্যাসে যে সময় বর্ণিত হয়েছে তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, তেভাগা আন্দোলন, আকাল দুর্ভিক্ষের সময়। পটভূমি নির্মিত হয়েছে, উত্তরবঙ্গের চাঁচিয়া, ধানঝুড়ি, ঘিরলা, খাগড়াবনের অরণ্য ও মানুষকে নিয়ে। রিজিয়া রহমানের ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনার সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গির যথার্থ প্রতিফলন এখানে লক্ষণীয়। সময় ও সমাজবিবর্তনের অনিবার্য টানে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যলালিত জীবনের ঐতিহাসিক সত্য উন্মোচিত হয়েছে। সাঁওতাল জীবনের অন্তর-বাহির, কুসংস্কার-বিশ্বাস, প্রত্যাশা-অচরিতার্থতা, শোষণ-বঞ্চনা, সংগ্রামশীলতা, সমস্ত, জীবনানুভূতির এপিকধর্মী বিন্যাস ঘটেছে এই উপন্যাসের সমগ্রতায় (রফিকউল্লাহ, ২০০৯ : ২৯১)। সামন্ত প্রভু ও জমিদার দেওয়ানদের শোষণের নগ্নরূপের

পাশাপাশি জঙ্গলের অধিকার থেকে কীভাবে এদের বঞ্চিত করা হয়েছে, সেই কাহিনিও লেখক নির্মোহ রূপে তুলে ধরেছেন। একদিকে প্রাকৃতিক খরা, দাবানল আর ফসলহীন মাঠ আর অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের করাল গ্রাস। জবরদখলের প্রক্রিয়ায় সাঁওতালদের নিজ ভিটামাটি আর ফসলের হিস্যা থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, তখন খ্রিস্টান মিশনারিরা তাদের উচ্ছেদ করেছে ধর্ম আর সংস্কৃতি থেকে। এখানে দুই ধরনের শোষণ প্রক্রিয়ার আধিপত্য বিকাশ লাভ করেছে। ভূমি থেকে উচ্ছেদ আর ধর্ম থেকে উচ্ছেদ সবই নিম্নবর্গের জীবনকে ব্যাহত করেছে। ক্ষুধার রাজনীতিকে কেন্দ্র করে যে ধর্মীয় আধিপত্যবাদ চলে, তা ঔপনিবেশিক রাজনীতির অংশ (মাসুদ, ২০১৭ : ৩০৮)। এই সমস্ত শোষণ আর শাসনের মধ্যে লেখক আসলে সাঁওতাল জীবনের একটি সামগ্রিক রূপকে তুলে ধরেছেন।

২১.১

সৃষ্টি যেমন সমাজনিরপেক্ষ হয় না, তেমনি নিজস্ব সংস্কৃতি ছাড়া কোনো জীবন সম্পূর্ণ হয় না। যেকোন সম্প্রদায়ের জীবনের সঙ্গে তাদের গোষ্ঠীগত সংস্কৃতি ও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকে। সাহিত্য এমন একটি চলমান সৃষ্টি মাধ্যম, যেখানে মানুষকে নিয়ে রচিত এবং মানুষের সময়ের ছবি চিত্রিত হয়। *একাল চিরকাল* উপন্যাসের সাঁওতাল জনজীবনের প্রতিচ্ছবি নির্মাণে লেখক তাদের ঘরের কথা বলেছেন। ঘরের কথা বলতে প্রথমেই আসে নারীর কথা। বৃহত্তর সমাজে নারী যে চিত্র পাওয়া যায়, আদিবাসী সাঁওতাল সমাজের নারীরাও একই রকম বঞ্চনা আর বৈষম্যের শিকার। যারা ঐতিহ্যগতভাবে খুব কর্মঠ, ক্ষেত্রবিশেষে মনে হতে পারে তারা পুরুষের তুলনায় বেশি পরিশ্রমী। সাঁওতাল নারীদের কর্মতৎপরতা এবং খাটাখাটুনি দৃশ্যমান, বাঙালি নারীর মতো আড়ালে আবডালে নয়। বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর তুলনায় আদিবাসী সাঁওতাল নারীরা মানদণ্ড আরো দুর্বল ও পশ্চাৎপদ। তাদের ঐতিহ্যগত আইন ও প্রথায় নারীকে দুর্বল রাখার বিধান কার্যকর রয়েছে।

২১.২

সাঁওতাল সমাজব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক। প্রধানত পিতা-মাতা ও সন্তান নিয়ে সংসার। পিতা হয়ে থাকে সংসারের প্রধান। এই পরিক্রমায় উপন্যাসের শুরুতে পাওয়া যায় হোপনা সোরেন ও তার স্ত্রী তালাময়ীর ঘর-সংসারের প্রাসঙ্গিকতা। সাঁওতাল জীবন ছিল বনভূমিকেন্দ্রিক, বন তাদের জীবনের প্রধান দোসর। তাদের অর্থনৈতিক কার্যক্রম বনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতো। পুরুষেরা বন থেকে শিকার করে নিয়ে আসত আর সাঁওতাল রমণীরা তাই দিয়ে গৃহসেবা করত। তালাময়ী চায় স্বামী শিকার ছেড়ে কৃষিকাজ করুক। স্বামীর কৃষিকাজে আগ্রহ না থাকায় সে নিজেই চেষ্টা করে : 'তালাময়ী

ঘরের সঙ্গের জমিতে নিজেই কিছু শাক-সবজি ভুট্টার গাছ লাগায়। তাতে তো সংসার চলে যায়। হোপনা শিকারের চামড়া বেচে ধান কেনে।' (রিজিয়া, ২০১৭ : ২২৩) এতেই তাদের দুজনের সংসার চলে যায়। সন্তানসম্ভবা তালাময়ীর স্বপ্ন তার ছেলে অন্তত কৃষাণ হবে। আত্মসচেতন সাঁওতালরা পরিশ্রমী; বনভূমিকে উচ্ছেদ করে ঐ ভূমিকে তারা চাষের উপযোগী করে তোলে। সাঁওতাল নারীরা কৃষি উৎপাদক, তারা ঘরের কাজের পাশাপাশি বাইরের কাজেও সমান ভূমিকা রাখে। সে কারণেই তালাময়ী বারবার চায় তার স্বামী কাজ করুক।

২১.৩

সাঁওতাল সমাজে নারীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণে বড় ভূমিকা রাখতে পারে না। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর কথা গুরুত্ব দেয়া হয় না। তালাময়ী স্বামী অন্তঃপ্রাণ, তাই স্বামীর মতামত অগ্রাহ্য করা তার জন্য কঠিন। সাঁওতাল নারীরা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ও পশ্চাৎপদ হওয়ায় স্বামীর সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়। তারা স্বামী-স্ত্রী উভয়ই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকে। সে গৃহকর্মের পাশাপাশি শুয়োর পোষে, মুরগি পোষে, যা দিয়ে তাদের সংসার চলে যায়। তালাময়ীর স্বপ্ন পূর্ণ হয় পুত্র চুবকাকে দিয়ে, চুবকা একদিন বড় কিষান হয়ে ওঠে:

> নিঃশ্বাসে সুগন্ধ টেনে নিয়ে সুখী চোখে বাইরে তাকায় তালাময়ী। চোখের দৃষ্টি কমে গেছে । প্রায় দেখতেই পায় না সে। তবু বাতাসের গন্ধেই বোঝে ক্ষেতে ক্ষেতে ধান পেকে উঠেছে। ধান কাটা , গোলায় তোলা, ধান সিদ্ধ করা রোদে শুকিয়ে তোলায় ব্যস্ত দিন কাটায় চম্পা। দৃষ্টিহীন অনুভূতি নিয়ে সেগুলো সম্পূর্ণই অনুভব করে তালাময়ী (রিজিয়া, ২০১৭ : ২৪০)

বহুদিনের শিকারি জীবনের কষ্টকে ভুলে তাদের কৃষিভিত্তিক জীবনে আগমন ঘটে তালাময়ীর পরিবারের। তালাময়ী আদিবাসী সাঁওতাল নারী হলেও মানবিক ঔদার্যে, প্রেমে ও মাতৃত্বে সে এক শাশ্বত নারীত্বের প্রতিমূর্তি।

২১.৫

চম্পা চুবকা সোরেণের স্ত্রী। বিয়ের পূর্বে মা আর ভাইকে নিয়ে তাদের ছিল ছোট সংসার। চম্পা মায়ের সঙ্গে ক্ষেতে কাজ করত। ছোট ভাইটি ডাঙায় মহিষ চরাত এভাবে সংসার চলে যেত তাদের। চম্পার মা হলদা খুবই বুদ্ধিমতী এবং পরিশ্রমী নারী। চম্পাও মায়ের মতো শান্ত আর পরিশ্রমী। বৈবাহিক জীবনে তার শখ সে কিষানি হবে। যদিও তার স্বামী চুবকা বংশপরম্পরায় শিকারি। বিয়ের পর চুবকা স্ত্রীর মতকে মেনে নিয়ে কৃষিকাজ শুরু করে।

> চম্পা পয়মন্ত মেয়ে। সাঁওতাল রীতি অনুসারে শ্বশুরবাড়ি আসার সময় একটা সাদা গাই এনেছিল চম্পা সঙ্গে। সেটার বাচ্চা হয়েছে অনেকগুলো।...বিয়ের পর চুবকা একেবারে বদলে গেছে। এখন সে খাটুয়ে কিষাণ। ছেলে বউকে নিয়ে সর্বক্ষণ ক্ষেতের কাজে ডুবে থাকে। (রিজিয়া,২০১৭ : ২৪০)

সাঁওতাল নারীরা অনেক বেশি পরিশ্রমী, তারা গৃহ কর্মের বাইরে ক্ষেত খামারের কাজ করে পুরুষের সমান দায়িত্ব নিয়ে। চম্পা তেমনি একজন সাঁওতাল নারী, স্বামী, শাশুড়ি ও তিন সন্তানের লালন-পালনের বাইরে যে সময় পায়, তা কৃষিকাজে ব্যয় করে সে। পাশাপাশি গৃহপালিত প্রাণী গরু-ছাগল পোষাতেও তার রয়েছে নৈপুণ্য। চম্পা নিম্নবর্গের প্রান্তিক নারী হলেও স্বামীর চুবকার প্রতি সব সময় প্রেমময় ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক বিরাজমান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজনিত আকাল, প্রাকৃতিক দুর্যোগ খরায় সাঁওতাল জনগোষ্ঠী যেভাবে নিঃস্ব আর রিক্ত হয়েছিল; তাদের সাধ্য অনুযায়ী সবাইকে সাহায্য করেছে। 'বড় আকালে না খেয়ে হন্যে হয়ে উঠল মানুষ। তখন দু-হাতে ধান বিলিয়েছে চম্পা।' (রিজিয়া,২০১৭ : ২৫১) ক্ষুদ্র গণ্ডির এই জীবনে চম্পা একজন মহৎ হৃদয়ের নারী। সবার কথা ভেবে সে অকতারে ধান বিলিয়েছে। এ ক্ষেত্রে চম্পার স্ত্রী সত্তা যেন অনেকখানি লেখকের আদর্শবাদ দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। তবে সর্বক্ষেত্রে তা গুরুত্ব পায়নি, অনেক ক্ষেত্রে আবার সে রক্তমাংসের নারীতে রূপান্তরিত হয়েছে। আকাল আর খরায় যখন সাঁওতালদের জীবন ওষ্ঠাগত, তখন নারী হিসেবে সমাজে-সংসারে তার অবস্থানকে চিনতে পেরেছি। তার ভাবনায় উঠে এসেছেঃ

> সুখের দিনেই মেয়েমানুষের কদর। অভাবের দিনে চুবকাও তাকে দূর-ছাই করেছে। অথচ সুখের সময়ে চম্পা ছিল চুবকা সোরেণের হাতের বাঁশি।..তারই শুভলক্ষণে চুবকার গোহাল ভরে উঠেছে। চম্পা ক্ষেতে বীজ ফেলে চারা দেয় বলেই নাকি চুবকা সোরেণের ক্ষেতে এত ফসল হয়। আলু ভুট্টা আখক্ষেত চম্পারই ভগ্যে! সেসব দিনের কথা এখন কোথায় গেল! মেয়েদের প্রাধান্য এখন সাঁওতালরা ভুলে যেতে বসেছে। (রিজিয়া, ২০১৭ : ৩০১)

চম্পার এই উপলব্ধি সাঁওতাল সমাজে নারীর অবস্থানকে চিনিয়েছে। অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর মতো সাঁওতাল নারী পুরুষের মধ্য বিভাজন স্পষ্ট। এই বিভাজন নারীকে আরো বেশি বঞ্চনার মুখে ঠেলে দিয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্য থেকে সৃষ্ট শ্রমবৈষম্য নারীকে চরম নাজুক অবস্থানের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। সে কারণে নারী যর্থাথরূপে ক্ষমতায়িত হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। চম্পার মতো নারীদের অবদান ইতিহাসের পাতায় স্থান পায়নি। আজও তারা সমাজ আর ইতিহাসের কাছে উপেক্ষিত নারী হিসেবে রয়ে গিয়েছে। সেই কারণেই নারীর অবদান সাহিত্যের পাতায় তুলে দায়বদ্ধতা সৃজনশীল লেখকের থেকে যায়। নিম্নবর্গের নারী চম্পার কথা মনে রাখে না এই দেশ, এই সমাজ।

২১.৮

একাল চিরকাল উপন্যাসের নারী চরিত্রের মধ্যে ত্রয়ী সত্তার একটি রূপ লক্ষ করা যায়। এই তিন রূপের মধ্য দিয়ে তাদের সামগ্রিক অবস্থানকে চিহ্নিত করা যায়। চরিত্রগুলোর সহিষ্ণুতা শক্তির অভূতপূর্ব প্রকাশ উপন্যাসে লক্ষণীয়। চরিত্রগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য রূপে ধরা দিয়েছে অপ্রতিবাদী, কোমল-শান্ত-শীতল ও ব্রততী রূপ। উপন্যাসের বহুমাত্রিক বিস্তার বিভিন্ন নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখানো হয়েছে; মূলত নারীর কথা নৈর্ব্যক্তিভাবে বর্ণিত হয়েছে। নারীকে দেখানো হয়েছে পুরুষের সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে। প্রথাগত রূপায়ণের বাইরে এ কথাও সত্য যে সাঁওতাল সমাজের অন্দরমহলের ছবি অঙ্কনে লেখক সাঁওতাল নারীকে দেখিয়েছেন। এই উপন্যাসের নারীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জীবন্ত ও কর্মচঞ্চল নারী ফুলাও। ফুলাও টুডু সাম্পাহানের স্ত্রী। নিঃসন্তান এই নারী উচ্ছল প্রকৃতির, নিজের অপ্রাপ্তির দুঃখকে ভুলতে সর্বদা হাস্যরসে সিক্ত থাকে সে। তার জীবন আর দশজন নারীর মতো নিস্তরঙ্গ প্রবাহে বয়ে চলেছিল, যুদ্ধজনিত দুর্যোগ তাদের স্বাভাবিক জীবনকে জটিল রেখায় বিভক্ত করে দিয়েছে। অভাবের তাড়নায় তারা জমিদার বাড়িতে এসেছিল কর্জ চাইতে, এই চাওয়া তার জীবনের কাল হয়েছে। সামন্ত প্রভুদের প্রতিনিধি রাজা সাহেবের দৃষ্টি পড়েছিল ফুলাওয়ের ওপর। তার সাহসী ও মুখরা স্বভাব আকৃষ্ট করেছিল রাজাবাবুকে। 'রাজা সাহেব গ্লাস দিলেন ফুলাওর হাতে–রাজাকে খুশি করলি শুকনো মুখে কেন যাবি।...অচেনা অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়ল ফুলাওর চেতনায়। ফুলাওর ঝাপসা চেতনায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল একটি কামনাসিক্ত পুরুষের অবয়বে।' (রিজিয়া, ২০১৭ : ২৯৫) এই ঘটনা ফুলাওয়ের জীবনকে ওলট-পালট করে দিয়েছে। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হলো তাকে। সামন্তবাদী শাসনের বহুমাত্রিক শোষণের মধ্যে নারীর প্রতি ঘটে দ্বিমাত্রিক শোষণ। প্রথমত, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অংশ হিসেবে দ্বিতীয়ত, নারী হিসেবে লৈঙ্গিক নির্যাতনের শিকার হয়ে। নারীর মনে হাজার বছরের চাপিয়ে দেওয়া সতীত্বের সংস্কারের শেকল এত গভীরে প্রোথিত যে নারী নিজেই সেই সংস্কারের মানদণ্ড থেকে বের হতে পারে না। (কাবেরী, ২০০৮ : ২৪২) সামন্ত প্রভুর কাছে ধর্ষিতা হওয়ার কারণে স্বামী সাম্পাহান টুডু তাকে ত্যাগ করেছে। তার স্থান হয়েছে পতিতালয়ে।'ফুলাও পাঁচঘরিয়ার বাজারে চলে গেছে। খারাপ মেয়েমানুষদের সঙ্গে ঘর নিয়েছে।' (রিজিয়া, ২০১৭ : ৩০৫) ফুলাও সব হারালেও, হারিয়ে যায়নি স্বামীর প্রতি তার ভালোবাসা। সাপে কেটে সাম্পহানের মৃত্যু হলে সে নিজের মৃত্যুকেও ডেকে নিয়েছে। 'ততেনপা গাছে ঝুলে আছে ফুলাওর উলঙ্গ দেহ। পরনের খাণ্ডির ফাঁসিতে ঝুলে বীভৎস চোখে সবার দিকে তাকিয়ে আছে

ফুলাও।' (রিজিয়া, ২০১৭ : ৩৩২) এই মৃত্যু কোনো স্বাভাবিক মৃত্যু নয়; সমাজ, সভ্যতার অব্যবস্থপনা নারীকে ঠেলে দিয়েছে এই মৃত্যুর দেশে। তার মতো সাহসী, বুদ্ধিদীপ্ত, নারী উপন্যাসে আর একটিও নেই। নিম্নবর্গের বঞ্চনাময় অনিশ্চিত জীবন নারীর প্রতি এক ধরনের নেতিবাচক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেয়। ঔপনিবেশিক আমল থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত পুরুষতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের আধিপত্যবাদী মানসিকতা এই সমস্ত কিছু এভাবে নারীর জীবনকে বিপন্ন করে তোলে। ফুলাও তারই একটি দৃষ্টান্তমাত্র।

২১.১০

উপন্যাসে লেখক সাঁওতাল নারী মাতৃত্বের রূপ, স্ত্রী রূপের পাশাপাশি নির্মাণ করেছেন যুবতী নারীর অবস্থান। তেমনি এক নারী তাংদা, মা-বাবা-ভাই নিয়ে তাদের সংসার। তাংদার বাবা অলসতা আর পরিশ্রমবিমুখিতার কারণে অভাব তাদের নিত্যসঙ্গী। অভাবের তাড়নায় তার বাবা পরিবারসহ খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছে। যদিও তাংদার তা একেবারেই পছন্দ নয়, তবুও তাকে মেনে নিতে হয়েছে। খ্রিস্টান হওয়ার পর তার নতুন নাম হয়েছে মেরী। নিম্নবর্গের জীবনে বহুমাত্রিক আধিপত্যবাদীর শিকার হয়েছে এই সাঁওতাল জনগোষ্ঠী। একদিকে সামন্ত প্রভুদের নানামুখী ষড়যন্ত্র, অন্যদিকে ঔপনিবেশিকতা আগ্রাসনে নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতিকে কেড়ে নেয়ার আধিপত্য। খ্রিস্টান হওয়ার কারণে তাকে সাঁওতালদের মূল সমাজ থেকে দূরে থাকতে হয়েছে। তাই সে সুরকাকে বলেছে :

> আমাকে তুই এখান থেকে কোথাও নিয়ে চল। না হয় এই সাহেব, যোসেফ এদের তাড়িয়ে দে। আমার এখানে একটুও ভালো লাগে না। আমাদের আবার আগের মানুষ করে দে সুরকা। সুরকার বুকে অসহায় কান্না নিয়ে কাঁপতে লাগলো তাংদা মিনজীর শরীর।...তাংদা মিনজী তো সভ্য নামের মানুষ হতে চায়নি। ঈশ্বরকে চিনে জ্ঞান বাড়াতে চায়নি। তাংদা কেবল খেয়ে বাঁচতে চেয়েছিল। (রিজিয়া, ২০১৭ : ৩৪৫)

তাংদার এই উপলব্ধি তার আত্মগত। সে তার সমাজকে, সংস্কৃতিকে ভালোবাসে। শুধু বেঁচে থাকার অন্নের জন্য তাদের সব ছেড়ে অন্য ধর্মের অংশীজন হতে হয়েছে। স্বসম্প্রদায় আর স্বজাতিকে হারিয়ে ভুঁইফোড় হয়ে তাদের বাঁচতে হয়েছে। *একাল চিরকাল* উপন্যাসের আখ্যান ইতিহাসের উপাদান নিয়ে নির্মিত হলেও ঐতিহাসিক কোনো চরিত্র এখানে বিস্তার লাভ করেনি। লেখক এমন কোনো চরিত্রকেও বিকশিত করেননি, যার মধ্য দিয়ে একটি কাল্পনিক বিদ্রোহ তৈরি করা যায় (মাসুদ, ২০১৭ : ৩০৭)। তাংদা চরিত্রের মধ্যে লেখক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যর স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তার আর্থ-সামাজিক অবস্থানে তার মনের মধ্যে যে প্রতিবাদের সুর নির্মাণ হয়েছে, তাই, তাকে অসাধারণ করে তুলেছে।

২১.১২

আদিবাসী জীবনের পরতে পরতে রয়েছে নারীর লাঞ্ছিত হওয়ার কাহিনি। অর্থনৈতিক শোষণের পাশাপাশি রয়েছে নারীর লৈঙ্গিক নির্যাতনের প্রতিবেশ। মুরমুদের মেয়ে ফুলাও যেমন নিজের জীবন দিয়ে অপমান থেকে রক্ষা পেয়েছিল। তেমনি পিওনির উপর দৃষ্টি পড়েছিল রাজাবাবুর। অভাবের সংসারে সে আর তার মা মুনি ক্ষেতে খামারে কাজ করেছে। আকালের সময় ধানের জমি বেচে দিয়ে তারা এখন বর্গা চাষি। এই চঞ্চলা তরুণীকে মনে ধরেছিল রাজা বাবুর। রাজাবাবু প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে সে জবাব দিয়েছিল :

> পিওনির দু-চোখের তারা দপ করে করে জ্বলে উঠল–না। তোর দেওয়ান আমাদের ধান কাটতে দেয়নি কেন? তোরা এত খারাপ লোক কেন?... চোখে ঘৃণার আগুন নিয়ে পিওনি তাকাল–তোদের বকশিশ আমরা নেব না। তুই এখানে আসবি না আর। (রিজিয়া, ২০১৭ : ৩৫৭)

পিওনির এই সাহস আর ঔদ্ধত্যের দাম দিতে হয়েছিল চরমভাবে। নদীর ঘাটে স্নান করতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। রাজার লোকেরা তাকে তুলে নিয়েছিল কাছারি বাড়িতে। ভোগের পণ্য হয়ে অন্য সাঁওতাল নারী পুরুষের মতো তাকেও পুড়ে মরতে হয়েছিল। ফুলাও, পিওনির মতো সাঁওতাল নারীরা এভাবে উচ্চবর্গের লালসার শিকার হয়ে থাকে।

২২.

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যকে সৃজনশীলতায় ও বহুমাত্রিক শৈলীর সম্ভারে সমৃদ্ধ করেছিলেন যাঁরা, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বিশ্বরাজনীতি থেকে উপমহাদেশীয় রাজনীতির দ্বন্দ্বমুখর সময়ের অববাহিকায় তাঁর উন্মেষ ও বিকাশ। তারপর দেশভাগ পরবর্তী জাতীয় রাজনীতির যে প্রতিসরণ, তাও লেখকের দৃষ্টিসীমার বাইরে নয়। তিনি অন্বেষণ করেছিলেন ইতিহাসের বিস্তৃত পরিধিতে জনমানুষের জগৎ ও জীবন সম্পর্কের নানা মাত্রিকতাকে। জীবনকে দেখার এই প্রক্রিয়া ইলিয়াসের কল্পনাপ্রসূত কোনো অভিপ্রায় নয়। গবেষণালব্ধ বিপুল এক তথ্যভাণ্ডারকে তিনি মহিমামণ্ডিত করেছেন মহৎশিল্পের সুষমা ও সৌন্দর্যে। সচেতন সাহিত্যিক ইলিয়াস বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের বিবর্তনশীল ইতিহাসকে বিবেচনায় রেখে সাহিত্যের ভিত রচনা করেছিলেন। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি একজন সফল সাহিত্যিক ও পথপ্রদর্শক। তাঁর বৈচিত্র্যময় সৃজনশীলতায় গণমুখী ধারার সাহিত্যিক পরিমণ্ডল হয়েছে বিস্তৃত-সুঠাম ও শক্তিশালী।

বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীল সমাজের রাজনীতি এই ভূখণ্ডের সাধারণ মানুষের নিয়তিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে সব সময়। সাহিত্যিক প্রবণতার এই সমস্ত জ্ঞানগর্ভ গবেষণায় তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন যথার্থ মননশীল সাহিত্যিক।

২২.১

খোয়াবনামা (১৯৯৬) উপন্যাসটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটি অন্তর্লীন ইতিহাসের আনুভূমিক প্রয়াস। মহাকাব্যিক পটভূমির এই উপন্যাসটিতে লেখক আখ্যান রচনা করেছেন মোট ৫৯টি পর্বে। ঔপন্যাসিক কাহিনির কাঠামোকে আবর্তন করেছেন সিপাহী বিদ্রোহ থেকে শুরু করে দেশভাগ ও তেভাগা আন্দোলন রাজনৈতিক অভীপ্সার বহুবিধ ঘটনার আলোকে। বর্তমানের বগুড়া জেলা (পূর্বের পুণ্ড্রবর্ধন নগরীর) কাৎলাহার বিল ও বিলের পার্শ্ববর্তী গ্রাম গিরিরডাঙা ও নিজগিরিরডাঙা, গোল-বাড়ি হাট ইত্যাদি স্থানের মানুষের জীবনপ্রবাহ, তার দৃশ্য ও অদৃশ্য জগৎ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক শক্তির উদ্ভব, শ্রেণিবৈষম্য, ভালোবাসার বিচিত্র গতির আদলে বিশেষত লোভ-ঘৃণা, কাম-ক্রোধ-ঈর্ষা ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে নির্মিত হয়েছে *খোয়াবনামার* শরীর (মোস্তফা, ১৯৯৭ : ১২৩)। এই সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়ে তিনি আসলে বিধৌত করেছেন সাধারণ মানুষের জীবনকে, যেখানে নারী-পুরুষ উভয়ই সমান অংশীদার। লেখক ইতিহাস আর মিথের সমন্বয়ে তুলে ধরেছেন প্রান্তিক মানুষের জীবনের দ্বন্দ্ব ও সংস্কৃতির শক্তিসমূহকে। প্রান্তিক মানুষের বিশ্বাসই যে অবিশ্বাস, অবাস্তবই যে বাস্তব, অনস্তিত্বই যে অস্তিত্ব–সেটা কৌম জীবন-সংস্কৃতির একটি কাঠামো। ইতিহাসকে লেখক গ্রহণ করেছেন তার উদ্দিষ্ট শিল্পের মাধ্যম হিসেবে। ইতিহাসের উপেক্ষিত যে প্রান্তিক শ্রেণি; তাদের বেঁচে থাকার স্বপ্ন, বাঁচার-স্বপ্ন, বাঁচার-সংগ্রামকে, বাস্তব-অবাস্তবের ছায়া তলে নির্মাণ করেছেন লেখক। প্রচলিত রাজনীতি কখনোই নিম্নবর্গের স্বাধীন ও নিজস্ব জগৎটাকে বুঝতে পারেনি। উল্টোটাও হয়নি–নিম্নবর্গও পারেনি উচ্চবর্গীয় রাজনীতির উপর আধিপত্য স্থাপন করতে। দুটি স্বতন্ত্র স্বর, স্বতন্ত্র পরিসরে বেড়ে উঠেছে (রাজকুমার, ২০১৯ : ১২০)। *খোয়াবনামা* পাঠককে ইতিহাসের সেই পথে নিয়ে যায়, যেখানে নিম্নবর্গ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে বেঁচে থাকার পথকে চিনে নিয়েছে; দ্বন্দ্ব আর চেতন-অচেতনের ব্যবধানকে উতরিয়ে রপ্ত করে নিয়েছে অস্তিত্ব আর মর্যাদার পুরাণটিকে।

২২.২

খোয়াবনামা বাংলাদেশের সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। প্রচলিত জীবনদৃষ্টির বাইরে থেকে জীবনকে দেখার প্রত্যয়ে এর যাত্রা। কথাসাহিত্যে জীবন-সমাজ-ইতিহাসকে বর্ণনা করার প্রধান মাধ্যম হলো চরিত্র। মহাকাব্যিক এই উপন্যাসে প্রধান চরিত্র তমিজ, তমিজের বাপ, চেরাগ আলী, বৈকুণ্ঠ, শরাফত মণ্ডল প্রভৃতি জনগোষ্ঠী। তবে নারী চরিত্র স্বল্প থাকলেও কাহিনিতে নারীর অবস্থান স্পষ্ট ও অনুভবপুষ্ট। প্রধান নারী চরিত্র কুলসুম, তমিজের বাপের দ্বিতীয় স্ত্রী, চেরাগ আলী ফকিরের নাতনি। উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই চরিত্রটি কয়েকটি পরিচয়ের মধ্যে ঘুরপাক খেয়েছে। স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের কারণে মানুষ হিসেবে সে ইন্দ্রিয় প্রভাব দ্বারা তাড়িত। এর বাইরে তার চরিত্রের সার্বিক বিকাশ হয়েছে স্মৃতিচারণার মধ্যে দিয়ে। তার চরিত্রের প্রধান দুটি দিকের মধ্য প্রথমটিতে আছে, অভাব-অনাহার-স্নেহ-ভালোবাসাহীন এক জীবন; দ্বিতীয়টিতে আছে ইন্দ্রিয় ভাবনাময় অধিবাস্তব এক জগৎ। যেখানে দাদা চেরাগ আলী, স্বামী তমিজের বাপের সান্নিধ্য ও সংস্পর্শের প্রত্যক্ষ প্রভাব। কুলসুম নিম্নবর্গের একজন নারী হলেও তার জীবনবোধ প্রচলিত সীমানার বাইরে। লেখকের স্বাতন্ত্র্যের সুস্পষ্ট দিক এখানেই যে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্নাঙ্গিক থেকে নিম্নবর্গের জীবনকে দেখতে চেয়েছেন; দেখাতে চেয়েছেন নিম্নবর্গের সীমানায় এসে, নিম্নবর্গের মতো করে। সংগ্রামশীলতা যেমন নিম্নবর্গের জীবনের অংশ, তেমনি তাদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলও সম্পূর্ণ নিজস্ব। নিম্নবর্গের এই জীবনকে, এই লৌকিক সাংস্কৃতিক বোধকে, অবিকৃতভাবে উপস্থাপনের নিরন্তর প্রচেষ্টা এই উপন্যাসে পরিব্যাপ্ত। উপন্যাস সতত জীবনের প্রতিচ্ছায়াকে বহন করে চলে। লেখক চরিত্রের ক্রমবিকাশ, দ্বন্দ্ব, জীবনদর্শন, আর্থ-সামাজিক অবস্থান, সমাজ ও সমকালকে প্রতীকায়িত করেছেন। কুলসুম সেই সময়, সেই সমাজের হয়েও অন্য পৃথিবীর, অন্য ধরনের মানুষ। যার সমস্ত জীবন কেটেছে ক্ষুধার জ্বালা নিয়ে, তবে ক্ষুধার তপ্ত দাহ তার মনের অনাবিল জ্যোস্নাৎকে দহন করতে পারেনি। ক্ষুধার নিষ্ঠুরতাকে *খোয়াবনামা*'র শোলোকের রহস্যে লুপ্ত করে স্বপ্নের ইন্দ্রিয়জালে মত্ত থেকেছে সে। তার তুলনার প্রতিচ্ছায়া নির্মাণ হয়নি বাংলা সাহিত্যে।

২২.৩

আলোহীন জীবনের অতি-শৈশবে কুলসুম তার বাবাকে হারিয়েছে, সে স্মৃতি বড় ধূসর বালুকণাময়। বাবা নামক মানুষটিকে বড় অচেনা আর অপরিচিত মনে হয়েছে তার। তারপর শৈশবের ক্ষীণ আলোয়

মাকে ছেড়েছে; মাকে হারিয়েছে মায়ের দ্বিতীয় বিবাহের সূত্রে। আত্মমগ্ন কুলসুমের স্মৃতিতে সহসা আলোড়ন তোলে স্মৃতিভ্রষ্ট মায়ের ছায়া–যমুনার কোন চরে 'সবুজ শাড়ির ময়লা আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে' তার মা-ই তাকে তুলে দিয়েছিল দাদার হাতে; আর তখন থেকেই 'দাদার সঙ্গে এ-গাঁও ও-গাঁও হাঁটতে হাঁটতে কুলসুম বড় হয়' (আখতারুজ্জামান, ২০১২ : ৪৩৩)। স্মৃতি আবিষ্ট কুলসুম এভাবেই তার পূর্বের জীবনকে খুঁজে চলেছে। সেই শৈশব থেকে দাদা চেরাগ আলীর সঙ্গী সে, তার ভিখ-মাঙা জীবনে শৈশব-কৈশোরের দীর্ঘ-পথ পাড়ি দেওয়া। মাদারি পাড়ার খাল পার হলে, বড় বড় গেরস্তদের অনেক গ্রাম 'এসব জায়গায় আকিকা, খাতনা, কুলখানি, চেহলাম, বিয়েশাদি, মানত একটা-না-একটা লেগেই থাকতো' (আখতারুজ্জামান, ২০১২ : ২৭)। এই সব অনুষ্ঠানের অনানুষ্ঠানিক খাবার খেয়ে তাদের দিন কাটত। তবে বিপদে পড়তে হতো বর্ষাকালে, প্রায়ই অনাহারে থাকত দাদা আর নাতনিকে। কারণ বর্ষার অতিবৃষ্টি স্পষ্ট করে তুলতো গ্রামবাংলার দারিদ্র্যকে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে লেখক গ্রামবাংলার জনজীবনকে দেখেছেন খুব কাছে থেকে। তারা পেট পুরে ভাত পেলে খোয়াব দেখে, তাদের খোয়াব দেখার সাধ জাগে। সংস্কারাচ্ছন্ন এই সব মানুষ খোয়াবের মাজেজা খোঁজে চেরাগ আলী ফকিরের কাছে :

> তার মাথায় কালো রঙের কাপড়ের টুপি, আলখেল্লাটির রঙ এককালে হয়তো কালোই ছিলো, পরে নানান রঙের কাপড়ের তালি লাগার ফলে আসল রঙ খুঁজে পাওয়া দায়। কাঁধে রঙ-জ্বালা-চটের-ঝোলা, এর ভেতর তার বই। আবার গেরস্থের ঘরের চাল, আলু, পেঁয়াজ, পটল, বেগুন, মরিচ, সময়ের আমটা, কলাটা যে যা দেয় নেওয়ার জন্যে সে এটা সামনে এগিয়ে দেয়। পয়সা নেওয়ার জন্যে কুলসুমের হাতে একটা টিনের থালা (আখতারুজ্জামান, ২০১২ : ২৮)।

অভাব আর দারিদ্র্যে ভরা জীবন এভাবেই কাটে অন্যের দয়া আর কারুণায়। মাদারি ফকির চেরাগ আলীর মরমি অভিজ্ঞানের সংবহন ঘটে নাতনি কুলসুমের মধ্য দিয়ে। দাদার সঙ্গে কাটানো দীর্ঘ সময়ের অভিজ্ঞতা তাকে মরমি ফকিরের শোলোক সম্পর্কে অবহিত করেছে।

২২.৪

কুলসুমের ভিক্ষা-মাঙা জীবনের পট-পরিবর্তিত হয়েছিল বিয়ের মাধ্যমে। যমুনার ভাঙনে মাদারি পাড়ার ফকির বাড়ি তলিয়ে গেলে তাদের আশ্রয় হয় মাঝি পাড়ার কালাম মাঝির জমিতে। অনালোকিত সেই জীবনের সীমানায় আগমন ঘটে আবোর, ঘুমকাতুরে, স্বামী তমিজের বাপের। পিতার বয়সী তমিজের বাপ নামক মানুষটিকে কুলসুম প্রথম দেখে তার দাদা মরমি ফকির চেরাগ আলির ভক্ত হিসেবে। বালিকা কুলসুমের তমিজের বাপকে প্রথমবার দেখার অনুভূতি লক্ষ করার

মতো। যেখানে মানুষটার চেহারায় আধো ঘুম, আধো জাগরণের এক অদ্ভুত অভিব্যক্তি জাগ্রত। মিনমিন কণ্ঠে লোকটা যখন বলে, ''আর গান হবি না'', তখন কুলসুম আবাক হয় এই ভেবে যে 'মানুষটা কথা বলতে পারে?' চেরাগ আলী ফকিরের গান শোনার প্রলোভনে কুলসুম আর তার দাদাকে স্থায়ীভাবে থাকার ব্যবস্থা করে দেয় কালাম মাঝির জায়গায়। পিতার বয়সী এই পুরুষের সঙ্গে দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে তার ঘটেনি কোনো জৈবিক সংশ্রব। দেশ-কাল-শ্রেণির ভিন্নতা সত্ত্বেও কুলসুমের এই অতৃপ্তিকে তুলনা করা যায় লেডি কেনির সঙ্গে। ডি এইচ লরেন্সের (১৮৮৫-১৯৩০) *লেডি চ্যাটার্জির* প্রেমিক (১৯২৮)-এর সঙ্গে। পুরুষ তমিজের বাপের যৌনাঙ্গ কুলসুমের মনে প্রশ্ন জাগে ওটা দেখে লাভ কি কুলসুমের? তেমনি মেলর্সের পুরুষাঙ্গ দেখে প্রভুপত্নী লেডি কেনির মনে হয় প্রভুসুলভ, সেই সঙ্গে এও মনে হয় পুরুষেরা কর্তৃত্বপরায়ণ। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের লিঙ্গবাদী কর্তৃত্ব লেডি কেনি মেনে নেন মেলর্সের লিঙ্গ দেখে, অবশ্য এর পেছনে কাজ করেছে স্বামীর লৈঙ্গিক অক্ষমতাজনিত অতৃপ্তি। কুলসুমের জীবনেও একই রকম সংকট, তার স্বামী আছে কিন্তু কোনো যৌনজীবন নেই (মেহেদি, ২০০৮ : ১৫৮)। সব মানুষ প্রতিবাদী হয় না, সবার প্রতিবাদের ধরনও এক হয় না। কেউ যন্ত্রণাকে ব্যক্ত করে না, কেউ অন্তরে অন্তর্লীন করে প্রতিদিনের বেঁচে থাকার মধ্য দিয়ে। কুলসুমের স্বাতন্ত্র্যও এখানে।

২২.৫

কুলসুমের আজীবনের সঙ্গী দারিদ্র্য আর অভাব; ক্ষুৎপিপাসা, অনাদর-অবহেলায় কাটানোই তার জীবনের ধর্ম। সপত্নী পুত্র তমিজের উপার্জনে কোনো রকমে বেঁচে থাকার অন্নের জোগান ঘটলেও অভাব দূর হয়নি তার। জীবনের শুরু থেকেই জীবনকে বয়ে বেড়ানোর শিক্ষা সে পেয়েছে। তার ভাষায় 'বারোভাতারি খানকি খিদেকে' কাবু করার কৌশল তার জানা আছে :

> বছর দুয়েক আগে আকালের সময়। কী রকম সেটা–জোরালো কোনো গন্ধ পেট ভরে নিতে পারলেই পেটটা তার বেশ ফুলে ওঠে। তবে থুথু ফেললে চলবে না। থুথু যতবার আসে একটু জমতে দিয়ে গিলে ফেলতে হবে, তাতে পাতলা ডাল খাওয়ার কাজ হয়। বমি বমি লাগবে, কিন্তু করা চলবে না, বমি হলেই পেট খালি। (আখতারুজ্জামান, ২০১২ : ৩৪৮)

তার এই অভিজ্ঞতায় উঠে এসেছে নিম্নবর্গের ক্ষুধিত জীবনের ইতিহাস। অতৃপ্ত এই ক্ষুধা নিম্নবর্গের জীবনের চিরকালীন সত্য। এই ক্ষুধার ইতিহাস বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যের পাতায় পাতায় পাওয়া যায়; পাওয়া যায় আবু ইসহাকের *সূর্য-দীঘল বাড়িতে*। *খোয়াবনামার* পাতায় পাঠক আবারও প্রত্যক্ষ করেছে ক্ষুধার নির্জলা ইতিহাস। ক্ষুধা কুলসুমের দাদার ঘরে, স্বামীর ঘরে, সর্বত্র

আকাল আর ক্ষুধার প্রতিচ্ছবি; আজন্ম ক্ষুধার অবসানের কোনো সমাধান তাদের জীবনে আসেনি। কুলসুমের ক্ষুধার চিত্রও পাওয়া যায় কুলসুমের আত্মমগ্নতায়। ক্ষুধার প্রচণ্ডতা থেকে কুলসুল প্রায়শ চেয়েছে দাদা চেরাগ আলী পেশা পরিবর্তন করে চাষি হোক; তাতে অন্তত খাওয়ার কষ্ট ঘুচে সে-কারণেই তমিজের উপার্জন করে ফিরে আসা কুলসুমকে আনন্দিত ও উৎফুল্ল করেছে :

> সেবার সেই তো তার প্রথম গাঁয়ের বাইরে যাওয়া। ছেলে রোজগার করে ঘরে এলো তো কুলসুম একটু খুশি হবে না? হোক না তার সৎ বেটা, হোক না সতীনের বেটা, পেটে নাই বা ধরলো তাকে, তবু বেটা তো! (আখতারুজ্জান, ২০১২ : ৩৪৬)

কুলসুমের এই অনুধাবনের মধ্যে আছে গ্রামীণ নিম্নবর্গীয় নারীর সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞান। গ্রামীণ নারীর দীর্ঘ অবদমনের যে সংস্কৃতি, তাই তাকে নিজের সমবয়সী তমিজকে পুত্র ভাবতে সহায়তা করেছে। পাশাপাশি দীর্ঘ অনাহারের অভিজ্ঞতায় কিছুদিনের নিশ্চিত অন্নের আগমন তাকে করেছে আনন্দিত। উপন্যাসের বিস্তৃত পরিধিতে চল্লিশের দশকের প্রান্তিক মুসলিম জীবনের যে সূত্র লেখক এঁকে দিয়েছেন, কুলসুম সেই সমাজের অংশ। যেখানে নারী প্রচলিত অর্থেই আবোর প্রাণী, সেখানে কুলসুম পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় তার জীবন আর দশজন নারী থেকে আলাদা। তবে শ্রেণিগতভাবে এক হওয়ায় কুলসুম, ফুলজান সবাই একইভাবে শোষিত হয়েছে। শ্রেণিগত জায়গায় নিম্নবিত্ত ও বর্গ দুইয়েরই অধীন তারা, আবার লিঙ্গগত প্রেক্ষিত থেকে আরো একটু বেশিই পিছিয়ে পড়া শ্রেণি। প্রান্তিকতার চূড়ান্ত সীমায় জীবন ধারণ করতে করতে বঞ্চনাজনিত ক্ষোভ ও ক্রোধের অবদমন কুলসুমের অন্তর্মনে এক বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। সে কারণেই একজন নারী কুলসুমের মনে হয়েছে উৎপাদনের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ততার কথা। সেখানে রয়েছে জমির মালিক বর্গাচাষিকে শোষণের ষড়যন্ত্র। এই সমস্ত আনুষাঙ্গিক ভাবনা নিয়ে সমালোচকের অভিমত নিম্নরূপ :

> ইলিয়াসের খোলা চোখের দৃষ্টি সমকালের মূলটুকু দেখে নেয়, তাঁর দাঁত নখ সবই, বাজপাখির মতো তড়িঘড়ি ও সোজাসুজি, আর ঠিক সেইটুকুই তিনি লিখতে বসে যান। এইজন্যেই তাঁর লেখায় হাবাগঙ্গারামদের প্রেম নেই। দাম্পত্য, প্রেম, প্রীতি, পিতৃভক্তি, বাৎসল্য ইত্যাদির উপর তিনি বাজ ফেলেছেন। জীবন এই রকম নাকি? এত কুৎসিত? দুপুরের ন্যাড়া মাঠে পোড়া মাটির মতো? (হাসান, ২০১৭ : ১০৩)

গবেষকের মতের প্রতি সহমত রেখে বলা যেতে পারে, লেখক প্রান্তিক জীবনকে সমূলে আত্মস্থ করেছিলেন। তাই এই উপন্যাস মেদহীন নির্যাস সময় ও সমাজের প্রতিচিত্র হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাহিত্যের পাতায়। ব্যক্তি কুলসুমের দ্বিতীয় পরিসরে তার বাহ্যিক জগতের আড়ালে আছে আর এক জগৎ। যে জগৎ তাকে ভুলিয়ে রাখে প্রান্তিকতার যন্ত্রণা থেকে, যা অধিবাস্তবের অন্তর্জগৎ।

ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার মধ্যে প্রান্তিকতার যে সীমানা নির্মিত হয়েছে, সেখানে নারীর নিজস্ব সত্তার বিশুদ্ধ চেহারা অচেনাই থেকে যায়। তারা রূপান্তরিত হয় উচ্চবর্গীয় ধ্যান ধারণার রীতিনীতিতে অভ্যস্ত উচ্চবর্গের অনুকারক মাত্র হিসেবে (বিপ্লব,২০০৭ : ৭৪)। যুগ যুগ ধরে শাসিত আর শোষিত হওয়ার ফলে নারী এটাকেই স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছে। তমিজের উপার্জিত অন্নের নিশ্চয়তা তাকে আনন্দিত করলেও, তিরস্কৃতও তাকে হতে হয়েছে পদে পদে। কথায় কথায় কুলসুমকে শুনতে হয়েছে ফকিরের বেটির কুৎসা। লৈঙ্গিক বৈষম্যের আওতায় তার সামাজিক অবস্থান নির্ধারিত হয়েছে। কুলসুমের ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। তবে প্রতিনিয়ত অপমানিত হওয়ার যন্ত্রণা কুলসুমকে প্রতিবাদী করে তুলেছে। ঔপন্যাসিকের বয়ানে তার অন্তর্জ্বালা যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা নিম্নরূপ :

> হামাক তো তোমরা রাখিছো চাকরাণী কর্‌য়া, আবার হামাক দিয়া কামলাও খাটাবার চাও?...রাগে ও চুলার আঁচে তপ্ত বেগুনি মুখটা তমিজের দিকে পলকের জন্যে একবার ঘুরিয়েফের চুলায় মনোযোগী হয়ে কুলসুম বলে, 'হামার ফকিরের ঘরের বেটি, হামরা কি জেবনে পাকঘর দেখেছি, না-কি পাকশাক করিছি? হামাক ওদে পোড়া লাগবি, বিষ্টিত ভিজা লাগবি। (আখতারুজ্জামান, ২০১২ : ৩৬৪)

এই সমস্ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নারীর প্রান্তিকতার বিভিন্নরূপ উঠে এসেছে। সেখানে নামহীন তমিজের বাপের আচরণে আবার কখনো তমিজের আচরণে। বিত্তহীন জীবনের গ্লানি তাকে প্রতিদিন আহত করেছে; সেই যন্ত্রণায় কাতর মন আশ্রয় খুঁজেছে চেরাগ আলী ফকিরের শোলোকে। পরাবাস্তবতা আর যাদুবাস্তবতার পরিসরে কুলসুমের যে জীবন সেখানে সমাজে প্রচলিত নারীর প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি তা বহমান।

২২.৬

তমিজের বাপ নামক যে পুরুষ কুলসুমের স্বামী, তার কাছে কুলসুমের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করার দায়িত্ব গুরুত্ব না পেলেও, স্বামীত্বের মানদণ্ডে কোনো ত্রুটি গ্রাহ্য হয়নি। পুরুষের ধর্ম বা অধিকার হয়ে দাঁড়িয়েছে নারীকে পদস্থ রেখে তার ওপর প্রভুত্ব দেখিয়ে, তার সেবা ও সম্মান আদায় করে নেয়। তমিজের বাপ সেই সমাজের মানুষ, তাই তার স্বামীত্বের জায়গায় কোনো রকম ত্রুটি, বিচ্যুতি, সে সহ্য করবে না। কারণ নিম্নবিত্তের এই জীবনব্যবস্থায় নারী আরো বেশি নিম্নবর্গ। সে কারণেই, যখন-তখন তাকে ফকিরের বেটি বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা যায়। গৃহকর্মের অনিপুণতায় তাকে প্রহার করা যায় :

> তুই হামার ভাতেত পাও দিস? এই নাপাক ভাত হামি এখন মুখোত তুলি ক্যাংকা কর্‌য়া? সঙ্গে সঙ্গে ওই এঁটো হাতের কিল পড়তে লাগলো কুলসুমের পিঠে। বাপরে, ভাতের সঙ্গে বহুদিন পর মুখে দুটো মাছ

> পড়তে না পড়তে বুড়ার তেজ কী! হাতের কিল আর তার থামে না। ওদিকে চাঁদের আলোয় হুঁকা টানা খান্ত দিয়ে দরজায় এসে দাঁড়ালো তমিজ। বাপের রাগে জোগান দেয় সেও, 'বাজানের ভাতের থালিত তুমি পাও দেও? ইটা কেমন কথা গো? মুখের রন্ন তুমি পাও দিয়া ঠেলো? নক্ষীর কপালেত তুমি নাথি মারো? কেমন মেয়েমানুষ গো তুমি? (আখতারুজ্জামান, ২০১২ : ৩৪৩)

নারীর গায়ে হাত তোলা, শারীরিকভাবে নির্যাতন করা পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার একটি ঘৃণ্যতম দিক। নারীকে শারীরিক ও সামাজিকভাবে দুর্বল প্রমাণ করে সমাজ যুগের পর যুগ এই অনাচার করে আসছে সমাজ। নানা বিশেষণে অভিহিত করে নারীকে শোষণ করার পথ তৈরি করেছে সমাজ। সে কারণেই কুলসুমের মতো নারীদের এভাবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, অপমানের মধ্য দিয়ে জীবনকে অতিবাহিত করতে হয়। তবুও পরিবার, পরিবারের সদস্যদের প্রতি ভালোবাসা নিয়ে তারা বেঁচে থাকে। এই উপন্যাসের প্রত্যেকটি চরিত্রে নিম্নবর্গীয় মানুষের অবস্থানগত ঐতিহাসিকতার পরিপাত্র রূপে; তাদের প্রত্যেকের গাঁ থেকে পাওয়া যাবে মাটির গন্ধ, গাছের গন্ধ, ঘাসের গন্ধ। প্রত্যেকটি চরিত্রের সঙ্গে মিশে গিয়ে এঁরা প্রবল জীবনানুরাগের মাধ্যমে অন্বেষণ করেছেন নিম্নবর্গের স্বর ও স্বরবর্ণ (জহর, ২০১৭ : ১৩৭)। অবস্থানগত বৈষম্যে সে তাদের থেকে নিম্নে, কারণ, সে নারী। কুলসুমের এই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে কৌমসমাজের আচার-আবহের মধ্যে কুৎসা-মিথ্যাচার-হীনম্মন্যতার-গ্লানি-মূঢ়তার কাঠামো নির্মিত হয়েছে। প্রাত্যহিক উপাদান-উপকরণে যা সমৃদ্ধ, আবার একইসঙ্গে চরিত্রের স্বতঃস্ফূর্ততায়ও তা গৃহীত। কুলসুমের নারীজীবনের কন্যা-জায়া-জননীর যে আবহ, সেখানে সুখ-আনন্দ-শান্তির জৈবিক চাহিদা সম্পর্কে সে ছিল উদাসীন। বৈবাহিক জীবনের জৈবিক অতৃপ্তিকে উপেক্ষা করলেও, জীবনের অনর্থতার বেদনা তার মধ্যেও অন্তর্লীন ছিল। বিবাহিত নারীর মাতৃত্বের বোধ তার স্বাভাবিক জীবনানুভূতি। যখন কোনো কারণ ছাড়া তা বাঁধাপ্রাপ্ত হয়েছে, তখন তার কথা নারী বলতে পারে না। তবে অন্তরের তাগিদ সে অনুভব করেছে আজীবন। নিম্নবর্গীয় গ্রামীণ জীবনে নারীর সংস্কার, শিক্ষা তাকে এ কথা বলা থেকে বিরত রেখেছে।

২২.৭

খোয়াবনামা একটি দলিল, নিম্নবর্গীয় জীবনের দলিল। নিম্নবর্গীয় শ্রেণির ইতিহাসের ধারায় শাসক শ্রেণি আর শোষিত শ্রেণির অনুপুঙ্খ চরিত্র যেমন এখানে নির্মিত হয়েছে, তেমনি শ্রেণি-লিঙ্গ অনুসারে সব শ্রেণির মানুষের সামষ্টিক ক্রন্দন, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার সামগ্রিকতার উপস্থাপিত হয়েছে এই উপন্যাসে। ঔপনিবেশিক সমাজব্যবস্থায় প্রান্তিক একজন নারীর নিজের কোনো চাওয়া-পাওয়া থাকে না; যা থাকে তা কেবল অতিবাহিত সময়ের অভিজ্ঞতা। সমগ্র উপন্যাসে কুলসুম ব্যক্তি হিসেবে,

ব্যক্তিক চাওয়া-পাওয়ার অবদমিত সত্তা হিসেবে অধিবাস্তবতার তীর্যকতায় উদ্ভাসিত। দাদা চেরাগ আলীর অভিভাবতা আরো বিস্তৃতি পেয়েছে তমিজের বাপের ঘুমের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হওয়া ধ্বনির অন্তর্জালে। সময়ের পাল বেয়ে সেও বরকতুল্লা শাহ-মজনু শাহ-ভবানী পাঠকদের সঙ্গে গিরিবংশের পূর্বজনগণের সম্পর্কের মধ্যে আত্মপরিচয় খুঁজে চলেছে।

> কুলসুমের সামনে হাঁড়ির ওপর ধোঁয়ায় কালো তন্ত্রের টুপিপরা চেরাগ আলীর মাথা। হাতের ছড়ি ঠুকে ঠুকে বুড়া কোন মেলায়, কোন হাটে, কোন নদীর ঘাটে বটতলায় ঘোরে আর দোতারা বাজিয়ে গান করে। চুলায় ভাত ফোটে টগবগ করে, আর সেই আওয়াজে তৈরি হয় চেরাগ আলীর শোলোক। (আখতারুজ্জামান, ২০১২ : ৪৩০)

যেন বাস্তবতার বৃত্তে থেকেও কুলসুম অবস্থান করেছে অধিবাস্তবের ভরকেন্দ্রে। অথবা প্রয়োজনের বাস্তবে আচ্ছন্ন হয়েও অপ্রয়োজনের গভীরে অবগহন করেছে। কিংবা দুই-ই চলেছে বাস্তবের যোগাযোগে, বর্তমানের সংকটকে ভুলে থাকার প্রচেষ্টায়। আত্মমুক্তির আকল্প, যে আকল্পে ভাত ফোটার টগবগে শব্দে নির্মিত হয়েছে শোলোকের মন্দ্রসুর। এই সমস্তই কুলসুমের নিজস্ব চেতনার সঞ্চারিত রূপ। তার জীবনের আর্থিক দীনতা তাকে সমাজ-সংসারে দরিদ্র, কাঙাল, বলে অবাঞ্ছিত করলেও চেতনার ঐশ্বর্যে সে অনন্য ও সৃষ্টিশীল এক নারী। যে সমাজ নারীকে জৈববৃত্তি নির্ভর এক প্রাণী ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না; সেখানে কুলসুম এক অনন্য দৃষ্টান্ত। *খোয়াবনামার* গ্রামীণ পরিসরে লোকজ জীবনের বহমানতায় কুলসুমের মরমিবাদের সুস্পষ্ট উচ্চারণ ও পরম্পরার অভিব্যক্তির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় শরাফত মণ্ডলের নাতি হূমায়ুনের রোগ শয্যাকালীন স্বপ্নের ব্যাখ্যায়। নিবিষ্ট মনে হামিদার খোয়াবনামা শুনে সে কেঁপে ওঠে; এই কেঁপে ওঠার মধ্য দিয়ে সে স্পষ্ট সুরে শুনতে পায় দাদা চেরাগ আলীর কণ্ঠ ও শোলোক। কুলসুম মিলিয়ে নেয় চেরাগ আলীর শোলোকের সঙ্গে হামিদার শোনা শোলোকের :

> খোয়াবে জননী চুম্বে পুত্রের ললাট
> ঝাঁপ দিয়ে পড়ে বাছা মত্ততের ঘাটে
> চুম্বিলে পুত্ররে মা গো কী কহিব আর ।
> আজরাইল লুকায় ছিলো ওষ্ঠোতে তোমার ॥ (আখতারুজ্জামান, ২০১২ : ৪৩৮)

কুলসুমের এই বর্ণনায় মণ্ডল বাড়ির বউ হামিদা বানু আহ্লাদিত হয়ে তাকে বুবু ডাকতে শুরু করে। এত দিন যা ছিল কুলসুমের একান্ত ব্যক্তিগত চেতনা, তার প্রকাশ ঘটে, অন্যের সম্মুখে আসে। কুলসুম শোনে হামিদার স্বপ্নের বিবরণ যেখানে তমিজের বাপের আদলের একজন মানুষ কাফনের কাপড় পরে

আগমন করে, যার কণ্ঠস্বর ছিল ফসফসে ধরনের, কিছু সময়ের ব্যবধানে তার অন্তর্ধান ঘটে। ব্যাকুলভাবে সে কুলসুমকে জড়িয়ে ধরে জড়ানো গলায় কুলসুমকে বুবু সম্বোধন করে। হামিদার বুবু সম্বোধনে বিগলিত হয়ে যায় কুলসুম, অনাহার, অবহেলা আর অবাঞ্ছিত এই জীবনে কেউ তাকে স্নেহের পরশ দেয়নি। মণ্ডল বৌয়ের খোয়াবের ব্যাখ্যায় কুলসুমের মরমি সত্তার জাগরণ, ব্যক্তি কুলসুমকে প্রখরতা দিয়েছে। যে অনাদৃত অবহেলার জীবনের জন্য তমিজ, তমিজের বাপসহ আরো দশজন মানুষের কাছে তাকে অবহেলা আর অপমানই পেতে হয়েছে। সেই জীবনের ঔদার্যতাই তাকে অসাধারণ করে তুলেছে। একজন তৃণমূল নারীর স্বতঃস্ফূর্ত জীবনদর্শনে গ্রামবাংলার সহজাত এই দর্শনের আঁধার তাকে চেতনাগত এক অরূপ সত্যতায় আবিষ্ট করেছে। তমিজের স্বগতো উক্তিতে তা ভাস্বর হয়েছে : 'হাজার হলেও সে চেরাগ আলি ফকিরের নাতনি। তমিজ জানে তার সৎ মা কম মানুষ নয়। তার বাপটাকে এখনও ফকিরের কবজার মধ্যে ধরে রেখেছে এই কুলসুমই।' (আখতারুজ্জামান, ২০১২ : ৪৫৫) খোয়াবের মাজেজার আড়ালে থেকে লেখক এভাবে কুলসুমের ব্যক্তিত্বের অসাধারণ দিকসমূহকে তুলে ধরেছেন। গ্রামের প্রান্তিক সাধারণ নারীর মধ্যে চিন্তার অসারতার মধ্যেও বৈদগ্ধ্যসত্তার দীপ্তি খেলা করেছে, যা বাংলা সাহিত্যে তার অবস্থানকে সুদৃঢ় ভিত্তি দিয়েছে। নিম্নবর্গের ইতিহাস ও জীবনবাস্তবতাকে রূপদান করতে গিয়ে লেখক লোকজ উপাদান, পুরাকথা, ছড়া, শ্লোক, মিথ ও জিনের অস্তিত্বকে নিম্নবর্গের জীবনের সমান্তরালে বিধৃত করেছেন।

২২.৮

পৃথিবীর প্রায় সব দেশের মতোই ঔপনিবেশিক যুগে নারীর ভূমিকা গৌণ হয়ে পড়েছে। প্রান্তিক নারী হলে তাকে নানা রকম সামাজিক উৎপীড়নের শিকার হতে হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা তাদের জন্য নয়। যেখানে একজন নারীকে বিবাহের নামে পণ দিয়ে কন্যা সম্প্রদান করা হয়, সেখানে স্বামী বৃদ্ধ হতে পারেন, লম্পট হতে পারে, তাতে কিছু আসে-যায় না। এই সব কিছুর মধ্য দিয়ে নারীকে রূপান্তরিত করা হয়েছে শান্ত, সহ্যশীলা, নিষ্ক্রিয় জড় প্রাণী হিসেবে (বিপ্লব, ২০০৭ :৭৭-৭৮)। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় পারিবারিক বন্ধনের মধ্যে নারী শ্রমের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়েছে। অথচ নারীর শ্রমের সঙ্গে অর্থনৈতিক শ্রমের সম্পর্কহীনতার কারণে তার মধ্যে অবদমনের অভ্যাস বিস্তৃত হয়েছে। ফ্রয়েডের মতে ব্যক্তিত্বের বিকাশ গড়ে ওঠে জন্মগত এবং পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যের পারস্পরিক সংঘাতে। সমাজবদ্ধ মানুষের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিচৈতন্যের গভীরে রয়েছে মিথের গোপন চলাচল। ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার হিসেবে যা সঞ্চিত থাকে ব্যক্তির মননশীলতার ব্যাপ্তিতে। নিজস্ব সংস্কৃতির বলয়ের মধ্যে বসবাসকারী প্রতিটি মানুষের মধ্যে মিথের কাহিনি সুপ্ত

অবস্থায় থাকে। 'খোয়াবনামায় ইলিয়াস মিথকে অবলম্বন করেছেন, তা ভেঙেছেন, আবার তা নির্মাণও করেছেন।' (শওকত,১৯৯৮ :৪১) তমিজের বাপের মগ্ন অধিবাস্তব জগতের ঘোর লাগা তন্দ্রায় যখন অসারতা ভর করেছে, তখন কুলসুম তাকে বোঝার চেষ্টা করেছে। কুলসুম অনুভবের অভিব্যক্তিতে যার প্রকাশ নিম্নরূপ :

মজনু হুঙ্কারে যতো মাদারি ফকির।

আন্ধার পাগড়িতে ঢাকো নিজ নিজ শির।।

সিনা টান রাখো আর আঁখি ভিতর।

সুরমা করিয়া মাখো সুরুজের কর।। (আখতারুজ্জামান, ২০১২ : ৫১৫)

তমিজের বাপ আর কুলসুমের এই যোগাযোগে কোনো জৈবিক বন্ধনের পথে রচিত হয়নি; হয়েছে আত্মিক যোগাযোগের পথে। তমিজের বাপের মৃত্যুর পরও সেই সম্পর্কের অন্তঃশিলায় বহমান থেকেছে। তমিজের বাপের অশরীরী বাস্তবতা গ্রাস করেছে কুলসুমকে। এভাবে কুলসুম আর তমিজের বাপ দৃশ্যমান সম্পর্কের বাইরে নির্মাণ করেছে অদৃশ্যমান আত্মিক সম্পর্কের আশ্রয়। মৃত্যুর পরও কুলসুম প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যে তমিজের বাপের ছায়া খুঁজে পেয়েছে। মৃত মানুষ তমিজের বাপকে কুলসুম যেভাবে আবিষ্কার করেছে তার সঙ্গে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর *কাঁদো নদী কাঁদোর* মোহাম্মদ মোস্তাফার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। মোস্তাফা এমন সব বস্তু বা ঘটনা দেখে, যা অন্য কেউ দেখতে পায় না। আবার আর একটি চরিত্র সকিনা নদীর কান্নার শব্দ শুনতে পায়, যা আর কেউ শুনতে পায় না (শওকত, ১৯৯৮ : ৩০)। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বোধিশক্তি অন্তর্সত্তায় নিম্নবর্গের বহির্বাস্তবতার পাশাপশি অন্তর্বাস্তবতা অন্তঃশীল হয়েছিল। মিথকে লেখক এমনভাবে অন্তর্সত্তায় অবগাহন করিয়েছেন, যেন চরিত্রের অবচেতনার পরতে পরতে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম প্রবাহিত থাকে। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের সমৃদ্ধ ধারায় মিথ আর অধ্যাত্ম সাধনার অলৌকিকতায় কুলসুম এক অনিন্দ্য সংযোজন।

২২.৯

খোয়াবনামার উপন্যাসের কেন্দ্রীয় পরিসরে কুলসুম যতখানি আত্মমগ্নতায় বিভোর অতীন্দ্রিয় সত্তায় স্বপ্নালোকিত, ফুলজান ততখানিই আত্মমর্যাদা, সংগ্রাম ও প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত নারী। শ্রেণিগত পরিচয়ের দিক থেকে নিম্নবর্গাধীন, বর্গাচাষি হুরমতুল্লাহর মেয়ে আর কেরামত আলির স্ত্রী সে। সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ হিসেবে নারীর নিজস্ব কোনো পরিচয় তৈরি হয় না, তাই তাকে পিতা অথবা

স্বামীর পরিচয়ে পরিচিত হতে হয়েছে। ফুলজান শুধু কারো কন্যা বা স্ত্রী নয়, সে সন্তানের জননীও বটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজাত দুর্ভিক্ষ তাকে সংকট ফেলেছে, স্বামী কেরামত তাকে পিতৃগৃহে রেখে নিরুদ্দেশ হয়েছে। দরিদ্র বর্গাচাষি পিতার অভাবের সংসারের সে গলগ্রহ হয়ে থাকার দায় থেকে মুক্তি পেতে যথাসাধ্য পিতাকে সহযোগিতা করেছে। ঔপন্যাসিকের বয়ানে :

> হুরমতুল্লাহর মেয়ে তিনজন। বড়োটার বিয়ে হয়েছিলো, স্বামীর ভাত খায় না দুই বছরের ওপর। বাপের বাড়িতেই পড়ে আছে। ....তা ছেলে না হোক লোকে বলে মেয়েরাই তার একেকটা ছেলের মদ্দা মানুষের মতো। নিজেদের ভিটার সব কামতো করেই দিঘীর দক্ষিণে এই বর্গা জমিতেও বাপের কামলাগিরি করে তারাই। (আখতারুজ্জামান, ২০১২ : ৩৮০)

ফুলজান চরিত্রকে লেখক শুধু একজন নারী চরিত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি; জীবনের ঘাটে ঘাটে তাকে মূল্য দিতে হয়েছে একজন সংগ্রামী মানুষরূপে। ফুলজানকে মূল্য দিতে হয়েছে একজন নিম্নবর্গ হিসেবে, আর্থ-সামাজিক শোষণের মধ্যে বাড়তে দেয়া জীবনের হিসাব; নারী হিসেবে লৈঙ্গিক বৈষম্যের শিকার হওয়া, বর্গাচাষি পিতার সহযোগী হয়েও শ্রমের যথার্থ মূল্য না পাওয়া শ্রমিকরূপে। এই সবকিছুর পরও সে একজন মা; অপুষ্টি আর চিকিৎসাহীনতায় পরপর দুটি সন্তানকে হারানোর যন্ত্রণাও তাকে মেনে নিতে হয়েছে। এর মধ্যে আছে বৈশ্বিক রাজনীতির ষড়যন্ত্রের দুর্ভিক্ষ, স্বামী নামক কেরামত আলির দায়িত্বহীনতা আর চিরদিনের সঙ্গী প্রান্তিকতার চরম যন্ত্রণা। বাবা কেরামত আলি সন্তানের দায়িত্ব অস্বীকার করে যেতে পারে, মা ফুলজান পারে না, পুষ্টিহীন দুটি শিশুর দায়িত্বকে এড়াতে। বিয়ের পর যখন একজন নারী পিতার গলগ্রহ হয়, তখন তা পিতা এবং কন্যা উভয়ের জন্য যন্ত্রণার। শ্রমজীবী পরিবারের ক্ষেত্রে ঐ সন্তানের মাকে তার সন্তানদের দায়িত্ব নিতে হয়েছে। ফুলজান তার নিজের ও সন্তানের খাইখরচ বাবদ বাবার সংসারে শ্রম বিনিয়োগ করেছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতকে মাথায় রেখে আখতারুজ্জামান নিম্নবর্গের এই নারীকে শ্রম বিনিয়োগের মাধ্যম হিসেবে পিতার সঙ্গে কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে কৃষিকাজে অংশগ্রহণের নৈপুণ্যকে রূপায়ণ করেছেন। ফুলজানের সংগ্রামময় জীবনের সহজাত সঙ্গীকে প্রথমে গ্রামীণ সমাজের বৃত্তিগত বৈষম্যের ফাঁকা আওয়াজে দূরে রাখলেও নৈরাশ্যপীড়িত জীবনের ব্যথার দোসর বলে তমিজের হাত ধরেছে। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় :

> তামাটে রঙের গোলগাল মুখের নিচে ফুলজানের ঘ্যাগটা একটু বড় দেখায়। শরীরটা তার মোটা, তবে কোমর অতোটা মোটা না। সারা শরীরে শক্ত মাংস ঠাসা। এই শরীরের মেয়ে জমিতে কাজ করবে না তো করবে কে? আহাম্মুক স্বামী তার বুঝতে পারলো না! (আখতারুজ্জামান, ২০১২ : ৩৯৭)

সমাজবাস্তবতার নিরিখে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তার চরিত্রগুলো সৃষ্টি করেছেন। তাদের শারীরিক মানসিক গঠনের মধ্যে কোনো অতিরঞ্জনের অপপ্রয়াস নেই। ফুলজান নিজে যে ঘ্যাগে আক্রান্ত, এর যে চিকিৎসা প্রয়োজন, এই নিয়ে উপন্যাসে কারো মাথাব্যথা নেই। বরং সবাই তাকে 'ঘ্যাগিমাগি' বলে গালি দিতে পছন্দ করে। আবার এই ধরনের উক্তি শুনতে সে এতটাই অভ্যস্ত যে প্রতিবাদ করার প্রয়োজন বোধ করে না (মেহেদি, ২০০৮ : ১৪৫)। *খোয়াবনামা* উপন্যাস শুধু আখ্যানের সম্প্রসারিত রূপই নয়, তা শ্রেণির সামগ্রিক জীবনের প্রতিনিধিত্ব করে। ফ্লোব্যারের মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার পাশাপাশি, বালজাকের সামাজিক অর্থনৈতিক বাস্তবতার যেমন প্রতিনিধিত্ব করে থাকে, তেমনি আবার মিলান কুন্দের মতে উপন্যাস কখনো সাইকেল রেস হবে না, হবে অনেক আহার্যের সমাহারে একটি ভোজ–ফিস্ট অব মেনি কোর্সেস। *খোয়াবনামা* উপন্যাসের অনুষঙ্গকে বিচার করলে দেখা যাবে, এটি আসলেই ফিস্ট অব মেনি কোর্সেস হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে।

২২.১০

খোয়াবনামায় ফুলজানের আগমনের অবশ্যম্ভাবিতা অপরিসীম, তমিজের শ্রমিক জীবনের একজন দোসর প্রয়োজন ছিল। ফুলজানের ভাঙাচোরা জীবনে যথার্থ একজন সঙ্গীর আবশ্যক ছিল, যে তার রূপের দোসর হয়ে থাকবে না। তার শ্রমের, তার কর্মনিপুণ শ্রমশীলতায় আপ্লুত থাকবে। বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন তমিজের সফল কৃষক হওয়ার জন্য দক্ষ কৃষাণীর তৎপরতায় ফুলজানের আগমন প্রয়োজন ছিল। এভাবে তারা একে অপরের বন্ধু, সহকর্মী ও সহযোদ্ধা হয়ে উঠেছে। ঔপন্যাসিক মাটির মানুষকে অবিকল রূপ দিতে গিয়ে তার সংস্কৃতিকে অন্তর্নিহিত শক্তির সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। সংস্কৃতির লালনকর্তা প্রতিটি মানুষ, সংস্কৃতির চর্চা ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। যেকোন পেশাজীবী মানুষ তার নিজস্ব সংস্কৃতিকে নিয়ে বাঁচে, শয়নে-স্বপ্নে-জাগরণে এই সংস্কৃতিকে সে চর্চা করে...আখতারুজ্জামান ইলিয়াস মানুষের ছবি আঁকতে গিয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্মতর বিষয়কেও এড়িয়ে যাননি। খুঁজে বের করেছেন তিনি শ্রমজীবীর অন্তর্নিহিত শক্তিকে। নিজস্ব শৈলীতে চরিত্রকে অবিকল রূপ দিয়েছেন তিনি (শহীদ, ১৯৯৭ : ১৯৭)। শ্রেণিবিভাজিত সমাজের ক্ষতকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন ইলিয়াস; তারই অংশ হিসেবে উপন্যাসে প্রতিনিধিত্ব করেছেন ফুলজান ও ফুলজানের বিবর্ণ জীবনের সারাৎসার। নারীর শ্রমজীবী জীবনের পাশাপাশি এই সম্প্রদায়ের নারীর প্রতি পুরুষের নিপীড়ন, অবহেলা ও অমানবিক জীবনের প্রতিচ্ছায়া রূপায়িত হয়েছে উপন্যাসে। শ্রম, অর্থ, বর্ণ বিভাজনের সঙ্গে প্রেম, ভালোবাসা, যৌনতা ও রাজনীতির সম্পর্কের সঙ্গে বাস্তবতা ও পরাবাস্তবতার স্বরূপ উঠে এসেছে :

> [...] তমিজ এতটাই কাঁপতে শুরু করে যে, তার শরীর আর নিজের দখলে থাকে না। তার হাত থেকে পড়ে যায় ফুলজানের বাপের হোঁচটা এবং ওই হাতটাই হয়তো কাঁপতে কাঁপতে পড়ে যায় গিয়ে ফুলজানের পিঠে। নিজের ঢ্যাঙা কালো শরীরটার সবটা নিয়েই সে পড়ে যাচ্ছিলো। তবে তার আগেই সে জড়িয়ে ধরে ফুলজানকে। ফুলজানের ঠোঁট থেকে গলগল করে বেরিয়ে আসছে জ্যোৎস্না। এমন কি জ্যোৎস্নার পেছনে আগুনের শিখায় আঁচ লাগে তমিজের সারা মুখে। ....ফুলজানের আলো-জ্বাল ঠোঁটে তার ঠোঁট লাগাবার চেষ্টা করলে ফুলজান মুখ সরিয়ে নেয়, তখন তমিজের খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা গালে লাগে ফুলজানের ঘ্যাগ। .. ফুলজান যে কীভাবে তার হাতের ভেতর থেকে বেরিয়ে গেলো তমিজ কিছুই বুঝতে পারলো না। বেরিয়ে পড়েই সে যেন মিলে গেলো পাথারের ভেতর। সে কি জ্যোৎস্না হয়ে মিশে গেলো জ্যোৎস্নার মধ্যে। (আখতারুজ্জামান, ২০১২ : ৪২১)

শ্রমজীবী মানুষের জীবন জীবিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত, তার অতৃপ্ত কামনা বাসনার চিত্রায়ণে লেখক যে চিত্রকল্পের অবতারণা করেছেন, তা শুধু দৃষ্টিগ্রাহ্য বর্ণনার ফসল নয়; বরং মননশীল মনের অনুধাবনতারও খোরাক। সমাজবাস্তবতার নিরিখে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের চরিত্রগুলোর মানবিকবোধ নিয়ে এভাবে নিরীক্ষা করেছেন। তবে গ্রামীণ মুসলিম সমাজের আশরাফ-আতরাফের যে জাতিবৈষম্য অবচেতন প্রক্রিয়ায় জাগ্রত থাকে তার প্রথাসিদ্ধতায় নিম্নবর্গ তার নিজের মধ্যে একধরনের বৈষম্যের প্রচীর নির্মাণ করতে ভালোবাসে। তাই তমিজের মনোদৈহিক কামনার প্রতি শ্রদ্ধার সঙ্গে আত্মনিবেদন করতে পারেনি ফুলজান। 'মাঝির বেটা, আসমনেত ছ্যাপ ফালাবার হাউস করিস কোন সাহসে?' (আখতারুজ্জামান, ২০১২ : ৪২২) ফুলজানের এই শ্রেণিবৈষম্যের চিন্তা যতটা না তার শ্রেণিগত, তারও অধিক সামাজিক অববাহিকার প্রথাগত সংস্কার।

২২.১১

নিম্নবর্গের নারীর জীবনে স্বামী আশ্রয় না দিক, অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা না করুক, তবু স্বামী হিসেবে আধিপত্য বিস্তারে কোনো ধরনের ত্রুটি থাকে না। নিম্নবর্গের নারীদের কোনো পারিবারিক ক্ষমতা, মর্যাদা বা সম্মান থাকে না। থাকে শুধু হাড়ভাঙা খাটুনি, অপমান আর লাঞ্ছনা। স্বামীর অবহেলা নির্যাতন সত্ত্বেও, স্বামী কেরামতের তালাক দেয়াকে মানতে পারেনি ফুলজান : 'মাচায় শুয়ে ফুলজানকে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে দেখে তমিজের কষ্ট হয়। কেরামত আলী তালাক দিলে ফুলজানের এতো ভেঙে পড়ার কী হলো'? (আখতারুজ্জামান, ২০১২ : ৫৯৫) ফুলজানের ভেঙে পড়ার কারণ চিরাচরিত সংস্কার, নারীর জীবনে স্বামীর কোনো অবদান না থাকলেও সামাজিক সংস্কারের কাছে নারী আবদ্ধ। স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিলেও শেষ পর্যন্ত সমাজ ও পরিবারের কাছে ঐ নারীকেই দোষী বলে চিহ্নিত করা হয়। সামাজিক নিরাপত্তহীনতা নারীকে এই অসহায়তার জায়গায় দাঁড় করিয়েছে।

উপন্যাসে পাঠক সমগ্র জীবনকে দেখাবে না, কিন্তু জীবনের উল্লেখযোগ্য বহু মূল্যবান ঘটনাটিকে চমৎকার করে পাঠকের কাছে উদ্ঘাটিত করবে, স্থানগত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও (দেবীপদ, ২০১৮ : ৬১)। উপন্যাস সম্পর্কিত এই কথাকে প্রণিধানযোগ্য করে *খোয়াবনামা*'র চরিত্রসমূহের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। ফুলজানের খণ্ডায়িত জীবনের এই সীমানায় নিম্নবর্গের নারী জীবনের একটি সমীকরণ পাওয়া যায়। ফুলজান সমকালীন হয়েও লৈঙ্গিক ও আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র শ্রেণির প্রতিনিধি। শ্রমিক জীবনের বৈষম্য লালিত সমাজে শ্রমের সহচরী হয়ে নারী-পুরুষের যে বন্ধন, সেখানে তমিজ ফুলজান হয়েছে একে অপরের যথার্থ দোসর। এ বিষয়ে গবেষকের মত :

> শত দুঃখ ক্লিষ্ট কিংবা বেদনাআর্তির মাঝেও মানুষের জৈবিক প্রবৃত্তি –এর আওতায় চরিত্রগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। মনে পড়ে 'পদ্মানদীর মাঝির' কুবের-কপিলার প্রবৃত্তির জটিলতার মনস্তত্ত্ব। ইলিয়াসের শ্রেণীচরিত্র তমিজ সারাক্ষণ স্বার্থচেতনায় ব্যস্ত। (শহীদ, ১৯৯৭ : ৯৩)

গবেষকের মতকে স্মর্তব্যে রেখে বলা যায়, আর্থিক অনটন সত্ত্বেও কুবের-কপিলার মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। ফুলজান তার জীবনের পুরানো অধ্যায়কে ফেলে নতুন আগামীর পথে পা বাড়িয়েছে। যেখানে তমিজ ফুলজান তাদের শ্রমে, ঘামে, সিক্ত ফসল দিয়ে সোনালি দিনের স্বপ্নে বিভোর হতে চায়। সমস্যা তৈরি হয় অন্য ক্ষেত্রে, বিয়ের একদিন পরে বিলের পত্তনি নিয়ে কালাম মাঝির সঙ্গে বিবাদের সূচনা হয় তমিজের। ফেরারি হয় তমিজ আর অন্তঃসত্ত্বা ফুলজানের আবার লড়াইয়ের জীবন শুরু হয়। কন্যাসন্তান সখিনাকে নিয়ে ফুলজানের একাকী পথচলা। বিরতিহীন এই পথে নিম্নবর্গের নারী চলার মধ্য যে প্রচ্ছদপট নির্মিত হয়, তা শোষণ আর শাসনের অন্তর্জালে নিমজ্জিত অবক্ষয়িত সমাজে প্রতিরূপ।

২২.১২

খোয়াবনামার সবচেয়ে বড় তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো ইতিহাসের দীর্ঘ পরিক্রমায় নিম্নবর্গের অপরিবর্তিত জীবনের সংগ্রামশীলতাকে বস্তুনিষ্ঠতায় রূপায়ণ করা। প্রথম প্রজন্ম থেকে তৃতীয় প্রজন্ম পর্যন্ত তাদের জীবনের ইতিকথাকে বিন্যস্ত করেছেন লেখক। তমিজের বাপের মুনসি ফকিরের অস্তিত্বকে তমিজের মধ্য দিয়ে তার কন্যা সখিনার মধ্যে প্রতিবিম্বিত করেছেন। যেমন করেছেন চেরাগ আলী ফকিরের উত্তরসূরি রূপে কুলসুমকে। চেরাগ আলী ফকিরের তৃতীয় প্রজন্ম কুলসুমের মতো তমিজের বাপ তার ঐতিহ্যকে অন্তর্লীন করেছে নাতনি সখিনার মধ্যে :

> কিন্তু বেটি তার এরকম শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কেন? এই ছটফটে মেয়েটা এতোক্ষণ ধরে এরকম স্থির চোখে তাকায় কী করে? নিজের মেয়ে তার দেখতে দেখতে সেয়ানা হয়ে যাচ্ছে নাকি? সত্যি তার বেটি তো?

> ....চিবুকে শিরশির করে ওঠে বিজবিজ আওয়াজ। তমিজের বাপ নিশ্চয় তার ওপর আসর করে নাতনির মাথার ভেতর ঢুকিয়ে দিচ্ছে তার জানা অজানা মুনসির পাওনা-শোলক। (আখতারুজ্জামান,২০১২ : ৬৯২)

অতীন্দ্রিয় চেতনায় আচ্ছন্ন তমিজের বাপ মুনসির মিথ আর শোলকের অনুষঙ্গে প্রাকৃত-অতিপ্রাকৃতের যে চিন্তনভূমি, সেখানে সখিনা আগামী দিনের পথিক। অতিপ্রাকৃত চেতনার চেতনস্তর ফুলজানের মধ্যেও ছায়া ফেলেছে কন্যার মধ্য দিয়ে। অধিচৈতন্যের নির্বাধ উৎসারে শ্রমজীবী প্রান্তিক মানুষের হার না মানা অন্তহীন স্বপ্নের সম্ভাবনকে যথার্থ স্বীকৃতি দিয়েছেন লেখক। শ্রমজীবী মানুষের অপরিমেয় জীবনীশক্তির উন্মোচন আর তাদের চেতনা ও সংস্কৃতির শিল্পরূপ নির্মাণে লেখকের বোধিসত্তা বিস্ময়কর দক্ষতা দেখিয়েছে–

> ভাতের গন্ধ আর মাছের গন্ধের কথা না হয় বোঝা গেলো, কিন্তু ফুলজানের বেটির মাথার ভেতরে বিজবিজ করে কী? তাহলে এর মাথার এই বিজবিজ আওয়াজ থেকে কথার কুশি বেরুবে, সেটাকে শোলকে গেঁথে তুলবে কি এই সখিনাই? ভাত খাওয়া ছাড়া ছুঁড়ি আর বোঝে কী? এ কি আর শোলক গাঁথতে পারবে? কে জানে! কী শোলক গাঁথবে! (আখতারুজ্জামান, ২০১২ : ৬৯২)

সুষুপ্ত প্রান্তিক মানুষের ঐন্দ্রজালিক, প্রতিভাসে দীপ্যমান মনোজগতের অধিবাস্তবতাকে ইতিহাসের পুরাকল্পে লেখক নির্মাণ করেছেন। দুশো বছর পূর্বের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাহিনীর সঙ্গে সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহের লড়াই ও মুনসি বরকতুল্লা শাহর মৃত্যু এবং তাকে নিয়ে গড়ে ওঠা মিথের প্রতি লোকবিশ্বাসের অতিবাস্তবতায়; আবার তমিজের বাপের অতীন্দ্রিয় অভিভাব ফিরে আসে মধ্যচল্লিশের মাঝিপাড়ার বাস্তবতায় (আনু, ১৯৯৮ : ১৫৮)। বিল বাসিন্দা মানুষের অন্তর্জীবনের সুপ্তি, অতীন্দ্রিয় মগ্নতা, তাদের বিশ্বাস-সংস্কার সবই ঘটে ঘোরের মধ্যে। বাস্তবের আঁধারে রূপায়িত স্বপ্ন, প্রাকৃত জীবনের অতিপ্রাকৃত চেতনা, অতিপ্রাকৃত চেতনে প্রাকৃতজীবন সবই নিম্নবর্গের জীবনের অংশ। উপন্যাসের বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতের প্রজন্মান্তর কাহিনির অভিভাব সেখানে সখিনা শেষ পর্যায় হিসেবে তার ঐতিহ্যকে অর্জন করেছে। ভবিষ্যতের পৃথিবী তার মধ্য দিয়ে ইতিহাস আর মিথের দ্বন্দ্বময়তায় শোষণের পর্যায়সমূহকে পর্যবেক্ষণ করবে।

২৩.

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের একজন উজ্জ্বল স্থপতি সেলিনা হোসেন (জ.১৯৪৭)। কথাসাহিত্যের জগতে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন ১৯৬৯ সালে ছোটগল্প রচনার মধ্য দিয়ে। পরবর্তী পথচলায় তিনি ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রভৃতি সৃজনশীল সত্তার গর্বিত অধিকারী। সাহিত্য রচনার মৌল প্রেরণায় তিনি স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি অবিচল। সে-কারণেই সাহিত্যের নানামুখী আয়োজনে তিনি বাঙালির

আত্মানুসন্ধান করে চলেছেন নিরলসভাবে। জাতিসত্তার গভীরে আলো ফেলে ঔপন্যাসিকের প্রতিবেদন নির্মাণে তিনি এক কিংবদন্তিতুল্য সাহিত্যিক। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের অভিমত নিম্নরূপ :

> বাঙালির সুদীর্ঘ রাজনৈতিক ইতিহাস যে-কোনো সংবেদনশীল শিল্পীর জন্যই প্রেরণার এক অন্তঃশীলা প্রবাহ। একজন সৃজনশীল শিল্পী সবসময় থাকেন সমাজ ও ইতিহাসের কাছে দায়বদ্ধ। নিরন্তর বহমান জীবনের স্রোতে, সমাজসভ্যতা-রাষ্ট্রের প্রয়োজনে আত্মত্যাগী ব্যক্তির ঐতিহ্যের আবির্ভাব ঘটেছে এই বাংলা। সেই মহৎ ব্যক্তিবর্গের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্যের গৌরবজনক অধ্যায়। শিল্পী তাঁর সৃজনবেদ্য গৌরবজ্জ্বল ইতিহাসের অনুরণন ঘটান গভীর জীবনাশক্তি ও সংগ্রামশীলতার ভেতর দিয়ে। (মিল্টন, ১৯৯৬ : ২৫)

এই অভিমতে সংযুক্তি রেখে বলা যায় ইতিহাসের জীবন্ত সব কিংবদন্তিরা তার সাহিত্যের পটভূমিকায় আরো একবার নবজন্ম লাভ করেছে। তবে সেই ইতিহাস যেকোনো ইতিহাস নয়, যে ইতিহাসের পটরেখায় বর্তমান বাংলাদেশের এগিয়ে প্রেরণা খুঁজে পায়, সেই ইতিহাসকে তিনি পুনর্জন্ম দিয়েছেন। বাঙালির সুদীর্ঘ রাজনৈতিক ইতিহাসে বহু আত্মত্যাগী ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। তাদের মধ্যে সবাই ইতিহাসের পাতায় আদৃত হয়নি, কেউ কেউ মিশে রয়েছে সাধারণ মানুষের স্রোতে। তিনি ঐতিহাসিক তথ্যের সদ্ব্যবহার করে দেখিয়েছেন ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা ও বিপ্লবীসত্তার উত্থান অনিবার্যভাবে শ্রেণিসংগ্রাম কেন্দ্রিক। বাস্তব জীবনের বাস্তবোচিত ইতিহাসের বাইরেও সাহিত্যের প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক সাহিত্যের উপাদান উপকরণ বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে তাঁর উপন্যাসে। যে ইতিহাস একান্ত বাঙালির আত্মগত সেই সাহিত্যের প্রাচীনতম অধ্যায়ে খুঁজে পেয়েছেন বর্তমান জীবনের সংকট বা সম্ভাবনার উদ্ভাসন। সাহিত্যিক নির্মাণকে ভেঙে নতুন সাহিত্য সৃষ্টির ধারায় সেলিনা হোসেন রেখেছেন প্রাতিস্বিক প্রতিভার সাক্ষর। বাংলা সাহিত্যে আদি পুরাণ চর্যাপদকে আশ্রয় করে বিনির্মাণ করেছেন *নীল ময়ূরের যৌবনের* মতো নান্দনিক সমকালীন জীবন প্রত্যয়ী উপন্যাস (বিশ্বজিৎ, ২০১৫ : ৩৭৮)। উপন্যাসটিতে দশম-দ্বাদশ শতকের ধূসর অতীত যেন বাস্তবভূমিতে প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে আছে। সমাজ ইতিহাসের বৃহত্তর পটভূমির পাশাপাশি আধুনিক জীবনযাপনের ক্ষুদ্র পরিবারকেন্দ্রিক চিত্রও তাঁর উপন্যাসের দুর্লভ নয়। ইতিহাসের নবনির্মিতিতে তিনি ভাস্বর। এ ক্ষেত্রে তিনি শ্রেণিচেতনায় পুষ্ট শোষিত মানুষের প্রতিরোধের স্বরকে ভাষিক অবয়ব দিয়েছেন ।

২৩.১

সেলিনা হোসেনের *নীল ময়ূরের যৌবন* (১৯৮৩) বাঙালির সংগ্রাম ও চেতনাবাহী উপন্যাস। নাতিদীর্ঘ এই উপন্যাসের তেরো পরিচ্ছেদে লেখক বিত্তহীন শ্রমজীবী মানুষের ঘর-গেরস্থালির সুখ-দুঃখের

টুকরো টুকরো ছবিকে প্রতিচিত্রিত করেছেন। চর্যাপদের কালখণ্ডে বর্ণিত জনজীবনকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের কাহিনি আবর্তিত হলেও এর মধ্যে একটি বিশেষ শ্রেণির শোষণ-বঞ্চনা-বিদ্রোহ, পরাজয় ও স্বপ্নের অবয়বে তিনি বাঙালি জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার দীর্ঘ সংগ্রামের রূপটিকে মূর্ত করে তুলেছেন। চর্যার ডোম-চণ্ডাল-শবর শ্রেণির জীবনসংগ্রাম, তাদের স্বাধীনভাবে বাঁচার স্বপ্ন, এক খণ্ড ভূমির স্বপ্ন আর স্বভাষা প্রতিষ্ঠার লড়াই। অত্যাচার আর পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধের সংগ্রাম শুধু এই অন্ত্যজ শ্রেণির একার নয়; প্রকারন্তরে তা সমগ্র বাঙালির অজন্ম লালিত অভীপ্সা। (শামসুন, ২০১৬ : ২৫৪) '১৯৫২-১৯৭১' পর্যন্ত দীর্ঘ সংগ্রামের যে পথে বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তার ঐতিহ্যসূত্র দীর্ঘায়িত হয়ে আছে হাজার বছরের বাঙালি সভ্যতার মধ্যে। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায় ইতিহাসের আর এক নান্দনিক উপস্থাপক কবি জীবনানন্দ দাশের বহুল পঠিত বাক্য 'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে'– জীবনানন্দের এই পঙক্তির যেন ভাব নির্যাস উপন্যাসটি সম্পর্কে গভীর ও সংঘাতমুখর সত্য। সেলিনা হোসেন এই উপন্যাসে যেভাবে বারো শ বছরের ইতিহাসকে গ্রহণ করেছেন, তা কোনো সরলরৈখিক ঘটনাবিবৃতি নয় (সুমিতা, ২০১৫ : ১০৯)। সমাজের পিছিয়ে পড়া অন্ত্যজ মানুষের অভাব-দারিদ্র্য-প্রেম-ঘৃণা-বেদনা-হর্ষ-শ্রম-ঘর্মের কাহিনি চরিত্রগুলোকে মহিমান্বিত করেছে। যেকোনো সমাজে নারী-পুরুষ দুটি লৈঙ্গিক সম্প্রদায় বসবাস করে। সভ্যতার বিকাশ-পরবর্তী সময়ে সমাজ, শ্রেণি, পুরুষ তাদের নিজের পরিবার, সমাজে, একটি বিভাজনরেখা নির্মাণ করেছে। উপন্যাসের কাহিনির অন্তর্জালে বিভাজনের সেই রেখাটিকে স্পষ্ট করা গবেষণার অভীষ্ট। ডোম্বী, শবরীর মতো প্রধান চরিত্রের পাশাপাশি দেবকী-সুলেখা- ভৈরবী-বিশাখা-সন্ধ্যার মতো অনেক অপ্রধান নারীর সমাবেশ লক্ষ করা যায়। যারা সবাই সম্মলিতভাবে কাহিনির গতিকে ত্বরান্বিত করেছে; যাদের দৈনন্দিনতার টুকরো টুকরো ছবি সঞ্চিত হয়েছে *নীল ময়ূরের যৌবনের* ক্যানভাসের সর্বত্র।

২৩.২

নীল ময়ূরের যৌবন উপন্যাসের মূল উপজীব্য উচ্চবর্গের সঙ্গে নিম্নবর্গের চলমান দ্বন্দ্বসংগ্রাম। বিরাজমান সামাজিক ব্যবস্থায় নানা রকম অসমতা রয়েছে; তার মধ্যে নারী-পুরুষের অসমতা অন্যতম। সমাজের চোখে পুরুষ যুক্তি বুদ্ধির চেতনায় আলোকিত; আর নারী আবেগের দ্বারা চালিত এক সত্তা। বিশ শতকের গোড়া থেকে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে নারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি সহবাস্থানকে বোঝানো হতো। বাংলা সাহিত্যে প্রাচীনকাল হতে নারীর অবস্থানকে স্পষ্ট করা হয়েছে। সেলিনা হোসেনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও তীব্র বিশ্লেষণী

প্রতিভায় আমাদের সমাজে নারীর প্রকৃত অবস্থানটা আরো একবার স্পষ্ট হয়েছে। সমগ্র কুশীলবের মধ্যে নারী কীভাবে আলাদা হয়, তার একটি যথার্থ দর্শন উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে। যেহেতু উপন্যাসটি সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের জীবনের চিত্র; সুতরাং সেই সমাজের নারীরা অধিকাংশ শ্রমজীবী।

২৩.৩

উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্র ডোম্বী। যদিও কাহিনিতে তার আগমন ঘটেছে পরে, তবু উপন্যাসের ক্লাইমেক্স নির্মাণে ও সমাপনে তার অবস্থান দৃঢ়। নিম্নবর্গের প্রতি উচ্চবর্গের বিরূপতার প্রগাঢ় প্রকাশ ঘটেছে নারীর প্রতি। শ্রেণিবিন্যস্ত সমাজে নারীর প্রতি শোষণ বরাবরই নির্মমতায় লিপ্ত। *নীল ময়ূরের যৌবন* -এর অন্ত্যজ সমাজের নারী তা থেকে আলাদা নয়। নিম্নবর্গের জীবনবাস্তবতাও তাকে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র পরিমণ্ডলে দাঁড় করিয়েছে। উপন্যাসের সবচেয়ে প্রাণবন্ত ও উজ্জ্বল নারী চরিত্র ডোম্বী। তার চরিত্রে অনেক গুণের সমাবেশ ঘটেছে। পেশায় সে খেয়াঘাটের পাটুনি। প্রথাগত সংসারের অবজ্ঞা তাকে স্বাধীনভাবে বাঁচার শক্তি জুগিয়েছে। নৌকা বাওয়া ছাড়াও সে গাইতে পারে, নাচতে পারে। জীবিকার জন্য তাকে নৌকা বাইতে হলেও এই কাজ তার জন্য সম্মানের ছিল না। অচ্ছ্যুত-অস্পৃশ্য ডোম্বীকে পারাপারের কড়ি দিলেও তা দিত চরম অবজ্ঞার্থে। যাতে করে তার ছায়া ও ছোঁয়া উচ্চবিত্তকে স্পর্শ করতে না পারে। তারা 'দূর থেকে একটা কড়ি ছুড়ে দেয় ডোম্বীর দিকে। নৌকার পাটাতনে সেটা ঠক করে পড়ে।' (সেলিনা, ২০১৩ : ২০) অন্ত্যজ জীবনের এই চিত্রের মধ্যে রয়েছে শ্রেণিবৈষম্যের চূড়ান্ত সূত্রায়ণ। সমাজের বিম্বিত সত্য প্রতিফলিত হয় সাহিত্যের পাতায়। মানুষ যখন সার্বিকরূপে শোষিত হয়, তখন তার অস্তিত্বের স্বার্থে তাকে সোচ্চার হতে হয়। যে সমাজের মানুষ মানবিকতার বোধ হারিয়ে মানুষ থেকে ক্রমশ অমানুষ হয়ে ওঠে, সেখানে প্রয়োজন হয় প্রতিরোধের-চেতনার। সেই সম্ভাবনার উৎস এই বঞ্চিত মানুষগুলোর মধ্যে লক্ষ করা যায়।

২৩.৪

ডোম্বীর এই সংগ্রামী চরিত্রের বাইরে তার চরিত্রের রয়েছে কতকগুলো মানবিক প্রকাশ। যেখানে স্বামী পরিত্যক্ত ডোম্বীর একাকী জীবন ঘিরে আছে কাহ্নুর ভালোবাসা আর বন্ধুত্বের শীতল পরশ। ডোম্বীকে কাহ্নুপদ ডাকে মল্লারী বলে। সে স্বামী পরিত্যক্ত হওয়ায় তার ঘরবাড়ি হয় গ্রামের বাইরে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে চর্যাপদের বিখ্যাত দ্বিপদী–'নগর বাহিরে ডোম্বী তোহারি কুড়িয়া/ ছোই ছোই যায়সি ব্রাহ্ম নাড়িয়া।'(কাহ্নুপাদ, ১৪৩ : ২০১৪) সেই সঙ্গে আলোচিত আরও একটি দ্বিপদী 'একশো পাদমা

চৌষ্ইঠ পাখুড়ী? তঁহি চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী।'(কাহ্নপাদ, ১৪৩ : ২০১৪) এই সমস্ত পদ থেকে অনুমান করা যায়, উপন্যাসের কাহিনির বুনুনে প্রেরণা জুগিয়েছে চর্যাপদের গানগুলো। গ্রামের বাইরে বাস করার কারণে উচ্চবর্গের পুরুষ তার সুযোগ নিয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মত নিম্নরূপঃ

> দিনের বেলা সে নদীতে খেয়া পারাপার করে, রাতে তার জীবিকা ভিন্ন। বিত্তবানেরা তার কাছে দু-দণ্ডের শান্তি পেতে আসে। ডোম্বীর দেহ বিত্তবানের, মন কাহ্নপাদের, নাচ নগরবাসীর আর দেহ-মন-প্রাণ সবটাই নিজের জাতের জন্যে, মায়ের ভাষার জন্যে, স্বাধীন দেশের জন্য। (বিকাশ, ২০১৩ : ৯১)

প্রাচীন বাংলার সামাজে ডোম্বীর মতো দায়িত্বশীল, বুদ্ধিবৃত্তিক নারী নিম্নবর্গের সামাজের অমূলক ধারণা নয়। বরং যথেষ্টই সংগতিপূর্ণ এই কারণে কাহ্নপদের মতো সৃজনশীল পুরুষ যেমন ছিল, তেমনি ডোম্বীর মতো সংগ্রামী নারীও ছিল। ডোম্বী দেবলভদ্রের ভাগ্নেকে হত্যা করে সমগ্র জনপদে সমূহ বিপর্যয়কে ত্বরান্বিত করে তুলেছে। অসংঘবদ্ধ অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছে। পরিণতির ভয়াবহতা অনুমান সত্ত্বেও তিলে তিলে মৃত্যুর পরিবর্তে সংগ্রামের ব্যঞ্জনায় উজ্জীবিত করেছে। (মিল্টন, ১৯৯৬ : ৬১) ডোম্বী তার সাহসী উচ্চারণে বলেছেঃ 'একটা বামুন মেরে দেখলাম আমরাও মারতে পারি। আমরা শুধু ছোটলোক নই।'(সেলিনা, ২০১৩ : ৮৩) ডোম্বী অস্তিত্বের জন্য আপোসকামী নয়। আজন্ম ভিতু এবং পিছিয়ে মানুষগুলোর সামনে সে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে; শ্রেণিসংগ্রামের পথকে করেছে প্রশস্ত।

২৩.৫

ডোম্বীর মতো তেজস্বী নারী উপন্যাসে আর দ্বিতীয়টি না থাকলে নারী চরিত্রের অবস্থান গত গুরুত্বের দিক থেকে শবরী অন্যতম। শবরীর সৌন্দর্যচর্চার মধ্য দিয়ে উপন্যাসের সূচনা ঘটে। কাহ্নুর সঙ্গে তার সুখের দাম্পত্য। একজন গৃহবধূ হিসেবেও তার গৃহকর্মের প্রতি রয়েছে প্রবল কর্তব্যপরায়ণতা। কাহ্নুর আগমনের আপেক্ষায় নিজের সৌন্দর্যরাশি বিকশিত করে তোলে। শবরীর প্রেমমুখরতা জৈবিক চেতনা অপেক্ষা ভক্তরসে সিক্ত। শবরীর প্রেম তীর্যক নয় বরং সহনশীলতায় নিজেকে শান্ত ও সংযত রাখতে অধিক স্বচ্ছন্দ বোধ করে। বিশেষ করে কাহ্নুর সঙ্গে ডোম্বীর বন্ধুত্ব নিয়ে তার যে নীরবতা তা, চোখে পড়ার মতো। রাজার লোকেরা কাহ্নুপাদকে ধরে নিয়ে গেলে অসহায় শবরী কাঁদতে কাঁদতে ঘাট পর্যন্ত আসে। ডোম্বীর মতো প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করার সক্ষমতা তার ছিল না। নিজে সে কথা স্বীকার করে বলেছেঃ 'আমি বুঝি ডোম্বী আমার চাইতে কানুকে বেশি ভালোবাসত। সে কারণে ওর জন্য মরতে পেরেছে।' (সেলিনা, ২০১৩ : ১৪৩) বাঙালি ঘরের চিরপরিচিত গৃহবধূ শবরী, স্বামী ছাড়া তার জীবনের আর কোনো ধ্যান নেই। সংসার তার মন্দির, স্বামী তার দেবতা।

২৩.৬

ভুসুকপাদের স্ত্রী আর দেশাখের বৌদি সুলেখা। ভুসুকপাদ বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বিদেশযাত্রা করলে শ্বশুর-শাশুড়ি, দেবর দেশাখ আর ছোট ছোট দেবর-ননদ নিয়ে তার সংসার। অভাবের সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি দেশাখ। ভুসুক না থাকলেও সুলেখা তার পরিবারকে নিজের মতো করে দুহাতে আগলে রেখেছে :

> দেশাখ রোজগার করেই দায় সারে, তা দিয়ে সংসার চলুক আর না চলুক সে নিয়ে ও ভাবে না। অথচ এই অভাবের সংসারকে দু'হাতে বেড় দিয়ে রাখতে হচ্ছে ওকে। সকলের দাবি ওর কাছে। অরুণ এসে আঁচল ধরে টানাটানি করে খিদে পেয়েছে বউদি? (সেলিনা, ২০১৩ : ২৩)

নিজে খেয়ে না খেয়ে ওদের মুখে অন্ন তুলে দিয়েছে। বাঁশের জিনিসপত্র তৈরি করে দেশাখকে সহযোগিতা করেছে। এক-দেড় বছর পার হওয়ার পরও যখন ভুসুকের খবর পাওয়া যায়নি, তখন জীবনের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছে সে। বিপত্নীক সুদামের সঙ্গে নতুন জীবন শুরু করার স্বপ্ন বুনতে শুরু করেছে সুলেখা। সুলেখার এই সিদ্ধান্তে দেবর দেশাখের সহযোগিতা পেয়েছিল। দীর্ঘ প্রবাসজীবন শেষ করে ভুসুক ফিরে এলে সুলেখাকে দোষ দেয়নি। বরং বলেছে : 'ভেবে দেখলাম সুলেখার কোনো দোষ নেই। ওর যৌবনটাই ওর সঙ্গে শত্রুতা করেছে। হরিণের মাংস যেমন হরিণের শত্রু।' (সেলিনা, ২০১৩ : ১৩২) নারীর প্রতি এই উদার সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি আজকের সমাজে বিরল। রাষ্ট্র শোষকের দায়িত্ব পালন করলেও সমাজ ও সমাজের মানুষ নারীর প্রতি সহনশীল মনোভাব পোষণ করত। চর্যাপদের সমাজে নারীর জন্য একটি সম্মানজনক জীবনাকাঙ্ক্ষা বিরাজমান ছিল। আজকের সমাজেও যা অনেকাংশই দুঃস্বপ্নের ন্যায়।

২৩.৭

নীল ময়ূরের যৌবন উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা শান্ত, স্থির সংর্বসহা নারী ভৈরবী। উপন্যাসে সে ধনশ্রীর স্ত্রী। ধনশ্রীর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পূর্বে কমোদের সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ধনশ্রীর সঙ্গে হলেও এই নিয়ে তার মনে কোনো খেদ ছিল না। ধনশ্রীর সংসারে সচ্ছলতা না থাকলেও প্রেম ছিল। নুন আনতে পান্তা ফুরানোর সংসারে সর্বদা ছিল অতিথির আনাগোনা :

ভোরে গবু দুয়ে তিন সের দুধ পেয়েছে ধনশ্রী, বিক্রি করে চাল আনবে। কখন ফিরবে কে জানে, খেয়ালি মানুষ।... একমাত্র কামোদের কাছে যেতে পরে, চাইলে সের খানেক চাল বাকিতে দেবে। কেন দেয় কামোদ? পুরোনো ভালোলাগার জন্যই তো। (সেলিনা, ২০১৩ : ২৬)

কামোদ ভৈরবীর প্রাক্তন প্রেমিক। তার নিরুপায় অনিশ্চয়তায় সে জানে, বোঝে, তাই সে সহযোগিতা করে। শান্ত স্বভাবের ভৈরবী সে ভীতু ও ঠাণ্ড প্রকৃতির নারী। শত সমস্যার মধ্যেও সে প্রতিবাদ প্রতিরোধ করতে পারে না। তার জীবন দিয়ে শুরু হয়েছিল উপন্যাসের ক্লাইমেক্স। ভৈরবী যমজ সন্তান জন্ম দেয়ায় রাষ্ট্রের চোখে সে গণ্য হয়েছে অপরাধী হিসেবে। ভৈরবীকে ত্যাগ করার জন্য রাষ্ট্রপক্ষ থেকে চাপ দেয়া হয়েছে ধনশ্রীকে। ধনশ্রী জানে ভৈরবী নিরাপরাধ ; তবু রাষ্ট্রের তর্জগর্জন সত্ত্বেও সে ভৈরবীকে ত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানায়। 'আমার বউকে যদি ঘরে রাখি তার জন্য রাজার কি কানু? আমি মানিনা রাজার আইন।... আমার অসতী বউ নিয়ে যদি আমি ঘর করি তাতে রাজার কী? ' (সেলিনা, ২০১৩ : ১০৮) যন্ত্রণাবিদ্ধ পাখির মতো ডানা ঝাপটিয়েছিল ধনশ্রী। দারিদ্র্যপীড়িত নির্যাতিত মানুষগুলো প্রতিবাদ-প্রতিরোধে জ্বলে উঠেছিল। এই জাতীয় শোষক রাষ্ট্রে নারী পুরুষ উভয়ই শোষিত, সেখানে নারীর শোষণ হয় দ্বিমাত্রিক। এখানে মূল উদ্দেশ্য হিসেবে কাজ করেছে লৈঙ্গিক রাজনীতির প্রতিফলন।

২৩.৮

নিম্নবর্গের নারীর মধ্যে আরেকজন হলো দেবকী। দেবকী রামক্রীর স্ত্রী। স্বামীর শুঁড়িখানার সে একাই প্রস্তুতকারী, পরিবেশনকারী ও বিক্রেতা। গৃহকর্মের পাশাপাশি তাকে মদ চালাইয়ের ব্যবসা পরিচালনা করতে হয়। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় : 'রামক্রির বউ একাই একশো। মদের দোকানে রামক্রি না থাকলেও চলে। দেবকি একাই মদ চোলাই থেকে আরম্ভ করে খদ্দের আপ্যায়ন এবং কড়ির হিসেব রাখা সবই অবলীলায় করে।' (সেলিনা, ২০১৩ : ১৫) কর্মের জন্য বা পেশার জন্য দেবকি মদ চোলাইয়ের কাজে লিপ্ত থাকলেও সে আসলে গৃহনিপুণ এক নারী। তার গৃহভিত্তিক কাজের জন্য সে নিজেই তার গণ্ডি তৈরি করে নিয়েছে। লেখক এভাবে নিম্নবর্গীয় সমাজের বৈচিত্র্যময় পরিবেশ থেকে বিভিন্ন পেশা ও কর্মের নারীকে উপস্থাপন করেছেন। বিবাহিত গৃহনির্ভর এই সমস্ত নারী ছাড়াও আছে অবিবাহিত যুবতী নারীর কথা, আছে সন্ন্যাসী নারীর কথা।

২৩.৯

বিশাখা এই সমাজেরই একজন প্রান্তিক নারী। সে দেশাখের প্রেমিকা রূপে উপন্যাসে অধিক পরিচিত। তার অনেকগুলো ভাইবোন নিয়ে অভাবের সংসার। অনাহারে অবহেলায় দিন কাটে;

তারপর আছে রাজার শাসন আর শোষণের উৎপাত। অভাব আর দারিদ্র্যভরা সংসারের একমাত্র ভরসা বনজঙ্গল থেকে সংগৃহীত খাদ্য। এই সমস্ত নারী চরিত্র অঙ্কনে লেখক কতকগুলো মূল সুর আপ্ত করেছে ; তারা সকলেই সাহসী, প্রতিবাদী, কর্মঠ ও মমতাময়ী। জীবন-জীবিকার প্রশ্নে প্রতিটি নারী আপোসহীন, সংগ্রামী, কর্মঠ; যারা একই সঙ্গে বাঙালির জাতীয় জীবনেরও প্রতিরূপক। (মঞ্জু, ২০১৪ : ২৪৩)

২৪.

বাঙালি জাতিগতভাবেই নদীর সঙ্গে আত্মার টান অনুভব করে। বিশ্বের নানা জাতির মধ্যে বাঙালিকেই বোধ হয় নদী সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে। সাহিত্যের অন্যান্য মাধ্যমের মধ্যে উপন্যাসে তার অনুকৃতি সর্বাপেক্ষা বেশি। নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদী ও নদীকেন্দ্রিক জীবন নিয়ে বেশ কিছু বিশিষ্টতা সূচক উপন্যাস রচিত হয়েছে। তার মধ্যে কাজী আব্দুল ওদুদের *নদী বক্ষে* (১৯১৯) হুমায়ুন কবীরের *নদী ও নারী* (১৩২৫), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মা নদীর মাঝি* (১৯৩৬) সমরেশ বসুর *গঙ্গা* (১৯৫৭), অদ্বৈত মল্লবর্মণের *তিতাস একটি নদীর নাম* (১৯৫৬) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর *কাঁদো নদী কাঁদো* (১৯৬৫) প্রভৃতি উপন্যাস। এই ধারার আরো একটি সংযোজন *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* (১৯৮৬)। নদীমাতৃক বাংলাদেশের জীবনধারার বিশ্বস্ত প্রতিনিধি এই সমস্ত উপন্যাস। দক্ষিণ পূর্ব বাংলার সমুদ্রবেষ্টিত জনজীবনের অস্তিত্ব সংগ্রামের জটিল তরঙ্গ এ উপন্যাসের মূল উপজীব্য। বাংলাদেশ নামক এই ভূখণ্ডের সমাজজীবন ও সংস্কৃতির ধারায় এই ঐতিহ্যে স্বতন্ত্ররূপে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। জীবনের রূপ ও স্বরূপ যেকোনো জনগোষ্ঠীর শিল্পকে প্রভাবিত করবে এটাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত। শিল্পীর অভিজ্ঞতা ও জীবনদৃষ্টির এই সহজাত প্রেরণা শিল্পস্বভাবে নতুন মাত্রা যোগ করেছে (সৈয়দ আকরম, ২০০৮ : ৯৩)। এর পাশাপাশি ঐ সময় ও সমাজের অভিজ্ঞতা জনজীবনে বিভিন্ন ধরনের দ্বন্দ্বময় পরিবেশের জন্ম দিয়ে থাকে। নদী ও নদী তীরবর্তী জনজীবনে নানামাত্রিক সংক্ষুব্ধতাকে সমাজসত্যের সমগ্রতায় ঔপন্যাসিক নিরাসক্ত এক শিল্পদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। একই সঙ্গে যা বাংলাদেশের এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের অংশও বটে।

২৪.১

পোকামাকড়ের ঘরবসতি উপন্যাসে লেখক সমুদ্রবেষ্টিত মানুষের জীবনযাত্রাকে প্রতিফলিত করেছেন গভীর একাত্মতার সঙ্গে। এই জীবনব্যবস্থায় নারীর অবস্থা আরো শোচনীয়। মানবসভ্যতার কারিগর হিসেবে প্রতিটি পরিবারে তাদের বেঁচে থাকা। তার মধ্যে সাফিয়া আপন বৈশিষ্ট্যে অন্যদের থেকে

আলাদা। নানা ঘটনা ও পরিপ্রেক্ষিতের মধ্য দিয়ে লেখক তার চরিত্রের তাৎপর্যবহ দিকসমূহ উল্লেখ করেছেন। তাকে উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্রের জায়গা দিয়ে পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করেছেন। নিম্নবর্গের নারী হিসেবে উপন্যাসে তার চরিত্রের আলোচনার অভিপ্রকাশ। সাফিয়া স্বামী পরিত্যক্ত এক যুবতী নারী। নাফ নদীর সরু খালের বাঁকের ওপর তার বাড়ি। বাবা নেই সাফিয়ার, মা জয়গুন আর সাফিয়া মিলে এই বাড়িতে থাকে। বাঁজা বদনামে স্বামী সোনামিয়া তাকে পরিত্যাগ করেছে। তারপর থেকে মালেকের সঙ্গে ঝিনুকের ব্যবসা করে আসছে। মালেক সাফিয়াকে ভালোবাসলেও মুখে বলতে পারে না; কারণ তার মতো নিপাট ভালো মানুষ সাফিয়ার পছন্দ নয় :

> মালেক বড়ো বেশি সরল আর বোকা। বোকা পুরুষ মানুষ ও সইতে পারে না। পুরুষ মানুষের রাগ থাকবে, প্রতিযোগিতার বাসনা থাকবে। নইলে সে পুরুষ কিসের ? মালেক ভালো মানুষ-বুকভরা কেবল দরদ। ধুত! ও কোনো মরদই না। মরদ লোকের মেজাজই আলাদা। ওইসব মিনেমিনে ভালোমানুষি দিয়ে পেট ভরে না। (সেলিনা, ২০২০ : ২৭)

সাফিয়ার এই মানসিকতার মধ্যে পুরুষতান্ত্রিকতার কিছু গুণাবলির প্রতি অনুরাগ দেখা যায়। যদিও মানুষ হিসেবে তার পছন্দের আলাদা বৈশিষ্ট্য থাকতেই পারে। সমাজ পুরুষকে ক্ষমতাবান, মেজাজি, ধূর্ত, এ-সমস্ত বলয়ের মধ্যে দেখতে পছন্দ করে। পুরুষতন্ত্রের মূল ভিত্তি হলো সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির ওপর নির্ভর সমাজে ও ব্যক্তিমানসে নারী-পুরুষের ধারণা তৈরি হয় (মাসুদুজ্জামান, ২০১৮ : ২২)। আরো অনেক কারণে সাফিয়া মালেককে অপছন্দ করতে পারে; অপছন্দ করার যে কারণগুলো লেখক উল্লেখ করেছেন, সেখানে পুরুষতান্ত্রিকতা স্পষ্ট পরিছাপ দৃশ্যমান।

২৪.৩

দক্ষিণবঙ্গের এই প্রান্তিক সমাজে নারী বিভিন্নভাবে বঞ্চিত-অবহেলিত-অপমানিত, সেখানে নারীর মানস প্রবণতায় পুরুষতন্ত্রের দাসত্বের দাগ থাকবে তা অত্যন্ত যৌক্তিক। স্বামী পরিত্যক্ত ও অর্থনৈতিকভাবে কিছুটা স্বাধীন হওয়ায় তার মধ্যে অবকাশ রয়েছে নিজস্ব ভাবনার। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে সে অন্যদের থেকে আলাদা হয়েছে। ঝিনুকের মুক্তা আহরণের ব্যবসায় পেশায় প্রতিনিয়ত সে মালেককে ঠকায়; কারণ সে স্বপ্ন দেখে নিজের একটি দালান বাড়ি তৈরি করার। এই ছলনার মধ্যে সে কোনো অসততা দেখে না। কারণ 'তুঁই যে কী কও মা, ন বুজি। অ্যাত ভাবিলে চলে না। আবাঁর প্যাটত ভাত নাই, ধান্দা করি ভাত জোগাড় করন লাগে'। (সেলিনা, ২০২০ : ৪১৬) যে সমাজে সবাই সবাইকে প্রতারণা করার পরিকল্পনায় থাকে, সেখানে সততাকে বোকামি বলে মনে করে সাফিয়া। তার চতুর, আত্মস্বার্থ গুণাবলি তাকে সাময়িক আনন্দ দিলেও শেষ পর্যন্ত তাকে ঐ সমাজের

আর দশজন নারীর মতোই নির্যাতন আর নিগ্রহের শিকার হতে হয়েছে তাকে। গুণ্ডা, মদ্যপ, ক্ষমতাধর শুকুরকে বিয়ে করলেও সুখী হতে পারেনি সে। শুকুরের মতো পুরুষেরা নারীকে ভোগ্যপণ্য ছাড়া আর কিছু ভাবে না। ভোগের মোহ শেষ হলে তাদের আসল চেহারা বের হয়ে আসে। জুয়ার নেশার টাকা দিতে সাফিয়া অস্বীকার করলে, পৈশাচিক চেহারার দাঁত-নখ বের হয়ে আসে :

> শুকুর মুখ খিঁচিয়ে উঠে সাফিয়ার চুলের মুঠি ধরে। দমাদম কিল চড় লাগায়। অসুরের শক্তি যেন, বাধা দিতে পারে নাও। শেষে ওকে বারান্দায় ধাক্কা দিয়ে ফেলে খোপ থেকে কয়েকটা হাঁস ধরে নিয়ে যায়। বাজারে বিক্রি করে টাকা জোগাড় করবে। সাফিয়া দ্রুত নিজেকে সামলে নেয়। কান্না নয়, যন্ত্রণা নয়, এক মুমূর্ষু স্থবিরতা ওকে আচ্ছন্ন করে রাখে। (সেলিনা, ২০২০: ৪৭৮)

দেরিতে হলেও সাফিয়ার পুরুষ সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তন ঘটে। ক্ষমতাতন্ত্র ও পেশিশক্তির মধ্যে পুরুষ বা মনুষত্বের কোনো মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। শুকুরের সঙ্গে যে দাম্পত্য, সেখানে সাফিয়া ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল। শুকুরের প্রতি কোনো ভালোবাসা থেকে নয়, বরং কিছুটা বাধ্য হয়ে সে এই সম্পর্কে মেনে নিয়েছিল। প্রান্তিক সমাজের শিক্ষা থেকে পুরুষতন্ত্র আর ক্ষমতাতন্ত্রের মধ্যে যে মানুষের সন্ধান সে করেছিল, তা ছিল একটি মোহ। পুরুষ ও পুরুষতান্ত্রিকতার উদ্বেলিত শিখায় সে গ্রহণ করেছিল শুকুরকে। শুকুরকে বিয়ে করার পর কল্পনা আর বাস্তবের ভুল ভাঙে তার। গবেষকের ব্যাখ্যায় সাফিয়ার মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা নিম্নরূপ :

> শুকুরের আচরণ যতোই তাকে বাস্তবের রূঢ় জগৎ চোখে আঙুল দিয়ে দেখাক বা বুঝিয়ে দিক না কেন শুকুরকে অস্বীকার করার কোনো উপায় ছিলো না সাফিয়ার। শুকুরের মৃত্যু আকস্মিক; সাফিয়া যেন দমবন্ধ করা খাঁচা থেকে মুক্তি পেলো কিন্তু ততোদিনে মনের আকাশে পাখা মেলে ওড়ার পরিবেশ নষ্ট হয়েছে; নিঃস্ব-রিক্ত হবার যে অনুভূতি এবং সেখানে সামনের পৃথিবীটা যে অবলম্বনহীন তাই সাফিয়ার হৃদয় থেকে নিঃসরিত আবেগের বহিঃপ্রকাশ অশ্রুতে ধরা দেয় বাধাবন্ধনহীন। (কল্যাণ, ২০২০ : ৩৪৮)

সাফিয়ার এই উপলব্ধি নিয়ে বাকি জীবন পার করেছে, মালেকের প্রতি তার যে অনুভূতি, তাকে আর প্রকাশ করতে পারেনি। মালেকের কাছ থেকে পাওয়া উপেক্ষা তার চেতনা-অস্তিত্বকে পিষ্ট করেছে। এই অনুভূতির যাতনা থেকে সে উপলব্ধি করেছিল মালেককে কতখানি ভালোবেসেছিল। সাফিয়া চরিত্রের এই বাঁকবদল তাকে আলাদা করেছে অন্য সব নারী চরিত্র থেকে। সাফিয়া চরিত্র নির্মাণে লেখক প্রথাগত নারী চরিত্রের বাইরে এসে নিরীক্ষণ করেছেন। যেখানে সে নিজেকে নিয়ে ভাবে, নিজের স্বপ্ন পূরণের কথা ভাবে।

২৪.৪

সাফিয়া ছাড়াও অন্য নারীদের আবস্থান আরও শোচনীয়। সন্তান জন্ম দেওয়ার যন্ত্র হিসেবে প্রতিটি পরিবারে তারা বেঁচে থাকে। হঠাৎ যদি বা কেউ সাহস নিয়ে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, তবে তাদের পিঠে জোটে কেবল লাঠির আঘাত; এমন এক নারী সুজার স্ত্রী কাঞ্চন। এই একটিমাত্র প্রাণী যেখানে সমস্ত অন্যায়-অনাচার বিনা প্রশ্নে বৈধতা পেয়ে যায়। 'জেলেপাড়ায় বউপেটানো ডালভাত, কেউ কিছু মনে করে না।' (সেলিনা, ২০২০ : ৩৯০) কাঞ্চনকে মারার পর সুজা নিজেই নিজেকে ধিক্কার জানালেও প্রবৃত্তির এই মোহ থেকে বের হয়ে আসতে পারে না। কাঞ্চনের কাছে সুজা নিজের আচরণের কৈফিয়ত দিতে চাইলেও তা কাঞ্চনের কাছে মূল্যহীন। কারণ সে ভেবেই নিয়েছে 'জাইল্যাপাড়ার ব্যাক মাইয়ামানুষ তো ফিডন খায়।' (সেলিনা, ২০২০ : ৩৯৩) এই নিয়ে তার আর আলাদা ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। পুরুষতন্ত্র নারীকে নিয়মের মধ্যে বেঁধে রাখতে বিভিন্ন প্রথার জন্ম দেয়। নারী আজন্ম সেই নিয়মের শিকলে নিজেকে বেঁধে রাখে। প্রান্তিক নারী যখন জীবনের পদে পদে যখন স্বামীকে অনুসরণ করে চলে, তখন নিয়মের বাইরে গিয়ে স্বামীর ভালোবাসাকে গ্রহণ করতে সে ভয় পায়। এ প্রসঙ্গে মালেকের একটি উপলব্ধি দৃষ্টান্তযোগ্য। প্রতিবেশী বসির যখন তার ক্রন্দনরত ছোট মেয়েকে মাটিতে ছুড়ে মারে; এই ঘটনায় মালেকের মনে হয়, 'এখন বাবা মারছে, যৌবনে স্বামী মারবে, বুড়ো বয়সে ছেলে মারবে। জীবনের হাজার অপূর্ণতা ওকে মানুষ থাকতে দেবে না। এমনই নিয়ম।' (সেলিনা, ২০২০ : ৩৮৬) এটাই যেন নারীর নিয়তি। মালেকের এই উপলব্ধি দিয়ে সমগ্র উপন্যাসে নারীর অবস্থানকে স্পষ্ট করেছেন লেখক। জেলেপাড়ার এই প্রান্তিক পরিবেশে নারী পোকামাকড়ের মতো বেঁচে থাকে।

২৪.৫

উপন্যাসের আরেক বিপন্ন নারী জুলেখা। মালেকের প্রতিবেশী বসিরের বড় মেয়ে সে। জুলেখার নবযৌবনে আগমন ঘটে সালেকের। মন নিয়ে খেলার দিন শেষ হলে দ্রুতই তার শরীরের প্রতি দৃষ্টি পড়ে সালেকের। অবুঝ নারী জুলেখা ভালোবাসার মোহে সালেকের চতুরতাকে বুঝতে পারে না :

> আমি কি মরে যাবো? খেলে বমি আসে, এ লজ্জা লুকোই কোথায়? ওর মা ওকে গলায় দড়ি দিতে বলেছে।..... মায়ের পিটুনির ফলে পিঠ ব্যথা, হাঁটতে ইচ্ছে করে না। পেটের ভেতর নাকি মানুষ বাড়ছে, ওর শরীর শিরশির করে। এত সহজে সব-কিছু হয়ে যায়, ঐ বোধ ভাঙতে না ভাঙতেই ও মা হতে যাচ্ছে। (সেলিনা, ২০২০ : ৪৪৭)

অনাকাঙ্ক্ষিত মাতৃত্বের লজ্জা কুঁকড়ে ফেলেছে জুলেখাকে। অথচ এর অংশীদার যে পুরুষ তার কোনো সংকোচ নেই। নিম্নবিত্তের এই সংগ্রামী জীবনব্যবস্থায় নারী যেন জুয়া খেলার ঘুঁটি। যার যখন মনে হলো নিয়ে খেলা করল, খেলা শেষে আবর্জনার স্তূপ ফেলে দিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে জুলেখার আত্মহত্যা ছাড়া কোনো পথ থাকে না :

> জুলেখা চিত হয়ে শুয়ে আছে, মুখটা একপাশে হেলানো। চোখের পাতা বোজা, সর্বত্র নিবিড় প্রশান্তি। কোথাও মৃত্যুর কোনো ছাপ নেই।...খুব কাছে থেকে ওকে একটা বিশাল শুঁয়োপোকার মতো মনে হয়, বিশাল এবং কুৎসিত।...জলকাদায় পোকার মতো মরে পড়ে থাকাই যদি নিয়তি, তবে জন্ম কেন? (সেলিনা, ২০২০ : ৪৫২)

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতি পদে পদে এভাবেই নারীকে জন্মের মূল্য দিতে হয়েছে। নিম্নবর্গের এই আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর জন্মই যেন অপরাধ। পুরুষতান্ত্রিক লালসাবৃত্তির চরম প্রকোপে মানবিকতা ডুকরে কাঁদে; জীবনের সৌন্দর্যগুলো জালের আড়ালে মুখ লুকিয়ে বিদ্রূপ করে। প্রান্তিক নারীর এই জীবন মানুষের জীবন নয়; মানুষ নামের আড়ালে পোকামাকড়ের মতো বেঁচে থাকা। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মত :

> হত্যালীলার বৈচিত্র্যে সমাজের স্তরে স্তরে সজ্জিত, যা এই উপন্যাসে জীবন্ত। আসলে এই সমাজের পরিকাঠামোয় প্রত্যেকেই যেন ঘাই মৃগী। তা সত্ত্বেও আশার দৃশ্যগুলি যেভাবে জন্ম নেয়, তার মধ্যেই অন্ধ পেঁচার মতো বাঁচার রসদ খুঁজে পায় শোষিত মনুষ্যত্ব–চমৎকার ধরা দু-একটা ইঁদুর এবার। (রাজকুমার, ২০১৩: ১০৮)

মানুষরূপে নারী এভাবে, পুরুষ আর পুরুষতন্ত্রের শিকরি প্রবৃত্তির রসদ জুগিয়ে বাঁচে নারী। নিম্নবর্গের নারীর এই বেঁচে থাকার মানবরূপের কোনো সাদৃশ্য নেই; যা আছে তা পশুতুল্য। তৃতীয় বিশ্বের দূষিত উন্নয়নব্যবস্থার কঙ্কাল হয়ে প্রান্তে থাকা মানুষগুলো বছরের পর বছর ধুঁকছে। এখানে মানুষ শুধু উদরপূর্তি আর জৈবিক প্রবৃত্তির অন্ধ কারাগারে বন্দি। নারী হয়ে থাকে সেই প্রহসনের অন্যতম উপাদান।

২৪.৬

জুলেখা ছাড়াও উপন্যাসে আরও এক বিপন্ন নারীর কথা জানা যায়, তার নাম রাণী। উপন্যাসে তার সরব উপস্থিতি লক্ষ করা যায় না। টেকনাফের পতিতালয়ে তার বাস। মালেকের মানসভূমি থেকে পাঠক তাকে আবিষ্কার করেছে। খদ্দের হিসেবে মালেক যখন তার কাছে যায়, তখন তাকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকে সে। টাকা কম দিলেও তাতে সে উচ্চবাচ্য করে না। রাণীর এই সমস্ত

অভিব্যক্তি থেকে মালেকের মনে হয় রাণী তাকে ভালোবাসে। রাণী ভালোবাসলেও মালেক রাণীকে ভালোবাসে না; কারণ বাজারের মেয়েকে ভালোবাসা যায় না। রাণীর গণিকা-বৃত্তির দায় কার? এই জিজ্ঞাসায় মালেকের মনে হয়েছে: 'বিষণ্ণ ক্লান্ত নিষ্প্রভ চোখের তারায় ঝিলিমিলি নেই। অথচ শরীরে বাড়বাড়ন্ত রাণী যৌবনের স্বাদ উপেক্ষা করে বিমর্ষ হয়ে থাকে।' (সেলিনা, ২০২০ : ৩৭০) সমাজজীবনে প্রতিদিন কতভাবে নারীর মৃত্যু ঘটছে, তার হিসাব কেউ রাখে না; রাখার চেষ্টাও করে না। দৈন্য আর শোষণের যূপকাষ্ঠে নারীর স্বপ্নগুলো মরে যায়, পচে যায়। সামাজিক এই হত্যালীলার বৈচিত্র্য সামাজিক স্তরে স্তরে সজ্জিত। এই উপন্যাসে যা জীবন্তরূপ নিয়ে উঠে এসেছে।

২৪.৭

উপন্যাসে চিত্রিত নারী চরিত্রের মধ্যে মাতৃত্বের বিশিষ্টতার দাবিতে মালেকের মা বিভিন্ন কারণেই প্রাসঙ্গিক। সমুদ্রের তাণ্ডবে স্বামীকে হারিয়ে পাঁচ পুত্রই তার সম্বল। স্বামীকে হারানোর বেদনায় কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে গিয়েছে সে; তবু তার কান্না বন্ধ হয়নি। 'বিয়ার পর থেকে আমি চেয়েছিলাম তোর বাপ ডাঙ্গায় কাজ করুন। কত রকমের কাজই তো আছে। শোনে নি একদিনও। নতুন বউ ঘরে রেখে মানুষ যে কেবল সাগরে ঘুরতে পারে সে কেবল তোর বাপই।' (সেলিনা, ২০২০ : ৩৬১) সমাজ-সংসারে নারীর কথার কোনো মূল্য নেই। যেহেতু মানুষ হিসেবে সে মূল্যহীন, তাই কথার মূল্য দেয়ার কেউ প্রয়োজনবোধ করে না। এ কথা সব প্রান্তিক নারীর জন্য প্রযোজ্য। নিম্নবর্গের নারীর জীবনে স্বামী একটা ব্রত, একটা ধর্ম। স্বামী যতই অবহেলা করুক, তার কথায় সে ভাববে, তার কথায় বলবে। মালেকের মায়ের এই সমস্ত ভাবনা সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য নিম্নরূপ :

> মালেকের মা অন্ধ, তার মুখমণ্ডলে বলি রেখা বাংলাদেশের মানচিত্রের মতোই একেবেঁকে গিয়েছে; চোখে না দেখাটা যতোটা সত্য তার থেকে বেশি বাস্তব হয়ে ওঠে তার বোধশক্তি। সে পদশব্দে বুঝতে পারে মালেক বা সালেক বা সুজা কে এলো, এমন কি অন্য কেউ এলেও তার চেতনায় ধরা পড়ে।...মালেক বিয়ে করতে সম্মত না হলে দিন দিন মালেকের মায়ের আক্ষেপ বাড়ে। ভিন্নরূপ কষ্টটা হলো সালেকের আচরণ মা হয়ে কোনো অবস্থায় সে মেনে নিতে পারে না, জানে সালেক কথা শুনবে না তবু নিজের কর্তব্যবোধ থেকে দূরে থাকতে পারে না। (কল্যাণ, ২০২০ : ৩৪৬)

একজন নিম্নবর্গের নিরক্ষর এই নারীর ন্যায়ধর্ম, কর্তব্যবোধ তাকে উচ্চকিত করেছে। তার শারীরিক অক্ষমতা সত্ত্বেও নির্বাক, নির্বোধের মতো সমস্ত অন্যায় অঘটনকে উপেক্ষা করেনি। মানুষ হিসেবে, মা হিসেবে তার দায়িত্ববোধে সে অনড়। সালেক মায়ের শাসনকে উপেক্ষা করলেও মা অবিচল থেকেছে নিজস্ব কর্তব্যবোধে :

মাইয়াডারে বিয়া কর। হিতে আঁর কাছত থাকিবো। নইলে জাইল্যাপাহাড় হিতারা থাকিবো ক্যানে?..আগে মনত না আছিল? বিয়র লাই মাইয়াডারে সব্বনাশ করিলি? বুড়ি চেঁচিয়ে ওঠে। মার এই কণ্ঠ ও কোনোদিন শোনে নি। (সেলিনা, ২০২০ : ৪৪৮)

মালেকের মা শুধু মাতৃত্বের সুধায় মোহগ্রস্ত নয়, সন্তানের অনৈতিক কাজে তাকে শাসন করতে দ্বিধা করেনি। সে অন্ধ, অসহায় মা হলে ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তায় সবল সুদৃঢ়। লেখক স্বল্প পরিসরের বৃত্তান্তে মালেকের মায়ের জীবনবোধ ও দর্শনকে আশ্চর্য নিপুণতায় তুলে ধরেছেন। সমগ্র উপন্যাসে মালেকের মা সনাতনী মূল্যবোধের প্রতীক হয়ে অন্ধচোখে দ্যুতি ছড়িয়েছে।

২৪.৮

জয়গুন মধ্যবয়সী এক নারী, উপন্যাসে সাফিয়ার মা। তার জীবন কেটেছে তোরাব আলী মাতবারের সংসারে ঝিয়ের কাজ করে। জয়গুনের একমাত্র চিন্তা মেয়ে সাফিয়াকে নিয়ে। কারণ তার অবর্তমানে সাফিয়ারও কেউ নেই। মাতৃত্বের এই দায়িত্ববোধ থেকে নারী কোনো দিনই মুক্তি পায় না। মালেকের মায়ের মতো তার চরিত্রেরও গুরুত্বপূর্ণ দিক ন্যায়পরায়ণতা। মালেক আততায়ীর হাতে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন হলে একরকম জোর করেই সাফিয়ার মা তার জমানো টাকা মালেকের চিকিৎসার জন্য দিয়েছিল :

জয়গুন কেমন হিংস্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়। যেন সাফিয়ার টাকা ছিনিয়ে নেয়াই এখন জীবনপণ লক্ষ্য। ..জয়গুন একবারও পেছনে ফিরে তাকায় না। যেন পাখনা গজিয়েছে, উড়তে উড়তে চলে যাচ্ছে সাগর পেরিয়ে। টাকার খুঁতি মালেকের হাতে গুঁজে দেয়। ওর ক্ষীণ দুর্বল কণ্ঠ, নিস্প্রভ দৃষ্টি কোনো ভাষাই প্রকাশ করতে পারে না। (সেলিনা, ২০২০ : ৪৭৯)

সংবেদনশীল ও ধীসম্পন্ন জয়গুন বুঝতে পেরেছিল মালেক তার কন্যার জন্য যোগ্য পাত্র। শুকুরের মৃত্যুর পর সে সুযোগ পেয়েছিল মালেকের হাতে মেয়েকে তুলে দেয়ার। নিয়তির দুর্নিবার বিধানে সমুদ্রের গহিন জলে হারিয়ে যায় মালেক। তার আজীবনের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। মানবিকতায় মালেকের পাশে দাঁড়িয়ে ব্যক্তিত্বের মহিমায় অনড় থেকেছে সে। মা হয়ে মেয়ের সুস্থ জীবনের আশায় গ্রামীণ জীবনের পটভূমিকায় জয়গুন বাস্তবোচিত জীবনবোধে উজ্জ্বল এক নারী।

২৫.

ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেনের দ্বিতীয় উপন্যাস *জলোচ্ছ্বাস*। উপন্যাসটি বাংলাদেশের নদীকেন্দ্রিক গ্রামীণ সমাজচিত্রের বাস্তব দলিল। সমাজসচেতন লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিতে শ্রমজীবী মানুষদের জীবনচর্যা

শিল্পিতরূপ ফুটে উঠেছে। *জলোচ্ছ্বাস* উপন্যাসে চরাঞ্চলের নিম্নবিত্ত মানুষের সংগ্রামী ও খেটে খাওয়া জীবনচিত্র মুখ্য বিষয়। দক্ষিণ বাংলার মানুষগুলো যেমন দরিদ্র, তেমনি গভীর অমানিশার জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি। বঙ্গোপসাগরের কোলে মুখ গুঁজে পড়ে থাকা দক্ষিণ বাংলার চরবাসীদের জীবনে অভিশাপ বয়ে আনে খামখেয়ালি প্রকৃতির লীলাখেলা। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে সামাজিক শোষণ। প্রকৃতি আর মানুষের যৌথ পীড়নে খেটেখাওয়া মানুষগুলোর জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। *জলোচ্ছ্বাস* উপন্যাসের কাহিনিকেন্দ্র পটুয়াখালী জেলার দক্ষিণে রাঙাবালী চরইউনিয়ন। যেখানে আগুনমুখো নদীলগ্ন, প্রকৃতিজয়ী মানুষের জীবনের চরাচর। উপন্যাসে অনেকগুলো নারী চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। যেন ঔপন্যাসিক প্রান্তিক পরিসীমায় নারীর জীবনের নিঃস্বতা-রিক্ততার একটি ধারাবাহিক প্রতিবেদন রচনা করে চলেছেন। এখানে কেউ মুখ্য বা গৌণ চরিত্র নয়। সামগ্রিক জীবনের চিত্রকে বাস্তবচিত অবয়ব দান করেছেন লেখক। শরীফা, সাজেদা, আলেয়া, আকাশী, হালিমা বিবি, তারামণবিবি, কলিমন, সর্বোপরি করম আলীর মা প্রত্যেকেই এই জীবনব্যবস্থার স্থিরচিত্র। *পোকামাকড়ের ঘরবসতির* মতো *জলোচ্ছ্বাসে*ও তিনি চোখ রেখেছেন প্রান্তিক মানুষের জীবনের ওপর। এর মধ্য দিয়ে তিনি নিয়ে আসেন সমাজ, আচার, কুসংস্কারের হাতে নিপীড়িত, নির্যাতিত মানুষের কথা (হামীম, ২০১৫ : ৭৮)। ঔপন্যাসিক করম আলীর জীবন চিত্রের মধ্য দিয়ে বাঙালি নিম্নবিত্ত শ্রেণির জীবন ও জীবিকার সমস্যাগুলো তুলে ধরেছেন। বেঁচে থাকার প্রয়োজনে করম আলীর মতো মানুষগুলো বিভিন্ন ধরনের অবদমনের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়ে থাকে। শিক্ষার আলো বঞ্চিত জনপদগুলো নানারকম শোষণের রূপরেখা নির্মাণ করে থাকে। সেই সুযোগের ব্যবহার করে ধূর্ত, ভণ্ড সমাজপতিরা দরিদ্র মানুষগুলোকে নিষ্পেষণ করে তাদের উদরের স্ফীতি ঘটায়।

২৫.২

স্বাধীনতা উত্তরকালের লেখক সেলিনা হোসেনের প্রায় সব লেখাতে নারীর প্রতি একটি স্পষ্ট মানসিকতার প্রতিফলন চোখে পড়ে। পুরুষকেন্দ্রিক বাংলাদেশের সমাজে বন্দি অসহায় নারীর অন্তরকষ্ট লেখককে স্পর্শ করেছে। নারীর প্রতি তাঁর সহানুভূতিপূর্ণ মননের প্রকাশ তাঁর প্রত্যেকটি সাহিত্যকর্মে লক্ষ করা যায়। সেখানে *জলোচ্ছ্বাস* (১৯৭৩) বিভিন্ন কারণেই উল্লেখযোগ্য। উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিরাজমান চরিত্র শরিফা। সে করম আলীর বিধবা বোন। তার স্বামী পিয়নের চাকরি করত, জলোচ্ছ্বাসে স্বামী-সংসার হারিয়ে ভাইয়ের বাড়িতে আশ্রিতা। চার সন্তানের জননী সে, চারটা ছেলে-মেয়ে নিয়ে ভাইয়ের সংসারের বোঝা হতে ওর বিবেকে বাধে। সবার নিষেধ উপেক্ষা করে সে হাওলাদার বাড়িতে ধান ভানতে যায়। শরীফার মতে, 'প্যাটে নাই ভাত, পোদ্দে নাই ত্যানা,

চউকের শরম কইরা লাভ কী? স্বামীর লগে লগে শরমও কবর দিছি আগুনমুখায়।' (সেলিনা, ২০১৯ : ১৯৪) শরীফা অত্যন্ত বাস্তববাদী ও বিবেচনাসম্পন্ন নারী। ভাই করম আলী তাকে আশ্রয় দিয়ে তার মাথার ওপরে ছায়া দিয়েছে, তাতেই সে কৃতজ্ঞ তাই যতটুকু পারে সে ভাইকে সহযোগিতা করে। নিম্নবর্গের জীবনে নারীর নিজস্ব পেশা জীবন তৈরি করা দুরূহ। তাই হাওলাদার বাড়িতে গৃহকর্মীর কাজ করা তাদের একমাত্র জীবিকা। তার মনে হয়েছে 'কথায় আছে না, ভাইগ্যের নাম ভাউয়া ব্যাং খুশিমতো চালায় ঠ্যাং। নইলে এই বয়সকালে কেউ রাড়ি অয়।' (সেলিনা, ২০১৯ : ২৩৮) পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী জন্ম মানবসভ্যতার সূতিকাগারকে বাঁচিয়ে রাখতে। বিবাহ নামক বৈতরণী পার হলে একটার পর মানবসন্তানের জন্ম দিয়ে নারী জন্মকে সার্থক করে। সমাজ-সংসার কেউ ঐ নারীর শারীরিক মানসিক অবস্থাকে উপলব্ধির চেষ্টা করে না। পুরুষশাসিত সমাজ নারীর মাতৃত্বের ওপর একটি কৃত্রিম মহত্বের মিথ উৎপন্ন করে। যেখানে অতি সহজেই মায়েদের আত্মত্যাগী, সতী সাধ্বী রূপে অঙ্কন করে পুরুষের বিকৃত আত্মতুষ্টির প্রতিমূর্তি নির্মাণ করে। যেখানে সমাজ ভুলেই যায় মা যে নারী, সেও একজন মানুষ; তার ভালো লাগা, মন্দ লাগা থাকতে পারে। যার ফলে সমাজে নারীর আসল অবস্থান কখনোই স্পষ্ট হয় না (যশোধরা, ২০১২ : ১৯৬)। সামাজিক এই সমস্ত পরিকাঠামোয় নারী বারবার আবর্তিত হয়, তার নিজস্ব জীবনাকাঙ্ক্ষা কখনোই গুরুত্ব পায় না। শরীফার নিজস্ব চাওয়া-পাওয়াগুলো যখন ব্যর্থ হয়, তখন জীবনের অন্য সব অনুষঙ্গ অসহ্য মনে হয়। তার জীবনবোধে সে একজন সংস্কারমুক্ত নারী। গ্রামীণ জীবনে নারীর অবস্থান সর্বসংস্কারে আবদ্ধ। জীবনের পদে পদের প্রতিকূলতা তাকে সংস্কারমুক্ত করেছে। শিকদার বাড়ির ধান ভানতে ভানতে ক্লান্ত দেহ যখন একটু বিশ্রাম চায়, তখন :

> দম নেয়ার জন্য আজ শিকদারদের ঢেঁকির ওপরই বসে পড়ে। মা'র নিষেধ মনে পড়লেও পালন করতে ভাল লাগে না। মা বলেছে বারা বাঁধার সময় ঢেঁকির ওপর বসতে নেই। ঢেঁকির ওপর বসলে বারা বাঁধা ছাড়ে না।...বারা বাঁধার ভাগ্য নিয়ে বুঝি ওর জন্ম হয়েছে! নইলে এত অল্প বয়সে রাড়ি হবে কেন ও? (সেলিনা, ২০১৯ : ৩১৬)

এভবেই গ্রামীণ জীবনের বন্ধুর পথে নিম্নবর্গের গ্রামীণ নারীর পথচলা। সেলিনা হোসেন নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সম্পর্কে সব সময় সজাগ ও সহানুভূশীল। বিশেষ করে তাঁর সৃষ্ট নারী প্রচলিত প্রথাকে অতিক্রম করে আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টায় সংগ্রামশীল। শরীফা তার একটি জীবন্ত রূপ। নারীর অধিকার সামাজিক ও পারিবারিক আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সেখানে ব্যক্তি আইন কখনো প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি (মালেকা, ২০১৬ : ১৫০)। এই কারণেই নারী সমাজে, রাষ্ট্রে, পরিবারে ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারেনি। যুগ যুগ ধরে নারীকে সর্বত্র দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক রূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। প্রাকৃতিক

দুর্যোগ, প্রান্তিক জীবনের দারিদ্র্য শোষণ অবহেলায় এই নারী স্বাভাবিক শক্তিকে হারিয়ে কাঠের পুতুলে পরিণত হয়েছে। বৈষম্যমূলক নিম্নবর্গ পুরুষ ও নারী যেমন একইভাবে শোষণ-নির্যাতনে পিষ্ট, তেমনি আবার পুরুষশাসিত বৃত্তে কেবল নারী-ই পৃথকভাবে শোষণ নির্যাতনের, জাঁতাকলে বন্দি। নারীর এই অবরুদ্ধ অবস্থা তাকে জীবনের প্রতি ভালোবাসার পরিবর্তে বিতৃষ্ণা, ঘৃণার জন্ম দেয় (মহীবুল, ২০০০ : ১৯৮)।

২৫.৪

জলোচ্ছ্বাস উপন্যাসের নারীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সক্রিয় ও সতেজ নারী চরিত্র কলিমন। কর্ম উদ্দীপনা, প্রতিবাদ প্রতিরোধে সে পূর্ণাঙ্গ মানবে পরিণত হয়েছে। কলিমনের স্বামী শরাফত জেলে থাকায়, পুত্রসন্তান আর মাকে নিয়ে তার সংসার। স্বামী ছাড়া জীবনে সে স্বাধীন ও স্বনির্ভর নারী। চটকলে কাজ করত শরাফত, ধর্মঘটে অংশ নেয়ার অপরাধে তার জেল হয়েছে। স্বামী জেলে যাওয়ার পর নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল নিম্নবর্গের এই নারীর জীবন। তবু সে ঘুরে দাঁড়িয়েছে :

> এখন কলিমন আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখে। উঠানে পুঁইয়ের মাচা তৈরি করে চালের উপর লাউয়ের ডগা তুলে দেয়। দখিনা বাতাসের অল্প পরশে গাছের ডগা যখন লকলক করে তকন অনাগত দিনের সুখ-স্বপ যেন গুনগুন করে ওঠে কলিমনের মনে। ও যেন স্পষ্ট দেখতে পায় সবুজ বড় বড় পাতায় ছেয়ে গেছে ওর জীবনের না পাওয়ার ইতিহাসের সবগুলো পৃষ্ঠা। (সেলিনা, ২০১৯ : ২১৬)

কলিমনের জীবনেও রয়েছে প্রকৃতির অপরিমেয় অনুদান। প্রকৃতির আপনছোঁয়ায় তার ক্ষতকে শুশ্রূষা করে তাকে দিয়েছে বেঁচে থাকার শক্তি ও স্বপ্ন। প্রচণ্ড আত্মমর্যাদা সম্পন্ন এই নারী দাসীবৃত্তির কাজকে অপছন্দ করে। তাই বেঁচে থাকার পথ খুঁজতে তার বড় আশ্রয় হয়ে উঠেছে তার বসতভিটা। তাকে কেন্দ্র করে কলিমনের জীবন ও জীবিকা দুইই চলে।

> কলিমন তরকারি চাষ, হাঁস-মুরগি পেলে বাড়ি বাড়ি ধান ভেঙে কোনোরকম চালিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে কাঁকিয়ে ওঠে মনটা। মনে হয় এমনভাবে বেঁচে? একবেলার অন্নের সংস্থান যার নেই, তাঁর আবার বাঁচার সাধ কেন? (সেলিনা, ২০১৯ : ২১৬)

কলিমন নিজেই নিজের বাঁচার পথ নির্মাণ করলেও সমাজের পুরুষেরা তাকে বাঁচতে দিতে রাজি নয়; কারণ কলিমন অল্প বয়সী নারী। তার এই বাঁচার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় জালাল মাওলানা। জালাল মাওলানা কলিমনকে বিয়ে করার জন্য ধর্মীয় বিভিন্ন ফতোয়া দেয়া শুরু করে। এই ফতোয়া অস্বীকার করে সে আগুনের কুণ্ডের মতো জ্বলে উঠেছে। পুরুষশাসিত সমাজের সমাজপতিরা ধর্মীয় বিধানের নামে নারীকে পদানত করে রাখতে চায়; সমাজের সেই অনাবৃত দিককে উন্মোচন করেছেন লেখক।

জোয়ান মেয়েলোক অভিভাবকহীন অবস্থায় বেগানা হয়ে থাকতে পারে না।...কলিমনকে জোর করে বেঁধে রাখা হবে দাসী বানানোর জন্য। বিক্ষুব্ধ হয়ে থাকে কলিমনের হৃদয়। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে–দরকার হলে সমস্ত গাঁয়ের বিরুদ্ধে ও একাই লড়বে। স্বার্থসিদ্ধির জন্য তৈরি করা হাদিস ও মানে না। (সেলিনা, ২০১৯ : ২৯০)

ব্রাত্য নারী থেকে শুরু করে গ্রামীণ নারী-সবাই সামাজিক ও ধর্মীয় রাজনীতির শিকার হয়ে থাকে। কলিমনের ক্ষেত্রে ও তাই হয়েছে, তবে এই সমস্ত শোষণ প্রতিরোধ করতে সে অপ্রতিরেধ্য। সে সব সময় প্রচলিত সীমার বাইরে জীবনকে দেখে এসেছে। সাধারণ গ্রামীণ পরিবেশের নারীরা ধূমপান করাকে একটু বাঁকা দৃষ্টিতে দেখা হয়। সে কারো কথাকে পরোয়া না করে কৈশোর থেকে আজ পর্যন্ত সুযোগ পেলে ধূমপান করে আসছে। স্বভাগতভাবে সে সাহসিকতার সঙ্গে জালাল মাওলানার প্রস্তাবকে নাকোচ করেছে। মাওলানার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করতে করিম আলীকে অল্প সময়ের ব্যবধানে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই বিষয়ে তার নিজস্ব ভাবনা নিম্নরূপঃ

যে ব্যাডা বউ কিল্যাইয়া মারে তারে আমি বিয়া করুম না। আমারেও মাইরা ফালাইব।... তারামন বেঁচে থাকতে ওর প্রতি কোনো সহানুভূতি জালাল মাওলানা দেখায়নি। কখনো খোঁজ নেয়নি কলিমনের ঘরে ভাত আছে কি না। আজ শুধু নিজের প্রয়োজনে জালাল মাওলানা কলিমনের জন্য নতুন হাদিস তৈরি করতে উদ্যোগী হয়েছে? এই তিন বছরে কলিমনকে একবারও কি পুরুষ অভিভাবকহীন দেখেনি মাওলানা? উঃ কী জঘন্য স্বার্থ! কী জঘন্য ষড়যন্ত্র। (সেলিনা, ২০১৯ : ২৯০)

ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেন তার প্রত্যেকটি উপন্যাসে নারীর জন্য একটি আলাদা জায়গা রাখেন। যেখানে চরিত্রগুলো অকপটে তাদের জীবনের সত্য-ভাষণ উল্লেখ করতে পারে। নারী চরিত্রগুলো মাতৃত্ব, বাাৎসল্য, প্রেম- প্রণয় মুগ্ধতায় ও প্রতিবাদে-প্রতিরোধে নির্দ্বন্দ্ব হয়ে উঠতে পারে। কলিমনের মতো সাধারণ নারী তার আত্মচেতনায় সমাজ ও ধর্মের ছিদ্রগুলোকে আবিষ্কার করতে পেরেছে।

২৫.৮

গ্রামীণ নারীর শোষণের বহুমুখীরূপের মধ্যে তারাবানুর প্রতি ঘটে যাওয়া ঘটনাসমূহ অন্যতম। সহজ-সরল গ্রামীণ নারী সমাজপতি, ধর্মীয় নেতাদের এতসব কৌশল আয়ত্ত করতে পারে না। ধর্মের সরলরৈখিক ব্যাখ্যা তার জীবনে অভিশাপ হয়ে আসে। মাওলানা জালালের স্ত্রী তারাবানু তারই শিকার। স্বামীর দেওয়া ধর্মের ব্যাখ্যা অনুসারে ‘বছরের দু-বেলার খাবার রেখে আর সব গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়া অশেষ পুণ্যের কাজ।’ (সেলিনা, ২০১৯ : ২৫৪) তারাবানু তার ঘরের সমস্ত খাদ্যদ্রব্য সমস্ত কিছু দান করে দেয়। স্বামী মাওলানা জালাল স্বার্থ অন্ধ মনোবৃত্তি তা কোনোভাবেই

মানতে পারেনি। যার ফলে শুরু হয় অকথ্য নির্যাতন। সন্তানসম্ভবা তারাবানু কোনো ক্ষমা পায়নি স্বামী জালাল মাওলানার কাছে। অমানুষিক শারীরিক নির্যাতনে তার অনাগত সন্তানের প্রাণ অকালেই ঝরে যায়। তারাবানুর মতো গ্রামীণ নিম্নবর্গের নারী ধর্মের নামে বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে; যার ফলে তাদের মৃত্যু অনিবার্য হয়ে ওঠে। উপন্যাসের সমগ্র অবয়বকে লেখক নির্মাণ করেছেন বিভিন্ন বয়সি নারীর আবর্তন। হালিমা বিবি, তারাবানুর মতো নির্যাতিত নারীর পাশাপাশি আছে আলেয়া ও আকাশীর মতো কিশোরী নারীর কথা। তাদের জীবনের কোণে কোণে রয়েছে উত্থান-পতনের গল্প। করম আলির ছোট দুই বোন আলেয়া ও আকাশী। অভাবের সংসারে তাদের সবসময় ভাবতে হয় দু'বেলার অন্ন জোগান কিভাবে করা যায়। আলেয়া আর আকাশীর প্রতিদিনের কাজ রান্নার জ্বালানি সংগ্রহ করা।'ওরা বেশিরভাগ সময়ই বনবাদাড়ে ঘুরে শুকনো পাতা, গাছের ডাল কুড়িয়ে নিয়ে আসে। এ কাজ রাঙাবালী চরের সব বাড়ির সব কিশোর ছেলেমেয়ের।' (সেলিনা, ২০১৯ : ১৯৫) নিম্নবর্গের জীবনে নারীর শৈশব-কৈশোরের স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে হারিয়ে বেড়ে উঠতে হয় জীবনের দ্বান্দ্বিকতার পথ ধরে। সমাজজীবনের দৈন্য-দারিদ্র্য-দুরাশা চিরকাল নিম্নবর্গের জনজীবনকে কীট থেকে কীটতর করে তুলেছে। মর্মের আঘাতকে সঞ্চিত করে পাল্টা দিতে কখনোও ব্যর্থ হয়েছে, কখনও প্রেরণা জুগিয়েছে। সবকিছুর মধ্যে তাদের সৌন্দর্যমুগ্ধ দৃষ্টি কখনই চঞ্চল করা উচ্ছলতাকে এড়িয়ে যেতে পারে না (রাজকুমার, ২০১৩ : ১০৬)। তাই আলেয়া হাঁস পুসে, হাঁসের ডিম বিক্রি করে মাকে সহযোগিতা করে। এ প্রসঙ্গে করম আলির একটি ভাবনা বিশেষভাবে স্মর্তব্য : 'কী করে অতটুকু আলেয়া এত যত্ন করা শিখল? ও তো পারে না। মেয়েগুলো কি মা হওয়ার জন্য জন্মায়।' (সেলিনা, ২০১৯ : ১৯৬) জন্ম থেকেই ওদের মধ্যে মাতৃত্বের ধারা বহমান হয়ে চলে। পোষা হাঁসগুলোর প্রতি তার যত্নআত্তি দেখে এই ভাবনার উদয় হয়। এর বাইরে আলেয়ার জীবনের আলো-অন্ধকারের ছায়াপথে আগমন ঘটে মতিনের। মতিনের সাহচর্য তাকে নতুন জীবনের স্বপ্নে বিভোর করেছে। তার স্বপ্ন আর সে সবই ভেসে যায় আগুনমুখোর ভয়াল থাবায়। আকাশী স্বভাবগতভাবে তার মায়ের মতো শান্ত-স্থির। উপকূলের-উপদ্রুত জীবনের জাঁতাকলে তার জীবন বয়ে চলে। আগুনমুখোর নির্মম থাবায় সব হারিয়ে সন্তানসম্ভবা আকাশী বেঁচে থাকে নবজীবনের পথ চেয়ে। নবাগত সন্তান আর শাশুড়ি হালিমা বিবিকে নিয়ে তার নতুন জীবনের নতুন অধ্যায়।

২৫.৯

করম আলীর মা উপন্যাসের সবচেয়ে অনাদৃত অবহেলিত জীবনের অধিকারী। প্রথম জলোচ্ছ্বাসে স্বামীকে হারিয়ে অনেকাংশে নীরব এক সত্তার অধিকারী হয়ে উঠেছিল সে। তার অনালোকিত জীবনে

নিজস্ব পরিচয়ের পরিমণ্ডল বিস্মৃত। তার নিজের নামে সে উপন্যাসে পরিচিত নয়, সন্তানের নামে পরিচিত। দীর্ঘ দাম্পত্যের আড়ালে চাঁপা পড়েছে তার নিজস্ব নাম পরিচয়। 'প্রতিটি ছেলেমেয়ের প্রতি মা'র অতিরিক্ত দরদ। ওদের বকে না, মারে না। কেবল আগলিয়ে রাখতে চায়। বুঝতে দিতে চায় না হতাশা দারিদ্র্য আর অভাবের তাড়না। কিন্তু পারে কি?' (সেলিনা, ২০১৯ : ২১৪) মা হিসেবে শহীদ আলীর রাগ করে ভাত না খাওয়া তাকে যেমন পীড়িত করে, তেমনি কষ্ট দেয় টাকার অভাবে সাজেদার সঙ্গে করম আলীর বিয়ে দিতে না পারায়। সন্তানের সুখের কথা মা লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে সাজেদার সঙ্গে করম আলীর বিয়ের প্রস্তাব তার মা পেশ করে। যদিও লজ্জা অপমান ছাড়া সেখান থেকে কিছু পাওয়ার ছিল না, তবুও বলেছে : 'কইছিলাম আমার করমের লগে সাজেদার বিয়াটা করাইয়া ফালান দরকার।... সব্বনাশ? কোনহানে হাজী দানেশ আর কোনহানে করম আলী?' (সেলিনা,২০১৯ : ২৫৩) মা হিসেবে করম আলীর মা সন্তানের মর্মার্থ বুঝতে পেরে অপমানিত হবে জেনেও এ কথা বলতে এসেছিল। চরিত্র হিসেবে করম আলীর মা একটি পূর্ণ ব্যাপ্তির মধ্য দিয়ে চলেছে। ঔপন্যাসিক অত্যন্ত কৌশলী বাতাবরণে চরিত্রের অনুকৃতি সম্পাদন করেছেন।

২৫.১০

জলোচ্ছ্বাসের উপন্যাসে লেখকের চিন্তার দৃকপাতে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয় : জৈবিক আধিপত্যে ধর্মীয় লেবাসে নারীকে পশুর স্তরে নামিয়ে আনার প্রবৃত্তি, অন্যদিকে সামাজিক প্রথা নিয়মের মধ্যে নারীর নিয়ন্ত্রিত জীবন। নারীর এরূপ কেন্দ্রাতিগ অসহায়, প্রান্তিক, অস্পৃশ্য রূপের মধ্যে সমাজে প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক প্রবণতাসমূহকে যথার্থরূপে চিহ্নিত করতে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। লেখক নারীর মনকে যথার্থ পরিধি দিয়ে প্রকাশ করেছেন। আলোচ্য উপন্যাসে নারীর মাতৃত্ব, বাৎসল্য, প্রণয়নী-সমস্ত রূপের সামগ্রিক ব্যবহার লক্ষ করা যায়। চেতনাগত দিক থেকে উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলো স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর। তাদের অবস্থান ও অভিব্যক্তি সব সময় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে। তাদের প্রকাশ ও প্রচেষ্টায় প্রচলিত সমাজকাঠামোর বাইরে নিজের অস্তিত্বকে দাঁড় করিয়েছে। পাশাপাশি তারা সময় ও সমাজের প্রাসঙ্গিক চরিত্র হয়ে উঠেছে। এই উপন্যাসের নারীরা ভেতরের শক্তির সম্ভাব্যতা রূপায়ণ, পারিবারিক, সামাজিক নিগ্রহ, চাপিয়ে দেওয়া পুরুষতন্ত্র, গ্রামীণ অর্থ-ব্যবস্থার বিপর্যয় সেলিনা হোসেনের শিল্পশক্তির অনিবার্য বৃত্তবিন্দু (শহীদ, ২০১৩ : ২২২)। রাঙাবালির অমানিশা, দারিদ্র্য, সংগ্রাম সবকিছুই আমাদের দেশের নিত্যনৈমিত্তিক বাস্তবতা। এই বাস্তবতায় নিম্নবর্গের নারীর সংগ্রাম, প্রতিরোধ, পরিণতি সবই অনিবার্য মানবিক সত্তায় রূপ নিয়ে জীবনবাদী আদর্শকে বিজয়ী করেছে।

২৬.

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের বৈচিত্র্যপূর্ণ গভীরজগতে দীর্ঘদিনের বসবাস সেলিনা হোসেনের। সাহিত্যের নানামুখী আয়োজনের মধ্যে বাঙালির আত্মানুসন্ধান করে চলেছেন তিনি নিরলসভাবে। লেখকের চেতনাগত এই ধারাবাহিকতায় *চাঁদবেনে* (১৯৮৬) তেমনি একটি উপন্যাস। মধ্যযুগের মনসামঙ্গলের সাহিত্যিক ঐতিহ্য এবং সমকালীন জীবনযাপনের অভিজ্ঞতালব্ধ চেতনার অন্তর্বয়নের চিত্ররূপ *চাঁদবেনে* উপন্যাস। উপন্যাসের নায়ক চাঁদ মনসামঙ্গলের সাহসী-প্রতিবাদী ব্যক্তিত্ব চাঁদ সওদাগরের আধুনিকতম উত্তরপুরুষ। ভূমিহীন শোষিত, বঞ্চিত, ক্ষেতমজুরের জীবনযন্ত্রণা ও জীবনসংগ্রামের কথা ব্যক্ত হয়েছে চাঁদ সওদাগর চরিত্রের প্রতিমূর্তিতে। তার স্ত্রী ছমিরণ সনকার মতোই মৃতবৎসা; শোষণ আর বঞ্চনায় অসুস্থ আর অনিরাপদ জীবনের অধিকারী। উপন্যাসে বেহুলা নেই ; বেহুলার মতো শক্তিমতী নারী আছে সকিনার মধ্যে (প্রথমা, ২০১৯ : ১২৩)। সন্তানসম্ভবা সকিনার মধ্যে চাঁদ তার কাঙ্ক্ষিত সন্তান লখিন্দরের আগমনী গান শুনেছে। এভাবে মধ্যযুগের সাহিত্যিক ঐতিহ্য মনসামঙ্গলের কাহিনি পরিপ্রেক্ষিতে চাঁদবেনে উপন্যাসের পটভূমি নির্মিত হয়েছে। লেখক আসলে স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষেশোষণমুক্ত জীবনের কথা বলেছেন; নারী-পুরুষসহ সকল মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচবে। এই আদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর লেখার মৌল প্রবণতা। সমাজ ও জীবন অভিজ্ঞতার প্রতিটি স্তর থেকে ঔপন্যাসিক আহরণ করেছেন তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু। এই আলোচনায় উপন্যাসের মূল অন্বেষণ নিম্নবর্গের নারীর জীবনরেখায় আলোকপাত করা।

২৬.১

সভ্যতার নির্মতারূপে নারীর প্রধান অবদান মানবসন্তানের প্রবহমান ধারা হিসেবে। নারীর বৈবাহিক জীবনের প্রথম ও প্রধান প্রত্যয় পুরুষ ও পুরুষতন্ত্রের বহমানতাকে ত্বরানিত করেছে। নারীকে স্ত্রীরূপে গৃহলক্ষ্মী হিসেবে দেখতেই সমাজ অভ্যস্ত। ছমিরন গৃহলক্ষ্মী স্ত্রীরূপে জীবন শুরু করলেও সময়ের পরিক্রমায় সে অসুস্থ, অপ্রাকৃত নারীতে রূপান্তরিত হয়েছে। উপন্যাসের পরিসরে চাঁদ চরিত্র যতটা বিস্তৃত তার স্ত্রী ছমিরন ততটাই অনালোকিত চরিত্র। চাঁদের ব্যক্তিজীবনের যে অন্ধকার দিক তার অনেকটা জুড়ে আছে ছমিরন। তাদের দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে ছমিরন ছয়বার মা হয়েছে এবং প্রতিবার সে মৃত সন্তান প্রসব করেছে। অর্থাৎ সে মৃতবৎসা এক নারী। তার এই অনর্বুর গর্ভ সমগ্র সমাজের অসুস্থতাকে প্রতীকায়িত করেছে (প্রথমা, ২০১৩ : ১২৪)। ব্যর্থ মাতৃত্বের যন্ত্রণা তাকে ক্লান্ত, অনুর্বর

নারীতে পরিণত করেছে। তার জীবনীশক্তি থাকলেও তাতে আজ আর কোনো জোয়ার-ভাটা আসে না। এই ব্যর্থতার যন্ত্রণা তাকে তিলে তিলে উন্মাদ করে তুলেছে। তার সমস্ত সত্তা জুড়ে ছিল সন্তান কামনাতুর বুভুক্ষু মাতৃহৃদয়ের হাহাকার ঔপন্যাসিকের ভাবনায় ধরা পড়েছে :

> ছমিরন এখন পদ্মার ধু ধু বালু। কোথাও একটু লবণ্য নেই। বিয়ের সময় ওর শরীর ছিল উথাল পাথলে। ...এখন শুকিয়ে কাঠ। শরীর মাটির মত ফাটে। সে ফাটলে সেঁধিয়ে যায় চাঁদের স্বপ্ন। ওর ভীষণ পিপাসা পায়। কিন্তু ছমিরনকে বলে কোনো লাভ নাই। (সেলিনা, ২০০৫: ৫১)

চাঁদের সানকা যেভাবে ছয় পুত্রসন্তানকে হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছিল, তেমনি শূন্যতা আর অস্তিত্বহীনতার সর্বগ্রাসী ছোবল গ্রাস করেছে ছমিরনের অন্তর্জীবনকে। পাশাপাশি পদ্মার নিঃস্ব-রিক্ত অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়েছে ছমিরনের অক্ষমতাকে। ফারাক্কায় বাঁধ পড়েছে বলে পদ্মা শুকিয়ে গিয়েছে, মাটি ফেটে চৌচির হয়েছে। পদ্মার অক্ষমতা যেন ছমিরনের শরীরে ছায়া ফেলেছে। ছমিরনের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে চাঁদের দাম্পত্য জীবনের বন্ধ্যাত্বর অবসান ঘটেছে।

২৬.২

ছমিরন বেঁচে থাকতেই সকিনার প্রতি চাঁদের মুগ্ধতার সূচনা; ছমিরনের মৃত্যু সেই বন্ধ্যাত্বর অবসান ঘটিয়ে নতুন জীবনের বারতাকে আন্দোলিত করেছে। অনুর্বর ছমিরনের মৃত্যু পর উর্বরতার সম্ভাব্য সতেজ ইঙ্গিত নিয়ে চাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছে সকিনা। যার প্রেমে ও সাহচর্যে চাঁদ অনুভব করে জীবনের নবতর তাৎপর্য ও সম্ভাবনা (শামসুন, ২০১৩ : ২৪১)। মনসামঙ্গলের আবহে নির্মিত উপন্যাসে চাঁদের মতো শক্তিমান পুরুষ আছে, সানকার মতো অসহায় মৃতবৎসা মা আছে, বেহুলার মতো সাহসী, শক্তিমান নারীর অভাব ছিল। সকিনা বেহুলার দৃঢ়তা নিয়ে চাঁদের জীবনে প্রবেশ করে। সকিনার ব্যক্তিগত জীবন আর দশ বাঙালি নারীর মতো বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। বাবা হাফিজ মিয়া অনেক কষ্ট করে তার বিয়ে দিয়েছিল; যৌতুকের টাকা পরিশোধ করতে না পারায় তাকে সংসার ছাড়তে হয়েছে। 'হামার স্বামীক কছলাম আপনে বিয়া করেন কিন্তুক হামাক খেদাইয়া দিয়েন না।' (সেলিনা, ২০০৫ : ৬১) ঔপন্যাসিক শুধু মিথের পুনর্নির্মাণের মধ্যে লেখক সত্তাকে সীমাবদ্ধ রাখেননি; বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীর যে চিরকালীন সমস্যা, তাকেও তুলে ধরেছেন। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুরুষের আধিপত্যবাদের মধ্যে নারীর অবমূল্যায়নের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কাব্যের প্রধান নারী চরিত্র বেহুলা। সে তার নিজস্ব সুখ, শান্তি, ঐশ্বর্য ও জীবনের মায়া ত্যাগ করে জীবনসংগ্রামের পথে অবতীর্ণ হয়েছে। মৃত স্বামী লখিন্দরকে জীবিত করার আশায় দেব-সভায় নেচেছে (জামিরুল, ২০০৯ : ১৩১)। সকিনার জীবনকে বিপন্ন করেছে সামাজিক অবক্ষয় আর

অবদমন। সেই পরিবৃত্ত থেকে বের হয়ে সে নবজীবনের পথ পেয়েছে চাঁদের আহ্বানের মধ্যে। লাঞ্ছিতা সকিনার জীবনে নতুন করে প্রেমের হাওয়া বয়ে দেয় চাঁদ। চাঁদ আর সকিনার মিলনের মধ্যে লেখক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নকে দেখিয়েছেন। জীবনের চরম হতাশা ও বিপন্নতার মধ্যে দাঁড়িয়ে সকিনার প্রতি চাঁদের দৃঢ় উক্তি :

> লখিন্দর? হামার লখিন্দর।..সকিনা হামাকেরে লখিন্দর। ... সকিনা কোনো কিছু না বুঝেই চাঁদের বুকে আশ্রয় নেয়। কেবল বোঝে এই সন্তানের জন্যে ওর কোনো লজ্জা এবং গ্লানি নেই। চাঁদ ওকে এসব থেকে আড়াল করে দিয়েছে। ...সকিনা তোমার লজ্জা? তোমার পেটের সন্তান আমার অহংকার। আমি একজন গর্বিত পিতা হবো। আমার লখিন্দরকে লোহার দেযাল দিয়ে আড়াল করতে হবে না সকিনা। আমার লখিন্দরের জন্ম হবে খোলা আকাশের খোলা আকাশের নীচে গাছের উন্মুক্ত তলায়।..সকিনা, তুমি আর আমি তেমন লখিন্দরের জন্ম দেবো যারা আজু মৃধাদের বেড়ে ওঠাকে রুখবে। (সেলিনা, ২০০৫ : ১২৫)

চাঁদের এই শোষিত, বঞ্চিত জীবনের অংশ সকিনার। সকিনা সন্তান রূপে যে লখিন্দরের জন্ম হবে তার শক্তি, সাহস, বীর্যে কেটে যাবে সব আঁধার। চম্পাইগঞ্জের মানুষের জীবন থেকে কেটে যাবে সব আঁধার। সাহসী প্রতিবাদী লখিন্দরের হিন্তালের লাঠির সামনে মাথা তুলতে ভয় পাবে আজু মৃধার মতো মনসা। সকিনা হয়ে উঠবে সেই বেহুলার মতো শক্তিমতী নারী, যার গর্বের উত্তাপে ভেসে যাবে সমস্ত অনাসৃষ্টি।

টীকা:

১. সুলাস্মি ফায়ারস্টোন কানাডিয়ান নারীবাদী তাত্ত্বিক লেখক (১৯৪৫-২০১২)। তিনি র‌্যাডিক্যাল নারীবাদ নিয়ে লেখালেখি করেছেন। তাঁর লেখার মূল বিষয় ছিল সামজিক অর্থনৈতিক সকল প্রেক্ষাপটে পুরুষের আধিপত্য নির্মূল করার ব্যাপারে সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণের ক্ষেত্রে। তাঁর প্রকাশিত বই ‘দ্য ডায়ালেক্টিক অফ সেক্স’ এখানে তিনি নারীর প্রজননগত অধিকারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পাশাপাশি পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্য কীভাবে নারীর প্রজননগত অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে, সেই বিষয়েও আলোকপাত করেছে। জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাগুলো দুর্বল হওয়ার কারণে নারী ধারাবাহিকভাবে সন্তান জন্মদান ও লালন-পালনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। যার ফলে নারী বাধ্য হয়েছে পুরুষের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে। ফায়ার স্টোন প্রস্তাব করেছেন এমন একটি কৃত্রিম উপায়ের যেখানে মানবশিশু জন্মগ্রহণ করবে ও বেড়ে উঠবে। (উদ্ধৃত, সেলিনা, ২০০৮ : ২৫৮)

গ্রন্থপঞ্জিঃ

১. অজয় রায় (২০১৭)। *বাঙলা ও বাঙালী*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

২. অমল দাশ (২০১৩)। *ভারত ইতিহাসে নিম্নবর্গের নারী শ্রমিক এদের সংকট ও সংগ্রাম উনিশ থেকে বিশ শতক*, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা

৩. অভিজিৎ চক্রবর্তী (১৯৯৬)। *মিশেল ফুকো*, রক্তকরবী, কলকাতা

৪. অনিন্দিতা দত্ত (২০১৯)। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র কথাসাহিত্য আত্মপরিচয়ের বর্ণমালা*, এবং মুশায়েরা, কলকাতা

৫. অনীক মাহমুদ (১৯৯৫)। *বাংলা কথাসাহিত্যে শওকত ওসমান*, ইউরেকা বুক এজেন্সি, রাজশাহী

৬. অনুপম সেন (২০১৬)। *বাংলাদেশ: রাষ্ট্র ও সমাজ সামাজিক অর্থনীতির স্বরূপ*, অবসর, ঢাকা

৭. অদ্বৈত মল্লবর্মণ (২০১৫)। *অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনা সমগ্র*, দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা

৮. আব্দুল মান্নান (২০১১)। *গ্রামীণ নারী*, অবসর, ঢাকা

৯. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (২০১২)। *রচনাসমগ্র* ২, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

১০. আহমেদ মাওলা (১৯৯৭)। *বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে প্রবণতাসমূহ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

১১. আহমেদ কবির (১৯৮৯)। *সরদার জয়েনউদ্‌দীন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

১২. আল মাহমুদ (২০০৮)। *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, অনন্যা, ঢাকা

১৩. আলাউদ্দিন আল আজাদ (২০১৩)। *ক্ষুধা ও আশা*, বাতায়ন প্রকাশন, ঢাকা।

১৪. আলাউদদীন মণ্ডল (২০০৯)। *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস নির্মাণে বিনির্মাণে*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

১৫. আবু ইসহাক (২০১৭)। *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা

১৬. আবু ইসহাক (২০১৬)। *পদ্মার পলিদ্বীপ*, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা

১৭. আনু মুহাম্মদ (২০১৮)। *বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতি*, মীরা প্রকাশন, ঢাকা

১৮. ইয়াহিয়া মান্নান (২০২০)। *আল মাহমুদের উপন্যাসের বিষয় ও স্বাতন্ত্র্য*, প্রতিভা প্রকাশ, ঢাকা

১৯. কল্যাণ মিরবর (২০২০)। *বাংলাদেশের উপন্যাস(১৯৭১-১৯৮৭)*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ,ঢাকা

২০. কামরুদ্দীন আহ্মদ (১৯৮৩)। *পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

২১. খোরশেদ আলম (২০১১)। *কথাসাহিত্যে : পাঠ ও চিন্তন*, অক্ষর প্রকাশনী, ঢাকা

২২. গিয়াস শামীম (২০০২)। *বাংলাদেশের আঞ্চলিক উপন্যাস*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

২৩. গোপিকানাথ রায় চৌধুরী (২০১৪)। *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা সাহিত্য*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

২৪. গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা. ২০১৫)। *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, আনন্দ, কলকাতা

২৫. ছন্দশ্রী পাল (২০০৯)। *বাংলাদেশের উপন্যাস পরিবার ও সমাজ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

২৬. জহর সেনমজুমদার (২০১৭)। *নিম্নবর্গের বিশ্বায়ন*,পুস্তক বিপনি, কলকাতা

২৭. জহির রায়হান (২০১৭)। *উপন্যাস সমগ্র*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা

২৮. জাকারিয়া শিরাজী (১৯৯৯)। *আধুনিক সাহিত্য মন ও মানসতা*, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা

২৯. জীনাত ইমতিয়াজ (২০০১)। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা

৩০. তপোধীর ভট্টাচার্য (২০০০)। *অদ্বৈত মল্লবর্মণ*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

৩১. দিলীপ দাস (২০১৪)। *তিতাসের অদ্বৈত একটি নদী-নিবিড় উপন্যাসের রূপকল্প সন্ধান*, বুক ওয়ার্ল্ড, কলকাতা

৩২. দেবীপদ ভট্টাচার্য (২০১৮)। *উপন্যাসের কথা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৩৩. দেবযানী ভৌমিক চক্রবর্তী (২০১৪)। তুলনার প্রেক্ষিতে বঙ্কিম-রবীন্দ্র উপন্যাসে নারী-মনস্তত্ত্ব, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

৩৪. নাজমা জেসমিন চৌধুরী (১৯৮০)। *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৩৫. ফজলুল হক সৈকত (সম্পা. ২০১৭)। *কথাশিল্পী আবু ইসহাক*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা

৩৬. ফজলুল হক সৈকত (২০০৮)। সরদার জয়েনউদ্‌দীনের কথাসাহিত্য: সমাজ ও সমকাল, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা

৩৭. ফরিদা সুলতানা (১৯৯৯)। *বাংলাদেশের উপন্যাসে জীবন চেতনা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৩৮. বদিউর রহমান অনু.(২০১১)। *উপন্যাসের যত বিষয়*, পলল প্রকাশনী, ঢাকা

৩৯. বিনয় ঘোষ (২০০৯)। *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, প্রকাশ ভবন, কলকাতা

৪০. বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০০৯)। *বাংলাদেশের সাহিত্য*, আজকাল, ঢাকা

৪১. মনসুর মুসা (২০০৮)। *পূর্ব বাঙলার উপন্যাস*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা

৪২. মল্লিকা সেনগুপ্ত (২০২০) *স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ*, আনন্দ, কলকতা

৪৩. মঞ্জু সরকার (২০১৪)। *নারী-উপন্যাসের শৈলীবিচার*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৪৪. মহীবুল আজিজ (২০০২)। *বাংলাদেশের উপন্যাসে গ্রামীণ নিম্নবর্গ*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা

৪৫. মালেকা বেগম (২০১৩)। *বিপন্ন নারী*, মুক্তধারা, ঢাকা

৪৬. মালেকা বেগম (২০১৬)। নারীমুক্তি আন্দোলন, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৪৭. মাসুদুজ্জামান (২০১৮)। *পুরুষতন্ত্র ও যৌন রাজনীতি*, পাঞ্জেরি পাবলিকেশন লি. ঢাকা

৪৮. মাসুদুজ্জামান, বরেন্দু মণ্ডল সম্পা.(২০১৩)। *সেলিনা হোসেনের কথাসাহিত্য দেশ কাল জাতি*, লেখা প্রকাশ, ঢাকা

৪৯. মিল্টন বিশ্বাস (১৯৯৬)। *শওকত আলী ও সেলিনা হোসেনের উপন্যাস*: প্রসঙ্গ রাজনীতি, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৫০. মিল্টন বিশ্বাস (২০০৯)। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে নিম্নবর্গের মানুষ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৫১. মুহাম্মদ ইদ্‌রিস আলী (১৯৮৮)। আমাদের উপন্যাসের বিষয়-চেতনা বিভাগোত্তরকাল, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৫২. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান (২০১৬)। *গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৫৩. মুনতাসীর মামুন অনু. (২০০০)। *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ*, সুবর্ণ, ঢাকা

৫৪. মোঃ মেহেদি হাসান (২০০৮)। *বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের জীবন(১৯৭১-২০০০)*, মনন প্রকাশ, ঢাকা

৫৫. মো. আশরাফুল ইসলাম (২০১৬)। *শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণির জীবন-রূপায়ন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৫৬. মোসা. শামসুন নাহার (২০১৬)। উপন্যাসে প্রাচীন বাংলা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৫৭. মোস্তাফা মোহাম্মদ (২০১০)। *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস কথাসাহিত্যে জীবনও সমাজ*, নান্দনিক, ঢাকা

৫৮. মোহাঃ সাইদুর রহমান (২০১১)। *আমাদের তিন ঔপন্যাসিক*, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা

৫৯. মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ (সম্পা.) (২০১৯)। *শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের কাশবনের কন্যা লৌকিক জীবনের গাথা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

৬০. মোহাঃ সাইদুর রহমান (২০১১)। *আমাদের তিন ঔপন্যাসিক*, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা

৬১. যশোধরা বাগচী (২০১২)। *নারী ও নারীর সমস্যা*,অনুষ্টুপ, কলকাতা

৬২. রফিকউল্লাহ খান (২০০৯)। *বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

৬৩. রণেশ দাশগুপ্ত (২০১২)। *উপন্যাসের শিল্পরূপ*, প্যাপিরাস, ঢাকা

৬৪. রামশরণ শর্মা (২০১৬)। *আদি মধ্যযুগের ভারতীয় সমাজ সামন্ত-প্রক্রিয়া বিষয়ে এক সমীক্ষা*, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাসোয়ান লিমিটেড, কলকাতা

৬৫. রাশিদা আখতার খানম (২০১৮)। নারীবাদ ও দার্শনিক প্রেক্ষাপট, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

৬৬. রিজিয়া রহমান (২০১৭)। *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস১*,ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা

৬৭. রিজিয়া রহমান (২০১৭)। *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস২*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা

৬৮. শওকত ওসমান (২০১১)। *জননী*,সময় প্রকাশ, ঢাকা

৬৯. শওকত আলী (২০১৬)। *প্রদোষে প্রাকৃতজন*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা

৭০. শহীদ ইকবাল (২০১৬)। *বাংলাদেশের সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা

৭১. শহীদ ইকবাল (১৯৯৭)। *কথাশিল্পী আখতারুজ্জামান ইলিয়াস*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা

৭২. শান্তনু কায়সার (২০১৪)। *জন্ম শতবর্ষে অদ্বৈত মল্লবর্মণ জীবন*, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, সোপান, কলকাতা

৭৩. শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম (২০১৬)। *কাশবনের কন্যা*, বিভাস, ঢাকা

৭৪. শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম (১৩৬৮ব.)। কাঞ্চনমালা,ওসমানিয়া বুক ডিপো, ঢাকা

৭৫. শহীদুল্লা কায়সার (২০১৭)। সারেং বৌ, চারুলিপি প্রকাশন, ঢাকা

৭৬. শহীদুল্লা কায়সার (২০১৭)। সংশপ্তক, চারুলিপি প্রকাশন,ঢাকা

৭৭. শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম (১৩৬৮ব.)। *কাঞ্চনমালা*, ওস্‌মানিয়া বুক ডিপো, ঢাকা।

৭৮. শামসুদ্দিন চৌধুরী (২০০৭)। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর সাহিত্যে প্রতীচ্য প্রভাব*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

৭৯. সরদার জয়েনউদ্দিন (১৩৬৫ব.)। *পান্নামোতি*, ওসমানিয়া বুক ডিপো, ঢাকা

৮০. সরিফা সালোয়া ডিনা (২০১৮)। শহীদুল্লা কায়সারের উপন্যাস বিচিত্র বীক্ষণ, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

৮১. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০০)। *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৮২. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (২০১৬)। *জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও জনগণের মুক্তি*, সংহতি, ঢাকা

৮৩. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (সম্পা.) (২০১৭)। শওকত ওসমান জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৮৪. সেলিনা হোসেন ও বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পা.২০০৮)। *জেন্ডার আলোকে সংস্কৃতি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

৮৫. সেলিনা হোসেন, *জলোচ্ছ্বাস*, মুক্তধারা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৩

৮৬. সেলিনা হোসেন, *নীল ময়ূরের যৌবন*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮২

৮৭. সেলিনা হোসেন, *চাঁদবেনে*, সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৪

৮৮. সেলিনা হোসেন (২০২০)। *উপন্যাস ত্রয়ী*, পাঞ্জেরী প্রকাশ, ঢাকা

৮৯. সেলিনা হোসেন (২০১৯)। *রচনাবলি ১*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা

৯০. সৈয়দ আকরম হোসেন ও সিরাজ সালেকীন (সম্পা.২০০৮)। *বাংলা উপন্যাসে নদী-চর ও দ্বীপ জীবন*, জ্ঞানজ্যোতি প্রকাশনী, ঢাকা

৯১. সৈয়দ শামসুল হক (২০০২)। *উপন্যাস সমগ্র৫*, অন্য প্রকাশ, ঢাকা

৯২. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (২০১৬)। *উপন্যাস সমগ্র*, প্রতীক প্রকাশ, ঢাকা

৯৩. সৈয়দ আবুল মকসুদ (২০০৮)। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর জীবন ও সাহিত্য*, মনন, ঢাকা

৯৪. সৌদা আখতার (২০০১)। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর লালসালু ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৯৫. হরিশংকর জলদাস (২০০৮)। *নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাস ও কৈবর্তজনজীবন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৯৬. হাসান আজিজুল হক (২০১৩)। *কথাসাহিত্যের কথকতা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

৯৭. হাসান অরিন্দম (২০১৯)। *বাংলার লোকজীবন ও আবু ইসহাকের কথাসাহিত্য*, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা

৯৮. হোসনে আরা (২০১৮)। *মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যে আদিবাসী জীবন*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা

৯৯. Engles (1970)|*letter of Joseph Blochin Marx and Engels Selected Corrspondence*

১০০. G.M.Trevelyan (1948) *English Social History*, London

১০১. HENRIK IBSEN (1880) *A DOLL'S HOUSE,* 26 PATERNOSTER SQUARE, LONDON

১০২. John Steinbeck (1939) *The Grapes of Wrath*, The Viking press, United States

সহায়ক প্রবন্ধঃ

১. অমলকুমার মণ্ডল, 'লোকসংস্কৃতির আলোয় অদ্বৈতের তিতাস' উৎপল ভট্টাচার্য সম্পা. (১৪২১ব.) কবিতীর্থ, কলকাতা

২. আবুল আহসান চৌধুরী (২০১৯)'*কাশবনের কন্যা*ঃ চকিত অবলোকন' মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ্ [সম্পা.] *কাশবনের কন্যা লৌকিক জীবনের গাথা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

৩. আনিসুজ্জামান, 'পুরোনো বাংলা সাহিত্যে নারী সম্পর্কিত ধারণা, সেলিনা হোসেন, বিশ্বজিৎ ঘোষ ও মাসুদুজ্জামান সম্পা.(২০০৩)। *নারীর ক্ষমতায়ন: রাজনীতি ও আন্দোলন*, মাওলা ব্রার্দাস,ঢাকা

৪. জামরুল আহসান বেগ (২০০৭)‘সূর্য-দীঘল বাড়ি:বৃত্ত ভাঙার সীমিত প্রয়াস’, ফজলুল হক সৈকত’ [সম্পা.] *কথাশিল্পী আবু ইসহাক*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা

৫. প্রথমা রায়মণ্ডল (২০১৩)‘সেলিনা হোসেনের কথাসাহিত্য একটি নিবিড় সমীক্ষণ’ মাসুদুজ্জামান, বরেন্দু মণ্ডল [সম্পা.] *সেলিনা হোসেনের কথাসাহিত্য দেশ কাল জাতি*, লেখা প্রকাশ, ঢাকা

৬. বিকাশকান্তি মিদ্যা (২০১৩) ‘নীল ময়ূরের যৌবন: ভাষা আন্দোলন ও স্বদেশিকতার শিকড় সন্ধান মাসুদুজ্জামান, বরেন্দু মণ্ডল [সম্পা.] *সেলিনা হোসেনের কথাসাহিত্য দেশ কাল জাতি*, লেখা প্রকাশ, ঢাকা

৭. বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০১৯) ‘*কাশবনের কন্যা*: নারীর মুখ’মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ্ [সম্পা.] *কাশবনের কন্যা লৌকিক জীবনের গাথা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

৮. বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০০৮)‘তিতাস একটি নদীর নাম: জল ও জীবনের বিকল্প নন্দন’ সৈয়দ আকরম হোসেন ও সিরাজ সালেকীন [সম্পা.] *বাংলা উপন্যাসে নদী-চর ও দ্বীপজীবন*, জ্ঞানজ্যোতি প্রকাশনী, ঢাকা

৯. মাসুদ পারভেজ (২০১৭)‘রিজিয়া রহমানের *একাল চিরকাল*’ চন্দন আনোয়ার [সম্পা.] *গল্পকথা রিজিয়া রহমান সংখ্যা*, রাজশাহী

১০. মিল্টন বিশ্বাস (১৯৯৫) ‘সেলিনা হোসেনের উপন্যাস: রাজনীতি চেতনা, মনসুর মুসা[সম্পা.] উত্তরাধিকার, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

১১. মিল্টন বিশ্বাস (২০১৭) ‘নারীর নিরাশ্রয়তা ও বিপন্নতার আখ্যান’ চন্দন আনোয়ার [সম্পা.] *গল্পকথা রিজিয়া রহমান সংখ্যা*, রাজশাহী

১২. মহীবুল আজিজ (২০০০)‘বাংলাদেশের উপন্যাসে নারী: প্রেক্ষাপট-গ্রামীণ নিম্নবর্গ’, সৈয়দ আনোয়ার হোসেন [সম্পা.] উত্তরাধিকার, ঢাকা

১৩. মোস্তাফা মোহাম্মদ (১৯৯৭) ‘আখতারুজ্জামান ইলিয়াস: জীবন ও সমাজচিত্র’, সৈয়দ আনোয়ার হোসেন [সম্পা.] উত্তরাধিকার, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

১৪. মেহেরুন্নেছা, আবুল বারকত [সম্পা.] Bangladesh Journal of political Economy: vol. 24, No. 1&2, 2009,p.580

১৫. যতীন সরকার (২০০৮)‘বাংলার লোকসমাজে পুরুষতন্ত্র ও নারীচেতনা’ সেলিনা হোসেন ও বিশ্বজিৎ ঘোষ [সম্পা.] *জেন্ডার আলোকে সংস্কৃতি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

১৬. রাশিদ আসকারী (২০২১)‘প্রদোষে প্রাকৃতজন:একটি বিকল্প পঠন’ হাবীবুল্লাহ সিরাজী [সম্পা.] *উত্তরাধিকার, নতুন অভিযাত্রা১০*, বাংলা একাডমি, ঢাকা

১৭. শওকত আলী (১৯৯৮) মীথ, ‘তৃণমূলে যাবার এক পথ’, আনু মহম্মদ [সম্পা.] *তৃণমূল আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা*, ঢাকা

১৮. শহীদ ইকবাল (২০১৩)‘জলোচ্ছ্বাসের করাল কণ্ঠস্বর’ মাসুদুজ্জামান, বরেন্দু মণ্ডল [সম্পা.] *সেলিনা হোসেনের কথাসাহিত্য দেশ কাল জাতি*, লেখা প্রকাশ, ঢাকা

১৯. শিরীণ আখতার (২০০৭)‘আবু ইসহাক ও তাঁর সূর্য-দীঘল বাড়ি’ ফজলুল হক সৈকত [সম্পা.] *কথাশিল্পী আবু ইসহাক*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা

২০. শেখ রজিকুল ইসলাম (২০০৭)‘আবু ইসহাকের উপন্যাস–সমাজ-বাস্তবতার নিরাবেগ উপস্থাপন’ ফজলুল হক সৈকত [সম্পা.] *কথাশিল্পী আবু ইসহাক*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা

২১. সৌমিত্র লাহিড়ী (২০১৭)‘ধবল জ্যোৎস্না: স্বপ্ন-দুঃস্বপ্নের আদিম আখ্যান’ চন্দন আনোয়ার [সম্পা.] *গল্পকথা রিজিয়া রহমান সংখ্যা*, রাজশাহী

২২. হান্নানা বেগম (২০১১) আবুল বারকত [সম্পা.] *Bangladesh Journal of political Economy*: vol. 27, No1&2, pp.029-030.

২৩. হোসনে আরা (২০১১)‘সূর্য-দীঘল বাড়ি : অপরাজেয় জীবনালেখ্য’, সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

২৪. হোসনে আরা (২০১২) ‘পদ্মার পলিদ্বীপ : চর-অঞ্চলের জীবনের মানচিত্র’, কলা অনুষদ পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সহায়ক ইংরেজি প্রবন্ধের তালিকা:

১. Limning the Unheard Voices: A Subaltern Reading of India Goswami's *The Blue-necked God,*Prosenjit Ghosh, Galaxy: International Multidisciplinary Research Joural, Vol.13, june 2022

২. SUBALTERNITY IN AMITAV GHOSH'S SEA OF POPPIES : REPRESENTATION OF INDIAN WOMEN'S STRUGGAINST PATRIARCHY, Sophia KiKi Artanti, Mamik Tri Wedati, Prosodi, Vol.14,2020

৩. REINTERROGATING PATITION VIOLENCE: VOICES: VOICES OF WOMEN/CHILDREN/ DALITS IN INDIA'S PARTITION, PAOLA BACCHETTA, Vol.26,20

তৃতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নিম্নবর্গের নারীর অর্থনৈতিক অবস্থান

ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের (১৭৬০) পরবর্তীকাল থেকে সেখানকার মেয়েদের কর্মজগতে প্রবেশের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায়। কলকারখানার নারী-শ্রমিকের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকলেও লিঙ্গগত বৈষম্যের শিকার হওয়া অবধারিত ছিল; তবু তারা থেমে থাকেনি, সব বাধাকে উপেক্ষা করে সামনে এগিয়ে চলেছে। মজুরির বৈষম্যকে কেন্দ্র করে পশ্চিমা নারী কর্মীরা প্রথম সংঘবদ্ধ হয়ে আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল। মজুরির সমতা থেকে শুরু করে ক্রমশ লিঙ্গসমতার দাবি নিয়ে সুদীর্ঘ পথপরিক্রমায় সফলতা অর্জন করে তারা। যদি এদেশীয়ও নারীর কর্মজগতে প্রবেশের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কালসূচক কোনো চিহ্ন নেই। বাংলাদেশের উচ্চবর্গের সমাজে নারীদের মধ্যে জীবিকাবহির্ভূত গার্হস্থ্য জীবনযাপনই পুরুষতন্ত্রের একান্ত কাম্য। জন্ম থেকে একজন কন্যাশিশুকে সেভাবেই বড় করা হয়। অন্যদিকে নিম্নবর্গের পরিবারের নারীদের ক্ষেত্রে জীবিকার সঙ্গে যুক্ত থাকাটা অনেকটা বাধ্যতামূলক শর্ত ছিল বহুক্ষেত্রে। শুধু সমাজ ইতিহাসেই নয়, সাহিত্যেও এর প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য মেলে। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদে শবরী, ডোম্বী প্রমুখ নারীর জীবিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার প্রাসঙ্গিকতা মেলে। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* -এ গোপবালাদের দধি-দুধের পসরা নিয়ে হাটে যাওয়ার প্রথার কথা জানা যায়। মধ্যযুগীয় মঙ্গল কাব্যগুলোতে অন্তেবাসী নারীদের স্বামীর সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের কাজে যুক্ত থাকার প্রাসঙ্গিকতা পাওয়া যায়।

১.

পুরুষতন্ত্রের স্বার্থে গৃহকেই নারীর প্রধান কর্মস্থল হিসেবে অনাদি কাল থেকে বিবেচনা করা হয়ে আসছে। নারী তার দ্বিতীয় কর্মক্ষেত্র অর্থাৎ উপার্জনের জন্য কর্মস্থলে গমনের ছাড়পত্র তখনই পেতে পারে, যখন গৃহের দায়দায়িত্ব সম্পাদনে কোথাও তার ঘাটতি থাকে না। লক্ষ রাখতে হবে, ব্যক্তিপুরুষ অথবা পরিবারের দিক থেকে নারী যেখানে কর্মজীবনে প্রবেশের অনুমতি পেয়েছে, সেখানে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কাজ করেছে অপর পক্ষের স্বার্থে। সংসারের ব্যয়ভার বহনে অক্ষম পুরুষ অনেক সময় বাধ্য হয়েছে নারীকে বহির্গমনের সম্মতি দিতে। সংসারের প্রয়োজন গুরুভার হলে নারী-পুরুষ উভয়ের জীবিকাগ্রহণ অনিবার্য হয়েছে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রের দায় দুজনের হলেও সংসার

পালনের দায়িত্ব একতরফাভাবে নারীর উপর বর্তানোর কারণে তার জীবিকার পথ ব্যাহত হয়েছে। অর্থনৈতিক পরাধীনতা নারীজীবনকে কতটা অবদমিত করে নারীবাদী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তার সারাৎসার ধরা পড়ে। অর্থনীতিবিদ ও গবেষকগণের মতে নারীর অবদানকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। এর মধ্যে একটি হলে মজুরির বিনিময়ে টাকা বা টাকার বিনিময়ে স্বনিয়োজিত শ্রমদান, যা জিডিপি হিসেবে যুক্ত হয়। দ্বিতীয়ত, মজুরিবিহীন পারিবারিক কাজ, যা জাতীয় হিসেবে যুক্ত হয় না। তৃতীয়ত, নারীর গৃহস্থালি কাজ, যা বাজারজাত করা যায় না; আবার শ্রমশক্তি হিসেবেও গণ্য হয় না।

১.১

'সমাজ ও অর্থনীতি কখনোই অনড় অচল থাকতে পারে না। তার মধ্যে সব সময়ই পরিবর্তনের সূত্রসমূহ কাজ করে চলে। এই পরিবর্তন কখনো হয় ধীরে, কখনো দ্রুত। যেভাবেই পরিবর্তনগুলো ঘটুক না কেন সেগুলো একসময় দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে উঠে।' (আনু, ২০১৮ : ১২৫) তেমনিভাবে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে নারীর অবস্থার পরিবর্তন তার জীবনের অতি আব্যশিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের সমাজ-অর্থনীতির ক্ষেত্রে যা একটি মৌলিক অনুষঙ্গ। পুরুষতান্ত্রিক প্রথার নিয়মতান্ত্রিক অধ্যায় হিসেবে নারীর নিয়মিত পেশা প্রায় অনুপস্থিত। বাংলাদেশের গ্রামীণ এবং প্রান্তিক সমাজ প্রধানত পুরুষশাসিত। সেখানে নারী তুলনামূলকভাবে অন্তরালে থাকে, তবে সম্পূর্ণরূপে চারদেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। তারা গৃহের অভ্যন্তরে নিত্যনৈমিত্তিক গৃহকর্মের পাশাপাশি ধনী পরিবারের গৃহভৃত্য বা ফসল কাটার মৌসুমে ভাড়াটে মজুর হিসেবে কাজ করে থাকেন। নারীর কাজ চারদেয়ালে সীমাবদ্ধ না থাকলে এর কোনো মজুরি নেই। নারীর শোষণ দুইভাবে হয়ে থাকে একটি যৌন শোষণ, অপরটি অর্থনৈতিক শোষণ। সমাজে নারীর অবস্থান দুর্বল বলেই তাদের উপর অর্থনৈতিক শোষণটি প্রচ্ছন্ন থাকে, নারীরা অসহায় বলেই তাদের ওপর পীড়নটি বেশি হয়।

১.২

নারীর ক্ষমতায়ন আসলে সামগ্রিক জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত হতেই হবে। কারণ, এ দেশের জন্মই হয়েছিল নারী-পুরুষনির্বিশেষে দেশের সবার উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। যে আকাঙ্ক্ষার মর্মবস্তু হলো বৈষম্যহীন অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা এবং অসাম্প্রদায়িক মানসকাঠামো সৃষ্টি। উন্নয়ন মানে শুধু মাথাপিছু গড় আয় বৃদ্ধি নয়; উন্নয়ন অর্থে আমরা মানব উন্নয়ন বা মানবিক উন্নয়নকে বুঝে থাকি। জনসংখ্যার অর্ধেক যে নারী, তাকে অন্ধকারে রেখে কোনো উন্নয়ন সম্ভব নয়। একই সঙ্গে তা সাংবিধানিক চেতনার সঙ্গেও সাযুজ্যপূর্ণ নয়। মানবিক উন্নয়নের যে পথরেখা, তা নারীর জন্য কখনো স্বীকৃত ছিল

না; তাই নারী সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া আর দরিদ্র একটি শ্রেণি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশের সমাজবাস্তবতা সব সময় পিতৃতান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণা দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় নারীর প্রকৃত উন্নয়ন কখনোই ঘটেনি। এ দেশের নারী প্রথমত, নারী হিসেবেই বঞ্চিত হয়, দ্বিতীয়ত নারী দরিদ্র মানুষ হিসেবে বঞ্চিত হয়। তাই এদেশের নারীর প্রকৃত অবস্থা অনুধাবনের জন্য জরুরি হলো আর্থ-সামাজিক শ্রেণি অবস্থান জানা। এই কারণেই নারীর অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়িত হওয়ার ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক শ্রেণিগত বিন্যাস সম্পর্কে গুরুত্ব দেয়া জরুরি।

১.৪

নারীকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করতে রাষ্ট্রকে সরাসরি অনেকগুলো দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। দরিদ্র নারীকে সংগঠিত করে প্রশিক্ষিত করার ব্যবস্থা করতে হবে; যার মধ্য দিয়ে নারী অর্থনীতির মূল ধারায় সম্পৃক্ত হতে পারে। নারীর অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসাসহ সকল চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন সুনিশ্চিত করতে নারীর স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, জীবনব্যাপী শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, তথ্য, উপার্জনের সুযোগ, উত্তরাধিকার, অর্জিত সম্পত্তির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেয়া ও সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা। বিশ্ববিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের মতে, নারী যখন এগিয়ে যায়, তখন পরিবার, সমাজ এবং দেশও এগিয়ে যায়। নারীর অগ্রযাত্রাকে শ্লথ করে, বাধা দেয় এমন যা কিছু, তা শুধু নারীকে নয়, দেশের অগ্রগতিকেও ব্যাহত করে (হান্নানা, ২০১০ :৩৩)। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের আজ যে অগ্রগতি, তা সম্ভব হয়েছে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতিতে নারীর ব্যাপক হারে সম্পৃক্ততার কারণে। আবার এর উল্টো পিঠে রয়েছে নারীর অসহায়ত্বের, বঞ্চনার, বৈষম্যের আর নির্যাতনের ছবি; যা নারীর অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রা আর উন্নয়নের অপার সম্ভাবনার বিপরীতে তৈরি করছে বন্ধুর সব পথের প্রতিবন্ধকতার পাহাড়।

১.৫

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন তার সামগ্রিক ক্ষমতায়নের পূর্বশর্ত, তবে একমাত্র শর্ত নয়। একই সঙ্গে তার রাজনৈতিক ক্ষমতায়, সামাজিক সুবিধাদি প্রাপ্তি-উদ্ভূত ক্ষমতায়ন এবং ব্যক্তিগত সুরক্ষা-সংশ্লিষ্ট ক্ষমতায়ন। এই সমস্ত ক্ষমতায়নে প্রধান অগ্রাধিকার দিতে হবে দরিদ্র-বিত্তহীন-প্রান্তস্থ নারীকে। তা না হলে শুধু অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন অর্জন হবে না, আবার অর্জন হলেও তা স্থায়ী হবে না। এর পাশাপাশি, সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনে নারীকে প্রচলিত গার্হস্থ্য বলয়ের বাইরে যেতে

হবে। বাইরের পরিবেশে কাজ করার সুযোগ ও নিরাপত্তা তৈরি করতে হবে। বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত নারীদের পিছিয়ে পড়ার বড় কারণ দারিদ্র্য; তার সাথে আছে, সামাজিক নানা ধরনের কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামিসহ, বিভিন্ন অনুশাসন; তার পাশাপাশি নারীর বিবাহ ও বিবাহজনিত নানাবিধ সমস্যা। যেমন : যৌতুকসহ, শারীরিক ও মানসিক বিভিন্ন নির্যাতন স্বামী ও স্বামীর পরিবার কর্তৃক। যন্ত্রণাকর এই সমস্ত পরিবেশ থেকে নারী বের হয়ে না আসতে পারারও বড় কারণ দারিদ্র্য। ধর্মীয় কুসংস্কার ও ফতোয়ার দ্বারা নারীর স্বাধীন গতিপথকে অবরুদ্ধ করা হয়। এই সমস্ত পিতৃতান্ত্রিক প্রথার নিগড় ভেঙে নারীকে দৃপ্ত পদচারণায় মুখর হতে অনেক প্রতিবন্ধকতা পাড়ি দিতে হয়। বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত, অর্থনীতি-সমাজ-রাষ্ট্রব্যবস্থায় নারীকে দাঁড় করাতে মূলধারার অর্থনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি শিক্ষা ও তথ্য প্রবাহের দ্বারা নারীকে আত্মসচেতন, আত্মবিশ্বাসী ও আত্মপ্রত্যায়ী করে গড়ে তুলতে হবে (মেহেরুন্নেছা, ২০১০ : ৫৮৪-৫৮৫)।

২.

বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এই পরিপ্রেক্ষিতে *তিতাস নদীর নাম* উপন্যাসের আলোকে কৌমজীবনাবদ্ধ মালো নারীর অর্থনৈতিক সংশ্লেষের রূপরেখা নির্মাণ গবেষণার পরবর্তী অভিপ্রায়। অদ্বৈত মল্লবর্মণ মালোজীবনের আদ্যোপান্ত ইতিহাস তুলে ধরার প্রচেষ্টায় জীবনসূত্রের কোনো রূপকে অস্পৃশ্য রেখে যাননি। তাঁর উপন্যাসের নারীরাও সামাজিক জীব, তাদের জীবন ও অর্থনীতির অমোঘ সুতায় বাঁধা। গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের অবশ্যম্ভাবী নিয়মে পুরুষেরা যেমন মাছ ধরতে জাল-নৌকা সঙ্গী করে নদীর বুকে ভেসে চলে, তেমনি তাদের ঘরের নারীরা শুধু গৃহকর্ম আর সন্তান লালন-পালনের মধ্যে দিনাতিপাত করে না; বরং তারা যথার্থ নর্ম সহচারী হয়ে পুরুষের সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম করে। পুরুষের মাছ ধরতে যাওয়ার প্রারম্ভিক কাজ তারাই সম্পন্ন করে থাকে। ঔপন্যাসিকের বয়ানে তার চিত্র নিম্নরূপ :

> তিন বউ সারারাত সুতা কাটিয়া শেষরাতে শুইয়াছিল। অল্প একটু ঘুমাইতেই কালোবরণের জালে যাওয়ার সময় হইল। ...উঠিয়া কেউ তামাক টিকার ডিবা, কেউ মনসা, খলুই জালের পঁটুলি হাতে নিয়া বাহির হইয়া পড়ে। ...কালোর মা যতদিন বাঁচিয়া আছে এইসময় বউদের উঠিতেই হইবে। সকল বাড়ির বউদের আগে কালোর বাড়ির বউদের স্নান করিয়া আসা চাই । (অদ্বৈত, ২০১৫ : ৪৪৭)

এই প্রাত্যহিকতা শুধু কালোবরণদের বাড়ির নয়, তিতাস-তীরের সমস্ত জেলে নারীর জীবন একই সুতায় গাঁথা। নানান রকম সাংসারিক কাজের মধ্য যদি একটু সময় পায়, তাহলে তাদের নানা রকম সুতা কেটে, জাল বুনন করে প্রস্তুত রাখতে হয়, যেন প্রয়োজনের সময় সহজেই হাতে পেতে পারে।

এই মহাকাব্যিক আখ্যানে বিভিন্ন জীবন-পরিপ্রেক্ষিতের নারীর সন্ধান পাওয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীর প্রচলিত জীবনগাঁথা লক্ষ করা যায়; বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, এই সমস্ত নারীরা সামাজিক ও ধর্মীয় বিভিন্ন সংস্কারে আবদ্ধ। এই নারীদের মধ্যে যেমন আছে বাসন্তী, অনন্তর মা আর উদয়তারার মতো মুখ্য চরিত্রের নারীরা ; তেমনি আছে গৌরাঙ্গসুন্দরের বউ, সুবলের মা, বাঁশিরামের স্ত্রী, কালোর মা প্রভৃতি অপ্রধান সব চরিত্রে নারীরা। তারা সবাই মালোসমাজকে ধারণ করে, বহন করে এবং প্রতিনিধিত্ব করে।

২.১

গল্প বলতে বলতে, লেখককে দেশ-কালের সীমানা পার হয়ে যেতে হয়; তাকে হতে হয় সমাজের প্রতিনিধি। সেই সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে যখন নারীকে দেখা যায়; তখন সেই পরিচিত বাস্তবের অন্তরালে থাকে অন্য এক বাস্তবতা। অর্থনৈতিক শোষণের ইতিহাসে তারা সমাজ থেকে পিছিয়ে পড়েছে; অথচ এই সমাজের বিনির্মাণের পটভূমিকায় তাদের শ্রমের, ঘামের সুলুক সন্ধান আজও যথার্থরূপে হয়নি। মালো নারী এই সামাজিক পরিপত্রের বাইরে নয়। মালোপুরুষের মতো হয়তো তারা তিতাসের বুক চিরে মৎস্যসম্পদ আহরণ করে না। মালো নারীরা পুরুষের সঙ্গে মৎস্য আহরণ করতে না গেলেও সকল প্রস্তুতিতে তাদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ অনিবার্য। ঔপন্যাসিকের বয়ানে তার বিবরণ নিম্নরূপ :

> মালো নারীরা জালের সূতা কাটে, সংসার সামলায়, সন্তান লালন-পালন করে। পারিবারিক জীবনে একজন মালো নারী, একজন মালো পুরুষেরই সমান পরিশ্রম করে। পরিবারের প্রাত্যহিকতায় চোখে পড়ে মালোনারীর দৈনন্দিন জীবন:জেলে রমণীর ঘরে থাকিবে কাটা আ-কাটা সূতা, এক একখানা অসমাপ্ত জাল আর সূতাকাটার নানা কিসিমের সরঞ্জাম। এই যদি না রহিল তো জেলেনীর ঘর আর কায়স্থনীর ঘরে তফাৎ রহিল কোথায়। (অদ্বৈত, ২০১৫ : ৪৪৮)

জেলেনীদের ঘর-সংসার এভাবেই চলে; গৃহকর্মের বাইরে হেলায় কাটানোর মতো কোনো সময় তাদের থাকে না। জেলে সমাজের সর্বাপেক্ষা কর্মকৌশলী নারী কালোর মা। কালোর মার সময়ের দাম অনেক, হাসি-ঠাট্টায় সে কারো সঙ্গে ব্যস্ত সময় পার করে না। কালোর মার এই কর্মস্পৃহায় দরিদ্র জেলে নারীদের কাজের সুযোগ হয়েছে। ‘কালোর মা কেবল কাজের তাগিদ দিতে জানে, কাজের পথ দেখাইতে জানে না! কাজের পথ যে জন দেখাইয়া গেল সে সুব্‌লার বউ।’(অদ্বৈত, ২০১৫ : ৪৪৭) সুব্‌লার বউ বাসন্তী। সে অনন্তর মাকে ভালোবেসেছে সখী হিসেবে, বন্ধু হিসেবে। অচেনা-আজানা

একটি পরিবেশে বেঁচে থাকার, টিকে থাকার সমস্ত আনুকূল্যজাত পথ নির্ধারণ করে দিয়েছে। উপার্জনের পথ দেখিয়ে বলেছে-

> দুপুরের পর সুবলার বউ কতকগুলি সূতা কাটার হাতিয়ার লইয়া হাজির হইল। সেগুলি মাটিতে নামাইয়া বলিল, 'এই নেও বড় টাকু, মোটা সূতার লাগি; এই নেও ছোট টাকু, চিকন সূতার ।... সাত দিনে চৌদ্দ 'নিড়ি' সূতা হইল। সাতটা মোটা সূতার, সাতটা সরু সূতার। মোটা এক টাকাও সরু দুই টাকা সের দরে একদিন কৈবর্ত্য পাড়ার লোক আসিয়া পরমাদরে কিনিয়া নিল । (অদ্বৈত, ২০১৫ : ৪৪৮-৪৪৯)

এভাবে বাসন্তীর আন্তরিক সহযোগিতায় অনন্তর মা পথ পেয়েছিল তার দিনযাপনের। বাসন্তী, অনন্তর মা ছাড়া অন্য জেলে নারীরা জেলে পুরুষের নিয়ে আসে মাছ বাজারজাতকরণের উপযোগী করে তোলে। মালো নারীর এই কর্মযোগ মালো পুরুষের অর্থনৈতিক প্রয়াসকে সচেষ্ট করে তোলে। এ-প্রসঙ্গে বিজিতকুমার দত্ত যথার্থই লিখেছেন-

> জীবিকার এই যৌথ প্রয়াস গ্রামীণ অর্থনীতির একটি বড় বৈশিষ্ট্য। অদ্বৈত এটা টের পেয়েছিলেন। তিনি কর্মক্ষম নারীর যে চিত্র এঁকেছেন তাতে শ্রম এবং মাধুর্য মিলে একটি সুন্দর রূপ ফুটে উঠেছে। (উদ্ধৃত, হরিশংকর, ২০০৮ : ১৯২)

নদীকে কেন্দ্র করে নর-নারীর সম্মিলিত যে জীবন প্রয়াস, তাতে জীবন-জীবিকা, সমাজ, অর্থনীতি খুঁটিনাটি সমস্ত কিছু এক বৃত্তাকারে ধরা পড়েছে। শ্রমজাত ব্রাত্যজীবনের ছবিগুলো কেবল তাদের স্বতন্ত্র প্রতিচ্ছবি হয়ে জীবনের আত্মপট রচনা করে গিয়েছে :

> ... নারীরা সূতা পাকাইবার জন্য উঠানে বাহির হয়। চোঙ্গার মতো মুখ একটা স্থায়ীভাবে মাটিতে পোঁতা থাকে। তার উপর সূতা-ভরা চরকি বসাইয়া দেয়। টেকোয় সূতা বাঁধিয়া উঠানের এ-কিনারা থেকে ও-কিনারায় পোঁতা একটি বড় খুঁটি বড়িয়া আনে। (অদ্বৈত, ২০১৫ : ৫০২)

অদ্বৈতের লেখনীর জালে মালোসমাজের আর্থ-সামাজিক সত্তার সামগ্রিক প্রেক্ষাপটকে ধরতে চেয়েছেন। নীরব ডুবুরি হয়ে লেখক তুলে ধরেছেন মালোপাড়ার গোষ্ঠীজীবনে নারীর আর্থ-সামাজিক অস্তিত্বের স্নায়ুশাখাগুলোকে। কারণ, মাছ ধরার জন্য যে জালের প্রয়োজন, তার সুতা কাটা, জাল বোনা ও প্রস্তুত করা-সমস্ত কিছুই সম্পন্ন করে মালো নারীরা।

৩.

নারীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা তাকে সামাজিকভাবেও তাকে দুর্বল করে তোলে। এই উপন্যাসে দরিয়াবিবির জীবনকে দুটি পর্বে দেখা যায়। প্রথম পর্ব তারই স্মৃতির আলোয় দেখা ঝাপসা অতীত।

যেখানে প্রথম স্বামীর পর মৃত্যু তার অল্প বয়সের সম্পূর্ণ নিরাপত্তাহীন জীবনপ্রেক্ষিত। মুসলিম পারিবারিক আইনের অপরিপক্বতায় সম্পদ থেকেও সে ও তার সন্তান বঞ্চিত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বের জীবনের স্বামীর সম্পদহীনতা ও অপরিণামদর্শিতা তাকে সবর্দা একটি নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে পরিচালনা করেছে। ভারতবর্ষের যে সামাজিক পরিমণ্ডল, যেখানে নারীর গৃহশ্রমের বাইরে অন্য কোথাও শ্রম-দান ও অর্থনৈতিক পরিবৃত্ত রচনা সম্ভবপর নয়। স্বামীর উপার্জনই নারীর একমাত্র আর্থিক অবলম্বন। নিম্নবিত্তের জীবনে প্রত্যেক নারী সংসারের সচ্ছলতার কথা ভেবে গৃহনির্ভর বিভিন্ন উপায়ে দুপয়সা বাড়তি সংগ্রহের চেষ্টা করে। দরিয়াবিবিও তার সংসারে জন্য সে রকম প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। দরিয়াবিবির সেই প্রচেষ্টায় আমরা দেখি পশুপালন তার নেশা ও পেশা। এখান থেকেই সে চেষ্টা করেছে সংসারে দুপয়সা জোগান দেওয়ার।

> অভাব-ছোঁওয়া সংসারে এই মূক পশুরাই তাদের সম্বল। গত বছর গোয়ালঘরে ছাগলের বাচ্চা হইয়াছিল। দুটিই গরুর গুঁতোয় মরিয়া যায়। তার পুনরাবৃত্তি আর না ঘটে। সেই ছানা দুটি থাকিলে এই বছর চড়া দামে বিক্রি হইত! (শওকত, ২০১১ : ২৪)

এই সম্বলটুকু কোনো কারণে হাতছাড়া হয়ে গেলে দরিয়াবিবির আক্ষেপের শেষ থাকে না। হতশ্রী এই অবস্থার কারণে দরিয়াবিবির আচরণে রুষ্টতাও বেড়ে যায়। এ বিষয়ে হাসান আজিজুল হকের অভিমত : *জননী* সার্থকতা প্রশ্নাতীত এখানেই যে সীমিত পরিসরে হলেও এই শতাব্দীর গ্রামগুলোর গঠন, অর্থনৈতিক বিন্যাস, হিন্দু ও মুসলমান দুই সমাজের বাস্তব ও সত্য সম্মিলিত জীবনযাপন, মানুষের দারিদ্র্যকে লেখক সততার সঙ্গে ছাপ ফেলেছেন (হাসান, ২০১৩ : ১৮)। লেখকের সততায় নির্মিত হয় সামাজিক বাস্তবতার চূড়ান্ত রূপ। দরিয়াবিবি মাতৃত্বকেন্দ্রিক নারীর যে সংগ্রাম-সংক্ষুব্ধতা তার বাস্তবোচিত প্রতিনিধি। বাৎসল্যের মোহে তাড়িত হয়ে সামর্থের সীমাকে অতিক্রম করেছে সে। স্বামী আজহারের মৃত্যুর পর সংসারের চরম দুরবস্থায় কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি হয়েও গ্রহণ করেছে মোনাদিরের লেখাপড়ার খরচ চালানোর দুঃসাধ্য দায়িত্বকে। এই সুযোগকে দুহাত ভরে নিয়েছে কামুক লালসায় উচ্ছ্বসিত ইয়াকুব। দরিয়াবিবিকে সংকটের তীরে দাঁড় করিয়ে অত্যন্ত সন্তর্পণে তার দীর্ঘদিনের অতৃপ্ত বাসনাকে আদায় করেছে। মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে ইয়াকুবের; তারপর দরিয়ার অব্যাহত নির্ভরতার সুযোগ নিয়েছে সে (ছন্দশ্রী, ২০০৯ : ৯৬)। আজীবন স্বাধীনচেতা, স্বনির্ভর, দরিয়াবিবির গর্বিত জীবনে ট্র্যাজেডির বীজ রোপিত হয় এভাবে। তার এই পরাজয়, এই আত্মহনন সবকিছু তার আর্থিক অপারগতার ফলশ্রুতি। এর পাশাপাশি নব্য পুঁজিবাদের উগ্র আগ্রসন ইয়াকুবদের মতো স্বার্থান্বেষী মানুষদের হাতে অগাধ অর্থের সমাগম ঘটিয়েছে। সেই অর্থ দুহাতে উড়িয়েছে তারা দরিয়াবিবির মতো অসহায় নারীদের ভোগ করার উদগ্র বাসনায়।

৪.

অর্থনৈতিক সক্ষমতায় অমৃত অন্যসব নারী অপেক্ষা আলাদা। সামাজিকভাবে সে নিম্নবর্গ অচ্ছুৎ হলেও অর্থনৈতিকভাবে সে ছিল পেশাদারি। পেশাদারিত্বের প্রকৌশলে সে নিম্নের হলেও সমাজে তার প্রয়োজন অপরিমেয়, তাই শ্রমের শেষ নেই তার। আর্থিকভাবে স্বাধীন হওয়ায় কলঙ্কিত জীবনের প্রতিবেশ তাকে আহত করেনি বা আবার আহত করার সুযোগ পায়নি। পরবর্তী জীবনে সান্তদের সঙ্গে তৈরি হওয়া ব্যবধান তাকে বেদনা বিদীর্ণ করলেও সে নিরাশ্রয় হয়নি। পান্নাকে নিয়ে তার ভাবনা ছিল অন্যরকম :

> জাত দায়িনীর মেয়ে হয়ে যদি একটু নষ্টিফষ্টিই না করলো তো করলোটা কি? বলি জাত দায়ানীর মেয়ের স্বভাবটা একটু এদিক ওদিক হয়ই। তা না হোলে সংসারটা চলে কি করে? এতো চিরকেলে কথা....অমৃত স্বপ্ন দেখতো জোত-জায়গা জমিদারীর মহারাণী হয়ে সিংহাসনে বসছে পান্না। কিন্তু সে সব স্বপ্ন ভেঙ্গেচুরে তচনচ করে দিল বিশু। (সরদার, ১৩৬৫ব. : ১৫৪)

ঔপন্যাসিক সমকালীন সমাজজীবনের ছবি আঁকতে গিয়ে সমাজস্থ মানুষের জীবন-জীবিকার প্রতিচ্ছবিকে বিশ্বাসযোগ্যতার প্রতিভাসে নির্মাণ করেছেন। লেখকের উদ্দেশ্য সমাজের জন্য নিবেদিত একটি পেশার মানুষকে কীভাবে শোষণ করা হয়, সাধারণত যেখানে বাঙালির আর্থিক জীবন-জীবিকার মান নিম্নবিত্তের। সেখানে নারীর জন্য বিশেষ কোনো জীবিকার ব্যবস্থা থাকে না। তার মধ্যে সেই পেশা যখন নারীকেন্দ্রিক, তখন তাকে অবরুদ্ধ করার কোনো উপায় থাকে না। দারিদ্র্য আর ধর্মশাসিত সমাজে নারীর ঘরের বাইরে কাজ করা অনুমোদিত নয়। যে নারীকে সমাজের প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতেও হয়, সমাজের প্রয়োজনে তাকে আবার শোষিতও হয়। যার কারণে তাকেও তার পরিবারকে হতে হয় অন্ত্যজ অস্পৃশ্য। এভাবেই অমৃত আর অমৃতের সন্তানের জীবন হয়েছে ধূলিসাৎ। সর্বোপরি পান্নামতি 'ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের নারী-বিলাসের কলঙ্কজনক কাহিনী, জারজ সন্তানের সামাজিক প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের চিত্র এ উপন্যাসের চরিত্র-চিত্রণে এবং ঘটনা-নির্বাচনে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেছে।' (মনসুর, ২০০৮ : ৬৭) পরিপ্রেক্ষিতের এই অববাহিকায় ব্যক্তিচেতনা মুখ্য হয়ে উঠতে পারেনি, বরং সমাজের অন্তর্দাহে ব্যক্তির বিনাশ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। সময়ই এখানে মুখ্য হয়ে উঠেছে। সামন্তবাদের অবক্ষয় নিম্নবর্গের জীবনের ইতিবাচক জীবনবোধকে ধূলিসাৎ করে ইছামতীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছে।

৫.

বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। এ দেশের বহুসংখ্যক মানুষের জীবিকা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে যন্ত্রশিল্পের আশারূপ কোনো প্রসার ঘটেনি। আবার কৃষি অর্থনীতি আকারে ক্ষুদ্র, প্রায় ব্যক্তি-উদ্যোগের ফল। ফলে গ্রামকেন্দ্রিক কৃষিনির্ভর অর্থনীতি চরিত্রে পূর্বের মতোই সামন্তবাদের বন্ধনকে সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করতে পারেনি (সাইদুর, ২০১১ : ১৭০)। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি রূপ আমরা প্রত্যক্ষ লালসালু উপন্যাসে। সামন্তবাদের আর এক হাতিয়ার ধর্ম, যা দিয়ে সহজেই মানুষকে নতজানু করা যায়। সমগ্র উপন্যাসের প্রত্যেকটি চরিত্র ধর্মীয় মোহগ্রস্ততায় আচ্ছন্ন হয়ে আর্থিকভাবে নিবীর্য হয়েছে। তাহেরের বাপসহ গ্রামের আরো সব পরিবার মজিদের এই ধর্মীয় হাতিয়ারের নিকট পরাভূত। সেখানে নারী তো আজীবনের শোষিত-বঞ্চিত সীমাহীন আকূল পারাবারের পথিক। উপন্যাসের সার্বিক পরিপ্রেক্ষিত এই আবহে নির্মিত। এই অর্থনৈতিক পরিসর নিম্নবিত্ত-বিত্তহীন মানুষকে আরো অধিক পরিমাণে অস্তিত্বহীন করে তোলে; নারী তার মধ্যে আলাদা নির্মিতি খুব কম ক্ষেত্রে নারী তার শ্রমের মূল্য পেয়ে থাকে, তা আবার নিজ গৃহের বাইরে যখন সে তার শ্রম বিনিয়োগ করে। যেমন হাসুনির মা বিধবা হওয়ার কারণে মজিদসহ গ্রামের অন্যান্য বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের গৃহকর্ম করেছে। যার মধ্য দিয়ে তার আর হাসুনির আহার্যের ব্যবস্থা হয়েছে।

৬.

রাষ্ট্রকে উন্নত হতে হলে নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন সামগ্রিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হতে হবে। কারণ এই দেশের জন্মই হয়েছিল নারী-পুরুষনির্বিশেষে দেশের সবার উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। যে আকাঙ্ক্ষার মর্মবস্তু হলো বৈষম্যহীন অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা এবং অসাম্প্রদায়িক মানসকাঠামো সৃষ্টি। জনসংখ্যার অর্ধেক যে নারী, তাকে অন্ধকারে রেখে কোনো উন্নয়ন সম্ভব নয়। একই সঙ্গে যা সাংবিধানিক চেতনার সঙ্গেও যা সাযুজ্যপূর্ণ নয়। মানবিক উন্নয়নের যে পথরেখা তা নারীর জন্য কখনো স্বীকৃত ছিল না ; তাই নারী সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া আর দরিদ্র একটি শ্রেণি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশের সমাজবাস্তবতা সব সময় পিতৃতান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণা দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় নারীর প্রকৃত উন্নয়ন কখনোই ঘটেনি। এ দেশের সমাজব্যবস্থায় নারী আসলে দু'দিক থেকে নিরন্তর বঞ্চনার শিকার হয়; প্রথমত, নারী হিসেবেই বঞ্চিত হয়, দ্বিতীয়ত নারী দরিদ্র মানুষ হিসেবে বঞ্চিত হয়। তাই এ

দেশের নারীর প্রকৃত অবস্থা অনুধাবনের জন্য জরুরি হলো আর্থ-সামাজিক শ্রেণি অবস্থান সম্পর্কে জানা। এই কারণেই নারীর অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়িত হওয়ার ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক শ্রেণিগত বিন্যাস সম্পর্কের প্রতি গুরুত্ব দেয়া জরুরি। এ প্রসঙ্গে অর্থনীতি গবেষকের মত :

> সমাজ ও অর্থনীতি কখনোই অনড় অচল থাকতে পারে না। তার মধ্যে সবসময়ই পরিবর্তনের সূত্র সমূহ কাজ করে। এই পরিবর্তন কখনো হয় ধীরে, কখনো দ্রুত। যেভাবেই পরিবর্তনগুলো ঘটুক না কেন সেগুলো একসময় দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে উঠে। (আনু, ২০১৭ : ১২৫)

এই পরিপ্রেক্ষিতে নারীর অবস্থার পরিবর্তন অতি আবশ্যিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে তার জীবনের জন্য। বাংলাদেশের সমাজ-অর্থনীতির যা একটি মৌলিক অনুষঙ্গ। বাংলাদেশের গ্রামীণ এবং প্রান্তিক সমাজ প্রধানত পুরুষশাসিত; সেখানে নারী তুলনামূলকভাবে অন্তরালে থাকে। তবে সম্পূর্ণরূপে চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। তারা গৃহের অভ্যন্তরে নিত্যনৈমিত্তিক গৃহকর্মের পাশাপাশি ধনী পরিবারের গৃহভৃত্য বা ফসল কাটার মৌসুমে ভাড়াটে মজুর হিসেবে কাজ করে থাকে। নারীর কাজ চারদেয়ালে সীমাবদ্ধ না থাকলে এর কোনো মজুরি নেই। এভাবে নারীকে নিত্যনৈমিত্তিক শোষিত হতে হয়। সমাজে নারীর অবস্থান দুর্বল বলেই তাদের উপর অর্থনৈতিক শোষণটি প্রচ্ছন্ন থাকে। *সূর্য-দীঘল বাড়ী* উপন্যাসে বর্ণিত পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নবর্গের নারীর অর্থনৈতিক সমস্যা এবং নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনকে ব্যর্থ করতে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো কীভাবে ক্রিয়াশীল থাকে, তার একটি পরিপূর্ণ রূপ লেখক আন্তরিকতার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মত :

> বিত্তহীনদের প্রতি তীব্র সহমর্মিতা বোধ এবং অত্যাচারী শোষকদের প্রতি নির্মম ঘৃণার আগুনে জ্বালাতে এ উপন্যাস যথেষ্ট পরিমাণে সফল। শোষিত-নির্বিত্ত বিপুল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে লেখকের অন্তরঙ্গ সহমর্মিতা এ উপন্যাসের সর্বত্র অন্তঃশীলার মত প্রবাহিত। তাই গ্রামীণ জীবন-সত্য হিসেবে 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য শিল্প-কর্ম। (মুহম্মদ, ১৯৮৮ : ৪৫)

ঔপনিবেশিক শোষণে জরাজীর্ণ বাংলাদেশের নিম্নবর্গের জীবনের যে ধূসরতা, সেখানে ক্ষুধার রাজ্যের গদ্যময় পৃথিবী। ক্ষুধার জ্বালা জয়গুন আর তার পরিবারকে গ্রাম ছেড়ে শহরে নিয়ে গিয়েছিল, আবার শহর ছেড়ে গ্রামে আসে। অনাহার ক্লিষ্ট জীবনের অন্তর্দাহে জীবনকে বহির্মুখী করেছিল কিন্তু সেই অনাদৃত ক্ষুধার নিবারণ ঘটেনি। অন্নের ক্ষুধায় দগ্ধ পৃথিবীতে ধর্ম, উৎসব, আনন্দ সমস্ত ম্লান আর মৃন্ময়তায় ভরা। 'পান্তাভাত', 'পোড়ামরিচ' ও 'ফেন' খাওয়া জীবনে রমজান মাসের রোজা আলাদা কোনো তাৎপর্য বহন করে না। ঔপন্যাসিকের বর্ণনার মুন্সিয়ানায় তার অভিপ্রেত নিম্নরূপে প্রকাশিত :

> সে তো জীবনভর রোজা রেখেই চলেছে। রোজা ছাড়া আর কী? বারো মাসের একদিনও সে পেট ভরে খেতে পায় না। ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত আধপেটা খেয়ে থাকে।... এক বাটি ফেনের জন্য ছেলেমেয়েকে নিয়ে কত জায়গায়, কত বাড়িতে বাড়িতে তাকে ঘুরতে হয়েছে... মাঝে মাঝে সারারাত-সারাদিন কেটেছে, একটা দানাও পড়েনি পেটে। রমজান মাসের রোজার চেয়েও যে ভয়ঙ্কর এ রোজা। রমজানের এক মাস দিনের বেলা শুধু উপোস। কিন্তু তার বারো মাসের রোজার যে অন্ত নেই। (আবু, ২০১৭ : ৬৫)

এই অভিজ্ঞতা শুধু জয়গুনের নয়, এই অভিজ্ঞতা সমগ্র নিম্নবর্গের। নিম্নবর্গের জীবনের ক্ষুধার যুদ্ধে সে একজন নারী সৈনিক। অন্য আর একজন নিম্নবর্গের সঙ্গে জয়গুনের সংগ্রামের পার্থক্য এখানে। রোজা শেষে ঈদের যে উৎসবমুখরতা, সেখানেও তাদের অবসন্নতার ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আকাশের ঈদের চাঁদ, সামান্য দক্ষিণমুখী বাঁকা হওয়ায় তাদের অন্তঃসত্তায় শঙ্কা জাগে 'আকাল অইব-ই'। এই আকালের ভয়ই তাদের জীবনের একমাত্র বাস্তবতা। সেখানে রোজা, ঈদ, দেশ স্বাধীন-সমস্তই ম্লান আর মুমূর্ষুতায় ভরা।

৬.১

সূর্য-দীঘল বাড়ী উপন্যাসের সমগ্র অবয়বে জয়গুনের যে যুদ্ধ-সংগ্রাম-লড়াই তার মূল কেন্দ্রবিন্দু অর্থনৈতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত করা। নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করার পথে সমাজ ও ধর্ম সব সময় প্রতিবন্ধকতার প্রাচীরের কাজ করে। ক্ষমতার বিচারে নারীর অবস্থান সমাজদেহের প্রান্তে। নারীর প্রতি সমাজের বৈষম্যমূলক আচরণ কখনো স্পষ্ট, কখনো প্রচ্ছন্নতা আবিষ্ট। নারীর শ্রম ও অবদানকে যথার্থ মর্যাদা ও স্বীকৃতি দিতে না পারার যে দুরাচারিতা, তাও এই উপন্যাসকে করেছে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। পুত্র হাসুকে সঙ্গে নিয়ে জয়গুন নেমেছে জীবিকার লড়াইয়ে। জয়গুনকে বাঁচার জন্য অনেক ধরনের জীবিকার অনুষঙ্গে আসতে হয়েছে :

> সে বাড়ী বাড়ী ঘর লেপে, ধান ভানে, চিড়া কোটে' এতও গ্রামের সমাজপতিদের জাত চলে যায় তারা এসে ক্ষিপ্ত হয় জয়গুনের ওপর। তারা জয়গুনকে বেপর্দা আওরাত বলে সম্বধোন করে। অনেক ভেবে-চিন্তেই সে সিদ্ধান্ত নেই দুটি কচি মুখ। এদের বাঁচাতেই হবে। ধর্মের অনুশাসন সে ভুলে যায় এক মুহূর্তে। জীবন-ধারণের কাছে ধর্মের বারণ তুচ্ছ হয়ে যায়, মিথ্যে হয়ে তার কাছে । (আবু, ২০১৭ : ২০)

গ্রামীণ পরিবেশের এ সমস্ত গৃহকর্মে জয়গুন যখন তার পরিবার নিয়ে জীবনধারণে অক্ষম, তখন সে গিয়েছে পরিচিত পরিসরের বাইরে কাজ করতে। প্রধানত ময়মনসিংহ থেকে সস্তায় চাল এনে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করা। এর পাশাপাশি শাকপাতা, পোষা হাঁসের ডিম বিক্রি করা; চালের ব্যবসার পুঁজি

জোগাতে বাড়ির আশপাশের গাছপালা বিক্রি করা। এভাবে একা একজন নারীকে, একজন মাকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়েছে। মায়ের সহযোগী হিসেবে কিশোর হাসুর যুদ্ধ :

> –চাউল পাওয়া যায় না বাজারে, তার আবার দেইখ্যা আনমু। কত কষ্টে এই চাউল জোগাড় করলাম। বারো টাকা বারো আনা । কাইল বাজারে ঢোল দিচ্ছিল ম্যাজিস্টর সাব–– নয় আনার বেশী এক সেরের দাম নিলে জরিমানা অইব। এই-এর লেইগ্যা বাজারে চাউল নাই। মহাজনরা গোলায় গুঁজাইয়া চাউল। (আবু, ২০১৭ : ৯৯)

অমানবিক, সুবিধাবাদী, স্বার্থান্বেষী, সমাজের পরতে পরতে বেঁচে থাকার মাশুল গুনতে হয় এই নারীকে। বিরুদ্ধ স্রোতের এই বৈরিতায় নিম্নবর্গের জীবনাখ্যান রচিত হয়। নারীর জীবন তো আজন্ম নিম্নবর্গের আনুষঙ্গিক স্রোতে বেড়ে ওঠা এক প্রতিবেশ। সেখানে সামাজের সংশ্রুত হলো, কী কারণে? বা কোনো কার্য দোষে একজন জয়গুন বা একজন নারীকে এভাবে প্রত্যর্থী করা হয়। প্রত্যুত্তর হলো অনুন্নত দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডল এমনভাবে নির্মিত হয়ে থাকে যে নারীর জন্য সহায়ক কোনো সীমানা থাকে না। কারণ নারী তো নিজে চালিত হয় না ; একজন পুরুষের দ্বারা সে চালিত হয়ে থাকে। সে কারণেই নারীর কোনো অর্থনৈতিক জীবন থাকে না, পরিচয় থাকে না। নারীর জীবনের এই নির্জীব পরিক্রমার সঙ্গে দারিদ্র্যের যোগসূত্র সম্পর্কে অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের মত :

> আয়ের দৈন্য আর সক্ষমতার দৈন্যের যোগসূত্রের উপর অবশ্যই জোর দেওয়া প্রয়োজন কিন্তু এই মূল সত্যটিও স্মরণে রাখতে হবে যে দারিদ্র্যমোচনের নীতির চরম অনুপ্রেরণা হিসেবে আয়ের দৈন্য অপসারণ একমাত্র কারণ হতে পারে না। দারিদ্র্যকে কেবলমাত্র তাদের বঞ্চনার সংকীর্ণ দৃষ্টিতে দেখে শিক্ষা, সুস্বাস্থ্য ব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্রে মূলধন নিয়োগের যথার্থতা তাদের আয়ের দৈন্য দূর করার উত্তম পন্থা বলে বিচার করলে ভুল করা হবে। ... এই যোগসূত্র তাৎপর্যপূর্ণভাবে একটি পরোক্ষ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে যে, সক্ষমতার উন্নতি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে মানুষের জীবনকে আরো সমৃদ্ধ করে এবং তার বঞ্চনা আরও বিরল এবং কম পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে। যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক করণকারক সম্পর্কগুলি দারিদ্র্যের স্বরূপ এবং চরিত্রের মৌলিক উপলব্ধির প্রয়োজনের বিকাশ হতে পারে না। (অমর্ত্য, ২০১৯ : ৯৬)

তৃতীয় বিশ্বের সেই অবনাশী সত্তা জয়গুন, তার জীবনস্পৃহা তাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে সংক্ষুব্ধ পথে। সমাজ ও পুরুষতন্ত্রের কাছে মাথা নিচু করে নয়, তাদের অভিপ্রায়কে ব্যর্থ করে নিজের বাঁচার পথকে নির্মাণ করেছে সে একা নারী। দারিদ্র্য আর অনাহার যার জীবনের নিত্যদিনের ঘটনা, তার কাছে সামাজিক অনুশাসন, বিধিবিধান কোনো যুক্তিতেই মান্য করে না। জীবনের এই দীর্ণতা জয়গুনকে শাণিত করেছে, পেটের ক্ষুধার কাছে অমলিন হয়েছে সমাজ, ধর্ম আর তার বিভিন্ন অজুহাত। একজন শ্রমজীবী নারীও অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখে কিন্তু তাদের শ্রমনিরাপত্তা ও বিনিময়ের হার নিম্নমুখী।

৭.

অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নারীর সামগ্রিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনে নারীকে প্রচলিত গার্হস্থ্য বলয়ের বাইরে যেতে হবে। বাইরের পরিবেশে কাজ করার সুযোগ নিরাপত্তা তৈরি করতে হবে। বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত নারীদের পিছিয়ে পড়ার বড় কারণ দারিদ্র্য। তার সঙ্গে আছে সামাজিক নানা ধরনের কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, বিভিন্ন সামাজিক অনুশাসন। তারপর আছে নারীর বিবাহ ও বিবাহজনিত নানাবিধ সমস্যা। যেমনঃ যৌতুকসহ, শারীরিক ও মানসিক বিভিন্ন নির্যাতন স্বামী ও স্বামীর পরিবার কর্তৃক হয়ে থাকে। *পদ্মার পলিদ্বীপ* উপন্যাসের প্রধান নারী জরিনা বিবাহ ও বিবাহকেন্দ্রিক সমস্যায় জারিত। উপন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে জরিনা নামক নারীর বিপন্ন অবস্থার পশ্চাতে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ নামক সামাজিক অনুঘটক সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে। গ্রামীণ নিম্নবর্গের নারীর জীবনে বিবাহ নামক পরিবৃত্তের যে প্রবর্ধমান, সেখানে গৃহকর্ম আর সন্তান লালন-পালন একমাত্র বৃত্তি। সে কারণেই তাদের জীবনে আলাদা কোনো জীবিকার পথ তৈরি হয় না। স্বামী-সংসারের নির্মমতায় বিপন্ন দশায় অধঃপতিত হলে ঐ সমাজবৃত্তের সম্পন্ন গৃহস্থবাড়ির গৃহশ্রমিক হওয়া ছাড়া অন্য কোনো কর্মের সুযোগ থাকে না। সেই নিয়মবদ্ধতা কোনো একক কাজে সীমাবদ্ধ থাকে না : 'আর যেই দিনকাল পড়ছে। ধান ভানতে বড় বেশি ডাক দেয় না কেও। চাউলের কল অওনে এই দশা। ঘর লেপন আর চিড়া কোডনের কামে আয় নাই।' (আবু, ২০১৬ : ১২২) উপন্যাসের পটভূমিতে যুদ্ধের প্রদাহ থাকায় সর্বত্রই তার ছায়ার প্রলেপ। জরিনাকে যখন ফজলের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়, তখনই তার অবস্থান নির্মিত হয়েছে সমাজের প্রান্ত প্রদেশে। যুদ্ধের বিভীষিকাময় পরিবেশের প্রদাহ গ্রামবাংলার প্রান্ত প্রদেশেও যখন ছায়া ফেলেছে, তখন তার অবস্থা আরো সংকুলাতীত হয়ে উঠেছে:

> কয়েকদিন ধরে জরিনা কাজের সন্ধান করছে। খেয়া নৌকায় পার হয়ে সে ঘুরছে এ চর থেকে সে চর। কিন্তু কোথাও কাজ পায়নি। অধিকাংশ গেরস্তের ঘরে খোরাকির ধান নেই। ....বাড়ি বাড়ি ঘুরেও সে কাজ পায়নি। প্রায় সকলের মুখে ঐ এক কথা, 'ধান পাইমু কই? এহন তো চাউল কিন্যা খাইতে আছি। তোমারে কাম দিমু কেম্বায়? (আবু, ২০১৬ : ১৯০)

তারপর যখন রাজনৈতিক অস্থিরতা সূচনা হয়, তখন নিম্নবর্গের এই নারীদের জীবন অনিশ্চয়তার চরমে পৌঁছায়। যন্ত্রণাকর এই সমস্ত পরিবেশ থেকে নারীর বের হয়ে না আসতে পারারও বড় কারণ দারিদ্র্য। আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে সমাজের জটিল ও বৈষয়িক দিককে প্রাধান্য দেয়ার মধ্য দিয়ে

ঔপন্যাসিক আবু ইসহাকের চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহে নারীর বিপন্নদশার অন্তর্দহন জুড়ে আছে সমগ্র উপন্যাসে।

৮.

শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম বাংলাদেশের শোষিত, অন্তেবাসী মানুষের কথা বলেছেন। *কাশবনের কন্যা* উপন্যাসে দক্ষিণবঙ্গের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবিকার সূত্রে তাদের অর্থনৈতিক উৎসের নানা দিক উঠে এসেছে। সেখানে কৃষিকেন্দ্রিক জীবিকা অপেক্ষা জেলে-মাঝি সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠী বেশি লক্ষ করা যায়। নদীকেন্দ্রিক মানুষের মাছ ধরা এবং কৃষিকেন্দ্রিক সমাজ ও জীবনব্যবস্থার মধ্য দিয়ে তাদের অর্থনৈতিক পরিসর গড়ে উঠেছে। উপন্যাসের আবহে সংসার বিমুখ রোমান্টিক ভাববাদী দর্শনের প্রভাব বেশি থাকায় জীবনের বাস্তবসম্মত দিকসমূহ আড়ালে থেকেছে। তবে গ্রামীণ মানুষের দারিদ্র্য, অন্নাভাব, সবকিছুই আলোচনায় এসেছে। *কাশবনের কন্যা*' র নারীদের মধ্যে জোবেদা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নারী চরিত্র। জোবেদা একজন সচেতন বুদ্ধিদীপ্ত নারী হয়েও তার জীবনমাধুরী তার কাছে অধরাই থেকেছে। তার নিজের কোনো আর্থিক সমাগম নেই; পিতৃগৃহের আর্থিক অসচ্ছলতা তাকে বাধ্য করেছিল প্রণয়প্রার্থী কানু শিকদারকে পরিত্যাগ করে সম্পন্ন ব্যবসায়ী আসগরউল্লাহকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে। সেই সুখের স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গের বেদনা, আশা-আশাহত হওয়ার যন্ত্রণা সব কিছুর মধ্য দিয়ে তার নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা অবিরত। সেখানে তার নিজের কোনো অর্থনৈতিক জীবন তৈরি হয়নি, সে সদা পরনির্ভরশীল হয়ে বেঁচেছে। আর্থিক আনুকূল্যতা তাকে সব সময় টেনেছে, বিবাহের পূর্বে কানু শিকদারের বিড়ম্বিত জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছে :

> জোবেদাও একবার ঠোঁট ফুলাইয়া বলিয়াছিলঃ কত বয়াতির কথা শুনি, ঘর-বাড়ি উঠাইছে, জমিজমা কিনছে, পানসি চড়িয়া দেশ-বিদেশ যাওয়া আসা করে। এখন নাকি খোদ সদর মুলুকেও পাকা দালান উঠাইতে আছে রাজা-রাজ্যের সাহায্যে। তোমার যে কেন সেই সব দিকে হুঁশ নাই? (শামসুদ্‌দীন, ২০১৬ : ১০২)

কাশবনের কন্যা উপন্যাসে নারীর আত্মমুক্তি-স্বাধীন জীবন ভাবনার চেয়ে সুখী গৃহকোণের স্বপ্নকে লেখক গুরুত্বপূর্ণ করে দেখেছেন। অসাম্য, বঞ্চনা ও ব্যক্তিগত অপ্রাপ্তি তাদের উপলব্ধিকে বিচলিত করলেও সমাজের বৃত্তকে ভেঙে স্বাধীন জীবনাচারের ভাবনা তাদের মধ্যে বিকাশ লাভ করেনি। এ প্রসঙ্গে অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন ভারতবর্ষের সাবেকি পরিবারে নারীর ভয়াবহ অসম অবস্থান সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন সাবেকী পরিবার একদিকে নিবিড় মমতা, অন্যদিকে শোষণের এক বিরাট মিশ্রণ। (অমর্ত্য, ২০০০ : ২৫) জোবেদার স্বামীগৃহে ফিরে যাবার মধ্যে নারীর চরম পরাজয়ের ইতিহাস রচিত হয়েছে। স্বামী-শাশুড়ির লাঞ্ছনা বাংলাদেশের সমাজে নারীর চিরন্তন নিয়তি।

৮.১

পিতৃহীন মেহেরজানের শত্রুর অভাব নেই, দুষ্ট, হীন লোকের বীভৎস আচরণ সহ্য করে বেঁচে থাকা। চরম অনিরাপত্তার মধ্যে নিজের ইচ্ছাকে বলিদান করা সমাজের বাস্তব চিত্র হলেও ঔপন্যাসিকের চিন্তাশীলতার দিক থেকে পশ্চাৎপদতার পরিচয় দিয়েছেন। গ্রামীণ জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে নারী নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দেখা কখনোই পায় না। পিতার আর্থিক দুরবস্থা আর নারীর প্রতি সমাজের সংস্কার তাদের জীবনকে চারপাশ থেকে নিস্পেষণ করেছে। মেহেরজান দরিদ্র ছাবদার মাঝির কন্যা, যৌতুকের অনাদায়ে স্বামী তাকে ফেরত পাঠিয়েছে। গ্রামীণ সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থায় নারী এভাবেই দিনের পর দিন নির্যাতিত হয়ে বেঁচে থাকে। আবার নিজের অন্নের সংস্থান নিজে করতে গেলে সেখানেও পদে পদে পুরুষের হিংস্রতার ভয়াল থাবা। ছাবদার মাঝির বিধবা স্ত্রী বিভিন্নভাবে চেষ্টা করে সংসারে সহযোগিতা করার। হাঁস-মুরগি পোষা থেকে শুরু করে, পুঁই, শশা, ঝিঙা বিভিন্ন শাক-সবজির ব্যবস্থা করা। শুধু এতেই তিনজন মানুষের অন্নের জোগান ঘটে না : 'সে বাহির হইত কেরায়া খাটিতে, স্ত্রী সামান্য কিছু জুটাইয়া আনিত জমি-জমা ওয়ালাদের বাড়িতে ধান ভানিয়া, না হয় অন্য কোনো কাজ করিয়া।' (শামসুদ্‌দীন, ২০১৯ : ৮৪) এখানে কাশবনের কন্যাদের মধ্যে একমাত্র ছাবদার মাঝির বিধবা স্ত্রীর কিছু উপার্জনের ব্যবস্থা ছিল। নিম্নবর্গের জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা আর্থিক দুর্বলতা। নিম্নবর্গের সাধারণ মানুষের কঠিন জীবনসংগ্রাম ও তাদের দুমুঠো অন্ন-বস্ত্রের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। আবার সুবিধাবাদী একদল উচ্চবিত্ত শ্রেণি বরাবর তাদের শোষণ করে চলে, যার মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গের যন্ত্রণা আরো শতগুণ বেড়ে চলে। উপন্যাসের শুরুতে লেখক নারীর সেই বিপর্যস্ত জীবনের কথা উল্লেখ করেছেন :

> দেখিও, কী ললিত ছন্দে চাষি বোনে ধান, মাঝি টানে নাও, বউ -ঝি কাদাজলে গোবরে লেপে তাদের ক্ষুদ্র মাটির ঘরের ভিত, কেমন করিয়া ভানে তাহাদের ধান, লতাইয়া দেয় সেইসব গৃহস্থালির অঙ্গাভরণের মতো পুঁই কি ঝিঙা, কত সবজির লতাপাতা ডগা। ...তাহাদের বসনের তিনটি রূপালি রেখাও যেন দেশ-প্রকৃতি হইতে অবিচ্ছিন্ন। দেখ না, দেশের শ্যাম-নীল প্রকৃতির অঙ্গ ঘিরিয়া ঘিরিয়া নদীজলের রৌপ্যস্রোত কেমন লতাইয়া জড়াইয়া রাখিয়াছে। (শামসুদ্‌দীন, ২০১৬ : ১৮)

নারীর দুঃখ, দুর্দশার, প্রতিলিপি ধরা পড়েছে লেখকের এই অভিব্যক্তিতে। কন্যা, দয়িতা, জননী-এই তিন রূপে নারীর যে অনন্ত বেদনার প্রতিমূর্তি, তা ব্যঞ্জিত হয়েছে এই উপন্যাসের অভ্যন্তরস্থ নারীদের মধ্যে। *কাশবনের কন্যা*র এই সব নারীরা বাংলাদেশের প্রতিদিনের পরিচিত বলয়ের মানুষ। নিম্নবর্গের

এই নারীর অভিজ্ঞতায় ও অবয়বেই বিম্বিত হয়েছে বাংলাদেশের বৃহত্তর নারী সমাজের প্রতিচ্ছবি (বিশ্বজিৎ, ২০১৯ : ২৩)।

৯.

শামসুদ্দীন আবুল কালাম বাংলার গ্রামীণ নিম্নবর্গের বিচিত্র জীবনকথা তুলে ধরেছেন তার উপন্যাসসমূহে। তার মধ্যে *কাঞ্চনমালা* বেদে সম্প্রদায়কে নিয়ে লেখা তাঁর অন্যতম সাহিত্যিক বৈচিত্র্যের বৈশিষ্ট্য। সমাজজীবনে নারী যত আসক্তিহীন হওয়ার সুযোগ পেয়েছে, ততোই তারা স্বাধীন ও স্বনির্ভর হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। উপন্যাসের প্রধান নারী মালা; সে মঙ্গল মাঝির দলের সাপ খেলা, নাচ-গান দেখানোর অগ্রগণ্য নারী সদস্য। গ্রামে, গঞ্জে, মেলা, বিভিন্ন জায়গায় নাচ-গান, সাপ খেলা দেখানো, তাবিজ-কবচ বিক্রি করা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে কর্মের জগতের সঙ্গে তার সংযোগ ঘটে। এই কর্ম-প্রয়াস তাকে আর্থিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যেমন যোগাযোগ করিয়েছে; তেমনি তার জীবনে স্বাধীনতা চিন্তার প্রসার ঘটিয়েছে। গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে নারী-পুরুষ কাঁধে, কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে, যার মাধ্যমে তাদের স্বাধীন জীবনাচারের চর্চা বৃদ্ধি পেয়েছে।

> মালাকে দিয়ে বড় নাচ-গান করাইতেও চাহে না সে। সকলের দৃষ্টির আড়াল হইতে তাহাকে নিজের স্নেহের ছত্রচ্ছায়ায় রাখিতেই সে যেন বেশি উন্মুখ। তবু পারে না, রোজগারের দিকটা ভাবিয়া তাহাকে আসরে নামাইতেই হয়। সে মেয়েও এমন, আসর মাতাইয়া তোলে। তাহার দলের সুখ্যাতিও যেন প্রধানত: তাহার জন্য। (শামসুদ্দীন,১৩৬৮ব. : ৬)

গোষ্ঠীবদ্ধ এই জীবনে মালা বা চাঁপার মতো নারীরা শুধু নিজের জন্য উপার্জন করে না। এখানে ব্যক্তি অপেক্ষা সামষ্টিক জীবন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। এই সমাজে সবাই বয়স ও যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করে থাকে। মালা আর চাঁপা নাচ-গান, সাপ খেলা দেখানোর কাজ করে, অন্যদিকে মালার মা ময়না বিবি ও টিয়া বিবি সম্পূর্ণরূপে বসে খায় না। ময়না বিবি রান্নাবান্না কাজের বাইরে বাঁশের জালি তৈরি করে, যা বাজারে বিক্রি করে নগদ অর্থ আসে। এভাবে গোষ্ঠীগত জীবনে নারীরা আর্থিক প্রক্রিয়ার নিজেদের যুক্ত রেখে সামষ্টিক জীবনে একে অপরের জন্য অপরিহার্য হয়ে জীবন-সংসার অতিবাহিত করেছে। সামগ্রিক বিবেচনায় উপন্যাসটি বিভিন্নভাবে সমালোচিত হয়েছে। তার পরও কথা থেকে যায় :

> আলোচ্য উপন্যাসটি সমাজ-জীবনের তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের সঙ্গে ঔপন্যাসিকের গভীরতর পরিচয়ের প্রমাণ বহন করে। গ্রামের বিচিত্র বৃত্তিজীবী শ্রেণির জীবন-আলেখ্যের বিশ্বস্ত রূপায়ন এতে লভ্য। লেখক-সত্তার বিশিষ্ট বিশিষ্ট মনোভঙ্গির প্রকাশও এখানে সুচিহ্নিত। উপন্যাসটি সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন, বৈষ্ণব

পদাবলীর সুরে গান, পুঁথিপাঠ এবং এ সবের সঙ্গে সঙ্গে বেদে-দলের সাপখেলানো নাচ-গান প্রভৃতি লোক উপাদানের মাধ্যমে লোকজীবনের প্রতি লেখকের বিশেষ আনুগত্য ও সম্প্রীতির প্রকাশ ঘটেছে এ গ্রন্থে। (সাইদুর, ২০১১ : ২৪২)

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার বৈচিত্র্যময় ভাণ্ডারের এক ঐতিহ্যবাহী শ্রেণি যাযাবর বেদে সম্প্রদায়। স্বদেশ আর স্বসমাজের অংশ হিসেবেই লেখক তাদের জীবনে বাস্তবতাকে সাহিত্যের ইতিহাসে উজ্জ্বলরূপে বিনির্মাণ করেছেন। সাহিত্যিক জীবনবোধ ও শিল্প-সৌকার্যের বিচারে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় বহন করলেও বিলীয়মান সমাজব্যবস্থার অংশ হিসেবে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

১০.

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে নারী যে চলমান রূপ, সেখানে তাকে প্রতি মুহূর্তে শোষণের শিকার হতে হয়। তার মধ্যে থাকে দারিদ্র্য, মহামারি, সামন্তশোষণ, ধর্মশোষণ প্রভৃতি শোষণের প্রক্রিয়া। বাস্তবতা হলো, কদমের স্ত্রী নবিতুনকে একা এককভাবে নিজের ও সন্তানের দায়িত্ব নিয়ে সংসার চালিয়ে যেতে হয়েছে। কদম সারেংয়ের জাহাজ থেকে ফেরার সময় ছিল কখনো দুই বছর অন্তর, কখনো তিন বছর অন্তর। এর মধ্যে নবিতুনের সংসার চালিয়েছে তার আত্মশক্তি ও শ্রম দ্বারা। নবিতুন নানা অর্থনৈতিক প্রচেষ্টায় নিজের আর সন্তানের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে। তার সেই সমস্ত প্রচেষ্টাসমূহ নিম্নরূপ :

মুরগি পালা, হাঁস পালা, চাটাই বোনা, কোরা বানানো, ডুলা বানানো আর মণকরা চুক্তির করে ‘বারা বান্দা’। এর মাঝে শেষের কাজটাই ছিলো নবিতুনের বড় নির্ভর। সারা বছরই থাকত কাজটা। অন্যগুলো মাঝে মাঝের ফরমাইশি কাম। কেউ বাঁশ আর বেত দিয়ে গেল, দাও একটা কোরা বানিয়ে। কেউ দিয়ে গেল বেত আর পাটি পাতা, দাও একটা চাটাই বানিয়ে। ধীরে সুস্থে অবসর মতো করে দিত নবিতুন। তাতে আর ক’পয়সা রোজগার! (শহীদুল্লা, ২০০২ : ২২)

নিম্নবিত্তের এই শ্রেণিকে এভাবেই জীবনপাত করতে হয়েছে দিনের পর দিন। নবিতুনকে ঘোর দুর্দিনের বৈরী সময়কে পাড়ি দিতে প্রাত্যহিক এই সমস্ত কাজের বাইরে আরো বিভিন্ন কাজের সন্ধান করতে হয়েছে। নবিতুনের মতো উপকূলবর্তী জনজীবনে নারীর সংগ্রাম ও শ্রমশীলতাকে লেখক বাস্তবধর্মী রূপে প্রতিবিম্বিত করেছেন। নবিতুনের ঐ জীবন ছিল লেখকের অভিজ্ঞতা দ্বারা আলোড়িত। তাই প্রান্তিক এই নারীর জীবনঘনিষ্ঠরূপকে সাহিত্যিক রূপ দেয়া লেখকের সৃষ্টিশীল সত্তার দায়বদ্ধতাও বটে।

১০.১

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর সময়ে পশ্চিমা সভ্যতা আগত যন্ত্রশিল্পের অবাধ প্রসার গ্রামীণ জীবনে নতুন সংকটের জন্ম দিয়েছিল। যন্ত্রের আবিষ্কার সভ্যতায় গতি আনলেও শ্রমজীবী মানুষ কাজের সুযোগ হারায়। নবিতুনের সংগ্রামের পথে আরো এক নতুন বাধার প্রাচীর তৈরি করেছিল চাল ভাঙার কলের আবির্ভাব : 'ভুঁইয়ার হাটে কল বসেছে। এখন থেকে সেই কলেই নাকি সবার ধান বানবে। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে যায় আক্কি। ...বলে, কলে নাকি খুব সাফ হয়, সাদা হয় চাল । ভাত হয় সাফ সাফ, সোন্দর সোন্দর।' (শহীদুল্লা, ২০১৭ : ১৪) জীবনের নির্মাণবয়ন আর প্রযুক্তির নির্মাণবয়ন সব সময় একই সমান্তরালে হয় না। প্রযুক্তির আধুনিকায়ন যেমন মানুষের জীবনে শ্রমলভ্যতা এনেছে, তেমনি ঐ শ্রমব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষের জীবনে সরাসরি আঘাত হেনেছে। পুঁজিবাদের অদৃশ্য চম্বুকে আটকে পড়া মানুষ বুঝতে পারে না কোনটা সাম্যবাদের প্রসারণ আর কোনটা আধিপত্যবাদের সুপ্ত সন্ত্রাস। (জহর, ২০১৭ : ১০১) সমাজ বিবর্তনের অনিবার্য অভিঘাত প্রান্তিক নারীর জীবনে প্রভাব রেখে চলেছে, তাও তুলে ধরেছেন লেখক। ঢেঁকিতে ধান ভানার কাজ সমগ্র বাংলার গ্রামীণ নারীদের অতি জনপ্রিয় ও পছন্দের পেশা। কারণ-এই কাজ তারা ঘরে বসেই করতে পারে, পাশাপাশি সন্তান দেখাশোনা, লালন পালন ও গৃহকর্ম সবকিছুই সামলাতে পারে। ব্যাপক দুর্ভিক্ষ ও খাদ্য সংকটের দিনগুলোতে পুরুষ সদস্যরা যখন কর্মহীন, তখন প্রান্তিক শ্রমজীবী নারী পরিবারের অন্ন জুগিয়েছে এই উপায়ে। ১৮৮৮ সালে ভাইসরয় লর্ড ডাফরিনের আমলে শ্রমজীবীদের অবস্থা সম্পর্কিত একটি সমীক্ষার বিবরণী থেকে জানা যায় : 'একজন শ্রমজীবী নারী সারা বছরে ঢেঁকিতে ধান ভানার কাজ করে গড়ে বারো টাকা রোজগার করতেন, যা তখনকার বাজারদরে মোটামুটি সন্তোষজনকই বলা যেতে পারে। (অমল, ২০১৩ : ১৬২) বিশ শতকের সূচনাকালে বিদেশি প্রযুক্তি প্রত্যক্ষ অবদানে শ্রমজীবী নারী নিরাপদ শ্রম বিনিয়োগের এই পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শ্রমজীবী নারীর জীবনে অন্ধকার নেমে এলে, তার সুযোগ নিতে উদ্‌গ্রীব হয়েছে পুঁজিপতি শ্রেণি। কারণ, চালকলগুলোর মালিকানা থাকে উচ্চবর্গের হাতে। এই সমস্ত সংকট নবিতুনের মতো নিম্নবর্গের মানুষের অস্তিত্বের সংকটকে আরো অধিক বিপন্ন ও বাধাগ্রস্ত করে তুলেছে। এ প্রসঙ্গে গবেষকের মত নিম্নরূপ :

> যন্ত্রসভ্যতার উদ্যত থাবা নবিতুনের অস্তিত্বসংগ্রামকে গভীরতর সংকটের মধ্যে নিক্ষেপ করে। কদমের চিঠি, টাকা, সংবাদবঞ্চিত নবিতুন ও তার মেয়ে আককির অস্তিত্বের অন্ধকার ক্রমশ দীর্ঘায়িত হতে থাকে। নবিতুনের এই অসহায়ত্বের মূল কারণ বামনছাড়ি গ্রামের উঠতি ধনিক শ্রেণীর বিকৃত প্রতিচ্ছবি লন্দুর শেখ।

> তার ষড়যন্ত্রেই স্বামী প্রদত্ত টাকা ও চিঠি থেকে বঞ্চিত হয় নবিতুন। ফলে আরোপিত দারিদ্র্য নবিতুনের অস্তিত্বকে সীমাহীন অনিশ্চয়তায় নিক্ষেপ করে : (রফিকউল্লাহ, ২০০৯ : ১২৫)

পুঁজিবাদ নিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থায় জীবনের মূলমন্ত্রগুলো ঢেকে দেয়া হয় নিরপেক্ষতার অলীক মুখোশের আড়ালে। যার ফলে বস্তুবিশ্বের দ্বান্দ্বিক প্রকল্পের মধ্যে মানুষ তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। এর মধ্য দিয়ে ক্ষমতাবানদের কাছে ক্ষমতাহীন মানুষেরা পণ্য হয়ে ওঠে।

১১.

নারীর সাংস্কৃতিক নির্মাণের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে গবেষকগণ বলেন যে নারীর অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতাই নারীকে নারী করে তোলে। নারীর শোষণের প্রভাব নারীর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকেও প্রভাবিত করেছে ও কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করেছে। শ্রমবাজারকে শারীরিক যৌন পার্থক্যের উপর ভিত্তি করেই পুরুষ বিভক্ত করে রেখেছে। অর্থনৈতিক অধিকারহীনতা নারীর শোষণকে আরো কার্যকর করে তোলে। হুরমতির মতো আর্থিক মূল্যের বিনিময়ে কোনও শ্রমদানকারী নিম্নবিত্ত নারী-ই পরিচারিকা। অর্থাৎ ‘পরিচারিকা’ শব্দটির একটি বিশেষ অর্থ যে বা যারা পরিবারের সেবাকর্মে নিয়োজিত, সেখানে তারা দান করে তাদের আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা। মানবসভ্যতার গোড়া থেকেই এই জীবিকার নারীদের উপস্থিতি লক্ষণীয়। অর্থাৎ নারীর এই জীবিকাটি মানবসভ্যতার ন্যায়ই প্রাচীন। (দেবযানী, ২০১৪: ১৫৭) হুরমতির জীবনবৃত্তান্তে সেকথার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। হুরমতির মার পরে সে, তারা বংশপরম্পরায় বকুলতলির মিঞা বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করেছে। এই পরিসরে তার জীবন গড়ে ওঠে আশৈশব মাতৃহীন, পোড়খাওয়া, আশ্রিতার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থায় ওরা ছায়ার মতো বেড়ে উঠেছে ; উচ্চবর্গের অত্যাচারে আশ্রিত এই নিম্নবর্গীয় নারীরা মূক বা বোবার মতো আচরণ করে। হুরমতি বিদ্রোহ করেছে প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। সে সেই সব বুদ্ধিমতী নারীর দলে, যারা নিজেদের অধিকার বুঝে নিতে চায়। সে সামাজিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর। মিঞা বাড়ির দাসী জীবনের অন্তরালে যখন মিঞা নায়েবদের যৌনদাসী হয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হবে, তখন স্বাধীন পতিতাবৃত্তি তার কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে। তবে সে স্বৈরিণী নয়; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অর্থনৈতিক সংকট আর গ্রামীণ প্রতিবেশে সামন্তবাদী প্রভুদের যৌন রাজনীতি তাকে এই পেশায় অভিযোজন করেছে। পেটের দায়ে সে শহরে গিয়ে পতিতাবৃত্তিতে অংশ নিলেও মনুষ্যত্বের বোধে সে ফেলু মিঞা, রমজানদের তুলনায় উন্নততর মানুষ। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় :

ঠোঁটে রঙ লেপেছে হুরমতি। কাউফলের কোয়ার মতো রসমেদুর টুকটুকে লাল ঠোঁট। চোখের নিচে গালের হাল্কা পোঁচের গোলাপি আভা দেহের উদ্ধত ভাঁজে সিল্কের পাতলা শাড়ির বাঁধনটা যেন নিলাজ আমন্ত্রণ। কাঁধের কিনার ঘেঁষে পিঠ ছুঁয়ে আঁচলটা ওর নেমে এসেছে মাটি অবধি। আঁচলের লতাপাতা আঁকা প্রান্তটা লুটোচ্ছ ধুলোয়। জুতো মালু দেখেছি আগে। সব মিলিয়ে বাকুলিয়ার হুরমতি সুন্দরী আজ বিশ্বের অপরূপা। (শহীদুল্লা, ২০১৭: ২১৪)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দেশভাগ, দাঙ্গা, মহামারি, দুর্ভিক্ষ, স্বাধীনতা আন্দোলন প্রভৃতি দুর্যোগ হুরমতিকে বিপন্ন করেছে। যৌবনের প্রারম্ভে সমাজ তাকে যে পথ দেখিয়েছে, শেষ পর্যন্ত তাকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে হুরমতি। সমাজে নারীর অর্থনৈতিক স্তরায়ন অপেক্ষা লিঙ্গ-পরিচিতিই একমাত্র নিয়ামক রূপে অধিষ্ঠিত। হুরমতি অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হলে লৈঙ্গিক পরিচয়ের অধঃপতনে সামাজিক পীড়ন থেকে মুক্তি মেলে না।

১১.১

অর্থনৈতিক মুক্তি ও নারীর মুক্তি একই খাতে বয়ে চলা সংগ্রামের অবিভাজ্য দুটি দিক। বুর্জোয়া পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের শোষণ ও নিপীড়নের গোটা প্রক্রিয়ার মধ্যে সামাজিক অসমতা ছড়িয়ে রয়েছে। বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় বিবাহের অর্থ হলো নারীকে সামাজিকভাবে সংগঠিত পণ্য উৎপাদনব্যবস্থা থেকে নিরাপদ রক্ষব্যূহের ভেতর প্রবেশ করানো। আর দশজন গ্রামীণ নারীর মতো আম্বরি পরিশ্রম করে সংসারের জন্য। বর্গাচাষির সংসারের যে জমি তারা চাষ করে তার অন্নে বছরের পাঁচ মাসের বেশি চলে না। বাকি সাত মাস চালানোর জন্য নানান ব্যবস্থা আম্বরিকেই করতে হয়েছে। তার শ্রমের অবদানকে মনের গভীরে স্বীকার করলে বাহির থেকে মানতে চায় না লেকু। তাই কারণে অকারণে নির্মমভাবে প্রহার করে, অমানুষিক ক্রোধে ফেটে পড়ে তার হাত দুটি। অথচ কঙ্কালসার আম্বরির সংসারের জন্য শ্রমের অন্ত নেই। ঔপন্যাসিকের বয়ানে তার বিস্তার নিম্নরূপঃ

আম্বরি নিজেই বনবাদাড় ঘুরে খড় শুকানো ডালপাতা হাবিজাবি জোগাড় করে সারা বছর উনুনটা জ্বালিয়ে রাখে। ভাতের সাথে কচু লতিটা ঢেঁকিশাকটার ব্যবস্থা করে। ...একপাল হাঁস-মুরগি পালে আম্বরির। আণ্ডা বেচে বাচ্চা ফোটায়। একটু বড় হলেই হাঁস-মুরগির বাচ্চাগুলো বেচে নিয়ে দুটো পয়সা ঘরে তোলে। ছাগল পালে। তালতলির রামদয়ালের হাঁপানির ব্যামো। প্রতি বছর ছাগল বিয়োলেই দুধটা রামদয়ালের জন্য বাঁধা, দামটা নগদ। (শহীদুল্লা, ২০১৭ : ৩৫)

এই শ্রম, এই অর্থ, মূল্যহীন পারিবারিক অর্থনীতিতে, জাতীয় অর্থনীতিতে। এর জন্য একজন লেকু এককভাবে দায়ী নয়। সমগ্র আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে যে অবদমন, যে অব্যবস্থাপনা লুকিয়ে

আছে তাকে পরাভূত করা সর্বপ্রথম দায়িত্ব। একজন শ্রমজীবী নারী সমাজ ও অর্থনীতিতে ভূমিকা রেখে চলে, কিন্তু তাদের শ্রমনিরাপত্তা ও বিনিময় হার নিচের দিকে।

১২.

হাজার বছর ধরে উপন্যাসে নারীদের শ্রমজীবন থাকলেও পারিশ্রমিক প্রাপ্তির সুযোগ ছিল না। স্বামীর সংসারে তারা বিনা বেতনের শ্রমিক ছিল। বিনিময়ে তারা অন্ন-বস্ত্রের পাশাপাশি নিরন্তর পেয়েছিল শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। আমেনা, ফাতেমা, টুনি মকবুলের সংসারে গৃহভিত্তিক শ্রমের বাইরে হাল চাষের গরু হিসেবে শ্রম দিয়েছে, ধান ভাঙানোর মেশিন হিসেবে শ্রম দিয়েছে, শ্রমিক হিসেবে জমি চাষের উপযোগী করেছে। তার বাইরে আছে চাটাই বোনা ও গৃহনির্ভর শ্রমদান ব্যবস্থা। এত সব পরিশ্রমের পরও তাদের কোনো অর্থনৈতিক জীবন গড়ে ওঠেনি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নিয়ম অনুযায়ী মকবুল মোহরানা দিয়ে বিয়ে করেছে তাদের শ্রমকে শোষণ করার জন্য। এখানে রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার সবাই নিশ্চুপ নির্বাক; তাদের বলার কিছু নেই, কারণ তারা এই শোষণকে সমর্থন করে। আম্বিয়ার নিজস্ব কর্মজীবন হাজার বছরের এই শোষিত নারীর ভিড়ে একমাত্র জীবন্ত অস্তিত্ব। নিপীড়িত, নির্যাতিত নারীর মধ্য লেখক এ কথাই বলতে চেয়েছেন অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া কোনো জীবন পরিপূর্ণ জীবন হতে পারে না। এই সমাজে নারী আসলে শ্রেণি-শাসন ও পুরুষ-শাসনে নিষ্পিষ্ট। সমাজ বিবর্তনের প্রতিটি ধাপে শ্রেণিসমাজের পরিবর্তন ঘটলেও; পুরুষতন্ত্রের অবস্থানের কোনো নড়চড় ঘটে না (যতীন, ১২১: ২০০৮)। সে কারণেই নারীর অবস্থান একই থেকে যায়, বিশেষ করে নিম্নবর্গের সমাজে নারীকে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়ানো শক্তি ও সাহস কোনোটাই দেয়া হয় না। ঢেঁকিতে ধান ভানার কাজ সমগ্র বাংলার গ্রামীণ নারীদের অতি জনপ্রিয় ও পছন্দের পেশা। ব্যাপক দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যসংকটের দিনগুলোতে পুরুষ সদস্যরা যখন কর্মহীন, তখন প্রান্তিক শ্রমজীবী নারী পরিবারের অন্ন জুগিয়েছে এই উপায়ে। '... ' নামে প্রকাশিত বিবরণী থেকে যা দেখা গিয়েছিল তা হলো একজন শ্রমজীবী নারী সারা বছরে ঢেঁকিতে ধান ভানার কাজ করে গড়ে বারো টাকা রোজগার করতেন, যা তখনকার বাজারদরে মোটামুটি সন্তোষজনকই বলা যেতে পারে (অমল, ২০১৫ : ১৬২)। অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ম্ভর নারী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বাধীন হয়ে থাকে। উপন্যাসে আম্বিয়ার সঙ্গে অন্যান্য নারীর পার্থক্যের জায়গা এভাবে স্পষ্ট করা যায়; নিম্নবর্গীয় সমাজের বহু সমস্যার মধ্যে আম্বিয়ার একটি দুটি স্বাধীন নারীর উদাহরণ পাওয়া যায়। এই স্বাধীন চিন্তা ও চর্চার পথটি রচনা হয়েছে তার উপার্জন সক্ষমতার জন্য। অনেক অবদমিত, নির্যাতিত নারীর ভিড়ে, সে একান্ত আত্মকেন্দ্রিক স্বাধীন নারী।

১৩.

ইতিহাসের সার্থকতা বোধ হয় তখনই, যখন তার সহায়তায় সামাজিক রূপরেখাগুলো দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। তার মধ্যেই অন্যতম একটি বোধদয় হলো যুদ্ধ-মহামারি-প্রাকৃতিক দুর্যোগে পরিবারগুলো যখন অকার্যকর ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। নারী সেখানে সেবাদায়িনী হয়ে সমস্ত বৈরিতাকে জয় করে পরিবারকে রক্ষা করে। এই অভিজ্ঞতা আজকের নয় অনাদিকালের। তবুও নারী সমাজ এবং পরিবারের নিকট অপাঙক্তেয়। সামাজিক ইতিহাস এককভাবে পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠতে পারে না; তার একটি অর্থনৈতিক দিক থাকে। সেখনে নারী, নারীর শ্রম বরাবরই অবমূল্যায়িত হয়েছে। গ্রামীণ নিম্নবিত্তের জীবনব্যবস্থায় তার প্রকাশ যুক্তিগ্রাহ্য খণ্ডিত একটি মাধ্যম। গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় একজন নারী পরিবারের জন্য যতটা শারীরিক শ্রম ও মানসিক শ্রম ব্যয় করে, তার কোনো মূল্য পরিবারের কাছে থেকে পায় না। ফাতেমার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নয়; জীবিকা যেহেতু উৎপাদন ও অর্থনীতি সঙ্গে যুক্ত, সেখানে গৃহশ্রম মূল্যহীন :

> বেটির জিদ বড় কড়া। গত কয় বৎসর একটুখানি ফুরসৎ পায়নি। দু' পয়সা বাড়তি আনার জন্য প্রধান বাড়িতে জানেপ্রাণে খেটেছে। নিজেদের একচিলতে বাড়ির মধ্যে লাউ কুমড়া সীম ডাঁটা করা আর হাঁসমুরগী অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। (আলাউদ্দিন, ২০১৩ : ৮)

উদ্দেশ্য ছিল পরিবারকে সহযোগিতা করার, লেখাপড়ায় ভালো ছেলেটাকে আরও একটু লেখাপড়ার সুযোগ করে দেয়া। এই মূল্যহীন কর্মনৈপুণ্যই আবার আকালের চরম বিপদের দিনে দুমুঠো অন্নের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল :

> ফাতেমা চাকরি পেয়েছে এক বড় বাড়িতে, আয়ার চাকরি। রান্নাঘরেও যায়, সেদিক থেকে আরো একটু সুবিধে। বস্তির ভিতর একটি ছোট্ট কুঠরি ভাড়া নিয়েছে মাসিক ছ'টাকায়; এক চালার মধ্যে দশ ঘরের একটি ঘর, চার হাত পাঁচ হাত; কোনমতে ঠ্যাং মেলে শোওয়া যায়। তবু পথে পথে ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে এ নিশ্চয় ভালো। (আলাউদ্দিন, ২০১৩ : ৪১)

মহামারির দিনে ফাতেমা তার পরিবারের আহারের ব্যবস্থা করে সব দায়িত্ব থেকে মুক্তি পায়নি। কারণ পারিবারিক আধিপাত্যের জায়গায় পুরুষ উচ্চবর্গ নারী নিম্নবর্গ। সেই ব্যবস্থা থেকেই পুরুষের সহজাত, ধারণা ফাতেমা যা করেছে সেটা কর্তব্য। এর জন্য তাকে আলাদা সম্মান দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। শ্রম বিনিয়োগের ব্যবস্থায় মানুষ যখন স্বাধীন নয়, তখন দাসত্ব তাকে বন্দি করে। দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ মানুষের শ্রমশক্তিও বদ্ধ। তাই নারীর শ্রমশক্তি তার জীবনের প্রবহমান স্রোতে

কোনো পরিবর্তন আনতে পারে না (অমর্ত্য, ২০০০ : ১৮)। এই চিত্র কেবলি ফাতেমার নয়, এই অবস্থা সামগ্রিকভাবে নিম্নবিত্তের নারী। পুরুষতন্ত্রের বিধান অনুসারে নারী সব অবস্থাতেই পুরুষের অধস্তন আর পুরুষ উর্ধ্বতন। এই বণ্টনব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে নারীর প্রতি সামাজিক বৈষম্য বাড়তে থাকে। জীবনের সর্বগ্রাসী চাহিদার কাছে নিজেকে বিলীন করে জীবনের প্রবাহে ভেসে থাকে নারী। অর্থনৈতিক অধিকারের অভাব থেকেই সামাজিক অধিকারে অভাবের উদ্রেক হয়, যে রকম বিপরীতভাবে সামাজিক বা রাজনৈতিক স্বাধীনতাহীনতা অর্থনৈতিক স্বাধীনতাহীনতাকে লালিত করে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা মানবজীবনের উন্নতিসাধনের প্রধান বাহন। এই প্রত্যয়কে বাদ দিয়ে সমাজ জীবনের সামাজিক অধিকার নিশ্চিত হয় না (অমর্ত্য, ২০০০ : ২০)।

১৪.

প্রদোষে প্রাকৃতজন ইতিহাসনির্ভর আখ্যান কাহিনি হওয়ায়, এখানে রাজনৈতিক প্রতিবেশ যত সক্রিয়ভাবে ভূমিকা রেখেছে, অর্থনৈতিক পরাভব ততটা প্রকটিত হয়নি। তবু সামন্ত রাজনীতির অন্তরালে গড়ে ওঠা সামন্ত অর্থনীতির একটি সংক্ষিপ্ত অথচ স্বচ্ছ রূপ ফুটে উঠেছে। উপন্যাসটিতে যে বিভিন্ন পেশাজীবী ব্যক্তির পরিচয় যায়, এতে বলা যায় তৎকালীন অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল মূলত কৃষি ও বাণিজ্যের উপর ভিত্তি করে। (শামসুন, ২০১৬ : ২৭৬) রাজনৈতিক সংকটের রোমন্থনকালে যে কয়েকটি পরিবারের কথা কাহিনির কেন্দ্রভূমিতে স্থান পেয়েছে, তারা সবাই নিম্নবর্গাধীন। প্রধান চরিত্র শ্যামাঙ্গ একজন মৃৎশিল্পী, পাশাপাশি লীলাময়ী ও মায়াবতীর অবস্থান। পাল-সেন-পাঠান ত্রিমুখী সংঘর্ষে জনজীবন রিক্ত-শূন্য-পীড়িত। দুর্যোগে গৃহহীন হয়ে তারা যে বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিয়েছে সেখানেও তারা পূর্বের পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত কোনো কাজে নিয়োজিত হয়ে জীবিকা নির্বাহ করেছে। ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে লেখক যে জীবনের চিত্র নিরূপণ করেছেন সেখানে, নিম্নবিত্তাধীন এই নারীদের নিজেদের কোনো অর্থনৈতিক জীবন নেই। অর্থনৈতিক পরাধীনতা নারীর জীবনকে চরমভাবে অবদমন করেছে। লীলাবতী, মায়াবতী, যোগমায়া কারো কোনো অর্থনৈতিক জীবন নেই। তারা সবাই তাদের অর্থনৈতিক চাহিদায় পরিবারের পুরুষ সদস্যদের উপার্জনের ওপর নির্ভরশীল থেকেছে। গৃহকর্মে তাদের শ্রম আছে, অথচ প্রাপ্তি নেই। ঘরকন্নার কাজের বাইরে নারী বাইরের পরিবেশে কাজের কোনো সুযোগ পাইনি। আবার সুযোগ পেলে বিভিন্ন ধরনের সংকট তাদের কাজের পথকে অবরুদ্ধ করেছে। বলা বাহুল্য এই সমস্যার প্রধান কারণ সে দ্বিতীয় লিঙ্গ। প্রকৃতিপ্রদত্ত শারীরিক সীমাবদ্ধতার কারণে বহির্জগতে তাকে বহু জটিলতার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে। ফলে অর্থ-অনর্থতার মধ্যে তাকে গৃহমুখী জীবনকে অনুসরণ করতে হয়েছে।

১৫.

ঘর ভাঙা ঘর উপন্যাসের অধিকাংশ নারীই অর্থনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত। নাগরিক বস্তিজীবনে তারা গৃহশ্রম ছাড়া অন্য কোনো কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেনি, সেই সুযোগও তাদের ছিল না। ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত এসব নারী শ্রমিকের কথা সাধারণ আলোচনায় আসে না। সমাজে নারীর অবস্থান দুর্বল বলেই তাদের উপর অর্থনৈতিক শোষণটি প্রচ্ছন্ন থাকে এবং নারীরা অসহায় বলেই তাদের ওপর পীড়নটিও বেশি হয়। নিম্নবর্গীয় সমাজের নারীরা যেহেতু প্রথম থেকেই জীবিকার্জনের সঙ্গে যুক্ত সুতরাং তাদের জীবনে আর্থিক বৈষম্যমূলক সংকট অপেক্ষাকৃত কম; হয়তো দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকাটাই তাদের জীবনের মূলগত সংকট। আদতে এ ক্ষেত্রেও কিন্তু তারা বঞ্চনার শিকার হতে বাধ্য। উপার্জন করলেও নারীর উপার্জিত অর্থের উপর অধিকার পরিবারের পুরুষ কর্তৃত্বের হাতেই থাকে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর সবচেয়ে বড় সংকট এখানেই যে পরিবারের দায়-দায়িত্ব নারী-পুরুষ উভয়ের হলেও সর্বত্র সমাজ এবং পরিবারের অভিযোগের আঙুল ওঠে নারীর দিকেই। শুধু যে কর্তৃপক্ষের চাপ নারীর ওপর এমন নয়, সম্পর্কের দিক থেকেও অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্তী স্তরের সদস্যদের, এমনকি নিজের আত্মজের পক্ষ থেকেও নারীর বিরুদ্ধে কারণে-অকারণে অনুযোগ ওঠে না, এমন নয়। উপন্যাসে ফুলজানকে দেখা যায় অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা সত্ত্বেও স্বামীর নিপীড়নের শিকার হয়েছে। জোলেখার মা অধিকার আদায়ে সজাগ হলেও শেষ পর্যন্ত দারিদ্র্যের কাছে হার মেনেছে। এভাবে নাগরিক বৈষম্যপীড়িত সমাজে নিম্নবর্গের নারীর জীবন কচুরিপানার মতো ভেসে বেড়ায়, কোথাও শিকড় গড়তে পারে না।

১৬.

সূর্য-সবুজ রক্ত উপন্যাসের চা-বাগানের শ্রমশীল পরিবেশে প্রতিটি নারীই অর্থনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার স্বাদ তারা গ্রহণ করতে পারে না। তাদের সমগ্র জীবন অশিক্ষা, কুসংস্কার আর অজ্ঞতার চার দেয়ালে বন্দি হয়ে রয়েছে। তাদের স্বামীরা যে উপার্জন করে তা দিয়ে মদ চুয়ানী খেয়ে শেষ করে, ঐ অর্থ সংসারের কোনো কাজেই আসে না। নারীর উপার্জিত অর্থ দিয়ে অন্ন-বস্ত্রের প্রয়োজন মেটাতে হয়। চা-বাগানের নারীরা ঘরে বাইরে দুই পরিবেশেই সমান পরিশ্রমী। এই অর্থনৈতিক শ্রম তাদের জীবনের কোনো সুফল বয়ে আনতে পারে না লৈঙ্গিক বৈষম্যের কারণে। পুরুষতন্ত্র ও পিতৃতন্ত্রের প্রকট আগ্রাসনের বিলোপ না ঘটলে নারীর জীবনের প্রকৃত স্বাধীনতার

সুবাতাস বইবে না। চা-বাগানের নারীদের জীবন আরো বিপন্ন কারণ তারা নিজ দেশ, জাতি, সম্প্রদায় ফেলে শুধু দুটো অর্থের আশায়, দুমুঠো অন্নের আশায় বিদেশ বিভুঁইয়ে বছরের পর বছর ধরে পড়ে আছে।

১৭.

রক্তের অক্ষর উপন্যাসের বারাঙ্গনা নারী অর্থ উপার্জনের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত থাকলেও এই অর্থ তার জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে না। একজন যৌনকর্মী বিভিন্ন হাত বদলের মাধ্যমে যেমন এই পেশায় আসে, তেমনি তার উপার্জিত অর্থের বিভিন্ন বণ্টন হওয়ার পর তার হাতে আসে। তার ফলে উপার্জনের সবটার প্রতি সে অধিকার স্থাপন করতে পারে না। নিম্নবর্গের এই নারীরা তাদের শ্রমশক্তি বিনিয়োগ তার যথার্থ মূল্য তাদের হাতে এসে পৌঁছায় না। উপন্যাসে খুব কম যৌনকর্মীকে পাওয়া যায়, যারা স্বাধীনভাবে তাদের জীবিকা চালাতে পারে। তাদের ঘর ভাড়া, খদ্দেরের দালাল বিভিন্ন বিষয়ে তাদের অর্থ চলে যায়। শ্রম শেষে যেটুকু তারা পায়, তা দিয়ে কোনো রকম অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করে। অনেক সংগ্রামের পরে যারা স্বাধীন হতে পারে, তারা কিছুটা সচ্ছলতার মুখ দেখতে পারে ; যেমন জাহান আরা, বকুল, শান্তি। সামাজিকভাবে এই নারীরা ঘৃণিত পেশায় যুক্ত থাকার কারণে তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কোনো সামাজিক মূল্যায়ন তারা পায় না।

১৮.

একাল চিরকাল উপন্যাসের সাঁওতাল নারী ঐতিহ্যগতভাবেই কৃষিকেন্দ্রিক শ্রমের সঙ্গে যুক্ত থাকে। অর্থনৈতিক ভূমিকায় তৎপর থাকার কারণে তারা পুরোপুরি পুরুষের ওপর নির্ভরশীল নয়। অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর মতো সাঁওতাল নারী-পুরুষের কাজের মধ্যে রয়েছে স্পষ্ট শ্রম বিভাজন। এই বিভাজন নারীকে আরো বেশি বঞ্চনার মুখে ঠেলে দিয়েছে। পুরুষ শুধু বাইরের কাজ করবে এমন একটি বদ্ধমূল ধারণা তাদের মধ্যে আছে। নারীকে ঘরে ও বাইরে সবখানেই কাজ করতে হবে। তাদের গবাদি পশুপালন, জ্বালানি সংগ্রহ, কৃষিকাজের মজুরির জন্য মাঠে যেতে হয়। নারীর কাজের ক্ষেত্রে কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় না। বরং কৃষিনির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নারীকে অধিক শ্রম দিতে হয়। এর পাশাপাশি গৃহস্থালি কাজও করতে হয়। তারপরও সাঁওতাল সমাজের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গিতে নারীকে দুর্বল হিসেবে দেখা হয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্য থেকে সৃষ্ট শ্রমবৈষম্য আদিবাসী নারীকে চরম নির্যাতনের মুখে ঠেলে দিয়েছে। ঐ সমাজের পুরুষ এই ব্যবস্থাকে নির্যাতন বলে মানতে নারাজ। নারী এটাকে নিয়ম আর নিয়তি বলে মেনে আসছে।

১৮.১

নারীরা সংসারের জন্য আয় করলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা তাদের ছিল না। নারী তার উপার্জিত অর্থ স্বাধীনভাবে খরচ করতে পারে না। নারী শ্রম ও উৎপাদনের অংশীদার হলে ক্ষমতার অংশীদার হতে পারে না। কারণ পিতা ও স্বামীর সম্পত্তিতে সাঁওতাল নারীর কোনো অধিকার নেই। অনিশ্চিত উত্তরাধিকার নারীর বঞ্চনাকে কেবল জিইয়ে রাখে না, একধরনের সামাজিক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে। (মাসুদ, ২০১৭: ২১৯) শ্রমবিভাগ নারীকে মানুষ পরিচয় থেকে অনেক দূরে সরিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। সামাজিক ভিত্তি কাঠামো ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নামিয়ে দিয়েছে অনেক অবহেলার স্তরে। আদিবাসী নারী শুধু তার সমাজের দ্বারাই বৈষম্যের শিকার হয় না; রাষ্ট্রীয় শোষণ, বৈষম্য ও পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের দ্বারাও সমভাবে নিষ্পেষিত হয়।

১৯.

ধবল জ্যোৎস্না উপন্যাসে আলোচিত নারীরা বিভিন্নভাবে অর্থনৈতিক কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ফাতেমা থেকে শুরু করে সাবজান পর্যন্ত সবাই গৃহশ্রম ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের কায়িক শ্রমের সঙ্গে যুক্ত থেকে জীবন চলে। ফাতেমা আর ফাতেমার মায়ের উপার্জনে তাদের সংসার চলে। ফাতেমার মায়ের চুরুট বেচা আর ফাতেমার বনে জঙ্গলে কাঠফলমূল সংগ্রহের মধ্য দিয়ে তাদের চলে। এ ছাড়া পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে ধান কুড়াতে যায় সে। এ প্রসঙ্গে লেখকের বিবরণ :

> কিষাণরা ধান কেটে নিয়ে যাওয়ার পর কিছু ধান ছড়িয়ে পড়ে থাকে মাঠে। পাখিতে খুঁটে খায়। পাখি তাড়িয়ে ওরা সেই ধান খুঁটে তোলে। ঝাড়ু দিয়ে কুড়িয়ে বাড়ি আনে। ফাতেমার মা সেগুলো ঝাড়ে। সিদ্ধ করে রোদে দেয়। দিনকয়েক খাওয়া চলে। (রিজিয়া, ২০১৭ :১৮৩)

উপন্যাসে সবচেয়ে কর্মযোগী, পরিশ্রমী নারী হ্লামে। শাশুড়ির কাছে অনাদৃত হওয়া ও স্বামীর পলাতক জীবন তাকে স্বাবলম্বী করে তুলেছে। তার বিভিন্ন রকম কর্মস্পৃহার মধ্যে অন্যতম হলো-

> ভরদুপুরে একা একা জঙ্গলে গিয়ে বাঁশ কেটে আনে। সারাদিন বসে বাঁশ চিরে রোদে শুকায়। টুকরি বোনে। অনেকটা পথ হেঁটে গিয়ে বাসে চড়ে টাউন থেকে সুতো কিনে আনে। অবসর সময় নিজের তৈরি তাঁতে খট খট শব্দ তুলে থামি বোনে। (রিজিয়া, ২০১৭ :১৮৩)

এ ছাড়া বনে গিয়ে কাঠ কেটে বাজারে বিক্রি করে। এইরূপ বিভিন্ন কর্মপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সে জীবন যাপন করে। তারপর থাকে স্বামী-শাশুড়ির নির্যাতন-নিগ্রহ। নিম্নবর্গের জীবনে নারীর স্বাধীন

কর্মযোগও তাকে শান্তি দিতে পারে না। তবুও চিরাচরিত জীবন থেকে তাদের মুক্তি মেলে না। উপন্যাসে তেমনি আর একজন পরিশ্রমী ও সংসারী নারী সাবজান। স্বামীর উদাসীনতা তাকে ঘর থেকে বের করেছে। 'চেউয়া আর চিংড়ি মাছ ধরছিলাম। শুঁটকি দিয়ে বাজারে বিক্রি করব।' (রিজিয়া, ২০১৭ : ১৩৭) এভাবে সমুদ্র তীরবর্তী ও পাহাড়ঘেরা জনপদের নিম্নবর্গের নারীর জীবনের প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের জীবিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে। এসব কর্মতৎপরতা তাদের সংগ্রামী জীবনের এককেটি পরিচ্ছেদ তবু তাদের জীবনে আসে না সাবলীল শান্তির পরিবেশ। বিভিন্ন প্রতিকূলতার পথ পাড়ি দিয়ে তাদের বেঁচে থাকতে হয়।

২০.

গ্রামীণ জীবনের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে নারীর সামগ্রিক অবস্থান স্পষ্ট হয়েছে সমাজ আর অর্থনীতির হাত নিয়ে। বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় যেখানে অর্থনীতিই প্রধান চালিকা শক্তি সেখানে কুলসুমের মতো সর্বহারার শ্রেণিচরিত্র স্পষ্টত বিরাজমান। শ্রেণি বাস্তবতার নিরিখে কুলসুম চরিত্রকে নিরীক্ষণ করেছেন লেখক। স্মৃতিবিজড়িত কুলসুমের চোখের সামনে তখন ভেসে ওঠে দাদার সঙ্গে তার ভিখ-মাঙা জীবনের নানা কথা। কত গ্রাম, কত জনপদ, কত খাল-বিল পেরিয়ে তার পথচলা। 'প্রথম দিকে দাদার সঙ্গে কোথাও খেতে বসে একটু বেশি ভাত চাইলেই 'এতকোনো ছুঁড়ির প্যাটখান কত বড় গো!' কিংবা 'অদ্যাখলা ছুঁড়ি!' (আখতারুজ্জামান, ২০১২ : ৩৫৬) যেমন দেখা যায় *সূর্য-দীঘল বাড়ি* র মায়মুনার সঙ্গে। কারো সঙ্গে একটু কথা মনোমালিন্য হলেই শুনতে হয় 'ফকিরের বেটি', ফকিরের লাতনি–এইসব কথা। কুলসুমের অতীন্দ্রিয় ঘ্রাণশক্তি আর দাদার শোলোকের আচ্ছাদনের নিচে বাস্তবের খটখটে ক্ষুধা আর বঞ্চনাময় জীবনের করুণাময় ধারা। কায়িক শ্রম বিচ্ছিন্ন এই নিচুতলার মানুষের অভাবের ঘোর লাগা দশা থেকে মুক্তির পথ কুলসুম পাইনি। ক্ষুধার নৈমিত্তিক যন্ত্রণায় দাদাকে পেশা পরিবর্তনের বারাবর অনুরোধ করলেও তাতে কাজ হয়নি। যমুনার ভাঙনের প্রবলতায় চেরাগ আলি ফকির ভূমিহীন, ভাসমান মানুষে পরিণত হলেও জাত্যাভিমান অটুট ছিল। বোহেমিয়ান মনোবৃত্তি তাদের আর্থিক কাজের প্রতি অনাগ্রহী করে তুলেছে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় এভাবে নিঃসম্বহায় নিরালম্বন হয়ে দিন কাটাতে হয়েছে কুলসুমকে। পূর্ব বাংলার শ্রমজীবী প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর যে সার্বিক জীবনাচার কুলসুম তারই অংশ। আর দশজন গৃহ অনুরাগী গ্রামীণ নারীর মতো জীবনবোধ বা জীবনাচার, তার গড়ে ওঠেনি। গ্রামীণ নারীর গার্হস্থ্য অর্থনৈতিক জীবনের যে প্রতিসরণ ঘটে, তা ঘটেনি কুলসুমের মধ্যে। এ ক্ষেত্রে ফুলজান সর্বার্থে একজন গ্রামীণ শ্রমজীবী নারী। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের শিল্পসাধনার বড় বিষয় হলো তিনি সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়াদিকে

শিল্পের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন (মোস্তফা, ২০১০ : ৪৪)। ফুলজানের চরিত্র নির্মাণ, প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন সেই গণমানুষের প্রতি দায়বদ্ধতার প্রকাশ সুস্পষ্ট। শ্রেণি তাড়িত সমাজদেহের অন্তর্ঘাতে লুকিয়ে থাকে ফুলজানের মতো শ্রমজীবী ভাগ্যতাড়িত নারীরা। দারিদ্র্য আর অপুষ্টির দুর্নিবার আঘাতে ফুলজানের জীবন বিপন্ন। স্বামী কেরামত আলী দুর্ভিক্ষের আভাসে স্ত্রী আর দুই সন্তানকে পিতৃগৃহে রেখে নিরুদ্দেশ হয়েছে। বর্গাচাষি হুরমতুল্লার বড় মেয়ে ফুলজান পিতার সংসারে আর কত দিন বসে খাবে সে। পিতার চাষের কাজে একজন ভূমিমজুরের মতো সকাল-সন্ধ্যা শ্রম বিনিয়োগ করেছে সে :

> –তা দুই বছরের ওপর বাপের বাড়িতে বসে বাপের অন্ন ধ্বংস করছে, বাপের জমিতে কাম না করে তার উপায় কী? তমিজ সব খবরই রাখে। আকালের বছর হুরমতুল্লার জামাই নিজের বৌ বছর দেড়েকের একটা বেটা আর ছয় মাসের একটা বেটি শ্বশুরবাড়িতে গছিয়ে রেখে নেই যে ভাগলো,–বেটিটা মরলো বছর না পুরতে, পেটফোলা বেটাটার পেট দিনদিন আরো ফুলছে তো ফুলছেই, তার তামাটে মুখ রোজ রোজ হলদে হয়, চোখে হলুদ ছোপ গাঢ় হয়ে হয়ে আসছে। (আখতারুজ্জামান, ২০১২ : ৩৯৩)

গ্রামীণ নারীর প্রচলিত গৃহজীবনের বাইরেও আছে তার শ্রম সক্ষমতা, ফুলজানের দায়িত্বশীলতার মধ্যে সে কথা স্পষ্ট হয়েছে। তমিজের সঙ্গে তার যে সম্পর্ক তা শ্রমজাত সম্পর্ক; শ্রমজীবী জীবনের দোসর রূপে তার আবির্ভাব ঘটেছে। যেখানে কৃষিশ্রমিক ফুলজানের দ্বারা কৃষিকাজের ভালো-মন্দের সহযোগিতা পায় তমিজ, অন্যদিকে ফুলজানের অসুস্থ সন্তানের চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন পরামর্শ, চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যাওয়া ; এই সমস্ত কিছুর মধ্যে দিয়ে পরস্পর পরস্পরের কাছের মানুষ, বন্ধু, স্বজন হয়ে উঠেছে। যা তাদের অর্থনীতিকেন্দ্রিক ভাবনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নিগৃহীত নারী কথা বলার সাহস ও শক্তি পায় তার শ্রমজীবী জীবনের সক্ষমতা থেকে। শ্রমিকশ্রেণির অতৃপ্ত কামনা-বাসনার চিত্রায়ণে ইলিয়াস যে চিত্রকল্পের অবতারণা করেছেন, তা থেকে স্পষ্ট হয় যে নিম্ন-কোটির শ্রমজীবী মানুষের চেতন-অবচেতন মনের খবর দেয়ার প্রচেষ্টাই এ ধরনের নির্মিতি। এই শ্রেণিবৈষম্যের মধ্যে কাৎলাহারের পাড়ের মানুষের জীবনঘনিষ্ঠ কথকতায় শ্রেণিবৈষম্যের প্রখরতা উজ্জ্বলভাবে চোখে পড়ে (মোস্তফা, ২০১০ : ৬১)। ফুলজানের শ্রমজীবনের তৎপরতা তার পরবর্তী জীবনের সিদ্ধান্ত নিতে তাকে অনুপ্রাণিত করেছে। পরিবারের গঠন ও বিকাশের মধ্য দিয়ে মানবসমাজের যে গতিপ্রকৃতি নির্ধারিত হয়ে চলেছে বলে নৃতাত্ত্বিকেরা দাবি করেন; ইতিহাসের সেই গতি পথ ধরেই মানুষের সামাজিক চেহারায় পরিবর্তন এসেছে। সেখানে পরাজয় ঘটেছে নারীর; শোষণের ফলে নারীর উপর বেড়েছে শোষণ আর নিপীড়ন। শ্রমজীবী শ্রেণির সামাজিক অর্থনৈতিক মুক্তি ও নারীর সার্বিক মুক্তি একই খাতে বয়ে চলা সংগ্রামের অবিভাজ্য দুটি দিক। বুর্জোয়া পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের শোষণ ও নিপীড়নের গোটা প্রক্রিয়ার মধ্যে সামাজিক অসমতা ছড়িয়ে রয়েছে। আর এই

কারণেই কাঠামোগতভাবে, নারীর একক স্বাধীন জীবনযাপন বুর্জোয়া অহংবোধকে তাড়িত করেছে। মজুরিভিত্তিক শ্রমের ওপর অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতার পাশাপাশি সম্ভব্য স্বাধীন জীবন ও জীবিকা অর্জনের জন্য নিজস্ব আয়ের আকাঙ্ক্ষা ক্রমবর্ধমানহারে নারীর মধ্যে বাড়তে থাকে। এই কাজটি করতে গিয়ে লেখক অলিতে গলিতে, রাজপথে, বস্তিতে, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত নানা শ্রেণিস্তরে একজন বিজ্ঞানীর ন্যায় অবতীর্ণ হয়েছেন। আর ব্যবচ্ছেদ করেছেন শ্রেণিচরিত্রের আলোকিত-অনালোকিত দিকের বাস্তব-অবাস্তাব দিকের সমূহ সম্ভব্যতাকে। এ কারণেই তাঁর উপন্যাসের প্রেক্ষিতে সময়জ্ঞান প্রধান পরিসর রূপে জাজ্বল্যমান হয়েছে। সময়ের প্রসারিত বাহুতে সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতির ক্ষত-বিক্ষত-সংক্ষুব্ধ দিকের বিস্তৃত পরিমণ্ডলে আবর্তিত হয়েছে (শহীদ, ১৯৯৭ : ১৯৫)।

২১.

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে অর্থনীতি-সমাজনীতি-রাজনীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। একে অপরের পরিপূরক হয়ে অবকাঠামোগত অবয়বে জড়িয়ে থাকে। *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* তেমনি একটি উপন্যাস যেখানে অর্থনীতির বঞ্চনা, দুর্ভাগ্যের অশনি সংকেতের পাশাপাশি সমষ্টিবদ্ধ জীবনের মুক্তির সচ্ছলতা, স্বপ্নের নীলিমা প্রত্যক্ষ করা যায়। সামাজিক সমস্ত পরিসেবায় পুরুষের অবস্থান যত শ্রেণি উজ্জ্বল নারীর অবস্থান ততটাই অনালোকিত। কারণ, আমরা জানি নারী শোষিত শ্রেণির মধ্যে দ্বিতীয়বার শোষিত শ্রেণি। উপন্যাসে মালেকের অবস্থান যতটা গুরুত্বপূর্ণ, ততটা অবস্থানগত গুরুত্ব জুলেখার নেই। নদীনির্ভর শাহপরী দ্বীপের সবুজ ভূমি উপন্যাসের অন্য নারীদের তুলনায় সাহসী ও সচকিত করেছে সাফিয়াকে। লৈঙ্গিকবৈষম্যে অন্ধ রাজনীতি তার জীবনের বাঁক পরিবর্তন করে দিলেও তার পথকে রুদ্ধ করতে পারেনি। প্রথম বিয়ের পর বন্ধ্যা নাম নিয়ে মায়ের সংসারে ফিরে আসার পর প্রথম অনুধাবন করছিল জীবনের আসল সত্যতা।

> সোনামিয়ার সংসার থেকে ছিটকে পড়ে ও মরতে চেয়েছিলো অনেক দিন, অনেক বার। প্রথমে বাবার ঘোলা চোখের ব্যথিত দৃষ্টি এবং হুহু কান্নায় নিজেকে ছাড়িয়ে অন্যের কথা ভেবেছে। এখন মা ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। আর বেরুবার পথ নেই। (সেলিনা, ২০২০ : ২৭)

সেলিনা হোসেন নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও সমাজে নারীর মূল্য সম্পর্কে পাঠককে অবহিত করতে চেয়েছেন। বাস্তব সমাজের চোখে নারী অবহেলিত হলেও সাহিত্যে তিনি নারীর যথাযথ মূল্যায়ন করেছেন। নারীর ব্যক্তিত্বের প্রথম সূচক অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। তার তাগিদ সাফিয়া অনুভব করেছিল, তাই মালেকের সঙ্গে ঝিনুকের ব্যবসা শুরু করে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থাকার কারণে সে একটি সুন্দর সচ্ছল জীবনের স্বপ্ন দেখেছে; তার নিজের একটি ঘর হবে। জীবনের বিসর্পিল পথে সেই স্বপ্ন

অধরাই থেকে যায়। নিম্নবর্গের প্রান্তিক নারী উপার্জন করলেও তার অধিকার স্থাপন করতে পারে না। পুরুষতান্ত্রিকতার প্রতিভূ যে শ্রেণি আছে, তা দুমড়েমুচড়ে নেই। উপন্যাসে দেখা যায়, সাফিয়ার উপার্জিত অর্থ হস্তগত করার প্রচেষ্টায় শুকুর কি নির্দয় অত্যাচার করে সাফিয়ার প্রতি :

> এ যেন অন্য শুকুর, ওর স্বামী নয়, মানুষ নয়, শুধুই মাতাল এবং জুয়াড়ি একটা। ও সোজা সাফিয়ার সামনে এসে দাঁড়ায়। টেঁয়া দে! টেঁয়া! সাফিয়া চোখ কপালে তোলে.. টেঁয়া দ? বহুত টেঁয়া দরকার।...শুকুর মুখ খিঁচিয়ে উঠে সাফিয়ার চুলের মুঠি ধরে। দমাদম কিল চড় লাগায়। অসুরের শক্তি যেন, বাধা দিতে পারে না ও। শেষে ওকে বারান্দায় ধাক্কা দিয়ে ফেলে খোপ থেকে কয়েকটা হাঁস ধরে নিয়ে যায়। (সেলিনা, ২০২০ : ১১২-১১৩)

নিম্নবর্গীয় সমাজে নারী জীবিকার্জনের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও লৈঙ্গিক বৈষম্যের তর্জনীটি কম থাকে না। লিঙ্গ-বিভাজনের পথ ধরে নারী অবদমনের বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় একান্ত আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব কোথাও কোথাও পোষণ করে। সমাজ-সংসারের কঠিন পরিসর অতিক্রম করে নারী যখন দুটো অর্থের মুখ দেখে তখন খুব সহজে তাকে হাতছাড়া করতে চায় না। যেখানে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকাটা তাদের জীবনের মূলগত সংকট; সেখানে তারা বঞ্চনার শিকার অনেকটা বাধ্য হয়েই হয়। তাই নারীর উপার্জিত অর্থে পুরুষের কর্তৃত্ব হতেই থাকে। তারপরেও নারীর উপার্জন নারীকে যে স্বাধীনতার সুখ দেয়, গৃহনির্ভর নারী সেই সুখ কখনোই পায় না। সাফিয়া আর্থিকভাবে স্বাধীন হওয়ায় শুকুরের মৃত্যু তাকে স্পর্শ করে না। বরং অনেকটাই ভারমুক্ত জীবনের স্বাদ অনুভব করে। মালেকের প্রতি গভীর থেকে টান অনুভব করার সুযোগ পেয়েছে। উপন্যাসের অন্য ক্ষেত্রে যা একেবারেই সম্ভব নয়।

২১.১

জয়গুনের জীবন কেটেছে একজন সাধারণ গৃহবধূরূপে। নিজ গৃহের গৃহকর্ম ছাড়া যার কোনো কর্মপ্রয়াস লক্ষ করা যায়। এই পরিবৃত্তে একজন নারীকে যে সক্রিয় ও কর্ম উদ্দীপনাময়। সে সাফিয়ার মা জয়গুন। মা-মেয়ের সংসারের নিত্যসঙ্গী অভাব। সেই অভাবকে পেছনে ফেলে বাঁচার আশায় দীর্ঘদিন ধরে তোরাব আলীর সংসারে কাজ করে সে। সারা দিনের অক্লান্ত শ্রমের পর যে খাবার পায়, তা মা-মেয়ে তাদের রাতের আহার্য সম্পন্ন করে। মায়ের পরিশ্রমলব্ধ জীবন সম্পর্কে সাফিয়ার ধারণা এইরূপ: 'যথেষ্ট বয়স হলেও শরীরের বাঁধুনি ভালো, খাটতে পারে। তোরাব আলীর বাড়িতে কাজ করে। কাজে ফাঁকি নেই বলে তোরাব আলীর বউ ভীষণ পছন্দ করে।' (সেলিনা, ২০২০: ২৬) এই কাজের ফলে তাদের মা-মেয়ে রাতের খাবার আসে তোরাব আলীর সংসার থেকে। তার কর্ম স্পৃহাময়

জীবনের প্রচেষ্টা এখানে শেষ নয়। স্বামী বা পুত্রসন্তান না থাকায় প্রতিদিনের আহার্য জোগানোর পাশাপাশি অন্যান্য খরচের উৎস তাকে ব্যবস্থা করতে হয়। তাই গৃহের আঙিনায় সবসময় হাঁস-মুরগি পালন করে। ডিম বিক্রি করে ওদের তেল-লবণের খরচ চলে; এ বিষয়ে জয়গুনের ভাবনা ছিল নিম্নরূপ :

> বাঁধের নিচেই বিডিআর সীমান্ত-ফাঁড়ি। ওরা রোজ অনেক ডিম কেনে। জয়গুণের ইচ্ছে আরো কিছু হাঁস মুরগি পেলে ডিমের ব্যবসা করবে। কিন্তু পারে না। মাঝে-মাঝেই মড়ক লেগে সাফ হয়ে যায়। কষ্টের সংসারে বড়ো লোকসান সয় না, তবু সইতে হয়। ভাঙা কোমর সোজা রাখতে হয়। (সেলিনা,২০২০ : ২৭)

জয়গুন প্রকৃত অর্থে একজন কর্মযোগী নারী। জীবনের সবকূল পার করে এসে শেষ সময়ে এসেও তার যে প্রবল কর্মস্পৃহা, তা প্রশংসার দাবি রাখে। নিম্নবর্গ জীবনের আর্থিক প্রতিকূলতাকে সে জীবন দিয়ে আত্মস্থ করেছে। তাই জীবনের যেখানে যতটুকু উপার্জনের সুযোগ আছে, তার যথাযথ ব্যবহারে সে সব সময় উদ্যোগী। একজন নারী হিসেবে সে সদা সতর্ক তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে। সেই কারণেই সে শুকুরকে অপছন্দ করে, মালেককে অনেক বেশি বিশ্বাস ও নির্ভর করে। তার চরিত্রের এই সমস্ত বাস্তবোচিত গুণাবলি তাকে অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করেছে। মাতৃত্বের দায়িত্বের বাইরেও নাফ নদীর সংকীর্ণ পরিবেশে সে একজন অনন্য নারী ব্যক্তিত্ব।

২২.

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে নানারকম অসমতা আছে। যার মধ্যে নারী-পুরুষের অসমতা অন্যতম। সমাজের চোখে পুরুষ যুক্তি বুদ্ধি চেতনার অধিকারী আর নারী যুক্তিবুদ্ধিহীন আবেগের বশীভূত। যুগ যুগ ধরে এভাবেই নারী-পুরুষের মধ্যে বিভেদের বৈষম্য তৈরি হয়ে আসছে। নারীকে হেয় করে রাখা হয়েছে। ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেন অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও সহানুভূতির সঙ্গে সমাজের অনাদৃত, অবহেলিত শ্রেণিকে তার সাহিত্যকর্মে তুলে ধরেছেন। তাঁর তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী প্রতিভায় উপন্যাসে সমাজ-সংস্কারকের বিদ্রোহী মূর্তি স্পষ্টতা পেয়েছে। *নীল ময়ূরের যৌবন*-এর চর্যাপদের প্রচীন সমাজেও নারী পুরুষের সামাজিক অর্থনৈতিক সমতা স্থাপনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বিশেষ করে অর্থনৈতিক কর্মপ্রয়াসে নারীর সহজ স্বাভাবিক অংশগ্রহণ তাদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করেছে। এখানে নারীর সহজাত আধুনিক জীবনবোধের রূপায়ণ ঘটেছে; পুরুষপ্রধান সমাজে নারীরা হার মানেনি। তারা সবাই অর্থনৈতিক কর্মপ্রয়াসের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেছে। উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্র ডোম্বী। সে প্রতিবাদ প্রতিরোধে যেমন বহ্নিশিখা, তেমনি কর্মজীবনে স্বাধীন ও স্বনির্ভর। তার পেশা নৌকা চালানো ও খেয়া পারাপার করা। এই কাজে সে কারো অধীন নয়, নিজের নৌকা

নিজে বায়। স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কে মনের মিল না হওয়ায় জীবন আলাদা করে নিয়েছে সে। একজন নিম্নবর্গের নারী সম্পূর্ণ স্বাধীন জীবনপ্রয়াসের এক জ্বলন্ত উদাহরণ সে।

২৩.

যাযাবর বৃত্তি ছেড়ে মানুষ যখন ঘর বাঁধল, ঘরের দায়িত্ব পড়ল নারীর ওপর আর পুরুষ নিল বাইরের দায়িত্ব। পিতৃত্ব নির্ণয়ের জন্য নারীকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বানাল পুরুষ। নারী গৃহবন্দি হলো মাতৃত্ব গার্হস্থ্যের সীমানা হলো ; এই চুক্তির মধ্যে লুকিয়ে আছে নারীর পরাজিত জীবনের সব গল্প। (মল্লিকা, ২০০২ : ১১৩) *জলোচ্ছ্বাস* উপন্যাসের নারীরা সেই প্রথানুগ জীবনেরই বসতি। উপকূলীয় জীবনের প্রতিঘাতী পরিবেশে তারা অদম্যরকম আপোসহীন জীবন ও জীবিকাসংলগ্ন। প্রথানুসারেই আমরা জানি নারীর শ্রম কখনো দৃশ্যমান হয় না। তবু বেঁচে থাকার প্রয়োজনে তাদের কাজ করতে হয় সংসারের জন্য সন্তানের জন্য। জলোচ্ছ্বাসে স্বামী-সংসার হারিয়ে বিপর্যস্ত জীবনে টিকে থাকার প্রয়োজনে সে বিভিন্ন ধরনের গৃহনির্ভর শ্রমের সঙ্গে নিযুক্ত হয়েছে। ‘করম আলীর অজস্র নিষেধ উপেক্ষা করে শরীফা হাওলাদারের বাড়ি ধান ভানতে যায়।... ফেরে দুপুর গড়িয়ে গেলে এক পোটলা খুদ-কুঁড়া নিয়ে। আসার সময় পথ থেকে জাংলা কুড়িয়ে আনে এক আঁটি।’(সেলিনা, ২০১৯ : ১৯৫) আত্মসম্মানে অনড় শরীফা ভাইয়ের সংসারে বোঝা হয়ে থাকেনি। উপকূলীয় জীবনের দুর্নিবার আঘাত তার জীবনকে স্তম্ভিত করে দিলেও, পেটের ক্ষুধা তো শেষ হয়ে যায়নি। তাই বাঁচার প্রয়োজনে, সন্তানদের ক্ষুধা মেটানোর প্রয়োজনে তাকে কাজ করতে হয়েছে। সামন্তবাদী সমাজ পরিসরে গৃহনির্ভর এই সমস্ত শ্রম বিনিয়োগ নারীকে নিশ্চিন্ত করতে পারেনি। কারণ, এই পরিসরে নারী তার শ্রমের যথার্থ মূল্য পায় না। শরীফা ছাড়া তার আর দুই বোন আলেয়া ও আকাশী বিভিন্নভাবে সংসারে সহযোগিতার চেষ্টা অব্যাহত রাখে। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় : ‘আলেয়া হাঁস পোষে। দুই জোড়া হাঁস আছে। আকাশীর আছে এক জোড়া মুরগি।...ডিম ফুটিয়ে যখন বাচ্চা তোলে তখন হলুদ নরম বাচ্চাগুলোকে ঘিরে আলেয়ার সে কী মমতা! করম আলী অবাক হয়।.. মেয়েগুলো কি মা হওয়ার জন্য জন্মায়? (সেলিনা, ২০১৯ : ১৯৬) নারী মানে যে পেলব, মধুর, সেবাপরায়ণ, নির্ভরশীল মমতাময়, গৃহশ্রমনিপুণ, এক সৌন্দর্যপ্রতিমা এই ধারণাগুলো সমাজের তৈরি। আজকের নারী এই মধুজালের মোহ ছিঁড়ে কাজের পৃথিবীতে বেরিয়ে এসেছে। পুতুলের ভাষা ভেঙে বেরিয়ে এসেছে, নিজের কথা নিজে বলতে শিখেছে। (মল্লিকা, ২০০২ : ১১৪) নারীর এরূপ জয়যাত্রার মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গের নারী প্রতি পদক্ষেপে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে পথ চলেছে। শরীফা, আলেয়া, আকাশীর

পৃথিবী সামাজিক সংস্কারের পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগের অবরুদ্ধ। এই সংকটময় পারিপার্শ্বিকতা তাদের অর্থনৈতিক সম্পৃক্ততায় আন্দোলিত করেছে।

২৩.১

জলোচ্ছ্বাস-এর দুর্যোগময় পরিবেশে স্বাধীন-স্বতন্ত্র নারী কলিমন। স্বামীর নিরুদ্দেশ যাত্রা তাকে আহত করলেও বৃদ্ধ মা আর সন্তানের দায়িত্ব নিয়ে যথানিয়মে জীবন পাড়ি দিয়ে চলেছে। শৈশব থেকেই সে অন্য আর দশটি নারী থেকে আলাদা। তারপর জীবনের এই শূন্যতা তাকে আরো সাহসী ও দুর্নিবার করে তুলেছে। স্বামীর নিরুদ্দেশ হওয়ার পর থেকে সে নিজের ও সন্তানের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে। হাঁস-মুরগি পালন ও ডিম বিক্রি, বাড়ির আঙিনায় শাক-সবজির চাষ তার অর্থনৈতিক উৎস। তার দাসীবৃত্তির কাজ তার কোনো দিনই পছন্দ নয় তাই সে নিজের হাতে নিজের জীবনের দায়িত্ব তুলে নিয়েছেঃ

> সেই থেকে কলিমন তরিতরকারির চাষ, হাঁস-মুরগি পেলে, বাড়ি বাড়ি ধান ভেঙে কোনোমতে চালিয়ে যাচ্ছে।...উঠানে পুঁইয়ের মাচা তৈরি করে চালের উপর লাউয়ের ডগা তুলে দেয়। দখিনা বাতাসের অল্প পরশে গাছের ডগা যখন লকলক করে তখন অনাগত দিনের সুখ-স্বপ্ন যেন গুনগুন করে ওঠে কলিমনের মনে। (সেলিনা, ২০১৯ :২১৬)

এভাবে নিরাবলম্ব জীবনে বাঁচার পথ খুঁজে নিয়েছে কলিমন। নিজের স্বাধীন জীবিকা দিয়ে নিজের বাঁচার পথ করেছে। জীবনের অসহায়তার হার না মেনে, ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্নকে লালন করেছে, প্রতিষ্ঠিত করেছে। কলিমন চরিত্রের এই দৃঢ়তা একাগ্রতা তাকে অন্য সব নারী থেকে আলাদা করে স্বাধীন স্বতন্ত্র ব্যক্তিতে রূপান্তরিত করেছে।

গ্রন্থপঞ্জিঃ

১. অমর্ত্য সেন (১৪২২)। *জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি*, আনন্দ, কলকাতা

২. অমর্ত্য সেন (২০১৯)। উন্নয়ন ও স্বাক্ষরতা, আনন্দ, কলকাতা

৩. অমল দাশ (২০১৩)। *ভারত ইতিহাসে নিম্নবর্গের নারী শ্রমিক এদের সংকট ও সংগ্রাম উনিশ থেকে বিশ শতক*, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা

৪. অদ্বৈত মল্লবর্মণ (২০১৫)। *অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনা সমগ্র*, দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা

৫. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৯৬)। *খোয়াবনামা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

৬. আলাউদ্দিন আল আজাদ (২০১৩)। *ক্ষুধা ও আশা*, বাতায়ন প্রকাশন, ঢাকা।

৭. আনু মুহাম্মদ (২০১৮)। *বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতি*, মীরা প্রকাশন, ঢাকা

৮. আবু ইসহাক (২০১৭)। *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা

৯. আবুল বারকাত, *Bangladesh Journal of political Economy*: vol. 27, No1&2, 2011, pp.029-030.

১০. কল্যাণ মিরবর (২০২০)। *বাংলাদেশের উপন্যাস (১৯৭১-১৯৮৭)*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ,ঢাকা

১১. ছন্দশ্রী পাল (২০০৯)। *বাংলাদেশের উপন্যাস পরিবার ও সমাজ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

১২. জহর সেনমজুমদার (২০১৭)। *নিম্নবর্গের বিশ্বায়ন*, পুস্তক বিপনি, কলকাতা

১৩. দেবযানী ভৌমিক চক্রবর্তী (২০১৪)। *তুলনার প্রেক্ষিতে বঙ্কিম-রবীন্দ্র উপন্যাসে নারী-মনস্তত্ত্ব*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

১৪. বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০০৯)। *বাংলাদেশের সাহিত্য*, আজকাল, ঢাকা

১৫. মনসুর মুসা (২০০৮)। *পূর্ব বাঙলার উপন্যাস*, অ্যার্ডন পাবলিকেশন, ঢাকা

১৬. মুহম্মদ ইদ্‌রিস আলী (১৯৮৮)। *আমাদের উপন্যাসে বিষয়-চেতনা বিভাগোত্তর কাল*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

১৭. মোসা. শামসুন নাহার (২০১৬)। উপন্যাসে প্রাচীন বাংলা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

১৮. মোহাঃ সাইদুর রহমান (২০১১)। *আমাদের তিন ঔপন্যাসিক*, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা

১৯. শওকত ওসমান (২০১১)। *জননী*, সময় প্রকাশ, ঢাকা

২০. শহীদুল্লা কায়সার (২০১৭)। *সারেং বৌ*, চারুলিপি প্রকাশন, ঢাকা

২১. শহীদুল্লা কায়সার (২০১৭)। *সংশপ্তক*, চারুলিপি প্রকাশন, ঢাকা

২২. শহীদ ইকবাল (১৯৯৭)। *কথাশিল্পী আখতারুজ্জামান ইলিয়াস*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন

২৩. শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম (২০১৬)। *কাশবনের কন্যা*, বিভাস, ঢাকা

২৪. সরদার জয়েনউদ্‌দীন (১৩৭১ব.)। *পান্নামোতি*, ওসমানিয়া বুক ডিপো, ঢাকা

২৫. সেলিনা হোসেন ও বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পা.২০০৮)। *জেন্ডার আলোকে সংস্কৃতি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

২৬. সেলিনা হোসেন (২০১৩)। *নীল ময়ূরের যৌবন*, ঐতিহ্য প্রকাশ, ঢাকা

২৭. সেলিনা হোসেন (২০০৫)। *চাঁদবেনে*, আহমেদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা,

২৮. সেলিনা হোসেন (২০২০)। *উপন্যাসত্রয়ী*, পাঞ্জেরী প্রকাশ, ঢাকা

২৯. সেলিনা হোসেন (২০১৯)। *রচনাবলি ১*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা

৩০. হরিশংকর জলদাস (২০০৮)। *নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাস ও কৈবর্তজনজীবন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৩১. হাসান আজিজুল হক (২০১৭)। *কথাসাহিত্যের কথকতা*, সাহিত্যিক, ঢাকা

সহায়ক প্রবন্ধ :

১. জামরুল আহসান বেগ (২০০৭) 'সূর্য-দীঘল বাড়িঃ বৃত্ত ভাঙার সীমিত প্রয়াস', ফজলুল হক সৈকত [সম্পা.] *কথাশিল্পী আবু ইসহাক*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা

২. বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০১৯) 'কাশবনের কন্যা : নারীর মুখ' মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ [সম্পা.] *শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের কাশবনের কন্যা লৌকিক জীবনের গাথা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

৩. মাসুদ পারভেজ (২০১৭) 'রিজিয়া রহমানের একাল চিরকাল' চন্দন আনোয়ার [সম্পা.] *গল্পকথা রিজিয়া রহমান সংখ্যা*, রাজশাহী

৪. সৌমিত্র লাহিড়ী (২০১৭) 'ধবল জ্যোৎস্নাঃ স্বপ্ন-দুঃস্বপ্নের আদিম আখ্যান' চন্দন আনোয়ার [সম্পা.] *গল্পকথা রিজিয়া রহমান সংখ্যা*, রাজশাহী

৫. হান্নানা বেগম, আবুল বারকাত [সম্পা.] *Bangladesh Journal of political Economy*: vol. 27, No1&2, 2011, pp.029-030.

তৃতীয় অধ্যায়

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নিম্নবর্গের নারীর রাজনৈতিক অবস্থান

নারী-পুরুষের লিঙ্গ-সমতার কথা বাংলাদেশের সংবিধানে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করা আছে। সমতাভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র গড়তে হলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। সে-কারণেই রাজনীতির সকল পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ আবশ্যক। নারী সামাজিক সচেতনতার অংশ হিসেবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে। রাজনীতির প্রতি নারীর আগ্রহ স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত বিস্তৃত। নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ প্রধানত দুটি লক্ষ্যে চালিত হয়েছিল, প্রথমত, নারীর ভোটাধিকারের জন্য আন্দোলন; দ্বিতীয়ত, পুরুষের পাশাপাশি স্বাধীনতাসংগ্রামে যোগদান করা। ভোটাধিকার অর্জনের পথে নারীদের বিভিন্ন ধরনের বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। সংগঠিত নারীশক্তির ঐক্য ছাড়া ভোটাধিকার অর্জন করা সম্ভব ছিল না। বাংলাদেশে এই আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন কুমুদিনী বসু, কামিনী রায়, মৃণালিনী সেন এবং জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী। তাদের নেতৃত্বে সংগঠিত নারীসমাজ ভোটাধিকার অর্জনের সংগ্রাম করেছিল। এই সংগ্রামে দুজন মুসলিম নারীও অংশগ্রহণ করেছিল; তারা হলেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন ও বেগম সুলতান মুয়াজিদ্‌জাদা। ১৯২৫ সালে বঙ্গীয় আইনসভা নারীর ভোটাধিকার অনুমোদন করে এবং ১৯২৬ সালে বাংলার নারী সর্বপ্রথম এই অধিকার প্রয়োগ করে। ভোটাধিকার অর্জনের মাধ্যমে বাংলার নারী সার্বজনিক পুরুষ-প্রাধান্যের জগতে প্রবেশ করে।

১.

ভোটাধিকারের সাংবিধানিক অধিকার অর্জনের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল স্বাধীনতাসংগ্রামে নারীর আত্মনিবেদন। ১৯২০ সালের খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনে বাংলার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন সি.আর দাস ও তাঁর স্ত্রী বাসন্তী দেবী। সি.আর দাসের কারাবন্দিত্বের সময় বাসন্তী দেবী বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। একজন সাধারণ গৃহবধূ থেকে রাজনীতির খোলা ময়দানে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা বাঙালি নারীর এক অনন্য দৃষ্টান্ত বাসন্তী দেবী। পরবর্তীতে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার হলেও বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর উৎসাহের ভাটা পড়েনি। তারা আকৃষ্ট হয়েছিল সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের দিকে। এই ধারার রাজনীতিতে প্রথম

এগিয়ে আসেন ঢাকার মেয়ে লীলা রায়। মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারের নামে গড়ে তুললেন একটি সংগঠন, যার নাম ছিল ‘দীপালী সংঘ’। এর আসল উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবী আদর্শের দিকে মেয়েদের আগ্রহী করে তোলা।

১.১

এরপর ১৯২৮ সালে আরও একটি রাজনৈতিক সংস্থার জন্ম হয় কলকাতায়। ‘ছাত্রী সংঘ’ নামের এই সংগঠনটির সভানেত্রী ছিলেন সুরমা মিত্র সম্পাদক ছিলেন কল্যাণী ভট্টাচার্য। এই সংগঠন সদস্যদের সাঁতার কাটতে আর আত্মরক্ষা করতে শেখাত। এদের প্রধান শিক্ষক ছিলেন একনিষ্ঠ বিপ্লবী নেতা দীনেশ মজুমদার। পরবর্তীতে ‘দীপালী সংঘ’ ও ‘ছাত্রী সংঘে’র মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল। এর সদস্য ছিলেন বীণা দাস, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত প্রমুখ। তারা সবাই সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে, সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সংগঠনগুলো সব থেকে বড় অবদান ছিল নারী-পুরুষের বিভাজনরেখাকে লোপ করা। তারা মেয়েদের শক্তিকে পুরুষের শক্তির সমতুল্য মনে করতেন। এই চেতনার ধারাবাহিকতায় তাঁরা গড়ে তুলেছিল একদল স্বাধীনচেতা, দৃঢ় মনোবলসম্পন্ন তরুণীকে যাঁরা দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের আদর্শকে অন্য তরুণীদের মধ্যে প্রচার করতে দৃঢ়পণ করেছিলেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায়, ১৯২০ দশক থেকে তৃতীয় দশক পর্যন্ত বাংলার রাজনীতিতে বাঙালি নারী একটি অভূতপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তার মানে এই নয় যে সেদিনের প্রেক্ষপটে বাঙালি নারীর রাজনীতিতে আসার পথ সহজ ও সাবলীল ছিল। সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কথা স্মরণে রেখেই তাঁরা রাজনীতির দুর্গম পথে পা বাড়িয়েছিল।এ প্রসঙ্গে প্রীতিলতা ওয়াদ্দোরের একটি চিঠি উজ্জ্বল দৃটান্ত; তিনি লিখেছিলেন যে, ভারতীয় সমাজে মেয়েদের জোর করে নিচে ঠেলে রাখা হয়েছে। রাজনীতির ময়দানে আত্মদান করে মেয়েরা প্রমাণ করেছে যে- কোনো অংশেই তারা পুরুষদের তুলনায় কম নয়। পাশাপাশি এ কথাও স্মরণীয় যে রাজনৈতিক অধিকার অর্জন হলে নারীর সামাজিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হবে। সে আশা যে দুরাশা ছাড়া আর কিছু নয়, তার প্রমাণ নারী কিছুকাল পরেই পেয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল বহুমাত্রিক; কখনো সম্মুখসমরে, কখনো ছদ্মবেশে খবর সংগ্রহকারী হিসেবে। সবচেয়ে বড় অবদান রেখেছে আহত মুক্তিযদ্ধাদের সেবাশুশ্রূষা করার মধ্য দিয়ে। এর পাশাপাশি আরো যেসব নারী মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেছে, তাদের কোনোটিকেই গৌণ করে দেখার অবকাশ নেই। ফরাসি বিপ্লব থেকে শুরু করে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সমস্ত আন্দোলনেই নারী অবদান রেখেছে; নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বললেও আজও তা সংবিধানেই লিপিবদ্ধ থেকেছে, তার পূর্ণ বাস্তবায়ন ঘটেনি। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই নারীকেই করতে হবে, সেখানে

রাজনীতি একটি বড় মাধ্যম। এই জন্য রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলোকে সুদৃঢ় পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। যার মধ্য দিয়ে নারীর রাজনৈতিক অধিকার সহজাত প্রবণতা হয়ে ওঠে।

২.

ঔপনিবেশিক রাজনীতির অবরুদ্ধতাকে উপেক্ষা করে কোনো সাহিত্য রচিত হতে পারে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের সর্বগ্রাসী কদর্যতা সঙ্গে নিয়ে ভারতভূমির বেড়ে ওঠা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন লেখক অদ্বৈত মল্লবর্মণ জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম মহাসমরের বিরূপ সময়ের অভিঘাতে শৈশব আর কৈশোর পাড়ি দেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখক হয়ে ওঠেন। নিম্নবর্গের সীমাবদ্ধ জীবনব্যবস্থায় ঔপনিবেশিক রাজনীতি সরাসরি বা প্রত্যক্ষরূপে প্রবেশ করে না; তার ছায়া পরোক্ষভাবে অবিনাশীরূপে দুর্গ গড়ে তোলে। কৌমজীবনের সমাজব্যবস্থায় মালো নারীর পরিচিত সীমানার বাইরে যাওয়ার অভিজ্ঞতা নেই বললেই চলে। তাদের বাইরের জগৎ বলতে পতিগৃহ থেকে পিতৃগৃহ আসা-যাওয়ার এই সীমিত পরিক্রমা। সামাজিক সীমানার চতুর্থবর্গের অন্তপ্রদেশে যাদের বসবাস, তারা জানে না এদেশ কোন রাজনৈতিক ভূখণ্ডের আওতায়। কোন শাসকগোষ্ঠীর সুচতুর কৌশলে এই রাষ্ট্রের আইনকানুন প্রবর্তিত, পরিবর্তন ও প্রয়োগকৃত হয়ে থাকে। তারা না জানলেও সমাজপতিরা জানে, রাজনৈতিক দিকপালেরা জানে, কোন কৌশল তাদের জীবনকে আরো বিপন্ন, আরো সংশয়াতীত করে তোলা যায়। তাই রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে তারা শুধু এক একটি সংখ্যা, তাদের জন্ম, মৃত্যু, দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা রাষ্ট্রের কোনো ভাবনার মধ্যে আসে না। এ প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণে আসে *আরণ্যক* উপন্যাসের আদিবাসী নারীর কথা, যে জানে না ভারতবর্ষ কোনদিকে বা কোথায়। তেমনি মালোপাড়ার অশিক্ষিত, অজ্ঞ নারীরাও জানে না রাষ্ট্র কী? তাতে তাদের ভূমিকা কী? আবার রাষ্ট্রই বা তাদের জীবনে কী ভূমিকা রাখে? এ প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি, ভারতের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি নারীকে সামাজিক ঐতিহ্যের আঁধারে অন্ধ করে রাখতে চেয়েছে। রাজশক্তি বা রাজনৈতিক যেকোনো অভিপ্রায় থেকে তাদেরকে দূরাগত কোনো পৃথিবীতে ব্যস্ত রাখতে চেয়েছে। সেখানে সব ক্ষমতার উৎস পিতৃতন্ত্র বা পুরুষতন্ত্র, তার বাইরে সবকিছু নির্জীব, নিরস্ত্র। তারপরও ঔপন্যাসিকের আন্তরিক প্রচেষ্টায় যেটুকু রাজনৈতিক অভিগমন ঘটেছিল, তাও বিভিন্ন কারণে অপহৃত হয়েছে। তবে সমস্ত উপন্যাসে নারীর যে উজ্জ্বল অবস্থান, তাতে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা না থাকলেও তা অসম্পূর্ণ নয়। রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার সবার অস্বীকৃতি বা অসৌজন্যতাকে অস্বীকার করেই সামনে এগিয়ে চলে। তিতাসপাড়ের এই নারীরাও তারই সহযাত্রী, তাদের স্পন্দন ইতিহাসের পাতায় স্বীকৃতি না পেলেও কালের অভিযাত্রায় তারা নির্জন সাক্ষর রেখে চলেছে।

৩.

ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সবসময়ই উত্তাল। সেখানে গ্রামীণ জীবনের নিস্তরঙ্গতা ভেদ করে সেখানেও 'শাসন কর ভাগ' কর নীতির প্রভাব পরিদৃষ্ট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন প্রবাহ থেকে শুরু করে দেশভাগ পর্যন্ত সময়ের পরিসরে *জননী* উপন্যাসটি রচিত। ঔপন্যাসিক রূপদান করেছেন রচনা সময়ের প্রায় বিশ বছর পূর্ববর্তী পশ্চিম-বাংলার গ্রামজীবনকে। রাষ্ট্রীয় এই সংকটময় সময়ের মহেশডাঙ্গা গ্রামের দারিদ্র্যপীড়িত কয়েকটি পরিবারের, বিশেষ করে উপন্যাসের নায়িকা দরিয়াবিবির পরিবারের নির্মম বাস্তবতাকে। সময়ের বিরূপ বাসনায় আজহার খাঁর মতো শ্রমজীবী আহোরাত্রি শ্রম দিয়েও সৎভাবে বাঁচার পথ তৈরি করতে পারে না। অথচ ইয়াকুবের মতো স্বার্থোন্মত্ত মানুষেরা দুহাতে অর্থ উড়িয়ে বেড়ায়। আজহার-দরিয়ার পারিবারিক চালচিত্রের পাশাপাশি গ্রামীণ জমিদারের শোষণ তৎপরতা কাহিনির অংশ হিসেবে উপন্যাসে সম্পৃক্ত। দেশভাগ পূর্ববর্তী অপরাজনীতির অংশ হিসেবে সাম্প্রদায়িক সংঘাত ও সম্প্রীতির সমসাময়িকতা যথাযথ যুক্তিতে প্রযুক্ত। এ প্রসঙ্গে হাসান আজিজুল হকের মন্তব্য : সম্ভবত রাজনৈতিক-সামাজিক পরিবর্তন শহরে স্ফীতি ও চাকচিক্যময় জীবনপ্রবাহের সৃষ্টি করলেও গ্রামগুলো রয়ে যায় পূর্ববৎ নিস্তরঙ্গ এবং নিথর। এই বিবেচনা থেকেই শিল্পী শওকত ওসমান জনজীবন এবং দেশের বঞ্চনা ও বেদনাকে উপজীব্য করে তোলার জন্যই চল্লিশের দশকের গ্রামের কথা লিখেছেন (হাসান, ২০১৩ : ১৭)। উপন্যাসের কাহিনির গতিকে সম্প্রসারিত করতে মুসলিম পারিবারিক আইনের একটি জটিলতর দিকের সন্ধান মেলে। পিতার পূর্বে পুত্রের মৃত্যু হলেও সেই সন্তানের স্ত্রী পুত্র সম্পত্তির ওয়ারিশ হয় না। রাষ্ট্রীয় আইনের এই অমানবিক দিকটি বাংলাদেশের সাহিত্যে বিভিন্নভাবে এসেছে। এই ঘটনায় মৃত ঐ ব্যক্তির পরিবার সর্বাপেক্ষা নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে পড়ে। অথচ আইন কাজ করে যারা সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে আছে তাদের পক্ষে। দরিয়াবিবির জীবনকেন্দ্রিক যে সংকটের সর্বায়বরূপ, সেখানে তার প্রথম স্বামীর সম্পত্তিতে, মোনাদিরের অধিকার না থাকার কারণে। অনুভূতিশীল ও স্পর্শকাতর মানুষ হিসেবে ঔপন্যাসিক শওকত ওসমান মুসলিম আইনের এই অন্ধকার অধ্যায় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল : 'স্বামী পিতার কোলে ইন্তেকাল করিয়াছেন। শরিয়ৎ মতে শ্বশুরের সম্পত্তির উপর তার বা মোনাদিরের কোন অধিকার না।' (শওকত, ২০১১ : ৫৪) দরিয়ার জীবনের ক্ষতস্থান মোনাদিরের প্রতি স্নেহান্ধতা দিয়ে তার চরিত্রের ট্রাজিক পরিণতির প্রতিকৃতি। ধর্মীয় সংস্কারের কাছে মানবিকতা কতখানি অবদমিত, তা লেখকের জীবনঘনিষ্ঠ ও সংবেদনশীল মননশীলতার পরিচায়ক রূপে বিধৃত। ব্রিটিশ শাসনের অন্তিমপর্বের আর্থ-সামাজিক ঘটনাবলির সঙ্গে সঙ্গে ওহাবি-ফারাজি আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা

উপন্যাসের রাজনৈতিক স্মৃতিপটের লক্ষযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তবে এই সমস্ত ঘটনার সঙ্গে উপন্যাসে চিত্রিত নারী চরিত্রের যোগাযোগ কম।

৪.

পুরুষতন্ত্রের পরিকাঠামো নারীর জন্য যে প্রতিবেশ তৈরি করে, সেখানে চাইলেও নারী সব কথার প্রতিবাদ করতে পারে না। তার পর যদি হয় নিম্নবর্গের নারী, সেখানে তার কণ্ঠস্বর হয় চির অবরুদ্ধ। সামন্তবাদী শোষণের নির্মোহ পথকে জেনে অবদমন করতে হয় নির্বিরোধে। ধ্রুব চৌধুরীর প্রণয় পিপাসা যে পান্না ও পান্নার পরিবারকে সামাজিকভাবে বারবার প্রশ্নবিদ্ধ করছে, তারপর তার আগমনের বাধা দেয়ার শক্তি তার তাদের নেই। কলঙ্কিত জীবনের দুঃসহ যাতনার প্রতিচ্ছবি এভাবে প্রতিধ্বনিত হয়েছে :

> হাড় শুকনো মরা বটগাছের সেই চিলটা আজ আবার চিঁ হি-হিঁ করে ডেকে উড়ে গেল। পান্নার হৃদয়টা কে যেন ঐ চিলের ডাক শুনলে বড় ব্যাকুল হয়, বড় ত্রাস জাগে তার মনে।... সে পারবে না , না না, সে তার মায়ের মত চৌধুরী বাবুদের ভোগের সামগ্রী হয়ে চিরকাল জীবনকে উচ্ছন্ন করে দিতে পারবে না। জীবন গেলেও না। সে বিয়ে করবে, স্বামী পুত্র কন্যা নিয়ে সংসার করবে। সে সংসার যত ছোট হোক, যত কষ্টের হোক, তা হবে নির্মল ও পবিত্র । (সরদার, ১৩৬৫ব. : ৩১)

এই অবসন্নতা, এই ক্লান্তি পান্নার জীবনজাত। সামন্ততন্ত্র ও পুরুষতন্ত্রের চাপে পিষতে থাকা এই জীবনের এই গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে সে সোচ্চার। পান্না নিম্নবর্গের নারী, দাই সম্প্রদায়ের পিতৃপরিচয়হীন জীবনের অধিকারী হলেও তার জীবনবোধ ছিল উচ্চকিত। মনিরদ্দির মতো মৌলবাদী চিন্তাচেতনার আফিমের ঘোর লাগা স্বামীর সঙ্গে মানিয়ে চলার সর্বাত্মক চেষ্টা করেও সে ব্যর্থ হয়েছে। সামাজিক প্রতিবন্ধকতায় জীবনের সুকুমার বৃত্তির মৃত্যু ঘটেছে; এই অনাদৃত জীবনকে বয়ে চলা তার পক্ষে আর সম্ভব হয় না। তাই মৃত্যুর মধ্যে জীবনের প্রশান্তির পথ খুঁজে নিয়েছে সে।

৫.

লালসালু উপন্যাসে বিশ শতকের প্রথম দশকের পূর্ববঙ্গের গ্রামীণ জীবনের চিত্র নিম্নবর্গ-পরিপ্রেক্ষিতের কাহিনিতে উপস্থাপিত হয়েছে। মানুষমাত্রই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বকালের রাজনৈতিক চেতনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। *লালসালু* উপন্যাসের লেখক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বিবিক্ত হয়েছিলেন ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের উত্তাল রাজনৈতিক সংক্ষুব্ধতার দ্বারা। উত্তাল-উষ্ণ রাজনৈতিক প্রতিবেশে শৈশব-কৈশোর-যৌবন অতিবাহিত করলেও সরাসরি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ তিনি কখনোই করেননি।

রাজনীতিতে অংশ না নিলেও তিনি চিরদিনই ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে। তাঁর রাজনৈতিক অভিব্যক্তিতে যে আভাস ফুটে ওঠে, সেখানে তিনি কার্ল মার্কসকে (১৮১৮-১৮৮৩) মানবমুক্তির মন্ত্রদূত বলে মেনেছেন। এ ছাড়া সমকালীন সময়ের 'ফ্যাসি বিরোধী লেখক ও শিল্পী-সংঘ'-সাপ্তাহিক অধিবেশনে উপস্থিত থেকে তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রত্যয়কে স্পষ্ট করেছিল। তবে তাঁর মধ্যে স্ববিরোধী উপাদান খুঁজে পাওয়া যায় প্রচুর। মার্কসীয় রাজনৈতিক দর্শন তাঁকে আকৃষ্ট করলেও, মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের প্রতি তাঁর আসক্তি ছিল না। সাহিত্য-ভাবনায় তিনি মুসলিম সমাজের সীমাবদ্ধতাকে সচেতনভাবে আশ্রয় ও উপজীব্য করেছেন। (জীনাত, ২০০১ : ২১) বাঙালি মুসলমানকে তিনি শুধু একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে ভাবেননি; একটি অবহেলিত ও পশ্চাৎপদ শ্রেণি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন বুদ্ধিবৃত্তিক সত্তায়। তাদের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অধিকারের প্রশ্নে তিনি সচেতন থেকেছেন। রাজনীতির প্রশ্নে ধর্মের ব্যবহার ও সম্প্রদায়িক চিন্তাচেতনাকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখেছেন তিনি। যা তৎকালীন সময়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার। যে কারণেই ভারতভাগ ও ধর্মের ভিত্তিতে দুটি রাষ্ট্রের গঠন। ধর্ম যখন রাজনীতি ও সমাজকে অন্ধ করে, তার পরিণতি কী ও কেমন হতে পারে তার পূর্বাভাস *লালসালু*। ওয়াল্লীউল্লাহর উপন্যাসে রাজনীতির প্রত্যক্ষ পরিছাপকে অন্তর্লীন রেখে অন্তঃশীলে রেখেছেন অপরাজনীতির অপকৌশলকে।

৫.১

শেইলা রাওবোথাম বলেছেন, নারীর 'ইতিহাস ছিল লুকিয়ে' সাম্প্রতিককালে নারী ক্রমশ সব ক্ষেত্রেই দৃশ্যমান হয়ে উঠেছেন। (উদ্ধৃত, সেলিনা, ২০০৮ : ২০) নারীর এই দৃশ্যমান ইতিহাসের একটি বড় অংশ সাহিত্য। সচেতন সাহিত্যিকদের রচনায় নারী জীবনের বিশ্বস্ত দলিল নির্মিত হয়েছে। আধুনিক রাষ্ট্রীয় জীবনপদ্ধতিতে নারীর অবস্থান কোথায়? বা আর্থিকভাবে বা ভৌগোলিকভাবে যে নারীরা সমাজের প্রান্তে অবস্থান করে। তাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির অনেকাংশই সাহিত্যের সত্যে প্রতিবিম্বিত হয়। *লালসালু* সেই পিছিয়ে থাকা মানুষের কথার স্বরলিপি। ওয়ালীউল্লাহ বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের বিত্তহীন-নিম্নবিত্তের মানুষের কথা বলেছেন। যেখানে বিপন্ন অস্তিত্বের নিম্নবর্গের মানুষের কাছে সজ্ঞানে ধর্মকে পণ্য করা হয়। এই শোষিত-বঞ্চিত মানুষেদের একটি বড় অংশ নারী। যারা সর্বাবস্থায় বিপন্ন ও পতিত। হাসুনির মা তার অংশ। (সৈয়দ আবুল, ২০০৮ : ২১৫)। রাজনৈতিক অধিকার নারীর ক্ষমতায়নের বহুমাত্রিক স্তরের একটি প্রক্রিয়া। তবে প্রতিটি প্রক্রিয়া একটি অপরটির সঙ্গে সম্পৃক্ত। লেখকের সজ্ঞান উপলব্ধি গ্রামীণ, প্রান্তিক,

পরিবেশে নারীর অবেহলা আর অসহায়তার বিবর্ণ জীবন সম্পর্কে সচেতন ও সহানুভূতি পূর্ণ ছিল। উপন্যাসের সমগ্র অবয়বের যে বিনির্মাণ সেখানে তাঁর রাজনৈতিক প্রাজ্ঞতার প্রভাবপুষ্ট ফসল স্পষ্ট।

৬.

শামসুদ্দীন আবুল কালাম যখন লিখতে শুরু করেন, তখন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল অগ্নিগর্ভ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ায় জনজীবন তখন বিপর্যস্ত। দেশভাগের পর পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর মতো অসাম্প্রদায়িক মানবতার সাধনাকারী লেখকের পক্ষে অনুমোদন করা সম্ভব হয়নি। সাম্যবাদী রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাসী শামসুদ্দীন সাম্প্রদায়িক ও উগ্র জাতীয়তাবাদী রাজনীতির চেতনার প্রভাব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। সমাজ, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গনির্বিশেষে মানবতার বিপক্ষের সমস্ত শক্তির বিরুদ্ধে তার ছিল দৃঢ় অবস্থান। এ সূত্রেই দক্ষিণবঙ্গের বরিশাল অঞ্চলের অবহেলিত নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবনসংগ্রামের চিত্রকে তিনি বরাবর গুরুত্ব দিয়েছেন। এই অঞ্চলের দরিদ্র, ছন্নছাড়া মানুষের জীবনকে দীর্ঘ ঔপনিবেশিক ও সামন্তবাদী শোষণ কত রূঢ়তার সঙ্গে তাদের জীবনের মর্মমূলকে ব্যবচ্ছেদ করেছে, তাঁর অভিজ্ঞতাজাত আখ্যান। ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিচ্ছিন্নতার অবারিত ধারা থেকে লেখক সামষ্টিক জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। যদিও আলোচনার অভিপ্রেত নারী, নারীর জীবনের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার বিভিন্ন দিকসমূহ। দীর্ঘ ঔপনিবেশিক আর সামন্তবাদী শোষণের গ্রামীণ নারীর জীবন বিপন্নতার চূড়ান্ত সীমায় অবস্থান করেছে। নারীকে পশ্চাৎপদ করতে, নারীর প্রতি বৈষম্যকে কার্যকরী করতে ধর্ম ও রাষ্ট্রনীতি একই সূত্রে বাঁধা থাকে। নারীর শোষিত-বঞ্চিত অবদমিত অবস্থার জন্য সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্রের নীতি, আইন ও বিধিনিষেধ দায়ী। সংস্কারাছন্ন সমাজে ধর্মীয় আইনে নারীর প্রতি যে বিধিনিষিধ আছে, রাষ্ট্র সেটিই কার্যকর করে। রাষ্ট্রের কেন্দ্রে থাকে পুরুষ অথবা পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা। সেখানে নারীর অধিকার বিবেচিত হয় সমাজ ও রাষ্ট্রের বিধানে। দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচারের মতো নারীর প্রতি একতরফা শোষণ চালিয়ে আসে রাষ্ট্র (মালেকা, ২০১৬ : ১০৯)। উপন্যাসে অঙ্কিত নারীরা দক্ষিণ বাংলার উপেক্ষিত, অনাদরীয় ও বঞ্চিত জীবনের অধিকারী। নদী-নালা বেষ্টিত ভৌগোলিক প্রান্তিকতা তাদের জীবনকে আরো নিম্নগামী আর নিরাপত্তাহীনতায় ভরিয়ে দিয়েছে। ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে প্রতিনিয়ত যারা নির্যাতন আর নিপীড়নের মধ্যে জীবনকে পাড়ি দেয়; তার প্রতি সহানুভূতিবশত লেখকের এই প্রচেষ্টা। লেখকের আপ্ত সাম্যবাদী দর্শন শোষিত-বঞ্চিত মানুষের প্রতি উপলব্ধির তীর্যকতায় প্রতিষ্ঠিত করার প্রেরণা পেয়েছে। কাশবনের এই কন্যারা সবাই চেনা গ্রামীণ অন্দরমহলের চিরপরিচিত মুখ। তাদের শাশ্বত বেদনা, যন্ত্রণা, অস্তিত্বের সংকট, চিরায়ত নারীর অবয়বে ফুটে উঠেছে। রাজনীতির অপকৌশল যেমন

নিম্নবর্গকে চির অধঃপতনের কারাগারে বন্দি করেছে; সেই একই কৌশল বহুমাত্রিক রূপ নিয়ে এ দেশের প্রান্তিক নারীকে চির অন্ধকারে বিলীয়মান রেখেছে। সুতরাং সমালোচকের এই অভিমতের বিপরীতে বলা যায়, শামসুদ্দীন আবুল কালামের *কাশবনের কন্যা* উপন্যাসে সমসাময়িকতার কোনো চিহ্ন নেই। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, কোনোভাবেই রাজনৈতিক চেতনার দেখা সেখানে মিলবে না (হাসান, ২০১৩ :১৯)। বরং রাজনীতির পরাকাষ্ঠে যাদের জীবন চিতাদহ করে তাদের অন্তঃকরণের ব্যথাকে, চিরায়ত আঞ্চলিক জীবনরূপকে রূপায়িত করেছে।

৭.

রাজনীতি সাহিত্যের প্রধান বিবেচ্য বিষয় নয়। তবে সব রাজনীতি যেহেতু মানুষকে কেন্দ্র করে, সে-কারণেই তার প্রতিক্রিয়া মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে থাকে। রাজনীতির পরোক্ষ প্রভাব সব সময়ই সব সাহিত্যে ক্রিয়াশীল থাকে। সাহিত্য সরাসরি রাজনীতির জগতে প্রবেশ করে না, কিন্তু সময়, সমাজ, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যখন মানুষের জীবন, আচরণ, আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে; তখন অবধারিতভাবেই রাজনীতির প্রভাব সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে। *সূর্য-দীঘল বাড়ী* উপন্যাসের পরিপ্রেক্ষিত নির্মিত হয়েছে এমন সন্ধিক্ষণকে সামনে রেখে; সেখানে রাজনীতিকে বৈগুণ্য করে এই উপন্যাসের আলোচনা অসম্পন্ন থেকে যায়। তবে সব রাজনীতিই যেহেতু মানুষকে কেন্দ্র করে, সে কারণেই তার প্রতিক্রিয়া মানুষের জীবনকে অবশ্যই প্রভাবিত করবে। উপন্যাসের শুরুতে সদ্যস্বাধীন দেশের কথা সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ধ্বনিত হলেও, তার কিছু পূর্বের বিভীষিকাময় পরিবেশের দাবদাহ তখন শেষ হয়নি। ভারতবর্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রভাব বিশেষ না থাকলেও, উপনিবেশিত রাষ্ট্রের খাদ্যাভাব, অর্থাভাব, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক অবক্ষয় ও মানসিক উৎক্রান্তির মতো পরোক্ষ প্রভাব অনিবার্য হয়ে ওঠে। বিশ্বব্যাপী সর্বগ্রাসী মন্দায় ব্রিটিশ সরকারের বিভিন্ন নীতি অবিভক্ত ভারতকে রণনৈতিক দুর্গে পরিণত করে। পাশাপাশি স্বদেশীয় জোতদার-মজুতদার, কালোবাজারিদের দুরভিসন্ধিতে দুর্ভিক্ষের কর্কশতা ক্রমে গাঢ় রূপ ধারণ করে।

> প্রাচীনকাল থেকে দুর্ভিক্ষ-পরম্পরায় কেটেছে নিম্নবর্গের মানুষের জীবন। তাদের দৈনন্দিন অন্ন-কষ্ট ভয়াবহরূপে প্রকাশ পায় এসব দুর্ভিক্ষের আবির্ভাবে। স্বাধীনতার চাইতেও দুর্ভিক্ষের গুরুত্ব তাদের জীবনে অধিক। ফলে তারা বার বার স্বাধীনতাকে তুলনা করেছে নিজেদের চির-দুর্ভিক্ষগ্রস্ততার পরিপ্রেক্ষিতে। স্বাধীনতার যেসব প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে, তার সুফল সাধারণ মানুষের জীবনে প্রায়োগিক হয়ে আসেনি; কিন্তু দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা তারা টের পায় প্রতিমুহূর্তে। (মহীবুল, ২০০২ : ১৯৮)

গবেষকের এই বক্তব্যের প্রতি সহমত জ্ঞাপন করে বলা যায়, তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক প্রতিবেশে সাধারণ মানুষের কথা ভেবে কোনো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় না। বরং রাজনৈতিক কর্তাব্যক্তিদের স্বার্থকেন্দ্রিক রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকে জনমানুষের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। ইতিহাসের অনিবার্য পতনরেখায় সাতচল্লিশের দেশভাগ হলো, এই রাজনৈতিক পরিহাসের অসমনীয় ফসল তার অনুধাবন ঘটে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে। ভারতভাগের এই রাজনৈতিক বিতর্কে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির অবস্থান স্পষ্ট না হলেও অস্পষ্টও থাকেনি। এই বিষয়ে প্রধান রাজনৈতিক দলের শাসকদের সঙ্গে যতটা যোগাযোগ ছিল, ততটা যোগাযোগ ছিল না জনগণের সঙ্গে। উভয় রাজনৈতিক কর্তা ব্যক্তিদের লক্ষ্য ছিল শাসক হওয়ার, জনগণের সেবক হওয়ার নয়। তাই জনগণকে কেন্দ্র করে এই রাজনৈতিক পরিক্রমা হলেও, জনগণের মতামতের কোনো প্রয়োজন ছিল না। যার ফলে শাসক ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ মিলে তিন পক্ষ এক হলেও, জনগণ ছিল প্রতিপক্ষ। সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসখ্যাত নীতি হলো, ভাগ করো এবং শোষণ করো। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে ক্ষেত্রে এই নীতি অসত্য ছিল না, বরং পুরোপুরিই সত্য ছিল। দেশভাগের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ভারতবর্ষে নতুন দুটি রাষ্ট্রের জন্ম দিলেও, এই জনপদের সাধারণ মানুষের জীবনে বিপ্লবাত্মক কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি (সিরাজুল : ২০১৬ : ২৭)। গবেষকের এই বীক্ষণে এই জনপদের রাজনীতির উদ্দেশ্য ও ফলাফল স্পষ্ট। রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি নিম্নবর্গের জীবনকে অন্ধকারের অতলেই রেখে দেয়। জয়গুনদের জীবনে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন অর্থই হলো দিনযাপন সহজ হওয়া, অর্থাৎ চাল সস্তা হওয়া, খাজনা মওকুফ হওয়া। রেলগাড়িতে আসা-যাওয়ার পথে জয়গুনও শুনতে পায় পাকিস্তান সৃষ্টির কথা, দিন পরিবর্তনের কথা। কেউ আবার আশঙ্কা করে বলে– 'পঞ্চাশ সনের চাইয়া বড় আহাল অইব এই বার।' অন্য একজন প্রতিবাদ করে বলে–'না মিয়া, দ্যাশ স্বাদীন অইব। আর দুক্খু থাকব না কারুর, হুনছি আমি। স্বাধীন অইলে চাউলও হস্তা অইব। আগের মত ট্যাকায় দশ সের' (আবু, ২০১৭ : ২১)। এ ছাড়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, পাকিস্তান সৃষ্টির উন্মাদনা, এই উন্মার্গ জীবনেও ছায়া ফেলেছে। রেলগাড়ির ইঞ্জিনের সামনে উড়ে চাঁদতারা আঁকা পতাকা, গাড়িতে মানুষের মুখে ধ্বনিত হয় 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'। রাস্তায় রাস্তায় মিছিলে চিৎকারে ধ্বনিত হয় স্বাধীনতার বার্তা। 'পথে আসতে আসতে দেখে সে, শহরের প্রত্যেক বাড়িতে নিশান উড়ছে বড় বড়।... ডানে হিন্দু পাড়া, বাঁয়ে মুসলমান পাড়া। সব বাড়িতেই আজ সবুজ নিশান।' (আবু, ২০১৭ : ২৮) এভাবে উপন্যাসে আসে যুগপৎ রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ঘটনাপ্রবাহের প্রতিসরণ। সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা, প্রাপ্তি আর অনিশ্চয়তা নিয়ে দিনাতিপাত করার মধ্য দিয়ে জয়গুনের মতো অবিচল নারীদের যাত্রা। তাদের রংহীন বিবর্ণজীবনে কালো ছায়া ফেলে রঙিন রাজনীতির নীল-নকশা। বিশ্বযুদ্ধজাত দুর্ভিক্ষের

রাহুগ্রাস আশ্রয়হীন করেছে নিশ্চঞ্চল নির্জীব নারী জয়গুনকে। খাদ্যাভাবে মৃত্যু হয়েছে তার নবজাত সন্তানের। দুর্ভিক্ষের দহন দিনে জয়গুনের স্বামী করিম বক্‌শের কাছে স্ত্রী আর দুই কন্যার অন্নের জোগান অমূলক মনে হয়েছে। তাই বিনা কারণে জয়গুনকে তালাক দিয়ে কন্যাসন্তান মায়মুনা আর নবজাত কন্যাসহ তাকে বিতাড়িত করেছে।

৭.১

এরপরের অধ্যায়সমূহ শুধু সংগ্রাম আর সংক্ষুব্ধতায় ভরা। চোখের সামনে অনাহারে, অপুষ্টিতে সদ্যোজাত সন্তানের মৃত্যুকে মেনে নিতে হয়েছে। জীবিত দুজন হাসু আর মায়মুনা প্রতিনিয়ত খাদ্যাভাবে জীর্ণশীর্ণ হতে শুরু করেছে। মা জয়গুন সন্তানের এই অপমৃত্যুকে আর মানতে পারেনি, শেষ সম্বল ভিটেমাটি বেচে খেয়েও বাঁচার পথ পায়নি। শেষে শহরে যেতে হয়েছে একমুঠো অন্নের আশায়, কঙ্কালসার মানুষের ক্ষুধার্ত হাহাকার স্পর্শ করেনি নাগরিক বিত্তবান মানুষের চিত্তকে। অনাহারে-অবহেলায় আবার ফিরে আসতে হয়েছে স্বভূমিতে, কিন্তু ভূমি তো তাদের নেই। যা ছিল তা পূর্বেই ক্ষুধার অনলে দাহ হয়েছে, যা আছে তা শুধু *সূর্য-দীঘল বাড়ী*। যেখানে কেউ বাস করে না, করলে বংশ নির্বংশ হয়, এমনই প্রচলিত গ্রামীণ সমাজের অন্তর্দেহে। নিম্নবর্গের নারী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার সুযোগ না পেলেও, রাজনৈতিক রিরংসার চোরাস্রোত তাদের জীবনকে বিরামহীন দুর্বিপাকে আবদ্ধ করে দিয়েছে। জীবন প্রতিবেশের সঙ্গে যে নারীকে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করতে হয়, সেখানে রাজনৈতিক অভিপ্রেত অবশ্যম্ভাবীভাবে সম্পৃক্ত থাকে। ব্রিটিশ শাসকদের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে পাকিস্তানি রাষ্ট্রনীতির বড় কোনো পার্থক্য ছিলো না। রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রান্তদেশে যে মানুষ, যে নারী বাস করে, সে আধুনিক রাষ্ট্রবিকাশের কোনো সুফলই পায় না। জয়গুনের মতো অসহায় নারী রাষ্ট্রের পরিসংখ্যানে একটি সংখ্যা ছাড়া কিছু নয়। ব্রিটিশ শাসননীতিতে ১৮৭২ সালে ধর্মভিত্তিক পারিবারিক আইনের পথ প্রশস্ত করা হয়। সেখানে সকল ধর্মাবলম্বী নাগরিকের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় আইন সমানভাবে প্রযোজ্য হলেও বিয়ে ও সম্পত্তি উত্তরাধিকার বিষয়ে ধর্মীয় বিধানের ওপর ব্রিটিশ সরকার হস্তক্ষেপ না করার ঘোষণা করে। তার ফলে মুসলিম শরিয়ত অনুযায়ী বিভিন্ন ইসলাম বিশেষজ্ঞগণ ব্যাখ্যা করে, সেই অনুযায়ী মুসলিম সমাজ নারীকে নিয়ন্ত্রণ করে (মালেকা, ২০১৩ : ১৯)। নারীর প্রতি প্রচলিত বিশ্বাস, ধর্মান্ধতা, দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখার সমাজ ও রাষ্ট্র একই সাথে ভূমিকা রাখে। কারণ, উপন্যাসে দেখা যায়, মেহেরজানের মৃত্যুর পর রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখে না। এখান থেকে স্পষ্ট হয় রাষ্ট্রের অবস্থান। সাংবিধানিক আইনে নারীর অধিকার থাকলেও রাষ্ট্রের প্রাত্যহিক চর্চায় তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তেমনি জয়গুন ও তার

মেয়ে মায়মুনার সাথে সমাজ বিয়ে নামক যে খেলা খেলে, তাতে প্রতিশব্দ উচ্চরিত হয় না রাষ্ট্র ও সমাজের দিক থেকে। এভাবেই উপন্যাসের কাহিনি আর চরিত্র দেশভাগ আর মন্বন্তরের রাজনৈতিক খোলসে প্রভাবান্বিত হয়ে জীবনের প্রতিকূলতার সঙ্গে যুদ্ধ করেছে।

৮.

আবু ইসহাকের দুটি উপন্যাসের কাহিনিই রাজনৈতিক বাস্তবতার পরিছাপকে ধারণ করে নির্মিত হয়েছে। অনেক গবেষকের মতে, ঔপন্যাসিক কোনো রাজনৈতিক মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে লেখনী ধারণ করেননি। নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী না হলেও, রাজনৈতিক মননশীলতা তাঁর সৃজনশীল সত্তায় অভিঘাত রেখেছে। ফলে রাজনৈতিক দুর্যোগে সময়ের প্রতিচ্ছবি তার কাহিনিকে করেছে বাস্তবনিষ্ঠতায় পরিপূর্ণ। *পদ্মার পলিদ্বীপ* উপন্যাসে চর দখল, বেদখকেন্দ্রিক কাহিনির আচ্ছাদন থাকলেও রাজনীতির ছায়া পড়েছে চরিত্রের অন্তর্গত জীবনে। বিশেষ করে জরিনার জীবনকে অস্থিতিশীল করেছে যে বাল্যবিবাহের ঘটনা, তাও রাষ্ট্রকেন্দ্রিক সিদ্ধান্তের সঙ্গতিতে। ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় সমাজে প্রচলিত বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে প্রথম আইন প্রণয়ন করেন ১৯২৯। যেখানে মেয়েদের বিয়ের বয়স নূন্যতম ১৬ বছর এবং ছেলেদের ১৮ বছর ধার্য করা হয়েছিল। এই আইনটি সারদা আইন নামে পরিচিত। হরবিলাস সারদা নামক একজন ভারতীয় এই আইনের উদ্যোক্ত ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সে কারণেই পরবর্তীতে আইনটি তাঁর নামে প্রচারিত হয়ে, সারদা আইন নামে খ্যাত হয়। অজ্ঞতার আর অশিক্ষায় আচ্ছন্ন ভারতীয় সমাজে তার একটি বিরূপ প্রভাব পড়ে। পূর্ববঙ্গীয় মুসলিম সমাজও তার বাইরে নয়। যে সমাজব্যবস্থায় নারী ঋতুমতী হওয়ার পূর্বেই বিবাহ দেয়া প্রচলিত, সেখানে ১৬ বছর তাদের কাছে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অনগ্রসর মুসলিম সমাজে অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়ের বিয়ে দেয়ার ব্যস্ততা শুরু হয়ে যায়। পাশাপাশি ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রতি ভয়-ভীতিও ক্রিয়াশীল ছিল। এই আইন কার্যকর হলে তারা তাদের পছন্দমতো বয়সে পুত্র-কন্যার বিয়ে দিতে পারবেন না। একটি জনকল্যাণকর রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকে অজ্ঞতাবশত সমাজ উপলব্ধি করতে পারেনি। তার ফলাফল হিসেবে জরিনা নামক এই নারীর জীবনে অনিশ্চয়তা নিয়ে আসে। সমাজের প্রথাগত পথ কখনো নারীবান্ধব হয়ে ওঠে না, বরং নারীর প্রতি প্রতিক্রিয়াশীলতায় যেন তার ধর্ম হয়ে ওঠে। সেদিনের ধর্মান্ধ মুসলিম সমাজের সিদ্ধান্ত অপ্রাপ্তবয়স্ক জরিনা আর ফজলের বিয়ে দিয়েছে আবার বিচ্ছেদও ঘটিয়েছে:

> জরিনার বাবা-মা তখন মারা গেছে। তাই ভাইয়ের সাথে পরামর্শ করে এরফান মাতব্বর। ঠিক হয়–– ফজল ম্যাট্রিক পাশ না করা পর্যন্ত জরিনা ভাইয়ের বাড়িতে থাকবে। সেখানে ফজলও যেতে পারবে না।...কিছু ফুল

যখন পাপড়ি মেলে তখন মধুকর টের পায়। দীর্ঘ পথের বাধা-বিঘ্ন তার কাছে তুচ্ছ মনে হয়। তুচ্ছ মনে হয় কাঁটার ভয় (আবু, ২০১৬ : ৬০)।

ফজলের ইচ্ছা-অনিচ্ছা সেদিন পরাজিত হয়েছে পিতার চোখরাঙানির নিকট। তার প্রথম প্রেমের আবেশ অকালেই ঝরে পড়েছে। সমাজের কাছে নারী সর্বার্থেই নিম্নবর্গ বলেই তাকে যখন খুশি বিয়ে করা যায় আবার তালাকও দেয়া যায়। নারী সর্বার্থেই পুরুষের কাছে ভোগ্যপণ্য, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নিয়ম অনুযায়ী নারী সব সময় পুরুষের তুলায় ক্ষুদ্র এবং দুর্বল হবে। যখন তাদের মনে হয়েছে : 'পনেরোয় পা দিয়ে জরিনা গায়ে গতরে বেড়ে ওঠে লকলকিয়ে। জরিনার শ্বশুর এরফান মাতব্বর চিন্তিত হয়। কারণ মেয়ের অনুপাতে ছেলে বড় হয়নি।' (আবু, ২০১৬ : ৬০) পুরুষতান্ত্রিকতা সব ক্ষেত্রেই নারীকে তার সুবিধার্থে ব্যবহার করে। জরিনা শারীরিক বয়োবৃদ্ধি তার অপরাধ, কারণ ফজল সেই তুলনায় নাবালক বা অনুপযুক্ত। তাই জরিনাকে ত্যাগ করে ফজলের জন্য তার অর্ধবয়সের কচি বউ ঘরে আনতে হবে। ধর্মের শিথিলতার সুযোগ নিয়ে সমাজ, উচ্চবর্গ, পুরুষতান্ত্রিকতা তাকে নিজের খেয়াল, খুশিমতো ব্যবহার করে। নারী সেখানে নীরব এক শ্রোতামাত্র, পুরুষান্ত্রিকতা তার উপর যা চাপিয়ে দেয়, সে তাই মেনে নেয়। জরিনার জীবন পরিস্থিতি তেমনি প্রথার পরিবৃত্তে ঘুরপাক খেয়েছে।

৮.১

ঔপনিবেশিক ভারতীয় সাম্রাজ্য নারীর কোনো রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। এমনকি বিবাহ বিচ্ছেদেও নারীর কোনো ভূমিকা থাকত না। ফজলকে দিয়ে জরিনাকে তালাক দেয়া হলে জরিনার কোনো মতামত নেয়া হয়নি। আবার রূপজানের বাবা যখন রূপজানের অন্যত্র বিয়ের আয়োজন করেছিল তখনও রূপজানকে তালাক দেয়ার জন্য ফজলকে জোর আরোপ করা হয়েছে। তখন জঙ্গুরুল্লা বলে : 'আরে মাইয়ালোকে তালাক দিতে পারলে কি আর তোরে জিগাইতাম।' (আবু, ২০১৬ : ৯৬) জরিনা, রূপজান সবাই এই রাষ্ট্রে অধিকারশূন্য এককেটি নির্জীব প্রাণী। সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী নিম্নবর্গের মানুষের বাসস্থান হয়ে থাকে গ্রামের প্রান্তিক পর্যায়ে। জরিনার অবস্থানও তেমনি গ্রামের প্রান্তে। তার স্বামী হেকমত পেশায় চোর হওয়ায় বেশির ভাগ সময় সে থাকে বাড়ির বাইরে। নিম্নবর্গের নারীকে জীবন যাপন করতে হয় সংকট আর সংকীর্ণতার মধ্য দিয়ে। তারপরেও যখন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও রাজনৈতিক কোনো বড় সংকট দেখা দেয়, তখন বেশি পীড়িত হয় এই শ্রেণির মানুষ। জরিনার জীবনে রাজনৈতিক প্রভাব ইতিবাচক পরিস্থিতির তুলনায় নেতিবাচক পরিবেশ নির্মাণে রেখেছে বিশেষ ভূমিকা। এ ছাড়া উপন্যাসের পটভূমিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তরের বিভিন্ন

ঘটনার প্রাসঙ্গিকতা পাওয়া যায়। উপন্যাসের সময়কাল ১৩৫০-এর পূর্ববর্তী হওয়ায় খাদ্যসংকটের আভাস পাওয়া যায় :

> ‘জানো জরিনা, চাউল বড় মাংগা অইয়া গেছে।’ ‘হ, আমিও হুনছি। তিন ট্যাহা মনের চাউল পাঁচ ট্যাহা অইয়া গেছে।’ চুলো ধরাতে ধরাতে বলে জরিনা। ‘দাম আরো বাড়ছে। আইজ দর উঠছে সাড়ে পাঁচ টাকায়।’ ‘মানুষ এইবার না খাইয়া দাপইয়া মইর‌্যা যাইব।’ ‘হ’ এইবার কী যে উপায় অইব মানুষের, কওন যায় না। দুনিয়া জোড়া লড়াই চলতে আছে। চিনি পাওয়া যায় না। কেরোসিন পাওয়া যায় না–।’ (আবু, ২০১৬ : ১২৬)

এই রাজনৈতিক প্রতিবেশ নিম্নবর্গের দিন আনা, দিন খাওয়া, জীবনকে চরম অনিশ্চয়তায় ফেলেছে। এই কথোপকথন লেখকের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় বহন করেছে। অর্থনীতি-নির্ভর সমাজজীবনে প্রান্তিক মানুষের দুর্যোগের প্রতি সহানুভূতিশীলতার মনোভাবও ব্যক্ত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় :

> আবু ইসহাক শিল্পীর দায়বদ্ধতায় চর-দ্বীপ-নদীর আঞ্চলিক বিষয়কে নির্বাচন করে এক্ষেত্রে বিশ্বযুদ্ধের আবহে চিহ্নিত সময়কে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যাখ্যানে চরিত্রের সম্পর্ক-সংযোগে এবং শ্রেণিস্তরের কাঠামোকে রূপদানে সচেষ্ট থেকেছেন। (শহীদ, ২০১৬ : ১৬৩)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সংগ্রামমুখর পরিবেশের বিভিন্ন প্রচ্ছন্নছায়া কাহিনিকে গতিময়তা দিয়েছে। তার পাশাপাশি স্বদেশী আন্দোলনের পরোক্ষ ছাপ পাওয়া যায় ফজলের কারাজীবনের মধ্যে। যেখানে মতি নামক স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মীর সাথে তার পরিচয় ঘটেছে। মতির সাহচর্যে পরিবর্তন এসেছে ফজলের চিন্তা জগতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রাজনৈতিক খেসারতে প্রান্তিক মানুষের সমগ্র জীবনব্যবস্থা হয়ে উঠেছে খোলামকুচি। গৃহদাসী জরিনা কাজ হারিয়েছে, দুর্ভিক্ষের প্রবল প্রভাবে তার জীবন সংশয়াকীর্ণ হয়ে উঠেছে :

> জরিনা খুদ ক'টা ধুয়ে চুলায় ধরায়। ঘরের চাল থেকে সে গোটা কয়েক লাউয়ের ডগা কেটে নেয়, গাছ থেকে ছিঁড়ে নেয় কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা। তাড়াতাড়ি রান্না শেষ করে সন্ধ্যার আগেই খেয়ে নিতে হবে। বেশ কিছুদিন ধরে কেরোসিন পাওয়া যাচ্ছে না। তাই কোনো বাড়িতেই বাতি জ্বলে না আজকাল। সন্ধ্যার পর হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা নয়তো বিছানায় গড়াগড়ি দিতে দিতে ঘুমিয়ে পড়া–এ ছাড়া অন্ধকারে আর কিছুই করার উপায় নেই। (আবু, ২০১৬ : ১৯১)

বিশ্বের অন্য এক প্রান্তে বেজে ওঠা যুদ্ধের রণডঙ্কা, তার অমোঘ ও অনিবার্য প্রভাব কম্পিত করেছিল বৃটিশ-শাসিত উপনিবেশ ভারতবর্ষকে। অর্থনৈতিক চাপে পিষ্ট হতে থাকল এ-দেশ, যুদ্ধকালীন দুর্মূল্যতার চাপে দেশবাসীর জীবন বিপন্ন হয়ে উঠল। সমগ্র দেশে অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে নিদারুণ খাদ্য ও বস্ত্র-সংকট নেমে এলো শ্রমজীবী শ্রেণির মানুষের জীবনে (গোপিকানাথ, ২০১৪ :

১৫)। এভাবেই রাজনৈতিক অর্থনৈতিক দাবানলে দাহ হয় নিম্নবর্গ আর নিম্নবিত্তের মানুষ। এর পাশাপাশি আরো একটি বিষয় স্পষ্ট যে যুদ্ধ-দাঙ্গা-দুর্ভিক্ষ যেকোনো রাজনৈতিক সংকট নারীকে ভিন্নভাবে মোকাবেলা করতে হয়। যুদ্ধে নিয়োজিত সৈন্যদের নিপীড়নমূলক মনোভাবের প্রকাশ লেখক এভাবে দেখিয়েছেন :

> নদীতে গোসল করার সময় ... ভট্‌ভট্‌ আওয়াজ তুলে যাচ্ছিল একটি কলের নৌকা। যাচ্ছিল বেশ কিছু দূরে দিয়েই । হঠাৎ এটা মোড় নেয় কিনারার দিকে। জরিনা জাবড়ি দেয় পানির ভেতর। গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে দেয় শরীর। আঁচল ঠিক করে গায়ে জড়ায়, ঘোমটা টানে। দুটো ধলা মানুষ শিষ দিচ্ছিল। ঘোমটার ফাঁক দিয়ে সে দেখে পাঁচ কি দশ টাকার কয়েকটা নোট দেখিয়ে কুৎসিত ইশারা করছে একটা বাঁদরমুখো। (আবু, ২০১৬ : ১২২)

জরিনার বসতবাড়ি পদ্মার তীরবর্তী হওয়ায় প্রায়শই তাকে এই ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। নারীর প্রতি সমাজ রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি সর্বদা ভোগবাদিতায় পূর্ণ। ঔপনিবেশিক শক্তির প্রতিনিধিদের মনঃসমীক্ষণে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। রাষ্ট্র নারীর নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হওয়ার পাশাপাশি তার জীবনের স্বাভাবিক স্রোতকে ব্যাহত করতেও ভূমিকা রেখেছে। নারীর প্রতি নির্যাতনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উদ্ভূত সমস্যা তাকে নিমজ্জিত করেছে সংকটের জালে। এই সমস্ত কিছুই উপন্যাসে আলোচিত রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতের অভিপ্রেত। এই সব ঘটনার অনুষঙ্গ নারীকে ক্রমশ প্রান্তিক থেকে আরো প্রান্তিকায়িত করে তোলে।

৯.

সারেং বৌ উপন্যাসটি লেখক শহীদুল্লা কায়সারের প্রথম উপন্যাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দেশভাগ-পরবর্তী সমুদ্র উপকূলবর্তী জনজীবনের সংগ্রামী প্রতিবেশকে নারীর দৃষ্টি দিয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন এবং দেখিয়েছেন ঔপন্যাসিক। *সারেংবৌ* য়ের নবিতুন লেখকের রাজনৈতিক অনুভূতির এক যথার্থ প্রতিমূর্তি। এদেশের নারী সর্বাপেক্ষা শোষিত জনবলের একজন। যাদেরকে জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন শোষণের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। তারপর যদি কোনো নারী পুরুষের সার্বিক আগ্রাসন থেকে মুক্ত হয়ে নিজের অনুভূতির আদলে, নিজের জীবনকে রূপ দিতে সচেষ্ট হয়; তাহলে তার প্রতিটি পদক্ষেপকে ব্যাহত করতে সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবার সবাই একত্রে এক সুরে কাজ করে। স্বজনহীন, স্বামীহীন ঐ রক্তাক্ত সময়ে সমাজের কোনো মানুষ তার প্রতি সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেয়নি। বরং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও তার জনবলসমূহ নবিতুনের বিরূপতার অংশ হিসেবে কাজ করেছে। আবার এই প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালিত হয়েছে গ্রামীণ সমাজের আধিপত্যবাদী গোষ্ঠীর দ্বারা।

উপার্জনসক্ষম পুরুষ সদস্যবিহীন পরিবারে নারী যখন অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য লড়াই করছে, তখন একজন পুরুষ বা একটি বিশেষ গোষ্ঠীর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ঐ নারীকে অবদমন করতে অপ্রতিরোধ্য শক্তির প্রয়োগ করেছে। এই প্রচেষ্টা একই সঙ্গে নারী ও নিম্নবর্গ উভয়ের জন্য প্রযুক্ত হয়েছে। ধর্মীয়, সামাজিক, পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয়-কোনো নেতৃত্বই নারীকে মেনে নিতে পারে না। ফলে ক্রমাগত নারীর প্রতি যৌন-রাজনীতির আক্রমণ বাড়তে থাকে। উপন্যাসের নবিতুন চরিত্রে যার একটি পরিপুষ্ট পরিবৃত নির্মিত হয়েছে। এখানে ঔপন্যাসিকের রাজনৈতিক প্রজ্ঞতার একটি পরিচ্ছন্ন প্রতিক্রিয়াও অভিব্যক্ত হয়েছে।

১০.

সংশপ্তক শহীদুল্লা কায়সারের দ্বিতীয় উপন্যাস। এই উপন্যাসে লেখকের রাজনৈতিক দর্শনের সর্ববৃহৎ প্রকাশ লক্ষণীয়। সামন্তবাদের সঙ্গে সর্বহারার যে দ্বন্দ্ব, উচ্চবর্গের সঙ্গে নিম্নবর্গেরও সেই দ্বন্দ্ব; সে কারণেই বোধ হয় লেখক উপন্যাসে এই কাহিনির সূত্রপাত ঘটিয়েছেন। হুরমতির লাঞ্ছনার দৃশ্য দিয়ে ঔপন্যাসটির নাট্যিক পদ্ধতির সফল প্রয়োগ ঘটিয়েছেন লেখক। তার শ্রেণিগত অবস্থান, লৈঙ্গিক অবস্থানকে স্পষ্ট করার মধ্য দিয়ে সামাজিক শোষণ রীতির যে দিকসমূহ তাও লেখক স্পষ্ট করেছেন। যেকোনো পরিস্থিতিতে হুরমতির অনড় থাকার মনোভঙ্গির প্রকাশের মধ্যে তার ব্যক্তিক ও সামষ্টিক দার্ঢ্য শক্তিমত্তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সর্বহারার হারানোর কোনো ভয় থাকে না, কারণ তার হারানোর কিছু নেই; যা ছিল তা বহু পূর্বে উচ্চবর্গের দ্বারা অপহৃত হয়েছে। আর্থিকভাবে হুরমতি দুর্বল হতে পারে কিন্তু মনের দিক থেকে সে দুর্বল নয়। চরিত্রের ব্যবহারিক পরিচ্ছেদে তার পরিচয় পরিচারিকার হলেও, সে টাইপ কোনো চরিত্র নয়। উপন্যাসের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে সে মানবিক, অত্যুজ্জ্বল, আত্মশক্তিতে বলীয়ান এক নারী। শ্রেণিগত শক্তিতে হুরমতি সংগ্রামী এবং সম্ভাবনাময়ী এক সজীব চরিত্রের পরিমণ্ডল। ইতিহাসের জটিল দ্বান্দ্বিক প্রেক্ষাপটে সে নিজের বিদ্রোহী সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে প্রচলিত সংকীর্ণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। সে তার সামাজিক অধিকারকে বুঝে নিতে চেয়েছে সামাজিক বঞ্চনার প্রতিস্পর্ধী স্বরের দ্বারা। পাশাপাশি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা, ১৯৪৩-এর মন্বন্তর, ১৯৪৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় গ্রামের দরিদ্র মানুষের যে অবক্ষয় অবনতি ঘটেছে, হুরমতি তাদের মধ্যে একজন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অর্থনৈতিক সংকট আর গ্রামীণ প্রতিবেশে সামন্তবাদী প্রভুদের যৌন রাজনীতি তাকে এই পেশায় অভিযোজন করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেশভাগ, দাঙ্গা, মহামারি, দুর্ভিক্ষ, স্বাধীনতা আন্দোলন প্রভৃতি দুর্যোগও হুরমতিকে বিপন্ন করেছে। যৌবনের প্রারম্ভে সমাজ তাকে যে পথ দেখিয়েছে, শেষ পর্যন্ত তাকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে সে। আম্বরির জীবন নির্মাণে শহীদুল্লা

কায়সারের রাজনৈতিক দর্শনের মানবিক চেতনার প্রভাবে পরিপুষ্ট। নিম্নবর্গ জীবনের বর্ণনায় তিনি যেমন শ্রেণি-সংগ্রামের আদর্শবাদের অনুসারী, তেমনি তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে ও উপন্যাসের সমাজভাবনায় মার্কসবাদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের যে কাঠামো তাতে ভূম্যধিকারী শ্রেণি চিরকাল কর্তৃত্ব করে এসেছে আর তার অধীনস্থ কৃষক শ্রেণি নিম্নস্তরে থেকে নিম্নবর্গে পরিণত হয়েছে। একই পরিক্রমায় নারী সামাজিক ও পারিবারিকভাবে নিম্নবর্গাধীন হয়ে চলেছে। নারী চরিত্র সৃষ্টিতে ঔপন্যাসিক সমাজতান্ত্রিক জীবনদর্শনের সংগ্রামশীলতাকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। হুরমতি আম্বরির মতো অজেয় সব নারীর প্রাণশক্তি সেই দমন-পীড়নকে সহ্য করে অন্তিম পর্যন্ত প্রাণশক্তিকে উজ্জীবিত রেখেছে। এই চরিত্রের পরতে পরতে আছে বাংলাদেশের গ্রামীণ নিম্নবর্গের নারীর জীবনসংগ্রামের প্রতিভাস। আম্বরির মৃত্যু ঘটলেও ঔপন্যাসিকের আশাবাদী জীবন-দর্শনের প্রেরণা নিয়ে জীবনযুদ্ধে এগিয়ে চলেছে হুরমতি। সমস্ত বিপর্যয়ের মধ্যেও সে বেঁচে থেকেছে জীবনকে ভালোবেসে। *সংশপ্তক*-এর বিস্তৃত পরিসরে অর্থনৈতিক-সামাজিকভাবে নিম্নস্থ নারীর অসাধারণ হয়ে ওঠার ইতিহাস শহীদুল্লা কায়সারের মানবিক জীবনদৃষ্টির গুণে সমৃদ্ধ।

১১.

হাজার বছর ধরে উপন্যাসটি লেখক লিখেছেন তাঁর রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা থেকে। উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর অন্তর্জগত ও বহির্জগতে প্রত্যক্ষ রাজনীতির কোনো অভিঘাত লক্ষ করা যায় না। তবে রাজনীতি আছে উপন্যাসের অন্তঃসলিলে। হাজার বছরের ইতিহাসের পিছিয়ে পড়া মানুষেরা তাদেরই অংশ। একই ভূখণ্ডে, একই আলো হাওয়ায় বেড়ে উঠে কেউ সমস্ত সুযোগ-সুবিধা নিয়ে বড় হয়; আবার কেউ সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। এই উপন্যাসের সকল পাত্র-পাত্রী শ্রেণিগত বৈষম্যে ও শোষণের শিকার। নারী যেকোনো শ্রেণির মধ্যে দ্বিতীয়বার শোষিত শ্রেণি। কারণ, নারীকে শোষণের ক্ষেত্রে সবর্দা কাজ করে লৈঙ্গিক রাজনীতির কূটকৌশল। বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, সমস্তই লৈঙ্গিক রাজনীতির বাহ্যিক দৃশ্য। অন্তরগত দৃশ্যে চলে নারী সামাজিক, অর্থনৈতিক অধিকার হরণ, শ্রম-শোষণ। এই শোষণ প্রক্রিয়া নারীকে করে তোলে নির্বীর্য, নির্বাক যন্ত্রে। টুনি, ফাতেমা, আমেনাসহ হাজার হাজার নারী তারই প্রতিধ্বনি। শোষিত মানুষের প্রতি সহানুভূতিবশত ঔপন্যাসিক জহির রায়হান বাংলার নারীর এই করুণ অমানবিক জীবনচিত্রকে উচ্চকিত করেছেন; এখানেই লেখক ও উপন্যাসের সার্থকতা।

১২.

ক্ষুধা ও আশা উপন্যাসের পরিপ্রেক্ষিত নির্মিত হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজাত দুর্ভিক্ষের আবহে। যেখানে গ্রামের শান্ত পরিবেশে বেড়ে ওঠা একটি পরিবার দুর্ভিক্ষের অনলে নিঃশেষ হয়েছে। রাষ্ট্রের অজাচারিত সিদ্ধান্তে হানিফের পরিবার ভূমিহীন উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়। খাদ্যের অভাবে শহরে এসে পুরো পরিবার হয়েছে তছনছ, ছিন্নভিন্ন। ফাতেমার সমস্ত প্রচেষ্টা বিফল হয়েছে রাষ্ট্রের বিভিন্ন নির্মমতার নিকট। বিশেষ করে জোহরার নিখোঁজ হওয়া তাকে বেশি দীর্ণ করেছে। কাজের খোঁজে হানিফের নিরুদ্দেশ, শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কোমল পরশে তার বাঁচার প্রচেষ্টা পরাজিত হয়েছে। যুদ্ধের অনিবার্যতায় মৃত্যু, ধ্বংসর উন্মাদনায় বিবর্ণ হয়ে উঠেছে সাধারণ মানুষের জীবন। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ের ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন জায়গায় সৈন্যদের দৌরাত্ম্যে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ সরকার যে সৈন্যদের যুদ্ধে নিয়োজিত করেছিলেন তারা ছিল চরম বর্বর। তাদের বর্বরতার ফলে এই সমস্ত অঞ্চলে নতুন নতুন পতিতালয় গড়ে ওঠে। যুদ্ধবিধ্বস্ত পরিবারের নারী, কন্যা, কিশোরীদের এখানে পাচার করা হতো। *ক্ষুধা ও আশা* উপন্যাসের জোহরা তাদেরই একজন। যুদ্ধের এই তাণ্ডবের সাদৃশ্যসূত্রে উল্ল্যেখ যে সুবোধ ঘোষের একটি প্রবন্ধ 'একটি দুঃসহ অপরাহ্ণ' এর কথা–

> যেদিকে তাকানো যায়, শুধু নিরন্ন রুগ্ণ মুমূর্ষু মানুষের জটলা। হুল্লোড় চিৎকার কান্না কলহ ও বিলাপের তাণ্ডবে। সেই দগ্ধ জনারণ্যে পৃথিবীর সব সুস্বর পুড়ে ভস্ম হয়ে গিয়েছে। (অনিন্দিতা, ২০১৯ : ১৬)

মারি-মড়কের আতঙ্কে ভেসে যাওয়া মানুষের মৃত্যুতে ছিন্নভিন্ন হয়েছিল এ দেশ। ক্ষুধায়-ক্ষয়িত মানুষের বীভৎসতায় কেঁপেছিল বাংলাদেশে। বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় তার স্কেচধর্মী প্রতিভাস ফুটে উঠেছিল। বিশ্বযুদ্ধের সর্বগ্রাসী মন্দায় ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল সাম্রাজ্যবাদী মহাপ্রলয়। এমনই রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব মুখরতায় নির্মিত হয় *ক্ষুধা ও আশার* প্রেক্ষাপট।

১৩.

রাজনীতিই *প্রদোষে প্রাকৃতজন* উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। তাকে আশ্রয় করে অন্য সমস্ত কিছুর বিকাশ ও বিন্যাস সাধিত হয়েছে। পাশাপশি চরিত্ররাজিও রাজনীতি দ্বারা প্রভাবপুষ্ট। 'আবহমান বাংলা ও বাঙালির প্রত্ন ইতিহাস মন্থন করে শওকত আলী আহরণ করেছেন অনালোকিত অন্তেবাসীদের কথা বীজ। তারপরে বিপুল দক্ষতায় ও পরম যত্নে তথ্যের সঙ্গে মিলিয়েছেন অন্তর্দৃষ্টিকে।'(তপোধীর, ২০১৬: ১৩২) ইতিহাসের অনালোকিত আঁধারে যাদের জীবন মূর্তিময়, তাদের জীবনপ্রবাহকে ব্যক্ত করেছেন ঔপন্যাসিক। কথাকার বুঝিয়ে দিয়েছেন, রাজবৃত্ত নয়, লোকবৃত্তই ঔপন্যাসিকের প্রধান আরাধ্য। যখন সর্বার্থেই বাংলার ইতিহাসের প্রদোষকাল, তখন সর্বগ্রাসী আঁধারে জনজীবন বিদীর্ণ।

তখন রাজরাজড়াদের জীবনের শঙ্কা বা সন্তর্পণ নয়; প্রাকৃতজনের অধঃপতিত জীবনসংগ্রাম গুরুত্ব পেয়েছে এখানে।

১৪.

ঘর ভাঙা ঘর উপন্যাসে সরাসরি কোনো রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত নির্মিত হয়নি; তবে রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে নিম্নবর্গের জীবনের নিপীড়ন-নির্মমতা ও ক্লেদাক্ততা তার দায় রাষ্ট্র অস্বীকার করতে পারে না। রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থাপনার মধ্যে তৈরি হয় বৈষম্যের দেয়াল। ঔপন্যাসিক নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রের প্রতিই আঙুল তুলেছেন, 'ভদ্রলোক আপনাকেই আপাতত উত্তেজিত নালিশ ছুড়লেন–আর বলেন কেন! যত সব বেজন্মা ক্ষুদে বদমায়েশ।..কুকুর বেড়ালের মতো এগুলো সারাদিন পথে পথে ঘুরে বজ্জাতি করে বেড়াচ্ছে। হারামজাদারা রক্তবীজের ঝাড় সব।' (রিজিয়া, ২০১৭ :১৯) ঔপন্যাসিকের এই বক্তব্যের মধ্যে নিম্নবর্গের প্রতি সুবিধাবাদী নাগরিকের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত। এই দৃষ্টিভঙ্গি শুধু নাগরিকের নয়, রাষ্ট্রও নিম্নবর্গের প্রতি এমন ধারণা পোষণ করে। যাকে পুঁজি করে ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক দল রাজনীতি করতে পারে কিন্তু তাদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটে না। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের বক্তব্য এমন, 'রিজিয়া রহমানের স্বাতন্ত্র্য এখানে যে, বিশাল আয়তনিক জীবনকে তিনি এক অভিন্ন বোধের কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন। এই বোধ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অহঙ্কারে গৌরবদীপ্ত।' (রফিকউল্লাহ, ১৯৯৬: ২৯১) নারী সেখানে এক বিশাল জনগোষ্ঠী, তাদের অবস্থার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমগ্র রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন সম্ভব।

১৫.

চা-বাগানের নারীদের শ্রমিকজীবনের পরিক্রমা শুরু হয়েছে ঔপনিবেশিক রাজনীতির পথ ধরে। ঔপনিবেশিক রাজনীতির পুঁজিবাদী অর্থনীতি নিম্নবিত্তের এই মানুষগুলোকে স্বদেশ-স্বজাতি ছেড়ে চা-বাগানের এই শ্রমজীবী জীবনে আবদ্ধ করেছে।

১৬.

রক্তের অক্ষর উপন্যাসের প্রেক্ষাপট গড়ে উঠেছে রাজনৈতিক আবহে। 'রিজিয়া রহমান অনাসক্ত দৃষ্টকোণ থেকে যুদ্ধোত্তরকালীন সমাজজীবনের অন্তর্গত ক্ষত ও অসঙ্গতির চিত্র অঙ্কন করেছেন।' (রফিকউল্লাহ, ১৯৯৬ : ২৭৩) উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ইয়াসমীনের জীবনচিত্র পাল্টে যাওয়ার প্রধান কারণ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা মুক্তিযুদ্ধ। ইয়াসমীন চরিত্রের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক ঘটনাচক্রের এক ভিন্নতর দিক উন্মোচন করেছেন লেখক। মুক্তিযুদ্ধের

মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীন দেশের সুফল অনেকে ভোগ করলেও ; যাদের ত্যাগের মধ্যে দিয়ে এই স্বাধীনতা অর্জিত হলো, তাদের প্রতি এই সমাজ সদাচরণ করেনি। শুধু ইয়ামীন নয়, যে সাম্যতার প্রত্যয়ে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল, নারীর প্রতি রাষ্ট্র তার কোনো দায়িত্বই যথার্থরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। এভাবে সমগ্র উপন্যাসে একটি রাজনৈতিক পটভূমি তৈরি হয়েছে।

১৭.

একাল চিরকাল উপন্যাসের প্রেক্ষাপট গড়ে উঠেছে বৈশ্বিক রাজনীতির উত্তাল সময়কে কেন্দ্র করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজনিত মুদ্রাস্ফীতি, কালোবাজারি, পুঁজিবাদের আগ্রাসন সমস্ত ঘটনার প্রভাব পড়েছে প্রান্তিক এই জনগোষ্ঠীর জীবনে। লেখক উপন্যাসের একটি চরিত্র সুরকার মধ্য দিয়ে তেভাগা আন্দোলনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। সাঁওতাল নারীর জীবনে রাজনীতির প্রভাব বিভিন্নভাবে এসেছে। ১৯৪৩ দুর্ভিক্ষ, তার পাশাপাশি ভূমি মালিকদের বহুমাত্রিক ষড়যন্ত্র নিম্নবর্গের এই মানুষদের করে তুলেছিল নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত। নিজে খোলানে ধান তোল, আধি নাই তেভাগা চাই, কজ্বা ধানের সুদ নাই প্রভৃতি; এই সমস্ত স্লোগানে উত্তপ্ত হয়েছিল বাংলার আকাশ বাতাস। রাজবংশী-সাঁওতাল-গরিব মুসলমান কৃষকেরা একত্রিত হয়েছিল এই আন্দোলনে। এই সময়ের অভিঘাতে সাঁওতাল জনজাতির বিপন্ন রূপটি লেখক তুলে ধরেছেন। ‘অরণ্য-বহ্নিতে যে আগ্নেয় সত্তার জাগরণ-লড়াই সিধু কানুর নেতৃত্বে হয়েছিল এই উপন্যাসে সুরকা সোরেণের নেতৃত্বে তার সাযুজ্য লক্ষণীয়। দেওয়ানের লাঠিয়ালদের হাতে ছাই হয় খাগড়াবন, চাঁচিয়া, তাংদা, বাহার। দেওয়ানের কাচারিতে পুড়ে মারা যায় চুবকা, লাজ, ডোঙা, চম্পা, মুনি। জন-জাতির ইতিহাসে এ লড়াই যেন শেষ হবার নয়। রিজিয়া রহমানও যেন সাবলটার্ন স্টাডির মর্মকথাকে এভাবে রূপ দেন। (সৌমিত্র, ২০১৭ : ৩০৩) ঔপনিবেশিক রাজনীতির প্রভাব খ্রিস্টধর্মের প্রচার প্রসার ঘটেছিল। জাতীয় ও বৈশ্বিক রাজনীতি প্রবল প্রতাপে প্রান্তিক মানুষগুলোর যখন নাভিশ্বাস অবস্থা, মিশনারিরা তখন সহানুভূতির জাল বিছিয়ে অসহায় মানুষগুলোকে খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করেছে। বিবর্ণ-শ্রীহীন-দীনহীন মানুষগুলো মনে খ্রিস্টান ধর্মের মধুর প্রলেপ ছড়িয়ে দিয়েছে ঔপনিবেশিকতার কালো থাবা। যার ফলে পুরো আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাটাই খ্রিস্টান, গরিব, ভূমিহীন হয়ে যায়; আর এভাবে সাঁওতাল পল্লি জাতীয় আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রকোপে বিলীন হয়ে যায়।

১৮.

ধবল জ্যোৎস্না উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ফাতেমা ও তার পরিবার পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার। ১৯৭০ সাল থেকে মায়ানমার ইসলাম ধর্মের শরণার্থীরা বাংলাদেশে আগমন করে। ফাতেমা ও তার পরিবার আরাকান থেকে বিতাড়িত হয়ে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী উড়িলা টিলার পাদদেশে আশ্রয় নেয়। শুধু তারা নয় তাদের মতো বহু পরিবার এভাবে গৃহহারা হয়েছে। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে গৃহহীন তারা এবং তাদের মতো ভাসমান জনগোষ্ঠী। এর পাশাপাশি রয়েছে স্থানীয় সামন্ত বাহিনীর বহুমাত্রিক শোষণ।

১৯.

খোয়াবনামা একটি রাজনৈতিক ইতিহাসের দলিল (মোস্তফা, ২০১০ : ৬৮)। বিবর্তনশীল সমাজের অংশ হিসেবে, রাষ্ট্র ও সমাজনীতির পরিবর্তন এই মানুষগুলোর ব্যক্তিজীবন ও পরিবারকেন্দ্রিক জীবনাচারের কী ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে, তাকে রাজনীতির অনুষঙ্গে তুলে ধরেছেন লেখক। সামন্তবাদী অর্থনীতি থেকে পুঁজিবাদের প্রসার এই দীর্ঘ পরিক্রমায় শোষণ-বঞ্চনার যে দীর্ঘ পরিসর তাতে অনেক দিনের জমাট বাঁধা প্রশ্নগুলো উত্তর খুঁজতে থাকে। সেখানে দিনমজুর থেকে বর্গাচাষি, তমিজের তেভাগা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়া, শ্রমের ন্যায্য হিস্যা বুঝে নেয়ার যে ডাক সমাজে দানা বাঁধে তার ইতিহাসকে প্রতিষ্ঠা করাও এই উপন্যাসের একটি অংশ। এই সব বড় ইতিহাসের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তির যে ইতিহাস থাকে, তাও ঐ মূল স্রোতের ইতিহাসেরই অংশ। তমিজ, তমিজের বাপ, কুলসুম, ফুলজান, বৈকুণ্ঠ রাজনীতি বোঝে না, তবুও তারা রাজনীতির বাইরের কেউও নয়। এভাবে রাজনীতির অংশ হয়ে উঠে সাধারণ মানুষ কিন্তু এই রাজনীতি সাধারণ মানুষের জীবনের কোনো পরিবর্তনই ঘটাতে পারে না। উপন্যাসের সময়কাল জুড়ে চলতে থাকে ইতিহাস আর রাজনীতির ব্যাখ্যায়ন। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে হাজার বছরের লোকায়ত সংস্কৃতি, বাংলার মানুষের আধ্যাত্মিক চেতনা যা তার পেশার সঙ্গে, জীবিকার সাথে বংশপরম্পরায় জড়িয়ে থাকে। বাস্তবতা ক্রমাগত চরিত্রকে বহির্মুখী করে, লৌকিক জীবনের দিকে টানে সামাজিক ন্যায়বিচার ও শ্রেণিশোষণের অস্তিত্বতে নিজেকে সংগ্রামমুখী করে তোলে। এভাবে প্রত্যেকটি চরিত্রই নিজস্ব ভাবনায় চিহ্নিত হয়েছে (শহীদ, ১৯৯৭ : ২০০)। ব্রিটিশ শাসন শোষণবৃত্তান্ত থেকে শুরু করে পাকিস্তান সরকারের তেভাগা আন্দোলনের দমন-পীড়ন পর্যন্ত বিস্তৃত অধ্যায়। সেখানে বর্গাচাষি থেকে শুরু করে মাঝি, দিনমজুর,

কবিয়াল, ফকির, হিন্দু-মুসলিম, নারী-পুরুষ, নব্য-পুঁজিবাদী, মহাজন, সামন্ত শাসক- সবার প্রতিচ্ছবি নির্মিত হয়েছে। রাজনীতি অন্তঃপ্রাণ আখতারুজ্জামান দেখিয়েছেন 'পার্লামেন্টারি রাজনীতিবিদদের কাছে শ্রমজীবী মানুষের একমাত্র পরিচয় ভোটার। ছলে-বলে-কৌশলে মহামূল্যবান ভোটটি নিংড়ে নিয়ে পার্লামেন্টারি রাজনীতিবিদ শ্রমজীবী নিম্নবিত্তকে ছিবড়ের মতো ছুঁড়ে ফেলেন।' (শহীদ, ১৯৯৭ : ৭৮) এছাড়াও ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধ, ১৮৪৭ সালের সিপাহী বিপ্লব, ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রভৃতি বিদ্রোহ-সংগ্রামের কথকতায় *খোয়াবনামার* ব্যাপকতা ও গভীরতা সম্পর্কে পাঠক অবহিত হয়েছেন। তবে রাজনীতির প্রত্যক্ষ প্রভাবে পুরুষ যতটা আলোড়িত, নারী চরিত্র ততখানি আলোড়িত নয়। উপন্যাসের যে দীর্ঘ রাজনৈতিক পরিক্রমা, সেখানে তার পরোক্ষ প্রভাব নারীর জীবনে বহমান। সে ক্ষেত্রে কুলসুমের জীবন পরিসর প্রান্তিকতার চরম সীমায় অবস্থিত। সামন্তবাদী অর্থনীতি ব্যবস্থায় ভূমিহীন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন সর্বদা বিপন্নতার মধ্যে থাকে। উচ্চবর্গীয় আধিপত্যবাদের আগ্রাসনের সঙ্গে কুলসুমের মতো প্রান্তিক নারীর বিপন্নতা রাজনীতির দীর্ঘ পরিক্রমার মধ্যে জড়িয়ে আছে। দাদা চেরাগ আলী আর স্বামী তমিজের বাপের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের মধ্যে একাত্ম হয়ে আছে ঔপনিবেশিক রাজনীতির বিভিন্ন দিক। তার সঙ্গে আছে দেশভাগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ভয়ংকর খেলা ও তেভাগা আন্দোলনের তীব্রতায় তমিজের গৃহত্যাগী হওয়া। কালাম মাঝির বাড়িতে আশ্রয় নেয়া, বিহারি ক্যাম্পে নিহত হওয়া নারীর সঙ্গে সাযুজ্যতায় কুলসুমের মৃত্যুর পথ নির্মাণ, সবকিছু রাজনীতির প্রভাব তাড়িত ঘটনাবলির অংশ।

১৯.১

ফুলজানের জীবনের প্রতিটি ঘটনা রাজনীতি তাড়িত। অর্থনৈতিকভাবে ঔপনিবেশিক রাজনীতির অভ্যন্তরস্থ সমন্বয়বাদী শোষণে জীবন কংকালসারে পরিণত হয়েছে। তারপরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দুর্ভিক্ষজাত অপুষ্টিতে জন্ম নেয়া দুটি শিশুসন্তানের মা সে। দুর্ভিক্ষের করাল থাবায় দায়িত্বজ্ঞানহীন স্বামী পিতার সংসারে ফেলে রেখে চলে যায়। নিরুপায় ফুলজান পিতার সংসারে, পিতার খেতে কামলা খেটেছে; তবু সন্তানদের বাঁচাতে পারেনি। খেতে কাজের সূত্রে তমিজের সঙ্গে পরিচয় ও পরিণয়, সেই সংসারের সুখ তার জীবনে স্থায়ী হয়নি। তেভাগার আন্দোলন তমিজকে ফেরারি করেছে। একমাত্র সকিনাকে নিয়ে পরবর্তী জীবনের অনিশ্চয়তায় পথচলা।

২০.

নীল ময়ূরের যৌবন রাজনৈতিক ও শ্রেণিসংগ্রামের চেতনাদীপ্ত এক অসাধারণ সাহিত্যকর্ম। শাসক বাহিনীর প্রবল প্রতিরোধের মুখে অস্তিত্বের সংগ্রামে চিরচেনা বাঙালির অধিকারের লড়াইয়ের প্রতিচ্ছবি। লেখক চর্যার পদ ও পদকর্তাদের জীবনছবি উজ্জীবিত করতে গিয়ে নিম্নবর্গের প্রতি উচ্চবর্গের যে প্রবল রাজরোষ তাই স্পষ্ট করেছেন। রাজ আইন ভাঙার মধ্য দিয়ে প্রতিরোধের শিখা জ্বলে উঠেছে। উপন্যাসে রাজনৈতিক প্রতিকার এসেছে তিনভাবে- প্রথম ধনশ্রীর আইন ভাঙা ; দ্বিতীয়ত, কাহ্নপাদের সাংস্কৃতিক অধিকারের দাবি। তৃতীয়ত, ডোম্বী কর্তৃক উৎপীড়নকারী ব্রাহ্মণ হত্যা। সমগ্র উপন্যাসে এভাবে রাজনৈতিক প্রতিভাসের নির্মাণ ঘটেছে। এখানে নারী-পুরুষ সবাই রাজনৈতিক ঘটনার মধ্যে সম্পৃক্ত। তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক শোষণের মধ্যে রাজনৈতিক আক্রোশ বর্তমান থাকে। সেই শোষণের শিকার নারী-পুরুষ উভয়ই। বিভিন্ন সংস্কার আর আইনের দ্বারা নারী রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়েছে। যাকে লৈঙ্গিক রাজনীতির একটি দিক বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। কোনো নারী যমজ সন্তান প্রসব করলে তাকে অসতী বলে বিসর্জন দিয়েছে। এটি একটি রাষ্ট্রীয় আইন, আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র নিম্নবর্গের প্রতি যত কঠোর হয়, উচ্চবর্গের প্রতি তার এক ভাগও হয় না। এই প্রতিক্রিয়ায় ভৈরবীর জীবনে নেমে এসেছে সংকট। অন্যদিকে ডোম্বী স্বামী ছাড়া একা ঘরে থাকে বলে ব্রাহ্মণেরা বিভিন্নভাবে তাকে উত্ত্যক্ত করে। এই অত্যাচার আর অপমানে জ্বলে ওঠে ডোম্বী, প্রতিরোধের প্রবল স্পৃহায় জেগে ওঠে। রাতের অন্ধকারে দেবল ভদ্রের ভাগ্নি ডোম্বীর ঘরে এলে তার বুকে ছুরি বসিয়ে দেয় সে। এভাবে রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠেছে তাদের জীবন। রাজদরবারে কাহ্নুর সাংস্কৃতিক অধিকার আদায়ের মধ্য দিয়ে তার প্রতি রাজ দোষের দৃষ্টি পড়ে, যার ফলে শবরীর স্বাভাবিক জীবন-সংসার বিঘ্নিত হয়েছে। এইরূপ ঘটনার আবর্তে প্রতিটি চরিত্র রাজনৈতিক শাসন-শোষণে জর্জরিত। ভৈরবী, ডোম্বীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত কারণ চরম রূপ নিলে রাতের অন্ধকারে রাজশক্তি অন্ত্যজ পল্লি পুড়িয়ে দিয়েছে। রাজ শোষণের বিরুদ্ধে অন্ত্যজ শ্রেণির যে প্রতিবাদ প্রতিরোধ, তা চিরকালীন ভাষা পেয়েছে এই উপন্যাসে। বাঙালির হাজার বছরের সংগ্রামের সঙ্গে তার একটি সাযুজ্য লক্ষ করা যায়। (বিকাশ, ২০১৩ : ৯৫) চর্যাপদের সমাজজীবনকে অতিক্রম করে এই চেতনা এগিয়ে চলেছে স্বাজাত্যবোধের অঙ্গীকারে, প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞায়।

২১.

মানবসভ্যতার ইতিহাসে নারীর ভূমিকা কী ছিল? কেমন হওয়া উচিত ছিল? লিঙ্গবৈষম্য ও যৌন নির্যাতনে তারা কতটা অবদমিত হয়েছিল, এই সমস্ত বিভিন্ন প্রশ্ন এসে যায়। বিশ্বসভ্যতার ইতিহাস

এই সাক্ষ্য দেয় যে সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে নারী লৈঙ্গিক রাজনীতির শিকার হয়েছে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার নানা স্তরে, নানা বর্ণব্যবস্থায়, তারা বিভিন্ন শোষণের শিকার হয়েছে। *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* উপন্যাস সামাজিকভাবে প্রান্তিক মানুষের কথা বলা হয়েছে। সেখানে নারীরা বিভিন্ন ধরনের পিতৃতান্ত্রিক চিন্তাচেতনা লালন করে। নারীকে নিজের কথা নিজেকে বলার সুযোগ দিতে হবে, তবেই নারীর যথাযথ ক্ষমতায়ন হবে। উপন্যাসের যে প্রেক্ষাপট, সেখানে প্রকৃতি একটি বিশেষ দিক। সমুদ্রের বিচিত্র পরিবেশ মানুষের জীবনকে বিভিন্ন ধরনের সংকটের মধ্য দিয়ে নিয়ে যায়। নারীর সংকট সেখানে আরো বেশি, কারণ নারী লৈঙ্গিকভাবে নাজুক পরিস্থির মানুষ। এখানে নারীর সঙ্গে প্রকৃতির একটি সহজ বোঝাপড়া সম্ভব। লিঙ্গ-সচেতন শ্রেণিব্যবস্থায় দেখা যায় প্রকৃতি ও নারীর ওপর পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্যের প্রেক্ষিতসমূহ। লিঙ্গ-সচেতন শ্রেণিব্যবস্থা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, প্রকৃতি ও নারীর ওপর পিতৃতান্ত্রিক সমাজের আধিপত্যকে প্রথাগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. অনিন্দিতা দত্ত (২০১৬)। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-ও কথাসাহিত্য আত্মপরিচয়ের বর্ণমালা*, এবং মুশয়েরা, কলকাতা

২. আবু ইসহাক (২০১৭)। *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা

৩. গোপীকানাথ রায়চৌধুরী (২০১৬০)। *বিভূতিভূষণ: মন ও শিল্প*, *দে'জ পাবলিশিং*, কলকাতা

৪. জীনাত ইমতিয়াজ (২০০১)। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা

৫. সৈয়দ আবুল মকসুদ (২০০৮)। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর জীবন ও সাহিত্য*, মনন, ঢাকা

৬. হাসান আজিজুল হক (২০১৩)। *কথা সাাহিত্যের কথকতা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

৭. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (২০১৬)। *জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও জনগণের মুক্তি*, সংহতি, ঢাকা

৮. মহীবুল আজিজ (২০০২)। *বাংলাদেশের উপন্যাসে গ্রামীণ নিম্নবর্গ*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা

৯. মালেকা বেগম (২০১৩)। *বিপন্ন নারী*, মুক্তধারা, ঢাকা

১০. মাসুদুজ্জামান, বরেন্দু মণ্ডল (সম্পা.) (২০১৩)। *সেলিনা হোসেনের কথাসাহিত্যে দেশ কাল জাতি*, লেখা প্রকাশ, ঢাকা

১১. মোস্তাফা মোহাম্মদ (২০১০)। *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস কথাসাহিত্যে জীবনও সমাজ*, নান্দনিক, ঢাকা

১২. শওকত ওসমান (**২০১১**)। *জননী*, সময় প্রকাশ, ঢাকা

১৩. শহীদ ইকবাল (১৯৯৭)। *কথাশিল্পী আখতারুজ্জামান ইলিয়াস*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা

১৪. সরদার জয়েনউদ্দিন (১৩৬৫ব.)। *পান্নামোতি*, ওসমানিয়া বুক ডিপো, ঢাকা

১৫. সরিফা সালোয়া ডিনা (২০১৮)। *শহীদুল্লা কায়সারের উপন্যাস বিচিত্র বীক্ষণ*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

১৬. রফিকউল্লাহ খান (২০০৯)। *বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

সহায়ক পত্রিকা:

১. তপোধীর ভট্টাচার্য(২০১৬) 'প্রদোষে প্রাকৃতজন': আখ্যান নরক-দর্শন' চন্দন আনোয়ার [সম্পা.] গল্পকথা রিজিয়া রহমান সংখ্যা, রাজশাহী

২. সৌমিত্র লাহিড়ী (২০১৭) 'ধবল জ্যোৎস্না: স্বপ্ন-দুঃস্বপ্নের আদিম আখ্যান' চন্দন আনোয়ার [সম্পা.] গল্পকথা রিজিয়া রহমান সংখ্যা, রাজশাহী

৩. বিকাশকান্তি মিদ্যা, নীল ময়ূরের যৌবন: ভাষা আন্দোলন ও স্বদেশিকতার শিকড় সন্ধান মাসুদুজ্জামান, বরেন্দু মণ্ডল [সম্পা.](২০১৩)। *সেলিনা হোসেনের কথাসাহিত্য দেশ কাল জাতি*, লেখা প্রকাশ, ঢাকা

চতুর্থ অধ্যায়

নিম্নবর্গের নারীর ভাষিক-বৈশিষ্ট্য

ভাষা মানবজীবনের মূল্যবান সম্পদ। এই ভাষার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে, তার পারিপার্শ্বিকে প্রবেশ করে। ভাষা যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম। মানুষে মানুষে সমাজিক সম্পর্ক হয় ভাষার অবয়বে। সাহিত্য বিশেষ করে উপন্যাস জীবনসম্পৃক্ত শিল্প। সুতরাং উপন্যাসের ভাষার ব্যবহার অবিকল্প সত্য। উপন্যাসের ভাষা সমগ্র রীতি বা বিষয়বস্তু থেকে পৃথক কোনো ব্যাপার নয়। বলা যায় ব্যক্তি বা সমাজ-চেতনার সমগ্র মহিমাকে লেখক তাঁর ভাষার আধারে ধরে রাখেন। এ প্রসঙ্গে ফ্লবেয়ারের একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য, 'If you know exactly what you want to say you will say it well.'(উদ্ধৃত, বিপ্লব, ২০১২ : ১৫) ফ্লবেয়ার ভাষাকে শুধু বহিরাঙ্গিক কোনো সৌন্দের্যের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেননি, তিনি বিশ্বাস করতেন শিল্পীর সাহিত্যভাবনার ত্রুটি তাঁর ভাষাবিন্যাসের সামান্য ত্রুটিতেও প্রতিফলিত হয়। ঔপন্যাসিকের কল্পনা এবং লক্ষ্যের সঙ্গে তাঁর ভাষার সম্পর্ক আত্মিকরূপে আত্মপ্রকাশ করে। উপন্যাসের ভাষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ভাষার ব্যবহার লক্ষ করা গেলেও মোটামুটি দুই এক জায়গায় ঔপন্যাসিকগণকে মিলিত হতে হয়েছে। উপন্যাসের ভাষা জীবনের বাস্তবতা ও কাব্য দুইকে ধারণ করে। একই উপন্যাসের বর্ণনায়, সংলাপে, মন্তব্যে একাধিক ভাষা-টাইপ ব্যবহৃত হতে পারে। প্রধান কথা হলো, ভাষার সেই বহুমুখী বৈচিত্র্য সমগ্র উপন্যাসের ঐক্যবিধায়ক কাঠামোর সঙ্গে যথাযথ রূপে সম্পৃক্ত কি না, সে বিষয়ে সতর্ক থাকা। ঔপন্যাসিক জানেন যথাস্থানে সুপ্রযুক্ত একটি শব্দ বাস্তব জ্ঞানের চিহ্ন। তখনই তাঁর ভাষায় প্রয়োজন মতো আসে গদ্যের যথার্থত, কাব্যের ব্যঞ্জনা। (সরোজ, ২০০০ : ৩৬) সাহিত্যের ভাষায় উপন্যাস একটি পৃথক ঘরানা, তার ব্যাপ্তি ও ধারণক্ষমতার ফলে ভাষার ক্ষেত্রে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা অবিরাম চলতে থাকে। বাংলা উপন্যাসের শুরুর দিকে ভাষায় জীবনের মর্মমূলের গভীর রস, নিগূঢ় রহস্য মানব-মানবীর জীবন ও সমাজচিন্তার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। যেখানে পাশ্চাত্য শিক্ষাজাত নবযুগের জীবনবোধে উদ্দীপিত নর-নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটেছে। উনিশ শতকীয় জীবনবোধের রূপায়ণে পুরুষের পাশাপাশি নারী ব্যক্তিত্বের ক্ষীণ প্রকাশ বিকাশলাভ করতে থাকে। যুগবাসনার প্রভাবে নারীব্যক্তিত্বের পরিস্ফুটন হলেও আত্মপ্রতিষ্ঠা ঘটেনি সম্পূর্ণরূপে। নারীর সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিহার করে, অসংকোচ ও স্পর্ধায় তার পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা ঘটে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে। চারিত্রিক দার্ঢ্যতা, পরিশীলিত ব্যক্তিত্ববোধ নারী চরিত্রকে ক্রম পরিণতির দিকে

অগ্রসর করেছে। নারীর সংলাপ ও ভাষাবৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে তার সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে।

১.

বাংলা উপন্যাস, বাংলা সাহিত্যের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনাচরণের সমন্বিত রূপের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রকাশ মাধ্যম। জীবন ও প্রবহমান সময়কে বিনির্মাণের লক্ষ্যে ঔপন্যাসিক উপন্যাস রচনা করে থাকেন। ঔপন্যাসিকের নির্মিত শিল্পের সৌকর্যে পাঠক তার নিজস্ব পাঠকৃতির জগৎ তৈরি করে। যার ফলে, পাঠকের অনুকৃতির স্তরায়ন ঘটে উপলব্ধির বোধিসত্ত্বে। চিত্রকলায় শিল্পের যে বিমূর্তরূপ মূর্তিমান হয়ে ওঠে, উপন্যাসে তা সম্ভব নয়, কারণ উপন্যাসের পরিসর বিস্তৃত। উপন্যাস প্রাত্যহিক জীবনের ভাষিক শিল্পের অনুরণিত সত্যের বর্ণিতরূপ। উপন্যাস সব সময় মানুষ, জীবন ও সম্পর্কের নতুনরূপ উন্মোচন করে। উপন্যাসের ঘটনার বিন্যাস, চরিত্রের বৈচিত্র্য-সবই প্রদীপ্ত হয় ভাষার প্রয়োগ দক্ষতার গুণে।(বিপ্লব, ২০১২; ১৫) উপন্যাসের প্রাণপ্রাচুর্যে গড়ে ওঠে ভাষার খেলায় জ্ঞানের রাজনীতি। আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পরিপ্রেক্ষিত ও পরিস্থিতি নারীকে ভিন্নরূপে দেখতে ও প্রতিষ্ঠিত করতে অভ্যস্ত করেছে। সেখানে পুরুষের দ্বারা নির্মিত ও পরিচালিত আধুনিকতার নিরিখে নারীকে দেখা হয় প্রেম আর যৌনতার রহস্যাবৃত প্রতীক হিসেবে। পুরুষশাসিত জীবনব্যবস্থায় নারীর জীবনায়নে ঘটে নানান বিবর্তন। বিচিত্র জীবনায়নের আবর্তে নারী কখনো প্রেমের মহিমায় সমুজ্জ্বল ও কমনীয়; আবার কখনো সামাজিক, পারিবারিক, ধর্মীয় নিষ্পেষণ-জর্জরিত, নিপীড়িত-নিগৃহীত। নারীর জীবনে ঘটে যাওয়া এই সমস্ত তাৎপর্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে ভাষার মধ্য দিয়ে। নিম্নবর্গের জীবনের সামাজিক-অর্থনৈতিক দিক যেমন ভিন্ন, তেমনি তার আবেগ-অনুভূতির বহিঃপ্রকাশে ভাষাও ভিন্ন রূপে প্রবাহিত হয়।

১.১

তিতাস একটি নদীর নাম অদ্বৈত মল্লবর্মণের (১৯১৪-১৯৫১) বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের নদীতীরবর্তী জেলে জীবননির্ভর উপন্যাস। মহাকাব্যিক পরিসরের এই উপন্যাসে বহু নর-নারীর আগমন-নির্গমন ঘটেছে; এর মধ্য দিয়ে তাদের জীবনদর্শন, সামাজিক-সাংস্কৃতিক বাস্তবতার প্রবহ প্রবাহিত হয়েছে তাদের মুখনিঃসৃত ভাষায়। নিম্নবর্গের জীবনধারায় প্রাকৃত জীবনের শেকড়সন্ধানী প্রতিবেশ সৃষ্টি হয়েছে আঞ্চলিক ভাষার আবহে। অশিক্ষা, অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে থাকা নদীপারের জনজীবনের প্রতিনিধিত্ব করেছে তিতাসের মতোই পূর্বাপর পরিব্যাপ্ত নারী বাসন্তী। তার জীবনের কিশোরীকাল থেকে শুরু করে মধ্যবয়স পেরিয়ে বিগতযৌবনায় শেষ হয়েছে উপন্যাসের কালপর্ব। এর মধ্যে

দীননাথ-মাঝির কন্যা, সুবলের বিধবা স্ত্রী আর অনন্তর মাসী হয়ে তার ভাষিক অবয়ব গড়ে উঠেছে। জীবনের বিভিন্ন পর্বে, বিভিন্ন প্রতিকূলতায় নারীর কণ্ঠের বাঁকে বাঁকে প্রতিচ্ছায়া রেখে যায়। কুমারী বাসন্তীর যে কোমলতা-প্রগলভতা দেখা যায়, তা তার সংলাপে অন্তর্লীন–

> মা, ওমা দেখ সবুল দাদা কিশোরদাদার কাণ্ড! আমি চৌয়ারি জলে ছাড়তে না ছাড়তে তারা দুইজনে ধরতে গিয়া কি কাইজ্যা। এ কয় আমি নিমু, হে কয় আমি নিমু। ডরে আর কেই কাছেও গেল না। শেষে কি মারামারি! আমি কইলাম, দুইজনে মিল্যা বানাইছ, দুইজনে নিয়া রাইখ্যা দেও। মারামারি কর কেন? শুইন্যা কিশোর দাদা ভার মানুষের মত ছাইড়া দিল। আর সুবলদাদা করল কি– মাগগো মা, দুই হাতে মাথাত তুইল্যা দৌড়। (অদ্বৈত,২০১৫ : ৪১৪)

এখানে নারী ভাষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য 'ওমা' বিস্ময়প্রকাশ ভাবোদ্দীপক রূপমূল। এ ছাড়া এই সংলাপের অন্তর্জগতে প্রতিফলিত হয়েছে আনন্দের উচ্ছ্বাস, তার সংলাপে ছড়িয়ে পড়েছে সেই উচ্ছলতা। তার কণ্ঠে ঝরেছে আবেগের আতিশয্য। (সোহানা, ২০১৪; ৪৩) এই নারী বাসন্তী যখন তারুণ্যে পৌঁছে সুবলের বউ হয়েছে, অল্প দিনের ব্যবধানে বিধবা হয়েছে, তখন তার কণ্ঠের লালিত্য, মাধুর্য, কমনীয়তা রূপ নিয়েছে কর্কশতা আর রূঢ়তায়। অনন্তর মার সঙ্গে কথোপকথনে তার সেই নিরস জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা ধরা পড়েছে:

> ছাওয়ালের বাপ কবে স্বগগে গেল দিদি!' জানি না। বলি মারা গেছে ত? জানি না।...মনে মনে খানিকটা ভাবিয়া নিয়া এবারও আগের মতই জবাব দিল, 'জানি না ত দিদি'।'খালি জানি না, জানি না, জানি না। তুমি কি দিদি কিছুই জান না। –না কি জিভে কামড় শিরে হাত, কেমনে আইল জগন্নাথ? আসমান থাইক্যা হইছে বুঝি। (অদ্বৈত, ২০১৫ : ৪৪৮)

অনন্তর মার সঙ্গে এই মতবিনিময়ের মধ্যে যে কোমলতাহীন সহজ স্বাভাবিক সম্ভাষণ, তা বিরক্তিসূচক ভাবের কারণ। আর সবই তার মানসিক অস্থিরতা ও অধৈর্যে পরিব্যাপ্ত। প্রবাদ-প্রবচনের আশ্রয়ে তার প্রশ্নের যথার্থতা তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে। বাল্যবিধবা জীবনের যে অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতা তার জীবনের মধুর কৌতূহলের উচ্ছ্বাসকে বিলীন করেছে। অকাল বৈধব্য শোষণ করেছে তার তারুণ্যের সজীবতকে। তার তারুণ্যের জায়গা দখল করে নিয়েছে কর্কশতা, রূঢ়তা, গ্রামীণ বিশ্বাস, সংস্কার, প্রবাদ-প্রবচন প্রয়োগের প্রসারতা।

১.২

বাসন্তী ছাড়াও অনন্তর মা, উদয়তারা কালোর মা, বৃন্দার মা প্রভৃতি নারীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে উদয়তারা একটু স্বতন্ত্র ঘরানার নারী। মালোপাড়ায় সে লবচন্দ্রের বউ। তার ভাষিক অবয়ব

''আলো বান্দিনীর ঘরের চান্দিনী ! মুখ সামলাইয়া কথা ক, বুক সামলাইয়া বাড়ি যা। বেশি কথা তুলিস না, ছালার মুখ খুলিস না।' (অদ্বৈত, ২০১৫ : ৫৫৮) তার কথায় রয়েছে বাংলাদেশের নারীর ছড়া ও প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহার। নিম্নবর্গের নারীর ভাষা-সংস্কৃতির প্রবাহ গড়ে ওঠে সমাজ ও ইতিহাসের গভীরে প্রথিত শেকড় থেকে। বিনির্মাণের মাধ্যমে মিথের রহস্য যেমন মোচন করা যায়, ভাষার রহস্য তেমনি মোচন করা যায় প্রতিবিম্বিত জীবনের তথ্যের আলোকে। তিতাসপাড়ের জীবন সম্পর্কে লেখক সার্বিকরূপে অবগত ছিলেন বলেই মালো সংস্কৃতির শিল্পশৈলী আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। যে পরিবেশ, যে সামাজিক নিয়মের মধ্যে তারা দিন কাটায়, তার আর বদল ঘটে না, অপরিবর্তনীয় তাদের জীবনদর্শন, প্রকৃতিসংলগ্ন সমাজ প্রকৃতির মতোই তারা স্থাণু। নদীকে কেন্দ্র করে এদের দিনযাপন। (বিপ্লব, ২০১২ : ৩৩) মালো নারীরা অশিক্ষিত বলেই তাদের ভাষার কোনো পরিশীলন নেই, আছে আঞ্চলিকতা আর প্রাত্যহিকতার আটপৌরে রূপবৈচিত্র্য। তাদের ভালোবাসা আর হিংস্রতার ভাষায় বড় কোনো ব্যবধান নেই, কোনো সংকোচ ছাড়াই তারা উচ্চারণ করতে পারে শকুন্যা বুড়া, উকুইন্যা বুড়া, পোড়ামুখি, বেইমান কাউয়া, বান্দিনীর ঘরের চান্দিনীর মতো ভদ্রসমাজের অনুচ্চারিত শব্দসমূহ। এই সমস্ত শব্দ শুধু তাদের প্রাত্যহিকতার চিত্রই নয়; মালোজীবনের অন্তর্জগতের চিত্রের প্রতিচ্ছবিও বটে। এই উপন্যাসে এমন অনেক শব্দের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়, যেখানে তাদের জাতিনির্ভর পেশাগত ভাবনার প্রতিচিত্র ধারণ করে। যেমন ডহর, মাথট, গরদিস, ঠিসারা, কুয়ারা, গাওয়াল প্রভৃতি। তৎসম, তদ্ভব ও আঞ্চলিকতার সমন্বয়ে সাধু ও চলিতের মিশ্রপ্রবাহে অদ্বৈতের যে গদ্যরীতি তা সম্পর্কে অশোক মিত্রের মতামত:

> ...১৯৫১-র প্রথমে মারা গেলেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ। পদ্মানদীর মাঝিতেই তখনো নিমজ্জিত ছিলুম বলেই বইয়ের নাম শুনে মনে হয়েছিল মল্লবর্মণ হয়ত মানিকবাবুর অনুসরণে লিখেছেন, সেজন্য প্রথমটা অতটা উৎসাহ পাইনি। মৃত্যুর বেশ কিছুদিন পরে বইটি পড়ে আমার মনে হলো অদ্বৈত মল্লবর্মণের বইয়ের জগৎ, তার পরিধি, ব্যাপ্তি, সমাজচিত্রণের গভীরতা যেন মানিকবাবুর থেকে বেশি। যে সমাজ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে লিখেছেন, যেন তাকে আরো গভীরভাবে জানেন ও তার সঙ্গে নিজেকে আরো অন্তরঙ্গভাবে সামিল করতে পারেন। তাঁর মালোভাষার ব্যবহার মনে হলো আরো মাটি ঘেঁষা। (উদ্ধৃত, হরিশংকর, ২০০৮ : ১৯৬)

মাটিসংলগ্ন মানুষের মুখের ভাষায় তাদের জীবনচিত্র আরো বস্তুনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তবে জেলে রমণীদের মুখের ভাষায় গ্রামীণ নারী এমন অনেক বাচনভঙ্গির সঙ্গে পরিচয় ঘটে, যা পাঠক সচরাচর শুনে অভ্যস্ত নয়। যেমন:

> ক. কি লা তোর মা-আবাগি কি আমার মত? হ মা, ঠিক তোমার মত। আছে? জানি না ত মা। আ কপাল।

খ. 'কিলা বাসন্তী, জলে কি তোরে যাদু করছে। 'টানে' উঠবি না? তোর সাথে একখান কথা আছিল।'... আমার ত ভইন কৃষ্ণহারা ব্রজনারীর মত অবস্থা। কিন্তু পরের পুত, তোরও পেটের না, আমারও পেটের না।'--দূর নিশত্তুরী। (অদ্বৈত, ২০১৫ : ৫৫৮)

'কি লা তোর মা-আবাগি কি আমার মত?' বাক্যের মধ্যে নারীর নাজুক অবস্থা স্পষ্ট। নারী মাত্র অভাগী, যে প্রশ্ন করেছে, সে নিজেকে অভাগী ভাবছে, এবং যার কথা জানতে চাওয়া হয়েছে, তাকেও অভাগীই ভাবা হয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যে বাসন্তী ও উদয়তারা দুজনেই অসহায় তাদের মাতৃত্বের অধিকারবোধের জায়গায়। কারণ তারা, কেউই অনন্তর গর্ভধারিণী মা নয়। প্রান্তিক এই নারীর অসহায়ত্ব শুধু এখানেই নয়, সমগ্র জীবনের কোথাও তারা নিজেদের অধিকারের দাবি করতে পারেনি। এই বাক্য তার একটি দৃষ্টান্তমাত্র। প্রান্তিক নারীর ভাষাকে অদ্বৈত সাহিত্যের ভাষায় রূপান্তরিত করে তাকে কালোত্তীর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সাহিত্যের মূল স্রোতের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন ব্রাত্য মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা আর আনন্দ-বেদনার কণ্ঠস্বর।

৩.

দরিয়াবিবি বাংলার নদীর মতো; বড় নদী নয়, ছোট একটি নদী। নদীর মতো তার জীবনের ধারা বহমান। কোনো প্রতিকূলতার কাছে সে মাথা নত করেনি। সমাজ-সংসার-ধর্ম-অর্থনীতি সবার সব বাঁধা বুকে করে জীবনের পথে সে বয়ে চলেছে। (সাইদুর, ২০১১; ২৪০) তবু সে বশ্যতা মানেনি, আত্মসমর্পণ করেনি। প্রচণ্ড আত্মমর্যাদায় ধিক্কার জানিয়েছে সমাজ রাষ্ট্রে বিরাজমান পুরুষতান্ত্রিকতার অন্তর্নিহিত প্রথাগুলোকে। তার শাণিত ব্যক্তিত্বের প্রদাহ ফুটেছে ভাষার অবয়বে। তার প্রকাশ সংলাপের প্রখরতায় আবার কখনো ঔপন্যাসিকের বর্ণনার প্রাতিস্বিকতায়। *জননী* উপন্যাসের বাক্যগঠন একবাক্যিক প্রকৃতির। যেমন 'দরিয়াবিবি বলিল: খালা, রাগ করো না। একটা কাপড় আমাকে দাও। পরে দাম দিয়ে দেব।' (শওকত, ২০১১ : ৫৫) শত অভাবের মধ্যেও সে নিজের মাথাকে সমুন্নত রেখে বেঁচেছে সে। বিশেষ করে যেখানে তার আত্মমর্যাদার প্রশ্ন, সেখানে তার ছোট ছোট বাক্যে তীর্যকতায় পূর্ণ। শুধু রূঢ়তা আর রুক্ষতায় তার চরিত্রের প্রকাশ নয়। সন্তানবাৎসল্যে সে এক প্রাণদীপ্ত নারী :

আমু, এদিকে আয় তো বাবা, আমার চোখে কী কী পড়েছে দ্যাখ। ... ভারি করকর করছে চোখটা। দরিয়াবিবি কাপড়ের খুঁটে মুখের ভাপ দিতে থাকে। ভালো হল, মা? দাঁড়া বাবা, খামাখা বকাসনি। (শওকত,২০১১ : ১৮)

ভাষার বিন্যাসগত দিকসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সেখানে বিভিন্ন ধরনের পদের সমাহার ঘটে চলেছে। যেমন 'ভারী মনে করে দিলি, বাপধন! ওগো বাছুরটা দেখ না।' ভারী শব্দটির প্রয়োগ ঘটেছে বিশেষণ অর্থে, বাপধন বলতে সন্তানের প্রতি মায়ের স্নেহার্দ্র সম্বোধন। সম্বোধনবাচক বিশেষণের প্রয়োগ ঘটেছে। পৃথিবীর সর্বত্র নারী-পুরুষের ভাষার পার্থক্য চোখে পড়ে। সমাজভাষাবিজ্ঞানীগণ নারীর ভাষায় বিশেষ কতকগুলো বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয় তার মধ্যে সংস্কারাচ্ছন্নতা আর ঐহিত্যানুগ প্রবণতা। যেমন ওগো স্বামীর প্রতি সম্বোধন। সংস্কার অনুসারে স্বামী নাম ধরে না ডাকা তাই সম্বোধন। 'ওই যে অভাগীর বেটি, দাঁড়িয়ে আছে।' অভাগীর বেটি নারীর প্রতি সমাজের নিম্নবর্গীয় মানসিকতা থেকে এমন সম্বোধনের প্রকাশ। এছাড়া বাক্যের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের নিম্নরুচির প্রকাশ লক্ষণীয়। যেমন 'আমার পেটে এমন ডিংরে জন্মালো।' ডিংরে অর্থে- বাউণ্ডেলে, বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই হতচ্ছাড়ি-গালি হিসেবে ব্যবহৃত বিশেষণ। 'এমন অপয়া কথা মুখে আনে!' নারীর প্রতি নেতিবাচক সামাজিক ট্যাবু। এর বাইরে বিভিন্ন অব্যয়ের ব্যবহার দেখা যায় তার ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের প্রয়োগ বেশি ঘটে থাকে। 'দশ-মেসে পোয়াতির মত, বৌমা। সদাই হাঁই–ফাঁই করছে।' হাইফাই হলো ধনাত্মক অব্যয়, হাঁসফাঁস অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখনই ছেলের জন্য হাঁপাহাঁপি। হাঁপাহাঁপি ধ্বনাত্মক অব্যয়। অস্থির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (সোহানা, ২০১৪ : ১৩০-১৩১) *জননী* উপন্যাসটিতে ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হয়েছে। উপন্যাসের ভাষায় ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য ও জীবনার্থের যথার্থ স্বরূপ পাওয়া যায়। *জননী* উপন্যাসের প্রথমপর্বের ভাষায় বস্তুজগৎ প্রাধান্য পেয়েছে, দ্বিতীয় পর্বের ভাষায় মাতৃত্বের অনুভব গুরুত্ব পেয়েছে। নারীর বাচনিক পর্যায়সমূহ নির্মাণের পাশাপাশি ঔপন্যাসিকের বর্ণনার তাৎপর্যে শেষের পরিচ্ছেদ মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। বিবরণ-বর্ণনা আর অলঙ্কৃত ভাষার সমাবেশ লেখকের পরিণত প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করেছে। নারীর ভাষাগত স্বাতন্ত্র্যে তার সামাজিক অবস্থান, স্বভাবের রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। পরিবেশ অনুযায়ী ভাষা-ব্যবহার শওকত ওসমানের ভাষাশিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য। চরিত্রের মনের নিভৃত প্রদেশের ভাবনারাজি তুলে ধরার ক্ষেত্রে তিনি এক জীবননিষ্ঠ শিল্পীর পরিচয় দিয়েছেন।

৪.

সরদার জয়েনউদ্‌দীনের উপন্যাসে গ্রামীণ জীবনের বাস্তবতা মূর্ত হয়ে উঠেছে লোকজীবনের সাবলীলতায়। উপন্যাসের সরলরৈখিক উপস্থাপনায় লেখকের উপলব্ধিজাত অনুভূতির গভীর বিশ্লেষণ অপেক্ষা চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দ্বারা কাহিনি প্রবাহিত করেছেন। এ ক্ষেত্রে শিল্পকুশলতা অপেক্ষা কাহিনির বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনে অধিক মনোযোগী ছিলেন। *পান্নামোতি*'র ভাষার ক্ষেত্রে লেখক চলিত

রীতিকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। গ্রামীণ জীবনকে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ভাষাকে বাহুল্যবর্জিত নিরাভরণ রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। পূর্ববঙ্গের গ্রামীণ জীবনের সরলতা এই উপন্যাসের ভাষা নির্মাণের পশ্চাতে প্রেরণা রেখেছে। আব্দুল গণি হাজারীর মতে :

> গদ্য সাহিত্যের জসীমউদ্দীন বলে অভিহিত করেন, তা কেবল তাঁর উপন্যাসের জটিলতাহীন জগতের জন্যে নয়; বিষয়বস্তুকে প্রকাশ করার ভাষাগত সরল ভঙ্গির জন্যেও। কিন্তু উপন্যাসের শুরুতে গ্রামীণ জীবনের বর্ণনায় ভাষার সারল্য ও কাব্যিকতা যে-সুষমা সৃষ্টি করে, তা আর পরে লক্ষ করা যায় না। পরবর্তীতে তাঁর ভাষা হয়ে উঠেছে বক্তব্যধর্মী ; ক্ষেত্রবিশেষে বক্তৃতাধর্মী। (উদ্ধৃত, মহীবুল, ২০০৮ : ১১৪)

উপন্যাসের সমাজবাস্তবতায় চরিত্র যেহেতু প্রধান হয়ে উঠেছে, সেহেতুই ভাষার প্রকাশ ভঙ্গিমাইও চরিত্রই প্রধান হয়ে উঠেছে। চরিত্রের সংলাপের অবয়বে চিন্তার অবয়বে ভাষার কাঠামো নির্মিত হয়েছে। আর একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ যে লেখক নিম্নবর্গের মানুষকে, প্রান্তিক মানুষকে কাহিনির অন্তরাত্মায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যথোপযুক্ত কারণেই, ভাষায় নিম্নবর্গের জীবন পরিচর্যার ছাপ স্পষ্ট হয়েছে। সেখানে লেখকের নিজের জেলার আঞ্চলিক ভাষার পাশাপাশি সংলাপের আঞ্চলিক বিভিন্ন স্ল্যাং ব্যবহারও লক্ষণীয়। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র পান্না তাকে কেন্দ্র করেই সমস্ত আয়োজন। পান্না নিম্নবর্গীয় নারী, নিম্নবর্গীয় পরিসীমার মধ্য থেকে সে জ্ঞান অর্জন করেছে। তাই তার ভাষায়, চিন্তায়, পরিশীলিত ভাষা বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। নারীর পরিবার তথা সমাজ পরিমণ্ডল শুরু থেকেই তাকে বিশেষ কতকগুলো মেয়েলি বাচন পদ্ধতি অভ্যস্ত করে তোলে। তার মধ্যে কয়েকটি হলো : ওমা, কি মা, ওগো, মাগো, মরি মরি ইত্যাদি। আমরা এই উপন্যাসের পান্নার সংলাপে তার কিছু প্রয়োগ দেখে থাকি। যেমন :

> ১. ওগো তোমরা বলে দাও পান্না আজ কি করবে? ছোট বাবু না, তার বিয়ে করা স্বামী, কে তার আপন হবে। (সরদার, ১৩৭১ব.: ১১০)
>
> ২. ওগো আমায় কি করতে হবে বলে দাও, কি করলে তোমরা খুশী হবে তা যে আমার জানা নাই। কলঙ্কিত জীবনের দুঃসহ যাতনার প্রতিচ্ছবি এভাবে প্রতিধ্বনিত হয়েছে: (সরদার, ১৩৭১ব. ১১২)

এই অবসাদ, এই ক্লান্তি পান্নার জীবনজাত সত্য। সামন্ততন্ত্র ও পুরুষতন্ত্রের চাপে পিষতে থাকা জীবনের এই গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে সোচ্চার হয়েছে সে। তার প্রতিবাদ প্রতিরোধ বৈচিত্র্যমণ্ডিত ও তীর্যক; একই সঙ্গে তার ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক বটে।

অমৃতের সমাজ পরিমণ্ডলে যা সত্য ছিল, তাই তার সত্তাকে দখল করে নিয়েছে। জীবনের ইচ্ছা আর অনিচ্ছাকে পুরুষতন্ত্র আর সামন্ততন্ত্রের চেনা পথে বলি দেয়ার মধ্যে কখন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে

সে বুঝতে পারেনি; বোঝার পথও তৈরি হয়নি। প্রথাগত পথের প্রবল অনুসারী হয়েও প্রবল তেজস্বিনী ও ব্যক্তিত্বময়ী সত্তার পরিচয় দিয়েছে সে, পাশাপাশি ভাষায় পরিচয় দিয়েছে ওজস্বিতা। স্বামীহীন জীবনে ছেলের অনুশাসনকে মেনে চলার যে সামাজিক বিধি, তাকে উপেক্ষা করেছে প্রচণ্ড দৃঢ়তায় :

> কি আমার শ্রী রে রাম শালিকের বাচ্চার মত চেহারা তার হাতে তুলে দেব আমার সোনার ময়না।...অমৃত বললো মেয়ে কি খোলামকুচি না বাসি চুলোর ছাই যে ইচ্ছে করলেই ফেলে দিলাম। লোকে কথায় বলে দাইয়ের ঘরের মেয়ে তো না রাজত্ব, সে মেয়ে নিতে তেল খড় লাগে অনেক। (সরদার, ১৩৭১ব. ১০৮)

একমাত্র কন্যা পান্নার বিয়ের প্রসঙ্গে এভাবে পুত্র বিশু ও অন্য সবার মতামতকে উপেক্ষা করে নিজস্ব বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অমৃতের ব্যক্তিত্বের প্রকাশে ভাষা বড় মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছ। সেই প্রকাশ ভঙ্গিমাকে ঋজুতা দিয়েছে বিভিন্ন ধরনের প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার ও প্রয়োগ:

> ১.লোকে কথায় বলে দাইয়ের ঘরের মেয়ে তো না রাজত্ব, সে মেয়ে নিতে তেল খড় লাগে অনেক। (সরদার, ১৩৭১ব. : ৬৮)
>
> ২. লোকে কথায় বলে টেঁপী ভাত খাবিরে? বলি হাত ধোব কোথায়? (সরদার, ১৩৭১ব. ৭৮)
>
> ৩. গুরুর মন্ত্র অযথাই এতদিন গরুর কানে ঢালা হয়েছে। (সরদার, ১৩৭১ব.: ৭৪)

সংলাপে প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার নারীর ভাষাকে বিশেষায়িত করেছে। এ বিষয়ে গবেষকদের মত এমন যে, নারী ভাষা ব্যবহারে পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি রক্ষণশীল। অর্থাৎ পুরুষ যত তাড়াতাড়ি পুরোনো কথাকে ত্যাগ করে নতুন বিষয়কে গ্রহণ করতে পারে নারী, তত তাড়াতাড়ি পারে না। ফলে নারীর ভাষায় আমরা পুরোনো অনেক শব্দ ও ভাষাভঙ্গিমার বিস্তার লক্ষ করা যায়। (সুকুমার,১৯৮৫ : ৬৭২) প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার পুরোনো রীতির অন্যতম একটি দিক।

৫.

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বাংলাদেশের উপন্যাসের বিষয়স্তু ও রচনাকৌশলে যেমন স্বাতন্ত্র্য সমৃদ্ধির শৈল্পিক বিনির্মাণ করেছেন; তেমনি ভাষাশিল্পের প্রথাগত পরিধিকে দূরে রেখে নিজস্ব রূপরেখায় উদ্ভাসিত হয়েছেন। তাঁর সাহিত্যকর্মের বিষয় আঙ্গিকের পশ্চাতে রয়েছে গভীর অনুশীলন ও মননশীলতার প্রতিচ্ছায়া। তাকে প্রকাশ করার জন্য প্রয়োজন ছিল যথোপযুক্ত ভাষাশিল্পের অনুধ্যান। সামাজিক পশ্চাৎপদ শ্রেণির পাশাপাশি মুসলিম নারীর নাজুক অবস্থান, প্রান্তিকচেতনা, চেতনাগত দ্বন্দ্ব, তৎকালীন গ্রামীণ জীবনের অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে উপন্যাসের ভাষায় (সাইদুর, ২০১১: ২৫৫)। প্রত্যক্ষ সমাজ-বর্ণন থেকে তিনি আশ্রয় করেছেন ব্যক্তির চৈতন্যে। মানববিদ্যা সম্পর্কিত নিবিড় জ্ঞান

তাঁকে সহায়তা করেছে সৃষ্ট চরিত্রদের মনোগহনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র অঙ্কনে। *লালসালু*র ভাষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে বর্ণনাত্মক ভাষারীতির। চরিত্রের অন্তরজাত সত্তা যতটা সংলাপে প্রকাশিত হয়েছে, তার অধিক প্রকাশিত হয়েছে বর্ণনায়, আকারে, ইঙ্গিতের তীর্যকতায়। চরিত্রের অবস্থানগত স্বল্পতা থেকে দীর্ঘতার দিকে যাত্রা করেছে। গ্রামীণ বৃদ্ধা এক মুখরা নারীর বাচিক ভঙ্গি ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরেছেন : 'ওরে মরার ব্যাটা তুই কী ভাবছস? ভাবছস বুঝি পোলাগুলি তোর জন্মের? আল্লা সাক্ষী-হে গুলি তোর জন্মের না, তোর জন্মের না! (ওয়ালীউল্লাহ, ২০১৬ : ৪৪) যখন প্রতিপক্ষ স্বামীর সঙ্গে মৌখিক ও শারীরিক শক্তিতে পরাজিত হয় তখন নিজেকে নীচ করে হলেও প্রতিপক্ষকে পরাজিত করেই শান্তি। দারিদ্র্য আর ক্ষুধার পৃথিবীতে দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে থাকে না শ্রদ্ধা, সম্মান আর ভালবাসা ; সবকিছু ঝড়ের হাওয়ায় ভেসে যায়। ক্ষুধার রাজ্যের এই করুণ ইতিহাস সম্পর্কে লেখক সর্বজ্ঞাত। অশীতিপর বৃদ্ধা তার মেয়ের আনন্দিত শরীর উপলক্ষ করে বলেছে: –খানকির বেটি নিকা করব বলাই তো মানুষটারে খাইছে! (ওয়ালীউল্লাহ, ২০১৬ : ১৪) '–খানকির বেটি' বলো সম্বোধন করার মধ্য দিয়ে ঐ নারীর মাকে পর্যন্ত অভিযুক্ত ও অবজ্ঞা করা হয়েছে। নারী জীবনের পরতে পরতে বঞ্চনা ও অবহেলার শিকার হয়ে থাকে। গ্রামীণ নিম্নবর্গীয় সংস্কৃতিতে নারী অল্প বয়সে বিধবা হলে তার জন্য তাকেই দায়ী করা হয়। হাসুনীর মার মা তাকে উচ্ছ্বসিত দেখে এমন বিরূপ মন্তব্য করে। নিম্নবর্গীয় সমাজের প্রান্তিক নারী হাসুনির মায়ের প্রতি এই সম্বোধন তার মায়ের। ঔপন্যাসিকের বাংলাদেশের নিম্নবর্গীয় সমাজে নারীর যে, অবমূল্যায়ন তার একটি সার্থক চিত্র পাওয়া যায় এই পরিপ্রেক্ষিতে। –খানকির বেটি আর ভাতার –খাইকা জারুণি দুটিই গালাগাল বাচক বিশেষ্য বাক্যাংশ। দুটি সংলাপের মধ্যেই নারীর নিগৃহীত জীবনের চিত্র পাওয়া যায়।

৬.

শামসুদ্দীন আবুল কালামের (১৯২৬-১৯৯৭) অধিকাংশ উপন্যাস প্রেক্ষপটগত দিক থেকে আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে শ্রেণিভুক্ত। যেখানে অনির্বচনীয়ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে দক্ষিণাঞ্চলের জনজীবন ও ভূখণ্ডের একটি বিশেষ সত্য। উপন্যাসে বিধৃত চরিত্রসমূহে যে জীবনজিজ্ঞাসা প্রকটিত তাতে মানবসত্তা ও প্রকৃতির মধ্যে সহজাত যে সম্পর্ক বহমান, তাকে অন্বেষণের প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। উপন্যাসের প্রয়োগকৃত ভাষারীতিতে বৈচিত্র্যের সম্ভার স্পষ্ট। *কাশবনের কন্যা* (১৯৫৪) উপন্যাসের ভাষা সম্পর্কে লেখক নিজে নিবেদন করেছিলেন এইরূপ : 'উপন্যাসখানির ভাষাতে আঞ্চলিক প্রকাশ-ভঙ্গির সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি।' তবে এই প্রত্যাশা পুরোপুরি অনুসৃত হয়নি। *কাশবনের কন্যা*র ভাষা রোমান্টিকতাজাত হলেও তার অনেকাংশই আঞ্চলিক জীবনের তথ্যভাণ্ডার

থেকে সংগৃহীত। প্রথম দিকের ভাষার বর্ণনাধর্মিত আখ্যানের যোগসূত্র অক্ষুণ্ন রেখেছে। চরিত্রের আত্মকথনে বিদগ্ধতা ও দার্শনিকতায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। শামসুদ্দীন আবুল কালামের ভাষারীতির বৈচিত্র্য বিদ্যমান। *কাশবনের কন্যা* ও *কাঞ্চনমালা* দুটি উপন্যাসেই ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হয়েছে। উপন্যাসের কাহিনি বর্ণনায় সাধুরীতির গদ্যের ব্যবহার হয়েছে। সংলাপ রচিত হয়েছে লেখক নির্মিত প্রমার্জিত আঞ্চলিক গদ্যে। এই উপন্যাসের আঞ্চলিক আবহে নারীর ভাষার যে স্বাধীন স্বাতন্ত্রিক প্রকাশ ঘটেছে তাও উল্লেখযোগ্য। উপন্যাসের নারী-সংলাপ অনুল্লেখ্য হলেও কতিপয় দৃষ্টান্ত দুর্লভ। (সাইদুর, ২০১১: ২৮৫) *কাশবনের কন্যা* উপন্যাসটি বর্ণনাধর্মী হওয়ায় সেখানে সংলাপের ব্যবহার কম। বাংলা সাহিত্যে জোবেদার মতো সাহসী নারীর দেখা খুব বেশি চোখে পড়ে না। সে তার জীবনের সব যন্ত্রণাময় অতীতকে পেছনে ফেলে কবিয়ালের কাছে তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সংস্কারবিহীন মনে নিজেকে মেলে ধরার জন্য যে মানসিক শক্তি আর সাহসের প্রয়োজন, গ্রামীণ পরিবেশে বেড়ে ওঠা নিরক্ষর একজন নারীর মধ্যে সচরাচর প্রত্যক্ষ করা যায়। জোবেদা তার চিন্তায়, সিদ্ধান্তে সব সময় দার্ঢ্য, বিবাহ-পূর্ববর্তী সময়ে কবিয়ালকে তার অপারগতার কথা স্মরণ দিতে দ্বিধা করেনি :

১. ছি! এরকম পাছদুয়ারে ঘোরাঘুরি করো ক্যান তুমি? (রিজিয়া, ২০১৬:৫৩)

২. রোজ রোজ দেখা হওনেরই বা এমন কী কথা আছে? (রিজিয়া,২০১৭ :৫৪)

৩. তুমি যাও, মিছামিছি আর অন্যের রোষের কারণ হইও না। (শামসুদ্দীন, ২০১৬ : ৫৪)

অত্যন্ত পরিশীলতা ও বুদ্ধিদীপ্ত নারী জোবেদা। নিজের জীবন, জীবনের ভালোমন্দের বিষয়ে সে সদা সতর্ক ও সজাগ। তবে নিজের অসহায় অবস্থার সুযোগে সে নিজের ব্যক্তিত্বকে বিলিয়ে দেয়নি। বাংলাদেশের গ্রামীণ নিম্নবর্গের জীবনের সমাজতাত্ত্বিক বির্বতন এবং তার সাহিত্যিক প্রতিফলন ভাষার মাধ্যমে নির্মাণ করা হয়ে থাকে। নারী সেখানে সদা উন্মুল এক শ্রেণি হিসেবে সংস্থাপিত। সাধু, চলিত ও আঞ্চলিকতাকে আত্মগত করে এক ধ্রুপদী ভাষারীতির অনন্য বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছেন লেখক। যার প্রয়োগে ও বর্ণনাকৌশলে লেখকের ভাষা শিল্পের অসাধারণত্ব স্পষ্ট হয়েছে। *কাশবনের কন্যা*র ভাষা নির্মাণে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষযোগ্য, তা হলো সেমিকোলনের ব্যবহার। এই সূত্রে লেখকের একটি মানস-স্বভাব দৃষ্টিগ্রাহ্য হয় যে, তিনি ভাষার ব্যবহারে জৈবধর্মী তথা যোগাত্মক। এই প্রবণতা প্রমাণিত করে যে তিনি জীবনদর্শনে সমন্বয়ী চিন্তাদর্শের অনুসারী। এ ছাড়া দীর্ঘ সংলাপ বা বর্ণনাও তাঁর এই প্রবণতার অনুসারী। (সাইদুর, ২০১১ : ২৯৬)

৭.

শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের আর একটি উপন্যাস *কাঞ্চনমালা* সাধুরীতির গদ্যে রচিত হলেও কথ্য-ভাষার কাছাকাছি ভাষারীতিতে নির্মিত। *কাশবনের কন্যার* ন্যায় এখানেও দীর্ঘ বাক্যের ব্যবহার কম। এই উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা দিয়েছে ছোট ছোট বাক্যে ভাব প্রকাশ করা। কথ্যভাষা উপন্যাসের গ্রামীণ বাস্তবতার মধ্যে উপন্যাসের কাহিনিতে বিশেষ ব্যঞ্জনার সঞ্চার করেছেন। এই উপন্যাসে বেদে সম্প্রদায়ের যাযাবর জীবনের আবহ গুরুত্ব পেলেও বাংলাদেশের চিরন্তন যে গৃহস্থ জীবনের ছোঁয়াও পাওয়া যায়। নিম্নবর্গের এই বেদে সম্প্রদায়ের নারী একজন কর্মী হিসেবে অবস্থান করে। *কাঞ্চনমালা* উপন্যাসে দুজন নারীর দেখা পাওয়া যায়, তার মধ্যে প্রধান মালা, মালার সঙ্গে সঙ্গে চাঁপাও একজন সক্রিয় কর্মী। নিজের পরিচয় অবস্থান সম্পর্কে তার কথা স্পষ্ট :

> আমি–আমি মালা।... আমি বাদ্যানী। ঐ গাঙের পাড়ে যেরা পাতছি আমরা – এই কিছুক্ষণ আগে।– আর তুমি... মালা একটু লজ্জা একটু হাসির সঙ্গে একটু মিশাইয়া একটুকাল নীরবে নিরীক্ষণ করিল তাহাকে, তারপর কহিল: উঁহু, চোর তুমি নও। নাম বলো! তাহার সেই ভঙ্গি দেখিয়া যুবকের মুখের ম্লানভাব আর রহিল না, কহিল: কাঞ্চন। (শামসুদ্‌দীন, ১৩৬৮ব. : ১৫)

মালা শুধু কথায় আচরণে-আত্মবিশ্বাসী নয়, তার কর্মদক্ষতায়ও সে আত্মবিশ্বাসী। আর্থিকভাবে স্বনির্ভর আত্মবিশ্বাসী এক নিম্নবর্গের নারী মালা। এমনকি উপন্যাসের শেষে যখন তার আত্মপরিচয় উন্মোচিত হয়েছে, তখনও সে পিতা-মাতার ইচ্ছাধীন না থেকে স্ব-ইচ্ছায় কাঞ্চনের সঙ্গে নতুন জীবনের পথে পাড়ি দিয়েছে। যাযাবর বেদে সম্প্রদায়ে বড় হলেও ঘরের বাইরে কাজ করার পরিসর তাকে আত্মাধীন করে বেড়ে উঠতে সহযোগিতা করেছে।

৮.

সূর্য-দীঘল বাড়ি নিঃস্ব ও নিঃসম্বল এক নারীর সন্তান-সন্ততিসহ নির্মমতায় ভরা জীবনসংগ্রামের ভাষা শৈল্পিক শিল্পকর্ম। উপন্যাসের প্রেক্ষিতের সঙ্গে সংহতি রেখে সংযত ও সংযম বাক্যে বিন্যাস করে ভাষাকে দৃশ্যময় ও চিত্রময় করে ব্যবহার করার প্রবণতায় আবু ইসহাক আশ্চর্য শিল্পসত্তার পরিচয় দিয়েছেন (আকতার, ২০০৭: ১৫৫)। গ্রামীণ জীবনের কুসংস্কারময়, সার্বিক শোষণে জারিত স্বামী পরিত্যক্তা নারী জয়গুনের দুই শিশুসন্তান নিয়ে সংগ্রামমুখর জীবনের কাহিনি *সূর্য-দীঘল বাড়ি*। মন্বন্তরের করালগ্রাসে বিপন্ন অস্তিত্বের নারী জয়গুনকে সামাজিক অন্ধবিশ্বাসের বাইরে লড়াই করতে

হয়েছিল। এই একক লড়াইয়ে তার প্রয়োজন হয়েছিল প্রচণ্ড মানসিক শক্তির ; তার আত্মোপলব্ধি ও সংলাপের মধ্যে দিয়ে তার প্রকাশ ঘটেছিল।

> সে-ত জীবনভর রোজা রেখেই চলেছে। রোজা ছাড়া আর কি? বারো মাসের একদিনও সে পেট ভরে খেতে পায় না। ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত আধপেটা খেয়ে থাকে। পেট ভরে কবে সে শুধুই দুটো ভাত খেয়েছে তার মনে পড়ে না। ....ছেলেমেয়েকে খাইয়ে কতদিন উপোস করতে হয়েছে। মাঝে মাঝে সারারাত সারাদিন কেটেছে একটি দানাও পড়েনি পেটে। রমজান মাসের রোজার চেয়েও যে ভয়ঙ্কর এ রোজা। রমজানের একমাস দিনের বেলা শুধু উপোস। কিন্তু তার বারোমেসে রোজার যে অন্ত নেই। (আবু.২০১৭ : ৩১-৩২)

এই উপলব্ধি একজন নিরন্ন সংগ্রামী মায়ের, একজন জীবনযোদ্ধা নারীর। জীবনের চাহিদার কাছে ধর্ম, ধর্মীয় সংস্কার সব নিরাশার হাতছানি হয়ে দেখা দিয়েছে। যার প্রতিদিনই অনাহার আর অর্ধাহারে কাটে, তার কাছে রমজান মাসের ধর্মীয় মহানুভবতা নতুন কোনো আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি। গ্রামীণ নারীর স্বাধীনভাবে চলা, স্বাধীন জীবিকায় জীবন ও পরিবার চালানো সমাজ ও সমাজপতিগণ মানতে পারে না। তাদের পরাজিত সত্তা সক্রিয় থাকে ঐ নারীর পথকে অবরুদ্ধ করার প্রচেষ্টায়। এই উপন্যাসে দেখা যায়, জয়গুনের কন্যার বিবাহ উপলক্ষ করে তাকে তওবা পড়ানো হয়। এই তওবা পড়ানোর উদ্দেশ্য তাকে গৃহবন্দি করা, পর্দাবিহীন তাকে ঘরের বাইরে না যাওয়া। অনাহার-অর্ধাহারের সংকটে ফেলে কোনো একজন পুরুষের অধীনতাকে মেনে জীবন চালানো।

> ১. তোবা আমি করতাম না। আমি কোনো গোনা করি নাই। মৌলবী সা'ব বিয়া না পড়াইলে না পড়াউক। আমার মায়মুনের বিয়া দিমু না। (আবু, ২০১৭ : ৬৮)

সংগ্রামমুখর জীবন জয়গুনকে শুধু বাঁচার পথকেই নির্মাণ করেনি; তাদের সত্তায় স্বাধীন ব্যক্তিত্বের জন্ম দিয়েছে। যা তাকে গতানুগতিক জীবনের সংস্কার আর বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী করে তুলেছে। করিম বক্সের সঙ্গে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে সংসার করার প্রস্তাবকে সে দ্বিধাহীনভাবে অস্বীকৃতি জানিয়েছে : [...] শরিয়তে থাকলেও আমি পারতাম না। (আবু, ২০১৭ : ৭৮) জয়গুন বাংলাদেশের উপন্যাসে প্রতিবাদ-প্রতিরোধে অগ্নিবাণ এক নারী। তার ভেতরের আত্মনিয়ন্ত্রণশীল শক্তি বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের নিম্নবর্গ ও নারীর জীবনচেতনার যথার্থ পরিমণ্ডল। সময়ের বিবেচনায় সমাজে তাদের সংখ্যা কম হলেও তাদের প্রতিরোধের আগুন অন্যদের পথের আলো হবে। জয়গুন শুধু সমাজের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি, যুদ্ধ করেছে কিছু ব্যক্তির আরোপিত বৈরিতার বিরুদ্ধেও।

৮.১

দীর্ঘকালব্যাপী নারীর মনস্তত্ত্বে পুরুষের আধিপত্য থাকায় বিভিন্নভাবে নারীকে শোষণের কৌশল তৈরি করা হয়। আবার নারীকে শোষণ নির্যাতনের সপক্ষে বিভিন্ন ধরনের যুক্তি দাঁড় করানো হয়। যা পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতার লালিত ফসল। জয়গুনের শাশুড়ি ও শফির মার কথোপকথনে ব্যক্ত হয়েছে;

> ১. জয়গুনের শাশুড়ির উক্তি : মরদগুনে যেই পিড়ে মরাব, হেই পিড বিস্তে যাইব। যেই আতে, যেই পায় মরাব, বেবাক বিস্তে যাইব। (আবু, ২০১৭ : ২৯)
>
> ২. শফির মার উক্তি : পুরুষের ঘরতন পালাইয়া আহে কেও? পুরুষের ঘরই মাইয়ালোকের হাপন ঘর। হেইখানে জিন্দিগী কাডাইতে অনব। হউর-হাউরীর খেদমত করতে অনব। মরলেও হেই মাডি বুকের উপুর লইয়া থাকতে অনব। হেই মাডি ছাড়তে আছে? হেই মাডি কামড় দিয়া পইড়্যা থাকতে অয়। (আবু, ২০১৭ : ৭০)

পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুরুষ নারীকে ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে আচ্ছন্ন রেখে তার উপর আরোপ করেছে মানসিক দাসত্ব। যেভাবে পুরুষের প্রয়োজন, সেভাবে তাকে ব্যবহার করতে তাদের মনোজগতে স্থায়ীভাবে জায়গা তৈরি করে নিয়েছে। তারই সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে জয়গুনের শাশুড়ি আর শফির মার উক্তিতে। গ্রামীণ নারীর মধ্যে অভ্যাস ও শঙ্কাবশত অভিশাপ দেয়ার প্রবণতা রয়েছে। শফির মা ও আঞ্জুমানের সংলাপের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে ;

> ১. তোবা! তোবা! তোর চীজ ছুঁইলে যেন আত খইয়া পড়ে, তোগ গাছের একটা পাতা ছিঁড়লে যেন রাইত না পোয়ায় আমাগ। (আবু, ২০১৭ : ৩৮)
>
> ২. খবরদার, ফলগাছে কোপ দিলে আজগাই ঠাডাপড়ব মাতায়, কইয়া রাখলাম। আঞ্জুমানের সংলাপে : আত উডাইও না কইতে আছি। খইয়া পড়ব আত। কুড়-কুষ্ঠ অনব। (আবু, ২০১৭ : ৪৩)

*সূর্য-দীঘল বাড়ি*তে জয়গুন আর শফির মার বসবাস করার সূত্রে কুসংস্কারবশত বিভিন্ন ধরনের তাবিজ-কবচ, ঝাড়-ফুঁক করার দ্বারা বাড়িকে বসবাস করার উপযোগী করে তুলেছে। জীবিকার জন্য জীবনযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে জয়গুনের মধ্যে থাকা গ্রামীণ সংস্কারের প্রলেপ খসে পড়তে থাকে। নিম্নবর্গের নারীর প্রখর জীবনবোধের প্রেরণায় নির্মিত উপন্যাস *সূর্য-দীঘল বাড়ি*। চরিত্রানুযায়ী ভাষাতেও রয়েছে জীবনঘনিষ্ঠতার স্পর্শ। ঢাকা জেলার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষায় উপন্যাসের সংলাপ রচিত হয়েছে, কাহিনি বর্ণনায় লেখক চলিত রীতির পরিমার্জিত ব্যবহারকে অক্ষুণ্ন রেখেছেন। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মতামত নিম্নরূপ :

> ভাষা পরিচর্যায় লেখকের পরিশীলত অভিজ্ঞতাকে মুখ্য না করে তাতে উপন্যাসের চরিত্রদের সামাজিক অভিজ্ঞতা এবং সমাজমানসের ছাপ এনে ভাষারও একটা সামাজিক চরিত্র গড়ে তোলা হয়েছে, যাতে উপন্যাসের ভাষা এর বিষয়বস্তুর মতই সমাজ-ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারে। নিঃসন্দেহে এটা যথেষ্ট কঠিন কাজ; এবং আবু ইসহাক সেই কাজে বেশ সাফল্য অর্জন করেন। (মহীবুল, ২০০২ : ১৬১)

জীবনের মহত্তম উপলব্ধির মধ্য দিয়ে, চরিত্রের আন্তরিকতায় ভাষা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সমকালীন সময়ের পটভূমিকায় অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামে রত অসহায় নারী-শিশুর জীবনানুগ ভাষায় ঔপন্যাসিকের মুন্সিয়ানা উদ্ভাসিত হয়েছে।

৯.

সূর্য-দীঘল বাড়ি প্রকাশিত হওয়ার দীর্ঘ একত্রিশ বছর পর আবু ইসহাকের দ্বিতীয় উপন্যাস *পদ্মার পলিদ্বীপ* প্রকাশিত হয়। কালগত বিস্তর ব্যবধান আবু ইসহাকের সাহিত্যাদর্শ সম্পর্কে পাঠকমনে প্রশ্নের জন্ম দেয়। এ ক্ষেত্রে লেখক মিখাইল শলোকভ কথিত সাহিত্যাদর্শকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন লেখক। স্বভাবতই এখানে লেখকের উদ্দেশ্য বাণিজ্যিক নয়, মহৎ ভাবনা থেকেই সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। (রজিকুল, ২০০৮: ৬০) *পদ্মার পলিদ্বীপ* তেমনি একটি মহৎচেতনাজাত উপন্যাস। *পদ্মার পলিদ্বীপ* পদ্মা নদীর তীরবর্তী চরাঞ্চলের অঞ্চলের জীবন ও জীবনের সংগ্রামকে বাস্তবোচিত করে শৈল্পিক মহিমা দিয়েছেন লেখক। কাহিনির পাত্র-পাত্রীর অবস্থান অনুযায়ী তাদের সংলাপে লেখক প্রয়োজন মতো আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার করেছেন। আবার কাহিনির বর্ণনায় লেখক চলিত ভাষার ব্যবহার করেছেন। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের প্রেক্ষাপটে নারীর নিজস্ব কোনো সত্তা গড়ে ওঠে না। সে সমাজ-সংসারের ইচ্ছার পুতুল হয়ে বেঁচে থাকে; জরিনা তেমনি একজন নারী। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বা নায়ক ফজলের প্রাক্তন স্ত্রী জরিনা। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় জরিনার শোষিত-বঞ্চিত জীবনের রিক্ততার কথা প্রকাশিত হলেও; জরিনার সচেতন কোনো প্রতিবাদ লক্ষ করা যায় না। জরিনার দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন সবার অলক্ষে অধিকার করে নিয়েছে। সেখানেই তার চরিত্রের সর্বপেক্ষা বড় সার্থকতা। তবে পরবর্তীতে গ্রামীণ নিম্নবর্গের নিরক্ষর নারীর সংস্কারবশত তার মধ্যে দ্বান্দ্বিকতার জন্ম হলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সে তাকে অতিক্রম করতে পেরেছে। 'নামাজ শেষ করে মোনাজাতের জন্য হাত উঠায়, 'আল্লা সব গুণা মাপ করো আল্লা। শরীলের গুনা মনের গুনা, চউখের গুনা–সব গুনা–।' (আবু, ২০১৬ : ১২৪) কোনো সংস্কার, ভীতিতে মনের বাঁধনকে বাধা যায় না। জরিনা কানে আঙুল দিয়েও ফজলের অপ্রতিরোধ্য ডাককে উপেক্ষা করতে পারেনি।'জরিনা নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না। তার বুকের ঝড় ছিন্নভিন্ন করে দেয় সব বাঁধা-বন্ধন। চোখের প্লাবনে ভেসে যায় সব দ্বিধা-

দ্বন্দ্ব। সে চোখ মুছে ঘোমটা টেনে ধীর পায়ে এসে দাঁড়ায় রান্নাঘরের দরজায়।' (আবু, ২০১৬: ১২৫) জরিনার অস্ফুট প্রেম, প্রেমের রিক্ততা, সংস্কারের বর্ণনায় ঔপন্যাসিকের ভাষা কখনো কাব্যময়তা, চিত্রকল্পের নৈপুণ্যে শিল্পভাবনার আনুষাঙ্গিক হয়ে উঠেছে। গ্রামীণ সমাজে নারীর নিজস্ব অভিব্যক্তি কখনোই গড়ে ওঠে না। নিম্নবর্গের নারীর এই সমস্ত আবহের পাশাপাশি শব্দের উচ্চারণে বিভিন্ন ধরনের পার্থক্য তৈরি হয়েছে। যেমন আঞ্চলিক উচ্চারণের জন্য অনেকক্ষেত্রে শব্দের শুরুর স ধ্বনি হ ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়েছে। *পদ্মার পলি দ্বীপ* উপন্যাসের ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে শরীয়তপুর অঞ্চলের ভাষা (আকতার, ২০০৭ : ১৫৭)।

১০.

সারেং বৌ উপন্যাসের ভাষিক অবয়ব নির্মিত হয়েছে কাহিনি ও চরিত্র উপযোগী ভাষায়। কোথাও কোথাও এ দেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় উপভাষার সফল ব্যবহার ঘটেছে। ঔপন্যাসিক নবিতুনের কর্মময় দৈনন্দিনতা, তার আশা-উচ্ছ্বাস প্রভৃতি শিল্পরূপময় করে তুলেছেন চিত্রাত্মক দৃশ্য-যোজনায়। নবিতুনের-কদমের প্রাক-বিবাহ পর্যায়ের একটি চিত্র এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিযোগ্য :

> বেড়ার ওপারে শরমে মরে নবিতুন। মিঞা যতই কিসসা জুড়ুক বাপজানের সাথে, নবিতুন কি আর বোঝে না কেন এসেছেন মিঞা.? বেড়াটার সাথে সেঁটে গিয়ে নিষ্কম্প বসে থাকে নবিতুন। চোখ দুটোকে ছোট আর সুঁচলো করে ধরে বেড়ার ফটোয়। (শহীদুল্লা,২০১৭ : ১৫)

এই বাক্যে কিশোরী নবিতুনের স্বভাবসুলভ কৌতূহলের প্রকাশ ঘটেছে। কদম সারেংয়ের দীর্ঘ অনুপস্থিতিজনিত শূন্যতায় তেইশ বছরের নবিতুন, ছোট কন্যা আককিকে সঙ্গে নিয়ে অবিরাম অস্তিত্বরক্ষার লড়াই করে গিয়েছে; বাড়িতে বাড়িতে 'বারাবান্দনী' হয়ে। নবিতুনের ভাষা বাঙালি পল্লিনারীর সকল বৈশিষ্ট্য নিয়ে সমুজ্জ্বল। নিম্নে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থান করা হলো :

> ক. গুঁজাবুড়ি, তুই শয়তান, দূর হ দূর তুই । (শহীদুল্লা, ২০১৭:১৮)
>
> খ. মুখে তোর পোকা পড়ুক। জিব তোর খোসে পড়ুক। (শহীদুল্লা, ২০১৭ : ১৯)
>
> গ. আহ কুটনী বুড়ি! বের হ তুই। মেয়ে খাগী ছেলে খাগী খসম খাগী। তোর মুখ দেখলে পাপ। তার কথা শুনলে পাপ। (রিজিয়া, ২০১৭ : ১৯)

ওপরের বাক্যগুলোতে গুঁজা বুড়ি নামে পরিচিত সগিরের মার প্রতি গালিবাচক তীব্র কটূক্তি প্রকাশ পেয়েছে। কুটনী বুড়ি একধরনের ঘৃণাসূচক সম্বোধন। যারা পরচর্চা, পরনিন্দা বা অপরের ক্ষতি কামনায় ব্যস্ত থাকে। সে সামাজিকভাবে গর্হিত কাজ করায় তার প্রতি ঘৃণাবাচক সম্বোধন ও অভিশাপ

প্রয়োগ হয়েছে। নবিতুনের দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার যে ভাষা ব্যবহার, আনন্দ-বেদনার প্রকাশ, সেখানেও রয়েছে নিম্নবর্গের নারীর ভাষিক প্রকাশ। যেমনঃ 'নবিতুন বলে, কেমন রসিক নাগর গো তুমি, ছিঃ মানে বোঝো না?' ছিঃ নারীর ভাষায় কখনো লজ্জাসূচক প্রকাশ কখনো ঘৃণাসূচক প্রকাশ। এখানে লজ্জা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ ছাড়াও এই বাক্যের 'নাগর গো'এর 'গো' সম্বোধনসূচক রূপমূল। নারীর ভাষায় ঘনিষ্ঠজনের প্রতি এমন সম্বোধন ব্যবহৃত হয়েছে।

১১.

শহীদুল্লা কায়সারের আর একটি বিখ্যাত উপন্যাস *সংশপ্তক* (১৯৫৬)। বিস্তৃত পরিসরের এই উপন্যাসে গ্রামের অবহেলিত, নিগৃহীত নারী আছে ; যারা নিম্নবিত্ত ও অবহেলিত, কায়ক্লেশে বেঁচে থাকে। তাদের ভাষাও প্রাসঙ্গিকভাবে কলহ-বিবাদ সংশ্লিষ্ট কটূক্তিতে পরিপূর্ণ। উচ্চ স্বরতরঙ্গের সঙ্গে তীব্র মীড়ে ও ঝোঁকের প্রবল ব্যবহার তাদের ভাষায় বিশেষভাবে বিশেষায়িত হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের শুরুতেই লেখক ভাষাচিত্রের সফল প্রয়োগ করেছেন। পাশাপাশি নিম্নবর্গের নারীর প্রতি সামাজিক যে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, তার যথার্থ প্রকাশ ঘটেছে। এই অন্যায়-অন্যায্য সংলাপগুলো ছুড়ে দেয়া হয়েছে হুরমতির প্রতি। হুরমতি এই লাঞ্ছনাকে মেনে নিয়েছে, কিন্তু প্রতিশোধ নিয়েছে অন্য পথে, অন্য উপায়ে।

> ১. 'বাহ্‌রে আমার মরদ। মেয়েমানুষের ওপর বাহাদুরি কেন? যাও না লেকুর কাছে! যেন জিঘাংসার একখানি ছুরি ঝিলিক দিয়ে গেল হুরমতির ঠোঁটের আগায়। (শহীদুল্লা,২০১৭ : ৮৫)
>
> ২. হুরমতী হাসে। ছিনালী হাসি। ছিনালী কটাক্ষ। (শহীদুল্লা, ২০১৭ : ১৭০)

'বাহ্‌রে আমার মরদ' এ কথার মধ্য দিয়ে সে রমজানের ক্ষমতাকে ধিক্কার জানিয়েছে সে। দুর্বলের প্রতি সবলের যে অত্যাচার, তার প্রতিবাদে হুরমতি মুখের কথায় প্রতিশোধ নিয়েছে। হুরমতি বিশ শতকের জাগ্রত নারীর একটি উদাহরণ। যে সমাজ পণ্যের মতো অসহায় নারীকে ভোগ করতে পারে; প্রয়োজন শেষ হলে কুকুর-বিড়ালের মতো লাথি মারতে পারে। সেই সমাজকে হুরমতি জানিয়েছে সে দরিদ্র, দুর্বল, অসহায় হলেও মেরুদণ্ডহীন নয়। এই উপন্যাসে লেখক নারী প্রকৃতির নানাদিকের ছবি তুলে ধরেছেন। সেখানে হুরমতির জীবন-জীবিকা-সংগ্রামের একটি সময়োপযোগী চিত্রকে প্রতিনিধিত্ব করেছে। যেখানে সামন্তবাদী শোষণ অত্যাচারে নারীর জীবন বিপন্ন প্রায়। যখন বিশ-শতকের জাগ্রত সমাজে নারী সবেমাত্র পথে বেরিয়ে আপন অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্রত নিয়ে। হুরমতি সেই সময়ের সেই সমাজের দৃষ্টান্ত। হুরমতির পাশাপাশি নিম্নবর্গের আরেক নারী আম্বরির চরিত্রকে লেখক নির্মাণ করেছেন সংসারের প্রতিদিনের প্রবাহে স্বামীর নিকট নারী কীভাবে নির্যাতিত হয় তার একটি

বাস্তবোচিত চিত্র। মাঝে মাঝে প্রতিবাদ করেছে সে : ‘কেন আমি কম যাই কিসে ? ফেলু ওস্তাগরের বেটি আমি। ...আশার বাপকে পঞ্চাশ টাকা ঘুষ দিয়ে এমন সোনার সম্বন্ধটা ভেঙে দিল কে?’(শহীদুল্লা,২০১৭ : ৩৮) শারীরিকভাবে দুর্বল আম্বরি তার কথা দিয়ে প্রতিবাদ করেছে। লেখকের দক্ষ নির্মাতার গুণে প্রতিটি চরিত্র আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য নিয়ে উজ্জীবিত হয়েছে। চরিত্রগুলো টাইপ না হয়ে সংগ্রামী ও সম্ভাবনাময় সজীব জীবনীশক্তিতে পরিণত হয়েছে। তবে তার এই সংলাপে নারীর প্রচলিত বাক্যবিন্যাসের সংযোগ লক্ষ করা যায়। ‘মাগো! কী ডাকাত। আম্বরি বলে আর আঙুল বুলোয় আধশুকনো ঘা-টার ওপর।’ (শহীদুল্লা, ২০১৭ : ৯৭) ‘মাগো’ সম্বোধনসূচক/ বিস্ময়সূচক মুক্ত রূপমূল। এই বাক্যে বিস্ময় ও ঘৃণার প্রকাশ ঘটাতে এই শব্দটি সাহায্য করেছে। নিম্নবর্গের এই নারী স্বামীর অত্যাচারের সরাসরি প্রতিবাদ করতে না পারলেও ক্ষততে শুশ্রূষার সময় সে কথা ভেবে এই কথা বলেছে। আলোচিত উপন্যাসে লেখক নিম্নবর্গের নারীর দ্রোহ ও সামাজিক সংকীর্ণতাকে মোকাবেলা করার সম্ভাবনাময় সংগ্রামী ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

১২.

আলাউদ্‌দীন আল আজাদ তাঁর উপন্যাসের আঙ্গিকে প্রথাগত ফর্মের মধ্যেই নব-আঙ্গিকের নিরীক্ষা করেছেন। চরিত্রচেতনা-অনুষঙ্গী ইম্প্রেশন ও সংলাপ সৃষ্টিতে তাঁর দক্ষতা সন্দেহাতীত। কাহিনির বিন্যাস, সংযত ও ব্যঞ্জনাধর্মী, ভাষা ব্যবহারে উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে। (রফিকউল্লাহ, ২০০৯ : ১৭৫) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সামগ্রিক ভাঙা-গড়ার মধ্যে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের প্রভাব, প্রতিবেশে *ক্ষুধা ও আশা* উপন্যাসের কাহিনির প্রধান প্রবাহ। ফাতেমা নামক নারীর স্বামী-সন্তানসহ যুদ্ধজনিত দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতায় দগ্ধ হওয়ার দিনলিপি এই উপন্যাস। উপন্যাস শিল্পের মূল বিষয় যেহেতু মানব বা মানব মন। সে ক্ষেত্রে উপন্যাস যত বিস্তৃতি ও গভীরতায় প্রবেশ করেছে, ততই চরিত্রের কর্মকাণ্ড ও চিন্তার বিস্তার ঘটেছে। চরিত্রের ব্যক্তিগত ও পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকাশমাধ্যম ভাষা। ফাতেমাও তেমনি করে স্বামী-সন্তানসহ শহরে এসে শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে পরিবারকে বাঁচাতে চেয়েছে। তার ভাষা আর ভাবনায় সেই সংগ্রামশীলতার দুঃখ আর যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে। ‘ফাতেমা নিজের চিকন স্বরের লিকলিকে আগাটা দিয়ে উদাসীন মহলবাসীর প্রাণ স্পর্শ করতে চাইলো, গরীব ভুখারী আম্মা! একটু দয়া করেন!’ (আলাউদ্‌দীন, ২০১৩: ৩৮) দুর্ভিক্ষের দাবানলে সন্তান-সন্ততিকে বাঁচাতে নারীকে ভিক্ষার কাদুনি গাইতে হয়। পরিবারের সংকটের প্রেক্ষাপটে জাগ্রত সত্তা নিয়ে নারীকে উপস্থিত হতে হয়। ঔপন্যাসিক তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আলো ফেলে দেখিয়েছেন– বয়স-শ্রেণি-লিঙ্গ কীভাবে ভাষাবৈচিত্র্যের জন্য প্রভাবক হয়ে ওঠে। সংলাপের কাতরতায় কীভাবে নারী

মনোজগতের অনুভূতিকে ব্যক্ত করে। (সোহানা, ২০১৪ : ১৪৭) ঔপন্যাসিকের নির্মিতিতেও তার প্রখরতা ধরা পড়েছে :

> অক্ষণই আইয়া পড়ুম, কই আইছে না? আবাঁধা চুল মুঠি করে ধরে গুম্মর গুসমুর কিল দিতে থাকে ওর পিঠের ওপর, ভীষণ ক্ষেপে গেছে ফাতেমা, বলছে, বুইড়া মাগি ঠ্যাং ছড়াইয়া খাস আক্কল নাইৎ আমারে ডাকলেনা ক্যারে? (আলাউদ্দীন, ২০১৩ : ৫৬)

অভাব আর দারিদ্র্যে ভরা সংসারে নানান ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় নারীর মধ্যে যে অন্তর্বেদনার জন্ম হয়, তার প্রকাশ ঘটেছে নিরূপায় কন্যার প্রতি। বাক্যের প্রতিটি শব্দের মধ্যে নারীর প্রতি সমাজের যে অসৌজন্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি, তার প্রকাশ দৃশ্যমান। শিল্পের নান্দনিকতার বিচারে তাত্ত্বিকেরা ভাষাকে সব সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড বলে ধার্য করে থাকে। বাখতিনের মতে উপন্যাস এমনিই একটি শিল্পকর্ম, যা কোনো কাঠামোতেই আঁটে না। তাঁর মতে, ফর্মের কাঠামোকে অস্বীকারের প্রয়োজন থেকেই উপন্যাস শিল্পেরূপের প্রয়োজন দেখা দেয়। উপন্যাস এমনই এক শিল্পরূপ, যা সচেতন সাহিত্যসৃষ্টির আদিকাল থেকেই চর্চিত হয়ে আসছে। (দেবেশ, ২০১৬ : ৪৮) বাখতিনের কথাকে স্মরণে রেখে বলা যায়, সমগ্র মানুষকে ব্যক্ত করার গদ্যনির্ভর কাহিনি উপন্যাস।

১৩.

সৈয়দ শামসুল হক তাঁর উপন্যাসের ভাষা নির্মাণে অত্যন্ত সচেতন ও কুশলী শিল্পী। তিনি ভাষাকে নানা মাত্রায় ব্যবহার করেছেন। কাহিনির বিস্তার, চরিত্রের বিকাশ, জীবনদৃষ্টি ও তাৎপর্যকে তুলে ধরার জন্য তিনি ভাষার শক্তি ও সুষমাকে কাজে লাগিয়েছেন। বাক্য গঠন, সংলাপ, বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি নিজস্ব ও স্বপরিকল্পিত ভাষা ব্যবহার করেছেন। উপন্যাসের সার্বিক লক্ষ্য সামনে রেখে তিনি বাক্য গঠন, সংলাপ, বর্ণনা প্রভৃতি প্রসঙ্গে চিন্তাচেতনা ও মননের পরিচয় দিয়েছেন। গ্রামীণ ও আঞ্চলিক প্রসঙ্গে তিনি উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মুখের ভাষা। সৈয়দ শামসুল হক তাঁর *আয়না বিবির পালা* উপন্যাসে প্রচলিত কাঠামোর বাইরে লোকসাহিত্যের পরিচিত গীতিকার কাঠামো ব্যবহার করেছেন। প্রচলিত আর্থ-সামাজিক চালচিত্রের মধ্যে নিম্নবর্গের নারীর লৈঙ্গিক বৈষম্যের বিষয় মৌল প্রেরণা হয়ে উঠেছে। এই উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্র আয়নাবিবি সম্বলহীন গ্রামীণ নারী। আয়নাবিবি মামুদ উজ্জ্যালের স্ত্রী। এর বাইরে তার কোনো পরিচয় নেই। আয়নাবিবিকে লেখক প্রচলিত প্রথাবদ্ধ নারী হিসেবেই সৃষ্টি করেছেন। প্রথাবদ্ধ নারী হয়ে পুরুষতন্ত্রের প্রচলিত মূল্যবোধে জীবনকে সাজিয়ে মুক্তি পায়নি সে। মুক্তি পায়নি পুরুষতন্ত্রের প্রচলিত নিষ্ঠুরতা থেকে। তার অবস্থার বর্ণনায়, তার সংলাপে নারীর প্রতি সমাজের নির্মমতার দিকসমূহ প্রকাশিত হয়েছে।

১.এতকাল পরে অভাগিনীর কাছে ফিরে এসেছ?(সৈয়দ শামসুল, ২০০২: ৬১)

২. আহা , সে-ই বা কী করে আরেকবার না দেখে থাকবে তার গলার হার! (সৈয়দ শামসুল, ২০০২: ৫৩)

৩. আহা, সৃষ্টিকর্তার বিচার নাই এত অবিচারের মধ্যেও? (সৈয়দ শামসুল, ২০০২ : ৬৫)

৪. কী কর, কী কর প্রাণের বন্ধু, আমার মাথা খাও, আজ রাতে তুমি মানা দাও। (সৈয়দ শামসুল, ২০০২: ৫৫)

৫.ছি ছি লজ্জায় মরে যাই (সৈয়দ শামসুল, ২০০২ : ৬৬)

৬.ছি, সাধু, ছি। (সৈয়দ শামসুল, ২০০২:৯৩)

৭.ছি, সাধু, নিশি নাই আর নিশি নাই।(সৈয়দ, ২০০২: ৯৮)

আয়নাবিবির সংলাপ থেকে উপরের বাক্যগুলোকে আলাদা করা হয়েছে। এর মধ্যে নারীর ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের শব্দের ব্যবহার তাকে পুরুষের থেকে আলাদা করেছে। 'অভাগী' সম্বোধনসূচক বিশেষণ। নারী তার নিজের অবস্থার কথা জেনে নিজেকে দুর্বল ও অসহায় ভেবে অভাগীরূপে সম্বোধন করে। 'আহা' আবেগ প্রকাশক অব্যয়। নারীর ভাষায় যে আবেগের প্রকাশ লক্ষণীয় তা এইরূপ শব্দের প্রয়োগের মধ্যে নিহিত থাকে। 'মাথা খাও' নারীর ব্যবহৃত বিশেষ ক্রিয়াবাক্যাংশ। এই বাক্যাংশ দিয়ে নারীর স্বভাবজাত দিব্যি দেয়ার প্রবণতার একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে। ছি ছি লজ্জা প্রকাশক মুক্ত রূপমূল। নারীর স্বাভাবিক লজ্জা পাওয়ার অভিব্যক্তি প্রকাশে বাক্যের শুরুতে ছি, ছি, ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাঙালি নারীর স্বভাবজাত রক্ষণশীলতায় স্বামীর নাম মুখে আনে না। তাই স্বামীর সম্বোধনে সে বারবার সাধু শব্দের প্রয়োগ করেছে।

মাউফল পেশাগতভাবে বারাঙ্গনা হওয়ায় তার সংলাপে চটুলতার ভাব লক্ষণীয়। সে জানে সমাজ নারীকে কোন চোখে দেখে, শেষ পর্যন্ত তারও সেই করুণ পরিণতি ঘটে। তার কথায় তার যথার্থ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

১. সাধু গো সাধু। কথা দিয়েছিলাম কি দিই নি? (সৈয়দ, ২০০২: ৯৮)
২. বলো কী, নাগর? জগতের রমণী আজ তোমার পায়ে লুটাবে। (সৈয়দ শাসুল, ২০০২: ৯৭)
৩. হায় নাগর! আমার কি চন্দন কিছু অবশিষ্ট আছে যে তোমাকে শীতল করতে পারি? (সৈয়দ শামসুল, ২০০২: ৯৭)

'সাধু গো সাধু' উক্তির মধ্যে 'গো' সম্বোধনসূচক রূপমূল। নারী তার আর্থ-সামাজিক অবস্থানের কারণে সরাসরি কোনো কথা বলার অভ্যাস তৈরি হয় না। যার ফলে মূল কথার শুরুতে বিভিন্ন ধরনের সম্বোধনসূচক রূপমূলের ব্যবহার করে থাকে। 'হায় নাগর!' সম্বোধনসূচক ভাবদ্যোতক বাক্যে। নারীকে ব্যভিচারিণী হিসেবে বর্ণনা করার সাধারণ সামাজিক ধারণা প্রাচীন সাহিত্যে লক্ষ করা যায়। কামের কারণে নারী সামাজিক ও মানবিক বন্ধনকেও অস্বীকার করে–এমনও ভাবা হয়েছে (সিরাজ, ২০২০ : ২৩৮)। বারাঙ্গনা শ্রেণির নারীর বাক্যে সেই সমস্ত ক্লেদাক্ত পরিবেশের প্রকাশ দৃশ্যমান হয়ে থাকে।

১৪.

উপন্যাসের ভাষায় থাকে বাস্তবের একটি কাল্পনিক রূপ। সেই কল্পনায় অংশ নেয় উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর ব্যক্তিগত উপস্থিতি। যেকোনো উপন্যাসের ভাষাতে প্রতিফলিত হয় একটি বিশেষ সময়ের সমাজের এবং শ্রেণির উপস্থিতির আধিক্য। উপন্যাসের অন্তর্নিহিত সংহতিও নির্ভর করে ভাষার সজীবতা ও শব্দের অর্থপূর্ণতার বিন্যাসের বিমূর্তিতে। (বিপ্লব, ২০১২ : ১৪) এই সমস্ত যৌক্তিক অবস্থানের পরও আরো কথা থেকে যায়, উপন্যাসের প্রধান চালিকা শক্তি যে চরিত্র, তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা পায় ভাষার অন্তর্জালে। ঔপন্যাসিকের বর্ণনার যে মাধুর্য, তার প্রেরণাও ভাষার, আবার চরিত্রের সংলাপে ব্যক্তিত্বের যে অন্তর্ধান, তাও শব্দের পারস্পরিক মেলবন্ধনে। এ প্রসঙ্গে Roland Barthes তাঁর The Death of the Author-এ মার্লামের উদ্দেশে বলেছিলেন, 'It is language Which speaks, not the author; to write is, through a prerequisite impersonality, to reach that point where only language acts, 'performs', and not 'me', (উদ্ধৃত, বিপ্লব, ২০১২ : ১৪) ভাষায় নির্মিত চরিত্রে শুধু শিল্পের প্রতিকৃতির নির্মাণ ঘটে না। নির্মাণ ঘটে সমাজ-ইতিহাস আর তার বিভিন্ন বহুমাত্রিক আদলের। উপন্যাসের গ্রামীণ নিম্নবর্গে নারী চরিত্ররা কেউ শিক্ষিত নয়, তাদের জীবনের বাস্তবতা তাদেরকে রূঢ় করেছে। ফলে তাদের কথোপকথনে অশ্লীল শব্দ, বিকৃত উচ্চারণ প্রভৃতি লক্ষণীয়। শওকত আলীর কথাসাহিত্যে ভাষারীতি স্বতন্ত্রশৈলীতে অভিষিক্ত। বিষয়ের সঙ্গে সংলগ্নতায় ও জীবনঘনিষ্ঠতায় তার ভাষা পেয়েছে স্বাতন্ত্র্যরীতি। শিল্পীজীবনের শুরু থেকে শেষাবধি তাঁর ভাষা ব্যবহারের রীতির রূপান্তর ঘটেছে। শওকত আলী *প্রদোষে প্রাকৃতজন*-এর ভাষা নির্মাণে ঐ সময়ের কথা স্মরণে রেখেছেন। উপন্যাসের বাক্যের গঠনপ্রণালি থেকে শুরু করে সংস্কৃতবহুল ও সমাসবদ্ধ শব্দ প্রয়োগে লক্ষ্মণ সেনের আমলের ভাষার আবহকে আরোপ করতে চেয়েছেন। কিন্তু তা যথার্থ রূপে না হলেও বিদ্যাসাগরীয় গদ্যের

প্রভাব প্রকর্ষতা এখানে লক্ষযোগ্য। সমগ্র উপন্যাসটি পঁচিশটি পরিচ্ছেদ আর দুটি অধ্যায়ে বিভক্ত। যতিচিহ্নের ব্যবহারে বৈচিত্র্য থাকলেও, চিহ্নের ব্যবহার চোখে পড়ার মতো। বাক্যবিন্যাসে বড় বাক্যের ব্যবহার বেশি, মাঝে মাঝে ছোট বাক্যের প্রয়োগ লক্ষণীয়। যেমন :

> তুমি কি আমাকে এই অবস্থায় রেখে দিতে চাও? বলো আমার কী অপরাধ? আমি কেন সমস্ত দিক থেকে বঞ্চিত হবো। আমি তো বলেছি তোমাকে, জীবনকে আমি পরিপূর্ণভাবেই চাই। আমি সংসার চাই, স্বামী চাই, সন্তান চাই– প্রত্যেকটি আমার প্রয়োজন, একটি ন্যূন হলে চলবে না।...হ্যাঁ চাই। আমার ধর্ম কোথায়? আমি তো বুঝি না, সত্য সত্যই আমার ধর্ম বলে কোনো বস্তু কখনও ছিলো কি না। (শওকত, ২০১৭ : ১৮৭)

উদ্ধৃতাংশে জীবনের সমস্যা যেমন দীর্ণ হয়েছে, তেমনি ব্যক্তির আত্মর্নাদও ব্যক্ত হয়েছে। এই উপন্যাসের শব্দগত চরিত্রচেতনা আর্তি আর শোষণের বহুকৌণিক অন্তর্জাল। নিম্নবর্গের মানুষের চেতনাগত আত্মপ্রত্যয়ের ভাষায় বাঙময়। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতির নানা মাত্রিক বৃত্তিগুলো নিয়ে নিম্নবর্গের জীবনবৃত্তান্ত রচিত হয়েছে। নারীর বাচনিক বৈশিষ্ট্য নানাকারণেই পুরুষের থেকে আলাদা। সমাজ পরিপ্রেক্ষিত লিঙ্গগত বৈপরীত্য সবকিছুই বিভাজন সৃষ্টি করে। লিঙ্গ-পার্থক্যের কারণে সমগ্র পৃথিবীতে সমাজের প্রায় সব নারী ও পুরুষের পরিবেশ-পটভূমিকা, অভিজ্ঞতা আলাদা হয়ে থাকে। সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব-সবকিছুর ব্যাখ্যামতে নারী ও পুরুষের মূল্যবোধ, সামাজিক-পারিবারিক দায়বোধ, সামাজিক মর্যাদা, ক্ষমতা, দৃষ্টিভঙ্গি আলাদাভাবে গড়ে ওঠে। আর এই পার্থক্যগুলো সামাজিকভাবে আরোপিত হয় (সোহানা, ২০১৪: ২১)। *প্রদোষে প্রাকৃতজন*-এর মধ্যযুগীয় পরিবেশে নারীর সীমাবদ্ধতা আরো সংকটাপন্ন। সামাজিক অবস্থান প্রতিকূল হলেও তার আত্মপ্রকাশ সংকীর্ণ পরিসরের হয়ে থাকে। তবে বিভিন্ন প্রক্ষাপটে নারীর ভাষায় প্রাধান্য পায় 'ছি', 'মাগো', 'ওগো' প্রভৃতি সম্বোধন সূচক অব্যয়ের ব্যবহার। যেমনঃ

> ক. এ কী সম্ভাষণ–ছি! পূর্বদেশ অঞ্চল থেকে কি এই আচরণ শিক্ষা করে এসেছে? (শওকত, ২০১৭ : ৫৫)
>
> খ. ছি ছি– এ কি নারী পীড়ক! (শওকত, ২০১৭ : ৬৩)
>
> গ. মা গো! এ বড়ই দুঃশীল–এই নাগরস্বভাব কিভাবে হলো এর–এ তো এমন ছিলো না। (শওকত, ২০১৭: ৫৬)
>
> ঘ. মরণ দশা! ছি ছি, এমন ওষ্ঠকর্তিতও হয় মানুষ! (শওকত, ২০১৭: ৬৫)

তবে নারীর ভাষায় সব সময় আবেগময়তা আর অধীনস্থতায় ব্যবহৃত নয়। সময় ও পরিপ্রেক্ষিতের দ্বন্দ্বে তার বুদ্ধিমত্তা ও বিশিষ্ট সত্তার পরিচয় দিতে পারে। সমাজ যতই তাকে অধীনস্থতায় আবদ্ধ

করুক, তার অন্তরস্থ জীবনদর্শন তাকে আলোকিত পথের সন্ধান দিয়েছে। সেখানে নারী নির্জীব বা নিতান্ত অসহায় প্রাণী নয় বরং বুদ্ধিদীপ্ত জীবনমুখী সত্তার পরিচয় দিয়েছে।

> সে বললো, সখী, কাঁদিস না– জীবন বিরূপ হয়ে উঠেছে ব'লে কি তুই তাকে পরিত্যাগ করবি? বরং ওঠ তুই, আয় আমরা শেষ অবধি দেখি, জীবন আমাদের জন্য কিছু দান করতে পারে কি না। (শওকত, ২০১৭ : ৬৮)

নারীর স্বর শুধু তার নিজের দুঃখ অভিমানের কথায় বাচনিক স্বকীয়তায় প্রকাশ করে না। ব্যক্ত করে তার নিজস্ব জীবন উপলব্ধি আর জীবনদর্শনের কথা। তার চেতনার ভাষা প্রস্তুত হয় তারই অভিজ্ঞতার আলো দিয়ে। সেই জীবন অন্বেষণ উপযোগী ভাষা তারা তাদের অন্তঃশীলায় নির্মাণ করেছে। নিম্নবর্গের একজন নারী হলেও তার ভাষাভঙ্গির বিভাজনতাকে অতিক্রম করে তাকে যুক্তিবহ করে তুলেছেন লেখক। নারীর ভাষায় জোর প্রকাশক শব্দ ও অব্যয়ের খুব ব্যবহার লক্ষণীয় মাত্রায় দেখা যায়। পাশাপাশি বাক্যে স্বরাঘাত ও স্বরের তারতম্য অন্যতম লক্ষণ হিসেবে দৃষ্টিগোচর হয়েছে। (সুকুমার, ১৯৮৫ : ৬৭২) লীলাবতীর ভাষার অন্তর্জগতে তার ব্যক্তিত্বের শৈলীও নির্মিত হয়েছে। লেখকের চরিত্র বিনির্মাণের ঔদার্য নারীর ভাষায় তার আত্মপ্রকাশের অভিব্যক্তিকে বলিষ্ঠ রূপ দিয়েছে :

> আমি তোমার পুত্তলিটি নই শ্যামাঙ্গ, আমি জীবন্ত নারী–আমার স্বামী চাই, সংসার চাই, সন্তান চাই–ঐগুলিই আমার ধর্ম, অন্য ধর্ম আমি জানি না–আমাকে তুমি প্রকাশ্যে বিবাহ করো। (শওকত, ২০১৭ : ১৮৮)

দীর্ঘ সংগ্রামী ও বঞ্চিত জীবনের দাবি লীলবতীকে বলিষ্ঠ করেছে, আত্মপ্রত্যয়ী করেছে। ছোট ছোট বাক্যের সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ ব্যবহার পাঠকের নিজস্ব ভাবনার অবকাশকে জাগ্রত করেছে। প্রশ্ন এবং পুনরুক্তির মাধ্যমে ঘটনার তীব্রতাকে পাঠকের মনে দেগে দেওয়ার চিহ্ন এই ভাষিক পরিকল্পনায় বহমান। উপন্যাসের বিষয়বস্তু ইতিহাসকে আশ্রয় করে রচিত বলে এর ভাষা শৈলী, দৃষ্টিকোণ, পরিচর্যা একটি নির্দিষ্ট ছকে বা বৃত্তে লালিত হয়েছে। এ জন্য ইতিহাসের ক্রোড়ে লালিত ব্রাত্য নারীর ভাষা নির্মাণে লেখক শওকত আলী অখণ্ড মনোযোগ দাবি করে। উপন্যাসের ভাষা চলিত রীতির এবং তৎসম শব্দবহুল। ফলে ভাষায় সৃষ্টি হয়েছে ওজস্বিতা, বর্ণনায় রয়েছে গীতময় পরিচর্যার প্রয়াস। (মিল্টন, ১৯৯৬ : ৫৫) এই উপন্যাসের ভাষার সৌষ্ঠবে সব সময় আছে চিন্তনের স্বচ্ছতা, যার মধ্যে দিয়ে পাঠকের দরবারে মূল বক্তব্যকে পৌঁছে দিয়েছেন লেখক।

১৫.

রিজিয়া রহমান তাঁর উপন্যাসের চরিত্রের ভাষা ও বর্ণনায় চলিত রীতির প্রয়োগ করেছেন। গদ্যের বৈশিষ্ট্য হলো প্রতি মুহূর্তেই লেখকের ভাবনার স্পন্দিত অনুভূতি। ফলে চরিত্রের সংলাপে প্রবাদ-প্রচন, উপমা বাগধারা প্রভৃতির ব্যবহার চোখে পড়ে। রিজিয়া রহমানের লেখার একটি বড় অংশ জুড়ে আছে নিম্নবর্গ। নিম্নবর্গের মানুষের যাপিত জীবন আনন্দ-বেদনা-হিংস্রতা-ক্লেশ, জীবনসংগ্রাম সমস্ত বিষয় তিনি তুলে ধরেছেন বিভিন্ন উপন্যাসের চরিত্রের আবর্তে। চরিত্রের চাহিদা অনুযায়ী তিনি চরিত্রের মুখে সংলাপ বসিয়েছেন। তাঁর ভাষারীতির মধ্যে জীবনস্পর্শী গদ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ভাষার মাধ্যমে তিনি শুধু চরিত্রকেই নির্মাণ করেননি, নির্মাণ করেছেন চরিত্রের মনোভূমিকে; যেখানে চরিত্রের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও কাল পরম্পরার বিশদ বিস্তৃতি পায়। লেখক শুধু মানুষের জীবনকে চিত্রায়ণ করেন না; চিত্রায়িত করেন জীবনের বোধ ও উপলব্ধির প্রগাঢ়তাকে। ঔপন্যাসিক রিজিয়া রহমানের ভাষারীতি সবসময় আলোচিত জনগোষ্ঠীর জীবনধর্মী হয়েছে। ভাষা তাঁর কাছে কাহিনি বর্ণনার মাধ্যম শুধু নয়; বিষয়বোধ, জীবনসংলগ্নতা চিত্রায়ণেরও মাধ্যম। (শফিক, ২০১৭ : ৪৩) নিম্নবর্গের জনগোষ্ঠীর মুখের ভাষা বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে নির্মিত হয়েছে। চরিত্রগুলোর সামাজিক অবস্থান, পেশা, লিঙ্গভেদ, ভিন্ন সংস্কৃতির বলয়ের সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়ে নির্মিত হয়েছে।

ঘর ভাঙা ঘর (১৯৭৪) তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। বস্তির মানুষের দুঃখ-দুর্দশা-ক্লেদ নিয়ে রচিত নিম্নবর্গের নারী জীবনচিত্রের নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসের কাহিনি বয়ান করেছেন সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে। লেখক কাহিনির বিস্তার ঘটিয়েছেন বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে একীভূত হয়ে। লেখক নিজের বর্ণনার সময় প্রমিত চলিতরীতির গদ্য ব্যবহার করলেও; চরিত্রের সংলাপে আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগ করেছেন। নিম্নবর্গের নারীর সম্বোধনের ক্ষেত্রে কিছু শব্দগত তাৎপর্য লক্ষ করা যায়; যা দিয়ে তাদের ভাষিক অবস্থানকে নির্ণয় করা যায়।

১. ওরে আমার কেডা রে! ভাত চাবার নাগছে! (রিজিয়া,২০১৭ :৪৫)

২. মা লো, নানি আইজ পয়সা বেশি পায় নাই। (রিজিয়া, ২০১৭ : ৪৩)

৩. হায় হায় রে! সতাই মাও না। (রিজিয়া, ২০১৭ : ৫৪)

৪. ইস করছে কী! যা, (রিজিয়া, ২০১৭ : ৫৬)

৫. আহা রে, আমার হালাল রুজি খাওনীরা! (রিজিয়া, ২০১৭ : ৫৩)

৬. উহ্ এ্যাতোও তুমি জানো! (রিজিয়া, ২০১৭ : ৬৫)

৭. ছি ছি কি লজ্জা (রিজিয়া, ২০১৭ : ৫৫)

উপরের সংলাপগুলো নারী ভাষার কতিপয় বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। 'ওরে আমার কেডা রে!' তাচ্ছিল্যসূচক সম্বোধন। 'মা লো' নিম্নবর্গের নারীর স্বাভবসুলভ সম্বোধন। 'হায় হায় রে' একধরনের উত্তেজনাসূচক ভাবের প্রকাশ যা নিম্নবর্গের নারী তার সংস্কৃতিগত প্রভাব থেকেই বলে থাকে। 'ছি' 'ছি' এখানে ঘৃণাসূচক সম্বোধন যা নারীর নিজস্ব সৃজন। এছাড়াও আহা রে, ইস, উহ প্রভৃতি তাচ্ছিল্যসূচক উক্তি নারীর সংলাপে লক্ষ করা যায়। বিষয়ের সঙ্গে চরিত্রের সঙ্গতি রেখে উপন্যাসে বিভিন্ন ধরনের ভাষারীতির প্রয়োগ ঘটেছে। নারীর ভাষাগত স্বাতন্ত্র্যের মাধ্যমে নারীর সামাজিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। নিম্নবর্গের নারীর ভাষিক বৈশিষ্ট্যে কিছু অশ্লীল শব্দের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমনঃ

১.–মর হারামজাদী! ছিনালনী মইর‍্যা যা তুই। তরে আইজ গোরে দিয়া তয় ভাত খামু। (রিজিয়া,২০১৭ : ৩০)

২. ওই সর্বনাশী ডাইনির কাছে ক্যারে মরবার গেছিলি? (রিজিয়া,২০১৭ : ৩৫)

৩. ছেনাল মাগী (রিজিয়া,২০১৭ :৪৩)

৪. হারামজাদী! ছিনালনী মইর‍্যা যা তুই। (রিজিয়া,২০১৭ : ৩৭)

৫. আমি বুড়া মানুষ, মাইরা আমারে কী করেছে হারামী ছেনাল। (রিজিয়া,২০১৭ : ৪৩)

৬. ও খালা চাইয়া দেহ ওই ছেনালের ঘরে। ওই খানকির মিছা নালিশ শুনে মুখ বুইজা মাইর খাইল হাসেম ভাই? (রিজিয়া, ২০১৭ : ৪০)

৭. ওই সর্বনাশী ডাইনির কাছে ক্যারে মরবার গেছিলি? (রিজিয়া, ২০১৭ : ৫৩)

৮. খাবিশ মাগি, আহারে কি মাইরডা খাওয়াছে হাসেমেরে।(রিজিয়া, ২০১৭ : ৪৪)

৯. খানকি, তরে প্যাটে ধরছিলাম ইয়ার ল্যাইগা? (রিজিয়া,২০১৭ : ৫৪)

উল্লেখিত ভাষায় প্রান্তিক জীবনের কদর্য দিকগুলো শুধু প্রকাশিত নয়; প্রান্তিক জীবনের ক্ষুধা বেঁচে থাকার লড়াইসহ প্রভৃতি বিষয়চিত্র উঠে এসেছে। প্রতিটি গালির মধ্যে স্ত্রী বাচক প্রত্যয় ব্যবহার করা। যেমন হারামজাদী, ছিনালনী, সর্বনাশী, ডাইনী, খাবিশ মাগি, খানকী প্রভৃতি অশ্লীল শব্দের উৎপত্তি হয়েছে নারীকে স্মরণে রেখে। সমাজ, রাষ্ট্র, সভ্যতার সমস্ত অপাঙক্তেয় নিয়েই যেন নারীর বেঁচে থাকা, নারীর পথচলা। নারীকে ছোট করতে অপদস্থ করতে এই সমস্ত শব্দের সর্বত্র প্রয়োগ লক্ষ করা

যায়; তবে নিম্নবর্গের সংস্কৃতি যেহেতু নিম্নগামী, সে কারণেই এই সব শব্দের প্রয়োগও বেশি চোখে পড়ে। নিম্নবর্গের জীবনে যখন নুন আনতে পান্তা ফুরায়, তখন জীবনের মূল্যবোধ, নীতি নৈতিকতা সমস্তই উবে যায়; থাকে শুধু লড়াই, অস্তিত্বের লড়াই, জীবিকার লড়াই প্রভৃতি। সংগ্রামী নারী জোলেখার মা তার দারিদ্র্যময় জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত দুঃখ-দুর্দশা আর ক্লেদময়তা নিয়ে কাটায়, তারপর সন্তানদের নির্লিপ্ততা তাকে আরও ক্লান্ত করেছে। এই সমস্ত ক্ষোভের প্রকাশ ঘটেছে উপরিউক্ত সংলাপগুলোর মধ্য দিয়ে। নারীর জীবনের একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ মাতৃত্ব। মাতৃত্বের বাৎসল্য মাকে যেমন আপ্লুত করে, লেখকের বর্ণনার গুণে এই আকুতি একটি সার্বজনীন রূপ পেয়েছে। '–হা...বু। ওরে আমার হা...,বু! ওরে বাবা। ও হাবু তুই কই গেলি রে। ওরে আমার হাবু...।' (রিজিয়া, ২০১৭ : ৯০) এক সন্তানকে হারিয়ে আর সন্তান বুকে নিয়ে মাতৃত্বের যাতনা ভুলেছে হাবুর মা। মাতৃত্বের আবাহন নারীজীবনের একটি বিশেষ পরিসর, যা বিভিন্নরূপে নারীর জীবনকে আন্দোলিত করে। নিম্নবর্গের মানুষদের জীবনযাপন ও টিকে থাকার সংগ্রামের পরিচয় ফুটে উঠেছে তাদের ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে। কথাসাহিত্যের ভাষা মিখাইল বাখতিনের কাছে সামাজিক বাচনের বৈচিত্র্যময় প্রকাশ। লেখক, বর্ণনাকারী এবং চরিত্র-সকলের মধ্য দিয়ে কথাসাহিত্য হয়ে ওঠে বহুস্বরের সঙ্গতিময় প্রকাশ। এ কারণে প্রত্যেকের বাচনের আলাদা আলাদা সামাজিক মূল্য রয়েছে। নারীর ভাষায় প্রবাদ-প্রবচনের যে সমাহার, তা বিশেষ করে লক্ষণীয়:

১. ভাত দেবার ভাতার না কিল মারার গোঁসাই। (রিজিয়া, ২০১৭ : ৬০)

২. –অ্যাদো সোনা, আমার ঘরের দিকে চাইয়াল পার ক্যান? আমার পোলায় মশা মাইরা হাত কালা করে না।। (রিজিয়া, ২০১৭ : ৬০)

৩. সোনার যৈবন পুরাইছে, দিনও গ্যাছে, অহন পড়পড়ান বারাইব।। (রিজিয়া, ২০১৭ : ৫৫)

৪. ইঃ ভাত জোটে না মিয়াভাইর খাট্টা খাইবার চায়। কালে কালে কত কী দেহুম।। (রিজিয়া, ২০১৭ : ৪৫)

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের নারী কথায় কথায় প্রবাদ-প্রবচন ও বাগধারার ব্যবহার করে থাকে। এগুলো তাদের জীবনের অংশ। কখনো হাস্য-রসিকতার ছলে, কখনো জীবনের বিভিন্ন দ্বান্দ্বিকতায় ক্ষোভ হতাশা থেকেও এই সমস্ত অনুভূতি জারিত হয়। সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের নিরিখে লিঙ্গভেদের কারণে নারীর ভাষায় বিশেষ বিশেষ ভাষা বৈশিষ্ট্যসৃষ্টি হয়েছে।

১৬.

সূর্য সবুজ রক্ত চা-শ্রমিকদের জীবনকাহিনি। পৃথিবীর সব দেশে শ্রম আর শ্রমিকের গল্প অনেকটাই এক। এই অবহেলিত অনাদৃত জীবন নিয়ে কথা বলেন অল্প কিছু লেখক সাহিত্যিক; রিজিয়া রহমান তাঁদের অন্যতম। ভাষা যেহেতু সামাজিক বাচনের প্রকাশ সেহেতু চরিত্রের মুখের সংলাপ ব্যবহারে সেই সব রীতি অনুধাবন যোগ্য। চা-বাগানের কুলি-কামিনরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছে। অভাবের তাড়নায় স্বদেশ, স্বজাতি ফেলে একটু বাঁচার আশায়, এই চা-বাগানের শ্রমিক তারা। এই বিদেশ বিভুঁইয়ে এসেও তারা তাদের ভাষা-সংস্কৃতিকে বিস্মৃত হয়নি। তাদের জীবনবৃত্তান্তে, তাদের ভাষারীতিতে, তাদের স্বাজাত্যবোধ ধরে রেখেছে। যেমন:

১.–কলি কাল। কলি কাল। গাছের পাতা নাই। আকাশে জল নাই। হবে লাই কেনে। কামিনগুলো যে সব ঢেমনি হয়ে গেছে। আমাদের দিন কি এমন ছিল নাকি। (রিজিয়া, ২০১৭: ২৪৩)

২.–দেখেছিস তোরা? ভগওয়ান তোদের চোখ আন্ধা করুক। মা বিষহরির শাপ লাগুক তোদের বালবাচ্চার ওপর। (রিজিয়া, ২০১৭ :২৪৩)

৩. নষ্ট মেয়েমানুষ। মা শীতলার শাপের বেমার ধরুক তোকে। (রিজিয়া, ২০১৭ :২৫৪)

নারীর ভাষা ক্ষমতাহীনের ভাষা (সোহানা, ২০১৪ : ২৪)। ক্ষমতাহীন নারী সে কারণেই বিভিন্ন ধরনের শাপ-শাপান্তসূচক শব্দের ব্যবহার চোখে পড়ে। অনেক অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও যখন সে নিরুপায়, তখন আশ্রয় নেয় বিভিন্ন ধরনের শাপ-শাপান্তের। ভাষার প্রবল জলরাশির মধ্যে শুধু শব্দের প্রবহমানতা থাকে না, থাকে দৈনন্দিন জীবনচিত্রের প্রতিচ্ছবি। চা-শ্রমিকদের জীবনপ্রবাহের শিল্পসফল উপস্থাপনায় সমৃদ্ধ এই উপন্যাস। বহুমাত্রিক ঘটনাস্রোতের সমন্বয়ে নির্মিত এই উপন্যাসে চাশ্রমিকদের কৌতূহলোদ্দীপক জীবনযাপনের সমগ্রস্বরূপ অঙ্কিত হয়েছে মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনায় (গিয়াস, ২০১৫ : ৩১৬)। মংলাছড়ির প্রেক্ষাপটে কুলি কামিনদের বিচিত্র জীবনাভিজ্ঞতা রুকমিনি, চঞ্চলা, বিন্দিয়া, শ্রীমতী, লছমি, রজর মা, হরমতী প্রভৃতি নারীর জীবন ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। তাদের মুখে লেখক তাদের কথাকে বসিয়ে জীবনঘনিষ্ঠ সাহিত্যস্রষ্টার পরিচয় দিয়েছেন:

১. হরমতী গলা তুলে চেঁচিয়ে উঠল–দেখেছিস তোরা? ভগওয়ান তোদের চোখ আন্ধা করুক। মা বিষহরির শাপ লাগুক তোদের বালবাচ্চার ওপর। কেন আমার পিছে লাগতে আসিস তোরা? (রিজিয়া,২০১৭ : ২৫৪)

২. তুই কেড়ে কথা বলিস রে ড্যাকরা। (রিজিয়া, ২০১৭ :২৫৮)

৩. চামেলী ভেংচি কাটল– হঃ রে। আমার বিশ মণ ঘি বানিয়ে রাধার লাচ দেখাবে রে। (রিজিয়া, ২০১৭ : ২৪০)

৪. রাক্ষুসী শ্রীমতী সুযোগ পেলেই আবার ওকে ধরবে। (রিজিয়া, ২০১৭ : ২৪৮)

৫. ঢেমনি হারামি। নষ্ট মেয়েমানুষ। মা শীতলার শাপের বেমার ধরুক তোকে। (রিজিয়া, ২০১৭ : ২৫৪)

৬. তোর মতো রেণ্ডির কি মরদের অভাব! (রিজিয়া, ২০১৭: ২৫৮)

৭. পোড়ামুখো বৃষ্টির মরণ হয় না। দূর হ রইড়জা। (রিজিয়া, ২০১৭ : ২৬৩)

শ্রমজীবী জীবনে নারী ব্যক্তিত্বে দুর্বলতার লেশমাত্র থাকে না। তাদের জীবন ও অবস্থা যতই দুর্ভাগ্যপীড়িত ও প্রতিকূল ব্যবস্থার হোক, তাদের ভাষায় তবু তারা দৃঢ়তার প্রমাণ রেখে যায়। তারা তাদের নিজেদের জীবনযাপনে বিভিন্ন ধরনের অশ্লীল শব্দ, গালি-গালাজের ব্যবহার করে থাকে। তার মধ্যে ড্যাকরা, ঢেমনি, হারামি, রেণ্ডি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। জীবনের বাস্তবতায় এই সব শব্দ তাদের প্রাত্যহিক ভাষা প্রসঙ্গের অংশ। চা-বাগানের নারীরা ভিন্ন প্রদেশ থেকে এলেও তাদের সংস্কৃতিতে অনেক বাংলা শব্দ স্থান করে নিয়েছে। যেমনঃ আমার বিশ মণ ঘি বানিয়ে রাধার লাচ দেখাবে রে। বাংলা প্রবাদ-প্রচনের এই অংশকে তারা তাদের ভাষায় আপ্ত করে নিয়েছে। কুলি-কামিনদের প্রতিদিনের কথোপকথনে বিভিন্ন ধরনের অশ্লীল কথাবার্তা সহজ স্বাভাবিকতায় রূপ নিয়েছে। এই উপন্যাসের ভাষা প্রধানত চলিতরীতির গদ্যে নির্মিত হলেও চরিত্রের সংলাপে ভিন্ন ধরনের প্রকাশরীতি লক্ষণীয়। বিশেষ করে চা-শ্রমিকদের ভাষায় ভিন্নধর্মী একটি গদ্য তৈরি করেছেন ; চা-বাগানের পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে চা-বাগানের নারীর ভাষারীতি। এভাবে লেখক নির্মাণ করেছেন চা-শ্রমিকদের বিশ্বস্ত প্রতিকৃতি। যেখানে বিষয় ও প্রকরণের মিলিত সমন্বয়ে নির্মিত হয়েছে শ্রমনির্ভর প্রান্তিক জীবনের মহাকাব্যিক পটভূমি।

১৭.

রক্তের অক্ষর রিজিয়া রহমানের একটি কালজয়ী সৃষ্টি। উপন্যাসের সম্পূর্ণ ঘটনা একটি পতিতাপল্লিকে কেন্দ্র করে। উপন্যাসের চরিত্রগুলো পতিতাপল্লির সদস্য অথবা সংশ্লিষ্ট। কিন্তু একটি শব্দ বা বাক্যও বাহুল্য দোষে দুষ্ট নয়। উপন্যাসের বিষয়ের ওপর লেখকের দক্ষতা ও ভাষার সৌকর্য যদি যথার্থ রূপে ঘটে থাকে, তাহলে ঐ উপন্যাসকে সার্থক উপন্যাস বলা চলে। সে ক্ষেত্রে রিজিয়া রহমানের এই উপন্যাসকেও একটি সার্থক উপন্যাস বলে ধরে নিতে হয়। উপন্যাসের কাহিনিকে লেখক ব্যক্ত করেছেন বর্ণনার মাধ্যমে অথবা বিভিন্ন কথোপকথনের মাধ্যমে। এর মধ্যে দিয়ে পতিতা জীবনের

নানা দিক যেমন উঠে এসছে, তেমনি ভাষার সহজ-সরল ও সাবলীল প্রকাশে আখ্যান হয়ে উঠেছে হৃদয়স্পর্শী। যেমনঃ

১....ওরে আমার জাত বেশ্যা মাগী রে। তয় আমিও কই, এই পাড়ায় যহন বইছি তহন এহানেই মরুম। (রিজিয়া, ২০১৭ :৪৩০)

২. ইয়াসমীন দমল না- তোরা নিজেদের কেবল বেশ্যা ভাবিস কেন? মানুষ ভাবতে পারিস না। (রিজিয়া, ২০১৭: ৪২৭)

৩. ... ও কুসুম গ্যাদাডারে এটটু ধরবি? আমি ত্যানা কয়ডা একটু ধুইয়া লইতাম। (রিজিয়া, ২০১৭ :৪২৮)

৪. শান্তি মুখ ভেংচি কাটল-ইঃ ঠমক কত! (রিজিয়া, ২০১৭ : ৪৩০)

৫. –ইস রে ! তেজ কত! (রিজিয়া, ২০১৭: ৪৪৩)

৬. হারামির পুতেরা আমাগো কী মনে করে? আমাগো কী মানুষের শরীল না ? (রিজিয়া, ২০১৭ : ৪৪৫)

৭. মর! মর! কুত্তার ছাও, একেবারে মইরা যা।(রিজিয়া, ২০১৭ : ৪৪৭)

৮. ইঃ দরদের হাতেম তাঈ। (রিজিয়া, ২০১৭ : ৪৬৫)

এমনই সব বাক্যে ফুটে উঠেছে বারাঙ্গনাপল্লির জীবনচিত্রের বাস্তবনিষ্ঠরূপ। এই চিত্র আরো জীবন্ত হয়ে ওঠেছে যখন লেখক তাদের মুখের কথাকেই তাদের সংলাপে বসিয়ে দিয়েছেন। পাশাপাশি ভাষার আবহে যখন সাধারণ, সহজ-সরল আর লোকজ উপাদানে ভরপুর তখন চরিত্রগুলো জীবনঘনিষ্ঠতায় ব্যঞ্জনাদীপ্ত হয়ে ওঠে। তার মধ্যে অন্যতম তাদের মুখের গালিগালাজ; এগুলো পতিতালয়ের বৈশিষ্ট্য। এখান থেকে ফুটে উঠেছে তাদের জীবনমান ও চরিত্রধারা। এই সমস্ত কিছু শুধু তাদের জীবনের অংশ নয়; এর মধ্যে তাদের জীবনের বিনোদনও বিরাজমান থাকে।

১.উঠ লো মাগী। আর কত গতর দেহাবি? (রিজিয়া, ২০১৭ : ৪৩৫)

২....ওই হারামীর দেমাগ যদি আমি না ভাঙছি তো আমার নাম শান্তি না। (রিজিয়া, ২০১৭ : ৪৪০)

৩. হারামিরা তরা দূর হইয়া যা। সবটির শরীর মরিচ বাটা দিমু আমি। (রিজিয়া, ২০১৭ : ৪২৫)

৪. মাংগীর পুত। কাঁথা পুড়ি তর গুষ্ঠির। আলাই-বালাই। (রিজিয়া, ২০১৭ : ৪২৭)

৫.গুষ্ঠিকিলাই তর খানকির পুত। খ্যাতা পুড়ি তর গুষ্ঠির। (রিজিয়া, ২০১৭ : ৪২৭)

এভাবে নানা বর্ণনা ও সংলাপের মাধ্যমে বারাঙ্গনা নারীদের অনুভূতি বর্ণিত হয়েছে। প্রতিটি বাক্য থেকে বোঝা যায় তাদের জীবনমান কতটা নিম্নবর্তী। সমাজের চূড়ান্ত প্রান্তিকতায় তাদের অবস্থান বলে তাদের জীবনে মানবিক অনুভূতি অপেক্ষা আদিমতার বর্ণনা বেশি। ক্ষুধার অন্ন সংস্থানের জন্য অসুস্থ-দূষিত পরিবেশের মধ্যে উৎকট রঙে সজ্জিত হয়ে নারীরা দেহকে প্রদর্শন করে পুরুষের আদিম বাসনাকে প্রলুব্ধ করে। তাদের ভাষায়ও এই ক্লেদাক্ত জীবনের প্রবল প্রভাব খুঁজে পাওয়া যায়। জাহান আরা উক্তি তার পরিচয় পাওয়া যায়:

১. বাইরা হারামখোর। বেশ্যা দেখবার আঁইছে। ক্যানলো গোলামের পুত আমরা কি চিড়িয়াখানার জানোয়ার নিহি? (রিজিয়া, ২০১৭ : ৪৫৬)

২. কি গো নাগর। সিনেমার হিরোর নাগাল হা কইরা রইল্যা ক্যান? খালি বোতল খাইয়াই মন ভরবে? (রিজিয়া, ২০১৭ : ৪৫৫)

৩. হারামীর ছাও এক বোতল মদ খাওয়াইয়া তুই আমারে বদদোয়া করবার বইছস। (রিজিয়া, ২০১৭ :৪৪৩)

রক্তের অক্ষর উপন্যাসটি বাংলাদেশের নগর পটভূমিকায় সমাজ-সভ্যতার বাইরে পাশবিক ও পঙ্কিলতায় পরিবেশে ধুঁকে ধুঁকে মরা নারীদের স্থূলতা ও রিরংসার বিভিন্ন দিক প্রকাশিত হয়েছে। এই অভিব্যক্তির প্রকাশ তাদের প্রতিদিনের যাপিত জীবনের। কখনো তাদের খদ্দেরদের সঙ্গে, কখনো সহকর্মীদের সঙ্গে। অস্তিত্বরক্ষার লড়াইয়ে একদিকে তাদের ভাষায় পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষ, অপরদিকে চূড়ান্ত দুঃখ-দুর্দশায় তাদের সহমর্মিতা প্রকাশিত হয়েছে। (সোহানা, ২০14 : ১৯৮) এভাবেই সমাজের প্রান্তিকস্থ নারীরা তাদের জীবনের যন্ত্রণাসমূহকে ভুলে সামনের পথে এগিয়ে চলে। নগরের ক্লেদাক্ততা তাদের জীবনের সুন্দর আলোকিত দিকসমূহকে বিনষ্ট করে পঙ্কিলতায় আঁধার করে তুলেছে ।

১৮.

ধবল জ্যোৎস্না উপন্যাসের ভাষা ব্যবহারে লেখক বরাবরের মতোই যত্নশীল ছিলেন। নান্দনিক ও বস্তুনিষ্ঠ চিত্রকল্পের সহযোগে বাক্যের গাঁথুনিকে নির্মাণ করেছেন সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর। উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর সংলাপে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ও প্রমিত ভাষার ব্যবহার কিছুটা বেমানান মনে হয়েছে। প্রান্তিক মানুষের মুখের ভাষায় শুধু তাদের অব্যক্ত ধ্বনিই প্রকাশিত হয় না, পাশাপাশি তাদের জীবন-জীবিকা-সংস্কৃতি-সংগ্রাম সমস্ত কিছুই উজ্জীবিত থাকে। নিম্নবিত্তের বিক্ষুব্ধ জীবনের কিছু উপকরণ ফাতেমার মায়ের সংলাপে পাওয়া যায়।

১. মা চমকে উঠল–ষাট, বালাই! মুখে আগুন তোর নেমকহারাম বুড়ো। আমারে ছেলে বেঁচে-বর্তে থাক। (রিজিয়া, ২০১৭ : ১৫৭)

২. টিলায় ফিরতেই মা বকে উঠল-এই যে হারামজাদী, সারাটা বিকেল সন্ধ্যা টইটই করে ঘুরে বেড়িয়ে বাড়ি ফিরল। তোর পায়ে আমি দড়ি দেব। ভাইয়ের বউর ওড়া দেখে তোমরাও পাখা গজাচ্ছে! (রিজিয়া,২০১৭ : ২০৩)

নিম্নবিত্ত জীবনের বিভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতি নারীর মুখে বিভিন্ন ধরনের কথার জন্ম দেয়। তেমনি পরিস্থিতিতে মা হয়ে পুত্রসন্তানের মঙ্গলকামনায় বলেছে ষাট, বালাই বলেছে। যার মুখনিঃসৃত বাণীতে পুত্রের অমঙ্গলের আশঙ্কা তার মুখে আগুন। এই সব নিম্নবর্গের নারীর সংস্কারের অংশ। লেখক শুধু কাহিনির রূপকল্প নির্মাণে ভাষাকে ব্যবহার করেননি, সেই সঙ্গে এতদঞ্চলের নারীর নির্মম বাস্তবতাকেও তুলে ধরেছেন। নারী শুধু সহ্য আর ধৈর্যের প্রতিমূর্তি হয়ে দিনের পর দিনের কাটাতে পারে না। নারীও রূঢ়বচন ব্যবহার করতে পারে; তার সঙ্গে হওয়া অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারে। নিম্নবর্গের এই নারীর প্রতিবাদী রূপ তার সংলাপের মধ্যে প্রকাশিত।

১৯.

রিজিয়া রহমানের *একাল চিরকাল* (১৯৮২) উপন্যাসটি সাঁওতাল জনপদের জীবনসংগ্রামের কাহিনিভিত্তিক আখ্যান। উপন্যাসের মোট আটাশটি পরিচ্ছেদে ঔপন্যাসিক জনজীবনের কাহিনি বর্ণনা করেছেন। সাঁওতালদের বিশ্বাস-সংস্কার, আনন্দ-বেদনা, উদারতা-স্বার্থপরতা প্রভৃতি শিল্পরূপময় অনুষঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। চলমান সময় ও সভ্যতার সংস্পর্শে সাঁওতালদের আদি-আরণ্যক জীবন কীভাবে ক্রমশ বিপর্যস্ত হয়েছে সেই বিষয়ও উপন্যাসে গুরুত্ব পেয়েছে (সৌমিত্র, ২০১৭ : ৩৪১)। উপন্যাসের ভাষারীতিতে লেখক জীবনঘনিষ্ঠ রূপকে গুরুত্ব দিয়েছেন। সাঁওতাল জীবনের আবেগ-বাস্তব-নাটকীয়তা যোগে উপন্যাসের ভাষাভঙ্গিমা নির্মিত হয়েছে। বিষয়ের মতো লেখকের ভাষা বিচিত্র পথের সন্ধানী। ভাষাকে হতে হয়েছে জীবনমুখী; জীবনঘনিষ্ঠ ভাষা ছাড়া কোনো শিল্পকর্ম কালজয়ী সৃষ্টি হতে পারে না। সাঁওতাল নারীর জীবন পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অধীন। সেখানে নারী সর্বক্ষেত্রে অধস্তনতার শিকার। অসমতার ভিত্তিতে নিরূপিত সম্পর্কের কারণে নারী হয় বঞ্চিত, নিগৃহীত ও শোষিত। বাংলাদেশের বৃহত্তর সমাজের তুলনায় আদিবাসী সাঁওতালরা অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ ও দুর্বল। নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান দুর্বল থাকার কারণে ক্ষমতায়নের দিক থেকে তারা নাজুক থাকে। অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর মতো সাঁওতাল নারী-পুরুষের কাজের মধ্যেও রয়েছে স্পষ্ট বিভাজন। এই বিভাজন নারীকে আরো বেশি বঞ্চনার মুখে ঠেলে দিয়েছে। উচ্চবর্ণের মানুষ অপেক্ষ

নিম্নবর্ণের মানুষের ভাষা সংলাপে পার্থক্য থাকে বিস্তর। চম্পা, ফুলাও, পিওনি সকলের ভাষার মাঝে তাদের জীবন-জীবিকার প্রতিচ্ছবি আছে। তাদের সংলাপে, সম্বোধনে তাদের সংস্কৃতির ছায়া লক্ষ করা যায়:

১. কী হলো রে চুবকা! ওরকম তাকিয়ে আছিস কেন? (রিজিয়া, ২০১৭ : ৩৬৫)

২. - হেই চুবকা! তুই কিষাণের কাজ করবি না? (রিজিয়া, ২০১৭ : ৩৬৭)

৩. –হায় বোংগা। ওটা যেন বুনো শুয়োর না হয়ে শেয়াল হয়। (রিজিয়া, ২০১৭ : ৩৬৫)

৪. কে রে! কে বট? (রিজিয়া, ২০১৭ : ৩৬৭)

৫. – দে রাজা চাল দে। আমরা যে না খেয়ে মরে গেলাম! (রিজিয়া, ২০১৭ : ৩৭৩)

৬. –আমরা ভিক্ষে করি না রে। আমরা কর্জ চাই। (রিজিয়া, ২০১৭ : ৩৫৮)

৭. –ওমা, সাজ আবার দেখলি কোথায়? (রিজিয়া, ২০১৭ : ৩৬৫)

একাল চিরকাল উপন্যাসে ভাষাকে সাঁওতাল গোষ্ঠীর জীবনঘনিষ্ঠ রূপে নির্মাণ করার সাধ্যাতীত চেষ্টা করেছেন এবং লেখক সফল হয়েছেন। নারীর ভাষা বৈশিষ্ট্যে প্রতিভাসিত হয়েছে তাদের গার্হস্থ্যজীবনের অন্তর্নিহিত সত্য। তাদের সম্বোধনের মধ্যে কোনো প্রাচীর ছিল না। নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, ধনী-নির্ধনের বিষয় ছিল না-এটা তাদের সংস্কৃতি বা জীবনের অংশ। তার মধ্যেও কিছু সংলাপের সপ্রতিভতায়, সপ্রাণতায় উপন্যাসকে আলোকিত করেছে। এ ছাড়া সাঁওতাল ভাষায় প্রবাদ-প্রবচন ও অন্যান্য শব্দের ব্যবহার কম চোখে পড়েছে। তবে নিম্নবর্গের নারী সাধারণভাবে ব্যবহৃত বিশেষণবাচক কিছু শব্দের ব্যবহার চোখে পড়ে। যেমন:

১.–পোড়ামুখী রিমি! আকাশের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে না কি তোর। (রিজিয়া, ২০১৭ : ৩৭৮)

২. হেই মুখপোড়া, এমন কথা কেন বলিস রে? (রিজিয়া, ২০১৭ : ৩৭৯)

'পোড়ামুখী ও মুখপোড়া' নারীর ব্যবহৃত বিশেষণবাচক সমাসবদ্ধ। শারীরিক বিকৃতিসূচকতা অর্থে ব্যবহৃত হলেও এগুলো আসলে আদরের গালি।(সোহানা, ২০১৪ : ৩৬) নারীর ভাষায় ঘনিষ্ঠজনের প্রতি এমন শব্দের ব্যবহার চোখে পড়ে। চলিত গদ্যরীতির পাশাপাশি আঞ্চলিক ভাষার শব্দ যুক্ত হয়ে সংলাপগুলো চরিত্রের অবস্থান অনুসারে নির্মিত হয়েছে। এর মধ্যে আবার আছে নারী-পুরুষের সংলাপে কিছুটা ভিন্নতা। নারীর সংলাপে কিছু মেয়েলি ভাষার বৈশিষ্ট্য বর্তমান। যেমন: হেই, না কি রে প্রভৃতি বৈশিষ্ট উল্লেখযোগ্য। এ উপন্যাসে লেখক প্রধানত চলিত গদ্য ব্যবহার করেছেন। তবে

সাঁওতাল জীবনের-পরিবেশের বিশ্বাসযোগ্যতা সঞ্চারিত করার জন্য মাঝে মাঝে সাঁওতাল জন-জীবনের কিছু শব্দ প্রয়োগ করেছেন (গিয়াস, ২০১৫ : ৩৬৪)। উপন্যাসটি লেখকের সর্বজ্ঞ প্রেক্ষণবিন্দু থেকে নির্মিত হয়েছে। তবে লেখক কখনও কখনও চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে কাহিনি বর্ণনার চেষ্টা করেছেন।

২০.

খোয়াবনামা উপন্যাসে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গ্রামীণ জীবনচিত্রায়ণের অভিনব অভিব্যক্তি লক্ষ করা যায়। সমকালীনতার প্রেক্ষাপটে শ্রমজীবী মানুষের মুখে তিনি বসিয়েছেন উত্তরবঙ্গের বগুড়া অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা। ভূমিসংলগ্ন মানুষের ইতিহাস, লোকশ্রুতি, পুরাণকে কেন্দ্র করে আবহমান বাংলার শ্রমজীবী মানুষের জীবনগাথা নির্মাণ করেছেন লেখক। আখতারুজ্জামান তাঁর কথাসাহিত্যে বিষয় অনুযায়ী ভাষা ও পরিবেশ নির্মাণ করেছেন। সমগ্র উপন্যাসে দুজন গ্রামীণ প্রান্তিক নারীর সরব উপস্থিতি কাহিনিকে অর্থব্যঞ্জক ভাবার্থ দিয়েছে। প্রথমজন কুলসুম তমিজের বাপের দ্বিতীয় স্ত্রী, চেরাগ আলী ফকিরের নাতনী। দ্বিতীয়জন ফুলজান বর্গাচাষি হুরমতুল্লাহর মেয়ে, কেরামত আলীর স্ত্রী। *খোয়াবনামার* শিল্প বিচারের নিরিখে আঞ্চলিক শব্দ সমৃদ্ধ প্রতীকী-ব্যঞ্জনাময় গদ্য-ভাষাশৈলী দার্শনিকতায় পূর্ণ (শহীদ, ১৯৯৭: ১৯০)। উপন্যাস সৃষ্টির নেপথ্যে কিংবদন্তির যে শক্তি ও সম্ভাবনার কথা বিধৃত হয়েছে কুলসুম তার একটি অংশ। নিম্নবর্গের নারী হওয়ায় উপন্যাসে বহুবার তাকে তিরস্কৃত হতে হয়েছে ; তার স্বশ্রেণির মধ্যে বিরাজমান ব্যবধান তাকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে সে ফকিরের নাতনি। সে গরিবের মধ্যেও গরিব, ছোট লোকের মধ্যেও ছোট লোক।

> হামাক তো তোমরা রাখিছো চাকরানি কর‍্যা, আবার হামাক দিয়া কামলা খাটাবার চাও?...‘হামারা ফকিরের ঘরের বেটি, হামরা কি জেবনে পাকঘর দেখিছি, না-কি পাকঘরত পাকশাক করিছি.? হামাক ওদেত পোড়া লাগবি, বিষ্টিত ভিজা লাগবি।’...সে ফকিরের বেটি, সে পড়েছে খানদানি মাঝিদের ঘরে। মাঝিদের নিজেদের পাছায় ত্যানা নাই, নিজগিরিরডাঙার হাভাতে চাষারাও এদের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করা দূরের কথা, ওঠা বসা পর্যন্ত করে না।– সেই গুষ্ঠির মানুষ হয়ে তমিজ কথায় কথায় তাকে খোঁটা দেয় ফকিরের বেটি বলে। (আখতারুজ্জামান, ২০১২ : ৩৬৪)

উপন্যাসে লিঙ্গবৈষম্যের প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যবহৃত না হলেও উপমা-উৎপ্রেক্ষার প্রাসঙ্গিকতায় নারী আলোচনায় এসেছে। পুরুষতান্ত্রিকতার সংস্কার শুধু পুরুষের দ্বারা প্রযুক্ত হয় না, নারীর মাধ্যমে তার বড় অংশের প্রয়োগ ঘটে থাকে।

১.কুলসুম রাগে জ্বলে! মা গো মা, মাগী বলে এতো দজ্জাল হয়? (আখতারুজ্জামান, ২০১২ : ৪৪৯)

সামাজিকভাবে নিম্নশ্রেণির মানুষ নারীর মধ্যে গালি দেয়া অর্থে অনেক সময় ঝাঁজালো বিশেষণবাচক শব্দের ব্যবহার হয়েছে।

> ১.এই মানুষটাক বলে ওংকা কর‍্যা মারে?...মণ্ডলের হাত পাও খস্যা খস্যা পড়বি, বুড়া শকুন কুঠ হয়া মরবি, তামাম গাওত তার কুঠ হবি।...বুড়ার মাথাত ঠাঠা পড়বি! (আখতারুজ্জামান, ২০১২ : ৫২৩)

গ্রামীণ নারীর অজন্ম সংস্কারে বৃদ্ধ স্বামীর প্রতি তার তীব্র মমত্ববোধ রয়েছে; তার শাপ-শাপান্তের মধ্য দিয়ে তার ভালোবাসা ধ্বনিত হয়েছে। এই মমত্ববোধের উৎস অনাদিকালের বাঙালি নারীর সংস্কার। এই সংস্কার থেকেই কুলসুম স্বামীর নাম মুখে না এনে সতীনপুত্র তমিজের বাপ নামে সমগ্র উপন্যাসে স্বামীকে সম্বোধন করেছে। সামাজিক-অর্থনৈতিক-পারিবারিকভাবে নিতান্ত অসহায়ও নিরুপায় হওয়ায় অভিসম্পাতকে পরম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে। (সোহানা, ২০১৪ : ১৮৯) এই সব অভিসম্পাতের মধ্য দিয়ে সমাজে নারীর অবস্থান নড়বড়ে হলেও সে যে বোধহীন নয়, এ কথা প্রমাণিত হয়েছে। তার অন্যায়ের প্রতিবাদ করার অন্য কোনো অস্ত্র না থাকলেও মুখনিঃসৃত অভিসম্পাত কম গুরুত্ব বহন করে না।

> ১. কুলসুম জবাব দেয় যেন কার কথার, 'না গো, ধান ভানার এখনি কী? তার বেটার টাউনের বাসাত চাউল পাঠান লাগবি? আবার তহসেনের, মাও কয়, ছুঁড়ি তুই এ্যানা স্যারা থাকিস। কও তো, হামাক সর‍্যা থাকা লাগবি কিসক? (আখতারুজ্জামান, ২০১২ : ৬৭০)
>
> ২. হামাক ম্যারা পালালো গো। তুমি আবোরের লাকান ওটি খাড়া হয়া থাকো কিসক? (আখতারুজ্জামান, ২০১২ : ৬৭৩)
>
> ৩. 'তোমার বেটার বৌ তো পোয়াতি হছে গো। উদিনকা গেছিলাম।' (আখতারুজ্জামান, ২০১২ : ৬৪০)

সামাজিকভাবে অবহেলিত পিছিয়ে পড়া নারী সরাসরি কথা বলতে ভয় পায় বা সংশয় জাগে তাই তাদের সংলাপে সব সময় সম্বোধন সূচক অব্যয়ের ব্যবহার লক্ষণীয়। এর পেছনে রয়েছে সামাজিকভাবে অসহায় নারীর মনস্তাত্ত্বিক অভিঘাত। কুলসুম নামক নারীর জীবনে বহু অপূর্ণতা থাকলেও সে কারণে তার মনে কোনো অনুতাপ নেই। তমিজের বাপের মতো ঘোরগ্রস্ত মাছের আঁশটে গন্ধযুক্ত মানুষটির প্রতি তার ভক্তি ভালোবাসার কমতি নেই। তার জীবনের অর্থনৈতিক অক্ষমতাকে মেনে নিয়ে জীবনের রুদ্ধ পথকে মানিয়ে নেয়া এই জনপদের নারীর বৈশিষ্ট্য। *খোয়াবনামা* প্রচলিত আঙ্গিকের বাইরে ভিন্নধর্মী একটি উপন্যাস। উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর মুখের ভাষা পূর্ব-উত্তরবঙ্গ অঞ্চলের মুখের ভাষা। ভিন্নধর্মী এই ভাষারীতি এই উপন্যাসের প্রাণশক্তির আধার; আঞ্চলিক ভাষার প্রবাহ একটি জনগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্যেরও পরিচায়ক।

বাংলা ভাষার প্রাণশক্তি অন্য যে কোনো ভাষার চেয়ে তেজোদীপ্ত এবং সৃজনশীল শিল্পীর হাতে তার বুননি নানামাত্রিক হতে পারে ইলিয়াস তার প্রমাণ দিয়েছেন। লেখকের হাতে গড়া মানুষগুলো নিজের ভাষায় কথা বলে; তাদের বিশ্বাস-সংস্কার ধর্মীয় চিন্তা ভাষার প্রাণশক্তিতে বেরিয়ে এসেছে।' (শহীদ, ১৯৯৭ :২০০)

উপন্যাসের ভাষার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার একটি আধুনিক মননশীলতার প্রয়োগ। সাহিত্য সেহেতু সমাজমানসের বিভাজনকে আত্মস্থ করে নেয়, সেখানে স্থান-কালগত বিভাজনকে সাহিত্যের শৈলীর মধ্যে জায়গা করে নেয়। নারীর স্বরে আবেগের প্রাবল্য আনার জন্য, সংলাপের প্রাসঙ্গিকতায় দৃঢ়তা আনার জন্য ভাষাভঙ্গিমায় এর প্রয়োগ করা হয়।

২০.১

কুলসুম ছাড়া উপন্যাসে আরো একজন নারী আছে, সে শুধু সামাজিকভাবেই প্রান্তিক নয়, একজন সত্যিকারের শ্রমজীবী নারী ফুলজান। তেভাগার লোককবি কেরামতের স্ত্রী, বর্গাচাষি হুরমতুল্লাহর বড় কন্যা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজনিত মন্বন্তরের সময় স্বামী কেরামত অসুস্থ পুত্রসন্তানসহ তাকে পিতৃগৃহে রেখে দেশান্তরী হয়েছিল। দরিদ্র পিতার ঘরে বসে না খেয়ে পিতার সহযোদ্ধা হয়ে উঠেছে সে। চাষ কাজে পিতার সমদর্শী হয়ে সে পিতার শ্রমের সমান অংশীদার হয়ে উঠেছে। তবে ফুলজান নারী বলেই পুরুষের মতো স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না। তাকে কাজ করার জন্য ভোরের আলো অথবা সন্ধ্যা রাতের চাঁদের আলোর অপেক্ষা করতে হয়। ছেলেসন্তানের মতো কায়িক শ্রম দিয়ে পিতাকে সহযোগিতা করলেও পিতার কাছে আপদ বলেই মনে হয়। পিতার সংসারে আশ্রিতা হিসেবে থাকলেও আত্মমর্যাদায় সে স্বয়ংসম্পূর্ণ; বিশেষ করে নিজগিরিডাঙার সমাজের প্রচলিত জাত্যভিমান সম্পর্কে। 'মাঝির বেটা, আসমানেতে ছ্যাপ ফালাবার হাউস করিস কোন সাহসে?' (আখতারুজ্জামান, ২০১২ : ৩৩৪) ফুলজানের মতো সাহসী নারীর মধ্যে রয়েছে স্বামী কর্তৃক অবহেলিত নারীর যন্ত্রণা, অসুস্থ সন্তানের জন্য হাহাকার। গ্রামীণ সমাজের প্রান্তিকতায় শোষণের সমস্ত প্রকাশ তার মধ্যে বহমান। তার মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক রূপরেখা স্পষ্ট হয়েছে:

১. 'ও মা, বুবুক মারিচ্ছে গো! ও মা'! (আখতারুজ্জামান, ২০১২ : ৫১২)

২. ইস! বেটার জন্যে সোয়াগ উথলাচ্ছে? দুনিয়া চষ্যা বেড়াও বেটাটার কথা মনে করিছো? (আখতারুজ্জামান, ২০১২ : ৫১৩)

৩. তোমার শরম করে না? এংকা মরদের মুখোত আগুন। (আখতারুজ্জামান, ২০১২ : ৫৩৩)

৪. তুমি আসিছো গো মাঝির বেটা? হামার বেটাক তুমি ডাক্তোরের কাছে লিয়া গেলা না গো? (আখতারুজ্জামান, ২০১২ : ৫৫৩)

উপরের সংলাপগুলোতেই ‘ও মা’ ‘গো!’ যা নারীর নিজস্ব সৃজন। নিম্নবর্গের নারীর ভাষা ব্যবহারে ‘ইস!’ ‘মরদ’ প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারের রকমফের লক্ষ করা যায়। পাশাপাশি ওগো, গো সম্বোধনসূচক অব্যয়ের ব্যবহার লক্ষণীয়। নারীর ভাষায় স্বরতরঙ্গ তার আবেগের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বিশেষভাবে প্রবাহিত।

২১.

নীল ময়ূরের যৌবন উপন্যাসটি লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। চর্যাপদের সমসাময়িক সমাজকে তুলে ধরতে লেখক তৎসম শব্দের পরিবর্তে তদ্ভব ও দেশি শব্দের প্রয়োগ করেছেন যথেষ্ট পরিমাণে। কাহিনি বর্ণনায় প্রযুক্ত হয়েছে ধনাত্মক শব্দ ও শব্দদ্বিত্বতা। চর্যাপদের সমাজে শ্রেণিবৈষম্যের ব্যাপক প্রসার থাকায় নিম্নবর্গের মানুষের সংগ্রামী জীবন এই উপন্যাসের প্রধান প্রতিপাদ্য। এই উপন্যাসের প্রধান নারী ডোম্বী, তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ উপযোগী ভাষায় লেখক চরিত্রকে নির্মাণ করেছেন। চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্যের পাশাপাশি তার সাবলীল সংলাপে অনন্য নারী ব্যক্তিত্ব সুগঠিত হয়েছে। যেমনঃ

১. হ্যাঁ গো, সত্যি। কী গুণ বলো দেখি? (সেলিনা, ২০১৩ : ২৪)

২. মাগো এত? মল্লারী হেসে গড়িয়ে পড়ে। কিন্তু আমি তো নিজের কিছুই দেখি না? (সেলিনা, ২০১৩ : ২৩)

৩. ওমা কী বলেন? কৈ শুনিনি তো? তা ভালো, আইন করে সব বেশ শুদ্ধ করে নিচ্ছেন আপনারা।... খুশি? খুশি হব কেন? আমার তো মনে হয় আমাদের ছোটলোকদের পাপও নেই পুণ্যও নেই। (সেলিনা, ২০১৩ : ২২)

লক্ষণীয়, উপরের সংলাপগুলোতে ‘হ্যাঁ গো’, ‘মাগো’, ‘ওমা’ সম্বোধনে নারীর স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে। সম্বোধনসূচক রূপমূল, যা বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে। পৃথিবীর সব দেশের নারীর ভাষা বিভিন্ন কারণে স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। নারী স্বভাবতই লজ্জাশীল হওয়ার কারণে সরাসরি কোনো কথা বলে না, বা সেই বিষয়কে বিশেষায়িত করে উপস্থাপন করেছে। এই উপন্যাসে ডোম্বী ছাড়া আরও যেসব নারী চরিত্র রয়েছে, তাদের সংলাপেও আছে নারীসুলভ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য। বিশেষ করে তরুণী নারী বিশাখার সংলাপে আছে আবেগের বিভিন্ন রূপ। যেমনঃ

১. ইস আমার নাগর! বললেই দিলাম আরকি! (সেলিনা, ২০১৩, ৩৩)

২. যাহ্ তাই বলেছি নাকি! (সেলিনা, ২০১৩: ২৩)

৩. কী যে খুশি লাগছে! (সেলিনা, ২০১৩ : ২১)

আদর্শচলিত রীতির ভাষায় গঠিত সংলাপে চরিত্রের স্বভাব ও মানসিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে। ইস বিস্ময়সূচক অব্যয়, যার মধ্যে দিয়ে নারী ভাষার ভাবাবেগের তারতম্য নির্ধারিত হয়েছে। যাহ্ তাচ্ছিল্য অর্থে বাক্যের শুরুতে ব্যবহৃত হয়েছে। তিন নম্বর বাক্যে আনন্দের প্রকাশ ঘটেছে, যেখানে তরুণী নারী তার মনের আবেগ ঢেলে দিয়েছে। এরকম বিভিন্ন ধরনের বাগ্‌ভঙ্গিমায় নারীভাষার ঝোঁক বা শ্বাসক্ষেপের বেগ ও তারতম্য নির্ধারিত হয়। শবরী এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান নারী। পুরোপুরি গৃহবধূ হওয়ায় তার ভাষা গৃহজীবনের একটি পরিচ্ছন্ন ছাপ পাওয়া যাবে। পাশাপাশি দাম্পত্য প্রতিবেশের প্রতিচ্ছায়াও পাওয়া যায়। যেমন:

১. ঐ যা সব গেল? আজ আর খেতে হবে না। (সেলিনা, ২০১৩: ৩৪)

২. উহ বাবা ছাড়ো। আমাকে আর পাগল বানিয়ো না। (সেলিনা, ২০১৩ : ৪৪)

৩. হ্যাঁ গো হ্যাঁ। (সেলিনা, ২০১৩ : ৩৫)

৪. উঃ! কি আনন্দ! কতদিন একসঙ্গে বনে যাইনি। (সেলিনা, ২০১৩ : ৪৫)

৫. ছাই রেঁধেছি। আয়োজন তো তেমন নেই। (সেলিনা, ২০১৩ : ৪৬)

৬. ওগো আর কথা না। তুমি ঘুমোও। (সেলিনা, ২০১৩ : ৫৪)

বিভিন্ন ধরনের শব্দের প্রয়োগে লেখক প্রয়োজন অনুসারে চরিত্রের বাগ্‌ভঙ্গির বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। বয়স অবস্থান ও শ্রেণি অনুযায়ী সংলাপ সৃষ্টি করেছেন। যার মধ্য দিয়ে কাহিনির মোড়গুলো বিভিন্নভাবে সুচারু সম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। চরিত্রের কার্যকলাপ মানসিক বৈশিষ্ট্যও এর অন্তর্নিহিতরূপে উঠে এসেছে।

২২.

পোকামাকড়ের ঘরবসতি উপন্যাসের কাহিনি বর্ণনা ও চরিত্রচিত্রণে ব্যবহৃত হয়েছে ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ। কখনো কখনো চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনাংশ বিন্যস্ত করেছেন ঔপন্যাসিক। উপন্যাসটিতে ব্যবহৃত ভাষা অত্যন্ত সাবলীল ; ভাষিক ভঙ্গি সহজ-সরল হওয়ার কারণে উপন্যাসটি শিল্পময়। সংলাপের ক্ষেত্রে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগের ফলে উপন্যাসে আঞ্চলিক বাস্তবতার প্রভাব পড়েছে। পোকামাকড়সদৃশ যে সমস্ত ছিন্ন-ভিন্ন মানুষের জীবনচিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন, সে-সমস্ত মানুষের মুখনিঃসৃত আঞ্চলিক ভাষাভঙ্গির যথাযথ বিন্যাসের ফলে উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে

যথার্থই সফল (গিয়াস, ২০১৫ : ৩০২)। ভাষার শৈল্পিকরূপ নির্মিত হয়েছে চরিত্রচিত্রণে পারদর্শিতার মধ্য দিয়ে। সেখানে নারীর অবস্থান বিভিন্নভাবে দুর্বল, শোষিত ও নাজুক। এই পরিস্থিতিতে নারীর অবস্থার সমাজবীক্ষা পাওয়া যায় তাদের সংলাপের মধ্য দিয়ে। নারীর ভাষার বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা সহজেই তাদের চেতনার জগতকে আলোড়িত করে। যেমন মালেকের মায়ের সংলাপ–

১. অ বাবা, তোরা ভাত খা। ভাত খঅনের সময় কথা না কইস। (সেলিনা, ২০২০: ২৬)

২. না না ন করিস। আগে মনত না আছিল? বিয়র লাই মাইয়াডারে সব্বনাশস করিলি? বুড়ি তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে ওঠে। (সেলিনা, ২০২০: ২৭)

উপরের দুটি সংলাপে একই নারীর দুই ধরনের বক্তব্য প্রকাশিত। প্রথমটিতে মাতৃত্বের বাৎসল্য রূপ ও সুধা প্রতীয়মান। আর দ্বিতীয়টিতে নৈতিকতাবিহীন সন্তানকে সংশোধন করতে মাতৃত্বের রুদ্ররূপ। এখানে লেখক নারীদের জগৎ ও নারীদের জীবনবৈচিত্র্য দৃশ্যমান। মমতাময়ী জননী রূপে যেমন সন্তানদের এক সুতায় বেঁধে রেখেছে। নারী ব্যক্তিত্বের প্রকাশ হিসেবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে। ঠিক এমনই আর একটি মাতৃত্বের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে সাফিয়ার মা জয়গুনের চরিত্রে।

১. অ মা, তোঁয়ার পানিভাত ছিকার মদ্যি রাখি গেই। (সেলিনা, ২০২০ : ৩২)

২. দালান ন লাগিবো। টেঁয়া দ, দি আস্যি। পোলাডারে ভালা করি ওষুধ পানি খাওয়াক। (সেলিনা, ২০২০: ৩৩)

এই দুই নারীর মধ্যে মাতৃত্বের একটি সদার্থক চিত্র লক্ষ করি। জয়গুন বাৎসল্যে যেমন আপ্লুত, তেমনি সন্তানের দ্বিচারিতা তাকে পীড়ন দিয়েছে। মানবিক প্রয়োজনের মুহূর্তে সে সচেতন হয়েছে, দীর্ঘদিনের জমানো এই অর্থ সে ব্যয় করেছে মালেকের সুস্থ হওয়ার প্রেক্ষিতে। উপন্যাসটিতে ব্যবহৃত ভাষা অত্যন্ত সহজ সরল। আর এত সহজ-সরল বলেই শিল্পময়। সংলাপের ক্ষেত্রে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের ফলে উপন্যাসটি আঞ্চলিক বাস্তবতা অর্জন করেছে। বিভিন্ন ধরনের অমার্জিত অচ্ছুৎ ভাষা ব্যবহারের ফলে নিম্নবর্গীয় জীবনের বাস্তবসম্মত চিত্রকে যথার্থরূপে হাজির করেছেন। এর মধ্য দিয়ে লেখকের সমাজ নিরীক্ষণের প্রবণতাসমূহ স্পষ্ট হয়েছে।

২৩.

জলোচ্ছ্বাস উপন্যাসের সবচেয়ে বড় দিক হলো প্রান্তিক মানুষের বাঁচার সংগ্রামকে সার্বজনীনরূপে প্রতিষ্ঠিত করা। এই লড়ায়ে নারীরা যতটা পূর্ণতা নিয়ে উজ্জ্বল পুরুষেরা নয়। যদিও পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতা নারীকে বারবার অপূর্ণ হিসেবেই দেখতে চাই। মানুষের লড়াইয়ের সবচেয়ে বড় দিক হলো

নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখা। টিকে থাকার এই পরিসরে মানুষের সংগ্রামের কোনো শেষ নেই; প্রতিদিনের নতুন নতুন অভিজ্ঞতা তাদের জীবনের নতুন নতুন স্মারক হয়ে ওঠে। *জলোচ্ছ্বস* উপন্যাসটি ভৌগোলিকভাবে প্রান্তিক পর্যায়ের জনগোষ্ঠীর জীবনযুদ্ধের স্বরলিপি। উপন্যাসে চরিত্রের বিকাশ হয় ভাষার মধ্য দিয়ে। ভাষা ব্যবহারের বর্গীকরণের প্রবণতা সাহিত্যের মধ্যে বহুকাল থেকেই সক্রিয়। সাহিত্য যেহেতু সমাজমানসের বিভাজনকে আত্মস্থ করে নেয়, ফলে বর্গ বা লিঙ্গগত প্রভেদ সাহিত্যের মধ্যে জায়গা করে নেয়। নারীকেন্দ্রিক ভাষার মধ্যে নারীর জীবনাচার মুখ্য হয়ে উঠেছে। শরিফা এই উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। চার সন্তানের জননীরূপে তার জীবন ব্যাখ্যান তার ভাষায় মুখ্য হয়ে রয়েছে। তার ভাষার মধ্যে তার ব্যক্তিত্ব জীবনবোধ প্রকাশিত হয়েছে।

১. প্যাটে নাই ভাত, পোদ্দে নাই ত্যানা, চউকে শরম কইরা লাভ কী স্বামীর লগে লগে লগে শরমও কবর দিছি আগুনমুখায়। (সেলিনা, ২০২০: ৪৫)

২. মাথায় কাপড়ের লগে চালচলন কী? আমি কনু খারাপ কাম তো করি না? আর চউকের শরম দিয়া কী অইব মনে যদি লাজ না থাহে? (সেলিনা, ২০২০: ৪৩)

শরিফার ভাষায় প্রান্তিক গ্রামীণ এই নারী যথার্থ জীবনবোধ রূপলাভ করেছে। শুধু আত্মসচেতনতার বোধের মধ্যে তার ভাষাবোধ অন্তর্হিত হয়নি। নিম্নবর্গের নিরক্ষর এই নারী জীবনসংগ্রামে নেমে, জীবনের হিসেবকে মেলাতে চেষ্টা করেছে। লেখক নিম্নবর্গের আর্থ-সামাজিক বৈপরীত্যের মধ্যে শরীফাকে যতখানি বোধগম্যতার মধ্য দিয়ে বিকশিত করেছে, অন্য কোনো নারীতে তার তুলনা পাওয়া যায় না। ব্যক্তি হিসেবে তার সত্তাকে জাগ্রত করতে লেখক যে ভাষিক অবয়ব নির্মাণ করেছে, তা প্রাতিস্বিকতায় পরিপূর্ণ। প্রকৃতিগত লিঙ্গবৈষম্যকে সামাজিক পরিচিতি রূপেও প্রতিষ্ঠা দেওয়ার প্রবণতা আজও সমানভাবেই বর্তমান। জন্মের পর থেকেই একটি শিশুকন্যা যে পরিবার প্রতিবেশে বড় হয়ে ওঠে, সেখানে তাকে লিঙ্গ সম্পর্কে যেমন সচেতনতা জাগিয়ে তোলা হয়, তেমনি ভাষার ক্ষেত্রেও অবশ্যই হবে লালিত এটাই সকলের কাম্য। বাংলা সাহিত্যেও নারী-পুরুষের মধ্যে স্বরগত বিভাজন স্পষ্ট। সেলিনা হোসেনের প্রায় সব লেখায় নারীর প্রতি সহানুভূতিশীলতা মানসিকতা স্পষ্ট। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বন্দি-অসহায় নারীর প্রতি লেখকের সহানুভূতিপূর্ণ মননের প্রকাশ ঘটেছে। জলোচ্ছ্বাস উপন্যাসের সবচেয়ে সংগ্রামী নারী কলিমন। কলিমনের সংলাপে তার চারিত্রিক দৃঢ়তা স্পষ্ট। জালাল মাওলানার সঙ্গে বিয়ে প্রস্তাব নিয়ে এলে :

কলিমন বুড়ির চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে দেয়। খামাকা খামাকা কতা কছ ক্যান তুই? তোর খাই না পরি? নিজের রোজগারে খাই। দুই মাস ধইরা যে ছিঁড়া শাড়ি পিন্দি চোহে দেহছ তুই?.. আর কইলে পুতা দিয়া তোর মুখ ছেঁইচা ফালামু। (সেলিনা, ২০১৯ : ২৮৯)

নারীর আত্মস্বরের অর্থ একদিকে পুরুষ নিয়ন্ত্রিত আদর্শের বিরোধিতা করা, অন্যদিকে নিজের অবস্থানকে থেকে, প্রাতিষ্ঠানিকতা মুক্ত হওয়া। নারীর স্বরগত বৈশিষ্ট্যকে যথার্থরূপে পরিস্ফুট করার মাধ্যমে লেখকের নারী সম্পর্কিত মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে। উপন্যাসে নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী মানুষের দারিদ্র্যপীড়িত জীবনচিত্রের পাশাপাশি অসহায় নারীদের করুণ কাহিনি সহমর্মিতার সঙ্গে ফুটে উঠেছে।

গ্রন্থপঞ্জিঃ

১. অদ্বৈত মল্লবর্মণ (২০১৫)। *অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনা সমগ্র*, দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা

২. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৯৬)। *খোয়াবনামা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

৩. আবু ইসহাক (২০১৭)। *সূর্য-দীঘল বাড়ি*, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা,

৪. আবু ইসহাক (২০১৬)। *পদ্মার পলিদ্বীপ*, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা,

৫. আলাউদ্দিন আল আজাদ (২০১৩)। *ক্ষুধা ও আশা*, বাতায়ন প্রকাশন, ঢাকা

৬. গিয়াস শামীম (২০০২)। *বাংলাদেশের আঞ্চলিক উপন্যাস*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৭. বিপ্লব মাজী (২০১২)। উপন্যাসের ভাষা, *অঞ্জলি পাবলিশার্স*, কলকাতা

৮. মহীবুল আজিজ (২০০২)। *বাংলাদেশের উপন্যাসে গ্রামীণ নিম্নবর্গ*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা

৯. মোস্তাফা মোহাম্মদ (২০১০)। *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস কথাসাহিত্যে জীবন ও সমাজ*, নান্দনিক, ঢাকা

১০. মোহাঃ সাইদুর রহমান (২০১১)। *আমাদের তিন ঔপন্যাসিক*, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা

১১. শওকত ওসমান (২০১১)। *জননী*, সময় প্রকাশ, ঢাকা

১২. শওকত আলী (২০১৭)। *প্রদোষে প্রাকৃতজন*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা

১৩. শহীদুল্লা কায়সার (২০১৭)। *সারেং বৌ*, চারুলিপি প্রকাশন, ঢাকা

১৪. শহীদুল্লা কায়সার (২০১৭)। *সংশপ্তক*, চারুলিপি প্রকাশন, ঢাকা

১৫. শহীদ ইকবাল (১৯৯৭)। *কথাশিল্পী আখতারুজ্জামান ইলিয়াস*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন

১৬. শামসুদদীন আবুল কালাম (২০১৬)। *কাশবনের কন্যা*, বিভাস, ঢাকা

১৭. সরদার জয়েন উদ্‌দীন (১৩৭১ব.)। *পান্নামোতি*, ওসমানিয়া বুক ডিপো, ঢাকা

১৮. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০০)। *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

১৯. সেলিনা হোসেন (২০১৩)। *নীল ময়ূরের যৌবন*, ঐতিহ্য প্রকাশ, ঢাকা

২০. সেলিনা হোসেন (২০০৫)। *চাঁদবেনে*, আহমেদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা,

২১. সেলিনা হোসেন (২০২০)। *উপন্যাস ত্রয়ী*, পাঞ্জেরী প্রকাশ, ঢাকা

২২. সেলিনা হোসেন (২০১৯)। *রচনাবলি ১*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা

২৩. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (২০১৬)। *উপন্যাস সমগ্র*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা

২৪. সোহানা বিলকিস (২০১৪)। *নারীর ভাষা প্রসঙ্গ*, অবসর, ঢাকা

২৫. হুমায়ুন আজাদ, সম্পা.(১৯৮৫)। *বাঙালা ভাষা বাঙলা ভাষাবিষয়ক প্রবন্ধসংকলন [১৭৪৩-১৯৮৩],* বাংলা একাডেমি, ঢাকা

২৬. রিজিয়া রহমান (২০১৭)। *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস১*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা

২৭. রিজিয়া রহমান (২০১৭)। *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস২*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা

সহায়ক প্রবন্ধের তালিকা:

১. মো.আকতার হোসেন(২০০৭) 'আবু ইসহাকের উপন্যাস : শিল্পরূপ বিচার' ফজলুল হক সৈকত [সম্পা.] *কথাশিল্পী আবু ইসহাক*, শোভা প্রকাশ,ঢাকা

২. শেখ রজিকুল ইসলাম(২০০৭)' আবু ইসহাকের উপন্যাস–সমাজ-বাস্তবতার নিরাবেগ উপস্থাপন' ফজলুল হক সৈকত [সম্পা.] *কথাশিল্পী আবু ইসহাক*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা

উপসংহার

সমাজবিবর্তনের ইতিহাসে কৃষি অর্থনীতির রূপান্তর বস্তুগত সংস্কৃতির প্রভূত পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। অর্থনৈতিক বৈষম্য কৃষিজীবী সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য; এই বৈষম্য সামাজিক বিভাজন ও বিভেদের রেখাকে স্পষ্ট করে তোলে। এই ব্যাপারটি ক্রমশ এমন পরিণতির দিকে এগিয়ে ছিল, যেখানে নারীর অবস্থান অনিবার্যভাবে অবনমনের পথে চলেছিল। অর্থাৎ উৎপাদনব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণ কমিয়ে তাকে গৃহনির্ভর রূপে গড়ে তোলার প্রতি মনোযোগী হয়েছিল পুরুষ ও সমাজ। যার ফলে, গৃহকর্মে তার শ্রম ও দায়িত্ব বাড়লেও তাকে ভার্যারূপে অন্যের দ্বারা ভরণীয়া; অর্থাৎ স্বামীর অন্নে প্রতিপালিত এই সংজ্ঞা দেয়া হলো। এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে ভৃত্য আর ভার্যা শব্দ দুটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এক, যাকে ভরণ করতে হয় সেই ভার্যা। স্ত্রী বা নারী সরাসরি অন্ন উৎপাদন করে না, তাই সে ভরণীয়া। নারীর এই শোষণের ইতিহাসে শুধু নারীর পরাজয়ের গ্লানিই লুক্কায়িত নয়, সমগ্র সমাজের বৈষম্যের সূচনা এখান থেকে। এর মধ্য দিয়ে সমাজে উচ্চ-নীচ ভেদ হতে থাকে আর সামাজিক শৃঙ্খলার নামে সাধারণ রাজনৈতিক কর্তৃত্বের হাতে ক্ষমতা জমতে থাকে।

১.

সাহিত্য সমাজ ও সভ্যতার অকৃত্রিম আয়না স্বরূপ। সমাজপটে চলমান জনজীবনের বিচিত্র কোলাহল, অপরাজেয় মানবসত্তার সুগভীর উপলব্ধি সাহিত্যের পরিপত্রে পরিশীলিত অবয়ব অর্জন করে। সেখানে সমাজের অবহেলিত, অনাদৃত মানুষের জয়গানকে নিষ্কণ্টক রূপে তুলে ধরা লেখকের মানবিক দায়িত্ব হিসেবেই বিবেচিত হয়ে থাকে। বাংলা সাহিত্যে এই অবহেলিত, অপাঙক্তেয়, অত্যাচারিত মানুষের পক্ষে কথা বলার প্রবণতা যথার্থরূপে পরিলক্ষিত হয় কল্লোলের কাল থেকে। বিভিন্ন ধরনের খেটে-খাওয়া মানুষের কথা উপন্যাসের পাতায় ভিড় করে; যাদের স্বভাবজাত প্রবণতাই হলো জীবনের সাথে লড়াই করে যুদ্ধ করে টিকে থাকা। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে প্রচলিত সামাজিককাঠামোকে ভেদ করে বাঁচার চেষ্টায় নিয়োজিত এই যুদ্ধমান জনগোষ্ঠী নিম্নবর্গ। নারী সেখানে বিভিন্ন কারণেই একটি আলোচিত অধ্যায়। অভিসন্দর্ভের বিভিন্ন স্তরে তার ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। নিম্নবর্গের নারীর সামাজিক সত্তার বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় ঔপন্যাসিকগণ বিভিন্নভাবে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। যার ফলে সামাগ্রিক সামাজিক সত্তার ব্যাখ্যায় নারী একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। নারীর ব্যক্তি হিসেবে, সামাজিক সত্তার অংশ হিসেবে, অবদমনের স্তরগুলো পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো ও

অর্থনৈতিক সূত্রের মধ্যে নিহিত রয়েছে। সেখানে ১৯৪৭ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের সাহিত্য বড় সময় অতিবাহিত করেছে। এর মধ্যে ৫২র ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ প্রধান দুটি মাইলফলক। আত্মপরিচয়ের নিরিখে হাজার বছরের নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয়ে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে রূপ নিয়েছে। এই বিশ্বাস, এই চেতনাধারা সাহিত্যের প্রতি স্তরে প্রখর হয়ে উঠেছে। জাতিগত এই বিনির্মাণের ইতিহাসে নারীর অবদান, নারীর শ্রম, ঘাম যথার্থরূপে স্বীকৃতি পায়নি। ফলত সাতচল্লিশোত্তর এই ভূখণ্ডে শ্রমজীবী, খেটে খাওয়া নারীর বঞ্চনার, যে নানারূপ ও রং আছে তার এক সুবিশাল অধ্যায় বাংলাদেশের উপন্যাসের আধারে স্বাতন্ত্র্য মর্যাদায় সমুন্নত রয়েছে। এই অনাদি-অনন্ত প্রত্যয়কে গবেষণার রূপরেখায় অভিব্যক্ত করার অভিপ্রায়। আধা-সামন্তবাদী, আধা-পুঁজিবাদী সমাজের অন্তর্মূলে বাস করা নিম্নবর্গীয় নারীর অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার যে লড়াই, তার সমষ্টিগত ধারণার একটি পূর্ণায়ত রূপ পেয়েছে।

১.২

এক একজন লেখক আলাদা ব্যক্তি, আলাদা দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। তাঁদের স্বতন্ত্র দৃষ্টি পরিসর থেকে নিম্নবর্গের নারীর একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে এই গবেষণায়। দরিদ্র, অবহেলিত, লৈঙ্গিক বৈষম্যের শিকার এই সব নারীর জীবনচিত্রণে ঔপন্যাসিকগণ তাদের জীবনসংগ্রামের যৌক্তিক পরিক্রমার পাশাপাশি তাদের অন্তর্লোকের সুকুমার প্রবৃত্তির প্রবাহকেও রূপায়ণ করেছেন। বহুকালবাহিত সমাজপ্রথার বন্ধন যিনি বা যারা ছিঁড়তে চান, তাঁদের রচনায় নারী শুধু নারীরূপে আসে না, সমাজের সামগ্রিক সত্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে রূপায়িত হয়। সভ্যতার আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন সামাজের যেসব বৈষম্যের জন্ম দিয়েছিল, সেখান থেকেই অপসারিত হয়েছিল নারীর স্বাধীনতার ক্ষেত্রটি। সমাজের এই অর্ধেক জনগোষ্ঠীর ওপর চাপিয়ে দেয়া পুরুষ ও পুরুষতন্ত্রের নিয়ন্ত্রিত শাসনব্যবস্থার গভীরতর দিক হলো লিঙ্গভেদ। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চাপিয়ে দেয়া কাঠামোটি টিকে থাকার কারণে নারীর অবস্থার কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। উপন্যাসে রূপায়িত হওয়া জীবনের বিস্তৃত পরিসরে তার বিভিন্নরূপের পরিচয় পাওয়া যায়। বাস্তব সংগ্রামের পাশাপাশি নারীর চিন্তার জগতে খেলা করা পরিবর্তনের স্তরগুলো আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে। অভিসন্দর্ভে আলোচিত নারীর মধ্যে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নারীর একটি প্রতিচ্ছবি লক্ষ করা যায়। সমাজের বিবর্তিত ধারায় নিম্নবর্গের নারীর যে বহুমাত্রিক পদচারণা সেখানে শোষণের ইতিহাস অধিক, সফলতার অধ্যায় কম। তবু নারী থেমে থাকেনি, তার পথচলা অবিরাম। জীবনের অন্ধকার গলির সবটুকু আঁধারকে মোচন করে আলোর পথ খুঁজে চলেছে তারা। সময়, সমাজ ও অবস্থান অনুসারে

নারীর সমস্যারা আকৃতি ধারণ করে। সেখানে পুরুষ, পুরুষতান্ত্রিকতা, ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র সবসূত্র একত্রে কাজ করে। বাংলাদেশের উপন্যাসের দীর্ঘ পরিক্রমায় নারীর শ্রমজীবন অবমূল্যায়িত হয়েছে সবচেয়ে বেশি। সংসারজীবনে নারী তার পরিবার ও পরিজনের জন্য দিনান্ত শ্রমদান তার কোনো ইতিবাচক অনুপ্রেরণা পায় না। সমাজ-সংসারের সর্বক্ষেত্রে পুরুষের একনায়কতান্ত্রিক আধিপত্যের তলায় বিলীন হয়ে যায় নারীর সমস্ত কর্মপ্রয়াস। নারী সামাজিকভাবে সম্মান ও স্বীকৃতি না পাওয়ায় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে রয়েছে। সমাজের এই বৈমাত্রেয় সুলভ ব্যবহার নারীর পথকে সংকীর্ণ করে তুলেছে।

১.৩

আলোচিত গবেষণাকর্মে সেই সব উপন্যাস সম্পৃক্ত হয়েছে, যেখানে নারী চরিত্রের গুরুত্ব ও বিস্তৃতির ওপর কাহিনি নির্মিত হয়েছে। এই চরিত্রসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় চরিত্রগুলো বাস্তবানুগ ও জীবন্ত। অর্থনৈতিক সংকীর্ণতা যেমন মানুষের জীবনকে সীমাবদ্ধ করে তোলে, তেমনি নারীর জীবনের চলন-বলন, আচার-আচরণেও প্রাধান্য বিস্তার করে। অর্থনৈতিক শ্রেণিবৈষম্য তাদের জীবনের গতিপথকে নিয়ন্ত্রিত করলেও মানবিক ঐশ্বর্যেও তারা এক একজন পরিপূর্ণ মানুষ। জীবনের দুর্গম পথে চলতে গিয়ে তারা আত্মবিসর্জনের পরাকাষ্ঠে এক একজন দাতাকর্ণ। নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার মধ্যে যে সার্বিক সুখানুভূতি আছে সেই আত্মদর্শন তাদের চরিত্রের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। বাঙালি বিবাহিত নারীর জীবন স্বামী-সংসারের বৃত্তের বাইরে নয়, স্বামীকেন্দ্রিক এই বৃত্তের অনুশাসন নারীর স্বাধীন জীবনাচারকে বারবার ব্যাহত করেছে। তবু নিম্নবর্গের নারী স্বামীর ছায়াতল থেকে বের হতে পারে না। সামাজিক অনুশাসনের পরিবৃত্তি তাদের চতুর্দিক থেকে আবদ্ধ করে, ফলে যতই অসহনীয় হোক, তারপরও এই জীবন থেকে মুক্তির পথ তারা পায় না।

বাংলাদেশের উপন্যাসে নিম্নবর্গের নারীর যে শিল্পভাষ্য রচিত হয়েছে, সেখানে অধিকাংশই বিবাহিত নারীর জীবন পরিসীমা গুরুত্ব পেয়েছে। বাংলাদেশের সমাজের নীতি অনুসারে ধরেই নেয়া হয় যে বিবাহই একজন নারীর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে নারীর যে নতুন পথচলা শুরু হয়, সেখানে প্রতি পদক্ষেপে তার সামাজিক দায়বদ্ধতা বেড়ে যায় শতভাগ। বৈবাহিক জীবনের সফলতা নির্ভর করে দায়িত্বশীল ও নির্জীব প্রাণী হওয়ার মধ্য দিয়ে। নিম্নবর্গের পরিবারগুলোতে নারীকে ঘরে ও বাইরে সমান শ্রম দিতে হয়, তারপরও তাদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন ভোগ করতে হয়। প্রাচীন বাংলার সামাজিক নীতি ও পারিবারিক মূল্যবোধে পুরুষের আধিপত্য বজায় রেখে নারীকে সব সময় পরনির্ভরশীল ও ভারবাহী পশুতে পরিণত করা হয়েছে।

আর্থিক নির্ভরশীলতার সুযোগ নিয়ে সামাজিকভাবে নারীকে পিতৃতন্ত্রের পরিচয়ে পরিচিত হতে বাধ্য করা হয়েছে। সর্বোপরি মানুষ হিসেবে মানুষের প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে তাকে ঠেলে দেয়া হয়েছে প্রান্তিকতার চরম স্তরে। পুরুষতান্ত্রিক রক্ষণশীলতার ও ধর্মীয় সংকীর্ণ বিধিনিষেধের গণ্ডিতে বারবার স্খলিত ও অবমাননাকর পরিস্থিতির শিকার হতে হয়েছে নারীকে। আলোচিত উপন্যাসের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সামাজিক নেতিবাচকতায় নারীর জীবন সংকটাপন্ন হয়ে উঠেছে। কোনো ক্ষেত্রে তারা সামাজিক সংকীর্ণতার সীমাকে অতিক্রম করে স্বাধীন কর্মপ্রচেষ্টায় জীবন পরিচালনা করার দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমাজ-সংসারের নীতির সঙ্গে আপোস করতে হয়েছে। নিজস্ব বিশ্বাস, জীবনবোধ আর বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মেলনে প্রান্তবাসী এই সব নারী অনন্য ও প্রাতিস্বিকতার দাবিদার হয়ে উঠেছে।

সার্বিক শোষণের পরিসরকে অতিক্রম করে নিজস্ব পথরেখার নির্মিতিতে সংগ্রামী এই সমস্ত নারীর অবদানকে যর্থাথ মূল্যায়নের মাধ্যমে অভিসিক্ত করা এই গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য। সামাজিক পরিসেবার দিক থেকে পিছিয়ে থাকা এই মানুষের অন্তর্নিহিত গুণাবলিকে সামাজিক বাস্তবতায় অনুধাবন, মানবিক বিবেচনায় সংজ্ঞায়ন করা এবং সমকালীন বাস্তবতায় রূপায়ণের দায়বদ্ধতা থেকে এই অনুশীলন। জীবনধারণের তাগিদে নিম্নবর্গের নারীকে বিভিন্ন ধরনের পেশাকে গ্রহণ করতে হয়; পেশাগত অবস্থান থেকে বিভিন্ন সামাজিক বৈরিতায় তাদের জীবন অনেক সময় বিপন্ন হয়ে থাকে। নারীর এই সংগ্রামমুখর জীবনের দীর্ঘ বর্ণনায় আর্থ-সামাজিক বহুবিধ সমস্যার পাশাপাশি লৈঙ্গিক রাজনীতি একটি বড় ভূমিকা রাখে। নারীর সামাজিক অবস্থান লৈঙ্গিক সমীকরণের বাইরের কোনো বিষয় নয়; তাই নিম্নবর্গের নারীর বিশদ বিশ্লেষণে পুরুষতান্ত্রিক অপকৌশলগুলো অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হিসেবে আলোচিত ও বিবেচিত। কারণ নিম্নবর্গের মানুষকে নিম্নবর্গের পরিণত করতে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক যে অনুবর্তনসমূহ ক্রিয়াশীল থাকে, সেখানে নারী প্রাসঙ্গিক স্তরায়ণে লৈঙ্গিক অবদমন অন্যতম একটি সূত্রায়ণ। ধান ভানতে শিবের গীত-এর মতো নারী প্রাসঙ্গিক আলোচনায় সামাজিক স্তরবিন্যাসের পাশাপাশি লৈঙ্গিক স্তরবিন্যাস গুরুত্বপূর্ণ উপাখ্যান রূপে আদৃত।

গ্রন্থপঞ্জি:

প্রাথমিক উৎস:

১. অদ্বৈত মল্লবর্মণ (২০১৫)। *অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনা সমগ্র*, দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা

২. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৯৬)। *খোয়াবনামা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

৩. আল মাহমুদ (১৯৯৫)। *নিশিন্দা নারী*, ঐতিহ্য, ঢাকা

৪. আলাউদ্দিন আল আজাদ (২০১৩)। *ক্ষুধা ও আশা*, বাতায়ন প্রকাশন, ঢাকা

৫. আবু ইসহাক (২০১৭)। *সূর্য-দীঘল বাড়ি*, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা

৬. আবু ইসহাক (২০১৬)। *পদ্মার পলিদ্বীপ*, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা

৭. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১৫)। *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়*, অবসর, ঢাকা

৮. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৪২৩ব.)। *কালিন্দী*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা

৯. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৪২৪ব.)। *গণদেবতা*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা

১০. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৪২৩ব.)। *পঞ্চগ্রাম*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা

১১. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১৮)। *কবি*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা

১২. জহির রায়হান (২০০৩)। *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা,

১৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (২০১৮)। *বঙ্কিম রচনাবলী উপন্যাস*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

১৪. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০০)। *পথের পাঁচালী*, আজকাল, ঢাকা

১৫. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৪০৮ব.)। *আরণ্যক*, আজকাল, ঢাকা

১৬. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১২)। *ইছামতী*, অবসর, ঢাকা

১৭. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৪২৪ব.)। *আদর্শ হিন্দু- হোটেল*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ. কলকাতা

১৮. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৪২৪ব.) *। অশনি সংকেত*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ. কলকাতা

১৯. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১৪)। *উপন্যাস সমগ্র২*, সাহিত্যম্‌ কলকাতা

২০. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১৮)। *উপন্যাস সমগ্র দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড*, অবসর, ঢাকা

২১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১৯)। *পদ্মা নদীর মাঝি*, অবসর, ঢাকা

২২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪২৫ব.)। *রবীন্দ্র উপন্যাস সংগ্রহ*, বিশ্বভারতী, কলকাতা

২৩. রিজিয়া রহমান (২০১৭)। শ্রেষ্ঠ উপন্যাস১, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা

২৪. রিজিয়া রহমান (২০১৭)। *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস২*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা

২৫. শওকত ওসমান (২০১১)। *জননী*, সময় প্রকাশ, ঢাকা

২৬. শওকত আলী (২০১৭)। *প্রদোষে প্রাকৃতজন*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা

২৭. শহীদুল্লা কায়সার (২০১৭)। *সারেং বৌ*, চারুলিপি প্রকাশন, ঢাকা

২৮. শহীদুল্লা কায়সার (২০১৭)। *সংশপ্তক*, চারুলিপি প্রকাশন, ঢাকা

২৯. শামসুদ্দীন আবুল কালাম (২০১৬)। *কাশবনের কন্যা*, বিভাস, ঢাকা

৩০. শামসুদ্দীন আবুল কালাম (১৩৬৮ব.)। *কাঞ্চনমালা*, ওসমানিয়া বুক ডিপো, ঢাকা

৩১. সরদার জয়েনউদ্দীন (১৩৭১ব.)। *পান্নামোতি*, ওসমানিয়া বুক ডিপো, ঢাকা

৩২. সেলিনা হোসেন (২০১৩)। *নীল ময়ূরের যৌবন*, ঐতিহ্য প্রকাশ, ঢাকা

৩৩. সেলিনা হোসেন (২০০৫)। *চাঁদবেনে*, আহমেদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা,

৩৪. সেলিনা হোসেন (২০২০)। *উপন্যাস ত্রয়ী*, পাঞ্জেরী প্রকাশ, ঢাকা

৩৫. সেলিনা হোসেন (২০১৯)। *রচনাবলি ১*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা

৩৬. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (২০১৬)। *উপন্যাস সমগ্র*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা

৩৭. সৈয়দ শামসুল হক (২০০২)। *উপন্যাস সমগ্র*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা

সহায়ক গ্রন্থ বাংলা :

১. অজয় রায় (২০১৭)। *বাঙলা ও বাঙালী*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

২. অমর্ত্য সেন (১৪২২)। *জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি*, আনন্দ, কলকাতা

৩. অমল দাস (২০১৩)। *ভারত ইতিহাসে নিম্নবর্গের নারী শ্রমিক এদের সংকট ও সংগ্রাম উনিশ থেকে বিশ শতক*, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা

৪. অনুপম সেন (২০১৬)।*বাংলাদেশ: রাষ্ট্র ও সমাজ সামাজিক অর্থনীতির স্বরূপ*, অবসর, ঢাকা

৫. অনিন্দিতা দত্ত (২০১৯)। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র কথাসাহিত্যে আত্মপরিচয়ের বর্ণমালা*, এবং মুশায়েরা, কলকাতা

৬. অনীক মাহমুদ (১৯৯৫)। *বাংলা কথাসাহিত্যে শওকত ওসমান*, ইউরেকা বুক এজেন্সি, রাজশাহী

৭. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় (২০০৬)। *কালের প্রতিমা বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর বছর:১৯২৩-১৯৯৭*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৮. অরুণ সেন (সম্পা.)(২০১৪)। *বিভূতিভূষণ: আধুনিক জিজ্ঞাসা*, সাহিত্য অকাদেমি, ঢাকা

৯. অশ্রুকুমার শিকদার (২০০৮)। *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস*, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা

১০. অশোক মিস্ত্রি (২০১২)। *শহীদুল্লা কায়সার জীবন ও সাহিত্য*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা

১১. আবদুল মান্নান সৈয়দ (২০১৩)। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্তর্বাস্তবতা বহির্বাস্তবতা*, প্রথমা, ঢাকা

১২. আহমদ শরীফ (২০০৫)। *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, নিউ এজ পাবলিকেশন, ঢাকা

১৩. আহমদ শরীফ (২০০৩)। *বঙ্কিমবীক্ষা অন্য নিরিখে*, উত্তরণ, ঢাকা

১৪. আহমেদ কবির (১৯৮৯)। *সরদার জয়েনউদ্‌দীন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

১৫. আহমেদ মাওলা (১৯৯৭)। *বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে প্রবণতাসমূহ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

১৬. আলাউদদীন মণ্ডল (২০০৯)। *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস নির্মাণে বিনির্মাণে*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

১৭. আনু মুহাম্মদ (২০১৮)। *বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতি*, মীরা প্রকাশন, ঢাকা

১৮. ইরফান হবিব (২০১৯)। *মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা* (১৫৬৬-১৭০৭), কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা

১৯. কল্যাণ মিরবর (২০২০)। *বাংলাদেশের উপন্যাস (১৯৭১-১৯৮৭)*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

২০. কামরুদ্দীন আহমদ (১৯৮৩)। *পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

২১. কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৪১৩ব.)। *বাংলা উপন্যাসে উপকাহিনী* (বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র), সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা

২২. খোরশেদ আলম (২০১১*)। কথাসাহিত্যে : পাঠ ও চিন্তন*, অক্ষর প্রকাশনী, ঢাকা

২৩. গিয়াস শামীম (২০০২)। *বাংলাদেশের আঞ্চলিক উপন্যাস*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

২৪. গিয়াস শামীম (২০১৫)। *বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্যাস*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা ১০০০

২৫. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী (২০০৮)। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

২৬. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী (২০১৬*)। বিভূতিভূষণ: মন ও শিল্প*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

২৭. গোপিকানাথ রায় চৌধুরী (২০১৪)। *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা সাহিত্য*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

২৮. গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পা. (২০১৫)। *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, আনন্দ, কলকাতা

২৯. গৌতম ভদ্র (২০১৮)। *ইমান ও নিশান*, সুবর্ণরেখা, কলকাতা

৩০. চিত্ত মণ্ডল ও প্রথমা রায়মণ্ডল সম্পা. (২০১৬)। *বাংলার দলিত আন্দোলনের ইতিবৃত্ত, একুশশতক*, কলকাতা

৩১. ছন্দশ্রী পাল (২০০৯)। *বাংলাদেশের উপন্যাস পরিবার ও সমাজ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৩২. জহর সেনমজুমদার (২০০১)। *উপন্যাসের ঘরবাড়ি*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

৩৩. জহর সেনমজুমদার (২০১৭)। *নিম্নবর্গের বিশ্বায়ন*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

৩৪. জয়শ্রী চৌধুরী ও ইন্দ্রানী দাশ সম্পা.(২০১৬)। *আন্তেনিও গ্রাম্‌শি ইতিহাসের প্রান্তসীমায়*, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

৩৫. জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (১৪০৬ব.)। *শরৎসাহিত্যে ব্যক্তি ও সমাজ*,করুণা প্রকাশনী, কলকাতা

৩৬. জাকারিয়া শিরাজী (১৯৯৯)। *আধুনিক সাহিত্য মন ও মানসতা*, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা

৩৭. জীনাত ইমতিয়াজ (২০০১)। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা

৩৮. তপোধীর ভট্টাচার্য (২০০০)। *অদ্বৈত মল্লবর্মণ*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

৩৯. তপোধীর ভট্টাচার্য (২০২০)। *বাখতিন তত্ত্ব ও প্রয়োগ*,বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ,কলকাতা

৪০. তাশরিক-ই-হাবিব (২০১৮)। *বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে প্রান্তজনের জীবনচিত্র*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা১০০০

৪১. দিলীপ দাস (২০১৪)। *তিতাসের অদ্বৈত একটি নদী-নিবিড় উপন্যাসের রূপকল্প সন্ধান*, বুক ওয়াল্ড, কলকাতা

৪২. দেবেশ রায় (২০১৬)। *উপন্যাস নিয়ে*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৪৩. দেবযানী ভৌমিক চক্রবর্তী (২০১৪) *তুলনার প্রেক্ষিতে বঙ্কিম-রবীন্দ্র উপন্যাসে নারী-মনস্তত্ত্ব*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

৪৪. দেবীপদ ভট্টাচার্য (২০১৮)।*উপন্যাসের কথা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৪৫. নাজমা জেসমিন চৌধুরী (১৯৮০)। *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৪৬. নাহিদ হক (২০১১)। *মানিক উপন্যাসের নারী*, শুদ্ধস্বর, ঢাকা

৪৭. নিতাই বসু (২০১১)। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজজিজ্ঞাসা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৪৮. নির্মল দাশ (সম্পা.)(২০১৪)। চর্যাগীতি পরিক্রমা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৪৯. নীহাররঞ্জন রায় (১৪০৭)। *বাঙালির ইতিহাস: আদি পর্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৫০. নীলিমা ইব্রাহিম (২০০১)। শরৎ প্রতিভা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৫১. পার্থ চট্টোপাধ্যায় (২০১৭)। *ইতিহাসের উত্তরাধিকার*, আনন্দ, কলকাতা

৫২. পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯২)। *উপন্যাস রাজনৈতিক: বিভূতিভূষণ*,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলাকাতা

৫৩. পূরবী বসু (২০১৭)। *আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বাংলার নারী*, বেঙ্গল পাবলিকেশনস লিমিটেড, ঢাকা

৫৪. প্রণব চৌধুরী (সম্পা.)(২০০১)। *গদ্যশিল্পী শরৎচন্দ্র প্রমথ চৌধুরী ও কাজী আবদুল ওদুদ*, বাংলাদেশ বইঘর ঢাকা

৫৫. ফকরুল চৌধুরী (২০১৬)। *প্রাচ্যতত্ত্ব ও উত্তর-ঔপনিবেশিক সমাজ* , কথা প্রকাশ, ঢাকা

৫৬. ফজলুল হক সৈকত (২০০৮)। *সরদার জয়েনউদদীনের কথাসাহিত্যঃ সমাজ ও সমকাল*, ইত্যাদি প্রকাশন, ঢাকা

৫৭. ফজলুল হক সৈকত (২০০৮)। *সরদার জয়েনউদ্দীনের কথাসাহিত্যঃ সামাজ ও সমকাল*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ,ঢাকা

৫৮. ফরিদা সুলতানা (১৯৯৯)। *বাংলাদেশের উপন্যাসে জীবন চেতনা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

৫৯. বদিউর রহমান অনু.(২০১১)। *উপন্যাসের যত বিষয়*, পলল প্রকাশনী, ঢাকা

৬০. বিনয় ঘোষ (২০০৯)। *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, প্রকাশ ভবন, কলকাতা

৬১. বিপ্লব মাজী (২০১৭)। *তৃতীয় বিশ্বের প্রান্তিক নারী*, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা

৬২. বিপ্লব মাজী(২০১২*) । উপন্যাসের ভাষা*, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা

৬৩. বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০০২)। *বাংলা সাহিত্য পাঠ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৬৪. বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০০৯)। *বাংলাদেশের সাহিত্য*, আজকাল, ঢাকা

৬৫. ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক সম্পা. (২০১২)। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শত বার্ষিক স্মরণ*, অবসর, ঢাকা

৬৬. ভুঁইয়া ইকবাল সম্পা.(২০১২)। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

৬৭. মঞ্জু সরকার (২০১৪)। *নারী-উপন্যাসের শৈলীবিচার*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৬৮. মনসুর মুসা(২০০৮)। *পূর্ব বাংলার উপন্যাস*, অ্যার্ডন পাবলিকেশন

৬৯. মল্লিকা সেনগুপ্ত(২০২০) *স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ*, আনন্দ কলকতা

৭০. মল্লিকা সেনগুপ্ত(২০০২)। *পুরুষ নয় পুরুষতন্ত্র*, প্রতিভাস, কলকাতা

৭১. মহীবুল আজিজ(২০০২)।*বাংলাদেশের উপন্যাসে গ্রামীণ নিম্নবর্গ*,জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা

৭২. মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় (২০০৯)। *গোষ্ঠীজীবনের উপন্যাস*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

৭৩. মাসুদুজ্জামান(২০১৮)। *পুরুষতন্ত্র ও যৌন রাজনীতি*, পাঞ্জেরি পাবলিকেশন লি. ঢাকা

৭৪. মালেকা বেগম(২০১৬)। *নারীমুক্তি আন্দোলন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৭৫. মালেকা বেগম (২০১৩)। *বিপন্ন নারী*, মুক্তধারা, ঢাকা

৭৬. মুনতাসীর মামুন অনু.(২০০০)। *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ*, সুবর্ণ, ঢাকা

৭৭. মুনতাসীর মামুন সম্পা. (২০১৬)। *বাংলাদেশ নিম্নবর্গ, দ্রোহ ও সশস্ত্র প্রতিরোধ* (১৭৬৩-১৯৫০), কথা প্রকাশ, ঢাকা

৭৮. মুহম্মদ ইদরিস আলী(১৯৮৮)। *আমাদের উপন্যাসে বিষয়-চেতনা বিভাগোত্তর কাল*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি

৭৯. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান (২০১৬)। *গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৮০. মিল্টন বিশ্বাস(১৯৯৬)। *শওকত আলী ও সেলিনা হোসেনের উপন্যাস: প্রসঙ্গ রাজনীতি*

৮১. মিল্টন বিশ্বাস (২০০৯)। *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ছোটগল্পে নিম্নবর্গের মানুষ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৮২. মো. আশরাফুল ইসলাম(২০১৬)। *শামসুদদীন আবুল কালামের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গ ও মধ্যবিত্তশ্রেণির জীবন-রূপায়ন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

৮৩. মোঃ আব্দুল মান্নান (২০১১)। *গ্রামীণ নারী*, অবসর, ঢাকা

৮৪. মোঃ মেহেদি হাসান (২০০৮)। *বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের জীবন(১৯৭১-২০০০)*, মনন প্রকাশ, ঢাকা

৮৫. মোসা. শামসুন নাহার(২০১৬)। *উপন্যাসে প্রাচীন বাংলা*, বাংলা একাডেমি

৮৬. মোহাঃ সাইদুর রহমান(২০১১)। *আমাদের তিন ঔপন্যাসিক*, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা

৮৭. মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ সম্পা.(২০১৯)। *শামসুদদীন আবুল কালামের কাশবনের কন্যা লৌকিক জীবনের গাথা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ

৮৮. মোস্তাফা মোহাম্মদ (২০১০)। *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস কথাসাহিত্যে জীবনও সমাজ*, নান্দনিক, ঢাকা

৮৯. মোস্তাফা তারিকুল ইসলাম (২০০৮)। সৈয়দ শামসুল হকের সাহিত্যকর্ম, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৯০. যশোধরা বাগচী (২০১২)। *নারী ও নারীর সমস্যা*,অনুষ্টুপ, কলকাতা

৯১. রণবীর চক্রবর্তী (১৪২৫ব.)। *প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে*, আনন্দ, কলকাতা

৯২. রণেশ দাশগুপ্ত (২০১২)। *উপন্যাসের শিল্পরূপ*, প্যাপিরাস, ঢাকা

৯৩. রফিকউল্লাহ খান (২০০৯)। *বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

৯৪. রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় ও গৌতম নিয়োগী সম্পা.(২০০৭)। *ভারত ইতিহাসে নারী*, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা

৯৫. রাজকুমার চক্রবর্তী (২০১৯)। *নির্মাণ অবিনির্মাণ বিকৃতি*, এবং মুশায়েরা, কলকাতা

৯৬. রুমা বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১৪)। *বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান*,বঙ্গীয় সাহিত্য সংসাদ, কলকাতা

৯৭. রাশিদা আখতার খানম (২০১৮)। *নারীবাদ ও দার্শনিক প্রেক্ষাপট*,জতীয় সাহিত্য প্রকাশ

৯৮. রেবতী বর্মণ (২০১৭)। *সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ*, বিভাস, ঢাকা

৯৯. শহীদ ইকবাল (১৯৯৭)। *কথাশিল্পী আখতারুজ্জামান ইলিয়াস*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন

১০০. শহীদ ইকবাল (২০১৬)। *বাংলাদেশের সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা

১০১. শান্তনু কায়সার (২০১৪)। *জন্ম শতবর্ষে অদ্বৈত মল্লবর্মণ জীবন*, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, সোপান, কলকাতা

১০২. শান্তনু কায়সার (২০০৮)। *বঙ্কিমচন্দ্র*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা

১০৩. শামসুদ্দিন চৌধুরী (২০০৭)। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর সাহিত্যে প্রতীচ্য প্রভাব*, বাংলা একাডেমি ঢাকা

১০৪. শাহীন আখতার(সম্পা.)(২০০৯)। *সতী ও স্বতন্তরা বাংলা সাহিত্যে নারী প্রথম খণ্ড*, সাহিত্যপ্রকাশ, ঢাকা

১০৫. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিজিৎ দাশগুপ্ত সম্পা.(১৯৯৮)। *জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ*, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, দিল্লি, পার্থশঙ্কর বসু কতৃক নয়া উদ্যোগে কলকাতা থেকে প্রকাশিত

১০৬. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০০)। *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

১০৭. সরিফা সালোয়া ডিনা (২০১৮)।*শহীদুল্লা কায়সারের উপন্যাস বিচিত্র বীক্ষণ*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

১০৮. সিরাজ সালেকীন (২০২০)। *ভারতীয় শাস্ত্রে নারীকথা*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা

১০৯. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (২০১৬)। *জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও জনগণের মুক্তি*, সংহতি, ঢাকা

১১০. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী(সম্পা.)(২০১৭)। *শওকত ওসমান জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

১১১. সুতপা ভট্টাচার্য (২০২১)। *প্রবন্ধ সংগ্রহ*,এবং মুশায়েরা,কলকাতা

১১২. সুকুমার সেন (২০১৩)। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, আনন্দ, কলকাতা

১১৩. সুকুমারী ভট্টাচার্য (১৪২৪)। *প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য*, আনন্দ, কলকাতা

১১৪. সুকোমল সেন (২০১৩)। *ভারতের সভ্যতা ও সমাজ বিকাশে ধর্ম শ্রেণী ও জাতিভেদ*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

১১৫.	সুবোধ দেবসেন (২০১২)। *বাংলা কথাসাহিত্যে ব্রাত্যসমাজ,* পস্তুক বিপণি, কলকাতা

১১৬.	সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায় (২০০৬)। *বিভূতিভূষণ: জীবন ও সাহিত্য*, সাহিত্যায়ন, কলকাতা

১১৭.	সুদীপ্তা চক্রবর্তী (১৪২০ব.)। *অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কবি ও কথাশিল্পী*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

১১৮.	সুশোভন মুখোপাধ্যায় (১৪১৩ব.)। *প্রাক-আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অন্ত্যজ জীবন*, করুণা প্রকাশনী, ঢাকা

১১৯.	সেলিনা হোসেন ও বিশ্বজিৎ ঘোষ(সম্পা.২০০৮)। *জেন্ডার আলোকে সংস্কৃতি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

১২০.	সেলিনা হোসেন, বিশ্বজিৎ ঘোষ ও মাসুদুজ্জামান(সম্পা.২০০৭)। *সাহিত্যে নারীর জীবন ও পরিসর,* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

১২১.	সোহানা বিলকিস (২০১৪)। *নারীর ভাষা প্রসঙ্গ,* অবসর, ঢাকা

১২২.	সৈয়দ আজিজুল হক (১৯৯৮)। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

১২৩.	সৈয়দ আকরম হোসেন ও সিরাজ সালেকীন সম্পা.(২০০৮)। *বাংলা উপন্যাসে নদী-চর ও দ্বীপপজীবন,* জ্ঞানজ্যোতি প্রকাশনী, ঢাকা

১২৪.	সৈয়দ শামসুল হক (২০০২)। *উপন্যাস সমগ্র৫*, অন্য প্রকাশ, ঢাকা

১২৫.	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (২০১৬)। *উপন্যাস সমগ্র*, প্রতীক প্রকাশ, ঢাকা

১২৬.	সৌদা আখতার (২০০১)। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র লালসালু ও অন্যান্য প্রবন্ধ,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০১

১২৭.	সৌমিত্র শেখর (সম্পা.)(২০০৯)। বিভূতিভূষণ কথা ও সাহিত্য, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

১২৮.	হুমায়ুন আজাদ, সম্পা.(১৯৮৫)। *বাঙালা ভাষা বাঙলা ভাষাবিষয়ক প্রবন্ধসংকলন[১৭৪৩-১৯৮৩],* বাংলা একাডেমি, ঢাকা

১২৯.	হুমায়ুন আজাদ, অনু. (২০১২)। *দ্বিতীয় লিঙ্গ,* আগামী প্রকাশনী,ঢাকা

১৩০.	হুমায়ুন আজাদ, অনু. (২০০৮)। *নারী,* আগামী প্রকাশনী,ঢাকা

১৩১.	হাসান আজিজুল হক(২০১৭)। *কথাসাহিত্যের কথকতা*, সাহিত্যিক, ঢাকা

১৩২.	হোসনে আরা (২০১৮)। মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যে আদিবাসী জীবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা ১০০০

১৩৩.	হরিশংকর জলদাস (২০০৮)। *নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাস ও কৈবর্তজীবন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

১৩৪. হাসান অরিন্দম (২০১৯)। *বাংলার লোকজীবন ও আবু ইসহাকের কথাসাহিত্য*, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা

সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থঃ

১. Bakhtin (1981) *The Dailogic Imagination: Four Eassy (trans. C. Emerson and M. Holquist ed.Hoquist)* Austm Tex: University of Teaxas Press.

২. Gayatri Chakravorty Spivak (1999) *A Critique of postcolonial Reason*, Harvat University Press, Massachustts, London, England.

৩. Engles (1970) *Letter of Joseph Blochin Marx and Engles Selected Corrspondence.*

৪. G.M Trevelyan(1948)*English Social History,* London

৫. HENRIK IBSEN(1870) *A DOLL'S HOUSE*, London,T. FISHER UNWIN, 26 PATERNOSTER SQUARE

৬. John Steinbeck(1939) *The Grapes of Wrath*, The Viking press, United States

৭. Ralph Fox (1937) *The Novel and the people*, London.

৮. RANAJIT GUHA (edit.)(1998) *SUBALTERN STUDIES* III,OXFORD UNIVERSITY PRESS, DELHI

৯. RANAJIT GUHA (edit.)(1997)*SUBALTERN STUDIES* IV, OXFORD UNIVERSITY PRESS, DELHI

১০. RANAJIT GUHA (edit.)(1998) *SUBALTERN STUDIES* V, OXFORD UNIVERSITY PRESS, DELHI

১১. DAVID ARNOLD and DAVID HARDI (edit.) (1999) *SUBALTERN STUDIES* VIII, OXFORD UNIVERSITY PRESS, DELHI

১২. GAUTAM BHADRA, GYAN PRAKASH and SUSIE THARU (edit.)(1999) *SUBALTERN STUDIES* X, OXFORD UNIVERSITY PRESS, DELHI

১৩. SHAHID AMIN and DIPESH CHAKRABARTY (edit.) (1999) *SUBALTERN STUDIES* IX, OXFORD UNIVERSITY PRESS, DELHI

সহায়ক প্রবন্ধের তালিকাঃ

১. অমলকুমার মণ্ডল, 'লোকসংস্কৃতির আলোয় অদ্বৈতের তিতাস' উৎপল ভট্টাচার্য সম্পা. (১৪২১ব.) কবিতীর্থ, কলকাতা

২. আবুল আহসান চৌধুরী(২০১৯)'*কাশবনের কন্যাঃ* চকিত অবলোকন' মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ্ [সম্পা.] *কাশবনের কন্যা লৌকিক জীবনের গাথা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

৩. আবুল বারকত, Bangladesh Journal of political Economy: vol. 27, No. 1&2, 2011,p.29-3,ঢাকা

৪. আনিসুজ্জামান, 'পুরোনো বাংলা সাহিত্যে নারী সম্পর্কিত ধারণা, সেলিনা হোসেন, বিশ্বজিৎ ঘোষ ও মাসুদুজ্জামান সম্পা.(২০০৩)। *নারীর ক্ষমতায়নঃ রাজনীতি ও আন্দোলন*, মাওলা ব্রার্দাস,ঢাকা

৫. গৌরী হালদার, নারীমুক্তি আন্দোলন ও দলিত নারী সমাজ, চিত্ত মণ্ডল ও ড. প্রথমা রায়মণ্ডল সম্পা. (২০১৬)। *বাংলার দলিত আন্দোলনের ইতিবৃত্ত*, একুশশতক, কলকাতা

৬. তপোধীর ভট্টাচার্য(২০১৬) ''প্রদোষে প্রাকৃতজন':আখ্যান নরক-দর্শন' চন্দন আনোয়ার [সম্পা.]গল্পকথা রিজিয়া রহমান সংখ্যা, রাজশাহী

৭. প্রথমা রায়মণ্ডল, বাংলার দলিত আন্দোলনের ইতিবৃত্ত, চিত্ত মণ্ডল ও ড. প্রথমা রায়মণ্ডল সম্পা. (২০১৬)। *বাংলার দলিত আন্দোলনের ইতিবৃত্ত*, একুশশতক, কলকাতা

৮. প্রথমা রায়মণ্ডল, 'সেলিনা হোসেনের কথাসাহিত্য একটি নিবিড় সমীক্ষণ' মাসুদুজ্জামান, বরেন্দু মণ্ডল [সম্পা.](২০১৩)। *সেলিনা হোসেনের কথাসাহিত্য দেশ কাল জাতি*, লেখা প্রকাশ, ঢাকা

৯. বিকাশকান্তি মিদ্যা, নীল ময়ূরের যৌবনঃ ভাষা আন্দোলন ও স্বদেশিকতার শিকড় সন্ধান মাসুদুজ্জামান, বরেন্দু মণ্ডল [সম্পা.](২০১৩)। *সেলিনা হোসেনের কথাসাহিত্য দেশ কাল জাতি*, লেখা প্রকাশ, ঢাকা

১০. বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০১৫) 'সেলিনামঙ্গল' চন্দন আনোয়ার [সম্পা.] গল্পকথা সেলিনা হোসেন সংখ্যা, রাজশাহী

১১. ভারতী রায়(২০০৭)স্বাধীনতা আন্দোলন এবং বাংলাদেশের নারী জাগরণ(১৯১১-২৯) রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় ও গৌতম নিয়োগী সম্পা.(২০০৭)। *ভারত ইতিহাসে নারী*, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা

১২. মহীবুল আজিজ(২০০০)'বাংলাদেশের উপন্যাসে নারীঃ প্রেক্ষাপট-গ্রামীণ নিম্নবর্গ', সৈয়দ আনোয়ার হোসেন [সম্পা.] উত্তরাধিকার, ঢাকা

১৩. মাসুদ পারভেজ(২০১৭)' রিজিয়া রহমানের *একাল চিরকাল*' চন্দন আনোয়ার [সম্পা.](২০১৭)। গল্পকথা রিজিয়া রহমান সংখ্যা, রাজশাহী

১৪. মালেকা বেগম(২০১৫)'জীবন রসিক কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন : নীল ময়ূরের যৌবন' চন্দন আনোয়ার [সম্পা.] গল্পকথা সেলিনা হোসেন সংখ্যা, রাজশাহী

১৫. মিল্টন বিশ্বাস(২০১৭) 'নারীর নিরাশ্রয়তা ও বিপন্নতার আখ্যান' চন্দন আনোয়ার [সম্পা.] (২০১৭)। গল্পকথা রিজিয়া রহমান সংখ্যা, রাজশাহী

১৬. মিল্টন বিশ্বাস(১৯৯৫) 'সেলিনা হোসেনের উপন্যাসঃ রাজনীতি চেতনা, মনসুর মুসা[সম্পা.] উত্তরাধিকার, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

১৭. মেহেরুন্নেছা, আবুল বারকাত [সম্পা.] Bangladesh Journal of political Economy: vol. 24, No. 1&2, 2009,p.580

১৮. মোস্তাফা মোহাম্মদ(১৯৯৭) 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াসঃ জীবন ও সমাজচিত্র', সৈয়দ আনোয়ার হোসেন [সম্পা.] উত্তরাধিকার, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

১৯. যতীন সরকার(২০০৮) 'বাংলার লোকসমাজে পুরুষতন্ত্র ও নারীচেতনা' সেলিনা হোসেন ও বিশ্বজিৎ ঘোষ [সম্পা.] *জেন্ডার আলোকে সংস্কৃতি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

২০. রাশিদ আসকারী(২০২১)'প্রদোষে প্রাকৃতজনঃএকটি বিকল্প পঠন' হাবীবুল্লাহ সিরাজী [সম্পা.](২০২১)। উত্তরাধিকার, নতুন অভিযাত্রা১০, বাংলা একোডমি, ঢাকা

২১. শিরীণ আখতার(২০১৭)'আবু ইসহাক ও তাঁর সূর্য-দীঘল বাড়ি' ফজলুল হক সৈকত [সম্পা.] (২০১৭)। *কথাশিল্পী আবু ইসহাক*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা

২২. শওকত আলী(১৯৯৮) মীথ, 'তৃণমূলে যাবার এক পথ', আনু মহম্মদ [সম্পা.]*তৃণমূল আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা*, ঢাকা

২৩. শহীদ ইকবাল(২০১৩)'জলোচ্ছ্বাসের করাল কণ্ঠস্বর' মাসুদুজ্জামান, বরেন্দু মণ্ডল [সম্পা.] *সেলিনা হোসেনের কথাসাহিত্য দেশ কাল জাতি*, লেখা প্রকাশ, ঢাকা

২৪. শেখ রজিকুল ইসলাম(২০১৭) 'আবু ইসহাকের উপন্যাস–সমাজ-বাস্তবতার নিরাবেগ উপস্থাপন' ফজলুল হক সৈকত [সম্পা.] *কথাশিল্পী আবু ইসহাক*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা

২৫. সুমিতা চক্রবর্তী(২০১৫) 'নীল ময়ূরের যৌবনঃ সেলিনা হোসেনের ভাষা চন্দন আনোয়ার [সম্পা.]গল্পকথা সেলিনা হোসেন সংখ্যা, রাজশাহী

২৬. সৌমিত্র লাহিড়ী(২০১৭)'ধবল জ্যোৎস্নাঃ স্বপ্ন-দুঃস্বপ্নের আদিম আখ্যান' চন্দন আনোয়ার [সম্পা.]গল্পকথা রিজিয়া রহমান সংখ্যা, রাজশাহী

২৭. হান্নানা বেগম(২০১১) আবুল বারকাত [সম্পা.] *Bangladesh Journal of political Economy*: vol. 27, No1&2, 2011, pp.029-030.ঢাকা

২৮. হোসনে আরা(২০১১)'সূর্য-দীঘল বাড়ি : অপরাজেয় জীবনালেখ্য' সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

২৯. হোসনে আরা(২০১২) 'পদ্মার পলিদ্বীপ : চর-অঞ্চলের জীবনের মানচিত্র' কলা অনুষদ পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সহায়ক ইংরেজি প্রবন্ধের তালিকাঃ

১. Limning the Unheard Voices: A Subaltern Reading of India Goswami's *The Blue-necked God,*Prosenjit Ghosh, Galaxy: International Multidisciplinary Research Joural, Vol.13, june 2022

২. SUBALTERNITY IN AMITAV GHOSH'S SEA OF POPPIES : REPRESENTATION OF INDIAN WOMEN'S STRUGGAINST PATRIARCHY, Sophia KiKi Artanti, Mamik Tri Wedati, Prosodi, Vol.14,2020

৩. REINTERROGATING PATITION VIOLENCE: VOICES: VOICES OF WOMEN/CHILDREN/ DALITS IN INDIA'S PARTITION, PAOLA BACCHETTA, Vol.26,2000